দশম বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৪৮ { ১ম স

“কঠিনেরে ভালোবাসিলাম”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

র[illegible] অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

উদয়ন
১৩ মে, ১৯৪১
রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিট

তারপরে কার্লমার্ক্স। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে পরস্পরের থেকে আলাদা নয়, বরং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কেবল রাষ্ট্রের গঠনই নয়, অন্যান্য সমাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করে---একথার স্পষ্ট স্বীকৃতি প্রথম পাই কার্লমার্ক্সে। রাজ্যশাসনক্রিয়ার আসল ব্যাপারগুলোর মর্ম উদ্ঘাটন করে মার্ক্স দেখিয়েছেন, কিন্তু মার্ক্সও হেগেলের মত অন্যান্য গুরুতর সামাজিক সঙ্ঘরূপ-গুলিকে তাচ্ছিল্য করেছেন। অথচ এইসব খণ্ড সঙ্ঘগুলিরই মধ্যদিয়ে যুগে যুগে সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে এবং এমন কি মজুর ও কৃষকদের অধিকারগুলোও সুরক্ষিত হয়ে এসেছে। মার্ক্স অর্থনৈতিক স্বার্থকে এবং সঙ্ঘগত সংঘর্ষকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নির্দেশ করেছেন যে শ্রেণীসংগ্রামের অবসানে শ্রেণীহীনসমাজে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হবে। এখন দেখা যাক্ রাষ্ট্রের সার্থকতা কোথায়? আগেই বলেছি পরিবার, সমবায়, গ্রাম্য সমিতি, ভদ্রসংহতি বা সামাজিক যূথ (group) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো হলো সামাজিক শাসনের এবং নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বিশেষ মাত্র। রাষ্ট্রও এদেরই মত নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সমষ্টিজীবনের স্বার্থেই উদ্গত হয়েছে। রাষ্ট্রে বিবর্তিত হয়ে উঠেছে কৃষিক্ষেত্রে সমষ্টিগত জলসেচনের জন্য, সর্বসাধারণের জমি, ময়দান এবং গোচারণ ভূমির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমষ্টির আত্মরক্ষার জন্য বা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। সমবায়গুলোও ছিলো আত্মরক্ষার্থে কিংবা অপরকেও আক্রমণার্থে সঙ্ঘবন্ধন। এদের ছিল নানা আইন কানুন, এবং বিঘ্ন উত্তরণের জন্য ছিল নানা সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী। পূর্বে পরিবার, গোষ্ঠী বা গ্রাম্য-সমাজ তার অন্তর্গত প্রত্যেকটী ব্যক্তির কার্য্য ও ব্যবহারের জন্য দায়ী থাক্‌তো। এই সব বহুবিধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহক প্রতিষ্ঠানগুলির মত, রাষ্ট্রও আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলি থেকে অনেক প্রাচীনতর। বর্তমান সমাজসংকটের সমাধান হয়ে গেলে রাষ্ট্র কিংবা অন্য কোন সমাজিক প্রতিষ্ঠান কেহই বিলুপ্ত হবে না। বরং তখন সামাজিক সহযোগিতা ও ব্যবস্থার নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হবে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নতুনতর রূপ ও ধরণ প্রকাশিত হবে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এই সব নানা সঙ্ঘরূপের পরস্পরের মধ্যে অহরহ প্রতিদ্বন্দ্ব চলেছে এবং সমাজ-বিকাশ এইসব সঙ্ঘরূপের একটা একটানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। রাষ্ট্রীয় বা আর্থিক বিবর্তনের নানা স্তরে ও অবস্থায় কখনো রাষ্ট্রীয়, কখনো আর্থিক বা কখনো সামাজিক (group) সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বশক্তিকে অতিমাত্র বাড়িয়ে তুলে আতিশয্য দান করা হয়ে থাকে। যেমন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়ে রাষ্ট্রশক্তিই সর্বে সর্বা হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি মার্ক্সীয় দর্শনেও অর্থনীতির প্রাবল্য আর্থিক পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণশক্তির প্রাবল্য ও বিস্তৃতিকে সূচিত করছে।

শুধু এই নয়। জড় পৃথিবীর রূপকে মানুষ ভেঙ্গে গড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লে যাচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কগুলো; এইরূপেই রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো "উৎপাদনশক্তির" থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। অর্থনীতির "ক্ল্যাসিকাল" পণ্ডিতেরা একরকমের "জড়বাদ" প্রচার করেছেন। এ হলো অর্থনৈতিক জড়বাদ। এদের মতে সামাজিক ও ঐতিহাসিক শক্তিবিন্যাসের দ্বারা নয়—

পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সম্পর্ক দ্বারাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মতে সমাজের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রকাশগুলোকে কতকগুলো অনড়, ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিধিমাত্র বলে গণ্য করা হয়েছে এবং এই বিধিগুলো মানুষের আশা আকাঙ্খা ও আদর্শের কোন ধার ধারে না। এই 'ক্ল্যাসিক্যাল' অর্থনীতির বিরুদ্ধে মার্ক্স উপস্থিত করেছেন এক "বাস্তববাদ"। মার্ক্সের এই মতবাদ হেগেলের "চৈতন্যবাদের" প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্মলাভ করেছে। হেগেলের প্রতিবাদে মার্ক্স দেখিয়েছেন যে জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক দ্বারা, মানুষের অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা; এই অর্থনৈতিক শক্তিই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থার ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যদিয়ে রূপায়িত হয়ে ওঠে। সুতরাং, মার্ক্স জড়বাদীও নন, দৈববাদীও নন, কারণ "উৎপাদন-শক্তিগুলো"ও জড় নয়, আর যে মতবাদ ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে রাষ্ট্রীয়, মনস্তাত্ত্বিক ও কানুনী-ব্যবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের ফল বলে নির্ণয় করেছে সে মতবাদও "জড়বাদী" নয়।

মার্ক্সীয় মতে, এক সমাজব্যবস্থা পরবর্তী সমাজব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারে কেবলমাত্র শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যদিয়ে; শ্রেণীসংগ্রামই হলো সমাজ-বিকাশের একমাত্র যন্ত্র ও উপায়। শ্রেণীসংঘর্ষ মারফতে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে এ কথাটা অতি স্পষ্ট যে শ্রেণীর রাজনৈতিক সফলতা নির্ভর করে বহু প্রকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরে। একই দেশে রক্তের সম্পর্ক, মাটীর টান, (localism) ধর্ম, বংশ এবং সাংস্কৃতিক বা সামাজিক সাদৃশ্য এমন প্রবল গোষ্ঠি-আনুগত্য (group loyalties) সৃষ্টি করতে পারে যা' শ্রেণীচেতনাকে বিকল করে দিতে পারে। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের ও বিনামূল্যের জমির প্রাচুর্যে, জনসাধারণের মজুরীর উচ্চ হার, জীবনযাপনের স্বচ্ছলতা ইত্যাদি কারণে শ্রেণীসংঘর্ষের বৃদ্ধি নাও হতে পারে। শিক্ষাপ্রচার রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার, মজদুরসঙ্ঘের ও রাজনৈতিক দলের সংগঠন, সমাজে শ্রেণীবিভাগের প্রাতিকূল্য করতে পারে, শ্রেণীসংঘর্ষের তীক্ষ্ণতাকে খর্ব করতে পারে, এমনকি শ্রেণীসংগ্রামকে সমাজবিপ্লবে পরিণত হতে না-ও দিতে পারে। এ সব ব্যাপার অতি জটিল। কোন একটা জাতির জীবনে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো দ্বারাই কেবল এসব ব্যাপার অতি সরল ও সহজভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। ইতিহাসকে কেবল অর্থনৈতিক ঘটনা ও শক্তিই সব কিছু করে না। কতো সামাজিক ও ধার্মিক সংঘর্ষ, কতো রাজপরিবারের অন্তর্কলহ, কতো নগণ্য ঘটনা এবং এমনকি কতো ব্যক্তির জীবনের কতো আকস্মিক অ্যাক্সিডেন্ট, সভ্যতার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে যুগে যুগে তার ইয়ত্তা নেই। মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ভুল হল এই যে, ইতিহাসের ক্রমপরিণতির স্তরগুলো প্রলিটেরিয়েটের ইচ্ছা অনুযায়ী অতিরিক্ত অনড়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্চে বলে কল্পনা করা হয়েছে এবং সমাজ যেন শ্রমিকের শ্রেণী-প্রয়োজন অনুসারেই বিবর্তিত হচ্ছে একটা ছককাটা পথে, এমনি এরা কল্পনা করেছেন।

অর্থনৈতিক শক্তি-সমবায়ের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে মার্ক্সীয় সমাজতাত্ত্বিক অর্থনীতির একটা অতিসরল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেবল তাহাই নয়। তার বিশ্লেষণ অনুসারে

তিনি কল্পনা করেছেন ইতিহাসের এক সার্বলৌকিক ও সার্বকালিক অভিযান ; তাঁর মতে ইতিহা এই অভিযান চলেছে একটি মাত্র পথকে, একটি মাত্র প্রণালীকে অনুসরণ করে এবং এই পথ হ পৃথিবীর সকল ধর্ম, সকল সংস্কৃতি ও সভ্যতার একমাত্র অদ্বিতীয় পথ। কিন্তু তা হয় মার্ক্স ভুল করেছেন। সকল পথই গিয়ে মার্ক্সীয় স্বর্গে শেষ হয় নি, যে স্বর্গ অনিবার্য শ্রেণীসংগ্র অহরহ আলোড়িত হচ্চে। সংস্কৃতি বস্তুটা হলো একটা সমগ্র অখণ্ড বস্তু এবং একটা অন্ত আঙ্গিক সামঞ্জস্য দ্বারা এর সংগঠন ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সংস্কৃতির এই সমগ্রতা সম্ব মার্ক্স অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন যুগেই "অর্থনী তন্ত্র" (economic) ও শ্রেণীসংঘর্ষ সার্বজনীন এবং একছত্র হয়ে ওঠেনি ; কিংবা ইতিহাসের বিবর্ত শ্রেণীসংঘর্ষের ডায়ালেকটিক অনুসারে, একটানা একটি যুক্তিসঙ্গত লজিক্যাল প্রণালীকে অনু করে চলেনি। জীবনটা লজিকের নির্দেশেই চলে, এ হলো হেগেলীয় মতবাদ। মার্ক্স অ এ ক্ষেত্রে এই হেগেলীয় ধারণাকেই অনুগমন করেছেন। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণী-সংগ্রা কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই যুক্তিহীন, গোঁড়া বিশ্বাসের জন্য দায়ী হলো পশ্চিম য়ুরোপীয় পরিবেশের সামাজি ইতিহাস, কারণ এই পরিবেশের থেকেই জন্ম হয়েছে মার্ক্সীয় মতবাদের।

ক্রমশঃ
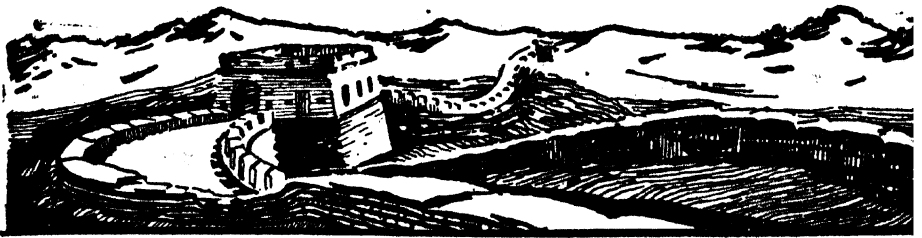
একটি আনি

কাকের

যতদূর স্মরণ হয় আনিটি পাঞ্জাবীর পকেটেই ছিল।

ডান পকেট বাঁ পকেট দু'পকেটই দেখিলাম। বুক পকেট নাই কাজেই প্রশ্ন ওঠে না চায়ের দোকানের ছোকরাটি মুচ্‌কী হাসিয়া বলিল—পয়সা নেই বুঝি ?

উত্তর না দিয়া পকেট দুটি উল্টাইয়া দেখাইলাম।

—কি ? ছোকরার স্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

—মণিব্যাগটা ভুলে এসেছি। মিথ্যা বলিলাম।

ছোকরাটি আমার শরীরের উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইল। মণিব্যাগ জাতীয় কোন পদার্থ যে আমার পকেটে কখনও ছিল একথা সহজে তাহার বিশ্বাস হইতে ছিল না। মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—দেখুন না ট্যাঁকে থাকতে পারে।

আমিও হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম—ট্যাঁকে ত পয়সা রাখি না ভাই। সত্যিই ভুল হয়ে গেছে।

ছোক্‌রার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল—তোমার সঙ্গে বক্‌বক্‌ করবার আমার সময় নাই—যদি ধর্ম্মে সয় ত অন্য সময় পয়সা দু'টো দিয়ে যেও।

পথে পা দিলাম। পিছু ফিরিয়া সাইন বোর্ডটির দিকে তাকইলাম। 'ষ্টুডেণ্টস্‌ ক্যাবিন—মুক্ত-রাজবন্দী কর্ত্তৃক পরিচালিত।' নামটি মনে মনে উচ্চারণ করিলাম।

মুক্ত রাজবন্দীদের কাহারও সহিত আলাপ করিবার বাসনা বহুদিন হইতেই ছিল। 'ষ্টুডেণ্টস্‌ ক্যাবিনের' পরিচালক মুক্ত রাজবন্দীটি সহিত আলাপ করিবার ছুতা একটা পাওয়ায় মনে মনে খুসী হইয়া উঠিলাম। ভাগ্য ভালো ভদ্রলোক এ সময়ে দোকানে নাই থাকিলে কি জানি তিনি কি মনে করিতেন।

সকালে উঠিয়া গরম এক পেয়ালা চা ঠোঁটের উপর তুলিয়া ধরার অভ্যাস পূর্বে ছিল। এখন নিঃসন্দেহে বুঝিতেছি যে তাহা বদ্‌অভ্যাস। নিত্য জোটে না। জোটে না বলিয়াই সময় সময় পুরানো দিনগুলির কথা মনে পড়ে। আজ ষ্টুডেণ্টস্‌ ক্যাবিনে ঢুকিয়াছিলাম—কারণ ছিল বলিয়া। গতকাল পেটে কিছু পড়ে নাই। রাত্রে শুইবার পূর্বেও দেশলাই বাহির করিবার ছুতায় পকেটে হাত দিয়া দেখিয়া লইয়াছিলাম—আনিটি আছে কিনা। সকালে আনিটি কি

উপায়ে খরচ করিব সেই সুখ চিন্তার মধ্যেই কাল ঘুমাইয়াছিলাম। অথচ পেরেকে টাঙ্গ
পাঞ্জাবীটির পকেট হইতে কে যে আনিটি উড়াইয়া লইল তাহা কিছুতেই মাথায় ঢুকিল না।

সকালের কলিকাতার কদর্যতাকে এড়াইয়া যথা সম্ভব সন্তর্পণে চলিতে লাগিলাম। স
চাঞ্চল্য জাগিয়াছে। সকলেই ব্যস্ত। সকলেই কিছু না কিছু করিতেছে। কেহ কিছু না করি
কিছু করিবার ভান করিয়া আছে। চায়ের দোকানে—কাননবালা, 'সাবু' গোল দিয়াছে ক
এস্ মিত্র ঠ্যাং ভাঙ্গিয়াছে কবে এবং প্রধান মন্ত্রীর নবতম পত্নী লাভের গোপন অভিযা
তারিখ কি? মাতিয়া উঠিয়াছে সকলেই। বিস্তীর্ণ পথ, বিস্তীর্ণ ফুটপাত। ফুটপাথের
চায়ের দোকানের পর চায়ের দোকান। শব্দের টুকরাগুলি এক দোকান হইতে অন্য দো
লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে। যুদ্ধ, এ, আর, পি, ব্লাক আউট। হেস্—সত্যিই .হেস্ কি
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মহাত্মা গান্ধীর —Latest Statement—. সুভাষবোস—বার্লিন রেডিও

চলিয়াছি। মনে মনে ভাবিতেছি এই চাঞ্চল্যের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।
গান্ধী, সুভাষ লইয়া আমি মাথা ঘামাইতেছি না কেন? কাননবালা বড় অভিনেত্রী না
চিট্‌নীশ? কে কাননবালা, কে লীলা চিট্‌নীশ!

পথের বাঁকে পানের দোকানটির সম্মুখে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলাম। মনে পড়িল স
হইতে একটিও বিড়ি জোটে নাই। আনিটি খোয়া গিয়াছে—না হলে একপয়সার বিড়ির বরা
কালকের বাজেটেই মঞ্জুর করিয়াছিলাম। দু'পয়সার চা, এক পয়সার বিড়ি আর এক পয়
সাদা ফুল্‌স্কেপ কাগজ।

টিনের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িলাম। আয়নায় নিজের চেহারা ফুটিয়াছে। মনে প
আজ পঞ্চম দিন। দাড়ি গোঁফ পাঁচদিনে মুখটিকে কালো করিয়া দিয়াছে।

—তোমার ঘড়ি ঠিক আছে?

দোকানী মুখ না তুলিয়াই বলিল, হুঁ।

—বিড়ি-টিড়ি চাই কিছু?

দোকানী মুখ তুলিল—স্যাম্পেল আছে!

—না।

—তবে কি মুখ দেখে নেব— স্যাম্পেল নিয়ে এসো আগে।

উঠিয়া পড়িলাম—বিকেলে আসবো তা হ'লে।

দোকানী তাক হইতে একটি বিড়ি ছুড়িয়া দিল। এই রকম মাল চাই। বি
কুড়াইয়া লইয়া নারকেল দড়িতে ধরাইলাম—দু'চার টান টানিয়া নিঃশব্দে নামিয়া পড়ি
পথে।

—অন্ধকে দয়া করুন বাবা, আপনারা হলেন গরীবের মা বাপ, আপনারা না দেখলে কোথায় যাবো বাবা।

কিশোর ছেলেটি চোখ পিট পিট করিতে করিতে গা ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ছল! চাতুরী! কিন্তু আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। আমি আরোও বড়দরের প্রবঞ্চক। দোকানী সন্দেহ করিবার অবকাশও পাইল না।

অন্যায় করিয়াছি! না। প্রয়োজনের তাগিদে প্রবঞ্চক হইয়াছি। ছেলেটিরও প্রয়োজন আছে সেজন্য অন্ধের ভান করিয়াছে। যুক্তি দিয়া প্রয়োজনের দর্শন খাড়া করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

পকেটে হাত দিয়া দেখি পেনসিলটি আছে। প্রয়োজন কিছু কাগজের। মনে মনে গল্পটি তৈয়ারী আছে। গল্পটি লিখিয়া ফেলিলে কিছু টাকা পাওয়া যাইবে। উষার সম্পাদকের গল্পের বিশেষ প্রয়োজন। আমার প্রয়োজন কিছু টাকার। মেসের দেনা বাড়িয়া চলিয়াছে। মেসের মালিকেরও টাকার প্রয়োজন। টাকা অভাবে তাঁহার কুমারী কন্যার বিবাহ আটকাইয়া আছে। মেয়েটির বয়স হইয়াছে তাহার প্রয়োজন একটি স্বামীর। কিন্তু আমার উপস্থিত প্রয়োজন কয়েক সীট্ সাদা কাগজের।

সুশীলের কথা মনে পড়িল—আর্টিষ্ট সুশীল। এই অঞ্চলেই তাহার ষ্টুডিও।

বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। সহরের কর্ম্মব্যস্ততা বাড়িয়া চলিয়াছে। রেডিওতে রেকর্ড বাজিতেছে। ফুটপাথ জুড়িয়া ভীড়। 'চল্ চলরে নওযোয়ান'—এক দোকানের পর অন্য দোকান। কর্ম্মব্যস্ত লোকগুলি মুহূর্ত্তের জন্য কাজ ভুলিয়া গিয়াছে। লীলা চিট্নীশ তাহাদের মনে ভর করিয়াছে। 'রোক্না তেরি কাম নহি চলনা তেরি শাম্।'

সুশীলের ষ্টুডিওয় ঢুকিয়া পড়িলাম। সুশীল ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকে। তাহার ষ্টুডিওতে ঢুকিলে হাঁপাইয়া উঠি। দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো বড় বড় ছবি। আদর্শহীন, উদ্দেশ্যহীন, সৌন্দর্যহীন ভারতীয় ছবি। সুশীল তুলি রাখিয়া বলিল—আয় বোস্। তার পর কি মনে করে?

বসিলাম না। সরাসরি উদ্দেশ্য বলিলাম। সুশীল দেরাজ হইতে কয়েক সীট কাগজ বাহির করিয়া দিল।

—চল্লি?

—হাঁ।

—কবে আসছিস্ আবার? তোকে দিয়ে কিছু কাজ ছিল।

—কি?

—আমার গোটাকতক ছবির একটু ভালো ক'রে একটা সমালোচনা লিখে দিতে হ'বে তোকে।

—আচ্ছা। কত দিবি?

সুশীল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পথে নামিয়া আসিলাম।

আমার সমালোচনা লেখায় সুশীলের প্রয়োজন আছে।

কত দিবি? ইহাতে হাঁসিবার কি আছে?

চলিতে চলিতে পার্ক মিলিল। ঢুকিয়া পড়িলাম। বেঞ্চগুলি খালি। এসময়
বসিবার মত বিলাসিতা হয়ত কাহারও নাই।

লিখিতে লিখিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি বেলা
গড়াইয়াছে। শেষাংশটুকু তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলিলাম।

উষার সম্পাদক মনিবাবু সাদর স্বাগতম্ জানাইলেন। গল্পটি পড়িয়া বলি[illegible]
হয়েছে। আমি হাত পাতিলাম। মণিবাবুর মুখে ছায়া পড়িল।

—একেবারে ব্যাগ খালি—আজ কিছুই নেই। ব্যাগ বাহির করিলেন।

আমি পকেট উল্টাইয়া দেখাইলাম। শেষে বলিলাম সারাদিন খাওয়া হয়নি।

মণিবাবু ব্যাগ হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন—এই নিন্
খেয়ে নিন্। কাল এসে টাকাগুলো নিয়ে যাবেন।

মণিবাবু দয়ালু। আধুলিটি পকেটে ফেলিয়া ফুটপাথে নামিলাম।

ষ্টুডেন্টস্ ক্যাবিনের ঠিকানা মনে ছিল।

খদ্দরধারী যে ভদ্রলোকটি অভ্যর্থনা করিলেন—অনুমানে বুঝিলাম ইনিই
রাজবন্দী।

টেবিলের উপর আধুলিটি রাখিয়া ছোকরাটিকে ডাকিলাম। আধুলিটি টে[illegible]
দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল। নিঃসন্দেহে সার্ভ করিল।

—এখন সাড়ে ছ'য় আনা আর সকালের ছ'পয়সা সাত আনা কেটে নেবেন।
ক্যাশ বাক্সের উপর রাখিলাম। ছোকরাটি আমার পাশেই দাঁড়াইয়া—বাকি এক আ[illegible]
গুঁজিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিব এইরূপ ঠিক করিলাম। টিপ্‌স পাইলে উহার মুখের ভ[illegible]
হইবে অনুমানে সে ছবিও ভাসিয়া উঠিল—তাহ'লে লোকটা জোচ্চর নয়, আনিটি পাইয়া
অনুতপ্ত হইয়া উঠিবে নিশ্চয়ই।

—আধুলিটা বদলে দেবেন!

মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হাতে লইয়া ভাল করিয়া দেখি—আধুলিটি
জাল। ঘামিতে লাগিলাম।

—দেখুন মুস্কিল হ'য়ে গেছে আমার কাছে এখন আর পয়সা নেই, আমি কাল দিয়ে যাবো। অতিকষ্টে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিলাম।

ছোকরাটি ওৎ পাতিয়াছিল। বলিয়া উঠিল—সকালে এই লোকটাই দু'পয়সার চা ঠকিয়ে খেয়ে গেছে।

সামান্য একটু গোলমাল হইল। কলেজের ছোক্‌রা দুই চারজন খাইতেছিল—উঠিয়া আসিল। নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইয়া গেল আমি একজন দাগী আসামী।

মুক্ত রাজবন্দী বলিলেন—পুলিশে দিয়ে কাজ নেই। দু'ঘা দিয়ে ছেড়ে দাও। ঘাড়ে হাত পড়িল। একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

পার্কে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর অধিক রাত্রে চুপি চুপি ঘরে আসিয়া ঢুকিলাম। সঙ্গীরা সকলেই ঘুমাইতেছে। পাঞ্জাবীটি যথারীতি পেরেকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম।

সকালে দেরীতে ঘুম ভাঙ্গিল। দেখি সঙ্গীরা সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছে। হাত বাড়াইয়া পাঞ্জাবীর পকেটটি টিপিয়া টিপিয়া দেখিলাম। আনিটি নাই। স্মরণ হইল গতকাল উহা খোয়া গিয়াছে!
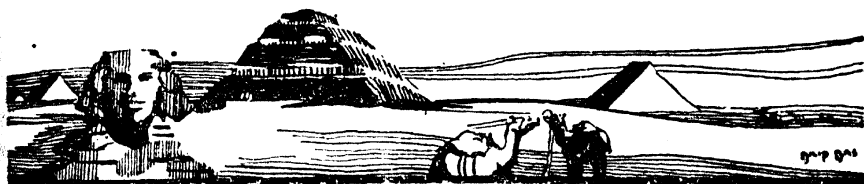
পদাতিক

অজয় ভট্টাচার্য

পৃথিবীর লৌহদ্বারে পদাতিক কালের প্রহরী
হানিয়াছে পদাঘাত; চিনিছ কি এ কোন্ শর্বরী?
তোমাদের ইতিবৃত্ত অসমাপ্ত আজো যদি থাকে,
যদি কোন' উৎসবের পানপাত্র বক্ষে তার রাখে
দ্রাক্ষার নির্যাস-কণা—সুরুকরা শেষহীন গান
শেষ কর' লহমায়; তাই র'বে তোমাদের দান।

আতাম্র আকাশে অই পলাতক জ্যোতিষ্কের দল;
ইস্পাতের বাজ ওড়ে, বায়ু নয়, আবর্তি অনল
অনেক মৃত্যুর জ্বালা; তোমাদের ক্ষুদ্র কান্না-হাসি
অবকাশ কোথা তার? ক্রন্দনের বিশ্রী বন্যা-রাশি
দূর হতে আসে শোন' পঞ্জরের দ্বার ভাঙ্গি' ভাঙ্গি'
এ নয় বসন্ত-পলাশ, ধূলি আজ রক্তে ওঠে রাঙ্গি'।

প্রেম-যক্ষ, কত প্রেম যখের মতন জমা রেখে
হৃদয়ের শুক্তি-মাঝে, রত্ন-বণিকের হাট থেকে
কত লাভ কত ক্ষতি বার-বার নাও নি কি তুলে?
জোয়ার কখন গেল, লোভাতুর আঁখি নাই ভুলে।
বৈশাখীর ছিন্ন পত্র জীবনের খতিয়ান ফেলি'
এ-বন্দর ভোল' আজ ফুরায়েছে সালের পহেলি।

এ মাটির বড় মায়া' মুছে যাবে তাই বুঝি ভয়,
দিগ্বিজয়ী রাত্রি এলো, পদশব্দে কোন্ কথা কয়
শুনিছ কি? দেখিছ কি শাণিত বর্ষার মুখে তার
বিদ্ধ কত সূর্য পৃথ্বী আসিয়াছে চিরদুর্নিবার
ধ্বংসোন্মাদ অভিযাত্রী। তোমাদের তাসের প্রাসাদে
ফাঁকির বেসাতি যদি ফাঁকা হয়, বল' কেবা কাঁদে।

এদিনের বহু আগে প্রাকৃতিক জৈব তৃষ্ণা ল'য়ে
মানুষের শোভাযাত্রা প্রাক্-ঐতিহাসিকতা ব'য়ে
চলিয়াছে ইতিহাস গড়ি' নব কৃষ্টির বৈভবে—
তাদের নিয়েছে মুছি পদস্পর্শে এই রাত্রি কবে!
নগর-মীনারে আজ আমাদের স্বর্ণাভ পতাকা—
অদম্য জিগীষা কত রক্তরাগে নভে নভে আঁকা।

ফেলে যেতে হবে সব। মৃত্যুর নকীব হাঁকে দ্বারে
জীবাশ্মের শুষ্কস্তরে মৃত্তিকার রুদ্ধ অন্ধকারে
আমাদের পরিচয় দুজ্ঞেয় রহস্য রচি' র'বে—
কবেকার মরুপ্রান্তে অভিজাত মমির গৌরবে
স্থিরীকৃত হবো মোরা,—এ রাত্রি চলিবে চিরদিন
অনাগত সেদিনের বর্তমান শূন্যে করি' লীন।

জাতীয়তার বিড়ম্বনা

অনিল চন্দ্র রায়

য়ুরোপে আজ মৃত্যুলীলা চলেছে। সেখানে বোমার বিস্ফোরণ আর কামানের
বেজে উঠেছে আজ মহাকালের অমোঘ আহ্বান। রক্তাক্ত মানবের কাতরোক্তিতে সেখ
রাত্রি হয়েছে জর্জর। বোমারুদের ঠোকাঠুকিতে আকাশ হয়েছে খানখান; জীবনের
সৌন্দর্য, সভ্যতার যতো লালিত্য সব আজ গ্যাসের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। দয়া
মায়া নাই,—সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করে মানুষ আজ মানুষকে মারছে। দশহাজার
প্রগতির প্রচণ্ড পরিণাম হয়েছে এই উন্মত্ত বর্বরতায়। কিন্তু য়ুরোপের চার সীমাতেই এই
আটক থাকবে না; এর দুর্বার টানে ছুটে চলেছে পৃথিবীর সর্বমানব, সকল দেশ, সমস্ত
ভারতবর্ষও আজ এই আবর্তের দুর্ণিবার টানে নিশ্চিত প্রলয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে
তাকে রোধ করবে? আকাশে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়েছে; চক্রবালে ছড়িয়ে পড়েছে আসন্ন
কালো কুটীল জটাজাল। জলতরঙ্গের প্রমত্ত কলরোল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; যুগান্তের প্র
আভাস দেখা দিয়েছে দিকে দিকে। এমন সময়ে ভারতবর্ষ কী করবে? কী করবে এই ব্যা
শোষণ-রিক্ত প্রাচীন মহাদেশ? এখানে পথে পথে নির্বোধ ক্লীবের দল পরস্পর হানাহানি
মরছে। প্রলয়ের মুখে দাঁড়িয়ে এদের অকারণ কলহ ও কাড়াকাড়ির অন্ত নেই। গলিতকুষ্ঠ
করে' দেহকে বিকল করে, দীর্ঘদিনের পরাধীনতা তেমনি করে এদের দেহ-মনকে করেছে বি
এদের অস্থি-মজ্জায় লেগেছে মহামারীর ছোঁয়াচ। তাই এদের শৌর্য নাই, আছে
মস্তিষ্কের সুস্থ মনন নাই, আছে ব্যাধির উত্তাপ আর অস্বাভাবিক বিকার।

সেই বিকারের বশে এরা পরস্পরকে খুন করছে, ছুরি মারছে, আর লাঠি
মাথার ওপরে বজ্র উদ্যত হয়ে রয়েছে, পায়ের নীচে মৃত্যুর গহ্বর হা করে অপেক্ষা করছে
নিদারুণ মুহূর্তে এরা পরস্পরকে মুখ ভেংচিয়ে, ব্যঙ্গ করে, কামড়াকামড়ি করে ল
বাঁধিয়েছে। ইংরেজ প্রভুর চাবুক পিঠে পড়ছে, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই; লাঙ্গুল সংবরণ করে ই
পদলেহন করা, হাজার লোকের দল বেঁধে নিরস্ত্র গৃহস্থের ঘরে আগুন দেওয়া, ভয় দেখি
জোর করে ধর্মান্তর গ্রহণ করানো, অন্ধকারে লুকিয়ে মন্দিরে-মসজিদে নিষিদ্ধ বস্তু
আসা, অসহায় নারীকে হরণ করে বিয়ে করা,—এই হোলো এদের বীরত্বের নমুনা
আত্মঘাতী মূর্খদের কে বাঁচাবে? সমস্ত পৃথিবীতে আজ আগুন লেগেছে, সেই আগুনের
দিকদিগন্তকে বেষ্টন করে এগিয়ে আসছে! এই মর্মান্তিক মুহূর্তে ভারতবর্ষের সহরে

গ্রামে গ্রামে কোঁদল আর শুক্‌নো হাড় নিয়ে কুকুরের কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়েছে। হিন্দুতে হিন্দুতে কলহ, মুসলমানে মুসলমানে কলহ, কংগ্রেসী-কংগ্রেসীতে কলহ, সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমানে কলহ। এই বিকারগ্রস্তদের চেতনা হবে কিসে ?

গত তিন মাস ধরে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা হচ্চে। দাঙ্গায় চলেছে নিষ্ঠুর রক্তারক্তি আর প্রকাশ্য অগ্নিলীলা। সভ্য সংস্কারের বাধা নাই, ভদ্রতার নিষেধ নাই; সামাজিক জীবনের বিধি নাই, সংযম নাই; কেবল আছে যুক্তিহীন বিদ্বেষ আর বুদ্ধিহীন উন্মত্ততা। বুদ্ধিহীন, কারণ এ হোলো "সাম্প্রদায়িক"। হিন্দু মুসলমানকে মারছে, একমাত্র কারণ সে মুসলমান। মুসলমান হিন্দুকে মারছে, মারবার একমাত্র যুক্তি হলো, সে হিন্দু। এখানে সম্প্রদায় হলো জন্মগত। জন্মদ্বারা জাতকের কপালে ছাপ পড়ে যায়, সে হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান। এই ছাপ ললাটে বহন করেই মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত চক্রপথকে পরিক্রম করে। বেশীর ভাগ লোক হলো অচেতন; তারা এই ছাপকে বহন করে বিমূঢ় ও অচেতন মনে। ক্বচিৎ কদাচিৎ এমন লোকও আছেন যাঁরা সচেতন। যাঁরা সজ্ঞানে এই জন্মচিহ্নকে স্বীকার করে চলেন; যারা আপন প্রেরণায় এই ছাপকে বদ্‌লেও নিয়ে থাকেন; যারা জন্ম-পরিচয়কে উল্টে নিয়ে আত্ম-পরিচয়কে জগতের সামনে স্থাপন করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই জন্ম-চিহ্নকে স্বীকার করেই চলেন। আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি, তাই হিন্দু। এরা হিন্দু, কিন্তু হিন্দুত্ব সম্বন্ধে এরা অজ্ঞ। এরা মুসলমান, কিন্তু ইসলামকে এরা জানেন না। জানলেও ধার ধারেন না। জীবনে হিন্দুধর্ম্মের চিহ্নমাত্র ও নেই, কিন্তু আমি হিন্দু। জীবনে মোসলেম ধর্ম্মের লেশমাত্র ও নেই, অথচ আমি মুসলমান। এই মানসিক অবস্থা সর্বত্র। এই কারণেই দেখা যায়, মোসলেম লীগের নেতাদের অনেকেই পুরোদস্তুর 'সাহেব' হয়েও ইসলামের ধ্বজা ধরে নেতৃত্ব করছেন। হিন্দুসভার পাণ্ডাদেরও অনেকেরই মনেপ্রাণে ও জীবন-যাপনে 'বিলিতী' হয়েও হিন্দুধর্ম্মের নেতাগিরি করতে বাঁধছে না।

প্রকৃত ধর্মের সঙ্গে সম্প্রদায়ের যোগ নেই। সম্প্রদায়-গঠনের মূল কথাই হলো অহমিকা; অর্থাৎ 'আমি হিন্দু', 'আমি মুসলমান', এই সংস্কার। এই সংস্কারের জন্ম হয়েছে দীর্ঘদিনের অভ্যাস থেকে। অনেকদিন ধরে শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হিন্দুত্ব ও মুসলমান-ত্ব সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট চেতনা গড়ে ওঠে। নানা আচার ও বিবিধ দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যদিয়ে সেই চেতনা ক্রমে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয় হিন্দু, অথবা হয় মুসলমান অথবা খৃষ্টান। একবার এই সংস্কার শক্ত হয়ে গড়ে উঠলে মানুষকে যন্ত্রের মতন চালিয়ে নেয়। তাই আজ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মনান্তর না থাকলেও মানুষ মানুষকে খুন করতে দ্বিধা করছে না। এখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ নেই, এখানে আছে সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের ঝগড়া। তাই অজানা অচেনা লোককে অবলীলাক্রমে হত্যা করে ফেল্‌তে মানুষ পারে। ব্যক্তিহিসেবে বিবেচনার

প্রয়োজন নেই, চরিত্র সম্বন্ধে ভাবনার দরকার নেই, দোষগুণ বিচারেরও প্রয়োজন নেই
মাত্র শব্দের ইঙ্গিতই পর্য্যাপ্ত। "হিন্দু" এই শব্দটীর দ্বারা মুসলমানের চিত্ত অভিভূত
তেমনি "মুসলমান" এই অক্ষরটীই ক্ষণেকে হিন্দুচিত্তকে মুহ্যমান করে তোলে। এই
চেতনার মূলে ধর্ম্ম নেই, আছে সংস্কার। ধর্ম্ম যদিও বা থেকে থাকে, তাহা নাম মাত্র।
প্রভাবই মানুষকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে থাকে। নামের সঙ্গে যে সংস্কার জড়িত
প্রবণতার খাদ মিশে সংস্কারকে যেনন করে প্রবল, নামকেও তেমনি করে প্রভাববান
শক্তি কম নয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, এই সব নামের অর্থ যাদের কাছে অজ্ঞাত
সব শব্দের যাদুতে বিমূঢ় হয়ে থাকে। এরই নাম মন্ত্রশক্তি। নামের ও শব্দের মো
মানুষ চিরকালই হয়ে এসেছে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির মূলে রয়েছে এই অর্থহীন না
ও যুক্তিহীন সংস্কারের শাসন। এজন্যই একটা মানুষ সম্বন্ধে কিছু না জেনেও তার প্র
পোষণ করা সম্ভব হয়, এবং তাকে খুন করাও অতি সহজ হয়ে ওঠে।

বর্ত্তমান ভারতের রঙ্গমঞ্চে এই সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই হলো প্রধান সাম্প্র
অকস্মাৎ এর আবির্ভাব হয়েছে এবার এবং অপ্রত্যাশিত এর রূপ। কেউ কল্পনাও করে
অকারণে, এমন অসময়ে এর আবির্ভাব ঘটতে পারে। ঢাকায়, আমেদাবাদে, বোম্বাই
কদর্য্য ও অভিনব আকারে হিন্দু মুসলমানের রক্তারক্তি ও দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গেলো,
ভারতবর্ষের দৃষ্টি এই সাম্প্রদায়িক কলহের ওপরেই পড়েছে। দুর্বল যারা তারা ভীত
চিন্তাশীল যারা তারা চিন্তিত হয়েছেন। সর্বোপরি সকলেই হয়েছেন অভিভূত ও
কতক হয়েছেন ক্রুদ্ধ এবং অনেকে হয়েছেন নিরাশ। সবাই মিলে হাহাকার করছেন
সমস্যা যেখানে ছিলো সেখানেই থেকে যাচ্ছে। অথচ সমস্যার সমাধান চাই, একথা সবাই
ভারতবর্ষে ৯ কোটী মুসলমান ও ২৩ কোটী হিন্দু। এদের মধ্যে মনান্তর নতুন নয়।
পরিস্থিতি যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে মনান্তর থেকে দেশান্তর সৃষ্টি হওয়ার উপক্র
হিন্দুদের কিছু অংশ আজ 'হিন্দুসভা' করে ২৩ কোটী হিন্দুর নেতৃত্ব দাবি করেছেন;
মুসলমানদের একাংশ 'মুসলীম লীগ' গঠন করে ৯ কোটী মুসলমানের মুখপাত্রত্ব দাবী
অপরদিকে জাতীয়তার আদর্শ নিয়ে কংগ্রেস দাবি করেছে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব।
তিনটী প্রতিষ্ঠান নয়, এরা হলেন তিনটে আদর্শের প্রতিনিধি। এই তিনটে প্রতিষ্ঠ
আজ ভারতের সমুখে তার দাবি উপস্থিত করেছে। এর ভেতর হিন্দুসভার আদর্শ ও মুসল
আদর্শ, এদের পরস্পরের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। এই সংঘর্ষ হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতার স
ধর্ম্ম ও সভ্যতার সংঘর্ষ নয়। কারণ ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ হয় না; সভ্যতার সঙ্গে
বিবাদ ঘটে না। বিবাদ হয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার ধারক মানুষের সঙ্গে মানুষের, সম্প্রদা
সম্প্রদায়ের। হিন্দুসভা বলছেন, এ ভূমি হলো হিন্দুস্থান; মুসলীম লীগ বলছেন,

পাকিস্তান হবে আলাদা রাজ্য। কাজেই মালিকানা সত্ত্ব নিয়ে হলো ঝগড়া। সভা ও লীগ আজ মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। কেবল মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে তা-ই নয়; পরস্পরকে চোখ রাঙাচ্ছে এবং বিরুদ্ধ প্রচার করছে। প্রচার মানেই হলো শব্দের যাত্ন সৃজন করা। একপক্ষ করছেন "হিন্দু" নামের চারিদিকে মায়ামণ্ডল সৃষ্টি; অপর পক্ষ করছেন 'মোসলেম' নামকে কেন্দ্র করে অফুরন্ত স্তুতিগুঞ্জন। হিন্দুদের ও হচ্চে মনে মনে আত্মমোহের রসায়ন; মুসলমানদেরও চিত্তে জন্মাচ্ছে আত্মবিভ্রমের মাদকতা। সঙ্গে সঙ্গে জোগানো হচ্চে উত্তেজনার তীব্র মসল্লা দুদিক থেকেই। দুপক্ষের প্রচারের ফলে দুদিকেই মানসিক বৃত্তি এমন এক চরম লোকে উত্তীর্ণ হয়েছে যেখানে অতি সহজে বিমূঢ় মনে আগুন লেগে যায়। কাণ্ড-অকাণ্ড জ্ঞান হয় লুপ্ত, অপরিসীম উন্মত্ততায়। আজকে ভারতবর্ষে তাই হয়েছে। কিন্তু একথাটী বুঝতে হবে যে একে হিন্দুসমাজের সঙ্গে মুসলীম সমাজের সংঘর্ষ নয়। এ হলো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ঝগড়া। এমন প্রতিষ্ঠান যাদের সমুখে কোন সুসংহত ও বলিষ্ঠ আদর্শ নেই; যাদের লক্ষ্য সংকীর্ণ এবং কর্মপন্থা অনির্দেশ্য। সর্বহারা জনসাধারণের দাবি এদের পন্থা ও আদর্শে স্থান পায় না। কেবল হিন্দুত্বের ভাবপ্রবণ প্রচার ও ইসলামের মুগ্ধ স্তুতিবাদ দিয়ে এরা গণসাধারণের বুভুক্ষাকে মেটাতে চায়; যা জগতে কেউ পারেনি ও কোনোদিনও পার্বে না। সম্প্রদায়ের স্বার্থের দোহাই দিয়ে উচ্চশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে, ভাবালুতাকে কাজে লাগিয়ে। যে ভাবান্ধতাকে জাগিয়ে তোলা হয় প্রতিষ্ঠানের নামে, তা কেবল প্রতিষ্ঠানের চালকদের স্বার্থে আসে; সম্প্রদায়ের সবাইর স্বার্থে আসে না। অথচ ভাবালুতাটী জাগিয়ে তোলা হয় সম্প্রদায়ের নামেই। "হিন্দুসম্প্রদায়" ও "মুসলীম সম্প্রদায়ের" ধুয়া তুলে মানুষের চিত্তোন্মাদকে দুর্ণিবার করে তোলা হয়। সম্প্রদায় বল্‌তে ধর্ম-সম্প্রদায়ই বোঝান হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা দেখেছি, সম্প্রদায়-চেতনা সত্যি সত্যি ধর্মকে আশ্রয় করে তৈরী হয়না; সে গড়ে ওঠে ধর্মের নামকে কেন্দ্র করে; ভিত্তিহীন শব্দকে আশ্রয় করে।

সাম্প্রদায়িক চেতনা সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেও গড়ে ওঠে থাকে, একথা ঠিক। সংস্কৃতি বল্‌তে বুঝি জীবনের সর্বমুখীন প্রকাশ। মানুষের আচার, বিবাহ, ধর্ম, আহার, বিহার, ভাষা, শিক্ষা, এ সবই সংস্কৃতির অংশ। যখন সংস্কৃতি পৃথক হয় তখন সম্প্রদায়ও পৃথক হতে পারে। তাছাড়া রক্ত বা বংশ নিয়েও সম্প্রদায়ভেদ হতে পারে। সম্প্রদায়ভেদ থেকে তীব্র ও প্রবল ভেদজ্ঞান জন্মাতে পারে। মানুষ জন্মায় একা। কিন্তু জন্মের পরে তার ওপরে পরে সংস্কৃতির ছাপ। ভাষা, আচার ও প্রথার চাপ তার ওপরে যত পড়ে তত তার মনে সম্প্রদায়-চেতনা দানা বেধে ওঠে। কারণ সদৃশ ও সন্নিকট যারা ভাবে-ভাষায় ও আচারে-ব্যবহারে, তাদের প্রতি হয় একটা সাজাত্য বোধ। যাদের সঙ্গে আছে দূরত্ব ও যারা অসদৃশ, তাদের প্রতি স্বভাবতই জন্মে একটা বিজাতি-ভাব। এমনি করে মনোলোকে একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণের ধারা সৃষ্ট হয়। এর পরে উত্তেজক প্রচার যদি ইন্ধন জোগায় তবে আকর্ষণ তীব্র হয়ে জন্ম নেয় মোহ,

এবং বিকর্ষণই পরিণত হয় বিদ্বেষে। এই মোহ এবং বিদ্বেষ আজ এক শ্রেণীর হিন্দু ও মু
মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণী আজ সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের ভাবান্ধতাকে মা
জাগিয়ে তুলেছে; ভাবান্ধ সাম্প্রদায়িকতা আজ তাই ভারতবর্ষে বিষের মতন সকল ক
বিনষ্ট করে ফেলছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা নূতন নয়। সংঘর্ষও নূতন নয়।
দিন একদা ছিলো যখন মানুষের জীবনযাত্রায় ভাবোন্মাদ অন্ধ হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করত।
সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের বিরোধ কম রক্তপাত ঘটায়নি। বংশ বা রক্ত মানুষের মনে
মাদকতা সৃষ্টি করে; মানুষের মনে অদম্য অহমিকা এনে দেয়। আমেরিকায় নিগ্রোদে
নির্যাতন ইতিহাসকে চিরদিন কলঙ্কিত করে রাখবে। মধ্য য়ুরোপে শ্লাভ্ (Slav) ও ম্যা
(Magyar) কলহ, এসিয়ার "পীতাতঙ্ক", আফ্রিকায় "সাদা" ও "কালো"র বিরোধ, এ
সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতারই নানা নমুনা। ইহুদীদের ওপরে যে অসীম অত্যাচার হতো তার
ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে; রাতারাতি ইহুদিপাড়া আক্রমণ করে নির্বিচার ব
অনুষ্ঠান করা হতো; নারী, বৃদ্ধ ও শিশু কেউ বাদ পড়তো না; ইহুদী পোগ্রোম (pog
য়ুরোপীয় খৃষ্টানের চিরন্তন কলঙ্কের নিশান হয়ে থাকবে মানবজাতির ইতিহাসে। তুর্কীস
রাজ্যে সেদিনও এই ধরণের সাম্প্রদায়িক বর্বরতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর্মেনীয়ানদেরও এম
অতর্কিত আক্রমণ করে রাতারাতি খুন করা হতো। ঘুমন্ত পল্লীতে ঢুকে নির্মম হত
করতো তুর্কীরা। পৃথিবীর ইতিহাসে সেদিন পর্যন্ত এই অন্ধ বর্বরতার যুগ অবাধে রাজত্ব ক
প্রোটেষ্টান্টদের ওপর রোমান ক্যাথলিকদের কী অকথ্য অত্যাচার হয়েছে! প্রাচীনকালে খৃষ্ট
ওপরেও বা কী অমানুষিক অত্যাচার না হয়েছে।

কিন্তু আজ সে যুগ বাসি হয়েছে। পৃথিবীর অন্যত্র এই ধরণের সাম্প্রদায়িক ব
দিন গত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের মন ও সমাজ আজ আবর্তি
না। ধর্ম ছিলো মধ্যযুগের সমাজ-পরিচালয়িতা। আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও আচার মানুষের জ
নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু বিজ্ঞানের আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সংগঠন গেল
ব্যবধান কমে গেল; জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে যে দূরত্ব ছিল তা হ্রাস পেয়ে সবাই
সবাইকার সন্নিকটে। পৃথিবীটা হয়ে গেল নিতান্ত ছোট। এর ফল হলো এই যে ম
সংস্কৃতির রাজ্যেও ব্যবধান ও পার্থক্য গেল কমে। য়ুরোপের সঙ্গে এশিয়ার, হিন্দুর সঙ্গে মুসল
খৃষ্টানের সঙ্গে হিন্দুর হলো সান্নিধ্য ও পরিচয়। সেই পরিচয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হলো আদান-
দেশ-কালের আবেষ্টনীতে বাঁধা ছিলো মানুষ ও মানুষের সমাজ; সেই আবেষ্টনী গেলো
বিভিন্ন দেশের ও কালের বন্ধনীতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো নানা সংস্কৃতি; সেই বন্ধনীকে ভে
বিজ্ঞান সর্বকালের ও সর্বদেশের সংস্কৃতিকে নিয়ে এলো সকল মানুষের দুয়ারে। সংস্কৃতিতে সং

হলো সংঘর্ষ, হলো সম্মেলন ; ধর্মের সঙ্গের ধর্মের হলো সংস্পর্শ ; সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হলো বিপ্লব, আবার হলো ভাঙ্গাগড়া, মিশ্রন ও সামঞ্জস্য। যা কিছু ভালো, যা কিছু মহৎ তা' সর্বত্র হলো আদৃত ; যা অশিব, যা অকল্যাণ তা হলো অগ্রাহ্য।

আমাদের দেশেও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিপ্লব হয়ে গেছে। হিন্দুর সংস্কৃতি ও মুসলীম সংস্কৃতি আজ ভেঙ্গেচুরে একই পথে রূপায়িত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞান আজ মানুষকে যে শক্তি দিয়েছে তা পৃথিবীর সর্বমানবের সম্পত্তি হয়েছে। সম্ভোগের যে বিপুল সম্ভাবনা আজ মানুষের কাছে এসেছে, তাকে হিন্দু, মুসলমান সবাই আদর করে বরণ করেছে। আহারে-বিহারে, যানে-বাহনে পোষাকে-পরিচ্ছদে, রুচিতে-প্রবৃত্তিতে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান আজ দৈনন্দিন জীবনে একই পর্যায়ের ও সমশ্রেণীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনে দিনে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি আজ একই ধরণের হয়ে এসেছে। মুসলিমলীগের নেতার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে হিন্দুসভার নেতার জীবনের কোন পার্থক্য নেই ; তাদের সংস্কৃতি সমশ্রেণীর। মধ্যযুগে যে বিচ্ছিন্নতা ছিল যুগবৈশিষ্ট্য, আজ তা' অন্তর্হিত হয়েছে। আলাদা আলাদা ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধনী ভেঙ্গে গেছে ; আজ পরস্পরের সংস্কৃতিকে তুলনা করে, বিচার করে দেখবার প্রয়োজন এসেছে। এই তাকিদ মানুষের গোঁড়ামীকে ও সংকীর্ণতাকে সংস্কৃতিক্ষেত্র থেকে দূর করেছে। যত দিন যাবে হিন্দু ও মুসলমান প্রধানতঃ একই সংস্কৃতির ধারক হবে। কাজেই মধ্যযুগে যে মনোভাব সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল, আজ তা' একান্ত অসম্ভব। আজ সাম্প্রদায়িক আচারকে কেন্দ্র করে জীবন চালানো অসম্ভব।

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যদি সাদৃশ্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা আমাদের দেশে কি করে হলো ? এর দুটো কারণ আছে। প্রথমতঃ, মোসলেম সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান মুসলীম সমাজ হিন্দুদের অনেক পরে গ্রহণ করেছে ; কাজেই মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী মাত্র ইদানীন্তন সৃষ্টি হয়েছে। ফলে চাকুরীর দাবীও বেড়েছে। অদ্যকার হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আর কিছুই নয়, এ হলো সদ্য-জাগ্রত মোসলেম মধ্যবিত্তদের দাবীর সমস্যা। মোসলীম লীগ সেই দাবীকে ভাষা দিয়ে এই মধ্যবিত্তদের নেতৃত্ব কায়েম করতে চাচ্ছেন। কিন্তু যুগপ্রয়োজনের তাকিদ কেবল মধ্যবিত্তকে নিয়েই নিঃশেষ হবে না। আজ গণজাগরণের যুগ পৃথিবীতে আগত হয়েছে। গণজীবনের বাণীই হলো এ যুগের যুগবাণী। নবজাগ্রত গণসাধারণ আজ তাদের বিপুল সংখ্যা ও শক্তি নিয়ে রাজনীতির প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের বাদ দিয়ে কোন মধ্যবিত্তই আজ দাঁড়াতে পারে না। তাই লীগও আজ এই মোসলেম গণসমাজেরও মোড়ল বলে নিজকে জাহির করছে। মোসলীম জনতাকে কথার চাতুর্যে খুশী করতে হবে, তাদের দারিদ্র দূর করে তাদের শ্রেণীপ্রয়োজনকে সার্থক করা এদের পক্ষে অসম্ভব। তাই এদের মনে ইসলাম-ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক মাদকতা সৃষ্টি করে' এদের যন্ত্র করে' স্বার্থসিদ্ধি করবার কৌশল অবলম্বন করতেই হয়। তাই আজ মোসলেম লীগ ধর্ম ও সংস্কৃতির ধূয়া তুলেছেন। অজ্ঞ জনতাকে 'ইসলামের'

শব্দযাদুতে ভুলিয়ে উত্তেজিত করার ঐতিহাসিক প্রয়োজন রয়েছে উচ্চশ্রেণীর মুসলম
আরও প্রয়োজন রয়েছে সদ্য-সচেতন মুসলমান মধ্যবিত্তদের হাতে রাখা, কাজেই তার জন্য
চাকুরী-বাটোয়ারা নিয়ে আন্দোলন তুলে মধ্যবিত্তেরও নেতা সাজা। কিন্তু ধর্মের নামে ভাব
বাষ্পময় কথাবার্তা দিয়ে তো আর ক্ষুধিত জনতার পেট ভরবে না! মধ্যবিত্তকে কিছুদিন
রাখা গেলেও গণশ্রেণীকে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু যতদিন সম্ভব হয় ততদিন লীগ
জনতাকে সাম্প্রদায়িক মত্ততা সৃষ্টি করে আয়ত্বে রাখবে। তারজন্য চাই অহরহ ঝাঁঝালো
নিত্য নূতন উত্তেজনা সৃষ্টি করে রাখা। হিন্দুসভার নেতাদেরও একই কর্ম-কৌশল।
মধ্যবিত্তকে হাতে রাখবার অস্ত্র হলো হিন্দুর চাকুরী অনুপাত নিয়ে আন্দোলন করা, আইন
সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধি দাবী করে মধ্যবিত্তকে আকর্ষণ করা। তাছাড়া হিন্দু জনতাকেও চাই।
জন্য চাই সমাজসংস্কার ও অনুন্নত শ্রেণীকে পংক্তিতে তোলার লোভ দেখিয়ে বাঙময় বক্তৃতাব
গণশ্রেণীর নিষ্ঠুর দারিদ্র দূর করবার জন্য সক্রিয় কর্মপন্থা নিয়ে হিন্দুসভার নেতারা করিত-কর্মা
না। কারণ তারা তা' হতে পারেন না; আসন্ন নির্বাচনের দিকে একচক্ষু রেখে অপর
জনতার দুঃখে অশ্রুধারা নির্গলিত করলেই জনতা কব্জায় এসে যাবে। কিন্তু বর্তমান আর্থিক
বদ্‌লে নতুনতর ব্যবস্থার আশা দেয়া নিরাপদ নয়। তাতে বুভূক্ষু জনতার বুকে জাগ্‌তে পা
সাহস, চোখে জ্বলে উঠতে পারে হিংস্র আগুন। তাই সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের মোহ সৃষ্টি
ধর্মের নামে এদের আবিষ্ট রাখা প্রয়োজন। তাই হিন্দুয়ানীর বাণীকে সহরে সহরে ব
হাওয়ায় ছড়িয়ে দিলেই চল্‌বে—কোটী কোটী নির্যাতিত, বুভূক্ষুদের অর্থনৈতিক দাবিকে ভাব
নীচে চাপা দেওয়া সহজ হবে। মোসলেম লীগের প্রতিরূপ বা antithesis হলো হিন্দ
একটীর প্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গে অপরটীর প্রাবল্য ঘটে থাকে। উভয়ের পারস্পরিক ঘাতপ্র
ও প্রতিদ্বন্দিতার ধাপে ধাপে সাম্প্রদায়িক ভাবোন্মাদ পর্দার পর পর্দা চড়ে গিয়েছে। তা
আজ দাঙ্গাহাঙ্গামার উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি এবং স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দ্বিতীয়
রাজ্যশাসনের যতোগুলি নীতি আছে তার মধ্যে ভেদনীতির কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। সাম্রা
শাসনের প্রধান কৌশলই হলো ভেদসৃষ্টি। একথা আজ পুরোণো হয়ে গেছে। যে
সাম্প্রদায়িক রক্তারক্তি আজ শক্তিশালী ইংরেজ আমলে হচ্চে, তা' প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে
সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এদেশে সৃষ্ট হয়েছে। সিপাহীবি
প্রধান বিদ্রোহী ছিলো 'বেঙ্গল আর্মী' (Bengal Army) এবং বিদ্রোহে সমান ভাগ নি
হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা সবাই। সিপাহীবিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে ঐক্যব
বিদ্রোহ করেছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সময়েও সাম্প্রদায়িক ঐক্য অব্যাহত ছিলো।
এর পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের যুগ। এই বিভেদের মূলে হলো

শাসকদের ভেদনীতি, যে নীতি তারা সিপাহীবিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। বহু ইংরেজের স্বীকৃতিতে এই তথ্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। এমন কি বিদ্রোহকে দমন করাও হয়েছিল ভারতবাসীকে একে অন্যের বিরুদ্ধে লাগিয়ে। Seeley সাহেব স্পষ্টই লিখেছেন "you see, the mutiny was in a great measure put down by turning the races of India against each other." তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসন সম্ভব হয় শুধু এই একটী শর্তে। "So long as this can be done,........the Government of India from England is possible.……" সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত J. A. Hobson ভারতে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে পর্যন্ত লিখেছেন, "It........is generally admitted that our empire in India has only been rendered possible by the wide cleavages of race, language, religion and interests among the Indian populations, first and foremost the division of Mahomedan and Hindu." সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকেই বিধিবদ্ধ ভাবে আরম্ভ হয়েছে এই হিন্দু-মুসলমানে ভেদনীতি। ১৯০৬ সালে স্বদেশী যুগে ঢাকায় মোসলেম লীগের জন্ম হয়; বঙ্গ বিভাগের মূলেও এই ভেদনীতি ছিলো। স্বদেশী যুগে মুসলমান প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন দিয়েছিলেন ইংরেজ, তার মূলেও ছিলো এই নীতি। পরে ১৯০৯ সনের মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কারে পৃথক নির্বাচন-ক্ষেত্র আমদানী করে ভেদের সহায়তা করা হলো। পরে ১৯১৯ সনের এবং ১৯৩৫ সনের দুটী শাসনবিধিতেও সাম্প্রদায়িক নির্বাচননীতি কায়েম করে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক ব্যবধানকেই প্রবল করে তুলেছেন। আজ মোসলেম লীগকে ভারতের মুসলমান সমাজের একমাত্র নেতা বলে স্বীকার করে ব্রিটিশ সরকার সেই নীতিকেই অনুসরণ করছেন। মুসলমান সমাজের বিরাট অংশ রয়েছে যারা মিঃ জিন্নার প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে মানেন না; জামিয়ৎউল্‌উলেমা, মোমিন সম্প্রদায়, মজলিস্-ই-অহরর, শিয়া-সম্প্রদায়, জাতীয়তাবাদী মুসলমানসমাজ ইত্যাদির অন্তর্ভূক্ত অগণিত মুসলমান লীগের নেতৃত্বকে স্বীকার করেন না। কিন্তু তবু গভর্ণমেণ্ট মিঃ জিন্না ও লীগের ওপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে ভারতীয় সমস্যাকে আরো জটীল করে তুলেছেন। সমস্যা যতো জটীল হবে ততই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ নিরাপদ থাকবে। ইংরেজের এই মনোভাবে উৎসাহিত হয়ে লীগ আজ আরো সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। লীগ আজ পাকিস্থান প্রস্তাব এনে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার কল্পনাতে এসে পৌঁচেছেন। ভেদবুদ্ধির চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে এই ভারত-ভাগের প্রস্তাবে। ইংরেজের ভেদনীতির-ও সর্বশেষ সাফল্য দেখা দিয়েছে এই পরিকল্পনায়।

লীগের "দ্বিজাতি" পরিকল্পনা (Two-nation theory) দাঁড়িয়ে আছে চরম সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের ওপর। আমরা আগেই বলেছি এই সাম্প্রদায়িকতা আধুনিক যুগে অচল, কারণ বিজ্ঞানের শক্তি আজ সম্প্রদায়-গত বন্ধনীকে ভেঙ্গে সংস্কৃতিক্ষেত্রে ঐক্য ও সামঞ্জস্যকে প্রবর্তন করেছে।

সম্প্রদায়ের খণ্ডিত সার্থকতার ভিত্তি আজ লুপ্ত হতে চলেছে; সে ভিত্তি হলো পৃথক সংস্কৃতি কাজেই সংস্কৃতির দিক থেকে যেমন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার দিন অতীত হয়েছে, তেমনি রাজনৈতি প্রয়োজনও এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজনকে বিনষ্ট করছে। সামাজিক ক্র বিকাশ অব্যর্থ নিয়মে অগ্রসর হয়েছে আজ সংহতির দিকে, বিচ্ছিন্নতার দিকে নয়। আধুনিক যুগে বৈশিষ্ট্যই হলো সামাজিক সংহতি, social integration. ভৌগলিক দূরত্ব লুপ্ত হয়ে পৃথিবীর তথা ভারতের সকল অংশ আজ একসূত্রে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে, ভারতবর্ষেরও প্রত্যেকটী ব্যক্তি আ পরস্পর-সম্বদ্ধ একটীমাত্র সমগ্রতাকে সৃষ্টি করেছে, রচনা করেছে "an organic complex c mutually dependent relations. It is a society in which that atomisti individualism of our frontier ancestors is impossible" (Frank Hankins American Sociological Review.) বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের তাগিদে আজ ভারতবর্ষকে অংশে অংশে সুসংহত একটী সমগ্র unitএ পরিণত হতে হবে। Seeley থেকে সকল পণ্ডিতেরই ম এই যে, কেন্দ্রীভূত, শক্ত রাষ্ট্র এবং জাতীয়তার অভাবই হয়েছে অতীত পরাধীনতার কারণ ভারতবর্ষের বাঁচবার একমাত্র উপায় হলো শক্ত, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রগঠন। ইহা ব্যতীত "নৈব নৈব চ" বিজ্ঞানের গতিও আজ বৃহত্তর সংহতির দিকে, বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষুদ্রতার দিকে নয়। ভারতের ভিতরে যদি বিভিন্ন রাষ্ট্র সমান অধিকারে অব্যাহত থাকে, তবে এই সব সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রত্যেকের পৃথক বৈদেশিক নীতি, পৃথক বাণিজ্য, পৃথক বৈদেশিক সন্ধি, পৃথক সৈন্যদল থাকতে হবে। ত ফল হবে পরস্পরের হানাহানি এবং সর্বোপরি সামরিক ও বাণিজ্য শক্তির দৌর্বল্য। অতএ বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক, উভয় প্রয়োজনই সাম্প্রদায়িক চেতনার বিলুপ্তি দাবি করে। 'দ্বিজা পরিকল্পনা' সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রয়োজনকে সিদ্ধি করে। এই দিক থেকে লীগ হিন্দুসভা থেকে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল।

কিন্তু এরা উভয়েই রাজনৈতিক আদর্শকে খাটো করে সাম্প্রদায়িক আদর্শকে বড় করেছে কাগজে-কলমে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র কথা থাকলেও কার্যতঃ এরা স্বাধীনতা থেকে সম্প্রদায়ের উন্নতি বড় স্থান দিয়ে থাকেন। স্বাধীনতার জন্য এক বিন্দু স্বার্থত্যাগ ও লাঞ্ছনবরণ হিন্দুসভা লীগ করে নাই। করার সম্ভবনাও নেই। অথচ অদ্যকার রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে ভারতব স্বাধীনতা ছাড়া কোন সম্প্রদায়েরই সত্যিকার কল্যাণ করা সম্ভব নয়। বর্তমান ভারতের প্রাথ প্রয়োজন হলো স্বাধীনতা এবং একমাত্র কর্মপন্থা হলো স্বাধীনতা-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম স লীগ ও সভা নির্বাক ও নিরুৎসাহ। অগণিত হিন্দু, অগণিত মুসলমান, এদের দারিদ্র্য, শি স্বাস্থ্য, ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করতে হলে রাষ্ট্রশক্তি হাতে আনতে হবে। অর্থাৎ স্বাধী চাই। কিন্তু লীগ ও সভা সেদিক দিয়ে যাবেন না। ইংরেজের সঙ্গে বিরোধের বিপদ অ তাই পরস্পরের সঙ্গে লড়াই'এর সহজ পথ এরা নিয়েছেন।' কারণ হিন্দুই হৌক, মোসলে

হোক—জনসাধারণের সত্যিকার মঙ্গলকে এরা গ্রাহ্য করেন না; এরা চান উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীর প্রাধান্যকে কায়েমী রাখা। তাই রাজনৈতিক আন্দোলন, স্বাধীনতা ও জাতীয়তাকে একপাশে সরিয়ে রেখে কৌশলে সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিপদের শ্লোগান উঠিয়েছেন। এদের নীতিও নরম-পন্থী, আত্মশক্তিতে লড়াই করবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা এদের নেই; এরা চান ব্রিটিশ সরকারের সভায় দরবার করে কাজ হাসিল করা। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বাইরে এরা কোন বিপ্লবী পরিকল্পনাকে ধারণায় আনতে পারে না। বাগাড়ম্বরের অন্তরালে এরা দুদলই হলেন প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপ্লব-বিরোধী। কিন্তু এই দুদলের বিরোধিতার ওপরেই ব্রিটিশ প্রভুত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে। কাজেই সাম্প্রদায়িকতা হলো উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ এবং ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সৃজন।

সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি ও কারণ আলোচনা করা গেছে, কিন্তু সমাধান কি এ সমস্যার? নয় কোটী মুসলমানকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সমাজের পরিকল্পনা যেমন অবাস্তব, তেমনি অবাস্তব হলো নয় কোটী মুসলমানকে পৃথক করে দিয়ে তাদের আলাদা রাষ্ট্রগঠনের কল্পনা। সমগ্র-ভারতীয় একটী শক্তিশালী রাষ্ট্রের আদর্শই হলো ভারতের আধুনিক যুগ-আদর্শ। কাজেই মুসলমানের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আস্‌তেই হবে, তাদের সঙ্গে একই পীঠভূমিতে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুগসংগ্রামের ভিত্তিস্থাপন করতে হবে। ভারতের সম্মুখে যে বিরাট সমস্যা সে হলো কোটী কোটী জনগণের অন্নবস্ত্রের সমস্যা। এই গণসমাজ বাস করে গ্রামে—ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে শতকরা ৯০ জন লোকের বাস। সাধারণ সহর মাত্র আছে ৩৯টী সমগ্র ভারতে, যে সব সহরের প্রত্যেকটীতে মাত্র এক লক্ষ করে লোকের বাস। মোট মধ্যবিত্তের সংখ্যা হলো ১॥০ কোটী মাত্র; আর ধনী জমিদারের সংখ্যা ১০ লক্ষ মাত্র। এই মুষ্টিমেয় ধনী ও মধ্যবিত্তদের বাইরে প্রায় ১৫ কোটী চাষী ও অন্যান্য গণশ্রেণী রয়েছে। সভা ও লীগ কয়েক লক্ষ ধনীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন কিন্তু এই ১৫ কোটী গণশ্রেণীর অন্নবস্ত্রের সমাধান করতে হলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে দূর করে নতুন আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পত্তন করতে হবে। বর্তমান যুগের জীবন সংগ্রামে আর্থিক ও কৃষি-বাণিজ্যসংক্রান্ত সমস্যাই তীক্ষ্ণতম সমস্যা। ধর্মাচারের মত্ততাকে কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত রাখা যেতে পারে সাময়িকভাবে। সম্প্রদায়ের ভিতরেই যখন আর্থিক পরিস্থিতির চাপে সংকট দেখা দেবে, তখন সম্প্রদায়ের ভেতরেই ফাটল ধরবে। হিন্দু জমিদার ও ধনিকের পক্ষে হিন্দু-চাষীমজুরের দাবি মেটান সম্ভব হবে না; তেমনি মুসলমান ধনীর ওপরে দাবি আস্‌বে মুসলমান চাষীর ও গরীবের। ১৫ কোটী গণশ্রেণীর আসল স্বার্থ হলো বেঁচে থাকবার স্বার্থ, এবং এই ১৫ কোটীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুইই আছে। এই বিরাট গণসাধারণকে ভুলিয়ে কিছুদিন রাখা যেতে পারে কিন্তু প্রবল বুভুক্ষার দাবী সব ধর্মোন্মাদনাকে ভেঙ্গেচুরে একদিন পথ করবেই। সে পথ হলো ভারতে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার পথ, ভারতের হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রামের পথ। সেই পথকে

নির্মাণ করবার সাধনা আজ থেকেই করতে হবে। এ সাধনা করবে সেই সব রাষ্ট্রনৈতিক কর্মী যারা গণসমাজের মুক্তি চায়, যে মুক্তি হিন্দু ও মুসলমান উভয়সমাজের। আজ সাম্প্রদায়িক প্রচারের, এবং তারই সৃষ্টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার, ফলে ভারতে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও সাধনা চাপা পড়েছে। কিন্তু এ নিতান্ত সাময়িক। অনিবার্য সামাজিক শক্তি-সঙ্ঘাতের প্রবল বন্যায় এই সাময়িক চিত্তোন্মাদ ভেসে যাবে। কিন্তু সেই শক্তি-সঙ্ঘাতকে সহায়তা করবার দায়িত্ব হলো যারা বিপ্লবী তাদের। তাই বিপ্লবীদের আজ শক্ত হতে হবে, সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে যে গণস্বাধীনতার স্বপ্ন তারা দেখছেন সেই স্বপ্নের বাস্তব সার্থকতার জন্য তাদের সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে। ভারতবর্ষকে বিভাগ করবার মারাত্মক পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে হবে, গণসমাজকে বিভক্ত করবার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে বিকল করতে হবে। তার জন্য এক মাত্র উপায় হলো গণসমাজের সঙ্গে যোগস্থাপন করে তাদের সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট সম্বন্ধে সচেতন করা। যারা জাতীয়তার আদর্শকে সম্মুখে রেখে আজ চল্লিশ বছর ধরে অবর্ণনীয় ত্যাগস্বীকার করেছেন এবং অকথিত লাঞ্ছনাকে বরণ করেছেন, ফাঁসীকাষ্ঠ, বন্দুকের গুলি, জেল ভোগ,—কোন অত্যাচারই যাদের দমাতে পারেনি, সেই সব বিপ্লবীদের আজ অবহিত হতে হবে যাতে সাম্প্রদায়িক ভাবোচ্ছ্বাসের মরীচিকা সৃষ্টি করে প্রতিক্রিয়াশীল দল ও শ্রেণীগুলি ভারতের গণসমাজকে বিপথগামী ও স্বাধীনতাসংগ্রামকে বিফল না করতে পারে। আজ আন্তর্জাতিক আকাশে ঝড় উঠেছে। সেই ঝড় আমাদের এদেশেও এলো বলে। ভারতের জাতীয় জীবনের এই সংকট-মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকে সম্মুখে রেখে সংহত না হতে পারলে চির-রাত্রির অন্ধকার ভারতবর্ষকে গ্রাস করবে। স্বাধীনতা, সাম্য, সংগ্রাম ও সংহতি—এই হোক আজ সঙ্কট ও সন্ধিমুহূর্তের অক্লান্ত তপস্যা।

. . .

ঐতিহাসিক

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী নয়, কাহিনীর ভূমিকা মাত্র।

সন্ধ্যার দিকে বলাইএর দোকানে একটি আড্ডা বসে। দোকানটি মুদিখানা। গ্রামের চলতি আবহাওয়ায় যারা মুখ তুলে সমালোচনা করতে পারে না, বা যুবকদের কোন থিয়েটার ক্লাবে গিয়ে অসংযত আমোদ প্রমোদে গা' ভাসাবার মত জীবনের সঞ্চয় যাদের নিঃশেষিত, একমাত্র তারাই এখানকার নিয়মিত সভ্য।

খদ্দের নেই, কেউ এসেও পৌঁছায়নি এখনো। বাধ্য হয়ে বলাই বসে বসে ঠোঙা বানাচ্ছিল। নিজের প্রয়োজনে লাগলেও ঠোঙ্গা ও বিক্রি করে। দোকানটা মুদিখানা হলেও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সবই এখানে পাওয়া যায়—চুলের ফিতে হতে সুরু করে মায় টোট্‌কা কবিরাজী ওষুধ পর্যন্ত। তিন পুরুষের দোকান, চলে ভাল—তবু গাঁয়ের মধ্যে এখনো একখানা দোতালাও তুলতে পারেনি। কারণ, বলাই লোকটা ধর্মভীরু। জ্ঞান হওয়া থেকে ব্যবসায়ে ঢুকে নিজের গতানুগতিক পথে পরিক্রমণ করে জীবনের বিয়াল্লিশটি বছর ও অতিক্রম করে এসেছে, কিন্তু আজো ওর হাত কাঁপে কারুর গলায় ছুরি দিতে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ব্যস্তভাবে প্রবেশ করল নীলু খুড়ো আর লক্ষ্মণ দাশ।

মুখ তুলে বলাই বললে, বসো খুড়ো, আমিই পাড়চি। কাটা কাগজ আর আঠার বাটিটা সে একপাশে সরিয়ে রাখল।—হরেকেষ্টর মন্ত্রীকে যা কাবু কাল করেছিলে। আচ্ছা, এসো দেখি আজ আমার সঙ্গে—

সে উঠে দাবার ছক পাড়বার উদ্যোগ করল। কিন্তু নীলু খুড়ো বাধা দিলে।

—আরে, রেখে দাও তোমার গজ আর মন্ত্রী। বলি, খবর-টবর রাখো কিছু? থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় নিয়েই ত পড়ে আছো। আর এদিকে যে—ধপ্ করে নীলু খুড়ো জলচৌকিটার ওপর বসে পড়ল। চোখ মুখ তার অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে, কপালটাও দপ্‌দপ্ করছে। সে যে বেশ উত্তেজিত তা সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু নীলু খুড়োর গাম্ভীর্য বড় সহজে ঘটে না। নিশ্চয়ই হেতুটা গুরুতর।

বিস্মিত হয়ে বলাই বললে, খবর? কী খবরের কথা তুমি বলচ খুড়ো?

—ছিদাম এসেছিল?—পাশ থেকে লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করলে।

—কই এখনোত এসে পৌঁছোয়নি।

—আর আসবেই বা কী করে? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে নীলু খুড়ো,—এ বয়সে যে আকাশটা ওর মাথায় ভেঙ্গে পড়ল!

নীলু খুড়ো আর কিছু বললে না—লক্ষ্মণও নির্বাক। নির্বোধ হয়ে গেছে বলাই, কিছুই বুঝতে পারছিলো না সে। অর্থহীন চোখে সে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, খুড়ো! একটু থেমে বলাই বললে।

—আর বুঝেই বা কী হবে? যারা বুঝলে, কী করলে তারা? নীলু খুড়ো বললে। লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বলাই বললে, ব্যাপার কী লক্ষ্মণ?

ছিদামের সর্বনাশ হয়েছে?

—সর্বনাশ! কেন, কী হল।

সে কথার উত্তর না দিয়ে নীলুখুড়োর দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মণ প্রশ্ন করলে, কিন্তু এ অন্যায়ের কী বিচার হবে না খুড়ো?

বিষন্নকণ্ঠে জবাব দিলে নীলু, রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে বিচার কে করবে লক্ষ্মণ? তুমি, আমি?···টিকে ধরাতে যাদের জামিন জোটে না!

—কিন্তু, একটু উত্তেজিত স্বরে লক্ষ্মণ বললে, কিন্তু, এত বছর ধরে যে জমিতে ও চাষ করে এল, যে বাস্তুভিটেয় সন্ধেপিদীম দিলে, আজ এক হুকুমে তার ওকালতনামা লিখে দিতে হবে? কেন? জমিদার ত তার পাওনা চিরকাল বুঝেই নিয়েছে, ফাঁকিত ছিদাম কোথাও দেয়নি।

—ফাঁকি না দিলেও ফাঁক পড়ে লক্ষ্মণ, বিশেষ করে, রাজা-প্রজার সম্পর্ক যেখানে।

—তবু এর কি প্রতিকার হবে না, খুড়ো? ভগবান কী নেই?—

—ভগবান কেন থাকবেন না, লক্ষ্মণ! নীলু হাসল, কিন্তু তিনি থাকেন ওপরে গরীবকে দেখেন না। তাঁকে সুধু পূজোই দাও, পেসাদ পাবার আশা রেখো না।

নিলুর কথা ঠিক বুঝতে পারল না লক্ষ্মণ। সে আবার বললে,

—ধরো, আদালতে যদি 'পেতিশন্' করা হয়?

—ফল হবে, এখন যে পঞ্চাশটি ট্যাকা পাচ্ছে সেটাও যাবে মারা। নিজের পাঁঠ যেদিক দে ইচ্ছে কাটবার অধিকার আছে—এই কথাটাই জমিদার আদালতে বলবে।

এতক্ষণ বাদে বলাই আবার কথা কইল, তোমাদের কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি না। ছিদামের কি হয়েচে খুলেই বল না বাপু।—

ছিদামের হয়েছে অনেক কিছুই।

প্রায় আঠারো বিঘা ধানজমি সে ও তার গত দশপুরুষ চাষ করে আসছে। অর্থাৎ জমিদারের নিকট পাওয়া ওই জমিখণ্ডকে কেন্দ্র করেই তার কোন এক পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীন্দর হাজরার এই গ্রামে পত্তনীস্থাপনের ইতিহাস রচিত হয়েছিল। তারপর পুরুষানুক্রমে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। এত শুধু. জমি নয়, মা বসুমতী,—তার লক্ষ্মী।—বৎসরান্তে সোনার ফসলে তার ক্ষুধায় অন্ন দেয়, পরিধানে দেয় বস্ত্র। পিতাপিতামহের পুণ্যপদক্ষেপে এর প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। পূর্ণ শরতে এর কচি কচি শীষের দিকে তাকিয়ে শৈশবে কত স্বপ্নই না দেখেছে ছিদাম, যৌবনে এর উর্বর বুকে লাঙলের সুতীক্ষ্ণ ফলা চালাতে চালাতে কত স্বপ্নের নীড়ই না গড়েছে মনে মনে, আর আজ জীবনের শেষ সীমায় এসে একে আশ্রয় করেই বেঁচে আছে। এর সর্বাংগে জড়িয়ে আছে প্রিয়জনের প্রিয় পরশ।…

কিন্তু জমিদারের নতুন আদেশ এসেছে যে তিনি এবার থেকে পূব-পশ্চিমের সীমানার হাজার তিনেক জমি একত্র করে বিরাট কার্পাসের চাষ সুরু করবেন। তিনি আধুনিক শিক্ষিত ও তরুণ,—তাই পূর্বাহ্নেই বুঝতে পেরেছেন যে চাউল উৎপাদনের আধিক্য হেতু বাজার মন্দা পড়ার সম্ভাবনা। কাজেই এ সুযোগে কার্পাসের চাষে লাভের আশা বেশী। তাই ছিদামের প্রতি (শুধু ছিদাম নয়, আরো প্রায় শ'দুই কৃষকের প্রতিও) আদেশ হয়েছে এবারকার আমন ধান কাটা হয়ে গেলে ও জমি জমিদারকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। এবং এই সংগে তার বাস্তুভিটাও। এর জন্য সে অবশ্যি জমিদারের কাছ থেকে কিছু টাকাও পাবে, এমন কী ইচ্ছে করলে জমিদারের এই নবগঠিত কার্পাসের চাষে ঠিকে কাজও করতে পারে।

—ঠিকা কাজ !

সংসারের লক্ষ্মীকে পরের হাতে তুলে দিয়ে তারই সেবাইত হয়ে থাকা !

অর্থাৎ নিজ বাসভূমে পরবাসী ! যেখানে নিজের ছিল অবাধ কর্তৃত্ব আজ সেখানে পরের খেয়াল মাফিক যন্ত্রের মত কাজ করা !—এ সে মেনে নেবে কেমন করে ? আর মা বসুন্ধরাই বা সইবেন কেন এমন ব্যভিচার !

বহুবার সে করল জমিদারের বাড়ীতে হাটাহাটি, হাতে পায়ে ধরে করল বহু কাকুতি-মিনতি,—কিন্তু নির্বিকার বিধানদাতা। অবশেষে সে জমিদারের দ্বারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে রইল।

জমিদার বললেন, তোর একারই কী এমন ক্ষতিটা হল শুনি ? চাষই যদি নেহাৎ করতে ইচ্ছে আমার এখানেই না হয় করিস ! আর বোকার মত কেবল ত চাষ করলেই হয় না সব দিক ভেবে চিন্তে এগুতে হয়। বিজ্‌নেস্ মার্কেট ফলো করতে হয়, ডিমাণ্ড-সাপ্লাই এর কোশ্চেন আসে—যাকগে ও সব কথা তুই বুঝবিনে। তবে জমিগুলো এবার থেকে আমি নিজেই চাষ করাবো এবং লার্জস্কেল প্রডাক্‌শন মেথডে—দু'দশ বিঘে করে নয়, একেবারে তিন হাজার বিঘে

এক সংগে। এ ছাড়াও অবিশ্যি আমার আরো প্ল্যান আছে, আছে আরো হাই এ্যামবিশুন এমনি বহু কথাই জমিদার বলেছিলেন যার অনেক কথাই ছিদাম বুঝেনি।

সে বললে, কিন্তু হুজুর, আমার এই বিশ বিঘে আপনাকে দয়া করতেই হবে। নইলে আমি বাঁচবনা, এতোকালের বাস্তু আমার—

—বাপ পিতাম'র বাস্তু তুমিত আর একাই ছাড়চনা হে, ওদিকে নিমাই, অবিনাশ কেষ্টদাশ, গৌরচন্দ্র, বিভূতি, ভোলানাথ সবাইত আছে কিন্তু কেউত তোমার মত এমন ছেনালি করেনি। কারণ লাভ ত এতে প্রজারই। আমার জমি আমি নিলাম, তবু এর জন্য কি খোরপোষ ওরা পাবে। বেকারও থাকবে না, ইচ্ছে করলে ঠিকে কাজও—

কান্নায় ভেঙে পড়ল ছিদাম, আমায় ছেনাল বলবেন না বাবু। ওরা ও কাজ করতে পারে,—ক'পুরুষ ওরা আবাদ করচে? আর মা বসুন্ধরার নেমকহারাম ছেলেরও ত অভাব নেই···

অবশেষে বিরক্ত হয়ে জমিদার বললেন, যাক্‌গে আর ঘ্যান ঘ্যান করিসনি। পাঁচটা টাকা না হয় তুই বেশীই নিস্—যা এবার।

এবার আত্মসম্মানে রীতিমত ঘা লাগল ছিদামের।

অন্তরের উষ্মাকে চেপে যথাসম্ভব কোমল কণ্ঠে সে বললে, টাকা আমি বেশী চাইনে, হুজুর, ও লোভ দেখাবেন না। বরং যদি বলেন ত খাজনা আমি আরো কিছু বাড়িয়ে দিতে রাজি আছি! তবু ও জমিটা—

ছিদাম তার কথা শেষ করবার সুযোগ পায়নি: জমিদারের সবুট পা তখন তার বুকের ওপর এসে পড়েছে।

খুব একটা হৈ চৈ পড়ল। দ্বারোয়ান ও দাসদাসীরা ছুটে এল, উচ্চকিত হয়ে উঠল মোসাহেবের দল। ছোটোলোকের এহেন স্পর্ধায় বিস্মিত জমিদারের কণ্ঠস্বর তখন সপ্তমে চড়েছে।

···ছিদামের জ্ঞান হলে সে দেখল জমিদার বাড়ীর ফটকে পড়ে আছে। সন্ধ্যার আগে নায়েব মশাই এসে তার বাড়ীতে জানিয়ে দিয়ে গেছে যে আগামী পনের দিনের মধ্যে যদি সে ওই জমি ও বাস্তু পরিত্যাগ করে না যায় তাহলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থার ভার জমিদার নিজের হাতেই গ্রহণ করবেন। নায়েব যখন আসে ছিদাম তখন অবিশ্যি বাড়ী ছিল না। এবং তারপর থেকে আর ছিদামের দেখাও পাওয়া যায়নি।

নীলুখুড়োর মুখে এ কাহিনী শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল বলাই। লক্ষ্মণ দাশের মুখেও রা নেই।

—কিন্তু এই অন্তরে অন্তরে গুমরে মরা ছাড়া আর কীইবা করতে পারে ওরা?

ক্রমে আড্ডায় আরো অনেকে এসে জুটল। কিন্তু আসর সেদিন আর জমল না, দাবার ছক তোলাই থাকল। সবারই মুখে ঐ এক কথা।

লক্ষ্মণ দাশ তাঁতী। জাত ব্যবসাই তার বংশানুক্রমিক পেশা। কৃষকের কাছে যেমন তার আবাদী জমি, তাঁতীর কাছেও তেমনি তার তাঁত। জড় হলেও ওরই সাথে একটা সশরীরী স্নেহের সম্বন্ধ ওরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করে। তাই ছিদামের ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী আঘাত লেগেছে লক্ষ্মণের, উত্তেজিতও হয়েছে সেই সব চেয়ে বেশী।

রামকান্তর কথার উত্তরে সে বললে, তুমি এ বুঝ্‌বেনা রামকান্ত যে জাতব্যবসা ছাড়া আর জাতধর্ম্ম ছাড়া একই কথা। জাতব্যবসাই যদি ছাড়লুম তবে আর লোকের কাছে পরিচয় দেবার রইল কী ?

সত্যি রামকান্ত এ সব বোঝে না। পূর্বে সে পোষ্টাপিসের পিওন ছিল, বর্ত্তমানে যৎকিঞ্চিৎ পেন্‌সন্ পায়।

সে বল্‌লে, জাতব্যবসা ছাড়তে কে বলচে লক্ষ্মণ ? জমিদার ত সে কথা বলেননি। তাঁর জমিতেও ত ছিদাম চাষ করতে পারে, তবে মালিকানা আর ছিদামের রইল না।

—যে কাজে মালিকানা নেই সেত স্রেফ চাকরের কাজ, লক্ষ্মণ বললে।

—চাষ করবে ছিদাম আর মাল গুদামজাত করবে জমিদার,—এ তোমার কোন শাস্ত্রে বলে, রামকান্ত ? নীলুখুড়ো প্রশ্ন করল।

—কিন্তু জমি ত জমিদারের।

—মানচি ! লক্ষ্মণ বললে, কিন্তু এতকাল যে খাজনা দিয়ে ছিদাম ও জমি আবাদ করে এল, তার কি কোন দামই নেই ! চাষ না করলে ও জমি ত এ্যাদ্দিন জঙ্গল হয়ে থাকত। ছিদাম যা খাজনা দিয়েচে তাতে ও জমির দাম উঠে গেছে কোন কালে !

—কিন্তু উনিত জমিদার ! রামকান্ত আবার নিজেকে সমর্থন করল।

—উনি কেন, তুমিও হতে পারতে। জমিদার হওয়ার ত আর কোন বাহাদুরী লাগেনা, রামকান্ত, বংশে জন্মালেই হল। কিন্তু হাতে কাজ করে যাদের বাঁচতে হয় তারাই ত মানুষ, দুঃখীর দুঃখ তারাই শুধু বোঝে। লক্ষ্মণ থামল।

নীলুখুড়ো এবার বললে, কাকে কী বুঝোচ্চ, লক্ষ্মণ ? বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কী ?

কথাটায় ঝাঁঝ ছিল ! আহত হয়ে চুপ করল রামকান্ত।

লক্ষণ বললে, ধরো যদি জমিদার হুকুম দেয় যে গাঁয়ের সব তাঁত জমিদারের এক্তালায় চলে যাবে তখন আমার কী কষ্টটা লাগবে, তা তুমি বুঝতে পারো ?

কানাই কর্ম্মকার লক্ষ্মণকে সমর্থন করল।

—ঠিক কথা ! আমার হাপরেও এটা খাটে।

—জীবনে যার প্রতিরোধ করতে গিয়ে সুধু আঘাত খেয়েই ফিরে এসেছিল, আত্মহত্যা করে তার মৃদুতম প্রতিবাদও করে গেল,—এই হয়ত ছিল তার মৃত্যুকালীন সান্ত্বনা। সে যে মা বসুন্ধরার নেমকহারাম সন্তান নয় তারই স্বাক্ষর হয়ত রেখে গেল নিজের আত্মাহুতিতে।

কিন্তু কীইবা মূল্য এই আত্মসর্বস্ব সান্ত্বনার! কী এসে গেল তার মৃত্যুতে! ক্ষণিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও অগ্রগামী দলের মধ্যে তা বিশৃংখলতা ঘটাতে পারেনি, প্রতিরোধ করতে পারেনি তাদের প্রগতি।

কলকাতা থেকে একজন সাহেব এঞ্জিনিয়ার ও কয়েকজন অভিজ্ঞ কর্মী এসেছে। জমিদার নিজেও উপস্থিত। আর আশে পাশের কয়েকটা গ্রাম একেবারে ক্ষেতের ধারে যেন ভেঙে পড়েছে।

যন্ত্রচালিত ট্র্যাক্টরের চলা যখন মাটির বুক বিদীর্ণ করে বিকট শব্দে পরিক্রমা করতে লাগল তখন অভূতপূর্ব উত্তেজনা ও উল্লাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠ্ল জমিদারের বুক, নবতরো আশা ও আকাঙ্খার আবেশে তাঁর শরীরের শিরা-উপশিরা কাঁপতে লাগল থরথর করে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না, সুধু ঘন ঘন পাইপে টান দিতে লাগলেন। সমবেত আবালবৃদ্ধবনিতার দল তখন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে, হঠাৎ-দেখা স্বপ্নের মত এই স্বপ্নাতীত ব্যাপারে তাদের দৃষ্টির প্রসার তখন দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে। হয়ত ওদের মনেও তরংগ জেগেছে। অসম্ভব এতে কিছুই নেইঃ মানুষের স্বপ্নই ত একদিন রূপ পায় বাস্তবে, স্বপ্ন তখন হয় সত্যি। ঢেউএর পর ঢেউ এসেইত পারের সংকীর্ণতা ভেঙে তাকে দিগন্তপ্রসারী করে তোলে। তারপর এই নবীনকে কেন্দ্র করেই চলে নতুন পরিক্রমার মহড়া। এবং এই মোহও একদিন কাটে, সীমা যায় ভেঙে। পুরানো সত্যি মিথ্যে হয়ে যায়, ধ্বসে পড়ে, আর মিলিয়ে যায় নবীন সম্ভাবনার মাঝে। এই হল ইতিহাস, চিরন্তনী এই দ্বন্দ্ব, আর এর মধ্য দিয়েই সম্ভব হয় নূতন সৃষ্টির।

—আর এ হেন মুহূর্তে ছিদামকে মনে রাখা! ছিদামঃ সে যে একেবারে অবান্তর এখানে।

ট্র্যাক্টর চলল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব জমিদারের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

—কেমন লাগচে?

—ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হাসলেন।

—জয়যাত্রা যন্ত্র—দেবতার।

—এ ত সবে জয়যাত্রার সুরু, মিঃ ল্যাঙ।

ক্ষণিক স্তব্ধতা।

—তোমার প্রজারা একে কী ভাবে গ্রহণ করবে, মিঃ চাড্রী?

—প্রজার দিকে তাকিয়ে আমি চলব না, তারাই অনুসরণ করবে আমাকে।

—এই তো কথার মত কথা—অভিনন্দন করলেন মিঃ ল্যাঙ।

—হেসে জমিদার ধন্যবাদ দিলেন।

—তুমি জেনো মিঃ ল্যাঙ্, একটু থেমে জমিদার বলতে লাগলেন, এ শুধু আমার ক্ষণিকের খেয়াল নয়, জীবনের তপস্যা। রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু প্রস্তাবের পর প্রস্তাবই পাশ করতে পারে, কিন্তু পারে না দেশের স্বাধীনতা আনতে। স্বাধীন হতে হলে আগে তার যোগ্য হওয়া চাই। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। এর জন্য দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হয়, স্বাবলম্বী করে তুলতে হয়।

—ঠিক কথা,—মিঃ ল্যাঙ্ তাকে সমর্থন করলেন।

—এই হবে আমার সাধনা যে শিল্পে ও বাণিজ্যে ভারত নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াক, তাহলেই সে পারবে বিশ্বসভায় নিজের আসন বেছে নিতে। এর জন্য প্রয়োজন প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক আবাদী প্রথা পরিহার করে ধনতান্ত্রিক বৃহৎ স্কেলের প্রবর্তন করা।

মিঃ ল্যাঙ্ ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

—তোমার সাধনা জয়যুক্ত হ'ক, মিঃ চাড্ৰী। তোমার প্রোগ্রেসের দিকে আমার লক্ষ্য থাকবে। প্রার্থনা করব যাতে তোমার স্বপ্ন বাস্তবরূপ পায়।

—ধন্যবাদ। জমিদার আবার কৃতজ্ঞতা জানালেন।

—তা হলে তোমাকে সব খুলেই বলি, মিঃ ল্যাঙ। একে পূর্ণরূপ দেয়াই শুধু আমার জীবনের একমাত্র আদর্শ নয়। এ কেবল মহত্তরের ভিত্তিভূমি মাত্র। নিজেই আমি কাঁচামাল উৎপন্ন করব কিন্তু একে আমি বাজারে ছাড়তে চাইনে। তুমি হয়তো আমাকে বুঝেছো। অন্তত বছর তিনেকের মধ্যেই তুমি দেখবে যে আজ যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এইখানে হ্যাঁ, ঠিক এইখান থেকে আমার কারখানার সেই বিশাল চিমনী সোজা আকাশের দিকে উঠেচে, যন্ত্রের আবির্ভাবে এ জায়গার রূপ গেছে বদলে। ক্ষেতকে আরো দেব পিছিয়ে, এখানে ওখানে মাটির ভিৎ কাঁপবে বয়লারের গর্জনে, ফারনেসের লেলিহ শিখা শ্রমিকদের প্রাণে জাগাবে অপূর্ব উন্মাদনা, দেবে অগ্রগামীর কর্মপ্রেরণা। অসংখ্য তাঁতের চলমানতার মধ্যে প্রাণ পাবে আমার জীবনের স্বপ্ন। মানুষ হবে যন্ত্র, আর যন্ত্রই হবে মানুষ—চরম লক্ষ্য হবে সৃষ্টি। সৃষ্টি···সৃষ্টি··· সৃষ্টি···। সুধু সৃষ্টিই হবে আমাদের নেশা, মদ মানুষকে মাতাল করে আর আমরা মাতাল হব সৃষ্টির নেশায়।

শেষের দিকে জমিদারের গলার স্বর একটু মাত্রা ছাড়িয়েছিল, মিঃ ল্যাঙ তাঁর হাত চেপে ধরলেন।

—বড়ো উত্তেজিত হয়ে পড়চ, মিঃ চাড্ৰী

জমিদার লজ্জিত হাসি হাসলেন।

(ক্রমশঃ)

"মৃত্যুবিজয়ী প্রবল প্রাণের সাড়া"

কমলরাণী মিত্র

পাহাড়ের গলে বহ্নি-মালিকা দোলে,
নব-বসন্ত আসে ;
তাপসী-ধরার গেরুয়া বুকেরও তলে
ঝড় ওঠে নিশ্বাসে।

শাল-পিয়ালের রুক্ষ-বনানীভূমে
মর্মরধ্বনি শুনি
বুঝিনু কামনা-শায়ক ভরিয়া তূণে
আসিয়াছে ফাল্গুনী !

আমারো মনের নিভৃত গহনে দেশে
ওঠে আগুনের ঝড়—
মনে মনে রচি কুসুমিত বধূবেশে
সাধের স্বয়ম্বর।

কৃষ্ণচূড়ার রক্তে রাঙানো রঙে
ব্যাকুল বাসনা জাগে।
প্রাণবন্যার ঢেউ খেলে তনুমনে
যৌবন অনুরাগে,

বিগত-কালের মৃত্যু-বিছানো-পথে
মহাসমারোহে আজ
নব-জীবনের বিজয়োদ্ধত-রথে
এলো চির-যুবরাজ !!

এতো শুধু নয় গিরিবনভূমিমাঝে
বসন্ত সমাগম,
এ'তো শুধু নয় লীলায় ললিত লাজে
প্রণয়ের গুঞ্জন ;

মৃত্যু-বিজয়ী প্রবল প্রাণের সাড়া
মহাকলরবে জাগে,
অগাধআকাশে সে-অবাধ প্রাণ-ধারা
উদ্দাম-গতি মাগে—

—ভুবন-তটের সীমা, অ-সীমার কূলে
ফোটে ফুল, গাহে পাখী ;
অসীম আলোক-তীর্থের উপকূলে
সবা'রে নেয় সে ডাকি !

দৈনন্দিন জীবনে রবীন্দ্রনাথ

মৈত্রেয়ী দেবী

আমাকে কবির সম্বন্ধে আপনারা কিছু লিখতে বলেছেন, এ একটু কঠিন কাজ। ওঁর ঘরোয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটী কথা প্রত্যেকটী ব্যবহারের এমন একটী সমুজ্জ্বল আনন্দময় রূপ আছে যা আমাদের অপটু লেখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কবির আত্ম-প্রকাশ বিচিত্র, তাঁর চিন্তা ও অনুভূতিকে নানা উপায়ে নানা রূপে, আমাদের উপহার দিয়েছেন, গানে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, ছবিতে। সর্বতোমুখী তাঁর প্রতিভা। এমন কি ছোট ছোট চিঠিগুলোও যে কত সুন্দর, কত উৎকৃষ্ট সাহিত্য, সে কথা সাহিত্যরসিক মাত্রেই জানেন। সেই রকমই আরো একটা দিক আছে সে তাঁর কথাবার্তা ও ব্যবহারে। কথাবার্তা অর্থে আমি কিন্তু কোনো সাহিত্যিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনার কথা বলছিনা; অতি সাধারণ প্রত্যেক দিনের কথাবার্তা, যে কথা তিনি একটী বালকের সঙ্গে বা তাঁর ভৃত্য বনমালীর সঙ্গেও বলেন, তেমন কথারও এমন একটা সৌন্দর্য আছে যা অশ্রুতপূর্ব। উনি কখনই নিজেকে কোনো আধ্যাত্মিক আবরণে আবৃত করেন না, অতি সাধারণ সহজভাবেই সকলের সঙ্গে, অতি মূঢ়তম নগণ্যতম লোকের সঙ্গেও যে রকম ব্যবহার হাস্য-পরিহাস্য করেন, অতি সুকুমার তার লালিত্য। তাই বলছিলাম যেমন ছন্দে গানে রচনায় তাঁর প্রতিভার বিকাশ, ঠিক সেইরকমই ওঁর প্রত্যহের জীবনে প্রতিভার আর একটী রূপ হাস্যে-পরিহাস্যে অপূর্ব হয়ে ওঠে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে সেগুলো ত ধরে রাখা যায় না, যারা কাছে থাকেন, যারা উপলক্ষ্য তারাই ভোগ করেন মাত্র। সেই টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলিতে কবিত্বের একটা আশ্চর্য প্রকাশ, কিন্তু সে হারিয়ে গেল। একথা আমার অনেক পর মনে হয়েছে যে আমরা যারা তাঁকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রত্যহ দেখবার সুযোগ পেয়েছি তারা কেউই সেগুলো ধরে রাখবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু একটা কথা এই যে, লেখার মধ্যে মানুষের যে প্রকাশ সে অন্য। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের যে প্রকাশ তার এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যেটা সেই ক্ষণের সঙ্গে জড়িত। খাতায় লিখে রাখতে গেলে সে সুরটী তার থাকে না, জীবন্ত রূপটী নষ্ট হয়ে প্রাণহীন হয়ে পড়ে; তার চেহারা নেহাৎ ডায়েরী গোছের মনে হয়। অন্তত, আমি যতবার লিখতে গিয়েছি আমার তাই মনে হয়েছে। তাছাড়া বিশেষ করে তাঁর মুখের কথা লেখা বড় শক্ত, তার মধ্যে নিজের ভাষা জুড়ে গেলে বড়ই অশোভন ও শ্রুতিকটু হয়ে পড়ে। সেই জন্য মাঝে মাঝে যখন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রভৃতির বিবরণ পড়ি তখন প্রায়ই সেগুলো যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। যারা তাঁর কথা শুনতে অভ্যস্ত সহজেই তারা বুঝতে পারেন কোন কথাটা কোন রকমে কবি বলেন। তা-ছাড়া বড়

বড় তত্ত্ব কথা মনে করে রাখা বা লিখে রাখা বরং সহজ কারণ চিন্তা সেখানে একটা logical process কে অবলম্বন করে একটা ছাঁচে ঢেলে যায়, কিন্তু ছোট ছোট হালকা কথার মধুর আনন্দময় সুরটা ধরে রাখা বড় কঠিন।

মনে আছে প্রথম যেবার কবি মংপু এলেন সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ও কবির সেক্রেটারী। আমরা মংপুর উপরে জঙ্গলের মধ্যে একটা বাংলোতে ছিলাম। সেদিন সারা সকাল ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টি চলেছে। আমরা একটু ভয়ে ভয়েই ছিলাম আসা হয় কিনা। গাড়ীর শব্দ শুনে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি ভাবছি হয়ত কত ক্লান্ত হয়ে আসবেন। গাড়ী থামাতেই বলে উঠলেন আজ পথে এক কাণ্ড। তোমার এই ড্রাইভার ত লাগিয়েছে এক মস্ত গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা। সেই গাড়ীতে ছিল এক সাহেব তার গাড়ীও যত মস্ত সেও তত মস্ত—এই প্রকাণ্ড লম্বা, সে ত তখুনি ওকে ধরে নিয়ে যায়। কত করে বুঝিয়ে ছাড়া পেয়েছি, খুব রক্ষে পাওয়া গিয়েছে এবার, তোমার এখানে আর নৈব নৈব চ। রথীদার মুখের দিকে তাকাই সে মুখ নির্বিকার! একটু ভয় পেয়েছিলাম বৈ কি। ভাগ্যে বেশী কিছু হয় নি। কবি আমার মুখের অবস্থা দেখে বল্লেন 'হয়ে গেল তোমার পরীক্ষা, তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবার জো টি নেই, যা বলব বিশ্বাস করে বসে আছ। যদি সব সময়ই সত্যি বলব তবে কথা বলে সুখ কী? ঠাট্টা করে তার সঙ্গে ফুট নোট দিতে হবে,—এটা ঠাট্টা !!'

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছিল উপরের শোবার ঘরের জানালার কাছে বসলেন। নীচেই গভীর অরণ্য কতগুলো সোয়ালো পাখী চালের মধ্যে বাসা করেছিল কল কল করে তারা ঘরে ফিরছিল, কবি বল্লেন তোমারি জিৎ তুমি জানতে এ জায়গাটা আমার ভালো লাগবে তাই অত জোর করেছিলে। একটা ছোট বাক্সর মধ্যে এক বোঝা কলম থাকত আর থাকত সম্বল আট আনা পয়সা। কিছুদিন আগে একটা মজার দুর্ঘটনা ঘটে যায়। বোলপুর থেকে কলকাতা আসছিলেন সঙ্গীরা ছিলেন অন্য কামরায়। বর্ধমানে একটা লেমনেড খেয়ে পয়সা দেবার সময় মহা বিপদ, ট্রেন তখন ছাড়ো ছাড়ো, বয়টা ওঁর অবস্থা বুঝে চলে গেল। সেই থেকে সঙ্গে কিছু পয়সা থাকে। প্রায়ই উনি সন্দেহ প্রকাশ করতেন যে সেই আট আনার উপর আমার দুর্জয় লোভ আছে। তাই নিয়ে আমাদের খুব হাসাহাসি হত।

লিখতে গেলে কত ছোটখাট কথা মনে পড়ে। পাঁচ মিনিট কথা বল্লে ১৫ মিনিট হাসতাম আমরা। একদিন খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন "দেখ আমার কথায় তোমরা আর হেসো না, এ একটা তোমাদের ভুল হয়ে যাচ্ছে কারণ আমার কথায় কোনো humour থাকা সম্ভব নয়। সেদিন একজন সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন লিরিক বা গীতি কবির কখনই humourএর বোধ থাকে না। আমি একজন গীতি কবি ত বটে আমার কথায় শুধু শুধু যদি হাস তাহলে এত কষ্টের কবি খ্যাতিটি খোয়া যাবে।

একটা মজার গল্প বলি, একবার গ্রীষ্মকালে যখন এখানে উনি ছিলেন—ওঁর দুজন সেক্রেটারী ও আমার এক বান্ধবীও তখন এই বাড়ীতেই থাকতেন। তাকে সকলেই মাসী বলে ডাকত। সে সময় এখানে নানা রকম পোকা মাকড়ের বড় উপদ্রব হয়েছিল বিশেষ করে কালোরংয়ের বড় বড় গুবরে পোকা সন্ধ্যে হলেই উড়ে আসত। মাসী সেগুলোকে একটু বেশী রকমই ভয় করত। একদিন সকাল বেলা কবি তাকে বল্লেন 'মাতৃস্বসা এক সময়ে আমি একটু জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করেছিলাম, আমার মনে হচ্ছে তোমার অদৃষ্টে আজ কিছু বিপদ আছে।' আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করেও কি সে বিপদ তা জানতে পারলুম না। ততদিনে আমাদের উভয়েরই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল আমরা খুব কম কথা বিশ্বাস করতাম। সেই দিন সন্ধ্যেবেলা তখন আমাদের খাবারের সময় হয়ে এসেছে, আমি ওঁকে ওষুধ দিচ্ছি, এমন সময় একটু আর্তনাদ ও জিনিষপত্রর শব্দ শুনে খাবার ঘরে ঢুকে দেখি মাসী একটা চেয়ারের উপর দণ্ডায়মান, খাবার টেবিল লণ্ড ভণ্ড, আমার স্বামী ও কবির সেক্রেটারী দুজন একটা প্রকাণ্ড গুবরে পোকা নিয়ে হৈ হৈ করে খেতে সুরু করেছেন। তখন প্রকাশ হল ওটা চকোলেটের গুবরে পোকা, দার্জিলিং থেকে তৈরি হয়ে এসেছে। তারপর পূর্ব পরামর্শমত ন্যাপকিনাবৃত হয়ে মাসীর প্লেটের উপর অপেক্ষা করছিল। এ ঘরে এসে দেখি একা একা খুব হাসছেন, বল্লেন "মাতৃস্বসা বলেছিলাম আজ একটা বিপদ আছে তোমার"—মাতৃস্বসা প্রশ্ন করলেন আপনিও এই পরামর্শে ছিলেন? কবি বল্লেন, তাইত আমিও এর মধ্যে! এটা কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, যা হোক তোমরা এসোসিয়েটেড্ প্রেসে এ খবরটা দিও না—আমার গুরুত্বটা বড়ই কমে যাবে, বিশেষত, আমাদের এই গুরুর দেশে। আচ্ছা আমি যদি তোমাদের গুরুদেব হয়ে খুব উচ্চাসনে বসে দুটি একটা উপদেশ দিতাম তাহলে কে বঞ্চিত হত তাই ভাবি। যারা নিজেদের একটা মইএর ওপর তোলে কতটা তারা বঞ্চিত হয় জানেনা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি উনি সমস্ত লোকের সঙ্গে কী রকম সহজে মেশেন। যারা মানে, সম্মানে, শিক্ষায় বা সামাজিক স্থানে সব দিক থেকেই ওঁর বহুনীচে তাদের সঙ্গেও ব্যবহারে কোনও দিন এতটুকু তারতম্য দেখিনি। আজকাল শারীরিক অত্যন্ত দুর্বলতা ও অসুস্থতা নিবন্ধন সব সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না কিন্তু যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তাঁরা সকলেই জানেন কোনও অহঙ্কারের গণ্ডি তাঁকে মানুষের সহজ সম্বন্ধ থেকে দূরে রাখে না। কত নানা জাতীয় লোকই না কবির কাছে আসে জগতের র্ষস্থানীয় থেকে নগণ্যতম অর্ধপাগল পর্যন্ত। মনে আছে একবার শান্তিনিকেতনে একটা মজার গল্প করেছিলেন। সে বহুদিন আগের কথা। নিজের ঘরে মাটীতে বসে তিনি লিখছেন হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক সোজা ঘরে ঢুকে একটা বড় চৌকিতে আরাম করে বসল মাটীতে, একটা খবরের কাগজ পড়েছিল তুলে নিয়ে পড়তে লাগল—কবি কী আর করবেন তার এরকম পরম নির্বিকার ভাব দেখে আশ্চর্য হলেও

বেশী কথাবার্তার হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে খুব গম্ভীর ভাবে ঘড়ী দেখে সেই লোকটী কাগজ রেখে দিয়ে বল্লে আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনার সঙ্গ যেমন interesting তেমন entertaining. কবি বল্লেন একটীও কথা না বলে কি করে যে তার আমার সঙ্গ এত entertaining ও interesting বোধ হল তা জানিনা। যা হোক পরমুহূর্তেই ভদ্রলোক বল্লেন arico-nut আছে arico-nut ? কবি জিজ্ঞাসা করলেন সুপুরী ? তা আছে হয়ত, আনিয়ে দিচ্ছি এই রকম দুই-চারটে নিতান্ত বাজে কথার পর অত্যন্ত interesting সঙ্গ ছেড়ে arico-nut কে যেতে হল।

যেদিন এ গল্পটা বল্লেন সেই দিনই সন্ধ্যের সময় আমরা চাতালে বসে আছি—হঠাৎ একজন লম্বামত লোক অন্ধকারে খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। কে তিনি জিজ্ঞাসা করতে জানালেন এখানে কিছুক্ষণ তিনি বসতে চান। কবি বল্লেন ওঁকে বলো কাল সকালে যখন সবাই আসবে তখন এলেই ত ভাল হয়, এখন এই অন্ধকারে—তা ছাড়া একটু বিশ্রাম করছি, কিন্তু ভদ্রলোক বল্লেন সকালে তাঁর সময় হবে না। অগত্যা আমরা চুপ করে রইলুম তিনিও চুপকরে বসে রইলেন—সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোক, একটু অস্বোয়াস্তি লাগছিল। কিছুক্ষণ বাদে লোকটী বল্লেন ওঁকে বলুন একটা অটোগ্রাফ লিখে দিতে, কিন্তু আমার দ্বারা সে কাজ করান তখন সম্ভব ছিল না কারণ শরীর তখন ওঁর খুবই অসুস্থ—এত অকাজ করবার মত ত নয়ই। কাজেই আবার সেই নীরবতা। আমরা দুটি মেয়ে সেখানে [illegible] দুজনেরই মনে হচ্ছিল arico-nut। ভদ্রলোক চলে যেতেই কবি বলে উঠলেন 'এযে সুপুরীর বাড়া হোলো।' আজ মনে পড়ছে গতবছর এমন দিনে ওঁকে কাছে পাবার আশ্চর্য সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। আমাদের এখানে জনসংখ্যা অর্থাৎ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম। জন্মদিন কাছে এলে আমরা ভেবেই পাচ্ছিলাম না কী করে উৎসব করব। অবশেষে অনেক পরামর্শর পর স্থির হল এখানকার পাহাড়ীদের নিমন্ত্রণ করা যাবে। তথাকথিত হোমরা-চোমরাদের নিমন্ত্রণ অনেক হয়ে থাকে কিন্তু এই চাষাভুষো কুলী মজুরদের নিয়ে আনন্দ করবার একটা নতুনত্ব আছে। সেদিন সকাল বেলা একজন বৌদ্ধ নেপালী বৃদ্ধ এসে বল্লে আমি আপনাকে স্তব শোনাব—সকাল বেলা স্নান সেরে বারান্দায় একপাশে বসেছিলেন ধূপ-ধূনো ও মালাচন্দনের মৃদু সুগন্ধের মধ্যে সে তার অস্পষ্ট উচ্চারণে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলে মন্ত্রপাঠ করল। তার সহজ অনাড়ম্বর সেই সভক্তি স্তব পাঠ কবির খুব ভাল লেগেছিল। উনিও ঈশ উপনিষদ থেকে খানিকটা পড়লেন। বিকেলের দিকে প্রায় ৪০০ পাহাড়ী এসেছিল, সকলেরই হাতে কিছু ফুল তিব্বতিরা এনেছিল খর্দা—যা ওরা লামাদের পরায়।

একটা ঠেলা চেয়ারে করে বাগানের পথ দিয়ে কবিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রত্যেকে একটী একটী ফুল বা তোড়া দিয়ে নমস্কার করে সরে যেতে লাগল। সে একটা সুন্দর ছবি, এরা যে এমন করে ফুল উপহার দিতে জানে তা আমি আগে কখনও মনে করিনি। কিছুক্ষণ তিব্বতী

নাচের পর পাহাড়ীদের আহার-পর্ব। আমরা নিজেরাই পরিবেশন করেছিলাম সমস্তক্ষণ। তাদের মাঝখানে কবি বসেছিলেন। সেইদিন জন্মদিন বলে তিনটে কবিতা লিখেছিলেন তারমধ্যে বুদ্ধভক্তের কথা আছে। সে কবিতাগুলো সদ্য প্রকাশিত 'জন্মদিন' নামে কবিতার বইতে থাকবে।

তারপর দিনই সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিদারুণ মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন।

আমি শুনেছিলাম কবির এখানে থাকাকালীন দৈনন্দিন জীবন যাত্রা সম্বন্ধে—আমার কিছু লেখা আপনারা চান কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে সবচেয়ে এই কথাটাই মনে জাগে কতটুকু তাঁকে চিনি বা জানি। যেখানে ওঁর সত্যকার জীবন সেখানে উনি সুন্দর। আমাদের মত মানুষের ধারণার চাইতে বহু বিস্তৃত তার পরিধি। কতদিন সকাল বেলায় দেখেছি রেডিওতে খবর শোনবার পর জগৎব্যাপী দুর্দশার কাহিনীতে, চ্যানার মর্মঘাতী দুঃখে কী দারুণ দুঃখই তিনি অনুভব করেছেন, সে একটা মৌখিক হা-হুতাশ নয় সত্যকার তীব্র অনুভূতি। সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে উনি বড় কিন্তু ছোটকে বাদ দিয়ে নয় ছোটকে গ্রহণ করে।

একদিন আমাদের বেহারাকে একটা বিছে কামড়েছিল ঔষধ দিয়ে দিয়ে যতক্ষণ তার যন্ত্রণা না কমল ততক্ষণ তাঁর বিরাম ছিল না। যখন জগৎব্যাপী আন্দোলনের কথা চিন্তা করতেন তখনও ঘরের কোনের তুচ্ছতম মানুষের প্রতি দেখেছি তাঁর সমান বেদনা। কত গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন কত লিখেছেন অথচ সহজ সরল ভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার হাস্য-পরিহাস একটুও ব্যাহত হয়নি। তাই বলছিলাম কবি মহৎ, অনন্যসাধারণ কিন্তু নিজেকে পৃথক করে নয়। সকলের মধ্যে থেকেই সকলের ঊর্ধ্বে তিনি, সে তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার আর একটী নিদর্শন।

সকাল বেলা যখন চুপ করে চৌকিতে বসে থাকেন ভোর বেলার রোদ এসে গায়ে পড়ে তখন তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন উনি বহু দূরের মানুষ—সকলের মাঝখানে থেকে সকলের অতীত। অথচ কিছুক্ষণ পরেই দেখেছি আমার খুকুর সঙ্গে ছড়া বলছেন আনন্দে। যেখানে কবি গভীরতম মানব তাঁর সেখানকার প্রকাশ তাঁর কাব্যে, গানে, কবিতায় সেই পরম মানবের অলৌকিক অনির্বচনীয় স্পর্শ অনেকেই পেয়েছেন।

কিন্তু তাঁর প্রত্যহের এলোমেলো ক্ষণগুলোরও একটা উজ্জ্বল প্রাণময় রূপ আছে। তাই বলছিলাম যেমন তাঁর ছোট ছোট চিঠিগুলোরও একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে তেমনি তাঁর প্রত্যেকটী কথা প্রত্যেকটী ব্যবহার যে কত সুন্দর কত উপভোগ্য ও মনোরম তা লিখে বা অন্য কোনও উপায়েই বোঝান যায় না। যেমন প্রাণীকে চিরে চিরে খুঁজলে তার প্রাণ পাওয়া যায় না তেমনি মানুষের কথাকে টুকে রেখে খুঁচিয়ে দেখলে তার প্রাণময় রূপটী হারিয়ে যায়।

সুদুর্লভ প্রতিভা তাঁর অক্ষয় রূপ নিয়েছে রচনায়, কিন্তু সর্বতোমুখী প্রতিভার কিছু কিছু হারিয়েও গেল, এক তাঁর মধুর কণ্ঠের গান, অন্য তাঁর প্রাত্যহিক জীবন। এর মূল্যও কম নয়। মাত্র দুচার জন যাঁরা তাঁর নিকটে আসবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁদের আজীবন একটা আনন্দচ্ছবি স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

দার্জিলিং রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে পঠিত—জ, স।

পুত্রী

ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

(এক)

জমিতে সারের অভাব যেমন বর্ষার প্রাচুর্যে মিটে না, তেমনি মাতৃহীনা মৈত্রীর জীবনে কাট্‌ল না তার জননীর অভাব—পিতৃ-স্নেহের অসাধারণ পর্যাপ্তি লাভ করেও। সে অভাবটা যত বড় কিংবা যত মারাত্মকই হোক্, মৈত্রী নিজে যে সেটা কোনদিন তীক্ষ্ণ ভাবে অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছে এমন কারোরই মনে হ'ত না ; কারণ মৈত্রীকে সময় অসময়ে সাফাই গাইতে শোনা যে'ত এই বলে যে সে মায়ের আঁচল-ধরা মেয়ে নয়। এ কথা ছেড়ে দিলেও এটা ঠিক যে মৈত্রীর ছিল মেয়েলিপনার উপর একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা। বেশ-ভূষা মোটামুটি রকমে করলেও সে কখনও উঁচু গোড়ালির জুতা পরত না কিংবা ব্যাগ ঝুলিয়ে বাড়ীর বাইরে বেরোত না। দক্ষিণ কলিকাতায় কোন্ নবোঢ়ার বেবি হবার সম্ভাবনা কিংবা কোন্ অনূঢ়াদের বাড়ীতে কোন্ মফঃস্বলের হাকিম—না হয় হালের বিলাত-ফেরতা যুবক চা-জলযোগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, মৈত্রী এ সব খবরের কোন ধার ধারত না-ই; শুনলে ভুরু কুঁচ্‌কাত। আত্মীয়-পরিচিত-মহলে মৈত্রীর সম্বন্ধে সকলেরই একটা সুস্পষ্ট কিন্তু বিচিত্র ধারণা ছিল। কারো কারো মতে মৈত্রী ছিল নিতান্ত দাম্ভিক, কারো কারো মতে অত্যধিক স্বার্থপর, আবার কারো কারো মতে সে ছিল দিশি-য়ানার মুখোস-পরা কিন্তু আসলে বিদেশী-মনের ছাপ-মারা মেয়ে। এই সব বিচিত্র ধারণাগুলির মধ্যে একটা সাধারণ সত্য নিহিত ছিল এই যে তেইশ বছরের জীবনে মৈত্রী কাউকে আপনার অন্তরের সান্নিধ্যে লাভ ক'রতে পারেনি'। তার কোন বন্ধু ছিল না, আত্মীয় পরিচিতদের মধ্যে সে কাউকে ভা'য়ের কিংবা বোনের স্নেহ দান করেনি' কিংবা বয়ঃজ্যেষ্টদের মধ্যে কারো প্রতি সে ভক্তিমতীও ছিল না। পিতার সান্ধ্য-বৈঠকে একদিন মৈত্রী হে'সে হে'সে বলেছিল যে ভাবের উত্তাপ চাইতে জ্বরের উত্তাপটাও ভাল, কেননা জ্বরে হয় শুধু দেহের স্বাস্থ্যের সাময়িক বিকার কিন্তু ভাবের উত্তাপে হয় তার চাইতে অনেক বেশী অনর্থ।

মৈত্রীর পিতা মৃত্যুঞ্জয় বসু ছিল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। মৃত্যুঞ্জয় যদিও গরীবের সন্তান, তবুও সরকারের দরবারে এ উচ্চপদ পেতে ওর কোন কষ্টই হ'ল না, কারণ য়ুনিভার্সিটীর জাগ্রত মন্দিরে পরীক্ষা-পর্বের দিনে পূজার্থির জনতা ঠেলে' কি করে সর্বপ্রথম মা-সরস্বতীকে অঞ্জলি দিতে হয়, মৃত্যুঞ্জয়ের মেধা সে কৌশলটা'কে, বিশেষ করে আয়ত্ত ক'রেছিল। কিন্তু পঁচিশ বৎসর বয়সে

চাকুরী পেয়ে ও মৃত্যুঞ্জয় বিবাহ করল পয়ত্রিশ বৎসর বয়সে-এক বিধবা মহিলাকে। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যুঞ্জরেয় বিবাহিত জীবনের আয়ু ফুরা'ল—মৈত্রীর জন্মের তু'ঘণ্টা পরেই মৈত্রীর মা হাঁসপাতালে মারা গেলেন। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল—মৃত্যুঞ্জয় পত্নীশোকে মূহ্যমান না হয়ে সদ্যজাত শিশুকে বাড়ী নিয়ে এল এবং তিন মাস ছুটী নিয়ে অহর্নিশ শিশুটীকে লালন-পালন করে তাঁকে বাঁচিয়ে উঠাল। মৃত্যুঞ্জয়ের এমন কোন আত্মীয়া ছিল না যে সে নিজে তাঁর বাড়ীতে এসে মৈত্রীর ভার নেয় এবং মৃত্যুঞ্জয়ের নিজেরও পণ ছিল যে সে মেয়েকে ওর কাছ-ছাড়া কোরবে না। ফলে শিশু-মৈত্রী বেড়ে উঠল পিতার বুকে ও এক নেপালী আয়ার কাছে আফিস খোলার দিনে তুপুর বেলা কাটিয়ে। মৈত্রীর বয়স যখন পাঁচ, তখন সে আয়াটাও গেল মরে। তখন থেকে সুরু হ'ল মৈত্রীর তুপুরবেলাকার ইস্কুলের জীবন। কিন্তু মৈত্রীর মন বাড়তে লাগল ঠিক ইস্কুলের পড়ায় নয়, পিতার প্রাণবান ও ক্লান্তিহীন সঙ্গলাভে। অবশেষে মৈত্রীর বয়স যখন পনর, তখন থেকে তার নাম-মাত্র ইস্কুলের জীবনেরও পাট—মৈত্রীর জীবন-লতার ষোল-আনা রস যোগাতে লাগ্‌ল পিতার বিদ্যা ও বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও আদর্শ, ধ্যান ও ধারণা। এই অপূর্ব জীবন-যাত্রায় মৃত্যুঞ্জয় ও মৈত্রী ঠিক যেন আর পিতা-পুত্রী রইল না—গুরু-শিষ্যা বল্লেও এ সম্বন্ধকে ঠিক বর্ণনা করা যায় না, বন্ধুতা বলে ও সম্বন্ধটাকে যথার্থভাবে যাচাই করা হয় না—তুইজনই যেন কোন আঁধার রাতে নিরুদ্দেশ পথের যাত্রী, মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দীপ-সংখ্যা বেশী, মৈত্রীর হাতে কম, পথ চলতে চলতে যেন পিতা-কন্যা একে অন্যের কাছ হতে দীপ জেলে নিচ্ছে। এমনি করে উত্তীর্ণ হ'ল মৈত্রীর তেইশ বৎসর—তখন প্রায় বছর তিনেক ধ'রে চাকুরী হতে অবসর নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় এসে বাস করচে কলিকাতায় ল্যান্সডাউন রোডের কাছাকাছি একটা ভাড়াটে বাড়ীতে।

কর্মজীবনের সঙ্কীর্ণতার জন্যই হৌক কিংবা সে সময়ে মৈত্রীর বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল বলেই হৌক কিংবা কলিকাতা জীবনের সুপ্রচুর বিস্তৃতির জন্যই হৌক, ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে এসে পিতা-পুত্রীর জীবনে মেলামেশার ক্ষেত্র বেড়ে গেল অনেকখানি। প্রায় সন্ধ্যায় না হ'লে ও অন্ততঃ শনি রবিবারে বোসেদের বাড়ীতে বৈঠক বস্‌ত। এই সব সাপ্তাহান্তিক সান্ধ্য বৈঠকে তুজন লোকের উপস্থিতি ব্যতিক্রম হ'ত অল্পই। তাদের একজন ছিল শ্রীমন্ত মিত্র, অপর কিরীট সেন। শ্রীমন্ত দীর্ঘতনু, গৌরকান্তি, বয়স ত্রিশের কোঠায় পড়েছে, কলিকাতার কোন এক কলেজে অধ্যাপনা করত এবং বছর খানেক পূর্বে বিয়ে করেছে। কিরীট কৃশকায় মধ্যাকৃতি, তার অনুজ্জ্বল দেহকান্তির মধ্যে বিশেষকরে লক্ষ্যের বিষয় শুধু ছিল উজ্জ্বল চোখ তুটো। বি, এ, অবধি পাশ করার পর থেকে গরীব ব্রাহ্ম-পিতার সামান্য যা পুঁজি তা জুতোর দোকান করে এবং ফরাকাবাদি সিল্কের চালানি কাজ নিঃশেষ করে সম্প্রতি ইনসিওরেন্সের এজেন্সী কাজে মন দিয়েছে। কলিকাতার অবসরপুষ্ট জীবনেও মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচিত জুটেছিল বেশীকরে তাঁরাই যারা ছিল বয়সে ওর চাইতে

অনেক তরুণ এবং পদগৌরবে ওর চাইতে নিম্নতর—এই পরিচয় লাভটা একেবারে আকস্মিক নয়, এটা ছিল অনেকটা মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রানুগত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুঞ্জয় কন্যা ও কিরীটের সঙ্গে বসে চা পান ক'চ্ছিল। মৃত্যুঞ্জয় রেকাব হ'তে একখানা নিম্‌কি মুখে পুরে ব'ল্ল "বাঃ আজ যে বেশ নিম্‌কি হয়েছে মিতি মা! তুমি করেছ বুঝি"? মৈত্রী উত্তর দিল "না-ত! রাম ঠাকুরই'ত করেছে"। কিরীট কথায় যোগ দিয়ে ব'ল্ল "তুমি আবার নিম্‌কি ভাজ্‌তে জান না কি মৈত্রী।" মৈত্রী কিরীটের চায়ের পেয়ালাতে চিনি নাড়তে নাড়তে ব'ল্ল "জানি কিছু কিছু কিন্তু আপনি অত বিস্মিত হচ্ছেন কেন"?

কি—বিস্মিত হচ্ছি এই জন্য যে তোমায় ত আমি কখনও রান্নাঘরের দরজায়ও দেখিনি।

মৃ—না হে কিরীট, এটা তোমার ভ্রান্ত ধারণা! মিতি ত কবে থেকেই বল্‌ছে আমাদের শোবার পাশের ঘরে গ্যাসের উনুন বসিয়ে দিতে। বাড়ীওয়ালাকে বলেও ছিলাম আমি দুএকবার কিন্তু ভদ্রলোক শোনে কই আমার কথা।

কিরীট কথা না বলে চোখ দুটো ঈষৎ বড় করে এবং ঈষৎ হে'সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। মৈত্রী সেটা লক্ষ করে ব'ল্ল "আপনি হাসচেন যে?"

কি—দেখ মৈত্রী আমি ভাব্‌ছিলাম যে ঠিক গ্যাসের উনুনের অভাবেই কি তোমার রান্না করা হচ্চে না।

মৈ—আমার যদি আদৌ রান্না ক'ত্তে ইচ্ছা নাও হয়, সেটা কি অত দোষের ব্যাপার হবে।

মৃ—আমরা সবাই চাই বটে কিরীট যে মেয়েরা রান্না-বান্না দেখুক কিন্তু আমরা রান্নার ব্যবস্থা করি কি রকম—না বাড়ীতে যে ঘর সব চাইতে ছোট, অন্ধকার এবং অব্যবহার্য, সেটাকেই করি রান্নাঘর এবং প্রত্যাশা করি সেই-ঝুল মাখা অপরিসর ঘরে, জলে ভিজা মেজের উপর দাঁড়িয়ে মেয়েরা সকালে বিকালে ঘণ্টা দুতিন আগুনের তাতে তাতুক। এ রকম ব্যবস্থা আমার মতে নিছক্ বর্বরতা।

মৈ—সে কথা ছেড়েই দাওনা কেন বাবা! আসল কথা সবাই ভাবে রান্নাটা হবে মেয়েদেরই একচেটে কাজ। আমি বলি তা কেন হবে? এই যে কিরীটবাবু আপনি অত করে আমার রান্নার অভ্যাস আছে কিনা খোঁজ নিচ্ছিলেন কিন্তু বলুন ত আপনার বাড়ীতে আপনার দিদি রাঁধেন কদিন এবং আপনি বা রেঁধেছেন ক'দিন?

মৈত্রীকে ক্ষেপিয়ে দেওয়াই কিরীটের উদ্দেশ্য ছিল, তর্ক করা নয়, কাজেই মৈত্রীর অত সোজাসোজি প্রশ্নে সে বিব্রতই বোধ কর্ল কিন্তু তার কপাল ভাল, উত্তর দেবার দরকার হ'ল না,

মৈ—কিসের আবার, বিচারের মাপে ?

মৃ—তা হয় না মিতি।

শ্রী—জীবনের বহু ভগ্নাংশের জন্য চাই একটা সাধারণ ভাজক—যাকে বলি আদর্শ।

মৈ—বুদ্ধির গুণক-ই এর পক্ষে ঢের।

শ্রী—বুদ্ধির গুণে ভগ্নাংশকে বৃহৎ করে জড়-জগতের সত্যের আবিষ্কার হয় কিন্তু মানুষের জীবনের কোন সত্যই এ'তে যাচাই হয় না, মৈত্রী।

মৈ—থাক্, এ আলোচনায় কোন লাভ হবে না—তা' আপনাকে আগেই বলেছিলাম।

কি—বাস্ তাই ভাল। এবার শোন আমার দিদির অনুরোধটা—দিদি তোমায় আস্‌চে শুক্রবারে সন্ধ্যাবেলা আমাদের ওখানে চা খাবার নিমন্ত্রণ জানাতে বলেছে, তুমি আস্‌বে কি ?

মৈ—এ'তে না যাবার কি আছে বলুন ?

শ্রী—সে কি হে কিরীট, সেদিন যেন তোমার আমাদের ওখানে চা খাবার কথা—এমনতরই কি একটা বাড়ীতে শুনছিলাম বলে মনে হ'চ্ছে।

কি—শুনেচ ঠিকই। আমিত নিজে যাচ্ছিই তোমার স্ত্রীর নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে। দিদিকে বলেওছিলাম সেকথা কিন্তু তা হ'লে কি হবে—সে যে নিমন্ত্রণ করে বসে আছে শৈবাল চাটুয্যে ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটাকে, যে হালে Indian Stores Departmentএ বড় চাকুরী পে'লে। তা' হোক দিদির আমার বিবেচনা আছে, বলেচে আমার থাক্‌তে হবে না, তবে মৈত্রীকে নিমন্ত্রণ করে ওর আসার ব্যবস্থা করতে। আমার গা' এখন হালকা, তবে দেখ্‌ব তোমার ওখান থেকে চা খেয়ে যদি এঁদের দলে ভিড়তে পারি।

মৃ—তোমরা যখন কেউই আস্‌চনা শুক্রবারে, আমি তবে হাঁটতে হাঁটতে ময়দানের দিকেই যাব এবং ফেরবার মুখে না হয় তোমাদের বাড়ী থেকে মিতিকে নিয়ে আস্‌ব।

মৈ—তোমার আমায় আন্‌তে যেতে হবে না। তুমি যাই বল বাবা, তোমার আমায় কিছুক্ষণের জন্যও ছেড়ে থাক্‌তে কষ্ট হয়—এটা ভাল না।

শ্রীমন্ত ও কিরীট মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগল।

অপ্রতিভতার বোধটা কাটিয়ে' সহজভাবে মৃত্যুঞ্জয় বল্‌ল' "দূর মেয়ে কি বল্‌ছিস্ "?

"হ্যাঁ বাবা, ঠিকই আমার এ ধারণা। তোমার মনটা ওরকম ছিল না আগে। আমার যত বয়স হ'চ্ছে, তুমি যেন ততই দুর্বল হয়ে পড়চ "।

মৃত্যুঞ্জয় এবার হেসে উঠে আগন্তুকদের প্রতি তাকিয়ে ব'ল্ল "মিতি কি বল্‌চে শোন তোমরা"।

অপরের কোন মন্তব্য করবার কোন সুবিধা হ'ল না কারণ এমনি সময়ে নীচে মৃত্যুঞ্জয়ের দুজন পেনশনার-বন্ধুর ডাক শোনা গেল। নিস্তারণ মিত্র ও রসময় রায় দুজনের সঙ্গে, বিশেষতঃ প্রথমোক্ত ভদ্রলোকটীর সঙ্গে কিরীট ও শ্রীমন্তের পূর্বেই বারকয়েক সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সেই সব সাক্ষাতের ফলে যুবকেরা তৎক্ষণাৎ বৈঠক ভঙ্গ দেওয়াই সমীচীন মনে করল—গৃহকর্তার নিষেধ সত্ত্বেও। মৈত্রীও এঁদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ঘরে পালাল। পালাল বিশেষ করে এই জন্য যে সে জানত ওর ডাক পড়বেই এবং হিতবাক্য যত কম শোনা যায় তত কম শোনাই ছিল ওর অভিপ্রায়।

(ক্রমশঃ)

পথ চলে

করুণাময় বসু

পথ চলে পথ চলে কোথা তার সীমার সঙ্কেত ?
অদৃষ্ট অদৃশ্য থাক নাহি মানি বন্ধন নিষেধ,
ঘূর্ণমান গ্রহচক্রে পৌরুষের পূর্ণ পরাভব ;
সর্বহারা শূন্যতার মাঝখানে জীবনের অপূর্ব উৎসব।
উদয় দিগন্ত হ'তে চির-অন্ধ অস্ত-গিরি বাঁকে
যে পথ হয়েছে শেষ সেই পথ বুঝি মোরে ডাকে ;
আমার রক্তের মাঝে শুনিতেছি সমুদ্রের গান,
যেন কোন পথ হারা দেবতার দূর হ'তে অদৃশ্য আহ্বান।

পথ চলে, পথ চলে, কে যেন ডাকিছে মোরে,
কোথায় চলেছে পথ রুক্ষ রৌদ্রে, মরুপ্রান্তে, পর্বত শিখরে,
স্বাধীন পার্বত্য জাতি ঘর বাঁধে ঘর ভাঙে যেথা ;
শাসনশৃঙ্খলা নাহি মানে দুর্বিনীত স্বপ্রতিষ্ঠ চেতা,
দুর্ধর্ষ, আপন শক্তিতে বীর্যবান ;
চড়াই উৎরাই পথ সে পথের দিয়েছে সন্ধান।

মানুষের পায়ে চলা পথ
নিঃশব্দ অব্যক্ত মৌনভাষে কাঁদাইছে রাত্রির জগৎ,
মানুষের জন্ম ইতিহাস
একেকটি পাতা খুলি বিস্মৃত কাহিনীচিহ্ন করিছে প্রকাশ ;
ভাষা দেয় মৌন বেদনারে
প্রাণের আলোর আভা নিক্ষেপিয়া অদৃশ্য আঁধারে।

এই পথে মাধবীর ছায়াবীথি তলে
কবে কোন অন্ধকারে গ্রামের বধূরা গেছে চলে
অতীত অস্পষ্ট গুণ্ঠনছায়া মেলি ;
সেদিনের গন্ধ আনে পথ প্রান্তে জেগে-ওঠা এ দিনের সন্ধ্যার চামে

পথ চলে, পথ চলে, এ পথের কোথা হবে শেষ?
ঘরছাড়া পাখীরা যেমন শূন্য পথে খোঁজে কোথা দেশ,
তরঙ্গ তর্জনী নাহি মানি, নাহি মানি সমুদ্রের সীমা,
দুরন্ত পাখার বেগে রাঙাইয়া সন্ধ্যার রক্তিমা।

পথ চলে, পথ চলে নিঃশব্দ গম্ভীর অন্ধকারে
আজ নয় কাল নয় কাল কালান্তরে;
মৃত্যুহীন নৈঃশব্দের পারে
বিদ্যুতের বিদীর্ণ শিখাতে,
অন্ধ অর্ধরাতে।

আজ যেন শুনিতেছি শব্দহীন পথের আহ্বান
অনন্ত আঁধার অরণ্য হ'তে
পর্বত শিখর প্রান্তে চিরস্তব্ধ ছায়ায় আলোতে
মর্মের নিঃশব্দ মন্ত্রে বাসনার পূর্ণ অবসান;
সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর সর্বশেষ গান।

সায়াহ্নের বিষণ্ণ অম্বরে
কার বাণী তারার অক্ষরে
যেন লেখা আছে,
এই পথে আসিবে কি কাছে।
এই পথে রাত্রদিন
মানুষ চলেছে তৃপ্তিহীন,
আজ নয়, কাল নয় যুগ হ'তে যুগান্তর ধরে;
রাজ্য হ'তে বনতলে গৃহ হ'তে গৃহশূন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে।

———o———

কি খাই?

ডাঃ রুদ্রেন্দ্র কুমার পাল

কিছুকাল পূর্বে বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর, লেঃ কর্ণেল এ, সি, চাটার্জি মহাশয়ের সৌজন্যে এবং বাংলার নিউট্রিশন অফিসার বন্ধুবর ডাক্তার শৈলেন চাটার্জির সাহচর্যে বাঙ্গালীর খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকটা নূতন অথচ মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বহুকাল কর্ণেল ম্যাক্‌কের বাংলার জেলের কয়েদীদের খাদ্য বিশ্লেষণ, কর্ণেল ম্যাক্‌-ক্যারিসনের ভারতীয় নানা প্রাদেশিক খাদ্য সম্বন্ধে ইঁদুরের পরিপুষ্টি হিসাবে গবেষণা, এবং অধুনা সুদূর কুনুরের পরিপুষ্টি গবেষণাগারের ডিরেক্টার এক্রয়েডের ভারতীয় নানা স্থানের খাদ্য সম্বন্ধে কাল্পনিক মতবাদই, বাঙ্গালীর খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি ছিল। অবশ্য ৺রায়বাহাদুর চূণীলাল বসু মহাশয়ের বাংলাদেশের অনেকগুলি খাদ্য-বিশ্লেষণ তথ্য, এবং কলিকাতা ও ঢাকায় দু'চারিজন সুযোগ্য বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার ফলে আমরা বাঙ্গালীর খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে ইদানীং কতকগুলি নূতন জ্ঞান লাভ করলেও, বাংলাদেশের নানা স্থানে ঘুরে, জনসাধারণের সংস্পর্শে তাহাদের দৈনন্দিন খাদ্য সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, কোন গবেষণাগারের উচ্চ-আসন হতে, অথবা কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের অভ্যন্তরে বসে সেটুকু জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। আমরা পূর্ণ একমাসকাল কলিকাতা ও সহরতলীগুলিতে, ঢাকা, ময়মনসিং, চাটার্গা, ফরিদপুর, বগুড়া, মালদহ, দার্জিলিং, কার্শিয়াং প্রভৃতি পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের অনেকগুলি স্থানে বাংলাসরকারের অধীনে পরিচালিত পরিপুষ্টি [illegible] কার্য দেখেছি, সহরে ও গ্রামে অনেকগুলি গৃহে স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্বন্ধে নিজেরাই অনুসন্ধান করেছি, তার উপর ছেলে ও মেয়েদের ইস্কুল-কলেজগুলিতে গিয়ে খাদ্যপ্রাণ ও ধাতব খাদ্যের অতি প্রয়োজনীয় অংশগুলির অভাব-ঘটিত স্বাস্থ্যহীনতা ও রোগের পরিমাণ নিজের চোখে দেখে এসেছি এবং অধুনা, প্রবর্তিত ইস্কুল-কর্তৃপক্ষকর্তৃক অনেকগুলি বিদ্যালয়ে টিফিনের সময় স্বল্পব্যয়ে খাদ্য বিতরণ ও তাহার ফলে বালক বালিকাদের সর্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে স্বাস্থ্যোন্নতির লক্ষণ লক্ষ্য করে এসেছি। সত্যই ইহা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা! এই নূতন অভিজ্ঞতার ফলে বাঙ্গালীর খাদ্যের দোষগুণ সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান লাভ হয়েছে, তারই উপর নির্ভর করে আমি বাঙ্গালীর দৈনন্দিন খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করে, কি করে স্বল্পব্যয়ে অভাবগুলি পরিপূরণ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা বলব।

বাংলাদেশের নিউট্রিশন অফিসারের অধীনে খাদ্যতথ্যানুসন্ধানের (Diet survey) ফলে যতটুকু জানা গেছে তাতে বাঙ্গালীর সাধারণ খাদ্যে আমিষজাতীয় অংশের খুব অভাব লক্ষিত হয় না, যদিও বহুকাল পূর্বে ম্যাক্‌-কে এবং কিছুকাল পূর্বে উইলসন্ ও আহমদের মতে বাংলাদেশে আমিষ-জাতীয় খাদ্যের স্বল্পতাই বাঙ্গালীর পরিপুষ্টির মুখ্য অন্তরায় বলে এতদিন মনে করা যেত। 'মাছ-ভাতে বাঙ্গালী' এই প্রবচনটি বাঙ্গালী, ধনী হইতে নির্ধন সকলেই মেনে চলে। যাদের কিনে খাবার মত সংস্থান আছে, তারা তরী-তরকারী, শাকসব্জীর পরিবর্তে মাছকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, এবং যাদের পয়সার অভাব, তারা কেউ অন্য দ্রব্যাদির বিনিময়ে আবার কেউ বা পাড়াগাঁয়ে, নদ, নদী, খাল, বিল, পুকুরের প্রাচুর্য হেতু, নানা উপায়ে যে কোন মতে যৎসামান্য মাছ সংগ্রহের চেষ্টার ত্রুটি করেন না। তার উপর মুগ, মুসরী ছোলা, অড়হর প্রভৃতি ডালেও আমিষ জাতীয় অংশ অপর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, এবং এমন বাঙ্গালীর বাড়ী বোধ হয় একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে দিনে অন্ততঃ একটি বারও ডালের বরাদ্দ নাই। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে ডালের আমিষ সহজপাচ্য নয়, তাহা হলেও যাহারা প্রত্যহ খেতে অভ্যস্ত তাদের পক্ষে এই আমিষ যে একেবারে অকর্মণ্য তা বলা যায় না। তা'ছাড়া সম্প্রতি বাঙ্গালোর ও ঢাকায় গবেষণার ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে চালের আমিষ জাতীয় অংশ শরীর সংগঠনের জন্য গমের আমিষ জাতীয় অংশ হতে গুণানুসারে শ্রেয়ঃ। সুতরাং 'ভেতো' বাঙ্গালীর খাদ্যে আমিষের অভাব, পরিমাণে অথবা গুণানুসারে; একথা খুব জোর গলায় বলা চলে না।

ইহার পর আসে চর্বিজাতীয় খাদ্যাংশের কথা। সরিষার তেলের প্রচলন বাংলার সর্বত্র এবং ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে বাঙ্গালীরা সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে এই তেল খাদ্যের বিশেষ অংশরূপে ব্যবহার করে থাকেন। চর্বিজাতীয় ও শর্করাজাতীয় খাদ্যে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি ও কার্যক্ষমতা-বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। সুতরাং একটির অভাবে, অপরটির প্রাচুর্যের দ্বারা কাজ চলে যায়। যারা পয়সার অভাবে খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তেল খেতে পারে না, ভাতের প্রাচুর্য তাদের এই অভাবটুকু অনায়াসে পূরণ করতে পারে। কিন্তু অন্যদিক্ দিয়ে বাঙ্গালীর খাদ্যে জন্তুর চর্বির যে অত্যন্ত অভাব, তাহা অস্বীকার করবার উপায় নাই। ফলে, অঙ্গাঙ্গী-ভাবে খাদ্যপ্রাণ 'এ'র যে সেই অনুপাতে অভাব ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এর কারণ যে একমাত্র ঘি, মাখন প্রভৃতির দুর্মূল্যতা তা নয় দুষ্প্রাপ্যতাও অনেকাংশে দায়ী।

বাঙ্গালীর খাদ্যে শর্করার পরিমাণ অত্যধিক, এই সম্বন্ধে সকলেই একমত। কিন্তু বাঙ্গালীরা কেন ভাত বেশী পরিমাণে খায় এবং সেই পরিমাণে আটার রুটি খায় না, তাহা অনেকেই ভেবে দেখেন না। ভারতবর্ষের যে সব অঞ্চলে বৎসরে চল্লিশ ইঞ্চির অধিক বারিপাত হয়, সেই সকল প্রদেশে গমের চাষ ভাল হয় না, বরং ধানই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। প্রধানতঃ, এই কারণেই বাংলার ন্যায়, মান্দ্রাজ, আসাম, হিমালয়ের তিরাই অঞ্চল, এবং কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে গমের

পরিবর্তে চালই লোকের মুখ্য খাদ্য। তার উপর চাল সিদ্ধ করিলেই ভাত হয়, সুতরাং তাহার জন্য বেশী পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না; গম সে ভাবে খাওয়া চলে না। গম পিষে আটা প্রস্তুত হয়, সেই আটা মেখে, ডলে, নেচি করে, বেলে হয় রুটি, তাও আবার ভাল ক'রে সেঁকতে হয়; সুতরাং গম হতে আরম্ভ করে সুখাদ্য রুটি পর্যন্ত স্তরগুলি অনেকটা আয়াস-সাধ্য! উপরন্তু এই সকল অঞ্চলে জলীয় হাওয়ার জন্য ঘরে আটা বেশীদিন মজুত রাখাও চলে না, এবং অন্যপ্রদেশ হইতে আমদানি করতে হয় বলে গরীবের পক্ষে আটার দাম চাল থেকে অনেক বেশী পড়ে। এই সকল নানাকারণে বাঙ্গালী সখ করে নয় একরকম দায়ে পড়ে 'ভেতো' অপবাদ নিতে বাধ্য হয়। তার উপর দরিদ্র যারা, খাদ্যে চর্বিজাতীয় পদার্থের অল্পতাবশতঃ উপযুক্ত কার্যক্ষমতা লাভের জন্য কম খরচে খাদ্যে ভাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের জন্য দৈনন্দিন যথোপযুক্ত 'কেলরির' ব্যবস্থা করে নেয়। প্রায়ই দেখা যায় যারা খেটে খায়, তারা আতপচালের পরিবর্তে সিদ্ধচালই বেশী পছন্দ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, যে সিদ্ধচালে নাকি অনেকক্ষণ পর্যন্ত উদরপূর্ণ থাকে এবং পুনরায় খিদে পেতে সময় লাগে। আতপচাল অপেক্ষা সিদ্ধচাল হজম হতে অধিক সময় লাগে কি না, তা পরীক্ষা-সাপেক্ষ; কিন্তু সিদ্ধচালে যে আতপচাল অপেক্ষা আমিষ, ক্যাল্‌সিয়াম্ ও ফস্‌ফরাস্ এবং খাদ্যপ্রাণ 'বি' অনেক বেশী থাকে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যখন ধান সিদ্ধ করা হয় তখন ঐ পদার্থগুলি চালের উপরে লালচে পাতলা আবরণ থাকে তণ্ডুলকণার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; সুতরাং কলে ছাটা হলেও সেগুলি আতপচালে যতটা নষ্ট হয় ততটা নষ্ট হতে পারে না। তবে প্রায়ই দেখা যায়, যে ভাত প্রস্তুত করবার পূর্বে, চাল অসংখ্যবার ধুয়ে পরিস্কার করা হয়, তাহাতে চাল ঢেঁকি ছাঁটা হউক আর কলে ছাঁটাই হউক, ঐ সকল অত্যাবশ্যকীয় পদার্থগুলি জলের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। তারপর যখন ভাত সিদ্ধ হলে উত্তমরূপে ফেন গালিয়া তাহাও ফেলিয়া দেওয়া হয়, তখন ভাতে শুধু শর্করা জাতীয় দ্রব্য ছাড়া আর বিশেষ কিছুই থাকে না। সুতরাং অধিক পরিমাণে ক্রমাগত ভাত খেলে, যকৃৎ ও অন্যান্য পরিপাকযন্ত্রের উপর অত্যধিক চাপের ফলে নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হতে পারে; এইজন্যই খাদ্যে ভাতের পরিমাণ যাতে অত্যধিক না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

খাদ্য তথ্য-অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে আমাদের খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়াম্, ফস্‌ফরাস, আয়রণ প্রভৃতি ধাতব লবণের পরিমাণ প্রয়োজনাপেক্ষা অনেক কম আছে। প্রথমোক্ত দুটির পরিমাণ দুধে বেশী থাকে সুতরাং দুধ অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য। কিন্তু আজকাল নানাকারণে বাংলাদেশে সর্বত্রই দুধের বিশেষ অভাব এবং শতকরা নব্বুইজনের পক্ষে দুধ খাওয়া একটা দুর্মূল্য বিলাসেরই নামান্তর। যে প্রদেশে শতকরা নিরান্নব্বুই জনই চাষী, সেখানে চাষবাস ও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভূমি ও গোধনের উপর। গরুর সাহায্যে আমরা চাষ করি, আবার গরুর দুধও খাই। সুতরাং আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা ও চাষবাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত গরুর খাদ্যের ব্যবস্থারও

একান্ত প্রয়োজন। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি না থাকাতে বাংলাদেশের সর্বত্র গোচারণ ভূমির একান্ত অভাব। তার উপর সমগ্র বাংলাদেশে প্রত্যহ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যের জন্য লক্ষ লক্ষ মণ দুধ হতে অনেক সার পদার্থ ফেলে দিয়ে ছানা প্রস্তুত করি। এই রকম অবস্থায় বাঙ্গালীর খাদ্যে যে দুধের অভাব ঘটবে এবং ফলে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের অভাব হেতু দেহের দীর্ঘতা ও স্বাস্থ্য বংশ পরম্পরানুসারে ক্ষুণ্ণ হতে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

আমাদের খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়ামের যতটা অভাব আপাতদৃষ্টিতে ফস্‌ফরাসের ততটা না হলেও ক্যাল্‌সিয়ামের অভাবে ফস্‌ফরাস কোন কাজ করতে পারে না। মাছে, ভাতে, তরীতরকারীতে ফস্‌ফরাস যাহা আছে পরিমাণে তাহা প্রয়োজন মিটাতে পারে, কিন্তু শস্যজাতীয় পদার্থে অধিক পরিমাণে ফাইটিন্ (phytin) থাকাতে ইহা দেহের কোন কাজেই লাগে না। ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ। যদি খাদ্যে যথোপযুক্ত ক্যাল্‌সিয়াম থাকে তা হলে ফস্‌ফরাস ফাইটিনের প্রভাব হতে মুক্ত হয়, নিষ্ক্রিয় অবস্থা হতে সক্রিয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এইজন্য বাঙ্গালীর খাদ্যে যদিও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ খুব কম নয়, তবু উপযুক্ত পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম এর অভাবে, যেটুকু ফস্‌ফরাস আছে তাহাও কোন কাজে আসে না, সুতরাং গৌণভাবে ফস্‌ফরাসের অভাব জনিত লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায়।

আয়রণের অভাব খাদ্যে হওয়া কিছুতেই উচিত নয়, কেন না অতি অল্পখরচেই লতাপাতা, শাক প্রভৃতি হইতে এই সামগ্রী অনায়াসে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর খাদ্য বিচার করলে দেখা যায় যে অজ্ঞতাবশতঃ অনেকস্থলেই এই সুলভ পদার্থটি, গরুঘোড়ার খাদ্যজাতীয় মনে করে পরিত্যক্ত হয়। খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে আয়রণের অভাবে রক্তশূন্যতা ও পরে দেহের অবসন্নতা দেখা দেয়। খাদ্যে শাক্ লতাপাতার অভাবে অনেক সময় কোষ্ঠবদ্ধতাও জন্মে।

এর পর আসে খাদ্যের অতি প্রয়োজনীয় আর একটি অংশ বিশেষ খাদ্য প্রাণের কথা। খাদ্যপ্রাণ 'এ' ও 'বি' ১ এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'বি' ১ এর অভাব, অবহেলা ও অজ্ঞতার জন্যই হয়ে থাকে। ঢেঁকিছাঁটা চাল, ও ফেন ভাত খাইলে কিছুতেই খাদ্যের এ প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অভাব হতে পারে না। বাঙ্গালীর খাদ্যে ফলমূল একটা অতি অনাবশ্যক দ্রব্যের তালিকাভুক্ত। আর্থিক হিসাবে খুব সচ্ছল যাঁরা, কেবল তারাই সম্বৎসরে নানারকমের ফলমূল আহার করেন। সর্বসাধারণ কেবল মরসুমী ফল ছাড়া যেমন আমের সময় আম, কমলালেবুর সময় কমলালেবু প্রভৃতি কদাচিৎ অন্য ফলের আস্বাদন গ্রহণ করতে পারে। একেত বাংলা দেশে ফলের চাষ খুবই কম, তার উপর বড় বড় সহর ছাড়া অজ্ঞতা ও দুর্মূল্যতাবশতঃ চাহিদাও খুব কম। এইজন্যই ফলের অভাবে খাদ্যপ্রাণ 'এ'র প্রাথমিক ক্যারোটিন নামক পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণ 'বি'র অভাব ঘটে। ওদিকে জান্তব চর্বির অভাবে খাদ্যপ্রাণ 'এ'র অভাবহেতু নানা চক্ষুরোগ, ত্বক্‌রোগ ও পরিপুষ্টির অভাব দেখা দেয়। আবার খাদ্যে ফলের অভাবে খাদ্যপ্রাণ 'সি'র অভাবহেতু, স্কার্ভি,

ও নানা মারাত্মক সংক্রামক রোগ দেখা দেয়। খাদ্যপ্রাণ 'বি' ২র অভাবে যদিও পেলাগ্রা নামক ব্যাধি এইদেশে বিরল, তবু কখনও কখনও ঠোঁটের কোনে ও জিহ্বার উপর পেলাগ্রা জাতীয় ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায়। দুধ, মাংস প্রভৃতির অভাবেই ইহা ঘটে। আমিষের কথা বলতে গিয়ে ইচ্ছাবশতঃই মাংসের উল্লেখ করি নাই, কেন না, বাংলাদেশে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে কেহই পর্বাদি উপলক্ষ ছাড়া মাংস বড় একটা আহার করেন না।

এই ত গেল আমাদের খাদ্যে দোষ-ত্রুটির মোটামুটি একটা আভাষ: এখন অল্প খরচে বাঙ্গালীর খাদ্যকে যাহাতে যথোপযুক্ত ও সুসামঞ্জস করা সম্ভব, দুচারি কথায় তাহারই একটা নির্দেশ নিম্নে দেওয়া গেল।

আহারের তালিকায় ভাতের পরিমাণ যাহাতে দিনে কিছুতেই দেড়পো'র বেশী না হয় তাহাই করা উচিত। ঢেঁকিছাঁটা আতপ চাল অথবা সিদ্ধ চালই সর্বদা খাওয়া আবশ্যক। চাল বেশী না ধুয়ে যাহাতে ফেন সমস্তই ভাতে থাকে তাহাই করতে হবে। সম্ভব হলে দিনে একবার ভাতের সঙ্গে দুচার খানি আটার রুটী অথবা পুরী খেলে ভাল হয়। খাঁটি সরিষার তেল ব্যবহার করা উচিত, অন্যথায় ভেজাল অথবা দূষিত তেলের জন্য শোথ্ প্রভৃতি রোগ দেখা দিতে পারে। প্রত্যহ সম্ভবপর না হলেও মাঝে মাঝে ঘি, মাখন প্রভৃতি কিছু কিছু খাওয়া উচিত। বাঙ্গালীর খাদ্যে ডাল ভাতের সঙ্গে মাছের প্রাধান্যটুকু ঠিক রাখতে হবে। মাংস না হলেও চলে, যদি খাদ্যে দুধ ও ডিম প্রভৃতি তার অভাব পূরণ করতো পারে। মোটকথা প্রাণীদেহজাত আমিষ, খাদ্যের আমিষের পরিমাণের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ হওয়া চাই। সম্ভব হলে সকলেরই অন্যথায় শিশু রোগী ও প্রসূতির পক্ষে দুগ্ধপান অবশ্য কর্তব্য। যদি অর্থাভাবে ইহা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে প্রত্যহ ৫—১০ গ্রেণ ক্যাল্সিয়াম ল্যাক্টেট্, অথবা ডাইক্যালসিয়াম ফস্ফেট্ খাওয়া উচিত; ইহাতে ক্যাল্সিয়াম ও ফস্ফরাসের অভাব কতক পরিমাণে দূর করা যাইতে পারে। প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে লতাপাতা, শাক, সব্জী খাওয়া উচিত, কেননা তাহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা ও রক্তশূন্যতা দূর হয়। বাঙ্গালীর খাদ্যে ফলমূলের অংশ অবশ্যই বাড়াইতে হইবে। যাহাতে ক্যারোটিন, খাদ্যপ্রাণ 'সি' প্রভৃতির অভাব না হইতে পারে। অভাবে সদ্যঅঙ্কুরিত ছোলা, মুগ প্রভৃতি এবং টমেটো, স্যালাড্ প্রভৃতি কাঁচা খাওয়া উচিত। কিন্তু এগুলি তার পূর্বে পটাস্-পারমেঙ্গানেট্ দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। শাক-শব্জী বেশীক্ষণ সিদ্ধ অথবা ভাজা করে খাওয়া উচিত নয় কেন না, তাতে খাদ্যপ্রাণ 'সি' একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। গরম তেল কি ঘিতে দু'তিন মিনিট ভাজা করলে খাদ্যপ্রাণ ততটুকু নষ্ট হয় না, যতটুকু অনেকক্ষণ ধরে ভাজা করলে অথবা সিদ্ধ করলে নষ্ট হয়। খাদ্যপ্রাণ 'বি ২'র প্রয়োজন অল্পাধিক দুধ অথবা মাংসে মিটতে পারে।

এই গেল প্রত্যেকের নিজস্ব কর্তব্য। এই সম্বন্ধে প্রদেশের গবর্ণমেন্টের কর্তব্য ও যথেষ্ট আছে। জন স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্তব্য খাদ্যা-খাদ্য সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞতা দূর করা, চালের কলগুলি

যাহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল পরিষ্কার না করে, এবং ছানা কাটার কলে, দুধের সারাংশ যাহাতে নষ্ট না হয়, প্রয়োজন হ'লে আইন করে ও তার প্রতিরোধ করা। কৃষি-বিভাগের কর্তব্য লোক সংখ্যার অনুপাতে প্রদেশের খাদ্য প্রদেশেই উৎপাদন করা এবং গরুর খাদ্যের ব্যবস্থা করে গোজাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দেশে দুধের পরিমাণ বাড়ান। এই প্রদেশে যাতে ফলের চাষ বৃদ্ধি পায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে কৃষি-বিভাগকে। তার উপর মৎস্যচাষ-বিভাগের উপর চাপ দিয়ে যাতে পুকুর বিল প্রভৃতিতে উপযুক্ত মৎস্যের চাষ হয়। এবং মাছের পেটে যখন ডিম থাকে, তখন যাহাতে যদৃচ্ছা মত তাহাদের বিনাশ করা না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। উপরন্তু হাঁস, মুরগী প্রভৃতির প্রতিপালনে যাহাতে দেশে ডিমের উৎপাদন অধিক পরিমাণে হয় তাহাও করতে হবে। এক কথায় স্বাস্থ্য ও কৃষি-বিভাগকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বর্জন করে, একই উদ্দেশ্যে নিজেদের শক্তি নিয়োগ করতে হবে।

সভ্যতার সঙ্কট

* * *যে যন্ত্র-শক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চ্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত, অথচ চোখের সামনে দেখলুম জাপান দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কী রকম সম্পদবান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। দেখেছি সেখানে তার স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য-শাসনের রূপ আর দেখেছি রাশিয়ায় মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের, আরোগ্য-বিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়। সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতি বিচার করেনি, শ্রেণী বিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত ও আশ্চর্য্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও সহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসন-কার্যের একটী অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল; দেখেছিলাম সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র অধিকারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোন বিরোধ ঘটে না। তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থ সম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসন-ব্যবস্থার যথার্থ সভ্য-ভূমিকা। দেখে এসেছি, পারস্য দেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্ম্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতা-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজ-নীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনও ঘটেনি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ সভ্যতা-গর্বিত কোন য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজো পরাভূত করতে পারেনি। এরা দেখতে দেখতে চারিদিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হতে চলল।* * *

সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাবমাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্ম-বিচ্ছেদ। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্য আমাদের সমাজকেই একমাত্র দায়ী করা হ'বে। কিন্তু এই দুর্গতির

রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ: উৎকট হয়ে উঠেছে সে যদি ভারত-শাসন যন্ত্রের উধ্বস্তরে কোনো এক গোপন্ কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হোত তা হলে কখনই ভারত ইতিহাসের এত বড়ো অপমান-কর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধি, সামর্থ্যে কোন অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন একথা বিশ্বাস-যোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্য দেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজ শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষচ্ছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস বা দারোয়ানি মাত্র।* * *

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হ'বে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসন-ধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিস্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— বৈশাখ, ১৩৪৮)

মিস্ রাথবোনের পত্রোত্তরে রবীন্দ্রনাথ

"ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে লিখিত মিস্ রাথবোনের খোলা চিঠি দেখে আমি গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছি......বৃটিশ জাতির চিন্তা ধারার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেও এখনও যে আমরা আমাদের দরিদ্রদেশের স্বার্থ সম্বন্ধে সামান্যও চিন্তা করে থাকি আমাদের এ অকৃতজ্ঞতা দেখে তিনি বিস্ময় অনুভব করেছেন।* * *

ইংরেজী ভাষাই অমাদের জ্ঞানলাভের একমাত্র বাহন বলে স্বীকার করলেও বৃটিশজাতির চিন্তাধারার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ট সম্পর্কের ফল দাঁড়িয়েছে দুই শতাব্দী ইংরেজ শাসনের পরেও ১৯৩১ সনে লোকসংখ্যার শতকরা মাত্র একভাগ লোক ইংরেজীশিক্ষিত—অথচ রাশিয়ায় ১৯৩২ সনে মাত্র ১৫ বৎসর সোভিয়েট শাসনের ফলে শতকরা ৯৮ ভাগ বালক-বালিকা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

দু'শ বছরের ওপরে জাতির সকল ঐশ্বর্যের চাবিকাঠি নিজেদের আয়ত্তে রেখে এদেশকে শোষণ করল যারা আমাদের স্বদেশবাসীর জন্য তারা কি করেছে? যে দিকে তাকাই চোখে পড়ে একমুঠো অন্নের কাঙ্গাল অনশনক্লিষ্ট, শীর্ণ দেহগুলি। আমি দেখেছি গ্রামে মেয়েরা কি ভাবে কয়েকফোঁটা পানীয় জলের জন্য কাঁদা খুঁড়ছে কারণ ভারতের গ্রামে বিদ্যালয়ের চাইতেও কূয়োর অভাব বেশী।

আমি জানি আজ ইংলণ্ডের অধিবাসীদের সামনে আসন্ন অনাহার অপেক্ষা করে আছে, তাদের জন্য আমার সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু যখন দেখি বৃটিশের সমস্ত নৌ-শক্তি বৃটিশ উপকুলে খাদ্য পৌছে দিতে নিযুক্ত এবং তারই সাথে যখন মনে পড়ে অনাহারে আমার দেশ-বাসীকে মরতে দেখেছি, প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে একগাড়ী চাল পর্য্যন্ত তাদের দ্বারে পৌছায়নি তখন বৃটেন ও ভারতে ইংরেজের ব্যবহারপার্থক্য লক্ষ্য না করে পারিনা।

তবে কি খাদ্য দানের জন্য না হউক আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বৃটিশদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত!

চারদিকে তাকিয়ে দেখি সমস্ত দেশময় সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা চলেছে, তাতে বহুসংখ্যক ভারতীয় জীবন হারাচ্ছে, আমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত, আমাদের মা বোন অপমানিত হচ্ছে কিন্তু শক্তিশালী বৃটিশবাহু বিন্দুমাত্রও সক্রিয় হোচ্ছেনা, কেবল আমাদের ঘর সামলাতে পারিনে বলে সাগরপার থেকে বৃটিশ কণ্ঠ ধিক্কার দিচ্ছে।

অস্ত্রধারী যোদ্ধাকেও প্রবলতর শক্তির সামনে হটে যেতে হোয়েছে ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। উন্নততর অস্ত্রবলের দ্বারা অভিভূত হয়ে সাহসিকতম বৃটিশ, ফরাসী ও গ্রীক সৈনিক রণক্ষেত্র পরিত্যাগ কোরে যেতে বাধ্য হয়েছে বর্তমান যুদ্ধেও এ দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু যখন অস্ত্রশস্ত্রহীন আমাদের অসহায় কৃষকবৃন্দ সশস্ত্র গুণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে ক্রন্দনরত শিশুদের নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় আমাদের কাপুরুষতায় ইংরেজ রাজপুরুষদের মুখে তখন বিদ্রূপের বক্র হাসি দেখা দেয়।

ইংলণ্ডের সমস্ত নাগরিক আজ শত্রুর হাত থেকে পরিবার ও গৃহ রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র, কিন্তু ভারতে লাঠিচালনা শিক্ষাও আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার দেশবাসীকে নিরস্ত্র এবং ক্লীব করে রাখা হয়েছে যাতে এরা সশস্ত্র প্রভুদের প্রতাপে অভিভূত থাকে ও চিরকাল তাদের উপর নির্ভর করে থাকতে বাধ্য হয় * * সকল গভর্ণমেন্টকেই জনসাধারণের মঙ্গলবিধান কতখানি করতে পেরেছে তাদিয়েই বিচার করতে হবে, তার মুখপাত্রদের বড় বড় কথা দিয়ে নয়। ইংরেজেরা কেবল মাত্র বিদেশী, বলেই যে অবাঞ্ছনীয় তা নয়। আমাদের কল্যাণের রক্ষক বলে দাবী করে তারা গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং নিজের দেশের মুষ্টিমেয় পুঁজিদারদের পকেটপূর্তির জন্য ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের সকল প্রকার সুখসুবিধাকে বলি দিয়েছে। এ সকল অন্যায় সম্পর্কে সুবুদ্ধি সম্পন্ন যে কোনও ইংরাজ অন্ততঃ নীরব থাকবেন এবং আমাদের নিস্ক্রিয়তার জন্য কৃতজ্ঞ হবেন বলেই মনে করেছিলাম কিন্তু তারা যে এই ভাবে আমাদের ক্ষতের উপরে নূনের ছিটে দিয়ে আঘাতের উপর অপমান চাপাবেন—এটা সমস্ত শালীনতার সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে।"

(এসোসিয়েটেড প্রেস—৪ঠা জুন ১৯৪১)

অহিংসার সীমা—

"১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যখন আমি আমার আত্মরক্ষার সহায়ক এবং সঞ্জীবনীশক্তিসম্পন্ন অহিংসার প্রথম প্রচার করি তখন লিখিয়াছিলাম নিরস্ত্রীকরণই ভারতে বৃটিশ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কময় পৃষ্ঠা। ১৯১৮

খৃষ্টাব্দের সেই কথা আমি পুনর্বার বলি—তখন আমি উৎসাহের সহিত বৃটিশ সেনাদলের নিমিত্ত সৈন্যসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম, যে উৎসাহের ফলে আমি ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়ি এবং আমার যথেষ্ট অখ্যাতি ও রটে।

আমি মনে করি অহিংসা কাহারও উপরে জোর করিয়া চাপান যায় না। ইহা হৃদয় হইতে আসে। বৃটিশরা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের শাসনকার্যকেই নিরাপদ করিবার জন্য, ভারতবাসীকে অহিংস করিবার জন্য নহে। এমন কি ইহা ভারতবাসীর অনিষ্ট করিবার শক্তিটুকু পর্যন্ত অপহরণ করিয়াছে আর অক্ষমেরা কল্যাণকর কিছু কখনও করিতে পারে না। বৃটিশ রাজের একটীমাত্র প্রতিনিধি এক সহস্র গ্রাম্যব্যক্তিকে পদানত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় ইহাতে বৃটিশদের গৌরব বা বাহাদুরী কিছু নাই।

যাহারা অহিংস থাকিতে পারিবে না এবং থাকিতে ইচ্ছুক ও নহে তাহাদের অস্ত্রধারণের এবং সে অস্ত্রকে সুব্যবহারের নীতি আমার অহিংসায় আছে। সহস্রবার বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি অহিংসা সবলতমের, ধর্ম দুর্বলের ধর্ম নহে। হিংসার চেয়ে ইহা মহত্তর শক্তি এবং গুণে ও কার্যকারিতায় ইহা হিংসা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

[মহাত্মা গান্ধী ; 'টাইমস' পত্রিকায় লিখিত পত্রে]

……যাহারা সহিংস প্রতিরোধ ভাল মনে করেন তাঁহারা কংগ্রেস হইতে বাহিরে আসিয়া নিজেরা যে ভাবে চলা ভাল মনে করিবেন সেই ভাবেই চলিবেন এবং অন্যকে ও চালাইবেন। আমার বিশ্বাস, যদি এ বিষয়ে কংগ্রেস নিজের নীতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা না করে তবে ইহা একটী অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়াই প্রমাণিত হইবে।

যদি কংগ্রেসের বেশীর ভাগ লোকেরই মত এই হয় যে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিরোধ তাহাদের কর্তব্য এবং ইহাতে কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করা হইবে না, তবে তাঁহাদের উচিত হইবে স্পষ্ট ভাবে এই মত ঘোষণা করা এবং অপরকে সেইভাবে চালিত করা। নেতৃবর্গের এই সময়ে কারাবাসের জন্য কাহারও পক্ষে আত্মমত প্রকাশে বিরত হওয়া উচিত হইবে না। যদি এই মত ভ্রান্ত হয় তবে পরে তাহা সংশোধন করা চলিতে পারে। মোট কথা, কাহারও এই সময়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা উচিত হইবে না।………

গুণ্ডার ভয়ে লোকে পলায়ন করিবে ইহা অসহ্য। তাহাদের উচিত গুণ্ডাদিগকে বাধা দেওয়া—সেটা অহিংস উপায়েই হউক বা সহিংসভাবেই হউক। কংগ্রেসের নীতি যদি আমি ঠিকভাবে বুঝিয়া থাকি তবে কংগ্রেস একমাত্র অহিংস প্রতিরোধই করিতে পারে এবং তাহাদের সাফল্য নিশ্চিত। কিন্তু স্পষ্টভাবে জনসাধারণকে আমাদের জানান উচিত যে ভয়ে পলায়ন করা কাপুরুষতা। তাহাদের কর্তব্য প্রতিরোধ করা এবং যদি তাহারা অহিংস প্রতিরোধে অসমর্থ হয় তবে সহিংস প্রতিরোধ অবলম্বন করিতে হইবে।—

[মহাত্মা গান্ধী, গুজরাট প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী,
ভোগীলাল লালাকে লিখিত পত্রে]

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি—

* * *রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব ইংরেজের পলিটিক্যাল ফিলজফির কোটরে ঢোকে না। সেখানে রাষ্ট্র আছে; তাই স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি স্বদেশী সমাজের শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে, তাঁর সমাজতত্ত্ব নিতান্তই অর্গ্যানিক···অধিকারসর্বস্ব নয়, ত্যাগধর্মী। এই হিসেবে তিনি বহু স্বদেশী নেতার চেয়ে স্বদেশী—কারণ আমাদের সমাজটাই ঐ ধরণের—অতএব, তিনি ঢের বেশী রিয়ালিষ্টিক। লোকে তাঁকে যখন আদর্শবাদী বলে তখন তারা আইডিয়ালিষ্ট কথাটির অনুবাদই করে, তাঁর সম্বন্ধে সত্য ধারণার প্রমাণ দেয় না।

কিন্তু ভারতবর্ষে সামাজিকতার প্রধান্য থাকলে কি হয়! ভাগ্যচক্রের ঘোরে সে এসে পড়ল এমন একটা প্রাঙ্গণে যেখানে ন্যাশনালিজমের নামে রাষ্ট্রদৈত্যের পূজা অহরহ চলছে। আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথের Nationalism নামে বইখানি আবার পড়তে অনুরোধ করছি। ফ্যাসিজমের জন্ম তারিখের বহু পূর্বে লেখা। আজকাল যাকে totalitarianism বলা হয়, তারই পূর্বাভাষ, statism-এরই বিপক্ষে প্রতিবাদ ঐ বইখানিতে পাবেন। অবশ্য ইকনমিক ব্যাখ্যা নেই তাতে, কিন্তু তাতে প্রতিবাদের তীব্রতা কমেনি তিলমাত্র। বইখানি বেশী জনপ্রিয় হয় নি, দেশোয়ালীরা ভাবলে তিনি দেশদ্রোহিতা করেছেন, এবং বিদেশীরা ভেতরে ভেতরে ভীষণ চটে বাইরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বল্লে, স্বপ্নবিলাস। এখন তাঁরা বুঝছেন স্বপ্নবিলাস কি আর কিছু! সে যাই হোক—রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ-দেশে রাষ্ট্র-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে মাথা তোলেন, এটা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। এই সেদিনও যে সাম্রাজ্যবাদের কুফল দেখালেন তারও সংযোগ ঐ statism-এর সম্বন্ধে প্রতিবাদের সঙ্গে। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোড়ায় রয়েছে ঐ রাষ্ট্রবাদ—সেটি কোনো একটি বিশেষ জাতির একচেটে সম্পত্তি নয়। রাষ্ট্রবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ তাঁর মতে একই বস্তু, অর্থাৎ লোভের এ-পিঠ ও-পিঠ। আত্মসম্মানবোধে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়।

এই লোভের প্রকৃতি কি? উত্তরের ভাষা রুচিসাপেক্ষ। মানুষের দিক থেকে প্রকৃতিটা মানসিক, মানুষ বাদ দিলে প্রকৃতিটা ইকনমিক। মানুষের সম্বন্ধে নিয়ে যার কারবার, সে বলবে লোভের জন্যই যত অত্যাচার। যে আবার ইতিহাসের রীতিনীতি খুঁজতে ও কাজে লাগাতে ব্যগ্র তার মতে অত্যাচার ধনোৎপাদন ও তার নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত, অতএব মানুষের দোষ কই যখন মানুষের প্রবৃত্তি ঐ সব পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানেরই প্রতিবিম্ব। প্রথম দল অত্যাচারের নিঃশেষ করবার জন্য আত্মশক্তি,-চিত্তশুদ্ধির ওপর জোর দেন, দ্বিতীয় দল বলেন নির্যাতিত শ্রেণীকে বিপ্লবী করে তোলো। এটা কর্তব্যের ভাগ, উদ্দেশ্য এক। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মনুষ্যধর্মেরই নামে রাষ্ট্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে বিনিপাত বলে অভিসম্পাত করেছেন। সেই হিসেবে তিনি স্বধর্মই পালন করেছেন।

(ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—
পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮)

গতবৎসরে দেশের আর্থিক অবস্থা—

পণ্যমূল্য :—বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে দেশের সর্ব-শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের সমষ্টিগত ভাবে যে মূল্য ছিল ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তাহা শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উহার পর হইতে মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে এবং গত মে ১৯৪০ সালে উহা মাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের তুলনায় শতকরা ১৭ ভাগ উচু ছিল। তৎপরে মূল্য আরও হ্রাস পাইতে থাকে এবং জুলাই মাসে পণ্য মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের তুলনায় শতকরা ১৪ ভাগ বেশী। অবশ্য উহার পর হইতে পুনরায় পণ্যদ্রব্যের মূল্য কিছু কিছু করিয়া পড়িতেছে এবং গত মার্চ মাসে পণ্যমূল্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ের তুলনায় শতকরা ২৩ ভাগ বেশী। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সর্ব-শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িলেও যে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্যের উপরে দেশের কোটী কোটী ব্যক্তির স্বার্থ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে, সেই সমস্ত পণ্যের মূল্য চড়িতেছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাট ও তুলার মূল্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ট্যাক্সভার :—বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এই পর্যন্ত ভারত সরকার দেশবাসীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৯ প্রকার ট্যাক্স বসাইয়াছেন এবং এজন্য দেশবাসীকে বৎসরে নূতনভাবে প্রায় ২৭ কোটী টাকার ট্যাক্সভার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গত বৎসর আরম্ভ হইবার সময় হইতে সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দেশে ব্যবহৃত চিনি ও পেট্রলের উপর আমদানী ও উৎপাদন শুল্ক বর্দ্ধিত করা হয়। উহার পরেই একটী আইন পাশ করিয়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের অতিরিক্ত লাভের অর্দ্ধেকাংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর সেপ্টেম্বর মাসে একটী অতিরিক্ত বাজেট করিয়া আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের পরিমাণ টাকায় চার আনা বর্দ্ধিত করা হয় এবং চিঠির মূল্য ও ডাক মাশুল বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে গতবৎসরে দেশবাসীর উপরে প্রায় ১৬৷৷০ কোটী টাকার নূতন ট্যাক্সভার পতিত হইয়াছে।

বাংলার অবস্থা :—গত বৎসরে বাংলা দেশের অবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে। বাংলায় প্রধানতঃ পাটের মারফতেই বাহির হইতে অর্থাগম হইয়া থাকে। গত পূর্ব বৎসরে বাংলা দেশে ৪ কোটী মণের মত পাট উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বাংলার কৃষক এই পাট বিক্রয় করিয়া গড়পড়তায় ৮ টাকা করিয়া মোট মাট ৩২ কোটী টাকা পাইয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর ৫ কোটী মণ পাট উৎপন্ন হইলেও এই পর্যান্ত কৃষক ৩ কোটী মণের বেশী পাট বিক্রয় করিতে পারে নাই এবং এজন্য প্রতি মণে ৪ টাকার অধিক মূল্য পায় নাই। কাজেই গতবৎসর পাটের দরুণ কৃষকের আয় ৩২ কোটী টাকা হইতে কমিয়া ১২ কোটী টাকায় পরিণত হইয়াছে।

[আর্থিক জগৎ—
বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৪৮।]

—:•:—

দুঃখবেদনার তীক্ষ্ণ স্পর্শ তাঁর চেতনার তারে তুলেছে সুরের জোয়ার। পণ্ডিতম্মন্যরা রবীন্দ্রনাথকে বাষ্পলোকের পলায়নধর্মী কবি বলে প্রায়শই বলে থাকেন। কারণ মাটীর পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের গুরুজনেরা যে ছক কেটে দিয়েছেন সেই ফর্মুলার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্য মেলে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বলছেন, "আমি পৃথিবীর কবি—" সেকথা শোনে কে? ডায়ালেকটীক চাই; থিসিস, অ্যান্টি-থিসিস চাই; শ্রেণীসংগ্রামের দুন্দুভীধ্বনি চাই, তবে তো সাহিত্য! এরা মনে করেন কৃত্রিম ভাষায়, কষ্ট-চেষ্টিত ভঙ্গীতে ও ভাবে বস্তীর কথা বিনিয়ে ও ফেনিয়ে তুলতে পারলেই সাহিত্য হলো। বাংলাভাষা নিয়ে যেসব রাজনৈতিক কবি সম্প্রতি নাড়াচাড়া করছেন তাদের সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ ঘটেছে। জীবনের সঙ্গে যোগ নেই অথচ কথার স্তূপ রচনা করছেন এরা। নিম্নশ্রেণীকে নিয়ে এদের সৌখীন ভাবালুতা হলো এদের সাহিত্যচর্চ্চার পুঁজি। এদের লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখীন মজ্‌দুরি।"

জীবন হলো অতলান্ত সমুদ্র। সাহিত্যও তাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও সাহিত্যে জীবনের যতোখানি বিস্তৃতি ও গভীরতা ধরা দিয়েছে, আর কোন সাহিত্যে কি তা' দিয়েছে? তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিলোকে সমসাময়িক পৃথিবীর সমস্ত আলোড়ন ও স্পন্দন প্রচণ্ডভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তবু তাঁর বদান্যতা ও বিনয় কী আনন্দপ্রদ! পৃথিবীর কবি হলেও, তিনি বলছেন, "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।" যারা তার অপূর্ণতা নিয়ে মুখর হয়ে ওঠেন তাদের নিন্দাকে সানন্দে স্বীকার করে তিনি বলছেন,—

"তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

সংসারের সমস্ত ভার চাষী, জেলে, তাঁতীরা মিলে বহন করছে, সমাজ দাঁড়িয়ে আছে এদের শ্রমের ওপরে। রবীন্দ্রনাথের মত সচেতন এ সম্বন্ধে আর কেউ না; যেখানে—

"চাষী খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল।"

সেখানকার সত্য জীবন নিয়ে কাব্য লিখ্‌বে নতুন কবি। কিন্তু সে কবি কোথায়? তবু সেই অনাগত কবির প্রতি তাঁর অভিবাদন জানিয়ে প্রতীক্ষা করছেন, "যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি"।

সাম্রাজ্যবাদী বণিক্‌-সভ্যতার বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গর্জে উঠেছে আর কোন আধুনিক প্রগতিবিলাসী লেখক তেমন করে প্রতিবাদ করেছেন? য়ুরোপে প্রলয়ের

লীলা চলেছে—সেখানে "সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো, দেশ বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত"। কিন্তু তবু এই নির্মম ধ্বংসলীলা যে ইতিহাসের অব্যর্থ প্রয়োজনে ঘটছে—এর মধ্য দিয়ে যে নতুন পৃথিবীর জন্ম হবে নবতর ঐশ্বর্যে—সেই বলিষ্ঠ আশা তার সমস্ত কাব্যকে দান করেছে অপরাজেয় মহিমা। তার ধ্যানদৃষ্টি ঘোষণা করছে—

"আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।"

কবিতা — রবীন্দ্র-সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৮

কবিতার পরিচালকদের ধন্যবাদ দিচ্ছি, রবীন্দ্র-সংখ্যা প্রকাশিত করে তাঁরা বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান কালের অদ্বিতীয় প্রতিভা; কাব্যে কেবল নয়, মননে ও আদর্শে। তাঁকে বুঝবার প্রয়োজন আছে, যেমন প্রয়োজন আছে তাঁর সাহিত্যকে উপভোগ করবার। আলোচ্য সংখ্যা আমাদের সেই প্রয়োজনকে অনেকাংশে সুসিদ্ধ করবে। এ-সংখ্যার সব চাইতে বড়ো আকর্ষণ হলো রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দুটী। সাহিত্যের মূল্য বিচার সম্বন্ধে সাম্প্রতিক বিতর্ক হলো শ্রেণীর প্রভাব নিয়ে। ধ্রুব আদর্শ সাহিত্যের নেই, একথা রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েই বলেছেন; 'বর্তমান কালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহঙ্কার সার্বজনীন আদর্শের ভাণ করে দণ্ডনীতির প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে'—এই বিত্তাল্পতার অহঙ্কারও যে একদেশদর্শী তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরাও সমাজতন্ত্রের সমর্থক; কিন্তু সাহিত্যে বামপন্থার নামে যে নতুন মার্ক্সীয় গোঁড়ামীর আমদানী হয়েছে তার আমরা বিরোধী। এই গোড়ামী সাহিত্যবিচারে ও শিল্পসৃষ্টিতে আনতে চায় যান্ত্রিকতা যাকে অদ্যকার বিজ্ঞান বর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানা সেই যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এর পরেই অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, ধূর্জটীপ্রসাদ প্রভু গুহ ঠাকুরতা, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির প্রবন্ধে সংখ্যাটী মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

পরিচয় — রবীন্দ্র-সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৮

'কবিতার সঙ্গে সঙ্গেই পরিচয়ের' রবীন্দ্র-সংখ্যার নাম করতে হয়। মতনির্বিশেষে বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীরা এই সংখ্যাখানা পড়ে খুশী হবেন, একথা জোর করে বলতে পারি। প্রত্যেকটী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটী লেখা বিচার বিশিষ্টতায় উল্লেখ-যোগ্য এবং একান্ত উপভোগ্য। পরিচয়ের পরিচালকবর্গকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শচীন সেন, হরপ্রসাদ মিত্র, জীবনময় রায়, ধূর্জটীপ্রসাদ, বিশু মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, হিরণ সান্যাল ইত্যাদির লেখায় এই সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশেষতঃ বিষ্ণু দে'র অনূদিত এজ্‌রা পাউণ্ডের প্রবন্ধটী এই সংখ্যায় মূল্যবৃদ্ধি করেছে। পুস্তক পরিচয়েও 'পরিচয়' আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে।

—'দীপঙ্কর'

'বিশ্ববন্ধু'

মধ্যএশিয়া—

ইরাক—বলকানের ঘোলাজলে ঘুরপাক খেয়ে যুদ্ধের গতি মধ্যএশিয়ার গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে নূতন লক্ষ্যের সন্ধান করছে। মধ্যএশিয়াতে ইংরেজ ও জার্মাণদের বর্তমান পারস্পরিক অবস্থা বুঝতে হোলে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের পটভূমি কিছুটা বিশ্লেষণ করা দরকার। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে ইরাণ, ইজিপ্ট ও আরব দেশগুলি—তুর্কী সাম্রাজ্যের আওতায় ছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের পর—ইরাক, ইজিপ্ট, ট্রেন্সজরডন, আরব ও ইরাণ এই পাঁচটী রাজ্য গড়ে ওঠে—এদের জন্মের জন্য বৃটিশ সরকার, অনেকাংশে দায়ী। কাজেই বৃটেনের মনে একটা আশা থাকা অস্বাভাবিক নয় যে মধ্যএশিয়ার এই রাজ্যগুলি তাদের জন্মদাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হবেনা। কিন্তু কার্যতঃ হোলো অন্যরূপ। প্রধানত দুটী কারণ এর জন্য দায়ী, প্রথমতঃ, পেলেষ্টাইনে ইহুদীদের উপনিবেশ স্থাপন করা নিয়ে সমস্ত আরব দেশগুলি ইংরেজের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হোয়ে উঠে।

রসিদ আলি।

২য়তঃ, ইরাক ও ইরাণের তেলের খনিগুলির উপরে পাশ্চাত্য, বিশেষ ভাবে ইংরেজের, আধিপত্য এরা কোন দিনই সন্তুষ্ট চিত্তে সহ্য করেনি। তৈল উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে ইরাণের স্থান তৃতীয় ও ইরাকের ৪র্থ, কিন্তু হোলে হবে কি? সমস্ত ব্যাবসাটাই, এংগ্লো-ইরাণিয়ান অয়েল কম্পানীর হাতে, ইরাকের অবস্থাও তাই সমস্ত তেলের ব্যবসা বৃটিশ, ডাচ্ ও আমেরিকান কম্পানীর হাতে এবং ইংরেজই তার প্রধান অংশীদার। এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে সর্বপ্রথম জানা গেল যে ইরাকে জার্মাণ প্রভাব কাজ করছে—রসিদ আলি কিন্তু ইরাকে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা কর্‌বার পরও ইঙ্গ-ইরাক চুক্তি মেনে চল্‌বেন বলে ঘোষণা করেন। চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ সৈন্য ইরাকে পাঠানো হয় ও যথাসময়ে বসরায় পৌছায়। কিন্তু ২য় দফা সৈন্যবাহিনী পাঠাবার সময় গোলমাল বাধলো—ইরাকীরা আপত্তি

জানায় প্রথম সৈন্য দল অন্যত্র না যাওয়া পর্যন্ত ২য় দল পাঠানো চল্‌বে না। আপত্তি অগ্রাহ্য কোরে ইংরেজ সরকার সৈন্য পাঠান—ফলে ইরাকীরা হাবানিয়ার বৃটিশ বিমান ঘাঁটি আক্রমণ কোরে বসে। এদিকে রসিদ আলিও জার্মাণির সাহায্য চায় এবং জার্মাণ সাহায্য ও ইরাকে কয়েক-দিনের মধ্যেই উপস্থিত হয়। শোনা যাচ্ছে ফরাসী অধিকৃত সিরিয়ার বন্দরগুলিতে যুদ্ধোপকরণ, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি নাকি জার্মাণি পাঠিয়েছে। সিরিয়ার বিমানঘাঁটিগুলিও নাকি জার্মাণির ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হোয়েছে। ভিসির সঙ্গে জার্মাণির হৃদ্যতা যতটা গভীর হোয়ে উঠেছে তাতে এ কিছু অস্বাভাবিক নয়। কাজেই ইরাকে সাহায্য পাঠানো হিট্‌লারের পক্ষে এখন অনেকটা সহজ। শোনা যাচ্ছে মশুলে জার্মাণ এরোপ্লেন ও বিশেষজ্ঞরা এরই মধ্যে এসে পৌছেছে—মধ্যএশিয়ার অন্যান্য রাজ্যগুলির ব্যবহারও ইংরেজেরপক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নয়, কারণ রসিদ আলি জার্মাণ সাহায্য চাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার আপত্তি বা অসন্তোষ দেখা যায় নি। গত ৩১শে মে তারিখে বিপ্লবী ইরাকিদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হবার পর ইরাকের রিজেণ্ট আব্‌দুল্লা ইল্লা বাগ্‌দাদ প্রবেশ করেছেন। ইরাকের বালক রাজা ফয়জল বাগ্‌দাদে নিরাপদে আছেন শোনা গিয়েছে। রসিদ আলি ইরানে পলায়ন করেছে এবং নূতন চুক্তি অনুসারে বৃটিশ সৈন্য ইরাকের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করবার অনুমতি পেয়েছে। এক্সিস্ সৈন্যও নাকি বন্দী করা হয়েছে। ইরাকের অবস্থা বাইরে থেকে বিচার করলে মনে হবে বিদ্রোহের পূর্বাবস্থা ইরাকে ফিরে এসেছে কিন্তু বাস্তবিক অবস্থা কি তা বোঝা কঠিন। কারণ পরিবর্তিত অবস্থায় এসব দেশ তাদের স্বার্থ কিভাবে প্রকৃষ্টতম একমাত্র উপায়ে রক্ষিত হবে একমাত্র সেই বিচার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হবে। রুশিয়া এসব রাজ্যের উপরে শেষ প্রভাব বিস্তার কর্‌বে বলে আশা করা ভুল নয়—রসিদ আলির শাসনকে রুশিয়া যে মেনে নিয়েছিল তাতেই ভবিষ্যতের একটা ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ফয়জল
ইরাকের বালক রাজা

ক্রীট—জার্মাণেরা গ্রীস অধিকার কর্‌বার পর ক্রীটের প্রধান বন্দর কানিয়াতে গ্রীক্ গভর্ণমেণ্ট স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধও ক্রীটে স্থানান্তরিত হয়। ক্রীটে বৃটিশ, গ্রীস ও নিউজিলেণ্ডের সমবেত শক্তির সঙ্গে জার্মাণরা যুদ্ধ করে ক্রীট অধিকার করেছে। ক্রীটের

যুদ্ধে জার্মাণরা যে অপূর্ব সমর কৌশল ও সাহসিকতা দেখিয়েছে তা বাস্তবিকই আশ্চর্য। হাজার হাজার জার্মাণ প্যারাসুট বাহিনী ক্রীটে অবতরণ করে। এরা নিউজিলেণ্ডের সৈন্যদলের যুদ্ধপোষাক পরিহিত ছিল ফলে ইংরেজ ও তার মিত্রদের প্রভূত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ১১দিন যুদ্ধের পর ক্রীট জার্মাণরা দখল করে। বৃটিশদের এই পরাজয়ে ইংলণ্ড ও ভারতের সমস্ত সরকারী কাগজগুলি তীব্র মন্তব্য কোরেছে বৃটিশের সমর কৌশলের ব্যর্থতা সম্পর্কে। ষ্টেটস্‌মেন পত্রিকাও এই পরাজয়ে মনের ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেন নাই এবং বৃটিশ সরকার যাতে লোকের মনে বৃথা আশার উদ্রেক না করেন সে সম্পর্কে সুদীর্ঘ উপদেশ দিয়েছেন। ক্রীটের যুদ্ধের ফল সুদূর প্রসারী হবে সন্দেহ নেই। ভূমধ্যসাগরে জার্মাণ প্রভাব বিস্তারের পক্ষে এটা প্রথম ও বড় একটী সিঁড়ি। এর পর লক্ষ্য হবে সাইপ্রাস্ এবং তার জন্য সাইপ্রাসেও তোড়জোড় চলেছে কিন্তু জার্মাণরা সাইপ্রাসে আসার আগে সিরিয়াতে দৃষ্টি দিয়েছে কারণ সিরিয়া থেকে সাইপ্রাসের দূরত্ব কম এবং সিরিয়াতে ফরাসী বিমানঘাঁটী গুলি পাওয়া যাবে। সিরিয়ার যুদ্ধের ফলাফলের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। সিরিয়াতে ইংরেজ ও তার কিছুদিন পূর্বেকার বন্ধু ফরাসী পরস্পরকে আক্রমণ করেছে। কাজেই "চক্ষুলজ্জার" বাঁধ এবার ভাঙ্গল। জার্মাণ কূটনীতির এ যে কতবড় জয় হোলো আশাকরি ইংরেজ তা বুঝেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে এখনও বৃটিশ দূরদর্শিতার ও কূটনীতির যে পরিচয় আমরা পাচ্ছি খুব আশান্বিত হবার কারণ

ক্রীটের প্রধান বন্দর কানিয়া, এথেন্স হতে গ্রীক গভর্ণমেণ্ট এইখানে স্থানান্তরিত হয়।

বিমানপোত হইতে জার্মাণ অবতরণ।

তাতে নেই। **সম্প্রতি** সিরিয়ার রণক্ষেত্রের ভাগ্য **সম্পর্কে** আমরা উৎসুক হোয়ে আছি।

আফ্রিকায়—জার্মাণ লক্ষ্য আলেকজেন্দ্রিয়া। বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল জার্মাণদের এখানে বাধাদেওয়ার চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। শতশত সৈন্য এখানে নাকে বৃটিশের দিক থেকে জড় করা হোয়েছে। এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর বৃটিশ স্বার্থ অনেক নির্ভর করছে। সাল্লমের চারধারে এখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকারে চল্‌ছে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধ যতদূর খবর পাওয়া যায় বৃটিশের পক্ষে চারদিক্‌কার ঘনায়িত অন্ধকারের মধ্যে "রজত রেখা"। এখানে ইটালিয়ান সৈন্য বেশী সুবিধা কোরে উঠতে পারেনি—আবিসিনিয়ার সহর সিয়াসিমানা ও আদেলা ইটালীর হস্তচ্যুত হোয়েছে। হেইলে সেলাসি আবিসিনিয়ায় নাকি প্রত্যাবর্তন করেছেন। এবং গত ২০শে মে ডিউক অফ আওষ্টা ৫জন জেনারেল ও বহু ইটালীয় সৈন্য সহ নাকি আত্মসমর্পণ করেছেন। দেখা যাচ্ছে ইটালীই ইংরেজের মুখরক্ষা কর্‌লো।

জার্মাণ-ভিসি চুক্তি ও আমেরিকা—বৃটিশ সরকার ও আমেরিকার সকল চেষ্টা নিষ্ফল কোরে জার্মাণ-ভিসি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হোয়েছে। জার্মাণির পক্ষে এ মস্তবড় জিৎ। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ডি গ্যালেকে সমর্থন করার ফলে ও ডাকারের নৌযুদ্ধে ফরাসী জাহাজ ধ্বংস হবার পরিণতি এছাড়া অন্যরূপ হবার সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া বৃটিশের ব্লকেড্ জার্মাণকে বিশেষ কিছু করতে পারেনি কিন্তু ফ্রান্সকে এর জন্য বিশেষ গলদঘর্ম হোতে হোয়েছে। কাজেই ফ্রান্স পূর্ব বন্ধুর উপর ক্রমেই বিরূপ হোয়ে উঠছিল। জার্মাণি এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল—বিশেষ সুয়েজ অভিযানের পূর্বে ভিসির সঙ্গে একটা পাকাকাকি সম্বন্ধ করা প্রয়োজন হোয়ে পড়ে কারণ তাতে সিরিয়া থেকে আক্রমণ চালানো সহজ হবে। ভিসি সরকার সিরিয়াতে জার্মাণ সৈন্যকে অবাধে আস্‌তে দিচ্ছেন, জার্মাণদের উদ্দেশ্য সিরিয়া, লেবানন ও পেলেষ্টাইন দখল করা, তাতে সুয়েজে সৈন্য পাঠানো খুব সহজ হবে এবং তাছাড়া ইরাকের তেলের খনি মশুল ও কার্‌কুকও দখল করা যাবে। ইংরেজ জার্মাণির এই অভিপ্রায় দর্শক হোয়ে শুধু দেখতে পারে না কাজেই তাকে খুব তোড়জোড় করতে দেখা যাচ্ছে। জেনারেল ওঁয়েগা নাকি বিরাট আয়োজন কর্‌ছেন। ইতিমধ্যে জার্মাণ সৈন্যদের অবাধ গতি বৃটিশেরা বাধা দেয়; এসব নিয়ে ফরাসী ও বৃটিশ সৈন্যে যুদ্ধ হয়। ভিসির সঙ্গে জার্মাণদের যে চুক্তি হোয়েছে তাতে জার্মাণ সৈন্যের জন্য যে ব্যয় ভিসিকে বহন কর্‌তে হোচ্ছে ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ যা ফরাসীর দেবার কথাছিল তার পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেওয়া হোয়েছে এবং সীমান্তের উপর যে কড়াকড়ি ছিল তাও হ্রাস করা হোয়েছে। এই সন্ধির সহযোগিতার খবরে আমেরিকা যে সন্তুষ্ট হয় নাই তা বলাই বাহুল্য। সেনেটরদের মধ্যে কেউ কেউ ডাকার দখল করবার প্রস্তাব কর্‌ছেন—অনধিকৃত ফ্রান্সের যে সব জাহাজ যুক্তরাষ্ট্র আটক কোরেছে সেগুলিকে যাতে মুক্তি না দেওয়া হয় সে সম্বন্ধেও অনেকে মত প্রকাশ কর্‌ছেন। অদূর ভবিষ্যতে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক শেষ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সোভিয়েট ও জার্মানি—বলকানে যখন যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো তখন অন্তের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে যারা খুসী হয় এমন অনেকেই পুলকিত হোয়ে উঠেছিলেন, যে এবার জার্মাণ ও সোভিয়েটের মধ্যে বিষম একটা গোলযোগ বাঁধবে—কিন্তু যখন তা হোল না পরিষ্কারই বোঝা গেল যে এমন কোনো ব্যবস্থা হোয়েছে যাতে এই দুই শক্তি পরস্পরের সহযোগিতা কর্‌তে অসুবিধা বোধ কর্‌ছে না। সম্প্রতি ষ্টেলিন নিজে প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করাতে আবার—অনেকে গোলমালের আশায় রোমাঞ্চিত হোয়ে উঠেছেন—কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হোচ্ছে তাঁদের এবারও নিরাশ হোতে হবে। এটাই স্বাভাবিক যে উভয়শক্তির মধ্যে এমন এক চুক্তি হোয়েছে

যাতে সোভিয়েট জার্মাণিকে ইউরোপে স্বাধীনতা ও জর্মাণ সোভিয়েটকে এসিয়াতে স্বাধীনতা দান করে। এব্যবস্থাতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে রুশিয়াকে অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া অসম্ভব নয়। ভারতের ভাগ্য কোনদিক থেকে কি বহন করে আনে দেখা যাক্ !

লা-পাসিওনারিয়া।

লা-পাসিওনারিয়া—স্পেনের বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেত্রী সেনোরিটা ডলোরেস্ ইবারুরি গোমেজকে আড়াই কোটি পেসেটা জরিমানা এবং ১৫ বৎসর নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হোয়েছে। এই জরিমানা দিতে গেলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি হারাবেন। স্পেনের নাগরিক অধিকার থেকে এঁকে বঞ্চিত করা হোয়েছে। স্পেনের সিভিল ওয়ারের সময় এঁর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা বিদ্রোহীদের বিশেষ উত্তেজিত কোরেছিল। এঁর এই বক্তৃতার জন্য এঁকে লা পাসিওনারিয়া নাম দেওয়া হয়। বর্তমানে ইনি রুশিয়ায় আছেন বলে অনুমান করা যায়।

সম্পাদকীয়

আমাদের কথা

এই আষাঢ়ে জয়শ্রীর বয়স হোলো দশবৎসর। ১৩৩৮ এর বৈশাখে এর জন্ম, তারপর নানা অবস্থান্তর, ঝড়ঝঞ্ঝা উত্তীর্ণ হোয়ে আজ সে যে যুগে এসে দাঁড়িয়েছে তা শুধু ভারতবর্ষের নয় বিশ্বমানবের পথসন্ধি। যথাযথ ভাবে এর মূল্যনিরূপণ করা এবং এর দায়িত্বকে বহন করা সহজ কাজ নয়। জয়শ্রী এ কঠিন দায়িত্বের অংশ গ্রহণ কোরেছে। যুক্তিচালিত বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা এ যুগের সমস্যাগুলিকে নির্ণয় করা এবং তার সমাধানের পথ নির্দেশ করা জয়শ্রীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্যই সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র ও ধর্মে, সর্বত্র যে নূতন মান (values) গড়ে উঠছে, জয়শ্রীর পাতায় তার স্বরূপকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিচার করে এ সকল বিষয়ে জয়শ্রীর নির্দেশ কি তাও দেওয়া হয়।

জয়শ্রী রাজনৈতিকপথ হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের পথকে বেছে নিয়েছে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নির্দেশ অনুযায়ী গণ-বিপ্লব সংঘটিত করবার প্রয়াসী। জয়শ্রীর কেবলমাত্র নেতিবাচক কর্মপন্থা নয়—গণ-বিপ্লব দ্বারা স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর যে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে, সে সম্পর্কে জয়শ্রীর একটা পরিষ্কার কল্পনা রয়েছে। সেই কল্পনার রূপকে জয়শ্রীর পাতায় আমরা ধরতে চেষ্টা করে থাকি, যাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের দেশের কর্মীদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। ভবিষ্যৎ সমাজের রূপ সম্পর্কে এক কথায়, জয়শ্রী সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী।

যে পরিবর্তন আসন্ন হোয়ে আসছে প্রতিদিন, শঙ্কাহীন সংকল্পের সাথে জয়শ্রী তাকে আহ্বান করছে—নবযুগকে জন্ম দেবার ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার গুরু দায়িত্ব জয়শ্রী অন্যান্য সহযাত্রীদের সহিত গ্রহণ করেছে। গত দশ বৎসরে জয়শ্রীর দান ব্যর্থ হয়নি—চিন্তা ও কর্মরাজ্যের অস্পষ্টতা ও দ্বিধাকে জয়শ্রী অনেকটা দূর কোর্‌তে সাহায্য করেছে—ভবিষ্যতেও করবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—

১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ষোড়শ মৃত্যুতিথি গেল। গত ১৫ বছরে বাংলা ও ভারতের রাজনীতিতে গভীর পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সকল পরিবর্তনের মধ্যেও আজ ভারতের

রাজনৈতিক কর্মীরা মনে প্রাণে অনুভব করছে চিত্তরঞ্জনের অস্তিত্বের মর্ম। প্রাণহীন জড়ত্ব ও ক্লীবত্বের শিকলে আজ ভারতবর্ষের প্রাণ বাঁধা পড়েছে, সেই শিকলকে ভেঙ্গে শক্তির তপস্যায় মানুষকে প্রাণবন্ত করে তুলতে আজ চিত্তরঞ্জনের মত প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন পড়েছে। আজ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে আমরা তাঁকে স্মরণ করছি এবং তাঁর নির্দেশিত পথে অগ্রসর হতে সবাইকে আহ্বান করছি।

পরলোকে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের গত ১৯শে মে মৃত্যু হোয়েছে। যে সময়ে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতার পূর্ণ স্বাধীনতাকে কংগ্রেসের লক্ষ্য ব'লে ঘোষণা কোরবার সাহস এবং দূরদৃষ্টি ছিল না তখন (১৯২৮ সালে) তিনিই কংগ্রেসের মণ্ডপ থেকে তা ঘোষণা করবার জন্য অগ্রণী হয়েছিলেন। ঐ বছরে তাঁর প্রচেষ্টা সফল না হ'লেও পরবর্তী বৎসর ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে তাঁর মতই জয়যুক্ত হয়েছিল।

আইন ব্যবসায়ে তিনি যে রকম প্রতিষ্ঠা লাভ কোরেছিলেন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রেও তেমনি শ্রেষ্ঠতম আসন অধিকার কোরেছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের দিনে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার প্রাক্তন মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ, সি, আই, ই, উপাধি এবং মাদ্রাজের এডভোকেট জেনারেলের পদত্যাগ কোরেছিলেন। ১৯২৬ সালে কংগ্রেসের গৌহাটী অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি জাতির রাষ্ট্রনীতি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে কংগ্রেস আইনঅমান্য আন্দোলন সুরু কোরলে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার ব্যবহারিক রাজনীতির সংস্পর্শ ত্যাগ করেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে সুভাষচন্দ্র যখন ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন কোরে সংগ্রামশীল গণ-আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন। ভারতবর্ষের বাম-পন্থীরা আজকের দিনে একথা স্মরণ কোরে গৌরব বোধ করবেন।

শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি, অতুলনীয় দূরদর্শিতা এবং সুস্পষ্ট পথনির্দেশ-দানের অসাধারণ ক্ষমতা জাতির অমূল্য সম্পদ ছিল। ১৯২৬ সালে গৌহাটী কংগেসের সভাপতি রূপে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কোনো কোনো অংশ আজকের জাতীয় সংকট-মুহূর্তে বিশেষ ভাবেই স্মরণ হচ্ছে। তাঁর অভিভাষণের একাংশ এখানে উদ্ধৃত করলে অবান্তর হবে না।

"আমাদের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে স্বরাজের দীপশিখা স্তিমিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে আমাদের দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া বিচার করিলে চলিবে না—কাজ করিতে হইবে। বর্তমানের প্রধান সমস্যাই হইতেছে যে, দেশের মধ্যে বিভিন্ন দল থাকিবে না। প্রদেশে মাত্র এখন দুইটী দল থাকিতে পারে এক গভর্ণমেণ্ট দল, আর এক স্বরাজলাভেচ্ছু দল। এখন সকল দলের কর্তব্য পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া স্বরাজসংগ্রামে অগ্রসর হওয়া।"

এই বাস্তব দেশপ্রেম ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশের ক্ষমতা আজকের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কোথায়?

ঢাকার দাঙ্গা-তদন্ত-কমিটি

গত ১৭ই মার্চ তারিখে হঠাৎ ঢাকা সহরে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আরম্ভ হয়। প্রায় তিনমাস ধরে এই দাঙ্গা চল্‌তে থাকে। চকবাজারের হিন্দু ব্যবসায়ীদের সমস্ত দোকান লুঠ হয়ে যায় এবং বেশীর ভাগ বাড়ী পেট্রোল সহযোগে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। হিন্দুপাড়ায় মসজিদ এবং অন্যত্র মন্দির আক্রান্ত হয়। পথে ঘাটে গুণ্ডাদের রাজত্ব চলে এবং পথিকের ওপর অতর্কিত ছোরা মারা অহরহ চলতে থাকে। বহুলোক ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র চলে আসেন। ১লা এপ্রিল থেকে অকস্মাৎ নারায়ণগঞ্জ থানার গ্রামে গ্রামে আক্রমণ আরম্ভ হয়। রায়পুরা ও

শিবপুর থানার প্রায় ৭০খানা গ্রামে হিন্দুদের ওপরে আক্রমণ হয়; ধনসম্পত্তি লুঠ হয় এবং বাড়ীঘরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সংবাদ আসতে থাকে। ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত এই অরাজকতা চলতে থাকে। মিঃ থ্যাচ্‌বার্ণওয়েল নামক ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে গ্রামে গিয়ে গুরুতর জখম হয়ে ফিরে আসেন। প্রায় ২৫ হাজার হিন্দু নরনারী ও শিশু আগরতলা ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। সমস্ত ভারতবর্ষে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। ঢাকা সহরে ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স এবং অতিরিক্ত মারাঠী সৈন্যদলের স্থায়ী ছাউনী রয়েছে; তাছাড়া পুলিশ রয়েছে, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ কমিশনার রয়েছেন; তা' সত্ত্বেও দুর্দান্ত প্রতাপশালী ব্রিটিশ রাজত্বে মাসের পর মাস ধরে এই ধরণের ঘটনা কী করে ঘটতে পারে তাই নিয়ে দেশবাসীর মধ্যে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। অতঃপর এই দাঙ্গার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও ভবিষ্যৎ প্রতিকার সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক দুজন সভ্য নিয়ে এক তদন্ত কমিটী নিযুক্ত হয়েছে। হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ম্যাক্‌নেয়ার হলেন প্রেসিডেণ্ট এবং মিঃ ম্যাক্‌ শার্প আই-সি-এস্‌ হলেন এই কমিটীর সভ্য। ২রা জুন সোমবার থেকে কমিটীর প্রাথমিক কার্য আরম্ভ হয়। বিপিসিসির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত শরৎ বসু, মিঃ ডি, আর, মুখার্জ্জী ব্যারিষ্টার ইত্যাদি ঢাকায় কমিটীর অধিবেশনে যোগদান করেন। হিন্দুসভার পক্ষ থেকে মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জী ও মিঃ নির্মল চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত থাকেন। অ্যাড্‌হক্‌ বিপিসিসির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত কামিনী দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় যোগদান করেন। আলোচনার পর স্থির হয়, ১৬ই জুন তারিখ থেকে পুনরায় কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হবে। ইতিমধ্যে কমিটীর অধিবেশন বন্ধ থাকবে এবং কমিটীর সভ্যদ্বয় দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি স্বচক্ষে দেখে আসবেন। গত ১৬ই জুন সোমবার থেকে তদন্ত কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে।

কমিটীর সভাপতি মহাশয় ২রা জুলাই সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাত্মক অর্ডার উঠিয়ে নিয়েছেন। এখন কমিটীর বিবরণ সাধারণের কাছে প্রকাশিত ও প্রচারিত হতে পারবে। আমরা মিঃ ম্যাক্‌নেয়ারের এই অতি সঙ্গত অর্ডারটীর সমর্থন করছি। কিন্তু কমিটীর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে এখনো আমরা অজ্ঞ রয়েছি। প্রথমতঃ সাক্ষী যারা দেবেন তারা নির্ভয়ে দিতে পারবেন কিনা, দ্বিতীয়তঃ সাক্ষীদের যথাবিধি জেরা করতে দেওয়া হবে কিনা, তৃতীয়তঃ কমিটীর রিপোর্টটী সাধারণ্যে প্রকাশিত হবে কিনা, চতুর্থতঃ তদন্তের ফলাফল ও কমিটীর মতামতগুলোর কী সদগতি হবে, এই চারটী বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কী মতিগতি আমরা জানি নে। তবে এরই ওপরে নির্ভর করছে এই তদন্তের কার্যকারিত্ব ও সার্থকতা। আমরা আশা করি উপরোক্ত চারটে বিষয়ে সর্বসাধারণের আশা ও দাবি অনুযায়ী পদ্ধতিতেই তদন্ত পরিচালিত হবে।

হিন্দুসভার বহ্বারম্ভ

গত ১৪ই জুন হিন্দুসভার কর্ম-পরিষদের অধিবেশন হয়ে গেল কলকাতায়। প্রেসিডেণ্ট বীর সাভারকার, ডাঃ মুঞ্জে, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি হিন্দুনেতৃবৃন্দ যথারীতি উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার দাঙ্গা, আমেদাবাদ, বোম্বাই ও বিহারশরীফের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ঠিক পরেই এই অধিবেশন হয়েছে; কাজেই হিন্দুসভা-পরিষদের এই অধিবেশনের দিকে লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাছাড়া মাদুরা প্রস্তাব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবার করা হবে বলেও হিন্দুরা আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ অধিবেশন শেষ হলো কেবল বিলম্বিত বক্তৃতায় এবং মামুলী প্রস্তাবগ্রহণে। মাদুরা প্রস্তাবে গত ডিসেম্বর মাসে হিন্দুসভা ব্রিটীশ সরকারকে খুব তর্জন করেছিলেন এই বলে যে এবছর ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে হিন্দুসভার দাবির সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর না পেলে লড়াই আরম্ভ করা হবে। দাবি ছিলো ডমিনিয়ান্ ষ্টেটাস্ ও পাকিস্তান-বর্জন। সে তর্জন যে কেবল প্রভাতের মেঘডম্বর, তা' কলকাতা অধিবেশনের লঘুক্রিয়া দেখেই বোঝা গেলো। মাদুরা প্রস্তাব বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না, এই যুক্তিদ্বারা এই সংগ্রামের প্রস্তাবটীকে স্থগিত রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি যে জটীল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে, হিন্দুসভা ইংরেজের বিরুদ্ধে কখনও লড়বেন একথা কেউ বিশ্বাস করেন না। স্থগিত করবার পক্ষে যত গুরুগম্ভীর যুক্তিই দেখান হোক্ না কেন, লোকের মন থেকে এ অনাস্থা দূর হবেনা। হিন্দুসভা মুসলমানের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত, কিন্তু ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কখনো সংগ্রাম করতে রাজী নন। এদের সমস্ত চেষ্টাচরিত্রের মূল ভিত্তিই হলো ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দানশীলতা। সকল রাস্তাই গিয়ে শেষ হয়েছে সেই সরকারের দরবারে। এবার প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছে হিন্দুসমাজ সংস্কার, সেবকদল গঠন এবং এককোটী সভ্যসংগ্রহ। এসব চির পুরাতন প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। আমাদের প্রধান আপত্তি, যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দোহাই এরা দিয়েছেন তার ইঙ্গিত ও অর্থ এদের চোখে ধরা পড়েনি। বিশ্বপরিস্থিতির সকল নির্দেশ আজ জাতীয়তার দিকে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নয়। ঘনায়মান জটীলতার মধ্যে সর্ব-ভারতীয় সঙ্ঘশক্তিকে গড়ে তুলতে হবে সাম্রাজ্যবাদীয় শোষণের বিরুদ্ধে। তা' না করে সাম্প্রদায়িক খাড়া-বড়ী-থোরের পুনঃপুনঃ স্তুতিবাচন করলে কোনই লাভ হবে না।

মিস্ রাথ্‌বোনের চিঠি—

স্বার্থের তাগিদে মানুষ সুরুচি ও ভদ্রতাকে বিসর্জন দিতে কোনোদিনই দ্বিধা করেনি। মিস্ রাথ্‌বোন নামীয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যাও যে করবেন না তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। "কয়েকজন ভারতীয় বন্ধুকে", বিশেষ কোরে, জবাহরলালকে উদ্দেশ করে তিনি যে পত্র লিখেছেন তাতে ইংরেজের দাক্ষিণ্যের স্তুতিবাদ ও অযৌক্তিক দাম্ভিকতা ভিন্ন আর কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ

এই দাম্ভিকতার সমুচিত জবাব দিয়েছেন। দু'শ' বছরের ইংরেজশাসন ভারতবর্ষকে করেছে দারিদ্র-জর্জর, আত্মকলহে মগ্ন, নিরস্ত্র ও ভীরু। য়ুরোপের পরাজিত রাজ্যগুলোর জন্য চোখে অশ্রু ও মুখে সাম্যের বুকুনীর বিরাম নেই, কিন্তু স্বরূপ প্রকট হয়ে পড়ে ভারতবর্ষের বেলায়। মিস্ রাথ্‌বোন-দের মতন স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের উপেক্ষা করাই শ্রেয়। রবীন্দ্রনাথের পত্র এই মহিলাকে অযথা গুরুত্ব ও সম্মান দান করেছে।

'বাণীচক্র' সাহিত্যসংসদ

শ্রীহট্টের তরুণ সাহিত্যিক সম্প্রদায় "বাণীচক্র'-সাহিত্যসংসদ" নামে একটী সংঘ গঠন কোরেছেন জেনে আমরা বাস্তবিকই আনন্দিত হয়েছি। মফঃস্বলে কোনো সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'বৎসর ধরে যেভাবে শ্রীহট্টের জন-সমাজে সাহিত্যরস পরিবেশন কোরে আসছেন তা প্রকৃতই প্রশংসাযোগ্য। তবে আজকের দিনে প্রয়োজন এমন সাহিত্যসৃষ্টির যা একাধারে আমাদের বর্তমান সমাজের, রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির শতছিদ্র জীবনকে প্রতিফলিত করবে এবং গৌরবময় ভবিষ্যতের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেবে, যে সাহিত্যের সাথে দেশের যোগাযোগ হবে অবিচ্ছিন্ন। কাজেই এই সাহিত্য-বাসর যদি জাতির জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবার কাজে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করেন তাহ'লে আমরা অধিকতর আনন্দিত হবো। আমরা সংসদের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

দি উইমেনস্ কলেজ

মেয়েদের জন্য সুপরিচালিত উচ্চশিক্ষালয় বা কলেজের সংখ্যা আজো বাঙ্গলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। এই অবস্থায় এই ধরণের কোন প্রতিষ্ঠানের কথা জানতে পারলে খুবই আনন্দ হয়। ব্যয়বহুল আবেষ্টনীর মধ্যেও কি কোরে সামান্য আরম্ভ থেকে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার দৃষ্টান্ত হলো কলকাতার, ২২৯, বিবেকানন্দ রোডের উইমেনস্ কলেজ। কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ কর্মীর চেষ্টায় প্রায় চার বছর আগে এই কলেজটী স্থাপিত হয়। অর্থাভাব প্রভৃতি অনেক অসুবিধা ভোগ করেও ঐকান্তিক চেষ্টা ও সত্যিকারের স্বার্থত্যাগের ফলে আজ উইমেনস্ কলেজ এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়াতে পেরেছে। স্বাধীনদেশে রাষ্ট্র যে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে আমাদের এখানে তা হবার উপায় নেই। কাজেই এদেশে ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের ভিত্তিতে যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তার মূল্য খুব বেশী। জাতিকে, দেশকে সেবা করবার আকাঙ্খা ও প্রেরণা নিয়ে এই যে প্রতিষ্ঠান তাকে আমরা অভিনন্দিত করি ও এই আদর্শ আমাদের আত্মগত সীমাবদ্ধ জাতীয় জীবনকে পথের ইঙ্গিত দেখাবে এই আশা করি।

ছাত্র আন্দোলন দমনে বাঙ্গলা সরকার—

বাঙ্গলার "জনপ্রিয়" মন্ত্রীমণ্ডলী আহারনিদ্রা ত্যাগ করে ভারতরক্ষায় আত্মনিয়োগ কোরেছেন। তাঁদের এই সাধু প্রচেষ্টাকে সার্থক করবার জন্য তাঁরা সারা বাঙ্গলার ছাত্র কর্মীদের বিরুদ্ধে এক বেপরোয়া অভিযান সুরু কোরেছেন, তার একটা দৃষ্টান্ত সম্প্রতি পাওয়া গেছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি অমর গোপাল নন্দী প্রমুখ বাঙ্গলার বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ছাত্রনেতার ওপর বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা বিধানবলে এক আদেশ জারী কোরে কোলকাতা থেকে তাঁদের বহিস্কৃত কোরেছেন এবং নিজ নিজ জেলায় বাস কোরতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই সব ছাত্রকর্মীদের বহিস্কৃত এবং অন্তরীণ না কোরলে ভারতবর্ষ বা বাঙ্গলাদেশের নিরাপত্তা যে কিভাবে বিপন্ন হোত তা আমরা বুঝতে অক্ষম। অবশ্য যুক্তি ও বিচারের বালাই আমাদের বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর কোনোদিনই ছিল না, এখনও নেই। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষায় এই প্রতিক্রিয়া-শীল মন্ত্রীমণ্ডলী যে সাফল্য লাভ কোরেছেন তা তাঁদেরই যোগ্য। কাজেই ছাত্র আন্দোলন দমন কোরবার জন্য তাঁদের এই তৎপরতা আমাদের বিস্মিত করেনি। কিন্তু যে মন্ত্রীমণ্ডলী দেশের কোনপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনই সহ্য কোরতে পারেন না তাঁরা যখন নিজেদের 'জনপ্রিয়' বলে ঢাক পেটান তখন বাস্তবিকই করুণার উদ্রেক করে। যদি এই মন্ত্রীমণ্ডলী মনে কোরে থাকেন যে এই দমন-নীতি দ্বারা তাঁরা দেশের ছাত্র-আন্দোলনকে বন্ধ কোরতে সক্ষম হবেন তবে তাঁরা নিরাশ হবেন। আমরা বাঙ্গলা সরকারকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ছাত্র-আন্দোলন অতীতে যেমন সহস্রপ্রকারের সরকারী নির্যাতন উপেক্ষা কোরেও বেঁচে ছিল ভবিষ্যতে ও তেমনি সর্বপ্রকার সরকারী দমন সত্ত্বেও সগৌরবে স্বীয় লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবে।

বিপন্ন বরিশাল ও নোয়াখালী—

গত ২৫শে মে পূর্ব বাঙ্গলার ওপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় ও বন্যা ব'য়ে গিয়েছে, তার ফলে বরিশাল ও নোয়াখালী জেলা দু'টাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছে। এই দুই জেলার ধ্বংসলীলার পরিমাণ এখন আর কারও অজানা নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'একটী কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। প্রথমতঃ, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর প্রায় একমাস অতীত হ'তে চললো, কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকারী কর্তৃপক্ষ এই বন্যা ও ঝড়ের ফলে নিহতদের কোন তালিকা বের করেন নি। আমরা মনে করি জনসাধারণের চিন্তা ও উদ্বেগ কমাবার জন্য সরকারের এবিষয়ে তৎপরতার সঙ্গে কাজকরা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষতির তুলনায় সরকারী সাহায্যের পরিমাণ নিতান্তই কম। বাড়ীঘর ছাড়াও গৃহপালিত পশু এবং শস্যের এতো ক্ষতি হয়েছে যে কয়েক লক্ষ

টাকা ঋণ দিয়ে এই বিপুল জনসমষ্টির খুব অল্পই সাহায্য হবে। আমরা আশা করি 'জনপ্রিয়' মন্ত্রীমণ্ডলী বিপন্ন জনসাধারণের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা কোরে অবিলম্বে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন। তৃতীয়তঃ সমস্ত বেসরকারী সাহায্য-সমিতি যাতে একটা কেন্দ্রীয় সমিতির পরামর্শে ও পরিচালনায় কাজ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং বরিশাল ও নোয়াখালী ফরোয়ার্ড ব্লক দুর্গতদের সাহায্যার্থে দুটি কমিটি কোরেছেন।

খাকসার দমন—

অবশেষে গত ৫ই জুন ভারত সরকার খাকসার প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা কোরে এক ইস্তাহার প্রকাশ কোরেছেন। বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াচ নিষিদ্ধ কোরে গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্বেই এক ঘোষণা প্রকাশ কোরেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঐ আদেশ অমান্য কোরে প্রকাশ্যে কুচকাওয়াচ করা সত্বেও এপর্যন্ত খাকসারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি। আমরা অনেকদিন থেকে লক্ষ্য কোরে এসেছি যে খাকসারদলের গতি ও প্রকৃতি দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও কল্যাণের পক্ষে এমন বিপজ্জনক যে তাতে সরকার ও জনসাধারণ—উভয়েরই শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিশেষতঃ বিশ্বসমর-পরিস্থিতির দরুণ ঐ শঙ্কার গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিল। যদিও ভারতসরকারের ইস্তাহারে যুদ্ধ-পরিস্থিতির কোন উল্লেখ নেই, তবুও একথা সহজেই বোঝা যায় যে এরই ফলে সরকারের এই তৎপরতা। সে যাই হোক, বিলম্ব হোলেও গবর্ণমেণ্ট যে অবশেষে এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন কোরেছেন তাও মন্দের ভালো।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম—

ভূতপূর্ব জার্মাণসম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের জীবনের অবসান ঘটেছে। এককালে ইউরোপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দুঃসাহসীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে বিশ্ববাসী বিস্ময়ে অভিভূত হোয়েছিল। শক্তির গর্বে যিনি একদিন সমস্ত দুনিয়াটাকে হেলার চোখে দেখেছিলেন সুদীর্ঘ নির্বাসনের মধ্যে অতি সাধারণভাবে তাঁর জীবনের দীপ নিভে যাওয়াটা দুঃখের হোলেও আশ্চর্যের নয়। ইতিহাসের পাতায় এরকম কাহিনী প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে থাকে। কাজেই সে কথা নিয়ে আক্ষেপ কোরবার কোন কারণই নেই। কিন্তু কাইজারের রাজনৈতিক জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতা দুনিয়ার সমস্ত শাসন-কর্তৃপক্ষকে যে সাবধান-বাণী জানিয়ে দিয়েছিল সেই কথাটাই আজকের দিনের রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমরা আশা করি বর্তমান মহাসমরের রথীবৃন্দ সে কথা স্মরণ রাখ্‌তে চেষ্টা কোরবেন।

বঙ্গীয় অনাথ ও বিধবা আশ্রম নিয়ন্ত্রণ বিল—

বাঙ্গলা আইনসভার কোয়ালিশন দলের সভ্যা বেগম ফরহাৎ বানু হঠাৎ বাঙ্গলার অনাথ ও বিধবা আশ্রমগুলোর জন্য উদ্বিগ্ন হোয়ে উঠেছেন। ওই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা সদ্‌গতি কোরবার জন্য এই মহিলা বাঙ্গলার আইনসভায় একটা বিল এনেছেন। এই বিলে এমন সব বিধান রয়েছে যা নারীসমাজের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই কোরবে বেশী। প্রথমতঃ, বিলের তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে এই সব প্রতিষ্ঠানকে কাজ কোরবার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে হবে। জনহিতকর কাজ কোরবার জন্য যদি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অবলা বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের (বিলে উল্লিখিত কয়েকটী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের ওপর রয়েছে) সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়, তবে এর চেয়ে অসম্মানজনক ব্যবস্থা আর কিছুই হ'তে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, বিলের ৪(গ) ধারায় বলা হয়েছে যে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখতে হবে যে অন্ততঃ দু'বছর প্রতিষ্ঠান চালাবার মত যথেষ্ট অর্থ প্রতিষ্ঠান-কর্তৃপক্ষের হাতে আছে কিনা। এই বিধান চালু হোলে ঐসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই অস্তিত্ব যে বিপন্ন হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তৃতীয়তঃ, নারীরক্ষা সমিতি এবং ওই ধরণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বিলের আওতায় আনা হয়েছে। অনাথ আশ্রম, বিধবা আশ্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ক্ষীণ যুক্তির উত্থাপন করা হোক না কেন, নারী-নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করাই যে-সব সমিতির উদ্দেশ্য তাদের এরকম ভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীন করবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অনাথ আশ্রম ও বিধবা আশ্রমগুলি যাতে সুপরিচালিত হয় তা কে না চায়? কিন্তু আলোচ্য বিলটী আইনে পরিণত হোলে বাঙ্গলায় নারী-কল্যাণমূলক কাজের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা তাই অবিলম্বে বিলের প্রত্যাহার অথবা সন্তোষজনক সংশোধন দাবী করছি।

চা পান—

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যান্‌সন্ বোর্ডের প্রচেষ্টায় চা সম্পর্কে যেসব খবর বের হয় তার মধ্যে কখনো কখনো খুব চিত্তাকর্ষক সংবাদ থাকে যথা:—

যুদ্ধ বর্ত্তমান আকার ধারণ করবার পর রাণী এলিজাবেথ রাজপ্রাসাদের কর্মচারীদের জন্য যে সব বিমান আক্রমণের আশ্রয় তৈরী হোয়েছে তা পরিদর্শন করেন এবং প্রতি জায়গায় তিনি খোঁজ নেন্ যে আর যাই থাক্‌না কেন এই আশ্রয়গুলিতে চা পানের ব্যবস্থা আছে কিনা! ইংরেজের জীবনে চা'র স্থান কোথায় এতেই তা বোঝা যায়—প্রাণ যাক্ তবু যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ চা চাই! আমাদের দেশে ভারতীয় চা'র প্রচলন যে ভাবে বাড়ছে তাতে এদেশেও বিমান আক্রমণের সময় লোকের চা পানের ব্যবস্থার জন্য উদ্‌গ্রীব হওয়া অসম্ভব নয়। অভ্যাস সর্বত্রই সমান।

"বল দেখি, চষ্‌মা নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখা পড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরেজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডুয়িত করিতেছে—তুমি বল দেখি, যে তোমা হতে এই হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই"।——

বঙ্কিমচন্দ্র (বঙ্গদর্শন)

দশম বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৮ { ২য় সংখ্যা

রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির সংঘাত এবং মার্ক্সীজম্

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বংশতত্ত্ববিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদদের তুলনামূলক বিচারে প্রমাণ হয়েছে, যে-সব সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে যাযাবর জাতগুলোর দ্বারা কৃষিজীবী, নিরীহ আদিম জাতগুলোর বিজয়ে ও লুণ্ঠনে—সেই সব সংস্কৃতিতে সমস্তটা সামাজিক কাঠামোই সামাজিক সংঘর্ষ এবং পীড়নের লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং রাষ্ট্রেও দেখা দেয় শ্রেণী-প্রভুত্ব। কিন্তু যেসব সভ্যতা তরবারির মারফতে না হয়ে শান্তিপূর্ণ আদান-প্রদান, সংগ্রহ এবং সঞ্চয়নের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে, সে সব সমাজে কদাচিৎ শ্রেণীসংগ্রাম ও সামাজিক অত্যাচার দেখা যায়। পূর্বোক্ত সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায় শ্রেণী-অত্যাচারের প্রচণ্ড যন্ত্র; কিন্তু শেষোক্ত সমাজে রাষ্ট্র কচিৎ হয় সর্বশক্তিমান্। এই দিক থেকে দেখলে, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রকে বলা চলে এককেন্দ্রিক (monistic) রাষ্ট্র আর এরই বিপরীত হলো ভারতের ও চীনদেশের বহুকেন্দ্রিক (pluralistic) ধরণের রাষ্ট্র; এই বহুকেন্দ্রিয় রাষ্ট্রে বিভিন্ন গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়গুলো রাষ্ট্র থেকে পৃথক ভাবে, ও প্রায়ই স্বাধীন ভাবে কাজ করে থাকে।

একেকেন্দ্রিক ও বহুকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে উৎপত্তিতে, নীতিতে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। একেকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে জবরদস্তি এবং দেশবিজয় থেকে; এর সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে সামরিক প্রথা কিংবা দাসত্ব প্রথাকে ভিত্তি করে। বহুকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে কতকগুলো স্বাতন্ত্র্যশীল, পৃথক কেন্দ্রের (unit) সংযোগ ও সহযোগিতার থেকে। আজকালকার ফিডারেল শাসনতন্ত্রের কোন কোন রূপের মধ্যে এই বহুকেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে দেখা যায়। একেকেন্দ্রিক রাষ্ট্র সম্ভব হয় কেবল শ্রেণীস্বার্থপরতা ও শ্রেণীসংঘর্ষ থাকলেই। বহুকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের আইনকানুন দাঁড়িয়ে আছে 'কর্তব্যমূলক' (duty) ধারণার ওপরে। এই 'কর্তব্যে'র ধারণার তারতম্য করা হয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিশেষে, সামর্থ ও সংঘ-গঠন অনুসারে। একেকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত রাজ্যকে কতকগুলো খণ্ডে বিভাগ করে নিয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে এই স্থানীয় বিভাগ অনুযায়ী বিভক্ত করে দেয়া হয়। বহুকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কিন্তু রাষ্ট্রশক্তিকে বণ্টন করা হয় জাতি কিংবা ব্যবসামূলক গোষ্ঠী অনুসারে। একেকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো ব্যষ্টির ষোল আনা জীবনকেই আয়ত্বে আনা এবং এমন সমস্ত রকমের দলগত বা সংহতিগত প্রচেষ্টাকে নিষ্পেষিত করে ফেলা যার মধ্যে সামান্য মাত্রও প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের লক্ষণ দেখা যায়। বহুকেন্দ্রিক রাষ্ট্র কিন্তু সমাজে বিভিন্ন সংঘ বা গোষ্ঠী বন্ধনকে সমাদর করে নেয়; কেবল তাই নয়, এই সব পৃথক সংঘকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র দান করে এবং রাষ্ট্রের শক্তিকে খর্ব করে আপন ক্ষেত্রকে অতি সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত করে ফেলে।

ভারতে 'গ্রাম্য সমাজে'ই হলো রাষ্ট্রীয় বহুকেন্দ্রিকতার (pluralism) দৃষ্টান্ত। এখানে ব্যবসা-মূলক ক্ষমতাবণ্টন (functionalism) চরমে উঠেছে এবং এর ফলে গ্রাম্য সমাজ এখানে টিকে রয়েছে হাজার হাজার বৎসর। এই গ্রাম্যসমাজে পাই এমন একটা স্বায়ত্বশাসন-মূলক সমাজ-ব্যবস্থা যাতে জাতিগত, শ্রেণীগত ও ধর্মগত সংঘর্ষ লুপ্ত হয়ে গেছে পারস্পরিক সহযোগিতায়; এই সহযোগিতা হল চাষবাস, জলসেচন এবং পঞ্চায়েতী শাসনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা। কিন্তু তাই বলে ভারতীয় গ্রাম্য সমাজ যে বৃহত্তর সমাজে ও রাষ্ট্রে একটা বিচ্ছিন্ন সত্বা, তা' নয়,। কারণ ১৩, ২৪, ২৭, ৪২, ও ৮২টী গ্রামের সংহতি-মূলক স্থানীয় সংঘ-স্বাতন্ত্রের বহু দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে এখনো অস্পষ্ট আকারে বেঁচে রয়েছে। একই ধরণের সভ্যতা-বিশিষ্ট কোনো প্রদেশে একদা স্বদেশী ফিডারেল শাসনতন্ত্র গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা হয়েছিল, এগুলো তারই স্মরণচিহ্ন। তেমনি ভারতবর্ষের ব্যবসামূলক গোষ্ঠী বা বর্ণগুলো (caste) এক অর্থে ছোট আকারে স্থানীয় ফেডারেশান বই আর কিছু নয়; বর্ণগুলো সহজেই ব্যবসাগত সমবায়ে (guilds) দাঁড়িয়ে গেছে। জাত বা বর্ণ-সংক্রান্ত নিয়ম কানুনগুলো করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ হস্ত-শিল্প বা যন্ত্র-শিল্পের স্বার্থে। এমন গিল্ড বা সমবায় আছে যার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতের বা বর্ণের লোক একই পেশা বা ব্যবসার সূত্রে একত্র হয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে 'গিল্ড' জিনিষটী শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থ

ব্যবসার উপরেই নির্ভর করে না। 'গিল্ড' বল্‌তে বোঝা যায় কর্ম ও সংঘর্ষের একটা বিভাগ যার জন্ম হয় সামাজিক জীবনযাত্রার এবং সংস্কৃতির সাদৃশ্য থেকে। কাজেই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে বর্ণগুলোর (castes) সম্পূর্ণ সামাজিক জীবন। কতকগুলো 'গিল্ড' একত্র হয়ে একটা ঘন-সংবদ্ধ (compact) বা শিথিল ধরণের ফেডারেশান গড়ে তোলে; এর মধ্যে একটা বিস্তৃত মুলুকের বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর, শিক্ষানবিশ, মধ্যবর্তী দালাল ও সাধারণ ব্যবসায়ী সবাই রয়েছে এবং সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে এদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। চীনদেশের কারিগর গিল্ড' বহুধা ভারতীয় কারিগর-বর্ণের (caste) মতন হলেও সেখানে ভারতের মত তত জটীল পরিণতি এবং বিস্তৃত সামাজিক স্তরবিন্যাস দেখা দেয় নি। তবু কারিকররা আপন আপন অঞ্চলে বহু ছোট ছোট দল গঠন করে থাকে এবং মাঝে মাঝে একত্র হয়ে গিল্ডের সমস্ত কারিগরের জন্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে থাকে। প্রত্যেক গিল্ডের সভাপতি, সম্পাদক, পরিষদ রয়েছে, যেমন ভারতবর্ষের নাগরিক গিল্ডগুলোর (city guilds) আছে। ভারতেরই মত চীনদেশেও 'বণিক, গিল্ড (merchant's guild) আছে। এই সব বাণিজ্য-গিল্ডের সংহতি এবং ঐক্যের জন্যই চীনদেশের বাজারদরে স্থিতি আছে এবং সমাজে শান্তি আছে। এরা আছে বলেই ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হয়ে উঠতে পারে না; প্রতিদ্বন্দ্বিতা আখেরে সকল অর্থনৈতিক শ্রেণীরই ক্ষতি করে থাকে। ভারতেরই মতন, চীনদেশের গিল্ডগুলির কাজ হল সভ্যদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ মেটানো এবং অন্যান্য গিল্ডের সঙ্গে বিতর্কের সমাধান করে দেওয়া। বহু ভারতীয় গিল্ডের মতন এরাও সুদের হার, পণ্যবিক্রয়ের হার ও হিসাব নিকাশের তারিখ নির্ধারিণ করে দেয় এবং সাধারণভাবে দশজনের উন্নতি ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ব্যবস্থা করে থাকে। বিশপ্ ব্যাশ্ ফোর্ড (Bashford) চীনদেশের গিল্ড সম্বন্ধে যা' বলেছেন তা' ভারতীয় গিল্ডের বেলায়ও প্রযোজ্য হতে পারে। তাঁর মতে গিল্ডের মারফতে ব্যবসা-বাণিজ্যের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ হওয়াতেই চীনা-সভ্যতা এতখানি গণতান্ত্রিক হতে পেরেছে।

প্রাচ্যদেশে কেবল আধুনিক সহরগুলোতেই একটা প্রবল ও ধনশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে পেরেছে, কারণ সহরেই হস্ত শিল্পগুলির সবিশেষ সম্পাদনা থেকে কারখানা প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। জাপানে অবশ্য পশ্চিম থেকে পাওয়া যন্ত্র শিল্প ব্যবস্থা ও নতুন কেন্দ্রীকরণ পুরোণো সমাজবন্ধনকে শিথিল করে ফেলেছে। কিন্তু ভারতে ও চীনদেশে স্বয়ং-শাসিত গ্রামগুলোতে এবং বাণিজ্যগিল্ড ও শিল্পগিল্ডে,—সর্বত্রই সমাজ শাসনের প্রথা ও অভ্যাস এখনো অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের প্রবল শক্তি হিসেবে বেঁচে রয়েছে। গত দু'এক দশকের মধ্যে ভারতের কো-অপারেটীভ আন্দোলনের এবং চীনদেশের বাণিজ্য গিল্ডগুলির অপূর্ব সাফল্যই পুরোণো সমষ্টিশাসন ও সমাজবোধের প্রমাণ দেয়। পশ্চিম দেশে সংঘব্যবস্থাটা সিন্ডিক্যালিজম্, গিল্ড্ সোস্যালিজ্‌ম্ বা সোভিয়েটতন্ত্রের রূপ নেয়। কিন্তু ভারতে এর প্রকাশ হয় এক ধরণের

দেশগত (regional) সংঘবন্ধনের এবং শ্রেণীবিভাগের আকারে,—যার উৎপত্তি অর্থনৈতিক কারণে মোটেই নয়। যে সব সংঘগুলি, এক সামাজিক স্তরের অন্তর্গত বা একই অঞ্চলে প্রতিবাসী, কিংবা একই ব্যবসা বা স্বার্থসূত্রে গ্রথিত,—সেই সমস্ত সংঘগুলি কার্যতঃ একটা স্বয়ংশাসিত বৃহত্তর সংঘে দানা বেঁধে ওঠে, এবং এইসব বৃহত্তর সংঘগুলি আবার একটা আরো বৃহত্তর শিথিল ফেডারেলতন্ত্রে রূপায়িত হয়ে ওঠে। এই ফেডারেলতন্ত্রের কেন্দ্রীয় শক্তিটাকে 'রাষ্ট্র' বলা চলে না; এ একটা সুবিধাজনক ব্যবস্থামাত্র। *

ফ্রান্‌ৎস্ ওপেনহাইমার (Franz oppenheimer) তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে বলেছেন যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এক জাতির দ্বারা অপর জাতির দমনে এবং বিজয়ে। সামন্তী য়ুরোপের (Feudal) রাজ্যবিজয় ও বৈদেশিক জনপ্রবাহের (migration) বিভিন্ন যুগে যে প্রকাশ্য বল-প্রয়োগ এবং চাষীদের অধিকারে যে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ হয়েছে তার উল্লেখ তিনি বিশেষ করে করেছেন। পঞ্চম শতকে মধ্য য়ুরোপে রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়, কারণ হুণ অভ্যাগমের (migration) কালেই বিভিন্ন জাতি (tribes) গুলি একত্র হয়ে বৃহত্তর সমষ্টি, গঠিত হয়েছিল। হুণদের ভয়ই এদের একত্র করেছিল এবং অসদৃশ লোকগুলোকে এই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এক ভূমিতে সম্মিলিত করেছিল। রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিকশিত হয়ে উঠলো যাকে ওপেন-হাইমার বলেছেন "The Feudal area" বা সামন্তী দেশ। এই সামন্তী রাজ্যের বৈশিষ্ট্য হলো দুটী (১) প্রথমতঃ, রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে শ্রেণীবিভাগ (class differentiation) দেখা দিল (২) দ্বিতীয়তঃ, সামন্ত রাজাদের দ্বারা জমির একচেটীয়া সত্বদখলের প্রথার প্রবর্তন হল। এই সব বিরাট 'দখলস্বত্বী জমিদারী' গুলি (demesne estates) পাশাপাশি বিস্তীর্ণ জমিকে গ্রাস করে এমন একটা একচেটীয়া অধিকারের সৃষ্টি করল যার ফলে প্রাকৃতিক উৎপাদনের উপায়, জমিতে চাষীদের কোনই সত্ব রইলো না। এমন কি যখন বৈদেশিক আক্রমণের বিপদ পরে কেটে গেল তখনই এই নবজাত সমাজ ব্যবস্থায় কায়েম হয়ে রইল একটা কেন্দ্রীয় শক্তি (authority), এবং অন্যান্য নানা সামরিক ও সামন্তী প্রতিষ্ঠান ও প্রথা যার ফলে কিষাণ সমাজের সমস্ত অধিকার ও সুবিধাগুলি একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। জার্মানীর স্বাধীন চাষীরা অন্ততঃ তিনবার এই ধরণের লুণ্ঠনের ফলে সম্পত্তিহারা হয়েছে এবং তাদের শ্রেণী বৈশিষ্টকে হারাতে বাধ্য হয়েছে। একবার এই জমি লুণ্ঠন হয়েছে কেল্টদের যুগে। দ্বিতীয়বার হয়েছে ৯ম ও ১০ম শতকে। তৃতীয়বার এই মর্মান্তিক ঘটনা আরম্ভ হয়েছে ১৫শ শতকে সেইসব প্রদেশগুলিতে যেগুলিকে তারাই স্লাভদের কাছ থেকে জয় করে দখল করেছিল। যেসব স্থানে সার্বভৌম কোন রাজশক্তি ছিল না, ছিল

* The Glasgow Herald, reviewing "Democracies of the East".

† "The state: Its history and development reviewed sociologically" by Oppenheimer.

[ক]েবল 'সামন্ত রাজাদের গণতন্ত্র (republics of nobles'), সেইসব স্থানে চাষীদের দুর্গতি হয়েছে [অ]নেক বেশী। ইংলণ্ডে এবং ফরাসী দেশে পূর্বকার টিউটন্ গ্রাম্যসমাজ লুপ্ত হয়ে তার স্থানে [এ]লো মধ্যযুগীয় manor বা জমিদারি। এটী ঘট্‌লো নর্ম্যান বিজয় বা ফ্র্যাঙ্ক্ বিজয় থেকে। [ইং]লণ্ডে ব্যারণদের প্রতি ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়ে রাজা তাঁর জজদের সহায়তায় সাধারণ লোকের [অ]ধিকারকে সাবধানে রক্ষা করে চলতেন। যতদিন তাদের নির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্য পালন করত [ত]তদিন সাধারণ লোক, স্বাধীনই হৌক, দাসই হৌক,—কেবল সংরক্ষিত নিজ জমিটুকুই নয়, পতিত [জ]মি বা খোলা জমিও, উপভোগ করতে পারত। প্রথম দিকে রাজার সম্পত্তি-সত্বের সঙ্গে তাঁর [সা]র্বভৌম সত্বের কোন পার্থক্য ছিল না; কিন্তু ধীরে ধীরে জমির মালিকানা সত্ব সার্বভৌম [স]ত্ব থেকে আলাদা হয়ে গেলো। রাজাকে সামরিক সেবাদানের দায়িত্বটী তাঁকে অর্থ দ্বারা কর [প্র]দানের বাধ্যবাধকতায় পরিণত হওয়ায়ই এই পরিবর্তনটী ঘট্‌ল। সামন্তদের অধীনস্থ লোকবলের [প]রিবর্তে রাজা গঠন করলেন তাঁর স্বকীয় সৈন্যদল। এতে তার সার্বভৌম শক্তি যেমন অসন্দিগ্ধ [হ]ল তেমনি প্রজাদের জমিতে অধিকারও হল অকাট্য। তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা অবাধ হল। [র]াজা দ্বিতীয় হেনরী যে মফঃস্বলে তার জজদের (Circuit Judges) পাঠিয়ে কোর্ট করাতেন, [ত]াতেই ইংলণ্ডে "কমন্ ল" (Common law) নামক আইন ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন হয়।* স্বাধীন [জ]নসাধারণদের (Freemen) ময়দান ব্যবহারের অধিকার ছিল কিন্তু ইংলণ্ডে বড় জমিদারদের প্রাধান্য হওয়ার পরে এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। রুশিয়াতে ভূমি দাসদের (Emancipation) [ব]ন্ধন মুক্তির যে ফল হয়েছিল ইংলণ্ডে "ঘেরনী আইন" (Enclosure Acts) গুলোরও সেই ফল [হ]য়েছিল। অর্থাৎ, এর ফলে জমিদারই হয়ে দাঁড়াল জমির প্রকৃত মালিক, যে জমিতে ছিল এতদিন [জ]মিদারের সঙ্গে সঙ্গে প্রজারও সমান অধিকার।

সামন্ত ভূখণ্ডের মধ্যে শহরগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব [হ]লো "তৃতীয় রাষ্ট্র-পর্যায়ের" (Third Estate) বা জন-সাধারণের। কিন্তু এই নতুন শক্তিকে [প]দে পদে বাধা দিতে লাগলো প্রচলিত মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা এবং ফলে এই ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর [বি]রুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হলো এই "তৃতীয় পর্যায়ের" বা নব-জাগ্রত সাধারণের। ইংলণ্ডের ১৬৪৯ সনের বিপ্লবে, ১৭৮৯ সনের ফরাসী বিপ্লবে, ১৮৪৮ সনের জার্মাণ বিপ্লবে এবং ১৯০৫ সনের [রু]শ বিপ্লবে,—এই নতুন শক্তির জয় হলো। এর ফলে মধ্যযুগীয় ছুটো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা [চ]ে‌গল অর্থাৎ সমাজে পদ-বৈষম্য এবং শ্রেণী-তারতম্য লুপ্ত হল। কিন্তু দ্বিতীয়টী, অর্থাৎ জমিদারদের [জ]মিতে একচেটীয়া সত্ব, থেকেই গেল। এই জমিদারির মধ্যেই আছে ধনতন্ত্রের বীজ। নাইট্-রা ও সামন্তী যোদ্ধারাই হয়ে দাঁড়ায় আধুনিক কৃষি-ক্যাপিট্যালিষ্ট্। (agrarian capitatist) *

* Commons, Legal foundations of Capitalism.

কৃষি-ক্যাপিট্যালিজম্-ই য়ুরোপে সমাজ-বিপ্লবের সূচনা করেছে এবং এর থেকে যে সূচনা হয় তাকেই পরে শিল্প-বাণিজ্যিক ক্যাপিট্যালিজম্ সম্পূর্ণ করেছিল।

ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে শ্রম-করের পরিবর্তে অর্থ-করের প্রবর্তন হওয়ায় চাষীর পরামোচন (emancipation) ঘটে এবং অনেক ভূমিদাস পালিয়েও মুক্তি অর্জন করে। ফরাসী বিপ্লব থেকেই সামন্তী সত্বগুলো লুপ্ত হয় এবং ফরাসীদেশে ক্ষুদ্র মালিকানা (petty proprietorship) সৃষ্টি হয়। কিন্তু য়ুরোপ জুড়ে বৃহৎ জায়গীরেরই ছড়াছড়ি রয়ে গেল এবং ক্ষুদ্র মালিকানা সম্পত্তি (small [illegible]) অতি বিরল থেকে গেল। কেউ বলছেন, এইসব মধ্যযুগীয় manor বা জায়গীর রোমীয় প্রথা। কেউ বলছেন এরা টিউটনী ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ। যুদ্ধ ও বহির্বিজয় থেকে যে সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার থেকেই যে এইসব জায়গীর প্রথার জন্ম হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। গ্রামে থেকে এই সব জমিহীন সর্বহারা দল সহরে এলো দলে দলে কিন্তু এসে দেখলো এখানে উৎপাদনের যন্ত্র ও কলকারখানাগুলো সব দখল করেছে [illegible]।

ভারতবর্ষ ও চীনদেশে কিন্তু চাষীর মালিকানা যুগ যুগ ধরে অব্যাহতই রয়েছে। এখানে গ্রাম্যসমাজের স্থাপয়িতা হলো প্রধানতঃ কৃষিজীবি জাতগুলো। কাজেই বড়ো জমিদার ও অপরদের মধ্যে পার্থক্য তীব্র হয়ে ওঠেনি। গ্রামের মালিক হলো চাষী পরিবারগুলো। ভারতে সামরিক, সামন্তী কিংবা স্বয়ংশাসিত বহুকেন্দ্রিক (pluralistic) ধরণের সমাজ কেবল যে অর্থনৈতিক ও সম্পত্তিগত সম্বন্ধগুলিকেই নিয়ন্ত্রণ করত তা নয়; সহরের শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থাকেও পরিচালনা করত। য়ুরোপে বিশেষতঃ জার্মাণ সহরগুলোতে গিল্ডের ইতিহাস শ্রেণীসংঘর্ষে কণ্টকিত হয়ে আছে। গিল্ডের সঙ্গে গিল্ডের সংঘর্ষ, গিল্ডের মধ্যেই ওস্তাদ কারিগরদের সঙ্গে মামুলী কারিগরদের (journeymen) সংঘর্ষ, কারিগর-গিল্ডের সঙ্গে বণিক-গিল্ডের সংঘর্ষ, এই ত্রিধারা সংঘর্ষের বিরাম ছিল না। কিন্তু ভারতে সমাজ গঠনটা সামন্তী প্যাটার্ণে হয়নি বলে গিল্ডের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে মিশ্রণ এবং আদান প্রদান যাতে প্রত্যেক সংঘ পেয়েছে তার স্বকীয় অধিকার এবং উপভোগ-সত্ব। স্মরণাতীত কালের প্রথা ও ইতিহাসের দ্বারা এরা সুরক্ষিত হওয়ায় আইনের শক্তিও এদের পেছনে ছিল ভারতীয় গিল্ডে বিত্তহারা শ্রমজীবিরা কখনো বহিষ্কৃত হয়নি এবং এদের পূর্ণ সভ্যরূপে গৃহীত হওয়ার দরুণ ভর্তা ও ভৃত্যের পার্থক্য প্রবল হয়ে ঈর্ষা ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রাচ্যদেশে গিল্ড-বিধানগুলো খুব কড়া হতে পারেনি, নিষেধ ও শাসনও খুব নির্মম হতে পারেনি। বরং কারিগর ও শ্রমিকদের একটা মর্যাদা ছিল এবং সহরের বা পল্লীর শাসনেও তাদের একটা অধিকার ছিল; এরা সভাসমিতিতে যোগ দিত; স্কুল, ভিক্ষাগৃহ, মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনার অংশ নিত। এই সব গিল্ডের দরুণই ভারতে 'ব্যবসা-মূলক গণতন্ত্র' (functional democracy) জোর ধরেছিল।

যাযাবর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিম য়ুরোপের এই এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রগঠন রাজনৈতিক সংগ্রামকে শ্রেণীসংগ্রামে পরিণত করেছে এবং শ্রেণীসংগ্রামকেও রাজনৈতিক সংঘর্ষে দাঁড় করিয়েছে। পরন্তু য়ুরোপে সম্পত্তিগত সম্বন্ধগুলিকে ও সামাজিক শ্রেণীগুলিকে পরস্পর বিরোধী করে গড়ে তোলা হয়েছে; সামন্তী সর্দার এবং ভূমিদাস, ভর্তা এবং শ্রমজীবি,—এরা যেন চিরন্তন শত্রুতায় মুখোমুখী হয়েই আছে। য়ুরোপীয় গিল্ডের ইতিহাসে যে তীব্র ঈর্ষা ও সংঘর্ষ দেখতে পাই তা' সমাজে এমন গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে যে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজও এই সংঘর্ষ ও বিদ্বেষদ্বারা প্রভাবিত। ম্যানহাইম্ (Mannheim) অভিযোগ করছেন যে আধুনিক য়ুরোপীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যই হলো বলপ্রয়োগ (coercion)। এর কারণ হলো, তাঁর মতে, এই যে বর্তমান য়ুরোপীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে অতীতে যুদ্ধজয় এবং পশুশক্তির ওপরে।

এই দৃষ্টি-কোণ থেকে য়ুরোপীয় সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশকে বিশ্ব-ইতিহাসেরই একটা আংশিক ধারা হিসেবে দেখলে একথা কিছুতেই বলা চলে না যে শ্রেণী-সংঘর্ষ আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অনিবার্য কারণ এবং মূলসূত্র। এমন কি মার্ক্স ও সমাজের একটা অন্তিম বিরামস্থান পরিকল্পনা করেছেন যেখানে শ্রেণীও থাক্‌বে না, শ্রেণী-সংঘর্ষও থাক্‌বে না, এবং সমাজ বিবর্তন যেখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হবে না। এটা অতি স্পষ্ট যে সামাজিক সংঘগুলো (group) অর্থনৈতিক ব্যতীত অন্যান্য আকাঙ্খা ও অভ্যাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে পারে এবং হয়েও থাকে। রাজনৈতিক পরিধির বাইরে দিয়েও সমাজ-বিবর্তন প্রবাহিত হয়ে চলতে পারে। অন্ততঃ, ভারতবর্ষ ও চীনদেশের রাষ্ট্রীয় বহুকেন্দ্রিকতা (pluralism) ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের আলোচনা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়।

মার্ক্সবাদ জগৎকে দেখেছে শ্রেণীচেতনার রঙ্গীন চশমা দিয়ে। কেবল তাই নয়; যে গুরুতর প্রশ্নটার অন্তকার বাস্তববাদী সামাজিক মনস্তত্ত্ববিদকে জবাব দিতেই হবে তার কোনই সমাধান মার্ক্স করেননি। অর্থাৎ একটা শ্রেণীর এবং সমাজের বিবর্তন-তত্ত্ব এবং পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, এই দুইয়ের মধ্যে একটা কার্যকরি সম্পর্ক (functional relation) কি করে স্থাপন করা যায়, সে সম্বন্ধে মার্ক্সবাদের কোন সমাধান নেই।

শ্রেণী সক্রিয় হতে পারে আর্থিক সংগ্রামের একটা সামাজিক আবর্তের মধ্যে। একটী সমগ্র 'নাগরিক সমাজে' (civil society), একটা সমগ্র অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, শ্রেণী সক্রিয় হতে পারে না, এমন কি বেঁচেও থাকতে পারে না। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষের সঙ্গতিস্থাপনের (adaptation) একটা খণ্ড অধ্যায় হল শ্রেণী। সমস্ত মানব সমাজের পক্ষেই শ্রেণীবিভাগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে (scheme) সংঘর্ষ এবং বিরুদ্ধতার বাস্তব ভিত্তি বলে মেনে নেওয়া চলে না। প্রকৃত পক্ষে বেবার (weber) এবং স্মোলের (schmoller)

প্রমাণ করেছেন যে, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক য়ুরোপে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মানদণ্ডটী যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক পশ্চিম য়ুরোপীয় সমাজের দুটো স্তম্ভ হলো, একদিকে, সমষ্টি-আত্মার সাধারণ প্রতিরূপ রাষ্ট্র, এবং অন্যদিকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যষ্টির প্রচেষ্টা। এরা উভয়েই এযুগে সামাজিক শান্তি ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হয়েছে। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত প্রগতি, প্রচেষ্টা ও প্রকর্ষের মূলে, আজ তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিয়েছে শ্রেণীচেতনা, তার চরম শত্রু। শ্রেণীচেতনা আজ অর্থনৈতিক জীবনকে গড়ে তুলতে চায় ব্যষ্টি-প্রচেষ্টার সমাধির ওপরে; রাষ্ট্রের ও শিল্পের বিরাট যন্ত্রকে দখল করে সমাজকে গঠন করতে চায় সমগ্র সমাজের স্বার্থে নয়, কেবল শ্রমিকদের স্বার্থে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং শ্রেণীপরিকল্পনা (class planning), এই দুয়ের সংঘর্ষে হয় শতাব্দীব্যাপী উদারনীতি ও সামাজিক গণরূপায়নের (democratisation) সমস্ত সুফল মুছে যাবে; নয় তো সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তার সুবিধা নিয়ে ডিক্টেটর-তন্ত্রের উদ্ভব হবে।

ব্যষ্টিপ্রচেষ্টা এবং রাষ্ট্রশক্তি, এই দুয়ের সংঘর্ষের ভিত্তিতেই য়ুরোপীয় কৃষ্টি গড়ে উঠেছে। এদের দুয়ের সামঞ্জস্য আজ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে; এ সামঞ্জস্য হবে কোন শ্রেণীর স্বার্থ পরিকল্পনার জন্য নয়, এ আনবে সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের যুক্তিসঙ্গত ও ক্রমবর্ধমান অধিকার ও উপভোগ। মনে হয় মানব সভ্যতার সকল ঐশ্বর্যে বর্তমান সংকটের একমাত্র সমাধান হবে এমন একটা সমষ্টিগত সমাজ-ব্যবস্থায় যা' শ্রেণীসংঘর্ষ ও সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে আস্‌বেনা, যা আস্‌বে বি-কেন্দ্রীকরণ (decentralisation) ও শক্তিবণ্টনের (devolution) মধ্যদিয়ে। ব্যবসামূলক গোষ্ঠী ও মৈত্রীসংঘ, কোঅপারেটীভ সমিতি ইত্যাদি হলো ব্যক্তি এবং বৃহৎ সমাজের মধ্যে সংযোগবিন্দু এবং স্বায়ত্বশাসনের বীজ। এরা শ্রেণীজর্জর সমাজের উদগ্রতাকে মোলায়েম করে লোকসেবা ও গণসংহতির এক নূতন নীতিশাস্ত্রের প্রবর্তন করতে পারে। গিল্ড সোস্যালিজ্‌ম্, সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্, যন্ত্রশিল্পে সহযোগিতা, কোঅপারেটীভ প্রথা ইত্যাদি সমাজ ও শিল্পকে সমগ্ররূপে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা বই কিছু নয়। এদেরই কাছাকাছি হলো সমাজ-নীতিতে প্রান্তিকতা (regionalism), ব্যবসাপরত্ব (functionalism) এবং রাষ্ট্রীয় বহু-কেন্দ্রিকতা (pluralism)। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের-থিওরীকে সংশোধন করে আবির্ভূত হয়েছে প্রান্তিক স্বায়ত্বশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বয়ংশাসিত কারখানায় শ্রমমর্যাদা ইত্যাদি। একথা স্বীকৃত হচ্চে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশাসন ও স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শিল্পনিয়ন্ত্রণ এক সঙ্গে থাকতে পারে না। আধুনিক সমাজ পরিকল্পনার গতি হ'ল বুরোক্র্যাসীকে উৎখাত করে শিল্পগুলিকে ভেঙ্গে কতকগুলো খণ্ড খণ্ড স্থানীয় কেন্দ্র থেকে পরিচালনার দিকে। স্বয়ংশাসিত শিল্পে, কারখানায়, গিল্ডের ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে পৃথক স্বার্থগুলোকে সামঞ্জস্য আনা সহজতর হবে। যত বেশী বি-কেন্দ্রীকরণ হবে, তত বেশী হবে নেতৃত্ব ও দায়িত্ব শিক্ষা দিবার সুযোগ। এই রূপেই বিরুদ্ধ-স্বার্থ শ্রেণীগুলোকে পরিণত করা যাবে কতকগুলো সাংস্কৃতিক সংঘে (cultural

group) এবং এখানে মর্যাদাভেদ হবে সম্পত্তি, পদ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পার্থক্য দিয়ে নয়, অন্য মানদণ্ড দিয়ে। যে রাষ্ট্র পশুশক্তি ও দস্যুবৃত্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে তারই নেতৃত্বে গণসমাজ থাক্‌বে না। নতুন রাষ্ট্র হবে নৈতিকতা ও সামাজিকতার যন্ত্র। প্রাচ্যদেশেও সমাজ পরিকল্পনা হবে দেশীয় সংঘগুলোর সংগঠন ও বিস্তৃতির পথ দিয়ে; গ্রাম্যসমাজ, বর্ণ, বাণিজ্য-সমবায়, হস্তশিল্প গিল্ড, ব্যবসা ইত্যাদি হবে নতুন সমাজের ভিত্তি। পুরাকালে এদের স্থিতিস্থাপকতা যথেষ্ট দেখা গেছে। আধুনিক কালের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও জাতীয়তার সঙ্গে এরা সামঞ্জস্য রেখে প্রগতিকে সাহায্য করবে এ আশা করা অন্যায় নয়। য়ুরোপে দেখা দেবে সমষ্টিতন্ত্রের (communalism) নব নব রূপ; যাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে খর্ব করা হবে না, অথচ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামাজিক শক্তি ও প্রকর্ষকেও বাড়িয়ে তুল্‌বে। তখন শ্রেণীচেতনা কর্ম ও শক্তির প্রেরণা হবে না। নতুন সমাজবোধ সমাজে ছড়িয়ে পড়বে এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে নবরূপে গড়ে তুল্‌বে।

"তবুও একাকী উতরিতে হবে—"

বিনয়েন্দ্র নাথ রায়

আজি, দুর্যোগ ঘন তমসার বুকে শিহরে ধরণী ত্রাসে,
চরাচর আজ একাকার করে প্রলয় ছাপিয়া আসে।
দিগে দিগন্তে লাগে আলোড়ন—শিহরণ জাগে প্রাণে ;
ক্রুদ্ধ বাতাস ফণিণীর মতো বাতায়নে মাথা হানে।
রুষিয়া রুষিয়া গরজি উঠিছে মহা প্রলয়ের ভেরী ;
সৃষ্টি-বিলয় ধ্বসিয়া পড়িবে নাই ওরে নাই দেরী!
সুচির অন্ধকারে—
কে পথিক আজ পথহারাদের ডাকিতেছে বারে বারে ?
অকালে আজিকে কাল বোশেখীর তাণ্ডব হ'ল সুরু ;
দিক্-বালাদের বক্ষ কি তাই কেঁপে ওঠে গুরু গুরু ?
দিগন্তরের পুঞ্জিত মেঘ রুষিয়া উঠিল ফুলে
ভীতি-বিহ্বলা দিগঙ্গনার মেখলা পড়িল খুলে!
ঘরে ঘরে আজ রুদ্ধ দুয়ার—মরণ-ভীতুর দল
সন্ত্রাসে বুকে চাপিয়া মারিছে জীবনের কোলাহল।
বৃথাই তাদের আশা—
বধির কর্ণে পশেনি প্রলয়-রাগিনী-সর্বনাশা।
মাটির মানুষ মাটিরে আঁকড়ি' মৃত্যুরে লবে বরি :
জীবন-উৎস শুষ্ক তাদের অচল জীবন-তরী।
তাদের মিছেই ডাকা—
পাথেয় যাদের ফুরিয়ে গিয়েছে—জীবন যাদের ফাঁকা।
হে মোর পথিক! জানি দুর্গম দুস্তর তব পথ ;
তবুও একাকী উতরিতে হবে হাঁকিয়া প্রলয়-রথ।
অন্ধকারের বক্ষে জ্বালিয়া জীবনের বর্তিকা—
লিখিতে হইবে বুকের রক্তে বিজুরী-অগ্নি-লিখা।
মাটির মানুষ চমকি' উঠিবে নয়ন-ধাঁধানো রূপে ;
ঝলসি উঠিবে অনল-কিরণ অন্ধকারের স্তূপে।
সেই রক্তের লিখা—
তোমার ললাটে পড়াবে বন্ধু! জয়-গৌরব-টীকা।

রুদ্ধ কপাট

আশাপূর্ণা দেবী

যে ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া, সুদীর্ঘকালের সৌহার্দবদ্ধ দুইটী পরিবারের বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল, সেটা এমনি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। উপলক্ষ্যটা নিতান্তই উপ-লক্ষ্য।

'খেলিতে চাহিলে যে কাণাকড়ি লইয়াও খেলা অসম্ভব নয়' এই পুরাতন প্রবাদটীকে হল্‌দেবাড়ীর বড়গিন্নি এমন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়া দিলেন যে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

লালবাড়ী প্রথমটা অপ্রতিভ হইলেন, তাহার পর অবাক হইলেন, অবশেষে হাল ধরিলেন। অতঃপর স্তব্ধ-মধ্যাহ্নের নিঃশব্দ শান্তি বিদীর্ণ করিয়া, চিরদিনের মধুবর্ষি কণ্ঠ হইতে যে তীব্র বিষ উদ্‌গীরণ হইয়া গেল তাহা যেমনি আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত।

সম্বন্ধ-বন্ধনহীন দুই পরিবারের মধ্যে অনেক দিনের আসায় যাওয়ায়, আদানে প্রদানে বিপদে সম্পদে, হাসি কান্নায় গড়া প্রীতির সম্বন্ধটী এই রূঢ় আঘাতে ভূমিসাৎ হইয়া গেল!...

এবং ইহারই পর লাল ও হলদে বাড়ীর সংযোগ সেতু খোলা জানালা দুটী যেন পুনর্মিলনের সমস্ত সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করিয়া দিতেই, আঠারো বৎসর পরে আজ প্রথম কপাট রুদ্ধ করিয়া দিল।...

ইহার পর রুদ্ধ কপাটের কঠিন দেয়ালে কেহ মাথা খুঁড়িয়া মরিতে চায় মরুক্, সে দায়িত্ব তাহার নয়!

হল্‌দে বাড়ীর বড়-জা ছোট-জাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—আচ্ছা করে 'কড়কে' দিয়েছি। এইবার যদি আদিখ্যেতা ঘোচে। চব্বিশ ঘণ্টা—'কাঞ্চন কাঞ্চন কাঞ্চন।'—'কাঞ্চনকে একবার আসতে বলবেন তো মাসীমা—কাঞ্চনকে একবার পাঠিয়ে দেবেন তো মাসীমা—কাঞ্চন একবার শুনে যাও তো ভাই—' ভেঙচানির সুরে জ্যোতির্ময়ীর নকল করিয়া—নিজস্ব ভঙিমায় মুখ বাঁকাইয়া কাঞ্চনের হিতৈষিণী জেঠতাত পত্নী কহেন—কাঞ্চন যেন ওঁর খানাবাড়ীর খানসামা। ধিঙ্গি এক মেয়ে পুষে রেখেছেন—বিয়ে দেবার নাম নেই। ভয় আছে? না লজ্জা আছে? মুখে আসে আসে আর চুপ করে থাকি—আচ্ছা করে টিট্ করে দিয়েছি আজকে। আরো বোধহয় কিছু বলতেন তিনি, শুধু ছোট গিন্নির—অর্থাৎ কাঞ্চনের মার, মৌখিক উৎসাহের অভাবে একটু থামিয়া যান। তিনি থামিলে ও 'দোয়ার' দিবার লোক ছিল; কাঞ্চনের বড়দি, যিনি সম্প্রতি শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছেন, এবং আসিয়া পর্যন্ত লালবাড়ীর বিরুদ্ধে হলদে বাড়ীর ধূমায়িত ক্ষীণ অসন্তোষকে অনুকূল বাতাসের সাহায্যে জ্বলিয়া উঠিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছিলেন, তিনিই কহিলেন—তোমরা যে এতদিন এসব সহ্য করে আসছো এই আশ্চয্যি। তোমায় এই বলে রাখছি মা, সময় থাকতে যাই প্রতিকার হ'ল তাই রক্ষে, নইলে শেষ অবধি একটা কেলেঙ্কারী না ঘটে ছাড়তোনা। 'নাত্তি' ছুঁড়ি কি কম বেহায়া! অতবড় মেয়ে—দিন রাত্তির আসছেন কাঞ্চনদার

—আর তুই চাইলি—ক্যাংলার মতন ?

—কই চাইলাম ? কক্ষনো না। বললে যে—আয় বাবলু বল খেলি—খেলে তা' পর বললে—তোর জন্যেই কিনেছি ওটা, নিয়ে যা।

খোকা অবশ্য ইহার মধ্যে অযৌক্তিক বা অপরাধজনক কিছু খুঁজিয়া পায় নাই, তাহার খেলনার ভাঁড়ার তল্লাস করিলে কাঞ্চনদা প্রদত্ত উপহারের অভাব নাই।

কিন্তু, তাই বলিয়া—এখন তো আর জ্যোতির্ময়ী সেটা বরদাস্ত করিতে পারেন না ? তাই বীর বিক্রমে ছেলের কাছ হইতে বামাল কাড়িয়া লইতে অগ্রসর হ'ন।

দালানের ওদিকে বসিয়া নমিতা এতক্ষণ সুপারি কুচাইতেছিল, কথা কহে নাই এবার মুখ তুলিয়া কহিল—কি ছেলেমানুষী হচ্ছে বৌদি ?

—ছেলেমানুষী আবার কি ? ও বল আমি ফেরৎ দেব। চুকে বুকে তো গেছে সব, আবার আমার ছেলেকে খেলনা দিতে আসা কেন ?

—আমি-ই বলেছিলাম দিতে।

—তার মানে ? কখন তুই বললি মুখপুড়ি ? জ্যোতির্ময়ী যেন ক্ষেপিয়া যান, তা' হলে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখাশোনা চলছে ?

—আঃ কি করো বাবলুর সামনে ? লুকিয়ে আবার কি ? রাস্তাদিয়ে যাচ্ছিল—বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে বললাম—কাঞ্চনদা, খোকার বলটা তোমাদের উঠোনে পড়ে আছে, দিয়ে দিও। ক'দিন ছেলেটা মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছিল—নতুন একটা কিনেই দিয়েছে দেখছি, বাড়ী থেকে নিতে সাহস হয়নি বোধ হয়। অল্প হাসিয়া চুপ করে নমিতা।

হাসির ভঙ্গী দেখিয়া জ্যোতির্ময়ী আরো জ্বলিয়া যান, বলেন—হবেই বা কেন ? তোমার মতন তো দুর্ধর্ষ পাহাড়ে সবাই নয় ? ডেকে কথা কইতে তোর লজ্জা হ'লনা রাক্ষুসী ?

পেটের মেয়ে নয়, ননদিনী, তাও স্বামীর সহোদরা বোন নয়, বৈমাত্রেয়, এতে শাসন করিবার সাহস বা অধিকার জ্যোতির্ময়ীর থাকার কথা নয়, কিন্তু অধিকার যে—কখন কোন সূত্রে জন্মায়, সাদা চোখে সে হিসাব মেলানো কঠিন।

নমিতা রাগ করে না, তেমনি প্রায় হাসিমাখা মুখে উত্তর করে—লজ্জা করবার কি আছে ? আমি তো কারুর সঙ্গে কোঁদল করে আসিনি।

—আর আমিই বুঝি পাড়া বয়ে কোঁদল করে আসি—না ? বড্ড তোর বাড় বেড়েছে নাস্তি, রোস্ আজ আসুক তোর দাদা, এর একটা বিহিত করে তবে ছাড়বো।

—কি করবে আমায় ? হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতবে ?

—যদিই তাই পুঁতি—মানসিক উত্তেজনার ভারেই বোধকরি জ্যোতির্ময়ী ধপাস করিয়া বসিয়া পড়েন দাঁড়াইতে পারেন না। নমিতা উঠিয়া নিঃশব্দে একখানা হাতপাখা আনিয়া হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া আবার সুপারি লইয়া বসে।

বাতাস খাইবার প্রয়োজনই বোধকরি ঘটিয়াছিল জ্যোতির্ময়ীর তাই সেখানা তুলিয়া লইতে বিলম্ব করেন না এবং নাড়িতে নাড়িতে ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন—সৎতো ননদ, ভারীতো টানের জিনিস, তার জন্যে আবার ভাবনা! আমার ও যেমন মরণ নেই। এইমাসের মধ্যেই যদি না তোকে বিদেয় করি তো কি বলেছি। কালো, কুচ্ছিত, মূখ্যু গরীব কিছু বাছবনা, যাকে পাই তা'কেই ধরে দেব।

কাটা সুপারি ক'টা নিবিষ্টচিত্তে একটা বোতোলে ঢালিতে ঢালিতে নমিতা কৃত্রিম গম্ভীর মুখে বলে—

—তার চেয়ে বরং সেকালের মহারাণীদের মতন প্রতিজ্ঞা করো বৌদি, কাল সকালে উঠে যার মুখ দেখবো—তার হাতেই—

—ফের তুই আমার সঙ্গে ইয়ারকি কচ্ছিস নাস্তি? আমি তোর ইয়ারকির যুগ্যি?

—বৌদি দু'টো সুপুরি খাও না ভাই।

বোতোলটা জ্যোতির্ময়ীর সামনে বসাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইয়া যায় নমিতা।

*　　*　　*　　*

জ্যোতির্ময়ী মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করেন নাই; স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া সোরগোল তুলিয়া নমিতার বিবাহের ব্যবস্থা পাকা করিয়া তোলেন তিনি।

এতব্যস্ত হইবার হেতু অবশ্য, সত্যই নমিতাকে শাস্তি দেওয়া নয়, কতকটা বরং ওবাড়ীকে টেক্কা দেওয়া। বাক্যালাপ না থাক্ তবু ওবাড়ীর আসন্ন বিবাহের বার্তা এ বাড়ীতে পৌঁছাইতে বিলম্ব হয় না। বড়লোকের বাড়ী বিবাহ, কাঞ্চনরাও কিছু গরীব নয়, সমারোহটা ভালই হইবে আশা করা যায়।

অন্ততঃ 'ঘটকিনী' বীণার মোটর চাপিয়া যখন তখন আনাগোণাটাই যেন পাড়ার মধ্যে একটা সমারোহের আভাস আনিয়া আশপাশের বাসিন্দাদের সচকিত করিয়া তুলিয়াছে।

জ্যোতির্ময়ীও যেমন তেমন করিয়া সারিবেন না তাঁহার অনেক সাধ অনেক বাসনা। কন্যার সাধ ননদিনীকে দিয়াই মিটাইতে হইয়াছে চিরকাল, আজ ও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কারণ নাই।

কিন্তু, তিনি যেন হাঁফাইয়া উঠিতেছেন। ও বাড়ীর বিচ্ছেদ বিরহ এতদিনে যেন আসল চেহারা লইয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার সামনে।

কাহাকে দেখাইয়া সুখ? কাহাদের খাওয়াইয়া তৃপ্তি? কাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলে স্বস্তি? কাঞ্চন ভিন্ন মনের মতন জিনিষ আনিয়া দেয় কে? বাজারের নূতন হালচাল, নূতন নূতন ফ্যাসানের খবর আসিবে কাহার কাছ হইতে? ঝগড়া হইয়াছে হোক, কিন্তু বিবাহ দুইটা চুকিয়া গেলে যদি হইতো? কাঞ্চনের বিবাহে জ্যোতির্ময়ী কড়ি খেলাইবেন না—নাস্তির বিবাহে মাসীমারা ভাঁড়ার আগলাইবেন না—একি অসঙ্গত কথা! এর স্বপক্ষে যেন কোন যুক্তিই নাই।

তবু চেষ্টাকৃত উৎসাহে তিনি একলাই সাতজনের কাজ করিতে থাকেন, শুধু এক এক

সময় নমিতার মুখ দেখিয়া কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়, হাতপায়ের বল কমিয়া যায়। অন্ত পাওয়া ভার মেয়েটার, কেমন যে এক ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, সুখ-দুঃখ বুঝিবার উপায় নাই। লুকাইয়া দুই দণ্ড কাঁদিতেছে প্রমাণ পাইলেও জ্যোতির্ময়ীর শান্তি ছিল বরং। সেতো দূরের কথা—বিবাহ উৎসবের শাড়ী গহনার আলোচনাতে ও মাঝে মাঝে তাহার উৎসাহের অভাব দেখা যায় না।

ঠিক এরকমটা কি আন্দাজ করিয়াছিলেন জ্যোতির্ময়ী?

* * * *

ও বাড়ীতেও উৎসবের আয়োজন চলে, এ বাড়ীর জন্য খুব বেশী কাতর কেহই বড় হয় না। লোকবল আছে, তা' ছাড়া বীণাতো একাই একশো।···রুদ্ধ কপাট তেমনি মৌন মুখে চাহিয়া থাকে, এত বড় উপলক্ষের সুযোগেও কেহ একবার তাহার মৌনতা ভাঙিয়া দেয় না।

বৈশাখের দুরন্ত ঝড় উহাকে ধাক্কা দিয়া ফিরিয়া যায়, শ্রাবণ রাত্রির ক্ষুব্ধবর্ষণ উহার গায়ে আছড়াইয়া মরে···আশ্বিনের সোনা'র রোদ হাসিয়া উঁকি মারিতে আসিয়া পিছলাইয়া পড়ে।···

তবু একদিন খোলে, না খুলিয়া উপায় ছিল না তাই খুলিতে হয়, কাঞ্চনের মা, আসিয়া খোলেন, অনেক দিনের ধূলাবালি জমিয়া কঠিন হইয়াছিল, সজোর ধাক্কায় যেন একটা আর্তনাদ করিয়া রুদ্ধকপাট খুলিয়া পড়ে।

মুখ বাড়াইয়া কাঞ্চনের মা কাতরকণ্ঠে ডাকলেন—বাবলু, অ-বাবলু—নান্তি, নান্তি; বৌমা—বাবলুও আসে না নান্তিও আসে না, আসেন বৌমা।

শ্রাবণ আকাশের মতন মেঘগম্ভীর থমথমে মুখ লইয়া, জ্যোতির্ময়ী আসিয়া জানালা খুলিয়া দাঁড়ান।

বিপদে পড়িলে নাকি লজ্জা থাকেনা মানুষের; তাই জ্যোতির্ময়ীর অনিচ্ছা-মন্থর ভঙ্গীকে অগ্রাহ্য করিয়া কাঞ্চন-জননী ব্যগ্র ভাবে বলেন—বড়ছেলে কি বাড়ী আছেন বৌমা?

জ্যোতির্ময়ী মাথা নাড়িয়া জানান নাই।

—তাহলে কি হবে বৌমা? ইনি গেছেন অফিসের কাজে পাটনায়, বড়ঠাকুর ক'দিনের জন্য দেশে গেছেন, বাড়ীতে একটি পুরুষ মানুষ নেই, আর এই বিপদ।

তূষ্ণীভাব ছাড়িয়া জ্যোতির্ময়ী এতক্ষণে কথা কহেন—কি হয়েছে?

—কাঞ্চন কাল রাত থেকে বাড়ী আসেনি বৌমা। বায়োস্কোপ দেখবে বলে বেরোলো—রাত তখন নটা। খেয়ে যেতে বললাম বললে—'ক্ষিদে নেই'। ঘরে খাবার ঢাকা থাকলো ঠাকুর দুয়োর খুলে দেবে জানি, তাই নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমিয়েছি সবাই। সকালে উঠে দেখি যেমন খাবার তেমনি ঢাকা পড়ে, ছেলে বাড়ী আসেনি। এতখানি বেলা অবধি দেখলাম—আর তো মনকে প্রবোধ দিয়ে রাখতে পারছি না মা—অন্ধকার 'মন্ধকার' রাস্তা এখনকার—ছোটগিন্নির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে।···কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া আরো কিছু বলিবার পূর্বেই জ্যোতির্ময়ী সহসা এতক্ষণকার কষ্টার্জিত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠেন—সে সব কিছু নয় ছোট মাসীমা, সর্বনাশই হয়েছে বোধ হয়—নান্তি হতচ্ছাড়িকেও দেখতে পাচ্ছি না সকাল থেকে।

———0———

ঐতিহাসিক

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনীর যবনিকা উঠ্‌ল এবার।

জমিদারের জীবনের স্বপ্ন রূপ পেয়েছে।

গ্রামের প্রান্তভাগে গড়ে উঠেছে বিশাল 'রায় চৌধুরী কটন মিল'। গ্রামের সে পলাশপুর নাম আর নেই, এর নাম এখন 'রায়নগর' কটন মিলের আকাশস্পর্শী চিমনীর অবিরাম ধূমউদ্গীরণে গ্রামের সেই সজীবতা, সেই আরণ্য ঐশ্বর্য আজ বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্ন। সমগ্র চাষীপাড়া ভেঙে ফেলা হয়েছে, তার পরিবর্তে সেখানে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার ছোটো ছোটো টিনের খুপরী। এগুলি শ্রমিকদের বস্তি। এখানে ওখানে কয়েকটা টিউবওয়েল আর একটা দাতব্য চিকিৎসালয়, চায়ের দোকান আর শুঁড়িখানা। আমদানী হয়েছে একদল হতভাগিনীর দল যারা মিলে কাজ করে না, কিন্তু নারীত্ব বিক্রী করে। বাসের জন্য তাদের কোন ট্যাক্‌স্‌ দিতে হয় না জমিদারকে—এটা তাঁর দয়া। শ্রমিকদের শুভানুধ্যায়ী তিনি, তাই তাদের জীবনকে আমোদ আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত করতে চান না। শ্রমিকদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন মনেপ্রাণে, তাই একটা অবৈতনিক পাঠশালা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করছেন। কিন্তু এতে অপর পক্ষের আগ্রহের অভাব দেখে এখনো কাজে হস্তক্ষেপ করেন নি। তাঁর দৃষ্টিভংগী আধুনিক। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতার দিকে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, শ্রমিকদের গঠিত ট্রেড ইউনিয়নকে তিনি মনে প্রাণে সমর্থন করেন ; তাই তিনিই তার সভাপতি।

গ্রামের রূপ বদলেছে। গ্রাম না বলে একে এখন সহরতলী বলাই ভাল। মিলের থেকে ষ্টেশন পর্যন্ত রেল লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাইরে থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর দল এসে হরেক রকম দোকান সাজিয়ে তুলেছে। একটা সস্তা সিনেমা হাউসও আছে। হিন্দি ও বাংলা দু'রকমের বই-ই দেখান হয়। কারণ রায়নগরের অধিবাসী আজ শুধু বাঙালী নয়। ঘোড়ার গাড়ীর স্থান অধিকার করেছে বাষ্পীয় যান।

শ্রমিকদের মধ্যে অনুসন্ধান করলে গ্রামের অনেক চাষীকেই পাওয়া যাবে, শুধু চাষী নয়, কুটীর-শিল্প-জীবিদেরও। কিন্তু তারা এখন চাষী নয় তারা মজুর। তাদের সেই আকৃতিও নেই, প্রকৃতিরও হয়েছে পরিবর্তন। ইস্‌পাতের সংগে কাজ করে করে তারাও আজ সচল ইস্‌পাত। পৈত্রিকতার ধার তারা ধারে না, ক্ষেত ভরা সোনার ফসলের দিকে তাকিয়ে তাদের চোখে গড়ে ওঠে না কোন স্বপ্ন, কোন অতীন্দ্রিয় মোহ দেয় না অশরীরি হাতছানি। বাস্তু-লক্ষ্মীর মূঢ় সংস্কারের জন্য আজ আর কেউ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে না। চরম মূর্খতা সেটা!

ছিদামের অপমৃত্যুতে এদের মধ্যে যাদের প্রাণ একদিন কেঁদে উঠেছিল, তাদের ঠোঁটের কোণেও সে কথার স্মরণে আজ খেলে যায় বাঁকা হাসি। ঈশ্বরের আশায় আজ আর ধন্না দিয়ে বসে থাকে না, সে ভুল ওদের ভেঙেছে; ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। ওরা জেনেছে এই জীবনই সব, সত্য একমাত্র পারিপার্শ্বিক, আর শাশ্বত ওই মিল ও বস্তি, শুঁড়িখানা এবং বারবণিতার দামী সাহচর্য। জীবনের গতি হয়ে এসেছে ছন্দহীন সরল, কিন্তু পাকে পাকে অন্তরের গ্রন্থি হচ্ছে জটিলতরো, বিপর্যস্ত জৈবিক সংঘাতে। অশিক্ষিত মন সে খোঁজ রাখে না, আত্মরোমন্থনের বিষফল ঝাপসা চোখ যে দৃষ্টিভংগি হারিয়েছে। আর শিক্ষিতরা হল প্রগতিশীল, উদার দৃষ্টি তাদের ঊর্ধ্বমুখী। অবান্তরে কাল ব্যয় করবার অবসর তাদের নেই। তাই মাঝে মাঝে শ্রমিকরা যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, অন্তরের আদিমতা যখন মাথা চাড়া দেয়, তখন ওরা মন্দিরের দ্বারে মাথা খোঁড়ে না, বা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যাও করে না—মিলে রাতে ওভার টাইম খাটে কিম্বা মদ গেলে মাত্রাতিরিক্ত!

—সবই বিধাতার, অর্থাৎ, বিধানদাতার ইচ্ছা সাপেক্ষ!

বলাই-এর দোকানের আড্ডা ভেঙেচে কিন্তু তার রূপ গেছে বদলে। এই চার বছরের ব্যবধানে বলাই-এর সিন্ধুক ভারী হয়েছে রীতিমত আর দোকানটি স্থানচ্যুত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে একটি একতালা কোঠাবাড়ীতে। দু'জন কর্মচারী দোকান চালায়, বলাই বসে বসে তামাক খায় ও তদারক করে।

শীতের মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়িয়েছে, নিবিষ্ট মনে বলাই খবরের কাগজের শেয়ারের পৃষ্ঠা পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত, দোকানেও তেমন ভীড় নেই। এমন সময় প্রবেশ করল লক্ষ্মণ।

—আর এস এস, ওরে তামাক দে, তামাক দে। তারপর দু'দিন যে পাত্তাই নেই? ব্যাপার কী? বলাই প্রশ্ন করল।

কিন্তু কোন উত্তর দিল না লক্ষ্মণ, হাসল করুণ হাসি।

তার দিকে তাকিয়ে বলাই বললে, বড় যে মনমরা দেখাচ্ছে, কিছু হয়েছে নাকি?

—না, হবে আর কী? তবে সাংসারিক—

—আরে, রেখে দাও তোমার সাংসারিক। ও ভাবলেই মাথা খারাপ, নইলেই নিশ্চিন্দি।

বলাই আজ একথা বলতে পারে, লক্ষ্মণ ভাবল।

—তার চেয়ে পরকালের চিন্তা দেখ, কাজ হবে।

—তাই দেখচি।

তার গলার স্বর শুনে বিস্মিত হয়ে বলাই তাকাল তার দিকে, কিন্তু লক্ষ্মণ তখন হুঁকোর আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। হুঁকায় অকারণ ঘন ঘন টানে বলাই-এর মুখের প্রশ্ন মুখেই রয়ে গেল, সে আবার কাগজে মনোনিবেশ করল।

কয়েক মুহূর্ত কাটল এমনি কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মাঝে।

—বলাই। এক সময় মৃদুকণ্ঠে ডাকলে লক্ষ্মণ।

মুখ তুলে বলাই বললে, কিছু বলবে আমায়?

না, বলবার কিছু নেই, একটু থেমে লক্ষ্মণ বললে, তোমার ছেলে কদ্দিন মারা গেছে বলতে পারো' বলাই।

এ সময় লক্ষ্মণের এ রকম প্রশ্নে বলাই বিস্মিত হল। ছেলে তার ছিল, এবং সেই তার একমাত্র পুত্র সন্তান। কিন্তু সে মারাও ত গেছে অনেক দিন; পুরানো সেই দুঃখের স্মৃতি আজ আর জাগিয়ে লাভ কী? সে ইতিহাস কী আজানা লক্ষ্মণের?

—আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন লক্ষ্মণ? বলাই জিজ্ঞাসা করল।

—হঠাৎ-ই মনে এল, কণ্ঠে রহস্য এনে বললে লক্ষ্মণ, আজ হঠাৎ-ই এ কথা বার বার মনে হচ্ছে,— হিংসে হচ্ছে তোমার সৌভাগ্যে।

—সৌভাগ্য! আমার সৌভাগ্য! বলাই আঁৎকে উঠ্‌ল, তুমি কী বলচো লক্ষ্মণ?

—ঠিকই বলচি। ছেলে নেই বলেই আজ সবাই তোমার দিকে চায়, আজও তাই তুমি বলাই-ই আছো। সে বেঁচে থাকলে সেই হত সব, কেউ ফিরেও চাইত না তোমার দিকে। হয়ত তোমার ছেলেও নয়।

আমার ছেলেও আমার দিকে ফিরে চাইত না, লক্ষ্মণ? বলাই-এর স্বরে গভীর বিস্ময় ঝরে পড়ল। ছেলে না থাকার যে কী দুঃখু তা তুমি বুঝবে না লক্ষ্মণ, তুমি তা বুঝবে না এক একবার ভাবি এই যে এত উপায় করি, আমি মরলে কী হবে এসব, এ কী আমার সংগে সংগে যাবে? দু'টো মেয়ে ছিল, তাত অনেক দিনই পার করেচি। কার জন্য এত সব? মনে মনে ভাবি, বুঝিও, কিন্তু ছাড়তে পারি না—ট্যাকার নেশা আমার ভেতরে শেকড় নামিয়েচে। আজ যদি সৃষ্টিধর বেঁচে থাকত তা'লে তার হাতে দোকান তুলে দিয়ে, কাশীবাস করতে পারতুম। শেষের দিকে বলাই-এর গলা ধরে যায়।

—তুমি ভুল করচ বলাই।

—ভূল!

—হ্যাঁ ভুল করচ তুমি।

বলাই বললে, আমায় তুমি জানো লক্ষ্মণ, ষোলো বছর বয়সে এই দোকানে ঢুকেছিলাম, বুড়ো বাপের হাত থেকে সংসারের ভার নিয়েছিলুম। আমার বাবাও—

—অবিনাশ কাকাও তাই করেছিলেন, তা আমি জানি বলাই। কিন্তু এটা কলিকাল।

—হবে। কিন্তু সৃষ্টিধর আমারই ছেলে, আমারই বাপপিতাম'র রক্ত তার শরীরে ছিল। সে কখনো—

অবিশ্বাসের হাসি হাসল লক্ষ্মণ।

—রক্তের সম্বন্ধ কলিতে বড় নয় বলাই, বড় হল ট্যাকা। এই ধরো আমার ছেলে বিষ্টুপদ, তাকেও আমি বুকে করে মানুষ করেছিলুম, আমারও বাপপিতাম'র রক্ত তার দেহে কিন্তু—

—কিন্তু বাধা দিয়ে বলাই বললে, সে কী আজকাল তোমার সাথে এমনি ব্যাভার-ই করচে লক্ষ্মণ ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে লক্ষ্মণ বলতে লাগল, প্রথম যেদিন সে মিলে ঢোকে, কত মানাই ওকে আমি করেছিলুম, কেঁদে কেঁদে ওর মা চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। বললুম, যাসনি বিষ্টু, নিজের হাত ব্যবসাকে হেনেস্তা করিসনি। ঘরের লক্ষ্মী তাঁতকে অপমান করিসনি। কিন্তু ও তা শুনলে না, পাঁচ ট্যাকা হপ্তাই ওর কাছে বড় হল। ঘরের লক্ষ্মীতে মন ধরল না, রাক্ষুসী কারখানাই হল সব।

—তা মন্দ কী ? লক্ষ্মণ উপায় ত করচে।

—উপায় করচে ! কিন্তু, বেল পাকলে কাকের কী বল। এ্যাদ্দিন যাবত আমার সংগে, সংসারে খরচ পত্তরও দিত ! কিন্তু বিধেতা বাদ সাধলেন, ঘাড়ে ওর ভুত চাপল। অনেক সহ্য করেছিলুম বলাই,—

লক্ষণের চোখ দিয়ে এবার জল গড়িয়ে পড়ল।

—কিন্তু যেদিন বাইশ বছরের ছেলে বিষ্টু, যাকে আমি বুকে করে মানুষ করেছিলুম, সেই আমার বিষ্টু, নেশা করে বাড়ি ফিরল সেদিন আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। এই আমার ছেলে, যে কোনদিন আমার সামনে তামাকও খায়নি, আমার মুখের ওপর কোনদিন একটা কথাও কইতে সাহস করেনি, সেই কিনা সেদিন আমারই চোখের সামনে বৌমার গায়ে হাত তুলল !

বলাই বললে, বিষ্টু এতদূর অধঃপাতে গেচে ! নেশা করে, বৌমার গায়ে হাত তোলে,— একথা তুমি এ্যাদ্দিন বলোনি, লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ উত্তর দিলে, ছেলে মদ খায়, বাপ-মা কী একথা মুখ তুলে বলে বেড়াতে পারে, বলাই ! হাজার হলেও আমি ওর বাপ, আমার রক্তে ওর জন্ম, আমার বুকেই ও মানুষ, ওর ব্যারামের সময় আমিই ওর জন্যে মা শেতলার কাছে মাথা কুটি।

—মদ অবিশ্যি আজকাল অনেকেই খায়, বলাই বললে, মদ না খেলে নাকি ওরা বাঁচতে পারে না।

—আর মদ খেয়েও কী চমৎকার বেঁচে আছে আমার বিষ্টুপদ! ওকথা আমায় আর কয়োনা বলাই। যেদিন আমার লক্ষ্মীর মত বৌমার গায়ে হাত তুলল, সেদিন আমি আর থাকতে পারলুম না,—দিলুম দু'কথা শুনিয়ে, সহ্যেরও একটা সীমা আছে, বলাই ! ছেলের আমার রাগ হল

তাতে, গট্‌গট্‌ করে বার হয়ে গেল বাড়ি থেকে। শুনি এখন নাকি কাকে নিয়ে বস্তিতেই একটা ঘর ভাড়া করেছে। বাড়িমুখোও আর হয় না।

লক্ষণ থামল। ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। বলাই-এর মুখে কথা নেই, কী উত্তর দেবে সে এর? কী করবে এর বিশ্লেষণ, সান্ত্বনা দেবারই বা আছে কী! দুঃখ দুর্দশা সংসারে নিত্য-নৈমিত্তিক, অভাব-অভিযোগের প্রাচুর্য চারিদিকে, তবু এরি মাঝে লক্ষণের যে বেদনা তা অপরিসীম, সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব এই অবসর-মন্থর গ্রাম্য পরিবেশে। ওদের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে সত্য, কিন্তু তা প্রতিফলিত অতীতের পটভূমিকায়। বর্তমানের সংঘাতে মাঝে মাঝে ওরা বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে ঠিক, কিন্তু বর্তমান এমন রূঢ়বাস্তব মূর্তিতে ওদের মুখোমুখি হয় ক্বচিৎ।

—জীবনের প্রান্তসীমায় ওদের মুমূর্ষু চোখের সামনে আজই হয়ত প্রথম ঝড়ের ইসারা এল, স্পন্দনের ঢেউ জাগল!

লক্ষণ বললে, দুঃখের কথা আর কী বলব, বলাই! গত আড়াই মাস তাঁত একেবারে বন্ধ। কে কিনবে আমার কাপড়? ওর চেয়ে চটকদার কাপড় আজ সস্তায় মিল দিচ্ছে, গেঁয়ো তাঁতের ঝল্‌ঝলে কাপড়ে লোকের মন আজ উঠবে কেন? অথচ আজো গায়ের অনেকের প্যাঁটরা খুললে এই লক্ষণ দাশের বোনা কাপড় মিলবে। বড় মেয়ের বিয়ের সময় রায়বাড়ির বড় কর্তা কাপড় দেখে খুসী হয়ে আমায় পাঁচট্যাকা বকশিস দিয়েছিলেন, সেকথা আমি আজো ভুলিনি। আর এখন একটা গামছা নিয়ে গেলেও ফেরৎ আনতে হয়, এমনিই বরাত! তার বুক থেকে একটা নিশ্বাস বার হয়ে এল।

—যাকগে, তাকে সান্ত্বনা দিল বলাই, যাকগে ও ভেবে আর কী করবে বল। কলির ধম্মোই এই—। সস্তায় কে না চায় বল?

—নিশ্চয়ই! কে না চায় সস্তায়! ট্যাকাই যখন সব। লক্ষণ বিদ্রূপে ঝলসে উঠল।

বলাই তা বুঝলে না। বললে, সবই বুঝি, কিন্তু কী করবার আছে চেষ্টা করে দেখনা, যদি মিলে একটা—

—মিলে! মিলে চাকরী করব আমি? যেন জ্বলে উঠল লক্ষণ, ঘরের তাঁত ছেড়ে দুটো পেটের ভাতের তরে পরের দোরে ধন্নে দেব? দুদিন বাদে যদি কুকুরের মত খেদিয়ে দেয়, তখন আবার ঘুরব ফেউ ফেউ করে? খাটব পরের মিলে, তৈরী করব পরের মাল, কেন? না দুটো পেটের জন্যে! পেটটাই বড় হবে, আর হাত ব্যবসা ছেড়ে এই গোলামিটা কিছুই নয়? ছিদামকে মনে পড়ে বলাই? ও যা করতে পেরেছিল, তা কী খুবই শক্ত?

বলাই চমকে উঠ্‌ল, সেকী লক্ষণ? তুমি—

—পাগল! বিষণ্ণ হাসি হাসল লক্ষণ, ওতেও সাহসের দরকার।

সংসারের অভাব এর পর যেভাবে বেড়ে চলল তা সত্যই মর্মান্তিক। তাঁত বন্ধ, এবং ঐ ছিল জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। লক্ষণের অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়—সস্তায় মিলের কাপড় ছেড়ে কেইবা কিনবে তাঁতের কাপড় ? পুরানো পুঁজি ভাঙিয়ে চলল কিছুদিন, এবং তাও কোনমতে। কিন্তু অবশেষে এও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। দুবেলা হাঁড়ি চড়া বন্ধ।

বিষ্টুপদর পরিত্যক্ত দেড় বছরের ছোট শিশুটি দুগ্ধাভাবে চিঁ চিঁ করে, তার মা' শুষ্ক স্তন মুখে দিয়ে বসে থাকে। অবোধ শিশু দুধ টানে, পায়না। কেবল মুখ ঘসে আর কাঁদে। বিরক্তিতে মা'র মুখ থেকে অভিশাপ বার হয় অভাগিনী নারীর চোখে নিদারুণ অসহায়তার অশ্রু তখন টলটল করছে। ওদিকে একেবারে মূক হয়ে গেছে লক্ষণের স্ত্রী, তার এতকালের নিস্তরংগ জীবন আজ সহসা উদ্বেল হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রতি আজ তার আর অভিযোগের যেন সীমা নেই, ও বুঝেছে দেবতার দ্বারেও মাথা কোটা চলেনা, কারণ তিনি প্রভু, —ঘুষ নইলে তার মন ওঠেনা। স্বর্গের দেবতা তিনি, মর্তের সংগে তাঁর ব্যবধানের ব্যাপ্তি অনেকখানি। ওপর থেকে শুধু আঘাতই নামে, নিচের অভিযোগ সেখানে পৌঁছায় না !

যাহক, লক্ষণকে দেখে বিস্ময় জাগে বইকী। সংঘাত যত বাড়ে, তত অটল হয়ে বসে থাকে সে। অভাবের তাড়নায় উন্মাদ প্রায় হয়ে উঠলেও ছিদামের ধারা অনুসরণ করে না। পরিবর্তে কয়েকজন কাবুলীওয়ালার সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠতরো হয়ে উঠ্‌ল। তবু বর্তমানে ত বাঁচুক !

এ অঞ্চলে কাবুলীওলার আমদানী সাম্প্রতিক।

সন্ধ্যার দিকে কোত্থেকে ঘুরে এল লক্ষণ। বাড়ী ঢুকতেই তার স্ত্রী বললে, ওগো শুনচ ?

—কী ? ঝাঁঝাল কণ্ঠে উত্তর দিল লক্ষণ।

—ছেলেটার দিকে যে আর তাকান যায় না। নিজেরা না হয় উপোষ করি, কিন্তু চোখের সামনে কী ওই কচিটা না খেয়ে মরবে ? হাজার হলেও ওত আমারি বিষ্টুপদর ছেলে। লক্ষণের স্ত্রী কেঁদে ফেলল।

ধমক দিয়ে উঠ্‌ল লক্ষণ, ও যা তা নাম তুমি আমার কাছে আর কখ্‌খনো করো না বউ,—আমি বারণ করে দিলুম। বুঝব আমার ছেলে মরে গেচে, কিম্বা ছেলেই হয়নি আমার।

—ওগো ওকথা বলতে নেই।

—কী বলতে আছে, আর কী বলতে নেই, তা তোমার থেকে আমি ভাল বুঝি, বউ। ছেলে! ছেলে! ছেলে! এ যেন তোমার ইষ্টনাম হয়ে দাঁড়িয়েচে। কিন্তু সে হতভাগা একবারো ফিরে তাকায় তোমার দিকে ? নিজে ত মদ বেশ্যা নিয়ে ফুর্তি মারচে, একবারো ভাবে তার গর্ভধারিণীর কথা ? কদিন পেট ভরে খাওনি বলোত, বউ? ওর স্বর বিকৃত হয়ে এল।

লক্ষণের স্ত্রী চুপ করে কাঁদতে লাগল। শব্দ করে নয়, একান্ত নিঃশব্দে। তার আনত চোখ থেকে ফোঁটার পর ফোঁটা জল গড়িয়ে মাটিতে পড়তে লাগল।

—এই যে পরের মেয়েকে এনে এমন করে ভাসিয়ে দিয়ে গেল, ফিরে চাইল একবার? একবারো ভাবল ওই নিদ্দোষ দুধের বাচ্চাটার কথা? মিছে আমরাই কেবল ওর জন্য ভেবে মরি, পাগল হই।—লক্ষ্মণ মুখ ঘুরিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। স্থাণুর মত তার স্ত্রী দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ এই সময় পাশের ঘর থেকে একটা তীব্র আর্ত্তনাদ উঠল। কণ্ঠটা পুত্রবধূর।

ঘর থেকে ছুটে বার হয়ে এল লক্ষ্মণ।

—ওকী হল? দেখত, দেখত বউ।

তার স্ত্রী তৎক্ষণে পুত্রবধূর ঘরের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। পেছনে পেছনে হন্তদন্ত ভাবে লক্ষ্মণও ছুটে এল। দেখা গেল ঘরের মধ্যে বৌমা তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। কোলের ওপর থেকে ছেলের মাথা এলিয়ে পড়েছে। চোখ তার বোজা, বেশ বোঝা যায় জ্ঞানও নেই।

দেখেই লক্ষ্মণের স্ত্রী চীৎকার করে কেঁদে উঠল, এ কী সব্বনাশ হল, বৌমা! দু'হাতে সে ছেলের মাথা ধরে নাড়া দিতে লাগল।—

ওগো জল আন শীগ্‌গীর।

—গলা শুকিয়ে বাছা আমার—শ্বশুরের সামনেও বৌমা নিজেকে সামলাতে পারল না।

লক্ষ্মণের সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপতে সুরু করেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এ দৃশ্য দেখা অসম্ভব।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে ছুটে সে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

উপায়! উপায়! হ্যাঁ, এর থেকে উপায় তাকে একটা বার করতেই হবে। জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে অন্ততঃ শেষবারের মত একবার প্রাণান্ত চেষ্টা তাকে করতেই হবে।

অনেক দিনের কেনা একটা রঙিন তাঁতের সাড়ি পাট করে তোলা ছিল। তার বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকটি দিনের সংগে এর একটি চমৎকার ঐতিহাসিক সংযোগ রয়েছে,—তাই এটা বিক্রি করবার কথা তার কোন দিনই মনে হয়নি। এর প্রতি বুননে যেন মেশানো রয়েছে অশরীরি আত্মীয়তার পরশ। এত দিনের এত অভাবের মাঝেও এটার দিকে সে কখনো লুব্ধ দৃষ্টি দেয়নি।

আজ সেটাই সে বার করে নিল।

আমাদের হাতে পায়ে ধরলেও কী তিনি এ উপকারটুকু করবেন না!

সাড়িটা বুকে করে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

*　　*　　*

দুঃসংবাদের যে পাখা আছে রাস্তায় পা দিয়েই তার পরিচয় পেল লক্ষ্মণ। কতক্ষণ আগেই বা ঘটেছে কিন্তু এরি মধ্যে সেটা সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। কথাটা শুনে চমকান স্বাভাবিক, কিন্তু আজ সে স্বাভাবিকতারও বাইরে। নিস্পন্দভাবে সে সব শুনল।

—বিষ্টুপদ, হ্যাঁ, তারি ছেলে বিষ্টুপদ, একটু আগেই নিজের সামান্য ভুলের জন্য একেব মেসিনের তলায়—

এ-ই-ই ? কিন্তু এতে অবাক হবার কী আছে, আর কীই বা আছে দুঃখের ? ল ভেবে পায় না। এত আজ নতুন নয়—ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

—একেবারে শেষ !

শুনে একটুও কাঁপল না লক্ষণ। অপরের প্রবোধ বাণীর মৃদুতম ভগ্নাংশও তার কা প্রবেশ করল না।

—তার ছেলে বিষ্টুপদ আজ নেই ? একেবারে মেসিনের তলায় !—

আশ্চর্য ! এ সংবাদে একটু কান্না পাচ্ছে না তার। যাকে সে বুকে করে মানুষ ক তুলেছিল, তার রক্তে যার জন্ম, তার জন্য লক্ষণের বুক আজ একেবারো হাহাকার করে উঠ না কেন ?

লক্ষণের বুক থেকে একটা অদম্য কাশির বেগ ঠেলে ওপরের দিকে উঠতে লাগ কোন মতে সে সেটা চেপে রেখে জমিদারের বাড়ীর দিকে দ্রুত এগুতে লাগল। হঠাৎ পথের পাশে একটা ঝোঁপের মধ্যে কাপড়টা ছুড়ে ফেলে দিলে।

তারপর বুক ফুলিয়ে হাঁটতে সুরু করল।

মৃত বিষ্টুপদর শূন্যস্থানে তার দাবীই যে সর্বাধিক !

—কিন্তু ইহাও কাহিনী নয় ; বৃহত্তর কাহিনীরভূমিকা পট মাত্র।
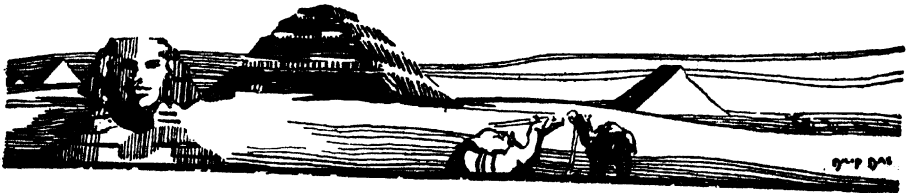
বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষা

সুধীর খাস্তগীর

সব দেশেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি যে খুব উৎকৃষ্ট তা নয়। আমাদের দেশে ত নয়ই। বিদ্যালয়ের ওপর আমাদের দেশের শিশুদের ভীতি এখনো যায়নি। পঁচিশ বছর আগেকার একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করতে এখন আর লজ্জা নেই। ছেলেদের কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হবার জন্য বয়সের দিক থেকে ছোট এবং বুদ্ধিতে না হ'লেও পড়াশোনাতে অযোগ্য ব'লে আমার ভর্তি হওয়া তখনো সম্ভব হয় নি। আমি হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচেছিলাম। কিন্তু আমার কপালে স্কুলে যাওয়া লেখা ছিল; ঘরে বসে যে মেঝেতে ছবি আঁক্‌বো, শ্লেটে হাতের লেখার নামে "কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং" আঁক্‌বো তার উপায় রইল না। দিদির সঙ্গে আমাকে মেয়েদের স্কুলে যেতে হ'ল। সেখানে গিয়েও বিদ্যালয় ভীতি—আমার গেলো না। ক্লাশে একটু কথা বলার জন্য "গুরু-মাসিমার" কানমলা খেয়ে আমি সে বিদ্যালয় ত্যাগ করি। মেয়েদের বিদ্যালয়ে এখনকার দিনে শিক্ষয়িত্রীদের এরকম কান, কেশ কিম্বা চড়-চাপড়ের ওপর প্রীতি নেই বলেই আমার বিশ্বাস, কিন্তু ছেলেদের বিদ্যালয়ে যে এখনো প্রচুর পরিমাণে আছে, সে বিষয় আমি নিঃসন্দেহ।

আজকাল অনেকেই যাঁরা শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা কর্‌ছেন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন এবং বিশ্বাস করেন ছোট ছেলে মেয়েরা মেজেতে "কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং" আঁকার মধ্যদিয়ে যদি স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা পায় অর্থাৎ শিক্ষক কিম্বা শিক্ষয়িত্রী যদি শিশুদের যা করতে বল্‌তে ও শুন্‌তে ভাল লাগে, সে সব করতে, বলতে ও শুন্‌তে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেন, তবেই তারা চট করে শেখে ও শেখাতে আনন্দ পায়। এই কারণেই আজকাল ছবি আঁকা, মাটিদিয়ে কিছু গড়া, ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ, বই বাঁধানো ইত্যাদি হাতের কাজ বিদ্যালয়ে ক্রমেই বড় স্থান পাচ্ছে। এবিষয় সকলেই নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে এসব কাজ বিদ্যালয়ে শেখানো উচিত, কিন্তু কি পদ্ধতিতে শেখানো উচিত সে বিষয় 'নানান' মুনির নানা মত।

মৌলবি সাহেব — নং ১

আমিনুদ্দিন — বয়স — দশ

ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি বিদ্যালয়ে একজন ক'রে ড্রইং মাষ্টার থাকেন এবং তাঁদের কাছে ছেলেবেলায় অপদস্থ হয়েছি তাঁদেরও অপদস্থ করেছি। ড্রইং মাষ্টার মহাশয়েরা ক্লাশে এসে 'বোর্ডে' কিছু এঁকে দিয়ে বলতেন 'আঁক'; কেউ বা গেলাস, ঘটি, বাটি, চেয়ার, টেবিল, দোয়াত কলম ধরণের সাম্‌নে রেখে বল্‌তেন 'আঁক', কেউ আবার ড্রইং বই থেকে কোনো ছবি দেখিয়ে বল্‌তেন 'এইটা আঁক'। কেউ আঁক্‌তো, কেউ আঁকতো না, কেউ 'ট্রেস্‌' কর্‌তো পাতলা কাগজ ফেলে অতি সাবধানে যাতে ধরা না পড়ে। কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে অঙ্কের ক্লাশের 'হোম ওয়ার্ক' অন্য ছেলের খাতা থেকে টুক্‌তো! ড্রইং এর ঘণ্টাটিকে কেউই যেন তেমন শ্রদ্ধার চোখে এখনো দেখে না। ড্রইং মাষ্টার মহাশয়রা অনেকেই যাঁরা ড্রইং শেখান তাঁরা ভুলে যান, তাঁরা শেখাচ্ছেন যাদের তাদের বয়স অল্প। ড্রইং মাষ্টার হবার জন্য তাঁরা যে "ট্রেনিং" নিয়েছেন, সেই পদ্ধতিতে ছেলেদের শেখানো চলে না, ছেলেদের চোখ ও মন দিয়ে তাদের কাজ শেখাতে ও তাদের কাজ দেখতে হবে। বয়স্ক লোকের হাতের কাজের সঙ্গে ছোট ছেলেদের কাজে মিল থাকা একেবারেই অসম্ভব।

আমাদের দেশে ড্রইং মাষ্টার যাঁরা সাধারণতঃ হ'য়ে থাকেন তাদের কোনো আর্ট স্কুলের থেকে "ট্রেনিং" নিতে হয়। যে কেউ, যাঁর কল্পনা শক্তি নেই—নিজের দেশের শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান নেই—কেবলমাত্র একটি পরীক্ষা পাশ ক'রে সার্টিফিকেট নিয়ে তাঁরা ড্রইং মাষ্টার হন। এঁদের দিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশে শিল্পীর অভাব আজকাল নেই। বিদ্যালয়ের ড্রইং মাষ্টারের কাজটি যে হেয় কাজ নয়, কল্পনাশক্তিশালী শিল্পীরা যে ড্রইং মাষ্টারের কাজে যোগ দিয়ে, শুধু ছাত্র নয় নির্জীব নিরস শিক্ষকদের মনে অনু-

লেণ্ডস্‌ কেপ নং ২
রবি সেন বয়স—এগার

সন্ধিৎসা ও রস-সঞ্চার কর্‌তে পারেন এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। আজকাল কোনো কোনো স্কুলে শিল্পীরা যোগ দিচ্ছেন এ আনন্দের কথা। কল্পনা-শক্তিশালী উৎকৃষ্ট শিল্পীরা বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষার কাজ নিয়ে তাঁদের শিল্প সাধন কর্‌বার উপযুক্ত সময় না পেলেও, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনে যে দেশের শিল্প সম্বন্ধে সজাগ করিয়ে দেন, তা দেশের পক্ষে কম কল্যাণকর নয়।

বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষকের স্থান ছাত্রদের শিল্পী তৈরী করবার জন্য ঠিক নয়। একশত ছাত্রের মধ্যে একজনের হয়তো শিল্পী হবার সম্ভাবনা। সেই একটি ছাত্রের চেয়ে অন্য নিরানব্বই জন ছাত্রের জন্যই শিল্প-শিক্ষককে বেশী প্রয়োজন। ছাত্রদের মনে সৌন্দর্য বোধ জাগিয়ে তোলা, রুচি-জ্ঞান পরিস্ফুট করা, ভালো জিনিষ চেনাতে শেখানো এইটাই বড় শিক্ষা।

দেখতে শেখা, মনে প্রাণে অনুভব করতে শেখা, এবং তা প্রকাশ করতে পারা, সুন্দর পরিচ্ছন্নতার মধ্যে বাস করা এ সবে সকল শিশুরই জন্মগত অধিকার আছে। এ শিখতে আমাদের পয়সা খরচ করতে হয় না —যা দরকার তা' হচ্ছে একটু সহানুভূতি এবং দরদ। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু সৃষ্টি করবার শক্তি আছে, এবং শিল্প-ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুর কাঁচা হাতের সরল ও স্বাভাবিক যে প্রকাশ তার মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, অঙ্কন পদ্ধতির মার প্যাঁচ নেই, আড়ম্বর নেই, শিশু যা দেখে, শোনে এবং বোঝে তা' নিজের সুবিধা মতো সে প্রকাশ করে। সেই সহজ প্রকাশ করবার শক্তিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যাঁরা তাদের শিক্ষকতা করেন তাঁরা যেন অঙ্কন পদ্ধতি এবং নানা রকমের বোঝা চাপিয়ে সেটা প্রথম থেকেই নষ্ট না করেন। ছোটগাছের চারা যেমন বেড়ে ওঠে, তেমতি সহজ ভাবেই শিশুদের বেড়ে উঠবার সাহায্য করতে হবে। শিক্ষকদের বিশেষ করে শিল্প-শিক্ষকদের এই দিকেই সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি রাখা দরকার।

বোঝা নং ৩

মহিউদ্দীন বয়স—বারো

এই রকমভাবে শিক্ষা যদি শিশুদের দিতে হয় তবে আমাদের বিদ্যালয়ে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা চাই।

প্রথমতঃ—শিল্প-শিক্ষকের যথার্থ শিল্পী হওয়া দরকার। অর্থাৎ 'ট্রেণিং' পরীক্ষা পাশ ছাড়াও তাঁর কল্পনাশক্তি ও দরদ থাকা দরকার। আজকাল বাংলা দেশে এই প্রকারের শিল্পীর অভাব নাই।

দ্বিতীয়তঃ—ড্রইং-ক্লাশটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বেশীরভাগ সময় নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে দেওয়া ভালো। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ড্রইং পরীক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের ড্রইং শেখানো হয়। পরীক্ষা পাশ করবার জন্য পারতপক্ষে ড্রইং শেখা উচিত নয়। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের দেখা উচিত, সহজে পাশ করা যায়, সেই কারণে ছেলেরা যেন ড্রইং না শেখে।

তৃতীয়তঃ—শিশুকাল হ'তে দশ বারো বছরের ছেলেমেয়েদের বেশীর ভাগ সময় নিজের মন থেকে আঁক্‌তে চেষ্টা কর্‌তে দেওয়া দরকার। তা' না ক'রে প্রথম থেকে নকল কর্‌তে আরম্ভ করালে তাদের কল্পনার থেকে কিছু করতে পারা আর পরে সম্ভব হয় না। বারো বছরের পরে যাদের শিল্পের কাজে ঝোঁক থাকে, তারা তাদের নিজেদের ভুলচুক আপনা থেকেই বুঝতে শেখে এবং ভুল শোধরাতে চায়, তখন তাদের শেখানো কষ্টকর ত' নয়ই—বরং সেই উপযুক্ত সময়।

চতুর্থতঃ—প্রত্যেক স্কুলে শিল্পের জন্য অন্ততঃ দুইটি ঘর থাকা দরকার। একটি ঘরে শিল্প সম্বন্ধে এবং অন্যান্য নানাবিষয়ে সচিত্র পুস্তক থাকবে। দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রের print ইত্যাদি আঁক্‌তে (বিখ্যাত শিল্পীদের হাতের আসল ছবি রাখার সামর্থ সব বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়)। সেই সকল ছবি কখনো কখনো বদ্‌লানো দরকার। কারণ দেখা যায় একই ছবি দেয়ালের এক জায়গায় অনেক দিন থাকলে ছেলেমেয়েরা তা' আর লক্ষ্য করে না। সেই ছবিখানিই যদি কিছুদিন অন্তর অন্তর অন্য স্থানে রাখা হয় তবে সবার সেই দিকে নজর পড়ে ও সেই ফাঁকে ছবিটিকেও ভাল ক'রে দেখতে আরম্ভ করে। আর একটি ঘর যেখানে শিল্প-শিক্ষক কাজ শেখাবেন, কিম্বা দরকার হলে নানা বিষয় ছাত্রদের সঙ্গে গল্পচ্ছলে আলোচনা করবেন, কখনো কখনো ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ছবি দেখাবেন। ছেলেমেয়েরা এমনি কাজ ততটা শিখতে পারে না। শিল্পশিক্ষক যদি তাদের সামনে কখনো কখনো নিজের কাজ করেন এবং

বংশীবাদক নং
ভিড বয়স—তেরো

ছাত্রছাত্রীরা যদি তাঁকে কাজ করতে দেখবার সুযোগ পায় তবেই তারা শিল্পের কাজে আকৃষ্ট হয় ও শেখে।

ছাত্র-ছাত্রীরা শিল্প-শিখবার নির্ধারিত সময় এসেই যে নিজের নিজের কাজে লাগবে তারও দরকার নেই। কোনো ছাত্রের যদি কাজে মন না লাগে, তবে সে শিল্প বিষয়ে কোনো বই নিয়ে পড়তে কিম্বা ছবি দেখতে পারে। শিল্প-শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মাঝে মাঝে ঘরের বাইরেও গাছ পালা জন্তু জানোয়ার আঁকতে যেতে পারেন।

মোগল ছবি নং ৫
১৪ বছরের ছেলের আঁকা

ছবি আঁকা, মাটি দিয়ে খেলনা ইত্যাদি বানানো কার্ডবোর্ডের বাক্স বই বাঁধানোর কাজ, নানা রকমের হাতের কাজ করবার সুবিধা রাখা ভালো। যার যেটাতে মন লাগে। অনেক সময় দেখা যায় একটি ছোট ছেলের হয়তো পেন্সিল দিয়ে কিম্বা রং দিয়ে কাগজে আঁকতে মন বসে না, কিন্তু মাটি দিয়ে খেল্না তৈরী, করতে তার পরম উৎসাহ। কোনো ছেলের হয়তো 'লাইনো-কাট্'এ উৎসাহ। যেদিক দিয়েই হউক, শিক্ষকদের দেখা দরকার, শিশুদের স্বাভাবিক সৃষ্টি করবার প্রবৃত্তিটা যেন চাপা না পড়ে।

শান্তিনিকেতনের থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবার জন্য যখন আমাকে কলকাতায় পাঠানো হ'ল তখনও আমি ভাবিনি, আমি পরীক্ষা পালাব। যখন দেখলুম—পরীক্ষা পাশ ক'রে ছবি আঁকা চর্চা হয়তো হবে না—কলম পেশার ব্যবসায়ী কিম্বা ঐ ধরণের কিছু একটা হ'তে হবে তখন পালানোই স্থির করলুম। শান্তিনিকেতনের কলেজের শিক্ষক মণ্ডলী দিয়েছিলেন ধিক্কার। তাঁদের কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে কলাভবনে যোগ দিয়েছিলুম—শিল্পী হবার উদ্দেশ্যে। তখনও ভাবিনি আমার কপালে শিক্ষকতা লেখা আছে। তাও আবার এমন বিদ্যালয় যেখানে ছেলেরা

ধনীলোকের আদরে পালিত মানুষ। প্রথমটা ভেবেছিলুম আদরে পালিত ধনীদের ছেলেরা কুঁড়েমীর মধ্যে শিল্প লেখাপড়া শিখবে, সেখানে আমাকে শেখাতে হবে ছবি আঁকা মূর্তি গড়া! খুব উৎসাহ ছিল না। শেখানোতে মন ছিল না—নিজের শেখাতে এবং নিজের কাজে মন ছিল। দেখলুম সেই হ'ল আসল শেখানো। ছেলেরা যখন দেখলে—আমি আঁকি—এঁকে আনন্দ পাই—খেলার সময় খেলার মাঠে যেতে ভুলি। তারা ভাবলে, দেখতে হবে ব্যাপার খানা কি! দেখতে এসে অনেকে ফাঁদে পড়লো! নেশা লেগে গেল তাদের। আমার আশে পাশে কাগজ পেন্সিল রংএর বাক্স নিয়ে লেগে গেল কাজে। এম্‌নি ক'রে ড্রইং শেখানো হ'ল সুরু।

তারপর এখানে পাঁচ বছরে শিখিয়েছি যা' তার চেয়ে আমি নিজেই শিখেছি বেশী। শেখার বিরাম নেই সে চলবেই।

স্কুলে ছাত্র সংখ্যা প্রায় তিনশ'র কাছাকাছি। থাকে সবাই এখানে। খেলার মাঠ—সাঁতারের 'পুল', কিছুরই অভাব নেই। লাইব্রেরী, নিজেদের স্কুলের ছাপা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ডিবেটিং, তার ওপর ক্লাসের পড়াশোনা। ছুতোরের কাজ, মোটর মেরামতের কাজ, কামারের কাজ—'ইলেক্ট্রো প্লেটিং' পর্যন্ত ছেলেরা করছে।

রাঁধুনী নং ৬
এম্‌ এম্‌ সেন্ধি বয়স—১৫

শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলাম আমি। একটু ঢিমে তালে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের গতিতে চলার অভ্যেস ছিল এখানে এসে পড়লাম যেন মেইলট্রেইনে। কিন্তু নিজেকে উপযুক্ত ক'রে নিতে দেরী হ'ল না! 'সময় নষ্ট করা' কাকে বলে বুঝে ফেল্‌লুম। ছেলেরা যে বয়সে এখানে ভর্তি হয়—তখন তারা বাড়ীর অনেক কুঁড়েমী বড়োলোকী অচল ভাব নিয়ে আসে—এখানে নিয়মবদ্ধ জীবনে পড়ে কিছুদিনের মধ্যেই সচল হ'য়ে ওঠে। আসে যখন বয়স তাদের দশ এগারো। সেই বয়স থেকে আঁক্‌তে শেখে।

প্রথম বছর আঁকার কোনোই নিয়ম নেই—যা পায় আঁকে—কেবল বইএর ছবি দেখে দেখে যে আঁকবে সেটি হচ্ছে না! ১, ২ নং এর ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায় এতে ক'রে কেমন ছবি

১৪ বছরের ছেলের আঁকা নং ৭

বার হয় ওদের হাত থেকে। এরাই ঠিক পথে চল্‌লে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা শিল্পী হবে। যা দেখেছে নিজের চোখে এমন সহজ ভাবে আঁক্‌তে পারা সোজা কথা নয়! এতে ভয় নেই, ভাবনা নেই, যেমনি ভাবা অম্‌নি হাত চল্‌লো! এই যে সহজ আঁকবার শক্তি এটাকেই পিশে মারা হয় সাধারণতঃ স্কুলে—বই দেখে আঁকা, বোর্ডে আঁকা ছবি নকল করা—কিম্বা ঘটি বাটি দেখে আঁকা। একটু এদিক ওদিক হ'ল কি বকুনি কি চড়চাপড়! মনই লাগে না!

তারপর ৩ নং এর ছবি দেখুন। বার বছর পেরিয়েছে—এর মাথায় ছবি ঢুকেছে। এ আঁকার মধ্যে ফুটোতে চায় "বোঝা"।

এ সব ছবিতে আমার হাত পড়ে নি! এদের দেখাবার সাহস আমার নেই—প্রবৃত্তিও নেই।

৪ নং এর ছবি এঁকেছে একটি তের বছরের ছেলে। ছেলেটির মাথায় অনেক কিছু ঠুকে গেছে—ভালো খারাপ, দেশী, বিলাতী আঁক্‌বার পদ্ধতি বুঝ্‌তে আরম্ভ করেছে।

৫ নং ছবি মোগল ছবির থেকে নেওয়া। ১৪ বছর বয়সের ছেলের আঁকা। ড্রইং করে ভালো—এ হয়তো ভবিষ্যতে পরিষ্কার নিখুঁত কাজ করবে ভালো। যার যে দিকে মন যায় তাই হওয়া চাই—যার কাছে শেখে, তারই ছাঁচে গড়া হওয়া মানেই তাকে নকল করা। শিল্পে নকল চলে না!

৬ নং এর ছবি পনেরো বছরের ছেলের আঁকা। ৭নং এর ছবি একটি চোদ্দ বছরের ছেলের আঁকা। এদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে—তারপর এরা ভবিষ্যতে ছবি আঁক্‌বে কি না আঁক্‌বে জানি নে। না আঁক্‌লেও ক্ষতি নেই। কিন্তু এ কথা জোর ক'রে বল্‌তে পারি—ছবি বুঝ্‌বে। দেশের শিল্পীকে অবজ্ঞা করবে না।

যারা আঁক্‌তে পারে না—তারাও এখানে ছবি বুঝতে শেখে। ভালোমন্দ বিচার কর্‌বার শক্তি সঞ্চয় করে—এটা কম বড় কথা নয়।

নিষ্প্রদীপ !

তড়িৎকুমার ঘোষ

নিষ্প্রদীপ্ !—

লক্ষ আলোক নিভিয়া গিয়াছে !······অন্ধকার,

মেঘ্‌লা আকাশ্ ভাঙিয়া পড়িছে !······বন্ধ দ্বার,

স্তব্ধ-জীব্ !

—নিষ্প্রদীপ্ !!

বাপ্‌রে বাপ্ !—

বিশ্রী যে পথ······জ্বলিছে ও'কিরে ?······রক্ত চোখ্ ?

শব্দ এ'কার ?——ফিসি ফিসি করে,——তীব্র রোখ !

গোখ্‌রো সাপ্ ?

বাপ্‌রে বাপ্ !!

রক্ত···জল !—

যাত্রী এ'কোন্ পা'টিপে পা'টিপে······চল্‌ছে হায় !

রাত্রি ভীষণ ! চুপি চুপি চলো !······দস্যু যায় !!

শক্ত কল !

রক্ত···জল !!

কান্না কার ?—

চুপ ! কথা নয় ! শুনিতে পেয়েছো ?······সব্ যে যায় !

ও···ই ! কথা কয় ! গোঙায়ে গোঙায়ে——ডাক্‌ছে কা'য় ?

সব্ কাবার !

—কান্না কার !!

নিষ্প্রদীপ্ !—

সাব্‌ধানে ভাই রহিও সকলে ! মৃত্যু-রাজ—

হাঁক্ দিয়ে যায় !——নড়িতেছে দেখো——সত্যি আজ

হত্যা-জিভ্ !

নিষ্প্রদীপ্ !

নিষ্প্রদীপ্ !!

পুত্রী

ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

দুই

শ্রীমন্তের স্ত্রী রত্না যথার্থই ছিল সার্থক-নাম্নী—এমনি ছিল তাঁর দেহের সুগোল গঠন মুখের ছাঁচে-কাটা নাতি-দীর্ঘ আকৃতি, রংয়ের উজ্জ্বলতা ও চোখ-দুটোর আবেশময় দৃষ্টি। রত্নার গ্রীবাভাগ যদি হ্রস্ব না হ'ত এবং ওর অধরোষ্ঠের স্থূলতা যদি একটুখানি কম হ'ত, তবে যে সব যুবক ওকে বিয়ে ক'র্তে পারেনি বলে ব্যর্থ-মনোরথ হয়েছে, তাঁদের পক্ষেও রত্নার রূপের নিন্দা করা সহজ হ'ত না। এ হেন রতন অধ্যাপক-যুবকের কপালে যে জুটল, তার কারণ বোসেদের বাড়ীতে শ্রীমন্তের সঙ্গে কিরীটের উপজাত সৌহার্দ্য। রত্না ছিল কিরীটেরই মত এক অসম্পন্ন ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে। শ্রীমন্তের বিয়ের বছর কয়েক আগে পরিচিত-মহলে এমন একটা কিংবদন্তি ছিল যে কিরীটের সঙ্গেই রত্নার হবে বিয়ে। এ কিংবদন্তির মধ্যে সত্যের অংশ যত কমই থাক এটা ঠিক যে কিরীটের সঙ্গে রত্নার সঙ্গলাভের অবকাশ হয়েছিল প্রচুর এবং রত্নার বিয়েতে ঘটকালিও করেছিল ষোল-আনা কিরীট। তারই ফলে শ্রীমন্তের মা ব্রাহ্ম-কন্যাকে ঘরে আন্তে রাজি হ'লেন এবং রত্নার মা ও বিনা রেজেষ্ট্রিতে শালগ্রাম সাক্ষী রেখে কন্যাকে পাত্রস্থ ক'র্তে অস্বীকার কর্লেন না। কিরীটের কথা বলবার ঢং যেমনই হোক এবং সে কথার শ্রী না থাক্লেও এমনি একটা ধার ছিল যা'তে ফল ফল্‌ত মাঝে মাঝে আশ্চর্য-রকমের। শ্রীমন্তের বিঘ্ন-বহুল বিয়েটা তারই একটা উদাহরণ।

অনেক বাধা কাটিয়ে যে বিয়ে হ'ল, পরে তার যাত্রা-পথও একেবারে বাধা-মুক্ত হ'ল না। শ্রীমন্তের মা উমাতারা ব্রাহ্ম পরিবারে পুত্রের সম্বন্ধ ক'রে' যে ঔদার্যের পয়িচয় দিয়েছিলেন রত্নাকে পুত্রবধূরূপে পেয়ে সে ঔদার্যের পরিচয় দিলেন না। রত্না সেই যে প্রথম বৃহস্পতিবার একবার শ্বাশুড়ীর লক্ষ্মীর আসনের বাসন-গুলি মেজে এনেছিল, দ্বিতীয় সপ্তাহে মাথা-ধরার ভান করে তা আর করল না, তৃতীয় সপ্তাহে ইচ্ছা করে মার বাড়ী থেকে ফিরতে করল দেরী যাতে পূজার বাসন ধুতে না হয় এবং তার পরে একদিন ও ছাতের চিলি-কোঠায় শ্বাশুড়ীর লক্ষ্মীর আসনের পাশেও ঘেঁসল না। শ্বাশুড়ী-বৌর পরস্পরের সংস্কারের দ্বন্দ ক্রমশ বেড়েই চল্‌ল কিন্তু বাক্য-গম্ভীর রত্না সে সব ব্যাপার নিয়ে কোন উচ্চ-বাচ্যই করল না। শ্রীমন্ত সবই চোখের সামনে দেখ্‌তে পে' কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় মাকে কিংবা স্ত্রীকে কাউকে কিছুই ব'ল্ল না, শুধু কথা-প্রসঙ্গে মাকে এ স্ত্রীকে একে-অন্যের বিভিন্ন আদর্শের ব্যাখ্যা করে গেল। এতে কিছুই লাভ হ'ল না, স্ত্রী ও ম

মানসিক ব্যবধান বেড়েই চল্‌ল এবং দ্বন্দ-বহুল জীবনের ঘূর্ণিপাকে পড়ে শ্রীমন্তের বিবাহিত জীবনের মিলন-প্রক্রিয়া ত বাধা পে'লই, তাঁর পূর্বেকার পারিবারিক নীড়েরও শান্তি নষ্ট হ'ল। বোসেদের বাড়ীতে সান্ধ্য সম্মেলনে শ্রীমন্তের বিনা ব্যতিক্রমে যোগদানের এ-ও ছিল একটা বিশেষ কারণ।

বিয়ের প্রায় মাস ছ'য়েক পরে একদিন রাত্রে শ্রীমন্তের মা পুত্রের নিকট কাশীবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শুনে শ্রীমন্তের আহত সন্তান-হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। স্ত্রীকে সে রাত্রে যে কি বলেছিল সে শ্রীমন্তই জানে কিন্তু ফলে পরদিন ভোর-বেলা যে রত্না মায়ের কাছে গেল রাত্রেও আর ফিরল্ না। দুদিন বাদে শ্রীমন্তের মা ছেলেকে বল্লেন, "দেখ বাবা, আমার কাশী যাওয়া তুমি বাধা দিয়ো না। আমি কাশী গেলেও আমি তোমার মা-ই থাক্‌ব কিন্তু রত্নাকে পাওয়া চাই তোমার কাছে—নইলে সে তোমার স্ত্রী হতে পারবে না। তুমি আজই গিয়ে তাকে নিয়ে এসো এবং কালই তুমি আমাকে পাঠিয়ে দাও কাশীতে"। শ্রীমন্তের মা কাশীবাসী হ'লেন।

যে দিন শ্রীমন্তের মা কাশী রওয়ানা হ'লেন, খবর পেয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় কিরীট রত্নাকে স্বামী-গৃহে পৌঁছিয়ে গেল। শ্রীমন্ত যথা-সম্ভব মনের ভাব দমন করে সে রাত্রে স্ত্রীকে ব'ল্ল "রত্না, তুমি আমায় ভুল বুঝো না কিন্তু মা কাশী যাওয়াতে আমি নিজেকে অপরাধী বলে মনে কচ্ছি"। "কিন্তু তার জন্যে বোধ হয় দায়ী নই ঠিক আমি? যাও না দিন সাতেক পরে গিয়ে নিয়ে এসো তাঁকে।"

শ্রীমন্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এবং পরে স্ত্রীর চোখের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে বল্ল "মা আমার আস্‌বেন না রত্না। তিনি অভিমান করে'ত ঠিক যাননি', নিজের কর্তব্য-বুদ্ধি থেকেই গেছেন"।

মা কাশী-প্রবাসী হবার পর থেকে শ্রীমন্তের পারিবারিক জীবনের আর কোন দ্বন্দ রইল না; বরং সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনে যতটা সুখ-শান্তি থাকে, শ্রীমন্তের ভাগ্যে তার চাইতে অনেক বেশীই জুটল। তার কারণ শ্রীমন্তের পরিবার ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র, তা'তে ছিল না কোন প্রকার আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং রত্নার প্রকৃতি-গত গাম্ভীর্য ও শ্রীমন্তের চরিত্রের একান্ত ঔদার্য মিলে পরিবারের আবহাওয়াটা করে রেখেছিল যেন লোকালয়ের বাইরেকার কোন নীরব নিস্তব্ধ শান্তিপূর্ণ বিরাম-কুঞ্জের মত। রত্না মোটেই সঙ্গ-প্রিয় ছিল না, প্রতিবেশিনী বা আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ীতে যাতায়াত করত অল্পই। সখের ভিতর ছিল নভেল পড়া আর সেতার বাজান। শ্বাশুড়ীর কল্‌কাতা ছাড়ার পর থেকে রত্নার মা-বাবা উঠে এলেন ভবানীপুরে এবং তখন থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বেড়াতে আস্‌ত ওর ওখানে রত্নার কোন না কোন ভাই না হয় কোন বোন। মাঝে মাঝে ভাই-বোনেদের সঙ্গে রত্না মায়ের বাড়ীর কোন কোন আত্মীয়-বন্ধুদের ডেকে চা খাওয়াত। এমনি একটী চা'য়ের নিমন্ত্রণে ডাক পড়ে ছিল কিরীটের—যার উল্লেখ হয়েছিল বোসেদের বাড়ীর এক সান্ধ্য সম্মেলনে।

সেই চা'য়ের নিমন্ত্রণে আহূত ছিল কিরীট, রত্নার ছোট বোন রেবা ও রত্নার মায়ের পিসতুত ভাই অখিল পাল। রেবা রত্নার বছর খানেকের ছোট, দিদির রং ও স্বাস্থ্য তাঁর ছিল না কিন্তু দিদির চাইতে সে ছাত্রী ছিল অনেক ভাল। কারণ কিছুটা ইস্কুলে পড়েও রত্না ম্যাট্রিক অবধি এগোতে পার্লনা কিন্তু রেবা প্রাইভেট পড়েই শুধু ম্যাট্রিক নয়, আই এ অবধি পাশ করেছিল। অখিল ছিল অবিবাহিত, বয়স আন্দাজ চল্লিশ, কোন বিলাতী দোকানে ম্যানেজারি করে শদেড়েক টাকা রোজগার কর্ত। শ্রীমন্ত নিজে চা'য়ে থাক্‌তে পারেনি, কারণ সে দিন হটাৎ পড়ে গিছ্‌লো college এর staff meeting.

সকলে চায়ের টেবিলে উপবিষ্ট হ'লে রেবা টিপট্ হতে চা ঢালতে ঢালতে বল্ল "তবু ভাল, অখিল মামা, দিদির চা'য়ের দৌলতে তোমার দেখা পাওয়া গেল। দিদির বিয়ের পর বোধ হয় তিন চার দিনের বেশী তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি"।

অখিল ঈষৎ হে'সে বল্ল "আজ কাল আর কোথায়ও যাওয়া হয়ে উঠে না, রেবা। দোকানে বড্ড কাজ জানিসনে"।

রে—আরে অখিল মামা, তুমিত খুকি ভোলাচ্চ না। কাজ না হয় তোমার আজকালই পড়েছে। কিন্তু দিদির বিয়ে হয়েছে'ত দেড় বছর।

র—মিথ্যামিথ্যি ওকে দোষ দিচ্ছিস্ কেন রেবা—বছর খানিক ধরেইত অখিল মামার উপর দোকানের গোটা চার্জ পড়েছে না কি?

কি—কিন্তু সে চার্জ পাওয়ার আগেকার ছমাসটায় অখিল বাবু তাঁর ভাগ্‌নী-প্রীতি কমে যাবার কি কারণ দেখাবেন?

রে—কারণ দেখিয়ে কিছুই দরকার নেই? আস্‌বেন্ যখন না, তখন কারণ তার নিশ্চয়ই আছে। অখিল মামা স্বীকার করলেই বাঁচি যে উনি এখন আগেকার মতন আমাদের ওখানে আসেন না।

চা'য়ের পেয়ালা হতে মুখ উঠিয়ে' অখিল বল্ল "বেশ তুমি বাপু বড্ড অভিমানী মেয়ে"।

রে—দেখ মামা ক্রুটিকে আমি ক্রুটিই মনে করি, অভিমানের তাপ দিয়ে সেটাকে আমি হাওয়ায় উড়াতে জানি না।

কি—বাঃ রেবা, তুমি সোজা কথাগুলোকে এমন চমৎকার বাঁকিয়ে বলবার ভঙ্গি কবে থেকে আয়ত্ত করলে?

র—(হেসে) আপনি রেবাকে ক্ষেপিয়ে দেবেন না। অখিল মামা, আপনি ত দু কাপ করে চা খান। আপনাকে আরেক কাপ চা দি'।

অ—না রত্না, আমি এখন বিকালে চা খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি?

রে—কেন মামা, তুমিও কি কিরীট বাবুর মত হটাৎ হটাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে কাজ করবার মনন

কি—ক'চ্চ? আচ্ছা সত্যি বল না অখিল মামা, আজকাল দোকানের কাজ ছাড়া কিসে অত ব্যস্ত থাক যে আমাদের ওখানে আসতেই পার না। বল না, লক্ষ্মীটি।

অ—তোরা যা ভেবেচিস্ তা কিছু নয়?

রে—অপররা কি ভেবেচেন তা আমি জানি না? আমি ত নিজে কিছুই ভাবি নি এবং তাই তোমায় জিজ্ঞাসাও কচ্ছি। ভেবে দেখ আগে তুমি সপ্তায় দুদিন আসতে আমাদের ওখানে, আর এখন দুমাসেও একদিন আস না।

অ—বল্‌ব'খন অন্য সময়ে।

রে—না এক্ষনি বল না কেন? তুমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করো না, যা কিরীট বাবুর সাম্‌নে তুমি বল্‌তে পার না?

কি—আমার এখন সেটা বলাতে আপত্তি আছে? এখন রত্নার একটা সেতারের আলাপ শোনা যাক্?

ততক্ষণে চা খাওয়া শেষ হয়েছিল কিন্তু ভোটে সেতার বাজনা আগে শোনা হবে কিংবা অখিলের নূতন গতিবিধির খবর আগে শোনা হবে সেটা দশ মিনিট তর্ক-বিতর্কে ঠিক হল না। কিন্তু রেবার কৌতুহল অজেয়, সে মামাকে টেনে অন্য ঘরে নিয়ে গেল? ব্যাপার দেখে কিরীট ঘড়ির দিকে তাকাল এবং নিজের বাড়ীতে আহূতদের সঙ্গে যোগদান করবার জন্য রত্নার নিকট অনুমতি চে'য়ে ব'ল্ল, "আজ পালাই রত্না, শীগ্‌গির একদিন এসে তোমার সেতার বাজনা শুনে যাব। তুমি নাকি আজকাল চমৎকার বাজাও।"

"কে বল্লে আপনাকে?"

"শ্রীমন্ত নিজে।"

"নিজের স্ত্রীকে বাড়িয়ে বল্‌তে উনি খুব সপ্রতিভ।"

"এ তোমাদের দাম্পত্যের পরম গৌরব—বিশেষত এই আধুনিক কালে।"

"তা হতে পারে? কিন্তু সত্যিকার গৌরবের কোন প্রকারের অপেক্ষা না করাই উচিত। যাক্‌গে, শুনতে ইচ্ছা হয় আস্‌বেন। তবে আমার বাজনার এখনও কোন ওস্তাদি নাই বল্‌তে পারি।"

"তা হোক গে, তবু শুন্‌ব" বলে কিরীট শিষ্টাচারান্তে নিষ্ক্রান্ত হল।

এমনি সময়ে দ্রুতপদে ও উত্তেজিত ভাবে রেবা ঘরে ঢুকে রত্নার দিকে তাকিয়ে বল্ল "ছ্যাঃ ছ্যাঃ দিদি, এই অখিল মামার কাণ্ড শুনেছ"? আধ মিনিট থেমে এবং বিকৃত মুখাবয়বটা আরো বিকৃত করে বল্ল "উনি নাকি রোজ রাত্রে বিশ্রী বিশ্রী জায়গায় গিয়ে মেয়েগুলোকে সংস্কার করবার চেষ্টা করেন। কি ঘেন্না, মাগো"! অখিলকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ব'ল্ল "মামা, এ সব ক্ষ্যাপামো ছাড়। ওসব লোকের সঙ্গে কথা কইতে তোমার প্রবৃত্তি হয়"?

"রেবা, তুই না কথা দিয়েছিস্ এ সব ব্যাপার কারও সঙ্গে আলোচনা করবি না" ?

"তা ক'রব না। কিন্তু কি ঘেন্না, মামা, তুমি এ সব কাজ ছাড়"।

শুনে রত্না স্তম্ভিত হয়ে রইল, সে কোন কথাই বলতে পারল না। তরুণী দুটীর বিস্ময় ও জুগুপ্সা মন্দীভূত হবার আগেই অখিল ওদের নিকট হতে সেদিনকার মত বিদায় নিল। যাবার সময় হেসে ব'ল্ল "তোমরা এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না মেয়েরা এবং কারো সঙ্গে আলোচনাও করো না।"

(তিন)

কিরীট নিজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যথা সম্ভব ত্রস্তপদে হেঁটে এসে ও নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে ঠিক যোগদান কর্তে পারল না। বাড়ীর সামনেই রাস্তায় শৈবাল চাটুয্যের সঙ্গে সাক্ষাত হ'ল—সে তখন চা-পানান্তে বাড়ী ফিরছিল। কিরীট দাঁড়িয়ে শৈবালের নিকট আপনার কৈফিয়ত জানাল এবং সে যে অনিবার্য কারণে বাড়ীতে উপস্থিত থাকতে পারে নাই, তার জন্য বহুবার ক্ষমা প্রার্থনা কর্ল। চাটুয্যে ব'ল্ল "আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার দিদির আপ্যায়নের ঋণ শোধ দেওয়াই আমার শক্ত"।

কিরীট বাড়ী গিয়ে দেখল যে ওর দিদি তখনও চা'য়ের সরঞ্জামের পাশে বসে মৈত্রীর সঙ্গে কথা কইচে। হেমবালা ভাইকে ঘরে ঢুক্‌তে দেখেই ব'ল্ল "দিলুম কিরীট তোমার জন্য দশ হাজার একটা কেস্ করিয়ে"। বলেই প্রৌঢ়া মহিলাটী যেন একটু অপ্রভিত বোধ কর্ল এবং সেই মুহূর্তে মৈত্রীর দিকে ফিরে বল্ল "জান না বোন, আমাদের কিরীটের উপর কি ভয়ানক টাকার চাপ—কত লোককে যে ওর অল্প অল্প সাহায্য ক'ত্তে হয়। কিন্তু তা হলে কি হবে নিজের ওর ব্যবসা বুদ্ধি নাই বল্লেই হয়—তাই মাঝে মাঝে আমিই ওর জন্য মাথা ঘামিয়ে মরি—তুমি হয়ত এটা কি ভাবলে জানি না"।

মৈ—আমার ভাবনার জন্য অপরে তাদের দরকার মত কাজ করবে না, এটাত আমার চিন্তার মধ্যে আসে না। তা ছাড়া, ভাইয়ের জন্য কেন, কোন মেয়ে যদি নিজের জন্য টাকা অর্জনের চেষ্টা করেন, আমি সে চেষ্টাকে শ্লাঘার চোখেই দেখি।

হে—কি জান মৈত্রী, আমরা সেকেলে মেয়ে কি না। তাই ভাবনা হয় পাছে তোমাদের নূতন রুচি কিংবা নূতন আশাকে আমরা অজ্ঞাতে পীড়া দিই।

হেমবালা মুহূর্তের জন্য পাশের ঘরে উঠে গেল এবং ফিরে এসে ভাইয়ের হাতে একখণ্ড কাগজ দিয়ে ব'ল্ল "এই নাও কিরীট, তোমার প্রপোসেল ফর্ম অবধি আমি চাটুয্যেকে দিয়ে পূরণ করিয়ে রেখেছি"।

একটা বিরক্তি-মিশ্রিত বিস্ময়ের সহিত কিরীট ব'ল্ল "এ তোমার নেহাৎ বেনেমি হ'ল দিদি।

ভদ্রলোককে চা খেতে ডেকে তুমি শুধু তাঁর থেকে বীমা করবার অঙ্গীকার নিয়েই ক্ষান্ত হওনি, একেবারে ফরম পুরিয়ে রেখে ছেড়েছ। ভদ্রলোক আমাদের কি ভাবলেন জানি না"।

হেমবালা ভাইএর দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধভাবে হাসল এবং পরে মৈত্রীর দিকে ফিরে ব'ল্ল "দেখ বোন কিরীটের রকম দেখ, আমার উপর ওর বিশ্বাস নাই। তোকে বলচি কিরীট এই ফরম পূরিয়ে নেওয়াতে আমি শিষ্টাচার খর্ব করিনি, বরং আপ্যায়নটা যে পর্যাপ্তভাবে ক'র্তে পেরেছি ফরম পূরণটা হল তারই নিদর্শন। কি বল বোন্ তুমি" ?

মৈ—তা ঠিক জানিনে'। কিন্তু আমি একথা নিশ্চয়ই বল্‌ব, কিরীট বাবু, শিষ্টাচারকে বাচাবার জন্য আমি কোন ঈপ্সিত কাজকে পঙ্গু করব না। কারণ কাজই আসল, শিষ্টাচার উপকরণ মাত্র।

হেমবলা উল্লসিত হয়ে ব'ল্ল "ঠিক বলেছ বোন, ঠিক বলেছ। বোঝাও'ত তুমি ব্যাপারটা কিরীটকে, আমি ততক্ষণে একটা কাজ সেরে আসি"! দিদি অপসৃতা হ'লে কিরীট ব'ল্ল "মৈত্রী তোমার এই নূতন-নীতি বিদ্যালয়ে টাকা দিয়েও আমার দিদি ছাড়া ছাত্রী পাবে না, বলে দিচ্চি।"

উত্তেজিত ভাবে মৈত্রী জবাব দিল "সে কথা আমার জানা আছে কিরীট বাবু। মেকী-সর্বস্ব পৃথিবীতে মেকীর পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কথা না বল্‌লে সেকথা কারোর কাছেই যায় না। লোকে চায় অর্থ, দেখায় শিষ্টাচার; লোকে খোঁজে স্বার্থ, ভাণ করে ত্যাগের; লোকেরা চায় নিজেদের জাহির কর্তে কিন্তু মুখোস পরে আদর্শের; লোকেরা চায় সকলে সুখ কিন্তু তাদের কাছে ছড়ান হয় শাস্তি—শতাব্দীর সঞ্চিত মিথ্যা—যুগান্তের পাহাড়-প্রমাণ দুর্বলতা।

কি—এই বয়সে তোমার বেলুনে অত গ্যাস জুট্‌ল কোত্থেকে ?

মৈ—সে যেখান থেকেই জুটুক, এটা ঠিক যে আপনার শ্লেষ-কথায় সে বেলুন ধূলায় লুটাবে না ? আমার কথার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, তা' আমার বয়সের খাঠ্‌তিতে খাট হবে না। সৃষ্টি-গতির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি-জ্ঞানের ব্যঙ্ক-ব্যালান্সত আর ক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে না যে বলবেন নবীন যুগ হতে প্রাচীন যুগের জ্ঞান বেশী কিংবা তরুণীর জ্ঞান হতে বৃদ্ধার জ্ঞান গভীর। অভিজ্ঞতার মূল্য নির্ভর করে, কিরীট বাবু, সময়ের ব্যাপকত্বে নয়, অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ণত্বে।

কি—কিন্তু আমিত দেখ্‌চি তোমার জ্ঞানের তীক্ষ্ণতার চাইতে ব্যাপকতাই বেশী। তুমি দেখ্‌তে চাইচ অনেক খানি, ফলে দেখ্‌চ না কিছুই ভাল করে। এইটেই হল তোমার এবং সকলের পক্ষেই তারুণ্যের মুস্কিল।

মৈ—আমার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা কোথায় কম, সেটা বুঝিয়ে দিন। যে প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজে লিখ্‌তে পারবেন না, আমার লেখা খাতায় শুধু লাল পেনসিলের নম্বর বুলালে আমি অশ্রদ্ধার সহিতই সে নম্বর গ্রহণ কর্তে অস্বীকার করব।

কি—দেখ মৈত্রী, আমার প্রকাশ-ভঙ্গি আড়ষ্ট, আমি হয়ত নিজেকে তেমন ভাবে প্রকাশ কর্তে পারব না। কিন্তু আমার বলবার মোদ্দা কথা এই যে পৃথিবীতে সত্য-মিথ্যা কিছু নাই —আছে শুধু ভাল-মন্দ। আর এই ভাল-মন্দের ভেদাভেদ হয়েছে শুধু আর্থিক প্রভেদ থেকে। জীবনে কি সমাজে যত সব অসঙ্গতি তুমি দেখবে, তার সবকিছুরই উৎপত্তি এই আর্থিক প্রভেদে। এইটী ঘুচিয়ে দাও, দেখ্‌বে জীবন-যাত্রা সরল, সহজ ও প্রশস্ত হয়ে উঠেছে।

মৈ—আপনার কথা আমি মানি না, কিরীট বাবু। মেকীকে অগ্রাহ্য কর্তে হলে চাই মনের বীর্য, অর্থের প্রাচুর্যে তাহা পাওয়া যায় না।

কি—তুমি আমার কথা বোঝ নি কিংবা আমি আমার কথা স্পষ্ট করে তোমায় বোঝাতে পারি নি'। আর্থিক-প্রভেদ-হীন যে সমাজ, তাতে তুমি যাকে বল্‌ব মেকী, তা'র উৎপত্তিই হবে না। জীবনকে সার্থক ক'র্ত্তে হলে আর্থিক প্রাচুর্য চাই না—যতটা চাই আর্থিক অবস্থার সমতা। এমনি সময় হেমবালা ঘরে ঢুকে ব'ল্ল "কি গো মৈত্রী বোঝাতে পার্লে কিরীটকে যে তাঁর দিদি ক্ষ্যাপাও নয় কিংবা শিষ্টাচারকে পায়ে ঠেলেও চলে না।"

মৈ—না, আমি ঠিক পাল্লাম না। আচ্ছা, আমি এখন আসি তা হলে। রাস্তায় নেবেই গাড়ী পাব আসা করি।

কি—তা হয়ত পাবে না। তুমি দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি ডেকে গাড়ী কোথা থেকে। কিরীট ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে হেমবালা ব'ল্‌ল "তোমায় বোন ডেকে আজ কষ্ট দিলুম। তা হ'লে ও তুমি নেহাতই আপনার লোক, তাই আমি কিছু মনে করি না। ভাল কথা, মৈত্রী তোমার বাবার সঙ্গে'ত আমার সাক্ষাত হয় নি, কখন গেলে ওর সঙ্গে একটু নিরিবিলি আলাপ করার সুবিধা হয়, বলত"।

"তা আমি ওকে জিজ্ঞাস করে কিরীট বাবুর কাছে বলে দিব"।

"আলাপ করা বৈ'ত নয়, তা হলেও দেখ শীঘ্রই যেন দেখা করবার আমার সুবিধা হয়। আচ্ছা মৈত্রী, নিস্তারণ মিত্র বলে তোমার বাবার বুঝি বিশেষ একজন বন্ধু আছেন"।

"আছেন এবং বাবার কাছে আসেনও প্রায়ই তবে ওর সঙ্গে হৃদ্যতা কতটুকু আমার যথার্থ জানা নেই"।

"সে যতটুকু হৌক, যথেষ্ট আলাপ'ত আছে?"

"প্রচুর।"

হেম-বালা খানিক চুপ করে এবং পরে ভ্রূকুটী আদ্যোপান্ত কুঁচকিয়ে ব'ল্‌ল "নিস্তারণ বাবুরই না এক ছেলে গেল সপ্তাহে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হ'ল"।

"আমার ঠিক জানা নাই"।

মৈত্রী উত্তরটা এতটা উদাসীন ভাবে দিল যে হেমবালা তৎক্ষণাৎ একেবারে ভিন্ন সুরে বলে উঠ্‌ল, "তাইত, তোমার কি আর বোন এ সব খবর রাখবার কোন প্রবৃত্তি আছে? বাংলা দেশের কলেজের মেয়েরা যেমন নূতন বড় চাকুরে ছেলেদের নাম মুখস্থ করে বেড়ায়, তুমি ত আর সে সব কলেজের ছেঁচিপেঁচি নও। গোল্লায় যেতে বসেছে বোন, গোল্লায় যেতে বসেছে এ কালের পাশ করা মেয়েগুলো। কিরীট আমায় কতদিন বলেছে যে তোমার জুড়ি মেয়ে কলেজে কিংবা য়ুনির্ভাসিটীতে নাই। তোমার স্বাতন্ত্র দেখে সত্যি বোন আমি অবাক হয়ে গেছি?"

বল্‌তে বল্‌তে হেমবালা আশ্চর্য হয়ে দেখল যে মৈত্রীর মুখের উপর একটী রেখাও ফুটে উঠ্‌ল না। এমনি সময় কিরীট এসে নীচে গাড়ী দাঁড়ানোর খবর দিল। হেমবালাকে ছোট একটী নমস্কার করে মৈত্রী অচঞ্চল গতিতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেবে গেল।

কিরীট সে রাত্রে শুয়ে শুয়ে মৈত্রীর কথা অনেক ভাবল। এই পিতৃ-ক্রোড়ে বর্দ্ধিতা মেয়েটী যে ঠিক অন্য দশটী শৈশবে মাতৃ-হারা মেয়ের মত নয় তা অনেকদিনই কিরীটের মনে হয়েছিল। বহুদিনই তাঁহার স্বভাব-সুলভ ব্যঙ্গোক্তি দিয়ে মৈত্রীকে উত্তেজিত করে কিরীট বেশ একটু নির্ম্মম আনন্দও উপভোগ করেছে। তবে মৈত্রীর কথার ফেনিল উত্তেজনার মধ্যে যে পনর আনাই তাঁর তারুণ্যের নিদর্শন কিরীটের মনে সেই ধারণাটাই এক রকম বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু সে রাত্রের কথাবার্ত্তা হতে কিরীট মৈত্রীর সম্বন্ধে তাঁর আগেকার ধারণাতে সন্ধিহান হয়ে পড়ল। তাঁর যেন কেবল মনে হতে লাগল যে মৈত্রীর চরিত্রের মধ্যে সত্যই একটা আগুনের ফুল্‌কি কাজ ক'চ্চে। কিরীট ভাবতে চেষ্টা কর্ল্ল যে তরুণীদের দেহে-মনে একটা স্বাভাবিক উষ্ণতা থাকে, মৈত্রীর আচরণে ব্যক্ত যে বিদ্রোহ সেটা হয়ত সেই উষ্ণতারই বিকার মাত্র। কিন্তু কিরীট অনেক চিন্তা করেও মৈত্রী সম্বন্ধে এ ধারণায় পৌছিতে পার্ল্ল না। কারণ তাঁর কাছে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল যে মৈত্রীর কথায় বা আচরণে যে শক্তির প্রকাশ, তা'তে তাপের চাইতেও বেশী থাকে দহন-গুণ। মেয়েদের স্বাভাবিক উষ্ণতার মধ্যে থাকে স্পর্শাবেশ, মাধুর্য কিন্তু মৈত্রীর কথার মধ্যে থাকে একটা অকৃত্রিম ঝাঁজ, একটা পীড়া দেবার ব্যাগ্রতা। মৈত্রীর মধ্যে এই বিদ্রোহিনীর ঈষৎ সন্ধান পেয়ে কিরীট মনে মনে পরিতোষ লাভ কর্ল্ল।

এই মানসিক পরিতুষ্টির কারণ ছিল এই— কিরীট জীবনে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে বুঝেছিল যে এর গলদ কোথায়? তাঁর আকাঙ্খা উঁচু ছিল না কিন্তু অনুচ্চ আর্থিক আশাও যখন পূর্ণ হ'ল না, তখন জীবনে সুখের স্বপ্ন মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেছিল। কিরীট বিন্দু-মাত্র ভাবপ্রবণ ছিল না এবং নিজের জীবনের ব্যর্থতায় সে ঠিক সংসার-বিরাগী হ'ল না কিংবা সংসার-বিদ্রোহী হ'ল না? জীবনের বাস্তব রূপকে চোখের সামনে রাখতে তাঁর প্রবৃত্তি হত না এবং জীবনের কোন আদর্শ রূপ প্রচার করবার মত তার বীর্যের ও ছিল অভাব। কাজেই

ব্যঙ্গোক্তিতেই সে ক'রত নিজেকে প্রকাশ এবং মৈত্রীর চরিত্রের মধ্যে বিদ্রোহের আভাষ পেয়ে তার হয়েছিল পরম উল্লাস। সে রাত্রে মৈত্রীর কথা ভেবে ভেবে কিরীট কল্পনা কর্ল যে মেয়েটী যদি তাকেও ওর দিদির মত স্বার্থপর ও টন্‌টনে বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন মনে করে থাকে এবং মনে করে তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে, তবে সেটা বড়ই উপভোগ্য ব্যাপার হবে। সে স্থির কর্ল যে ভবিষ্যতে মৈত্রীর কাছে আরও বিকৃতভাবে নিজের স্বরূপ প্রকাশ কোরবে। এমন আপশোষও কিরীটের হল যে সেদিন সন্ধ্যায় মৈত্রীর সঙ্গে যতটা স্পষ্ট ভাবে আলোচনা করেছিল, তা না করলেই ছিল ভাল।

(ক্রমশঃ)

—————ঃ#ঃ—————

অমর ভট্ট

নবাব-জাদার প্রেমের অর্ঘ
পাষাণের চত্বরে
অনাহারী কোন বুভুক্ষু প্রেত
ঘুরে মরে বারে বারে ;—
বর্ণনা করে কঠিন পাথর
মানুষের অবিচার
চির বুভুক্ষু কঠিন পৃথিবী
ঋণ শোধ করে তার !—

যুগ যুগ ধরে মানুষের গড়া
প্রাণহীন ভগবান

মূকের শোণিতে তৃপ্তি পায়না
করিয়াছে অভিমান !—
প্রপিতামহের আদরের ধন—
স্বপ্ন বিলাসী কবি,
আপনার মনে চলিয়াছে এঁকে
বিভীষিকাময় ছবি ;
মাঝখানে শুধু জাগিয়া রয়েছে
মানুষের হাহাকার ;
চির অনাহারী কঠিন পৃথিবী—
ঋণ শোধ করে তার।

যুগের দেবতা করে ক্রন্দন
কঠিন মাটির তলে
সবুজ ধানের সুকোমল শিষে
তপ্ত শোণিত জ্বলে ;—
ভেদ করি আজ তোমার রচিত
মরণের কুহেলিকা
মানুষের চোখে জাগে ধীরে ধীরে
সপ্ত সূর্য শিখা ;—
আদিম বাসনা ছুটে বহি যায়
টুটিয়া রুদ্ধ দ্বার
চির অতৃপ্ত কঠিন পৃথিবী
ঋণ শোধ করে তার !—

নেমে আসে ধীরে বিদায় গোধূলি
তবু নাই তার শেষ,
নূতন কয়লা আমদানি হয়
জ্বলে ওঠে ফার্নেস ;—
সুনীল আকাশ ঢাকা পড়িয়াছে
ধাতব আস্তরণে,

মাঝখানে বসি বিকৃত প্রেতেরা
মরণের দিন গোণে ;—
তোমার লাগিয়া আপনারে তারা
খুন করে বারে বার—
চির ক্ষুধার্ত্ত সোনার পৃথিবী
ঋণ শোধ কর তার !—

জীবনের পথে উঠিয়াছে ঝড়
নেচে উঠে বৈশাখী
যুগের সারথী বল্গা তাহার
টেনে ধরে থাকি থাকি ;
মানুষের আশা ভবিষ্য মুখে
করিতেছে চুম্বন,
অনাগত ভ্রূণ তাই কেঁপে উঠে
লভি নব শিহরণ ;—
যুগ যুগান্তে আলো আঁধারের
অপূর্ব সঙ্গমে,
তোমার বক্ষে ক্ষুধার বাসনা
যত উঠিয়াছে জমে,
সব কিছু তার চিতার মতন
করে অনলোদ্গার
চির বুভুক্ষু সোনার পৃথিবী
ঋণ শোধ কর তার !!—
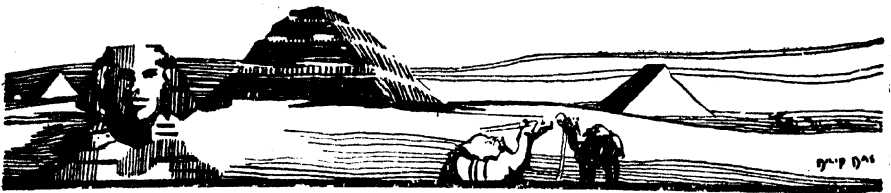
সমসাময়িক রাজনীতির ইঙ্গিত

অনিল চন্দ্র রায়

গান্ধীজি কিছুদিন আগে একটা কোলাহল তুলেছিলেন, সে কোলাহল আজ কামানের গর্জনে চাপা পড়েছে। কোলাহলটা আর কিছুই নয়, ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা নৈতিক প্রতিবাদের শোরগোল মাত্র। এ নিতান্তই আধ্যাত্মিক এবং বিশুদ্ধভাবে অহিংস। কিন্তু এই অহিংসা আজ পৃথিবীব্যাপী রক্তসমুদ্রে অস্ত গেছে। দুটো ঘটনা আজ সমসাময়িক রাজনীতিতে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে; একটী হ'ল, য়ুরোপে যুদ্ধের নির্মম বিস্তৃতি; অপরটী হ'ল, ভারতে হিন্দুমুসলমানের রক্তারক্তি। য়ুরোপে মানুষ আজ ছিন্নমস্তার মত রক্তগঙ্গা সৃষ্টি করেছে; ভারতবর্ষেও টাট্‌কা রক্তের ফিন্‌কী ছুটেছে পথে ঘাটে। এর মাঝেও বৃদ্ধ মহাত্মা অহিংসার বীণা বাজাচ্ছেন, সেবাগ্রামের নিরালা মাঠে বসে। তাঁর মৃদু প্রেমসঙ্গীতের বিরাম নেই।

কিন্তু বাস্তব বড়ো নিষ্ঠুর। হৃদয়বৃত্তির দিকে সে ফিরেও তাকায় না; মানুষের আকুলতাকে সে পায়ে মাড়িয়ে চলে। স্তূপীকৃত শবের ওপর দিয়ে সে চালিয়ে দেয় জগন্নাথের রথ। সমস্ত কৃত্রিম মাধুর্যকে সে কেটে করে খান্ খান্; সে হলো ইস্পাতের তলোয়ার। মিথ্যা আর শুধু কথার সে হলো কালান্তক শত্রু। দুটো বাস্তব ঘটনা আজ ভারতীয় জীবনের সমস্ত মিথ্যাকে গুড়ো গুড়ো করে দিয়েছে। সাম্প্রতিক রাজনীতিতে সে মিথ্যা হলো, 'অহিংসা'। আমাদের রাজনীতিতে এতদিন রাজত্ব চলেছে এই মিথ্যার। সত্যাগ্রহই হয়েছে মিথ্যাচারের অমোঘ মন্ত্র। বিশ্বাস নেই, অথচ স্থানে-অস্থানে এই মন্ত্রজপের বিরাম নেই। এতদিন এই ভণ্ডামী চলেছে। কারণ বাস্তবের ডাক্ এসে আমাদের ঘুমন্ত প্রাণে পৌছায়নি। কিন্তু আজ কালপুরুষ হানা দিয়েছে আমাদের দরজায়। তাসের ঘর তাই ভেঙ্গে পড়ছে।

কংগ্রেস হলো ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র। সে যন্ত্র এই গান্ধীবাদীয় মিথ্যার প্রভাবে বিকল হয়ে পড়ে আছে। বিপুল শক্তি, অফুরন্ত সম্ভাবনাকে বিফল করেছে এই সার্বজনীন অহিংসার মারাত্মক মৌতাত। এই মৌতাতের আবেশে আমাদের পুরুষত্ব হয়েছে স্তিমিত, আমাদের ব্যক্তিত্ব হয়েছে ম্রিয়মান। ভারতবর্ষ ভরে তাই বিচরণ করে বেড়াচ্ছে অকর্মণ্য ক্লীবের দল। একেতো দীর্ঘদিনের পরাধীনতা, তার ওপরে এই অহিংসার বিষ। আমাদের রক্তে যে ওজস্বিতা ছিলো তার মৃত্যু হয়েছে। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা বজ্রের মতন গর্জে উঠিনে। মিথ্যার প্রতি ঘৃণায় আমরা হিংস্র হয়ে উঠতে পারিনে। চোখের সামনে পাশবিকতা দেখেও আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে ঝড় ওঠেনা, যে ঝড় সংসারের সকল কদর্যতাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

কথায়, কার্যে, ভাবে, ভঙ্গীতে আমরা নির্লজ্জভাবে মোলায়েম। আমাদের ধার নেই, আছে স্থূলতা, বীর্য নেই, আছে বাক্‌পটুতা। জীবন্ত প্রখরতা নেই, আছে পাণ্ডুর মুমূর্ষুতা। তাই রায়পুরায় পচিশ হাজার নর-নারী গুণ্ডার ভয়ে বাড়ী ছেড়ে পালায়। আত্মরক্ষার সামর্থ নেই, দু'চোখে আর্ত দৃষ্টি আর শিশুর মত অসহায়। মনুষ্যত্বের সে যে কী লজ্জাকর অধোগতি তা' চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। মানুষ লোপ পেয়েছে, আছে মানবত্বের প্রেত। এই প্রেতলোকের ক্লেদাক্ত আবহাওয়ায় বসে মহাত্মাজী শোনাচ্ছেন অহিংসার করুণ আলাপচারি। মানবধর্মের এর চাইতে অবমাননা আর কী হতে পারে! অবসন্ন মনুষ্যত্বকে পরিণত করা হচ্চে ক্লীবত্বে। সেবাগ্রাম থেকে নাকি আবার কাকে পাঠান হয়েছে রায়পুরায় অহিংসার পাঠশালা খুল্‌তে। এরই নাম হলো অদৃষ্টের পরিহাস। গান্ধীজীর চোখে সে পরিহাস ধরা পড়েনি।

গান্ধীজীর চোখে ধরা না পড়লেও, আজ সাধারণ লোকের দৃষ্টি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। দুটো ঘটনার কথা বলেছি, যার আঘাতে আজ মৌতাতের নেশা দুচোখ থেকে বিদায় নিয়েছে। মিথ্যার মুখোস খুলে গেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং সাম্প্রদায়িক কলহ এই দুয়ে মিলে আমাদের মোহকে কঠিন আঘাত করেছে। প্রাণ বাঁচাবার নির্মম দায় উপস্থিত হয়েছে, এখন আর পালিশ করা বুলিতে চল্‌ছে না। আততায়ীর ছুরি আর বোমার বিস্ফোরণে অহিংসার ঝকঝকে বাণী কাজে আস্‌ছে না। শাণিত অস্ত্র এবং ততোধিক শাণিত, শক্ত মনোবৃত্তির প্রয়োজন আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছে। গান্ধীজী চেষ্টা করছেন গলার সুর চড়াতে; কিন্তু তার চেষ্টার ফল হয়েছে স্ববিরুদ্ধ উক্তি। একবার হিংসা, একবার অহিংসার স্তুতি তার কলমে ও কথায় মুখর হয়ে উঠেছে। বাস্তবের কাছে তাঁকেও মাথা নোয়াতে হয়েছে। তাই আত্মরক্ষায় মানুষকে রক্তপাতও করতে পরামর্শ দিয়েছেন। ক্লীবত্ব নয়, বীর্যবত্তাই হলো মানুষধর্ম। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর তাত্বিক গোঁড়ামী প্রবল হয়ে উঠেছে। আবার শুরু হয়েছে অহিংসার পাংশু স্তুতি। ত্রিশলক্ষ কংগ্রেসীকে বল্‌ছেন মার খেতে, অপর সবাইকে বল্‌ছেন মার দিতে। ইতিহাসের অমোঘ গতিতে গান্ধীবাদ এসে পৌচেছে এই অযৌক্তিক গোঁড়ামীতে। এই গোঁড়ামী লোকের কাছে ধরা পড়ে গেছে। মানুষের সহজ বুদ্ধি আজ উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। মিছে কথায় আর চল্‌ছে না। তাই আজ কংগ্রেসে ফাটল ধরেছে। জোড়াতালি দিয়ে অহিংসার ফাঁকিকে আর বজায় রাখা সম্ভব নয়। মিঃ মুন্সির কংগ্রেস বর্জন ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের ইঙ্গিত করছে। নূতন অধ্যায় মানে হল— ভারতবর্ষের প্রমুখ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস নতুন করে সহজবুদ্ধিকে ফিরে পাবে। কিন্তু সত্যটা অতি পুরানো। সার্বজনীন অহিংসাটা যে ফাঁকি, এ তত্ব অতি পুরানো। আমরা বহুদিন থেকে এ ফাঁকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলেছি। কিন্তু মৌতাতের মাত্রা ও ব্যক্তিত্বের মোহ প্রবলতর হওয়ায় আমাদের প্রতিবাদ কার্যকরী হয়নি। আজ বাস্তব পরিস্থিতি নির্দয় আঘাত হেনেছে, প্রচুর রক্তমোচনের মধ্যদিয়ে সেই আঘাত আমাদের আজ প্রকৃতিস্থ করেছে। এবং আরো করবে। ইতিপূর্বেও

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গান্ধীজীর সঙ্গে একবার অপর সভ্যদের মতভেদ হয়েছিল। অহিংসার মেকি দর্শন যে রুচিকর হচ্চে না, তা' গান্ধীভক্তরাও স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী আবার সেই আত্মপ্রতারণাকে কায়েম রাখবার ব্যবস্থা করলেন। আজ সেই পুরানো সত্যই আবরণ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। শোনা যাচ্ছে বহু কংগ্রেসী নেতা অহিংসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলবেন। গান্ধীজী ও নাকি কংগ্রেস থেকে অবসর নেবেন। কিন্তু গান্ধীজীর অবসর গ্রহণের ওপরে আমাদের আস্থা নেই। তাঁর নিষ্ক্রমণ হলো পুনঃপ্রবেশেরই ভূমিকা মাত্র। বারবার এই প্রহসন ঘটেছে। আজ বাস্তব জীবনে এ প্রহসনের স্থান নেই।

রূঢ় প্রয়োজনের দাবি আজ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। ভণ্ডামীও মিঠে কথায় আজ ক্ষুধা মিট্‌বেনা। ভণ্ডামী বল্‌ছি এই জন্য যে অহিংসায় কেউ বিশ্বাস করেনা। অহিংসার তথাকথিত শক্তির ওপরে কারুরই আস্থা নেই। অহিংসার ওপরে নির্ভর করে আগুনে ঝাঁপ দেবার সাহস কারুর নেই। যারা অহিংসার গুণব্যাখ্যা করেন তাদেরই কথা বল্‌ছি। সাম্প্রদায়িক বহ্নিতে 'ভস্ম হবার' জন্য যে সব অহিংস সাধক ঢাকায় এসেছিলেন, তারা অক্ষম প্রমাণ হয়েছেন। ঢাকায় আবার ২৬শে জুন থেকে রক্তারক্তি আরম্ভ হয়েছে; রাজেন্দ্র প্রসাদ, কৃপালিনী ইত্যাদি এসে গেলেন। তাদের উপস্থিতিতেই দাঙ্গা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। ইতিপূর্বে বোম্বেতে, আহমদবাদে, বিহারশরীফেও অমানুষিক বর্বরতা ঘটে গেছে। কিন্তু কোথায় সেই অহিংস 'শান্তি ব্রিগেড', যারা আততায়ীর উদ্যত অস্ত্রের সমুখে বুক পেতে অহিংসাকে জয়ী করবে। পথে ঘাটে যখন বর্বর হানাহানি চল্‌তে থাকে, তখন অহিংস সাধকদের দেখা যায় না। আগুন নিভে গেলে তারা ঘটনাস্থলে দেখা দেন এবং শান্তি ও অহিংসার স্তুতিবচন করতে থাকেন। একথা কারুর ওপরে ব্যক্তিগত ইঙ্গিত নয়। কারণ অহিংসা সার্বজনীন ধর্ম হতে পারে না। দু'একজনের ধর্ম হতে পারে। যাঁরা এই ধর্মের মুখর প্রচারক তাঁরা একটা অবাস্তব তত্ত্বকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। যা' অবাস্তব, তাই হলো মিথ্যা। আর বাস্তবের সমুখে মিথ্যার মৃত্যু হবেই হবে। আজ ভারতবর্ষে অহিংসার ফাঁকি প্রয়োজনের দাবিতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্চে। কৃত্রিম উপায়ে একে বাঁচাবার চেষ্টা করলে মনুষ্যত্বকে করা হবে পঙ্গু, ক্লীবত্বকে বসান হবে সিংহাসনে। কিন্তু আশার কথা, কৃত্রিম যা কিছু তার আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ। গত বিশ বছরের লালিত মিথ্যা আজ ভারতবর্ষে শেষ সীমায় এসে উপনীত হয়েছে। তারই শঙ্খধ্বনি আজ কালপুরুষ আমাদের শোনাচ্ছেন এই যুগসন্ধিতে।

তাই সমসাময়িক রাজনীতির প্রথম ঘটনা হলো গান্ধীবাদের বিলুপ্তি। এই বিলুপ্তির দাবি আজ পারিপার্শ্বিকের মধ্য থেকেই উদ্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক ঝড়ের দাপাদাপি চারদিকে; এর মধ্যে কংগ্রেসের আধ্যাত্মিক প্রতিবাদের ক্ষীণ কলরব মিলিয়ে গেছে। অন্ধকার রাজনৈতিক চিত্রে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের স্থান নগণ্য। কংগ্রেসকে যদি বাঁচতে হয় তবে তাকে নতুন মূর্তিতে রূপায়িত করে তুল্‌তে হবে। বাস্তব জীবনের সংগ্রামে নেমে আস্‌তে হবে কংগ্রেসকে। অবাস্তব অহিংসা-

নীতিকে বর্জন করে সংগ্রামকে স্বাভাবিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আজ দেশে সবল ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, যে ব্যক্তি শারীরিক শক্তিতে ঐশ্বর্যশালী। স্থূল ক্ষাত্রশক্তি ব্যতীত জাতি বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ হতে পারে না। সেই ক্ষাত্রশক্তিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে আজ দুর্বার করে তুলতে হবে। সামরিক মনোবৃত্তি ব্যতীত এই দীর্ঘস্থায়ী তমোগুণের হাত থেকে দেশের পৌরুষকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। সেদিন শ্রীমদনমোহন মালব্যও এই ঘোষণা করেছেন। "হিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করতে হবে; অহিংসার দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ হিংসাকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব।" চারদিক থেকেই দাবি উঠেছে, পশুশক্তির প্রয়োজন আছে; সেই শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে দেশের মনুষ্যত্বকে রক্ষা করতে হবে।

ভারতবর্ষে প্রতিক্রিয়াশীলদের নতুন চক্রান্ত হলো পাকিস্থান পরিকল্পনা। সমসাময়িক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার মধ্যে এই পরিকল্পনা লালিত হচ্ছে। য়ুরোপে যুদ্ধ, এখানে সর্বথা সংকট; এর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি দেখা দিয়েছে এই ভারতভাগের পরিকল্পনায়। ভবিষ্যৎ অন্তর্যুদ্ধ ও বর্তমান অশান্তির বীজ বপন করা হচ্ছে পাকিস্থান প্রচারের সূত্র ধরে। আমরা চাই ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। ভারতবর্ষ হবে অখণ্ড রাষ্ট্র। মধ্যযুগে আধুনিক সংস্কৃতি-বিপ্লব ঘটেনি, সেই যুগে ও ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করবার কল্পনা কোনো হিন্দু বা কোনো মুসলমান করেনি। আজ বিংশ শতকে যারা এই কল্পনা করছেন তারা ভারতবর্ষকে মৃত্যুর পথে পাঠাতে চান। মানুষ অতীতকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে না। কোনো না কোনো ঐতিহ্যকে তার মানতেই হয়। ভারতবর্ষের পরিকল্পনা ও ধারণার পিছনে কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল নেই। এর পেছনে আছে বহুযুগের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন; অকাট্য সামাজিক ঐতিহ্য একে ক্রমে ক্রমে বিকশিত করে তুলেছে; অনিবার্য রাষ্ট্রনৈতিক ক্রমবিকাশ ভারতবর্ষকে একটী অখণ্ড ক্ষেত্রতে পরিণত করেছে। বর্তমান জগতে সংহতির প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন সত্ত্বার সার্থকতা আজ সন্দেহস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত বেশী সংহতি হবে ততো হবে শক্তি ও স্থায়িত্ব। বিজ্ঞান এই সঙ্ঘ ও ঐক্যশক্তির প্রয়োজন ও সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলেছে। য়ুরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর আজ অস্তিত্ব নিরর্থক ও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানের বিরাট শক্তি ও উপাদানকে ব্যবহার করা আজ বড়ো বড়ো রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। ছোট-রা আজ বড়োদের কৃপায় বাঁচতে পারে। স্বকীয় মহিমায় টিঁকে থাকা ছোটদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আজ নানা ঢঙের নতুন দুনিয়ার (new order) ছড়াছড়ি। যারা ভারতবর্ষকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দুর্বল করতে চায় তাদের গতি পশ্চাতের দিকে। তাদের কল্পিত, বিভক্ত ভারত আধুনিক সঙ্ঘশক্তির চাপে ক্ষীণতেজ ও প্রাণহীন হয়ে পড়বে। সামরিক ও আর্থিক শক্তিতে ভারতবর্ষ হবে তৃতীয় শ্রেণীর নগণ্য রাষ্ট্র। যারা ভারতবর্ষের জাতীয় কল্যাণ চান, তাদের সকল প্রচেষ্টার ভিত্তি হবে 'অখণ্ড ভারত'। চল্লিশ কোটী মানবের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি হবে তাদের লক্ষ্য। সমস্ত জাতীয়তাবাদীদের একত্র হতে হবে

এই অখণ্ড ভারতের পীঠভূমির ওপরে। হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, খৃষ্টান হৌক, পার্শী হৌক, সকলের সমষ্টি-স্বার্থই হলো ভারতবর্ষের পূর্ণ অখণ্ডতা। সমস্ত ভারতে জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তি হলো এই অখণ্ডতা। মধ্যযুগীয় বিভেদ-চেষ্টাকে প্রতিরোধ করে সমগ্র ভারতীয় সমাজ পরিকল্পনা যাতে সম্ভব হয় তার জন্য সক্রিয় হতে হবে। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রতিষেধক হবে একমাত্র এই "অখণ্ড ভারত" মনোভাব। মিঃ মুন্সী এই মনোভাবের সমর্থন করে অন্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতবর্ষে কেন্দ্রাতিগ শক্তিবিন্যাস আরম্ভ হয়েছে। ভিতরে যেমন পাকিস্থান প্রস্তাবে এই মনোবৃত্তির প্রকাশ হচ্চে, তেমনি বাইরে থেকেও এই মনোবৃত্তির পরিপোষক সমর্থন আস্‌তে পারে। বহির্ভারতীয় শক্তি ও এমন আছে যারা ভারতকে ব্যবচ্ছিন্ন করে দুর্বল করাটাকে স্বার্থ-সঙ্গত মনে করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোর সঙ্গে এই আন্তর্জাতিক সম্বন্ধবিন্যাসের যোগ আছে বলে অনেকেই মনে করেন। যুদ্ধ যতই ঘোরালো হবে ততই স্বার্থসন্ধদের পক্ষে গোলমাল করা সুবিধাজনক হবে। ফলে স্থানে স্থানে হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা, অন্তর্যুদ্ধ ইত্যাদি আরম্ভ হবেই। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে আত্মরক্ষা করবার জন্য সংহতি গড়ে তোলা বই অন্য উপায় নেই। যুদ্ধের গতি ভারতবর্ষের দিকে। জার্মাণ আক্রমণের কক্ষ ইরাণ পার হয়ে ভারতের দিকে বিসর্পিত। এদিকে জাপানের অভিসন্ধিও ভারতের অভিমুখে উচ্চকিত হয়ে উঠ্‌ছে। আন্তর্জাতিক আবর্তের টানে ভারতবর্ষের গতিও জটীল হয়ে উঠেছে। এই সব নানা সংঘাতের ফলে ভারতবর্ষের ভিতরকার পরিস্থিতিতেও বিক্ষোভ দেখা দেবে। এই বিক্ষোভেরই অগ্রদূত হলো এইসব সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। এই হাঙ্গামার মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শকে সম্মুখে রেখে অগ্রসর হতে হবে। সে আদর্শ হলো সর্বভারতীয় সমাজব্যবস্থা। এবং তার প্রথম ধাপ হলো সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। আজ যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তাতে সর্বসাধারণের সংহত চেষ্টার প্রয়োজন। একদিকে অন্তর্ভারতীয় বিশৃঙ্খলা, অন্যদিকে বহিরাক্রমণ ; এই দুই থেকেই রক্ষা পেতে হলে গণসমাজকে সংঘবদ্ধ ভাবে প্রস্তুত হতে হবে। কেবল মাত্র সৈন্যদলের দ্বারা আজকালকার যুগে ষোলআনা কাজ হয় না। নাগরিকদেরও দলবদ্ধ হয়ে স্বাবলম্বী হতে হয়। ইংলণ্ডে ও অন্যান্য সকল দেশেই নাগরিক সাধারণ আজ বাধ্য হয়ে সংঘবদ্ধ হয়েছে। ছেলে, মেয়ে, প্রৌঢ় ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই "সমগ্র লড়াইর" যজ্ঞে সাধ্যমত আহুতি দিচ্ছে। এদেশেও সেই সমষ্টি-চেতনাকে জাগিয়ে তুলে সংঘবদ্ধ করতে হবে। নতুবা আসন্ন বিপদে রক্ষা নেই।

ভারতের কল্যাণই হবে ভারতবাসীর সকল বিচারের একমাত্র কষ্টিপাথর। আজ বামপন্থীদের অনেকেরই ভুল ভাঙ্‌ছে হয়তো। কিছুদিন আগে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দলের এক প্রস্তাব পাস হয়েছে, তাতে গান্ধীবাদীয় নীতি ও পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে।

অনেক দেরীতে হলেও এ শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট দলেরও কোনও সক্রিয় অস্তিত্বের পরিচয় জাতীয় জীবনে নেই আজ। দক্ষিণীদের সঙ্গে ঐক্যের লোভে তাদেরও বামপন্থীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয়েছে। আজ যুদ্ধের ও সাম্প্রদায়িক কলহের পটভূমিকায় গান্ধীয় সংগ্রামের চিহ্নও লুপ্ত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে আজ সকল কলরব স্তব্ধ হয়েছে। সকল প্রোগ্রামের নিষ্ক্রিয় অবসান ঘটেছে গত এক বছরের মধ্যে। এই অবস্থায় ন্যাশনাল ফ্রন্ট দলেরও ভুল ভেঙ্গেছে কিংবা আজো কংগ্রেসী ঐক্য ও দক্ষিণী মিতালীর ধূয়ো ধরে অতীতকে আঁকড়ে পড়ে থাকাই চলেছে, তা' জানিনে। তবে বামপন্থী ঐক্যকে বিনষ্ট করে ভারতীয় সংগ্রাম-শক্তিকে এরা দুর্বল করেছিলেন। আজ কর্মের ঘর জুড়ে শূন্য রয়েছে। কোন কথার স্তূপ দিয়ে সে শূন্যকে ভরলে ভারতীয় স্বাধীনতার পথ সুগম হবে না। অথচ তাই আজ তথাকথিত বামপন্থীরা করছেন। তার ফলে তাদের কথায় ও কাজে হচ্চে বিরোধ, তাদের কথা হচ্চে পরস্পরবিরোধী। পৃথিবীর সঙ্গে যোগ না রেখে কেবল সমাজতান্ত্রিক স্বপ্নলোকে পাখা মেলে উড়লেই পৃথিবীতে শ্রমিক-মজুরের স্বর্গ বস্‌বে না। যেখানে কাজ নেই কেবল কথা, সেখানে এই অবাস্তব মনোবৃত্তিই পেয়ে বসে মানুষকে। তাই আজ রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের খবরে কাগজে কাগজে রুশপ্রীতির বাণ ডেকেছে। যখন কার্যকরী সাহায্য করবার ক্ষমতা নেই একবিন্দু, তখন সহানুভূতির উচ্ছ্বাস দেখানো সহজ। তাই যারা ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য কোন কার্যকরী প্রোগ্রাম নিয়ে মাথা ঘামান না তারা আজ সুদূর রুশিয়ার বিপদে অশ্রুব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। যদি বামপন্থীদের ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গরজ দুর্বার হতো, তবে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকেও তারা দুর্বার করে তুলবার তপস্যা করতেন। কিন্তু কোথায় সে দুর্বার গরজ? স্বাধীনতা সংগ্রাম এখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্বল হয়ে রইলো; বামপন্থী ঐক্য পড়ে রইলো অনিশ্চিত কালের জন্য; জাতীয় সংহতি ভেঙ্গে গেল খান্‌ খান্‌ হয়ে: কংগ্রেস দ্বিধাভিন্ন; হিন্দু-মুসলমানে রক্তারক্তি চল্‌লো মাসের পর মাস। তার জন্য দুশ্চিন্তা নেই; এই মর্মান্তিক দুর্যোগকে অবসান করবার প্রাণান্ত প্রয়াস নেই; আছে কেবল পরস্পরকে গালাগাল দেবার মূর্খতা ও আত্মস্তুতির দুর্বিনীত অহঙ্কার। শ্মশানের অন্ধকারে বসে আমরা একে অন্যের দোষ ধরছি; অথচ সন্ধিক্ষণ দ্রুতবেগে অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে। সেদিকে আমাদের খেয়াল নেই। কিন্তু রুশিয়া যুদ্ধে আক্রান্ত হয়েছে শুনে আমরা আর দুঃখে বাঁচিনে। সমাজতন্ত্রের শোকে আমাদের দুই চোখে একেবারে সমুদ্রের পাণি বিগলিত হচ্ছে।

আমরা সমাজতন্ত্রের সমর্থক, রুশিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সুতরাং আমাদের সহানুভূতি সমাজতন্ত্রের দিকে আছেই। কিন্তু আমরা চাই ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় সমাজতন্ত্র ও ভারতীয় স্বাধীনতাই হল আমাদের সকল প্রচেষ্টার মৌলিক প্রেরণা। রুশিয়াকে সাহায্য করবার সামর্থ আমাদের নেই, আমরা কেবল কাগজ-কলমে প্রস্তাব পাস করেই খালাস। অক্ষমদের এই নিরর্থক উচ্ছ্বাস ভাবালুতার মূল্যে মূল্যবান হতে পারে; কিন্তু ব্যবহারিক মূল্যের

বিচারে এ নিতান্ত হাস্যকর। যারা নিজেকে সাহায্য করতে পারেনা তারা অপরকে সাহায্য করবার আস্ফালন করলে হাসির ব্যাপার হয় বই কি! যারা রুশিয়াকে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তাব পাস করছেন তারা ভারতের স্বাধীনতার লড়াইও চালাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এ দুটো কাজ একই সঙ্গে সম্পাদন করা যে সম্ভব নয় তা তাদের বোধগম্য হয়নি। তবে মোল্লার দৌড়ের মত, আমাদের দৌড়ের সীমাও কাগজ-কলম পর্যন্ত তাই রক্ষা। তাতেই দুদিক রক্ষা করে দিব্যি "ডুড্ ও টামাক" দুই-ই খাবার সুবিধাকে বজায় রাখা চলেছে। ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে আজ সর্বব্যাপী শূন্যতা। সেই শূন্যতার মধ্যে বসে আমরা ফাঁকা আওয়াজ করছি, আর paper bullet ছাড়ছি।

এই নিষ্ক্রিয়তার অবসান করতে হবে। অবাস্তব মনোবৃত্তিকে বর্জন করে আজ সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। যে শোচনীয় দুর্দশার পথে আমাদের জাতীয় জীবন আবদ্ধ হয়ে পড়েছে তার থেকে মুক্ত হতে হলে চাই অখণ্ড ভারতের সংহতি; অহিংসাকে বর্জন করে চাই জীবনের বাস্তব দর্শন; সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে চাই সর্বভারতীয় প্রচেষ্টা; ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন চাই সকল ক্লীবত্বের উর্ধে; গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে চাই আত্মরক্ষার কেন্দ্রস্থাপন। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের কব্জা থেকে মুক্ত করে আন্তে হবে গণসমাজকে এবং তাদের করতে হবে সংঘবদ্ধ। কিন্তু তার জন্য চাই প্রগতিশীলদের ঐক্য। অদ্যকার পরিস্থিতিতেও কি সেই ঐক্য সম্ভব হবে না?

জীবন সন্ধ্যায়

অমিয়া দাস

মোর জীবনের সন্ধ্যা বেলায়
রূপের প্রদীপ জ্বালিয়ে এলে
মরমী গো! মোর মরমের
মৌন বাণী শুনতে পেলে!
—এই আঙ্গিনায় তাই কি এলে পথ ভুলে?

আজকে আমার বিদায় বেলা
খেলতে এলে ফুলের খেলা;
আজ অবেলায় গাঁথ্‌ব কি হায়,
তোমার মালা ঝরা ফুলে!

আজ যে আমার জীবন দোলে
আলোছায়ার মাঝখানে
নিরুদ্দেশের যাত্রী আমি
ডাক্‌লে কেন ঘরের পানে?

এলে যদি হে বিজয়ী
শোনাও গো সুর চিত্ত-জয়ী
মরণ হয়ে এসো, প্রিয়,
আঁধার-রথে লওগো তুলে।

কুৎসিত

রাখাল তালুকদার

ছুটন্ত রাস্তাখানি চৌমাথায় আসিয়া থামিয়া পড়ে। ট্রাম বাস ও মোটর চলাচল কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হইয়া যায়;—সেটা যেন শ্রান্তিভরা চক্ষু ছুটি বুঁজিয়া আসার মতো। কোলাহল-খিন্ন সহরের মাঝে এ দৃশ্য হঠাৎ কারো চোখে পড়ে, কিন্তু তার বিচিত্রতা মোটের উপর লক্ষনীয় নয়। গৃহযাত্রী নবনীধরের চোখে রাস্তার এই অদ্ভুত গতিবিরতির চিত্র ধরা পড়িল না। রাস্তা সে পার হইতেছিল এবং হইয়াও গেল ডান ও বাঁপাশে তেরচা সশঙ্ক একটি দৃষ্টি হানিয়া। রাস্তার সুকঠোর পাষাণময় চেহারা হয়ত তার চোখে কেবলমাত্র পড়িল—আর পড়িল কেমন করিয়া সেই রাস্তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে গাঁথিয়া ফেলিয়া ট্রামের লাইন দুইটি সুদূর প্রসারিত। নবনীধরের কাছে বরং সেদিন রাস্তা পারাপার হওয়া খানিকটা সহজ বোধ হইল। কেমন করিয়া এ সম্ভব হইল? আধ মিনিটের জন্য চলন্তিক রাস্তাটি হাঁপ ছাড়িয়া লইল। তার পরই ক্ষুব্ধরোষে বিরাটাকৃতি মোটর বাস হাঁস-ফাঁস করিতে করিতে মোড়ের মাথায় আসিয়া দাঁড়াইল। যন্ত্রের আস্ফালন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ছাড়া পাইবার জন্য। —গোঁ-ও-ও-হু-স হুই—

ব্রেক কষিবার সুতীক্ষ্ণ আওয়াজ।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। আবার ছুটন্ত রাস্তাখানি বর্শার ফলায় সহরের এক অংশকে বিদ্ধ করিয়া ছুটিয়া চলিল। হাত মিলাইয়া সে সুবিধা মাফিক বিভিন্ন রাস্তার কর-পীড়ন করে; ছাড়পত্রের জন্য আবেদন জানায় পুলিশের নিকট। রাস্তাগুলি ছুটিতে ছুটিতে একে অপরকে পথের সন্ধান দেয়।—মানুষের তৈরি রাস্তার কোনরূপ স্ব-বিরোধ নাই।

* * * * * *

নবনীধরের অত ভাবিয়া দেখিবার সময় কম। সে ফিরিতেছিল লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া। সারাদিন ঘুপচি গুমোট ঘরের ভিতর থাকিয়া কলুর ষাঁড়ের মতো কাজের জোয়াল কাঁধে লইয়া বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তিতে দিন গুজরান ছাড়া আর কি,—তাই সে সন্ধ্যার পর একটু ঘুরিয়া আসে উন্মুক্ত খোলা প্রান্তরে।

সে চাকুরি করে সওদাগরি অফিসে। ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া সোজা সে মাঠে চলিয়া যায়। ঘণ্টা দেড়েক বড়জোর সে টিকিয়া থাকে সেখানে। ফিরিয়া আসিয়া এসপ্ল্যানেড হইতে কালীঘাটের ট্রামে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি দ্বি-যাত্রিক বেঞ্চিতে জুৎ করিয়া বসিয়াও

তবু সে আরাম খোঁজে। কিন্তু জীবন-বিধাতা তাকে ক্ষুণ্ণ করে তিক্ত অসন্তোষ দিয়া, নবাগত যাত্রীটি নবনীধরের পাশে বসিয়া নবনীধরের মতোই সে একাকীত্বের কামনা জানায়, বোধ করি, অদৃশ্য দেবতারই নিকট।

নবনীধরের তাই কোনদিন একলা একটি বেঞ্চিতে ফেরা হয় না।

সেদিন তো হইবার কোন উপায়ই ছিল না। যা ভিড় ছিল তাতে ফুটবোর্ড পা রাখিবার জায়গারও স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা ছিল না—একেবারে ঠাসা ঠাসি গাদাগাদি অবস্থা।

আকাশখানা বোধ হয় পরিষ্কার। গরমে ভাঁপিয়া উঠিবার যোগাড়। দেহনিঃসরিত ঘাম আসিয়া পাঞ্জাবী আঁটিয়া ধরিতেছে,—নবনীধর হাজার করিয়াও ঘামের সহিত পারিয়া উঠে না। তার উপর হুমকির ভয় আছে। হুমকি খাইয়া বেশ খানিকটা সে ঘামিয়া নেয়। কুঞ্চিত কপালে ফুটিয়া ওঠে ঘর্মরেখা, পাঞ্জাবীর আস্তিনের ডগা দিয়া সে মুছিয়া নিয়া বড়ো সাহেবের টেবিলে ফিতে বাঁধা ফাইলগুলো রাখিয়া আসে।

সাহেবের ইংরেজী ভাষা খুবই বনেদি, কিন্তু সাহেবদের মুখে তা মুখর নয়। স্বল্পভাষণে ওরা ধাতদুরস্ত।

ডাকঘণ্টা বাজিয়া উঠে, ক্রিং—বেয়ারা আসিয়া দাঁড়ায় ভেজানো দরজার সামনে আবার নবনীধরের তলব পড়ে। ফাইলগুলো বগল দাবা করিয়া সে আবার ফিরিয়া আসে। চাকুরী পঞ্জীর একঘেঁয়েমির একটি জেরটানা পরিচ্ছেদ। তিরিশ দিনের ভিতর একটি দিনকেও আলাদা করিয়া ধরিবার জো নাই।

নবনীধর জগুবাবুর বাজারের সম্মুখে আসিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল। আকাশের মনগুমরা স্বভাবের জন্য সে তিক্ত হইয়া উঠিল, কেন? ছিঁচ-কাঁদুনে স্বভাবটা ওর গেল না কিছুতেই! বৃষ্টি তো এখন নামিবে এবং নামিয়াছেও বেশ। কিন্তু একটু রহিয়া সহিয়া নামিলে হয়ত তার সুবিধা হইত। পদ্মপুকুর রোডের ৭২-এ, নম্বরের বাড়িটা বেশী দূরে নয়। হাঁটিতেও সে সুরু করিয়া দিল।

মোড়ের মাথায় আসিয়া সে দাঁড়াইল। পানের দোকানে গিয়া সে গত পাঁচদিনের পান খাইবার দেনা শোধ করিল—সাত পয়সা। দুইটি আনি দিয়া সে একটি পয়সা ফিরাইয়া লইল। নাতিস্পষ্ট রাস্তা, আলো-নিয়ন্ত্রিত কলিকাতা নগরী। হায়রে রূপনগরীর গৌরব! বাতিছাড়া সে রূপের কুশ্রীতাই চোখে পড়ে।

নবনীধর হাঁটিতেছিল। অ্যা, একি……। লাইটপোষ্ট ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইল একটি ছায়ামূর্তি। কতকগুলি লোকও সামনে দিয়া হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল, এবং মুখ টিপিয়া তারা

হাসিতেছিল ইতর ভাবে। নবনীধর আগাইয়া গেল। অমনি ঝপ্ করিয়া তার গায়ের পর আসিয়া পড়িল দ্বিতলের র'ক হইতে মেলিয়া দেওয়া একখানা শাড়ী। উপরে নজর ফেলিতেই নবনীধরের চোখের সম্মুখ হইতে কে যেন সরিয়া গেল। চুড়ির আওয়াজে সে আঁচ করিয়া লইল। হাতের চুড়িগুলি অনর্থক বাজিয়া উঠিল দীর্ঘছন্দে।

—র'ক থেকে আপনাদের শাড়ীখানা পড়ে গিয়েছে—বলিয়া রাস্তা হইতে শাড়ীখানা তুলিয়া লইয়া সে আগাইয়া যাইতে লাইটপোষ্ট ঘেঁষা সেই বিবসনা ছায়ামূর্তি মাংসল দেহিনীর রূপ পরিগ্রহ করিল।

একি নগ্নমূর্তি নবনীধরের চোখের সামনে!—ওঃ, কী কুৎসিত—। শাড়ীখানা লাইটপোষ্টের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া ছুটিয়া চলিল নবনীধর।

মাথা খারাপ হবে হয়ত মেয়েটির!

মেস-এর দরজায় পা দিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। নবনীধর ঘামিয়া একেবারে ভিজিয়া উঠিয়াছে। তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া সে আলো জ্বালাইবার সাহস পাইল না। চুপ করিয়া সে বিছানায় পড়িয়া রহিল। মনকে সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না, রাস্তায় যেন ছুটিয়া সে আবার বাহির হইয়া পড়িল। শক্ত করিয়া নিজের দেহকে সে নিশ্চল করিয়া রাখিল। দুর্বলতা আসিয়া পড়িয়া কেন যে মনকে উদ্দাম করিয়া তুলিল।

মানুষের আদিমরূপ তবে কী কুৎসিত!

বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে পামি দত্ত

১৯১৪ সনের পূর্ব্বের বছরগুলিতে যারা বয়স্ক ছিল তাদের মনে পড়বে কিভাবে রক্ষণশীল-দল তিরিশ বছর আগেও সামরিক আয়োজন বাড়াবার ও যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক করবার জন্য দাবী করেছিল এবং সেসময়েও তাদের প্রধান যুক্তিছিল জার্মান কর্তৃক ইংলণ্ড আক্রমণের সম্ভাবনা। সেই একই কৌশল আজও নেওয়া হোচ্ছে। যেই অসন্তোষ চরম সীমায় ওঠে চার্চিল অমনি ইংলণ্ড আক্রমণ সম্পর্কে আর একবার বক্তৃতা করেন। বৃটিশ প্রপ্যাগেণ্ডার দৌলতে পরপর বহু কাল্পনিক তারিখ হিটলারের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে।

ধনীরা এ-যুদ্ধ থেকে কোটি কোটি টাকা লাভ করছে······। ১৯১৬এর পেট্রোগ্রাডের সঙ্গে ১৯৪১এর লণ্ডনের তুলনা হয়!

নূতন এক উদারনৈতিক শ্রমিক-দল—লাস্কি, ব্রেলস্‌ফোর্ড, উইলিয়াম, বেভিন, কিংগসলী, মার্টিন প্রভৃতি বামপন্থী বীরেরা তাদের নূতন মতবাদ নিয়ে আরো এক পা অগ্রসর হোয়েছেন এবং কৃত্রিম বিপ্লবীর এমন কি মার্ক্সীয় ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগদানের নীতি সমর্থন করছেন। এরা স্বীকার করেন—যে এটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কিন্তু একনিঃশ্বাসে এও বলেন যে এটা কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয় ("লাস্কির—ইহা কি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ?")

বৃটিশ টরি শাসকগণ—এরাই প্রতিক্রিয়াপন্থী বিশ্ব-বিপ্লবের নেতা। এরা ফ্রান্সের চরম ফ্যাসিষ্ট ডিগলের, জার্মানির প্রতিক্রিয়াশীল রুশনিগ-ষ্ট্রেসারের, পোলাণ্ডের সোভিয়েট-বিরোধী কুটিল সিকোরিস্কির সঙ্গে মিতালি করছেন। এরাই এখন "ইউরোপীয় বিপ্লবের" এবং "শোষণের বিরুদ্ধে সর্ব্বহারাদের সংগ্রামের" নেতা বলে ঘোষিত হোচ্ছেন!

('লেবার মান্‌থলি'—Labour Monthly.)

পার্ল বাকের স্পষ্টভাষণ

গণতন্ত্রের ফ্রন্ট ইংলণ্ডের ভৌগলিক সীমানায় সঙ্কুচিত হতে দিলে চলবে না। কারণ ইংলণ্ডের বাইরেও গণতন্ত্রের আওতায় রয়েছে অগণিত মানব-সমাজ যাদের আজ ডাক পড়েছে যুদ্ধে গণতন্ত্রের রক্ষার জন্যে—অথচ এরা জানেনা গণতন্ত্র কি কল্যাণ বহন করে আনে, কি-ই বা তার রূপ।

আমার মনে পড়ছে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানব-সমাজের কথা—আত্ম-স্বাতন্ত্রের কোন অধিকার যাদের নাই। যে গণতান্ত্রিক শাসন তাদের রেখেছে গণতন্ত্রের ছোঁয়াচের বাইরে, যে শাসনতন্ত্র ভারতের প্রজাতন্ত্রের নেতা পণ্ডিত জহরলালকে চার বছরের জন্য কারারুদ্ধ করেছে—তারই নিরাপত্তার জন্য আজ ভারত লোকবল ও সমরোপকরণ বাধ্য হচ্ছে যোগাতে।

আমি আমেরিকার সমাজে অপাংক্তেয় ও নির্যাতিত ১ কোটি ২০ লক্ষ নিগ্রোদের কথা আজ মনে করিয়ে দেব। আমেরিকার শ্বেত অধিবাসীরা নিগ্রোদের নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে; তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সর্বতোভাবে পঙ্গু করার ব্যবস্থা করেছে, আর আজ তাদের তাগিদ এসেছে গণতন্ত্রের সাম্য ও স্বাধীনতার দুয়ার আগলাবার জন্য। তারা যদি আজ জানতে চায় এ কার স্বাধীনতা? কিসের সাম্য?—তাদের অপরাধটা কোথায়?

চীনের চাষীদের কথা আজ আমার মনে পড়ছে। তাদের উপর অত্যাচার না করেছে কে?—সরকার, ধনী, বুদ্ধিজীবী সকলেই। চাষীদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জনই অশিক্ষিত। তারই সুযোগ নিয়ে কখনও বা তাদের পঞ্চাশ বছরের ট্যাক্স আগাম আদায় করে দারিদ্রের চরম দুর্গতির মাঝে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে; ট্যাক্স পাবার জন্য তাদের উপর আফিম চাপান হয়েছে। বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় বংশের পর বংশ লোপ পেয়ে গেছে--তবুও তাদের দুর্গতির আসানের কোন চেষ্টা হয় নাই। তাদেরই ভাগ্যবান দেশবাসীরা পরম নিশ্চিন্তে চাষীদের এই নির্মম মৃত্যুকে লক্ষ্য করেছে, কারণ তাদের চোখে এটা হ'ল জন-সংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধির একটা প্রতিকারের পথ। আর আজ এই চীনা চাষীরাই তাদের শত্রুদের অমিততেজে বাধা দিচ্ছে।

জনসাধারণের স্বার্থ যদি আমরা উপেক্ষা করি তবে গণতন্ত্রের নামে কার স্বাধীনতা ও সাম্য আমরা রক্ষা করতে সমরে প্রবৃত্ত হচ্ছি? গণতন্ত্রের সীমানায় যারা বাস করে তাদের যদি না বাঁচাই তবে কি গণতন্ত্র রক্ষা পাবে? হিট্‌লার হয়ত বা হারবে কিন্তু গণতন্ত্রের এই সর্বব্যাপী ফ্রন্ট যদি আমরা স্বীকার না করে নেই, গণতন্ত্রের হারও অনিবার্য।

এটা আমাদের বোঝা উচিত যে পরস্পরের দুর্বল স্থানগুলি যদি চোখ ঠেরে যাই আমাদের বিপদ কাটবে না। আমেরিকাবাসীরা নির্ভয়ে ভারতের কথা বলবে; নিগ্রোদের অবস্থিতিও স্বীকার করতে তাদের সঙ্কোচ বোধ করলে চলবে না; তেমনি আজ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের চীন সম্বন্ধেও সত্যভাষণে ভয় পেলে চলবে না।

সাম্যের দেশ আমেরিকা পণ করেছে গণতন্ত্রের ঘর সামলাবে আর তাদেরই ঘরের ১ কোটি বার লক্ষ লোক বৈষম্যের নির্যাতন ভোগ করছে! চীনদেশ শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করছে আর সেখানকার চাষীদের উপর জমিদার-মহাজন ও সামরিকদের অত্যাচারের অন্ত নাই। এমনি ধারা স্ব-বিরোধী ব্যবস্থা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে যখন শুনি স্বৈরাচারের খাসমহলে লালিত ভারতবর্ষের ডাক এসেছে ইউরোপের স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ডের পক্ষে লড়াই করবার।

যতদিন পর্যন্ত এই বিরোধের অবসান না হবে গণতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব—তার অন্তর্নিহিত বিরোধের চাপে গণতন্ত্র ভেঙে পড়বে।

(পার্ল বাক্‌—'এশিয়া' নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকা হইতে।)

চাকুরীর ভাগ্য—

বর্তমান বিভিন্ন ব্যবসার অবস্থা ও বিভিন্ন ঋতুতে কাজের তারতম্য বিবেচনা কোরে চাকুরীর সম্ভাবনা কিরূপ Vocational Trend নামক পত্রিকায় তার একটা তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হোয়েছে—

*	ভালনয়	তুলা ও তামাক	**
**	মন্দনয়	ডিফেন্সের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প	****
***	ভাল	লোহা ও ইস্পাত	****
****	খুব ভাল	তৈরী জিনিষ উৎপাদন	***
কৃষি	***	খনিজ দ্রব্য উৎপাদন	***
মোটর ইত্যাদি ব্যবসা	***	খুচরা বিক্রির ব্যবসা	***
বিমানযান চালনা	****	বস্ত্রব্যবসা	**
পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবসা	****	মাল স্থানান্তরিত করার ব্যবসা	***
কয়লা উৎত্তোলন	*	গুদামের ব্যবসা	**
ঘরবাড়ী নির্মাণ	***		
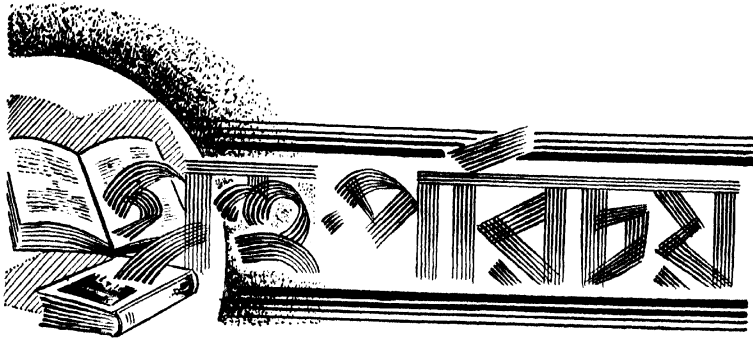
Pain, Sex. and Time—Gerald Heard.

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের চিত্ত সন্দেহচকিত হয়ে উঠেচে। পৃথিবীর চিন্তানায়করা সেই থেকে আজ পর্যন্ত নানা সমস্যা ও প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করছেন। নানা সমাধান, বাস্তব পরিকল্পনা মনীষীরা উপস্থিত করেছেন। বহুদিন পূর্বে স্পেঙ্গলারের 'Decline of the West' নামক পুস্তকের সভ্যতার গতি ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশিষ্ট মতামতগুলি পণ্ডিতসমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান সভ্যতার ব্যাধি সম্বন্ধে ফ্রয়েডও 'Discontents of Civilization' নামক বইয়ে লিখেছিলেন। তার পরে বর্তমান সভ্যতাব অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে বহু বই লেখা হয়েছে। মনীষীরা এ সম্বন্ধে একমত যে আধুনিক সভ্যতা একটা সংকটের মুখে এসে পৌচেছে। সভ্যতার গতিমুখে যে বিষ উঠেছে তাকে বাদ দিয়ে শুধু অমৃতটুকু উপভোগ করবার কৌশল আজো বের করা যায়নি। কিন্তু আজ মানব-সভ্যতা যদি নতুন রূপায়নের পথে পা না দেয়, তবে তার ধ্বংস অনিবার্য। সেই রূপায়নের স্বরূপ সম্বন্ধে আজ পণ্ডিতেরা গবেষণা সুরু করেছেন। ইংরাজী সাহিত্যে আলড্বাস্ হাক্সলী (A. Huxley), ওয়েল্‌স্ (H. G. Wells) ইত্যাদিরা মানব সভ্যতার নতুন রূপান্তরের চিত্র এঁকেছেন মননা ও কল্পনা মিশিয়ে। আলোচ্য গ্রন্থখানিও এঁদের বইগুলোরই সমগোত্রীয়। Gerald Heard সুখ্যাত লেখক। তাঁর লেখা পণ্ডিতদের চিন্তাকে সহায়তা করবে সন্দেহ নাই। তাঁর মতে আধুনিক সভ্যতার ব্যাধি হলো এই যে, উপকরণের ওপরে এর ঘটেছে অবাধ আধিপত্য কিন্তু হারিয়ে ফেলেছে এ সম্মুখের লক্ষ্য। ক্ষমতা আয়ত্ব হয়েছে মানুষের, প্রকৃতিকে করেছে মানুষ দাস, কিন্তু এ ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ ব্যবহার করবে কোন্ আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য? হারাণো আদর্শকে আবার ফিরে পেতে হবে, এই হবে এ যুগের নব অভিযান। কিন্তু কোন্ পথে? Heard বলছেন, সভ্যতার নতুন রূপান্তর হবে আধ্যাত্মিক পথে। মানব সমাজের বিবর্তন এতদিন ধরে চলে এসেছে স্থূলের ক্রমবিকাশে, বাহ্যজগতে নব নব শারীরিক রূপের উদ্ঘাটনে। মানুষে এসে শারীরিক স্থূল বিবর্তন শেষ হয়েছে। বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হয়েছে যেদিন মানুষ যন্ত্র (tool) আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু করলো। এ হলো মানবের বিবর্তনের যান্ত্রিক (technical) স্তর। এ স্তর ও শেষ হয়ে গেছে অদ্যকার যান্ত্রিক সভ্যতার চরম বিকাশে, শিল্পশক্তির বিপুল প্রসারে। এবার তৃতীয় স্তরে উত্তীর্ণ হবার সন্ধিক্ষণ আগত হয়েছে। এবার মানব সভ্যতার নব বিবর্তন হবে আত্মিক স্তরে। চেতনে ও অচেতনের সীমারেখা

এবার লুপ্ত হবে। বিশ্বব্যাপী প্রাণসমুদ্রের সঙ্গে মানুষের হবে অন্তরঙ্গ একাত্মবোধ। সত্য বস্তুর মধ্যে মানুষের সম্প্রসারিত চেতনা অবগাহন করে সত্যের অনাবৃত রূপকে অনুভূতিতে পাবে। মানুষ মুক্ত হবে কামোদ্দীপনা থেকে; থাকবে না মানুষের দুঃখ বেদনার (pain) অনুভূতি; মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হবে সহজ এবং হিংসাবর্জিত। সামাজিক ক্রমবিকাশের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আজকাল অনেক মুনীষী প্রচার করছেন। আমাদের দেশে শ্রীঅরবিন্দ ও অনেকটা এই ধরণের আধ্যাত্মিক রূপান্তরের পরিকল্পনা পৃথিবীতে উপস্থিত করেছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। শুধু Gerald Heard এর বইখানার প্রতি আমাদের দেশের পণ্ডিত ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

Hitler Youth—Hans Siemsen. Published by Lindsay Drummond; 7s. 6d.

জার্মাণীর যুবশক্তিই হলো জার্মাণীর সামরিক শক্তির ভিত্তি। হিট্‌লারের দুটো সামরিক বাহিনীর নাম হলো S. S. এবং S. A. এরাই হলো নতুন জার্মাণরাষ্ট্রের শিরোমণি। এদের সৈন্যসংখ্যা আসে জার্মাণীর "হিট্‌লার যুবসংঘ" নামক যুব-সংগঠন থেকে। "হিট্‌লার যুব-সংঘ" হলো জার্মাণীর যুবশক্তির সংঘরূপ। Adolf Goers নামক একজন "হিট্‌লার যুব-সংঘের" সভ্যের মুখ দিয়ে এই সংঘ সম্বন্ধে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে এই পুস্তকে। Goers জার্মাণ বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে এসে গ্রন্থকার সিমসেন'এর কাছে জার্মাণ যুবশক্তির বর্ণনা দিচ্ছে। এই হলো পুস্তকের মর্ম। বইখানার আগাগোড়া কেবল জার্মাণ যুবকদের জঘন্য শারীরিক ও মানসিক দুর্গতি ও তাদের ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের চিত্র দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। জার্মাণ যুবশক্তি হলো যৌন বৃত্তিতে কদর্য, সমাজ বৃত্তিতে নিষ্ঠুর, ঘুসখোর ও পানাসক্ত; মনুষ্যত্বের ক্লেদাক্ত বিকৃতি ঘটেছে জার্মাণ যুবজীবনে। এই বক্তব্যটুকু গ্রন্থকার পরিবেশন করেছেন জগতের সম্মুখে। আমাদের মতে বইখানা হলো তৃতীয় শ্রেণীর প্রচার-পুস্তক। কারণ একটা সমস্ত জাতির যুবশক্তিকে এমন হেয় ও জঘণ্য বলে প্রমাণিত করবার প্রেরণা যে উদ্দেশ্যমূলক তা' প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। হিট্‌লার-পন্থী যুবকদের জীবন-দর্শন ভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু তাদের কর্ম-শক্তি ও নানা ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করবার কারণ ঘটেনি আজো।

হালখাতা (ছোটদের বার্ষিকী)—**১ম বর্ষ, ১৩৪৮, দাম ১৲, ৪১ডি, একডালিয়া রোড, কলিকাতা।**

'হালখাতা' পেয়ে ছোটরা খুসি হবে। কেবল তাই নয়, শিক্ষাও পাবে। বাংলা সাহিত্যের যারা বিশিষ্ট নায়ক তাঁদের অনেকেরই লেখা এতে রয়েছে। এটা সম্পাদকদের কৃতিত্ব, বলতেই হবে। 'হালখাতা' সব দিক দিয়েই নতুনত্ব দাবি করতে পারে। কিন্তু একটা খুঁত আছে বলে আমাদের চোখে পড়ল। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা হলেও এর সবলেখা ছোটদের উপযুক্ত হয়নি; যেমন শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর হালখাতা প্রবন্ধটী। 'ফ্রান্সের বাক্‌শক্তিহীন শিশু পেয়েছে রাশিয়ার কোলে বাক্‌স্ফূর্তি'' "প্রচলিত ব্যবস্থা ভস্মীভূত করণের অনলকণা''—ইত্যাদি আরো বিস্তৃতভাবে সহজ ভাষায় ও ভাবে লিখলে সহজবোধ্য হতো। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক লেখা এতে স্থান পায়নি, এটাও চোখে পড়ল। স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে ছোটদের চিত্ত সচেতন হয়, দুর্ধর্ষ সংগ্রামে যে বলিষ্ঠ আনন্দ তার প্রবল আকর্ষণ ছোটদের মনে সহজেই জন্মে,—এমন যুগোপযোগী লেখা 'হালখাতায়' নেই। রাধারাণী দেবীর লেখা এবং কাজী আফসারউদ্দিন আহম্মদের প্রবন্ধ, এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের গল্প—এই তিনটি মাত্র লেখাতে যুগপ্রচেষ্টার ছোঁয়াচ কিছুটা আছে। এসব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও 'হালখাতা' সবদিকদিয়েই সফলতা লাভ করেছে।

'দীপঙ্কর'

"বিশ্ববন্ধু"

যুদ্ধের নব পর্যায় ঃ

(ক) রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের পৃষ্ঠপট

অবশেষে সত্যিই তাই ঘট্‌লো! ২২শে জুন (১৯৪১) রবিবার ভোরে চারটার সময় হিট্‌লার সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করেছে।

সমস্ত পৃথিবী দম বন্ধ করে শুনলো এবং বিস্ময়ে দুচোখ রগড়াতে লাগ্‌লো। কিন্তু সন্দেহের কারণ নেই; ২২শে বেলা ১১টায় মলোটভের বিবৃতি এবং সেইদিনই প্রাতে হিট্‌লারের ঘোষণা সকল সংশয়ের নিরসন করলো। ১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসে রুশ-জার্মাণ মিতালী আরম্ভ হয়েছিল; দেড় বছরের অধিক কাল পরে মিতালী ভাঙ্গলো। এই দেড় বছর ধরে সমস্ত পৃথিবীতে কতো জল্পনা-কল্পনা, কত হাহুতাশ এবং কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলেছে, এই কল্পনাতীত মিতালী সম্বন্ধে। এই মিতালীর জন্মও যেমন আকস্মিক এবং আশাতীত, এর অবসান-ও তেমনি অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য। অহি-নকুলের মৈত্রীর মত এই দুই পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রের সন্ধি পৃথিবীর ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় ঘটনা। এমন আর কখনো হয়নি। হিট্‌লারের ভাষায় বলশেভিকরা হলো 'blood-stained criminals', 'dregs of humanity'. আর বলশেভিকদের সঙ্গে সন্ধি? অসম্ভব; "……it would be folly to ally ourselves with a country whose master is the mortal enemy of our future. How can we release our people from this poisonous grip if we accept the same grip ourselves?" (Mein Kampf.) কম্যুনিজ্‌ম্ হলো মানবতার নারকীয় শত্রু, এর সঙ্গে বন্ধুত্ব? নৈব চ নৈব চ। এই হলো ফ্যাশিজ্‌ম্-এর মনোভাব রুশিয়ার প্রতি। ঐদিকে রুশিয়ার মনোভাবও জার্মাণ রাষ্ট্রের প্রতি সমান বিদ্বেষে পূর্ণ। ক্যাপিটালিজ্‌মের নির্মম শত্রু হলো সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং হিট্‌লার হলো সেই ক্যাপিটালিজ্‌মের নারকীয় সন্তান। কাজেই, হিট্‌লারের সঙ্গে মৈত্রী শ্রমিক স্বার্থের প্রতি

বিশ্বাসঘাতকতা বই আর কি হতে পারে? কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের জেনারেল সেক্রেটারী বিখ্যাত ডিমিট্রিভ্ ১৯৩৮ সনের ২৬শে জুন এক প্রবন্ধে ('ন্যাশনাল ফ্রন্ট') বৃটিশ ও অন্যান্যদের তীব্র ভাষায় গালি দিয়েছিলেন, কারণ এরা প্রকারান্তরে ফ্যাসিস্ত্দের কুকর্মে সাহায্য করছিলেন; "aid and abet the foul deeds of the German * * * plunderers." ফ্যাসিস্ত্রা হলো 'pirate,' 'war mongers' ইত্যাদি। ১৯৩৫ সনে কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের ৭ম কংগ্রেসের প্রস্তাবেও ঘোষণা করা হয়েছিল যে জার্মান ফ্যাসিস্ত্দের প্লান হলো ফরাসীদেশ, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, বাল্টিক রাজ্যগুলি এবং সর্বশেষে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করা। তারপরেই পৃথিবীব্যাপী ক্রুসেড্ আরম্ভ হলো ফ্যাসিজি্মের বিরুদ্ধে।

ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট্ গঠন করতে হবে, দেশে দেশে শ্রমিক সংহতি গড়ে তুলতে হবে? এবং এই ক্রুসেডের নেতা হবে সোভিয়েট ও ষ্ট্যালিন। ডিমিট্রিভ বললেন, ফ্যাসিস্ত্কে একঘরে করে রাখতে হবে, "the fascist aggressors must be isolated internationally" ইত্যাদি।

কিন্তু হায় বিড়ম্বনা, হায় ভবিতব্যের পরিহাস! ডিমিট্রিভের সকল প্ল্যানকে মাটি করে ষ্ট্যালিন এবং হিটলার, কম্যুনিজ্ম্ ও ফ্যাসিজ্ম্, পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলালেন। আন্তর্জাতিক আদর্শের সংঘর্ষকে ব্যাহত করে রুশ-জার্মান সৌহার্দের ভিত্তিস্থাপন হয়ে গেল। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এই সৌহার্দ দেড় বছর ধাপের পর ধাপ পার হয়ে গাঢ় মৈত্রীতে পরিণত হলো। এই মৈত্রীর ছায়ায় বসে নিশ্চিন্ত জার্মাণী একের পর এক য়ুরোপের রাজ্যগুলোকে গ্রাস করল।

তারপরে এলো রাশিয়ার পালা। হিটলার বল্লেন, রাশিয়া তলে তলে চক্রান্ত করছে জার্মাণীর বিরুদ্ধে, তাকে আক্রমণ না করে উপায় নেই। ষ্ট্যালিন বললেন, হিটলার বিনাদোষে আক্রমণ করেছে, সন্ধিশর্তকে অগ্রাহ্য করে।

(খ) রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের গতি

চার্চিল বলেছেন, রাশিয়া আক্রমণে যুদ্ধের চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হল। প্যারীর পতনে যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং ইংলণ্ডের বোমা-আক্রমণে তৃতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের ওপরে নির্ভর করছে সমস্ত যুদ্ধের নয় কেবল, সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যত। যুদ্ধের ভারকেন্দ্র মধ্যএশিয়া ও আফ্রিকা থেকে সরে গেছে রুশ সীমান্তে। ইংলণ্ড একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে বহুদিন পরে; কিন্তু রুশিয়া ঘায়েল হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিন ঘনিয়ে আস্বে একথা ইংলণ্ডের অজ্ঞাত নেই। আর তা হলে আমেরিকাই বা কোথায় থাকবে? তাই চার্চিল, ইডেনের বিবৃতিমুখে ব্রিটিশ সরকারের রুশ-প্রেম উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রকে এরা দুচোখে দেখতে পারেন না এবং রুশিয়া হলো এদের মতে অপাংক্তেয় একথা এরা স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেছেন। তবু সাময়িক প্রয়োজনে রুশিয়াকে সাহায্য-ও কর্তে প্রস্তুত আছেন, তার সঙ্গে মিতালিও পাত্তে রাজী।

আমেরিকাও রুশিয়ার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এখন কথা হলো, কার্যতঃ রুশিয়া কতো সাহায্য পাবে এবং সাহায্য পাবার পথ কোথায়। দূর থেকে 'লড়ো বাহাদুর, মরো বাহাদুর' বলা সহজ ও নিরাপদ কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে যারা মুখোমুখী লড়াই করছে তাদের সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ নেবার বন্দোবস্ত কোথায়? রুশিয়াকে আজ একাকী প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্চে। যেমন ইংলণ্ডকে করতে হয়েছে ইতিপূর্বে।

এদিকে আর্টিক সমুদ্র থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত দুহাজার মাইলব্যাপী আক্রমণে জার্মাণীর অগণিত সৈন্য, ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন রুশিয়ার ওপরে চড়াও করেছে। ফিনল্যাণ্ড, ল্যাট্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোলাণ্ড, উক্রেইন, বেসারাবিয়া—এই কটা রণাঙ্গণের মধ্যদিয়ে জার্মাণ সৈন্য চক্রাকারে রওনা হয়েছে; মস্কো ও উক্রেনের রাজধানী কিভের দিকেই সমস্ত বাহিনীর বিদ্যুৎগতি। এদিকে রুশিয়াও দশ মাইল চওড়া একটা প্রতিরোধ-রেখা গড়ে তুলেছে; এই প্রতিরোধ-রেখার নাম হল ষ্ট্যালিন লাইন। ষ্ট্যালিন-লাইনের আশ্রয় নিয়ে রুশিয়া গড়িলা-নীতিতে হিট্‌লার-বাহিনীকে পিছন থেকে বিদ্ধস্ত করবার চেষ্টায় আছে। ইতিমধ্যে জার্মাণী থেকে প্রচারিত হয়েছে, বিয়ালিষ্টক্ ও মিনস্ক এই দুই স্থান জার্মাণী দখল করেছে। কিন্তু দক্ষিণে বেসারাবিয়ায় জার্মাণ গতি প্রতিহত হয়েছে। নানা বিরুদ্ধ খবর দুপক্ষ থেকেই প্রচারিত হচ্চে। কিন্তু আসল কথা হলো এই যে, একাকী রুশিয়া দুর্দান্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে কতদিন লড়তে পারবে? আমেরিকা ও ইংলণ্ডেরই বা সাহায্য করবার সামর্থ কতখানি আছে? ওয়েনডেল্ উইল্‌কী বলেছেন, মৌখিক সহানুভূতির কোনই মানে নেই। আমেরিকা, ইংলণ্ডকে সাহায্য করেই কূল পাচ্ছে না, রুশিয়াকে কী করবে! 'New York Post' বল্‌ছে, "There is no honesty in asking the British to give their lives while we only supply the tools." আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান করার দাবি চারদিকেই উঠেছে; কিন্তু কবে রুজভেল্ট কথার রাজ্য ছেড়ে বাস্তবভাবে কাজে নামবেন! পৃথিবী তা দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে।

..

তুর্ক-জার্মাণ চুক্তি

গতমাসে রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের পরেই তুর্ক-জার্মাণ চুক্তি প্রথম শ্রেণীর ঘটনা। হিটলারের বল্‌কান অভিযানের সময় যখন একে একে সমস্ত রাজ্যগুলি হয় তার আনুগত্য স্বীকার করে কিংবা তার সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয় তখন তুর্কী কি করে দেখবার জন্য সকলে উৎসুক হোয়েছিল। কখনো কখনো মনে হোয়েছে তুর্কীর সঙ্গে জার্মাণীর যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। কিন্তু সে সময় তুর্কী নিরপেক্ষতা রক্ষা করেছে। সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত ১৮ই জুন তারিখে তুর্কী-জার্মাণ মৈত্রী চুক্তি আন্‌কারায় স্বাক্ষরিত হোয়েছে। তুর্কীর দিক্ থেকে সারাজোগলু এবং জার্মাণীর পক্ষে ফন্ প্যাপেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির সর্ত তিনটী (১) জার্মাণ ও তুরস্ক পরস্পরের

নাকি খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছে। যুদ্ধের গতি যা দেখা যাচ্ছে তাতে ভিসি বোধহয় খুব সুবিধে কোরে উঠ্‌তে পারেছেনা।

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধ ও জাপান

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের মতিগতি সম্পর্কে জগতের লোকের কৌতূহলের অন্ত নেই। কিন্তু এই কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারে যে তার সেদিক দিয়ে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। এক্সিস বন্ধুদের মধ্যে ইটালী ইতিমধ্যেই রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে—জাপ মন্ত্রীসভা কয়েকদিনব্যাপী বৈঠকের পর জাপান বর্তমান যুদ্ধের গতি সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করবে বলে ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণাতে নূতন আলো কিছু সাদা চোখে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ বর্তমান জগতে "সতর্কতার সঙ্গে" প্রস্তুত থাক্‌বার সামর্থ বা স্বাধীনতা যার আছে সেই—সে পথ অবলম্বন করবে নিঃসন্দেহ। জাপানের ভাগ্য খারাপ, এ পর্যন্ত যে কয়টী কূটনৈতিক চাল সে দিয়েছে তার কোনটাই বাঞ্ছিত ফল আনে নাই। প্রথমতঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের যে এ ফল হবে তা সে বোঝে নাই—যুদ্ধ ৪র্থ বছর অতিক্রম কর্‌লো কিন্তু এখন পর্যন্ত তা শেষ হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। যাতে এদিকে সে পূর্ণ দৃষ্টি দিতে পারে তার জন্য মিঃ মাৎসুওকা মস্কো পর্যন্ত পরিভ্রমণ কোরে রুশিয়ার সঙ্গে নিরপেক্ষতা চুক্তি করলেন কিন্তু তাতেও বিপদ এড়ানো গেল না। রুশ-জার্মান যুদ্ধ বেধে নূতন সমস্যার সৃষ্টি কর্‌লো। চুক্তি অনুসারে জাপান জার্মাণির মত রুশিয়ারও বন্ধু—দুই বন্ধুর বিপদে তার হয় মধ্যস্থতা করতে হয়, না হয় নিরপেক্ষ থাক্‌তে হয়। প্রথমটা অসম্ভব আর দ্বিতীয়টাও চিরকালের জন্য লাভজনক হবেনা। ইতিমধ্যে জার্মাণি জাপানের মন গলানোর চেষ্টা আরম্ভ কোরেছে। চীনে জাপানের তাঁবেদার নান্‌কিং গভর্ণমেন্টকে এতদিন জার্মাণি স্বীকার করতে রাজী হয় নাই—রুশের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে মত বদলেছে ও নান্‌কিং এর গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করেছে। জাপানের মন এতে টলবে কিনা জানা যায়নি—তবে জাপানের বন্ধুত্ব যে বেশী দাম দিয়ে কিন্‌তে পার্‌বে, সেই লাভ কর্‌বে—এটা হয়তো অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কাজেই জাপানের আপাতঃনিস্পৃহতাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে।

আমেরিকা

সম্প্রতি আমেরিকা আইসল্যাণ্ড দখল কোরে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি কোরেছে। বৃটেন আমেরিকার নিকটবর্তী কয়েকটী দ্বীপের স্থায়ী দখলীস্বত্ব আমেরিকাকে যেমন বিলি কোরে দেয় তেমনি আইসল্যাণ্ডের অস্থায়ীস্বত্বও বিলি কোরে দেয়—এই অধিকার বলে আমেরিকা আইসল্যাণ্ড দখল কোরেছে। অবশ্য আমেরিকা বল্‌ছে আইসল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ

কোরে এমন কি তার নিমন্ত্রণেই নাকি এরূপ করা হোয়েছে। আইসল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ সমস্ত প্রকার অধিকারই অব্যাহত থাক্‌বে এবং যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা আইসল্যাণ্ড ত্যাগ কোরে আস্‌বে। বর্তমানে আমেরিকার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আইসল্যাণ্ডকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা। অনুরূপ উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই বৃটেন সেখানে ঘাঁটি আগলাচ্ছে। সম্প্রতি কমন্স সভায় চার্চিল বলেছেন যে আমেরিকার কাজে বৃটেনের আপত্তি কর্‌বার কোনো হেতু নেই বরং বৃটেন তা অনুমোদনই করছে। আইসল্যাণ্ড দখল করবার কারণ বলা হোয়েছে—দুইটী; প্রথমতঃ আইসল্যাণ্ড যদি জার্মাণ বা ইটালীর দখলে যায় তবে আমেরিকা ও বৃটেনে বিমান আক্রমণ চালানো খুব সহজ হবে। সেটা পূর্ব থেকে অসম্ভব করা হোল—দ্বিতীয়তঃ আমেরিকা থেকে বৃটেনে খাদ্যোপকরণ পাঠানো বহু পরিমাণে নিরাপদ হবে। তাহোলে আমেরিকা শনৈঃ শনৈঃ আসরে নামছে ?

এই দখলের ব্যাপারটী মহানাটকের অন্যান্য "অভিনেতারা" কি ভাবে দেখছেন বোঝা যাচ্ছেনা—কারণ ইটালী ও জার্মাণি উভয়েই এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত নীরব। তবে মন যে তাঁদের এতে খুব সুপ্রসন্ন হোয়ে ওঠে নাই তা নিশ্চিত। জাপান কিন্তু আমেরিকার এইসব ব্যবহারে মানসিক স্থৈর্য রাখতে পারছেনা—এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের জন্য তৈরী হোচ্ছে—সে উদ্দেশ্যে নাকি নৌবহরও জড় কোরতে আরম্ভ কোরেছে। সংবাদ চাঞ্চল্যকর সন্দেহ নেই। এবং এই ভারতের ৪০ কোটি অরক্ষিত নরনারী—তারা চঞ্চল হোয়ে কর্‌বে কি ? বেশী চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে "ভারত রক্ষা আইনের" রক্ষাকবচ আছে—মুহূর্তে সমস্ত চাঞ্চল্য দূর কোরে নিশ্চল শান্তিতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে—আমাদের আবার চিন্তা কি ?

১১-৭-৪১

সাম্প্রদায়িকতার হিড়িক

গতমাসে বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব পূর্ণভাবেই চলেছে—বিভিন্ন স্থান থেকে যে কয়টী খবর পাওয়া গেছে তারমধ্যে গত ১৪ই জুন কুমিল্লা জেলায় চাঁদপুর অঞ্চলের হাজিগঞ্জ থানার অধীন মালিগাঁও গ্রামের দ্বারকানাথ ও অনাথশর্মার বাড়ী প্রায় ১০০ লোকে একত্রিত হোয়ে লুট করে।

১৯শে জুন নোয়াখালী জেলা থেকে একটী সংবাদ পাওয়া যায় ১২টার পর রায়পুরা থানার অধীন সায়েস্তানগর গ্রামের ধনী জমিদার শ্রীপ্যারীলাল রায়ের বাড়ীতে ১৪।১৫ শত লোক জড় হোয়ে চার্ শ মণ সুপারি লুট কোরে নিয়ে যায়, একটী লোহার সিন্দুক ও নিতে চেষ্টা করেছিল, নিতে বা ভাঙ্গতে না পেরে ফেলে রেখে যায়।

তৃতীয় ঘটনাও কুমিল্লা জেলাতে ঘটে। চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানার আলুনিয়া গ্রামের অভয়দাস মজুমদারের বাড়ী ২০।২৫ জন লোক আক্রমণ করে—সেদিন সার্কেল অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজে উপস্থিত হোয়ে লুণ্ঠনকারীদের চলে যেতে বল্লেও তারা যায় না। তারপর গুলি চালানো হোলে তারা চলে যায়।

গত ২৬শে জুন রাত্রিতে ঢাকাতে আবার দাঙ্গা ভীষণাকারে সুরু হয় এবং প্রায় দুই পক্ষ কাল ধরে গুপ্ত খুন ও আক্রমণ চল্‌তে থাকে—এই কয়দিনে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৪০ এবং আহতের সংখ্যা তার দ্বিগুণ হয়।

এখন প্রশ্ন হোচ্ছে এই সকল (১) দাঙ্গার মূলে কি কারণ রয়েছে ? (২) সেগুলি দূর করবার উপায় কি ? (৩) সে উপায় অবলম্বন করবার জন্য কি করা হোচ্ছে ? দাঙ্গার মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখি সাম্প্রদায়িক ইন্ধন জুগিয়ে যারা লাভবান হয় সে সকল লোকের বা দলের—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনা রয়েছে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সাম্প্রদায়িক ব্যবহারও একটি প্রধান কারণ। সম্প্রতি হক্ সাহেব আজাদের পৃষ্ঠায় তার জাত ভাইদের—ঢাকা দাঙ্গা তদন্ত কমিটির সম্পর্কে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে যে ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ দিয়েছেন তাতে যে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার উন্নতি হবে এমন

অনুমান করবার হেতু নেই। শরৎবাবুও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তিনজন ব্যক্তির নাম করেন এবং শান্তি রক্ষার জন্য ঢাকা থেকে তাদের সরিয়ে আনবার প্রয়োজনীয়-তার উল্লেখ করেন—কিন্তু আমরা যতদূর জানি সরকার পক্ষ সেরূপ কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু বহু সংখ্যক ছাত্র ও যুবক যারা সাম্প্রদায়িকতাতে বিশ্বাসই করে না তাদের আটক করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ যারা দাঙ্গা করে তাদের শাসনের ভয় নেই—চাঁদপুরে ১৪।১৫ শত লোক একত্র হোয়ে বাড়ী আক্রমণ করে। ঢাকা সহরে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয় এসব সম্ভব হয় শাসনের ভয় না থাক্‌লে—এতে বাংলা সরকারের যে অযোগ্যতা প্রকাশ পেয়েছে তা একেবারে তুলনাহীন। আমরা বিশ্বাস করি সাম্প্রদায়িকতা দূর করা সম্ভব এবং যে কোনো দেশের মঙ্গলকামীর করা একান্ত কর্তব্য। তাঁর প্রধান সর্ত, সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে জনসাধারণ মনে কোর্‌তে পারে যে শাসকদের কাছে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে এবং সম্প্রদায় বিশেষ অনিষ্টকর প্রশ্রয় পাবে না। দ্বিতীয় সর্ত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাজে ও কথায় অসাম্প্রদায়িক হওয়া। এ সম্পর্কে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রীদের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, তারা উভয়েই পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন—যে হিন্দুস্থান, পাকিস্থান ও শিখস্থান—কোন প্রকার বিশেষ স্থানই তারা প্রতিষ্ঠা করতেই দেবেন না তাদের নিজেদের প্রদেশের মধ্যে। এ সম্পর্কে বাংলার প্রধান মন্ত্রী নীরব কেন? তৃতীয়তঃ, দাঙ্গাকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া। সিন্ধুর আইন ও শৃঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার গোলাম হোসেনের উক্তির উল্লেখ কর্‌ছি। তিনি মন্ত্রীত্ব নেবার সময় সুক্কর দাঙ্গাজনিত অত্যন্ত অশান্তি ছিল। তিনি বলেন "হয় আমি দাঙ্গা বন্ধ করবো না হয় মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করবো"—। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবার মত মনোভাব তো নেই-ই বরং তাদের কাজের সমালোচনা করলে প্রমাণ করতে তারা বদ্ধপরিকর হন যে এটা সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র অর্থাৎ মুসলমানপ্রধান মন্ত্রীত্বের বদলে হিন্দুপ্রধান মন্ত্রীত্ব গঠন করবার চেষ্টাই এর উদ্দেশ্য। চতুর্থতঃ, জনসাধারণকে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করতে দেওয়া। কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়—মহাযুদ্ধের ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ শান্তি যে কোনো সময় ব্যাহত হোতে পারে—তার জন্য জনসাধারণকে আত্মরক্ষায় সক্ষম করা এখন সবচেয়ে বড় কর্তব্য। জনসাধারণেরও এদিকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টার প্রয়োজন—তা নাহোলে সাম্প্রদায়িকদের হাতে আগামীকালে লুঠতরাজের অজুহাতে ধনপ্রাণ রক্ষা অসম্ভব হবে। আজ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই এবিষয়ে অবহিত হোয়ে সচেষ্ট হওয়া দরকার কারণ কোনো প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এবিষয়ে যে কোনো নির্দেশ পাওয়া যাবে তার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ ভাবে যাঁরা পাকিস্থানের ধূয়া ধরেছেন তাঁদের সীমান্তের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেবের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি বল্‌ছেন "বর্তমান সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এক বিরাট পরিবর্তন আসিতেছে এবং এই পরিবর্তনকে আমাদের অনুকূলে লাগাইবার জন্য হিন্দু-মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক"। ডাঃ খান সাহেব

বলেন "দাসত্বের আবহাওয়ায় কাহারো ধর্ম নিরাপদ নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতা না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের স্ব স্ব ধর্মও নিষ্ঠার সহিত পালন করা যায় না।"

আশা করি আমাদের দেশের ধর্ম-ধ্বজীরা একথাগুলি চিন্তা কোরে দেখ্‌বেন।

আইনের অতিপ্রয়োগ

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে ভারতরক্ষার ব্যাপারে দেশের লোক এই দেড় বছরে বেশ অভ্যস্ত হোয়ে উঠেছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এ জগন্নাথের রথ চল্‌তে চল্‌তে পায় বাধা, তাতে নানা গোল বাধে—তারই কয়েকটী প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে।

নাগপুরের একটি জনসভায় বক্তৃতা করবার জন্য নাগপুর ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা মিঃ রুইকার ভারতরক্ষার দায়ে ধরা পড়েন। বিচারের পর দণ্ডিতও হন—এই বিচারের বিরুদ্ধে তিনি আপীল করেন এবং দায়রা আদালতের বিচারে মুক্তি পান কিন্তু এ ব্যাপারে চারদিকে নানা সমালোচনা হওয়াতে গভর্ণমেণ্ট বিব্রত হোয়ে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন—*কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানেও একই ফল হয়, হাইকোর্ট ও নিম্নআদালতের রায় বহাল* রাখেন এবং মন্তব্য করেন যে, *"স্বাধীনতার জন্যে গণআন্দোলন মাত্রেই সমর প্রচেষ্টার বিঘ্নসৃষ্টি* করা নয়।" কিন্তু এই একই অভিযোগে অর্থাৎ গণসংগঠনের অপরাধে সমস্ত ভারতময় কত কর্মী যে বন্দী হোয়ে আছেন কত জেলে তার হিসাব কে রাখে?—তাদের, বন্দী থাক্‌বার একমাত্র কারণ বিচারের বিভ্রাট, যুক্তি নয়।

দ্বিতীয় ঘটনা—কল্‌কাতার শিখ নেতা ও দেশ দর্পণ কাগজের সম্পাদক মিঃ নিরঞ্জন সিং তালিবকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে বোম্বাই হতে পুলিশ ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার কোরে আনে ও তাঁকে জামীন পর্যন্ত দেয় না। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার কোরে ১০ দিন জেলে রাখে—সম্প্রতি বিচারে তিনি শুধু যে বেকসুর খালাস হোয়েছেন তাই নয়, বিচারক রায় দেবার সময় মন্তব্য করেছেন যে তিনি সাম্প্রদায়িকতা প্রচার তো করেনই নাই বরং তাঁর বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপন করতে তিনি চেয়েছেন।" কিন্তু আশ্চর্য হোচ্ছি ভেবে সবচেয়ে বড় অপরাধ কি তা জজ সাহেবের জানা নেই।

আর একটি উদাহরণ—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক—মৌলভী আস্‌রাফুদ্দীন চৌধুরীর আপ্রাণ চেষ্টায় কুমিল্লাতে আসন্ন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বন্ধ হোলো। কিন্তু তাতে হবে কি? বক্তৃতা দেবার অভিযোগে তাঁকে জেলে যেতে হোলো তিন মাসের জন্য।

প্রফেসার জ্যোতিষ ঘোষ, পণ্ডিত ধারানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার গাঙ্গুলী ও হেমন্ত বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাগণ হরিপালে এক বক্তৃতা দেবার জন্য অভিযুক্ত হন। শ্রীরামপুর আদালতে এক বছর যাবত বিচারের পর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও চারশত

টাকার কারাদণ্ড হয়। আপীলে প্রফেসার জ্যোতিষ ঘোষ ছাড়া আর সকলেই বেকসুর মুক্তি পান। জ্যোতিষ বাবুর ২০০ টাকা জরিমানা হয়।

এ-কয়েকটি ঘটনা দেখে এরপর ভারতরক্ষা আইনের কবলে যারা পড়েন তাঁদের ভাগ্য সম্পর্কে কৌতূহল হয়। যাঁদের আটক কোরে রাখা হোয়েছে তাঁদের সকলের যদি বিচার হোতো তবে কার ভাগ্যে যে কি ফল হোতো বলা যায় না।

সে যা হোক, বিচারও হবে না আর তার ফল দেখে কৌতূহল নিবৃত্তি করাও চল্‌বে না; ইতিমধ্যে ভারতরক্ষার উদ্যোগপর্ব ভারতের সর্বত্র বিভীষিকা ছড়াতে থাকবে।

কংগ্রেসে মতসংঘর্ষ—মুন্সীজীর সঙ্গে গান্ধীজীর মতবৈষম্য

যা' অনিবার্য তাই ঘটেছে। গত বিশ বছর ধরে গান্ধীয় অহিংসা কংগ্রেসী রাজনীতির কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। অহিংসার যে একটী সীমা আছে, তা' গান্ধীজী স্বীকার করেন; কাজেই অব্যর্থ নিয়মে কংগ্রেসে আজ ভাঙন ধরেছে। জুন মাসের শেষদিকে বোম্বের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্রসচিব *শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সী কংগ্রেস বর্জন করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ হলো এই যে অহিংসার একটা সীমা আছে বলে তিনি মানেন। ধর্ম, ধর্মস্থান, গৃহ, নারীর মর্যাদা ও প্রাণরক্ষার* জন্য হিংসার আশ্রয় নেওয়া দোষের তো নয়ই, বরং মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। কিন্তু গান্ধীজী শ্রীভোগীলাল লালাকে লিখিত পত্র প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, হিংসার দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করা কংগ্রেসে থেকে চলবে না। এমনকি যে সব ব্যায়ামাগারে হিংসভাবে আত্মরক্ষার কৌশল শেখান হয় তাদের সঙ্গে সংশ্রব পর্যন্ত কংগ্রেসীরা রাখতে পারবে না। মুন্সীজী বহু ব্যায়ামা-গারের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন; সংশ্লিষ্ট থাকা কর্তব্য মনে করেন। কাজেই মতভেদটা খুব গভীর। শোনা যাচ্ছে মুন্সীজীই একা নন। আরো বহু কংগ্রেসী তাঁকে অনুসরণ করবেন। যদি বিশ্বাসের ও মতামতের মর্যাদা থাকে এবং আদর্শের সততা থাকে, তবে অনেকেরই কংগ্রেস ছাড়তে হবে। নতুবা গান্ধীজীকেই কংগ্রেস ছেড়ে যেতে হবে। প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের দিক থেকে বিচার করে অহিংসার পরীক্ষার জন্য গান্ধীজীর অন্য ক্ষেত্র নির্বাচন করা উচিত। ভারতের সবচাইতে বড়ো গণপ্রতিষ্ঠানকে একটা কৃত্রিম নৈতিকতার শিকলে বেঁধে পঙ্গু করে রাখবার দিন গত হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একা গান্ধীজীর ওপরে নয়, অগণিত সাধারণ সদস্যের ওপরে। এরা যদি আজ নির্ভয়ে নিজেদের মতামতের ওপরে দাঁড়িয়ে গান্ধীবাদকে অস্বীকার করেন তবেই কংগ্রেসে সত্যের মর্যাদা সুরক্ষিত হবে। নতুবা ব্যক্তির মোহ যদি আজও আমাদের সকল যুক্তি ও বিচারকে আচ্ছন্ন করে থাকে তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল সম্ভাবনা বিফল হবে।

মুন্সীজীর পরবর্তী প্রোগ্রাম হলো পাকিস্তান-বিরোধিতা। তিনি চান 'অখণ্ড হিন্দুস্থান" আন্দোলন। আমাদের পূর্ণ সমর্থন এই প্রস্তাবের পেছনে আছে। ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রয়োজন

সেখানে এই ছোট ও মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গুলি যদি ধ্বংস পায় তবে যেমন বেকার সমস্যা বাড়্বে তেমনি ভারতকে আরো পরমুখাপেক্ষী হোতে হবে। অথচ তার জন্য মাথা ব্যাথা কার?

কিছুদিন আগে কল্‌কাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স কোনো একটী শিল্পের জন্য সাহায্য চেয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ কোরেছিল কিন্তু সরকার এই মোড়লি সহ্য না কোরে নির্দেশ দিলেন শিল্পের মালিকেরা সোজাসুজি সরকারের কাছে আবেদন না কোরলে তা বিবেচনা করা হবে না। ছোট ছোট শিল্পগুলির পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে আবেদন করার অসুবিধা অতি সহজেই বোঝা যায়—তাদের পক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতা গ্রহণ করা স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়—কিন্তু সরকারের তা সহ্য হোলো না, কে জানে যদি এ ভাবে সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্য দিয়ে বিপদ ঘটে। সর্বত্র তাই বিচ্ছিন্নতা যত বেশী পরিমাণে জাগিয়ে রাখা যাবে—কি রাষ্ট্র ক্ষেত্রে, কি শিল্পক্ষেত্রে ততই মঙ্গল। ঘুরে ফিরে একজায়গাই আমরা আসছি। বার বার সাম্রাজ্যবাদের রুদ্ধ-দরজায় মাথা খুঁড়ে শক্তিক্ষয় হোতে বা মাথাটা যেতে পারে হয়তো কিন্তু তাতে ঘরে ঢোকা সহজ হবে না—অন্য পথ দেখ্‌তে হবে—সমস্ত জাতির মধ্যে কবে এ কথাটী বীজ-মন্ত্রের মত ছড়িয়ে পড়্বে?

চাউলের ও কাপড়ের সমস্যা.

ভারতবর্ষের স্বার্থের সঙ্গে বর্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তবু ভারতকে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছে। আধুনিক লড়াই এমনই সর্বগ্রাসী ব্যাপার যে তাতে দেশের সমস্ত অর্থ ও সামর্থ্য আহুতি না দিয়ে নিস্তার পাওয়া দুষ্কর। কাজেই যুদ্ধের অব্যর্থ ফল হিসাবে নিদারুণ অর্থ, অন্ন ও বস্ত্র সংকট সকল দেশে দেখা দেবেই। সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে যারাই গবেষণা করেছেন তারা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন সাম্রাজ্যবাদের পরিণামে যুদ্ধ ঘটবেই এবং যুদ্ধের পরিণামেও সংকট দেখা দেবেই। যুদ্ধে যে সব দেশ সাক্ষাৎভাবে লিপ্ত হয়েছে, যে সব দেশের বুকের ওপরে বোমা ও বিমানের ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে তাদের দুর্দশার কথা ছেড়েই দিলাম। যারা ভারতেবর্ষের মত কিছু দূরে থেকে অর্থ ও জন দিয়ে সাহায্য করছে তাদেরও দুর্দশা দিনে দিনে শোচনীয় হয়ে উঠতে বাধ্য। ভারতবর্ষেও যুদ্ধজনিত সংকট আরম্ভ হয়েছে। এর প্রথম সূচনা হয়েছে খাদ্য ও বস্ত্রের দুর্ভিক্ষে।

বাংলায় চাউলের দাম আগুনের মতো বেড়েই চলেছে। ৬ টাকা দিয়ে চাউল কিনে আমাদের গরীব দেশের কজন লোক পেটের ক্ষিদে মেটাতে পারবে? চারদিকে তাই আজ শোনা যাচ্ছে দরিদ্রের ক্রন্দন ও মধ্যবিত্তের হাহাকার। কিন্তু এই অন্নদুর্ভিক্ষের প্রতিকারেরও কোনো পথ সরকার বাহাদুর খুঁজে পাচ্ছেন না। তারা বিবৃতি বের করে এবং দুর্ভিক্ষের কারণগুলো বিশ্লেষণ করেই খালাস। ইতিমধ্যে দুটো বিবৃতি বের হোয়েছে। অন্নাভাবের তিনটে কারণ: (১) বাংলা-

দেশে যে ধান জন্মে তাতে বছরের খোরাক কুলোয় না, ব্রহ্মদেশ থেকে চাউল আমদানী করতে হয় (২) এবার যুদ্ধের জন্য জাহাজ পাওয়া যাচ্ছে না, তাই আমদানী অনেক কম (৩) এবছর ফসল বহু নষ্ট হওয়ায় মজুদী চাউলও খুব কম আছে। (৪) যুদ্ধের জন্য এদেশ থেকে বহু চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়েছে (৫) ব্রহ্মদেশেও চাউলের অভাব আছে কারণ সেখান থেকে জাপান, হংকং, মালয় ইত্যাদি দেশ বহু অতিরিক্ত চাউল কিনে নিয়েছে। কারণগুলো জানা গেল, কিন্তু প্রতিকার কি? প্রতিকার একমাত্র চাউলের আমদানী বাড়ানো। কিন্তু জাহাজ কোথায়? বাংলা গভর্ণমেণ্ট জানিয়েছেন, জাহাজী কর্তাদের কাছে আশ্বাস পাওয়া গেছে ভবিষ্যতে জাহাজের কিছু সুবিধা হতে পারে। এ আশ্বাসও অস্পষ্ট। তাছাড়া রেঙ্গুনে চাউলের দামও এবার অনেক বেড়েছে, রপ্তানীর দরুণ মণ প্রতি বৃদ্ধি ১৸৵০, জাহাজ ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে মণ প্রতি ।০, ব্রহ্ম সরকারের নতুন রপ্তানী ট্যাক্স দিতে হচ্ছে মণ প্রতি ৵৫, মোট ২৵৫ করে মণপ্রতি বৃদ্ধি হয়েছে। কাজেই এই আগুনের দামের চাউল রেঙ্গুন থেকে এনে এদেশে কিছু পরিমাণ ফেললেই বা এই দুর্মূল্য চাউল কিনবে কে? সরকারের উচিত ছিল জাহাজের চেষ্টা আগে থেকেই করা আর দাম বাড়াবার আগেই সম্ভবমত চাউল আমদানী করে রাখা। তখন গাফিলতী করে এখন কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করার কোনই মূল্য নেই। দারিদ্রের কান্নায় দেশ ভরে যাবে কে এর প্রতিকার করবে?

কাপড়ের বেলায়ও সেই একই অবস্থা। ভারতে উৎপন্ন কলের ও তাঁতের কাপড়ে চাহিদা মেটে না। আমদানী করতে হয় বিদেশ থেকে। বিদেশ থেকে আমদানী বন্ধ হয়েছে, আর এর ওপরে যুদ্ধের জন্য গভর্ণমেণ্ট কলগুলোকে খাটাচ্ছেন যুদ্ধের বস্ত্রের জন্য। কাজেই কাপড় দুর্মূল্য হয়েছে, দুষ্প্রাপ্য হবে শীগ্‌গীরই। সুতারও অভাব তীব্র। এ সমস্যারও কোন সমাধান গভর্ণমেণ্ট করেননি। তথ্য সংগ্রাহক কমিটী (fact finding committee) একটী করা হয়েছে। কিন্তু কমিটির দ্বারা কতটুকু কী হয়েছে বা হবে, তা অজ্ঞাত। গভর্ণমেণ্টের যদি কল্পনাশক্তি বা দৃঢ়দৃষ্টি না থাকে তবে দেশকে রক্ষা করবে কে?

কৃষক আন্দোলনে হাওড়া

বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি, এ কথা স্বীকার করতে হবে। একটী প্রাদেশিক কৃষক সভার অফিস কলকাতায় আছে শোনা যায়; কিন্তু বাংলার ২৯টী জেলায় কোনো সংগঠনের বালাই এদের আছে কিনা সন্দেহ। বিহার, ইউ-পিতে যেমন মণ্ডলে মণ্ডলে কৃষক-সংগঠকরা প্রাণান্ত পরিশ্রমে কৃষকদের শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংস্থা গড়ে তুলেছেন, বাংলায় তা' আজো কল্পনাতীত। এখানে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই বচনে বিশারদ, কিন্তু ক্ষেত্র-কর্মে হাতে-কলমে কিছু করবার বেলায় লোক পাওয়া দায়। বিশেষতঃ গ্রামে থেকে কাজ করবার কর্মী বিরল। সহরে বসে সভা সমিতিতে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনা করা

সহজ। কিন্তু জলে-ঝড়ে, রৌদ্রে-বৃষ্টিতে, মাঠে-ঘাটে ঘুরে অশিক্ষিত চাষীদের মধ্যে কাজ করতে শক্ত মেরুদণ্ডের দরকার হয়। বাংলাদেশে তাই কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী হয়নি। মাত্র যে তিন চারটে জেলায় কিছু কিছু কৃষক আন্দোলন হয়েছে তার মধ্যে হাওড়ার নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত নিতাই মণ্ডলের নামে ইতিপূর্বে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, তাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে চাষীদের জন্য। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত বিষ্ণু সামন্ত, ক্ষিতীশ সরকার, নরেন্দ্র চৌধুরীর নামেও কিছুদিন আগে ভারতরক্ষা আইনের মোকদ্দমা আনা হয়েছিল। অপরাধ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধ অমান্য ক'রে এরা শোভাযাত্রা করেছিলেন এবং 'সুভাষবাবুকী জয়', "জমিদারি প্রথা ধ্বংস হোক" ইত্যাদি ধ্বনিও এরা করেছিলেন। জমিদারি প্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে মতামত থাকাতে এবং তা' প্রচার করাটা যে ভারতরক্ষার কী বিঘ্ন করছে, তা' বোঝা দুষ্কর। তাছাড়া সুভাষ-প্রীতিটা ও যে যুদ্ধ চালনার কী ব্যাঘাত উৎপাদন করছে তাও বোঝা মুস্কিল। যেটা অতি সামান্য তাকে মিছামিছি বাড়িয়ে তুললে য[illegible] পরিচালনার কোনই সৌকর্য হয় না, তবে দেশের পক্ষে এইটুকু কল্যাণ হয় যে এইসব জুলুম লো[illegible]র চেতনা[illegible] সত্যিকার অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ করে তোলে। হাওড়ার কর্মীদের আমরা অভিনন্দন করছি, তারা ধীরে ধীরে কৃষক চেতনাকে গড়ে তুলতে পারছেন এই কারণে। সাম্প্রদায়িক বিষয়ে একমাত্র প্রতিষেধক হলো কৃষক-সংগঠন।

স্যার সি. ওয়াই. চিন্তামণির মৃত্যু

এলাহাবাদের লীডার পত্রিকার সম্পাদক, লিবারেল পার্টির ভাইসপ্রেসিডেন্ট ও নেতা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ৬১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বিশ্বকোষী পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ শ্রমশক্তি চিরকাল ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা অর্জন করবে। সামান্য অবস্থা থেকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। যুক্তপ্রদেশ আইন সভার ও গোলটেবিল বৈঠকের তিনি সদস্য ছিলেন, যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা-শিল্পমন্ত্রী ও তিনবছর ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের অভাবনীয় ক্ষতি হল।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত

নানা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা প্রিয়ভাষী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের ক্যান্সার রোগে অকালে মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। সরোজনলিনী দত্ত বিদ্যালয় এবং ব্রতচারি সংঙ্ঘ, এই দুটো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নাম চিরদিন জড়িত থাক্‌বে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে এবং হিজলী মহিলা-বন্দীদের অনশনকালে তাঁর দেশপ্রীতি ও সৎসাহসের পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। সমাজ সেবাক্ষেত্রে তাঁর অভাব চিরদিন বাংলাদেশ অনুভব করবে। আমরা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

ফোটো: শম্ভু সাহা

১লা বৈশাখ, ১৩৪৮
শান্তিনিকেতন
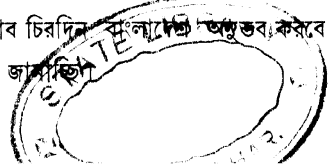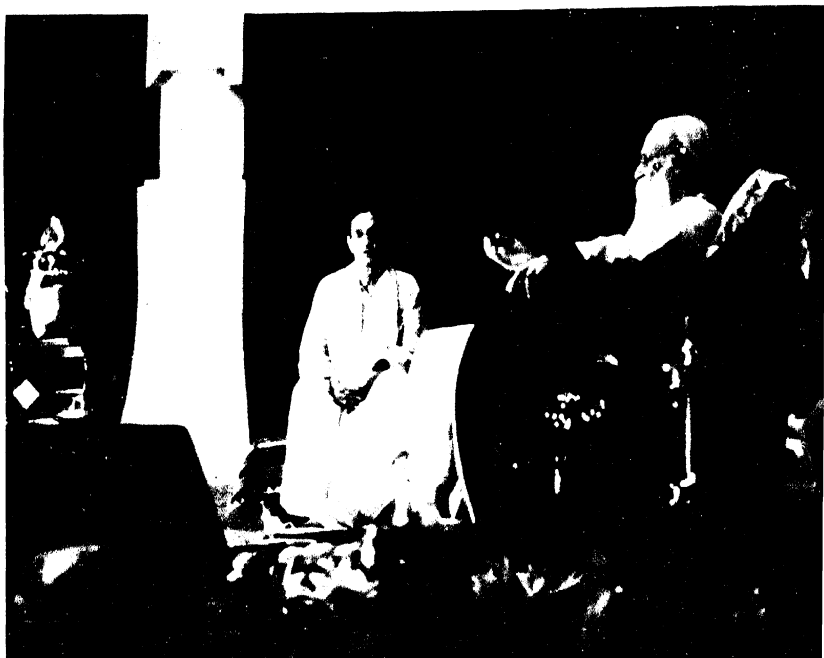
ENGRAVED & PRINTED BY
REPRODUCTION SYNDICATE

দশম বর্ষ { ভাদ্র, ১৩৪৮ } ৩য় সংখ্যা

ভারত শাসনে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি

অনিল চন্দ্র রায়

"My work lies in administration, yours in exploitation but both are aspects of the same question and of the same duty"——কথা কয়টা লর্ড কার্জনের। বরাকরের ইংরেজ খনি-পতিদের সম্বোধন করে বলেছিলেন ১৯০৩ সালে। শাসনটা যে ব্যবসারই নামান্তর মাত্র, আর ব্যবসা মানেই যে শোষণ, একথা ধুরন্ধর কার্জন সাহেব জাতব্যবসায়ীদের কাছে বলে ফেলেছেন। কিন্তু কথাটা সহজ নয়, সূক্ষ্ম। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের মূলসূত্রটীকে সাহেব অতি পরিপাটী ভাবে ব্যক্ত করেছেন। বল্ডুইন মন্ত্রীসভার হোম-মন্ত্রী, সার উইলিয়াম জয়েন্‌সন্‌-হিক্স সাদা কথায় এই সূত্রটীরই টীকা করে বলেছিলেন, "We conquered India by the sword and by the sword we should hold it........I am not such a hypocrite as to say we hold India for the Indians." ভারতবর্ষকে ইংরেজের চাই; এ তার রক্তমাংস-নাড়ীর প্রয়োজন। এখানে শোষণ হলে ওখানে পোষণ হবে সম্ভব। কাজেই এখানে যে শাহানশাহী শাসন তার কারণ মদমত্ততা নয়; রক্তের অহঙ্কার নয়, শক্তির নেশা নয়। এর মূলে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদীয় পেশা; সূক্ষ্ম ভগ্নাংশের চুলচেরা হিসাব, লাভ-লোসকানের স্থুল অঙ্কে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আসল রূপ কি? এ হলো ভেদনীতিরই রূপান্তর। শাসন যেখানে শোষণ; সেখানে শাসন-নীতিকে হতেই হবে ভেদনীতি। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত বিস্তৃত দেশকে করায়ত্ব রাখতে হলে ভেদ-নীতিই হলো একমাত্র অব্যর্থ অস্ত্র। এর সঙ্গে থাকবে অপর তিনটে নীতির মিশাল। বচনে ও ইস্তাহারে উচ্ছ্বসিত হতে থাকবে সাম-নীতির মিষ্টি-বীণাণী। কিন্তু প্রচুর ব্যবহার হবে দান ও দণ্ডনীতির। দান ও দণ্ড হলো ভেদ-নীতিরই দুটো অঙ্গ। এক পক্ষের ওপরে বর্ষিত হবে দান-নীতির অফুরন্ত দাক্ষিণ্য; অপর পক্ষের পিঠে পড়বে ছুতোনাতায় দণ্ড-নীতির অক্লান্ত চাবুক। তাতেই সৃষ্টি হবে একাধিক পক্ষ এবং ক্রমশঃ তাদের মধ্যে প্রসারিত হবে সমুদ্রের ব্যবধান। ব্যবধান ক্রমশঃ আনবে বিদ্বেষকে এবং বিদ্বেষ পরিণত হবে হানাহানি ও রক্তারক্তিতে। এরই নাম divide et impera এবং বিজেতা ও প্রবলের হাতে এই নীতি হলো আদ্যিকালের পুরোণো অস্ত্র। তবে সাম্রাজ্যবাদ আজ পৃথিবীতে বিজ্ঞানের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারছে; তাই শাসন ও শোষণ দুই-ই আজ হয়েছে অতি ক্ষুরধার ও সূক্ষ্ম। কুটীলতায় ও কুশলতায় ভেদনীতি আজ হয়েছে বিজ্ঞান-সম্মত। লাজপত রায়ের ভাষায় "The policy of divide and rule is the sheet anchor of all Imperialist Governments. British rule in India has been persistently following that policy." অদৃষ্টের পরিহাসে বিপুল ভারতবর্ষ হয়েছে এই নীতির প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র এবং ব্রিটিশ শাসন এই প্রশস্ত ক্ষেত্রে এই ভেদনীতির করেছে চরম প্রয়োগ, বৈজ্ঞানিক রীতিতে ও সূক্ষ্মতম কৌশলে। এই ভেদনীতিরই চূড়ান্ত ফল ফলেছে ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। এতে শাসন কর্তৃপক্ষ আপত্তি করবেন জানি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বাস্তব তথ্যের সম্মুখে সে আপত্তি মিলিয়ে যাবে। শাসন-যন্ত্র যারা চালান তারা যে সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবে ভেদনীতির পথেই একে চালান, তার প্রমাণ রয়েছে রাজপুরুষদের অগণ্য স্বীকৃতিতে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। পূর্ব বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্য শুরু হয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের থেকে। তার পরেই আরম্ভ হয়েছে রক্তাক্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা যা আজ ধারণ করেছে বর্বর আকার। ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ সন পর্যন্ত নানা দাঙ্গায় ৫ বছরে প্রায় ৪৫০ লোকের মৃত্যু হয়েছিল এবং ৫০০০ লোক আহত হয়েছিল। তার পরে ১৯২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২৮ জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১৯টা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে, যাতে এক মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য সব প্রদেশই ভুক্তভোগী হয়েছে। ১৯২৬ সনের এপ্রিল থেকে জুলাই চারমাস কলকাতার পথঘাট রক্তাক্ত হয়েছিল; তার পরে পাবনা, রাবলপিণ্ডি, লাহোর এবং অন্যান্য স্থান। ১৮ মাসের মধ্যে মৃত হয়েছে প্রায় ৩০০ এবং আহত ২৫০০; তার পরে ১৯২৭ থেকে পর পর আরো ২০টী সাংঘাতিক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে, "বোম্বে দাঙ্গা তদন্ত কমিটীর" হিসাবে, এক বোম্বের দুটী দাঙ্গাতেই ২০০ লোক মারা গেছে। তারপর

১৯৩০ এর পরে ১৯৪১ সনের দাঙ্গা, ঢাকায়, আহমেদাবাদে, বোম্বেতে, বিহার শরীফে। দিনে দিনে এই সংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছে; দিনে দিনে এর প্রভাব হচ্ছে ব্যাপক ও এর শক্তিও হচ্ছে মারাত্মক। এই ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের কারণ কি? অন্যান্য কারণের মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ হলো, ভারতের শাসনপদ্ধতি এবং ইংরেজের পক্ষপাতমূলক মনোভাব। গত অর্ধশতাব্দী ধরে ইংরেজ মুসলমানকে তোষণের নীতি অবলম্বন করে হিন্দুর বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টির সাহায্য করেছে। হিন্দুকে করেছে ঈর্ষাবিষদুষ্ট, মুসলমানকে করেছে পক্ষপাতপ্রিয় ও প্রসাদলোলুপ। এই দীর্ঘকালের নীতি আজ ফলপ্রসূ হয়েছে মর্মান্তিক শত্রুতায় ও হিংস্র রক্তপাতে।

প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান যারা তারা একথা স্বীকার করবেন না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ একজন মোসলেম লীগ নেতা সেদিনও আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের কাছে আমাদের মতের প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিবাদ আন্তরিক। তিনি বিশ্বাস করেন, এই আত্মকলহে ইংরেজের কোন হাতই নেই। মুসলমান সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে, তার কারণ মুসলমানের চোখ খুলেছে; প্রথম জাগরণের প্রাণস্পন্দন দেখা দিয়েছে এই সাম্প্রদায়িক চাঞ্চল্যে। মুসলমানের এই বিক্ষোভ, এই অসন্তোষ হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আস্বাদনের ফল। কিন্তু এ যুক্তি হলো ইংরেজেরই যুক্তি। সাইমন কমিশনও বলছেন এই কথা। যখন ইংরেজ ক্ষমতাকে হস্তান্তর করতে চায়নি তখন পর্যন্ত হিন্দু-মুসলীম সংঘর্ষ জোর ধরেনি। অতএব পূর্বযুগে দাঙ্গা হয়নি। আর তাছাড়া দু' পক্ষের কারুর হাতেই ক্ষমতা না থাকায়, কারুরই কাউকে ভয় পাবার কোন কারণ ছিলো না; তাই ১৯০৯ সালের পূর্বে সংঘর্ষও প্রবল হয়নি *। সাইমন কমিশনের এই যুক্তি কর্তৃপক্ষেরই যুক্তি। এই যুক্তি ভারতের লীগপন্থী নেতারাও উপস্থিত করে থাকেন। কিন্তু এই যুক্তি যে শিশুসুলভ ও ভিত্তিহীন, তা' আজ লীগওয়ালাদের চোখে ধরা পড়ছে না। কারণ তাদের চোখে লেগেছে নতুন স্বার্থের রঙ্। তৃতীয় পক্ষের কারসাজি তাদের চোখে ধরা পড়ে না, কারণ বাহ্যত সে কারসাজি হল মুসলমানের স্বার্থেরই সহায়ক। তার চোখের সমুখে ইংরেজ ধরেছে আজ রঙীন ভবিষ্যতের মোহকে সেই মোহে আজ লীগপন্থীরা অন্ধ; তাই আজ তারা বুঝতে পারছেন না, এ বাস্তব কল্যাণের সম্ভাবনা নয়, এ হলো মিথ্যা মরীচিকা।

ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে এ ধরণের দাঙ্গা ঘটেনি; এমন কি ইংরেজ রাজত্বেও আজ হতে পঞ্চাশ বছর আগে এই পরিস্থিতি কল্পনাতীত ছিল। লীগপন্থী ও ইংরেজ উভয়েই বলবেন

---

*...is a manifestation of the anxieties and ambitions aroused in both communities by the prospect of India's political future. So long as authority was firmly established in British hands and self-govt was not thought of, Hindu-Moslem rivalry was confined within a narrower field. (Vol 1, Page 29) "...at that epoch so much good feeling had been engendered between the two sides that communal tension as a threat to civil peace was at a minimum." (*ibid*)

এই শান্তির কারণ হল মুসলমানের তদানীন্তন অজ্ঞতা ও ক্ষমতার অভাব। কিন্তু আদতে তা নয়। বরং মুসলমান আমলে মুসলমানের হাতে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করবার সামর্থ ও সরঞ্জাম প্রচুর ছিল। হিন্দুদেরও সেই যুগে দাঙ্গা করবার যথেষ্ট কারণ ছিল, যেহেতু হিন্দুরা এই দেশে একদা ক্ষমতার অধিকারী ছিল। সেই পূর্বাস্বাদিত ক্ষমতার স্মৃতি তাদের মনকে বিষাক্ত করতে পারত। কিন্তু এই ধরণের দাঙ্গা সে যুগে অজ্ঞাত ছিল। তারপর ১৮৫৭ সালের যুগে দেখি মুসলমান অজ্ঞ তো নয়ই বরং অধুনালুপ্ত ঐশ্বর্যের স্মৃতিতে মুসলমান ১৯ শতকে পরম আত্মসচেতন ও ক্ষমতাপ্রয়াসী। সিপাহী যুদ্ধে মুসলমানই প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল; বাহাদুর শাহাকে দিল্লীর গদীতে বসিয়ে ইংরেজকে তাড়িয়ে লুপ্ত মুসলীম সমৃদ্ধিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার শ্লোগানই ছিল সিপাহীদের একমাত্র শ্লোগান। নিজাম, অযোধ্যার নবাব ও অন্যান্য মুসলমান তালুকদারদের প্রতি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার মুসলমানদের মনে ইংরেজ বিদ্বেষ জ্বেলে দিয়েছিল। তারা ইংরেজকে তাড়িয়ে মুসলমান শক্তিকে পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী হয়েছিল। ক্ষমতার সম্ভাবনা সেই যুগেই মুসলমানের বেশী ছিল; মুসলমানের সঙ্গে বেশী সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা' হয়নি। এলাহাবাদের মৌলবী লিয়াকৎ আলি, পাটনার শাহ মহম্মদ হুশেন, ওয়াজুল্ হক্ ও পীর আলী প্রভৃতি মৌলবীদের বিধিবদ্ধ প্রচার তাদের সচেতন মন এবং প্রখর আত্মসম্মান জ্ঞানেরই পরিচয় দান করে। সিপাহীযুদ্ধের যুগে মুসলমানদের সমুখে ছিল ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিপুল সম্ভাবনা; হিন্দুদের সামনেও ছিল সেই অনিশ্চিত পরিস্থিতির সুযোগে নতুন হিন্দুশক্তির সংগঠনের আশা। প্রদেশে প্রদেশে রাজ্যচ্যুত হিন্দুরাজা ও জমীদারদের মনে সেই স্বপ্নই ছিল গোপনে লুকিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য এই রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য দুর্দম আকাঙ্খা সত্বেও হিন্দু-মুসলমান পরস্পর লড়াই না করে করেছিল ইংরেজের সঙ্গে লড়াই। কাজেই লীগপন্থী ও ইংরেজ, কারুরই যুক্তি টেকে না! আসল কথা, ১৯ শতকের শেষের দুই দশক থেকেই হিন্দুমুসলমান পরস্পরকে শত্রু মনে করছে।

কুখ্যাত সার ব্যাম্‌ফিল্‌ড্ ফুলার একটি বহুপ্রচারিত উপমায় ভারত সরকারের দুই রাণীর উল্লেখ করেছিলেন: হিন্দু হোলো দুয়োরাণী, আর মুসলমান সুয়োরাণী। কথাটায় সত্য আছে। মুসলমানকে নেকনজরে দেখা হলো সরকারে অভ্যস্ত ক্রীড়া। তবে প্রথম থেকেই অবস্থা এমনি ছিল না। সিপাহীযুদ্ধের অভিজ্ঞতাই ইংরেজকে সজাগ করে তোলে। সৈন্যসজ্জায় ও সামরিক ব্যবস্থাকে নতুন করে গঠন করবার প্রয়োজনবোধ প্রবল হয়ে উঠে। এমন বন্দোবস্ত চাই, যাতে ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ সম্ভব না হতে পারে। কাজেই divide et imperaর অস্ত্রকে শাণিত করে তোলা হল। অবশ্য সিপাহী যুদ্ধের আগে থেকেই এ অস্ত্র ছিলো এবং এর ব্যবহারও হয়েছে। ১৮২১ সনে পর্যন্ত একজন বৃটিশ অফিসার 'carnaticus' ছদ্ম নামে 'Asiatic journal'এ লিখেছিল Divide et Impera should be the motto of our Indian administration,

whether political, civil or military." * এমন কি Lt. Col. John Coke, মোরদাবাদের কমাণ্ডাণ্ট, সিপাহিযুদ্ধের সময়ে লিখেছিলেন, ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মধ্যে কৌশলে পার্থক্যকে বাড়িয়ে রাখতে হবে, একত্র হতে দেওয়া হবে না। ১৮৫৯ সনে যে পীল কমিশন তদন্ত করেছিল তার রিপোর্টে ও সাক্ষ্যে দেখা যায়, বহু ইংরেজ অফিসার ভেদনীতির পোষক হিসেবে সৈন্যদলকে একাধিক জাতির ও বর্ণের মিশ্রন করে রাখবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন! লর্ড এল্‌ফিন্সটোন্, মেজর জেনারেল টাকার (H. T. Tucker) ইত্যাদি সৈন্য দলকে বর্ণ ও জাতি-বিরোধে জর্জরিত করে রাখবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। Lord Ellenborough ও এই মতই দিয়েছিলেন, কারণ তাতে বৃটিশ স্বার্থকে কায়েম রাখা যাবে। কাজেই পীল কমিশনও সুপারিশ করেছিলেন, প্রত্যেক রেজিমেণ্টকেই বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের বিরোধক্ষেত্র করে তুলতে হবে ×। লর্ড এল্‌ফিন্সটোন্ খোলাখুলি লিখেছিলেন, "Divide et impera was the old Roman motto and it should be ours." (14-5-1859 minute) ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যাতে ইংরেজের ভেদনীতিপ্রবণতা প্রমাণ হয়।

তবে লক্ষ্য করবার আছে এই যে, ইংরেজের এই ভেদনীতিরও দুটা পৃথক অধ্যায় রয়েছে। একটা হলো মুসলমান দমনের অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায় হলো মুসলমান তোষণ ও হিন্দু দলনের অধ্যায়। মুসলমানের হাত থেকেই ইংরেজ ভারতবর্ষকে ছিনিয়ে নিয়েছে, মুসলমানই ছিলো এ দেশের একছত্র অধিশ্বর সেই যুগে। এই কারণেই যেমন মুসলমান ইংরেজের বিদ্বেষী ছিলো, ইংরেজও মুসলমানের শত্রুতা করত তেমনি পদে পদে। সিপাহী যুদ্ধের পরেও প্রায় বিশ বছর যাবৎ মুসলমানের প্রতি বিরূপ ছিল ইংরেজ। ১৮৫৯ সনে মুসলমানরাই প্রধানত বিদ্রোহের শক্তি জুগিয়েছে। আর মুসলমানদের ছিল হিন্দুদের চাইতে বেশী ধর্মোন্মাদ ও দুর্ধর্ষতা। ১৮৪২ সনে, কাবুল যুদ্ধের পরে লর্ড এলেন্‌বরো (তখনকার গভর্ণর-জেনারেল) ডিউক অব ওয়েলিংটনকে লিখেছিলেন, "মুসলমান চেয়েছিল আমরা আফগানিস্থানে হেরে যাই, আর হিন্দুরা চেয়েছে আফগানরা হারুক। কাজেই মুসলমান যখন শত্রুভাবাপন্ন, তখন বিশ্বস্ত হিন্দুদের আনুগত্য লাভের চেষ্টা না করাটা আমাদের আহাম্মুকী হবে। হিন্দুরা সংখ্যায় ও দশগুণ হবে।" * তিনমাস পরে

* Vide, "consolidation of the Christian Power in India," pp74-5, by B. D. Basu.

+ "Our endeavours should be to uphold in full force the (for us fortunate) separation which exists between the races & religions, not to endeavour to amalgamate them. Divide et impera should be th : principle of Indian Government." (Ibid)

× "The Native Indian Army should be composed of different nationalities and castes, and as a general rule, mixed promiscuously through each regiment." (Report of the Peel Commission on the organisation of the Indian Army.)

লর্ড এলেনবরো একেবারে স্পষ্টভাবেই ব্রিটিশনীতির উল্লেখ করেছেন; মুসলমান শত্রুভাবাপন্ন, তাই হিন্দুদের তোষণ করাই হলো আমাদের আসল নীতি।+ হেনরী হ্যারিংটন টমাস নামক বঙ্গীয় সিবিল সার্ভিসের একজন অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী ১৮৫৯ সনে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে একখানা পুস্তিকা লিখেছিলেন; বইখানার নাম "The late rebellion in India and our future policy". এতে তিনি লিখেছেন, মুসলমানরা সাধারণতই গর্বিত ও নির্মম এবং প্রাধান্য-লিপ্সু। তার ওপরে রয়েছে তাদের অনির্বাণ আশা, ইংরেজকে নষ্ট করে আবার মোসলেম শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করবার। তারাই হিন্দুদের হাত করে এই সিপাহী-বিদ্রোহের বা বিপ্লবের বন্দোবস্ত করেছে। 'বঙ্গীয় সৈন্যদলে'র হিন্দু-সিপাহীরা মুসলমানের হাতের যন্ত্রমাত্র ০। রাজকর্মচারীদের তদানীন্তন মনোভাব এই সব কথা থেকেই বোঝা যায়। মুসলমান দলনই সেই যুগে ছিলো ব্রিটিশ শাসনের মূলমন্ত্র।

কিন্তু শতাব্দী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস উল্টোদিকে বইতে লাগ্‌লো। হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে তখন। য়ুরোপীয় বিপ্লবের বাণী এবং ১৯ শতকের সাম্য ও স্বাধীনতার মন্ত্র হিন্দুসমাজে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। ফলে ভারতের স্থানে স্থানে বিপ্লব আবহাওয়া ও সঙ্ঘ গড়ে উঠতে লাগ্‌ল, হিন্দুরাই হ'ল ইংরেজ শাসনের বিরোধী। সংখ্যাধিক হিন্দুরা যদি জেগে ওঠে দলবদ্ধ হয়ে এবং তার সঙ্গে যদি মুসলীম শক্তি যুক্ত হয়, তবে ইংরেজ শাসনের আয়ু অচিরে ফুরাবে। সেই থেকেই আরম্ভ হল ব্রিটিশ শাসনের নবনীতি, মুসলমানকে তুষ্ট করে হাত করবার এবং হিন্দুকে দলন করার কূটনৈতিক পালা। মুসলমান পাশ্চাত্য শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছে, হিন্দুরা তখন অনেক অগ্রসর। মুসলমান ঘুম থেকে উঠে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করলো; ইংরেজের আনুকূল্য ও প্রীতিকে তারা তাই সাগ্রহে ও নিশ্চিন্তে বরণ করে নিলো। ইংরেজের কূট ভেদনীতিকে তারা ধরতে পারলো না। ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণের পথ কোন্ দিকে তা' তারা চিন্তা করলো না। মুসলমান ও হিন্দু গণসমাজ তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। এখানে শুধু মধ্যবিত্তের কথাই বলা হচ্চে, ইংরিজী শিক্ষায় যে শ্রেণী পাশ্চাত্য বিদ্রোহের শক্তি-মন্ত্রে

---

* "It seems to me unwise, when we are sure of the hostility of one-tenth, not to secure the enthusiastic support of the nine-tenths which are faithful." (oct 4, 1842)

+"I cannot close my eyes to the belief, that that race (Muslims) is fundamentally. hostile to us and therefore our true policy is to conciliate the Hindus." (letter dated 18-1-43 to Duke of Wellington)

0 "......it was the result of a Muhammadan conspiracy....The Muhammadans planned and organised this rebellion (or rather revolution) for their own aggrandisement alone and that the Hindu sepoys of the Bengal Army were their dupes and instruments." (Henry Harrington Thomas.)

উদ্বোধিত হয়েছিল তাদের কথা। ধীরে ধীরে মুসলমান নেতারা হিন্দু বিরোধী হয়ে উঠতে লাগলেন, হিন্দু মধ্যবিত্তও মুসলীমের ওপরে বিরূপ হতে লাগলো। ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নতুন অঙ্কের সূচনা হলো। এই নতুন অঙ্কের আদি অভিনেতা হলেন লর্ড মিণ্টো এবং প্রধান ঘটনা হলো ১৯০৯ সনের মর্লি-মিণ্টো স্কীম। ইতিপূর্ব থেকেই যে বীজ বপন করা হয়েছিল তারই প্রথম পরিণতি হল এই স্কীম। ১৮৯১ সনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল আইনে (Indian councils Act.) ব্যবস্থা হল বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের বিশেষ করে মুসলমান স্বার্থের রক্ষার জন্য বিশেষ মনোনয়ন প্রথার। তার পরেই ১৯০৬ সনে শাসনসংস্কার বিবেচনা করবার জন্য ভাইস্‌রয়ের কাউন্সিলর (Exc. Council) এক কমিটী নিযুক্ত হল এবং মিঃ আগা খাঁর নেতৃত্বে শিমলার এক মোস্‌লীম ডেপুটেশান মুসলমানসমাজের পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবি পেশ করলো। মিণ্টো সাহেব জবাবে সাম্প্রদায়িক পৃথক প্রতিনিধিত্বকে সানন্দে স্বীকার করে নিলেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন (Personal enfranchisement') মারাত্মক হবে ; (কার পক্ষে ?) কাজেই সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের ভিত্তিতে (traditions of the communities') নির্বাচনই বরণীয়। তাছাড়া মুসলমানের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারিত হবে মুসলমানের রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং তাদের ইংরেজ-প্রীতি ও সেবার মূল্যে। কিন্তু মুসলীম ডেপুটেশানের পিছনে কার প্রেরণা ছিলো ? মুসলমানদের পৃথক স্বার্থের চেতনাকে কে জাগিয়েছিল ? ইংরেজ, এবং সর্বোপুরি, লর্ড মিণ্টো। লর্ড মর্লির স্বীকৃতিই রয়েছে যে মিণ্টোই মুসলীমকে প্রলুব্ধ করে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির সৃষ্টি করেছেন। (১) আগা খাঁ ডেপুটেশান যে সাজানো ব্যাপার তা' মুসলেম নেতা মহম্মদ আলি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন ১৯২৩ সনের কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণে। (২) এমন কি ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন যে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টই শিমলা থেকে ষড়যন্ত্র করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে থাকে। (৩) ভূতপূর্ব ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার (Lord Olivier) টাইমস্‌ পত্রিকায় ১৯২৭ সনে লিখেছেন, 'one will be prepared to deny that on the whole there is a predominant bias in British officialdon in favor of the Muslim Community . . . largely as a make-weight against Hindu nationalism." ইংরেজরাজত্বের পূর্বে সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না ; পাঞ্জাবে ভূতপূর্ব কার্য-পরিষদ-সদস্য Sir John Maynard লিখেছিলেন, "the mass rivalry of the two communities began under British rule." (Foreign affairs, 1927—28). ১৯০৯ এর মর্লি-মিণ্টো শাসনতন্ত্রের গূঢ় অর্থ এতেই বোঝা যাবে। তার পরে ১৯১৯ সনের মণ্টেগু রিফর্ম স্কীম। তারও ভিত্তি সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি। কিন্তু ইতিমধ্যে রাউলেট বিল, জালিয়ানয়ালা, সাইমন কমিশন, খিলাফত ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের চক্ষু কিঞ্চিৎ উন্মিলিত হয়েছিল এবং আংশিক ঐক্যও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সদাজাগ্রত-চক্ষু ব্রিটিশ সরকার এই অবস্থা বেশী দিন টিকতে দেননি।

মহম্মদ ইয়কুবের নেতৃত্বে মোস্‌লীম লীগের কলকাতা অধিবেশনে (৩০-১২-২৭) সাইমন কমিশনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু লাহোরে সার মহম্মদ শফীর নেতৃত্বে ঐ তারিখেই বয়কটের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করান হয়। ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধির সহায় স্বরূপ ভারতে মতান্তর ও মনান্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে। সর্বশেষে ১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্র। এবার কেবল হিন্দু-মুসলমান নয়, এবার ভারতে হিন্দু সমাজও উন্নত ও অনুন্নত জাতের কলহে বহুখণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ আত্মকলহের রক্তাক্ত লীলাভূমি। আজিকার এই হানাহানি ও কলহকে বিচার করতে হবে পূর্ববিবৃত পটভূমিকায়।

এই প্রেক্ষাপটে দেখ্‌লেই বর্তমান ভারতের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের স্বরূপ ও তত্ত্ব ধরা পড়বে। ইংরেজ কর্মচারির ব্যক্তিগত সদিচ্ছা বা উদারতা নয়, সমষ্টি জীবনের ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে বিচার করতে হবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, ঘটনাপুঞ্জের সমষ্টিগত বাস্তব বিবর্তনের বিশ্লেষণ দিয়ে। একটু চোখ মেলে বিশ্বজগতের দিকে তাকালেই সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতির গূঢ় অর্থ ধরা পড়বে। কেবল ভারতেই নয়, সর্বত্রই সাম্রাজ্যবান্‌দের একই নীতি। কেবল ইংরেজই নয়, অন্যান্য জাতিও এই একই পথে চলে। ইংরেজের দোষ নাই। কারণ ঐতিহাসিক নিয়মেই তাদের মতি ও স্বার্থ বুদ্ধি এইরূপ নিয়েছে ও নিতে থাকবে। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা আমরা কেন গ্রহণ করবো না? এই দুঃখ জর্জর দেশের কোটী কোটী মানবের কল্যাণের পথে যে ভূমিকা সার্থক হবে। যাদের চক্ষু খুলেছে তাঁরাই এ ভূমিকা সজ্ঞানে গ্রহণ করতে পারবে। ইংরেজের স্বার্থবুদ্ধি যাই করুক, আমাদের কল্যাণ-বুদ্ধি দ্বারা আমরা তাকে ব্যর্থ করবো। ইংরেজের যদি ভেদনীতি হয়, আমাদের নীতি হবে সংহতি-নীতি। কিন্তু ভেদ-নীতিকে ব্যর্থ করবে কে? যে শর্ষে-দিয়ে ভূত ছাড়াব, সেই শর্ষেই যে ভূতের বাসা হয়েছে। আমরা যে পরস্পরকে ভেদ-বিচ্ছিন্ন করে নিজেরাই ব্যর্থ হতে চলেছি! এক্ষেত্রে উপায় কি? উপায় হলো, সাম্প্রদায়িকতার ভূতগ্রস্ত যারা এখনো হননি তারা একত্র হৌন এবং ভূতাবিষ্টদের ভূত ছাড়াবার চেষ্টা করুন। যে ভূত আজ চেপেছে, তাকে না তাড়ালে কল্যাণের পথ রুদ্ধ থাকবে।.. ইংরেজকে দোষারোপ না করে আত্ম-শক্তিতে ভারতের গণকল্যাণকে উদ্ধার করতে হবে। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ নাত্মানমবসীদয়েৎ", এই শ্লোক আজ আমাদের সঙ্ঘবাণী।

---

1. "I respectfully remind you once more that it was your early speech about their extra claims that first started the Moslem hare." (Recollectious, vol, 11, pp 325)

2. "There is no harm now in saying that the deputation's was a 'command' performance !...Hitherto the Mussalmans had asked very much like the Irish prisoner in the dock who,...had frankly replied that he had certainly not engaged counsel, but that he had 'friends in the jury !' But now the muslims 'friends in the jury', had themselves privately urged that the accused engage only qualified counsel like all others." (Congress President's address, cocanada congress, 1923).

3. "Sinister influences have been and are, at work on the part of the govt ; that Muhammdan leaders are inspired by certain British officials and that these officials...sow discord...by showing to the Muhamadans special favours." (Awakening of India, p 283)

ডার্ক

গোপাল ভৌমিক

কম্‌রেড্, সাইরেন্ শোন ঃ
দুর্দিনের ভয় ছিল—
সে দুর্দিন আজ সমাগত—
আকাশে বাতাসে তাই সূচনা-সংকেত।
সভ্যতা-সৌধের ভিত্তি ন'ড়ে ওঠে আজ—
ধ্বংসের দেবতা তাই বাজায় বিষাণ ঃ
এতদিন তন্দ্রা ছিল মানুষের চোখে
নিশ্চিন্ত আরামে ছিল
দৃঢ়বদ্ধ গাঁথুনির নীচে,
মুখে ছিল অহিংসার মধুময় বাণী।
আজ দেখি আসলেই ছিল বড় ফাঁকি ঃ
আস্তরণ ভেদ ক'রে
বের হয় প্রকাণ্ড ফাটল—
ধূলিসাৎ হ'তে চায় কৃত্রিম প্রাসাদ।
ধ্বংস-স্তূপ দেখে ভয় পেয়ো না, কম্‌রেড্ ঃ
এরই মাঝে উপ্ত আছে ভবিষ্যের বীজ—
সভ্যতার চক্র-পথ বন্ধন-বিহীন।
পুরাণো ধ্বংসের বুকে—
নতুনের কর উদ্বোধন ঃ
নিরন্ধ্র গাঁথুনি দিয়ে
গ'ড়ে তোল সভ্যতার ভিৎ।

"জীবন নদীর তীরে"

ভবানী সেনগুপ্ত

আজ আমার জন্ম দিন। তিনদিন আগে থেকে শুনে আসচি, আজ জন্মদিন আমার। উৎসব আয়োজনের পরিমাণে হয়তো অভিমানের সুযোগ পাবোনা, কিন্তু তবু কেন যে মনটা এতো নিস্তেজ লাগছে, একটা চাপানো পাষাণের নীচে যেন হাঁপিয়ে উঠ্চি!

মেঘলা দিনের কালো সকাল। এই ধূসর সকালের গভীর ভাবটা ভালো লাগে, না?' না, কৈ ভালো লাগে না তো। ওর সঙ্গে আমার মনের ভেতরকার ভাবের সাদৃশ্য আছে বলেই আমার মনে হয় ওকে আমার ভালো লাগে। কেউ জানে না, আমি আমাকে হারিয়ে দি'— বাইরে আর ভিতরে রং-এর একাকার হয়ে যায়। বই এর পাতা থেকে মুখ তুলে বাইরের আকাশের দিকে একটু তাকাই। আচ্ছন্ন কৃষ্ণ আবেশে সব কিছু নিজেকে মিলিয়ে দিয়েচে—বর্ষা প্রাতের ধূসর গম্ভীর ভাবটাতে মনটাও কেন যেন গম্ভীর হয়ে উঠতে চায়।

রেখা এসে ঘরে ঢোকে।—সু, তুমি কি ভাবচ?

আমি কি কিছু ভাবছিলাম? না, আমি একটু কি যেন করছিলাম।—'কিছু নয় তো?'

—বলো না,—রেখা একটু হাসে,—ক্যালকুলাসের প্রব্লেমগুলি খুব শক্ত, না সু?

—তাই বুঝি আমি ভাবছিলাম?

—তা নয়তো কি? আর নয়তো লজিকের কোন দুরূহ সমস্যা……ও, তুমি তো আর লজিক পড়োনা, তবে হয়তো আর কিছু একটা বই!

টুপ্‌ টাপ্‌ করে বাইরে জলের ফোঁটা ঝরতে আরম্ভ করে।

রেখা আলমারী খু'লে সেতারটা বার ক'রে…

—আজকের দিনটা বড়ো সুন্দর। মনটাকে মাত্‌লা ক'রে দেয়। তুমি তো এসব কিছু বোঝো না, তোমাকে বলাই বৃথা। আমি ওপরে যাই—বলবে, তারের ওপরে উ, আ, কি করচিস্‌।

রেখা চ'লে যায়। আমার চোখ নেমে আসে জু-অলজির বইটার ওপর। কি রকম ছবিটা এঁকেচে অ্যামিওবার…জীব-তত্ব থেকে মনটা জীবন-তথ্যের দিকে এগিয়ে আসতে চায়। ওরা ভাবে, মানুষ আমি নই, হৃদয় আমার নেই। বাস্তবের প্রাচীরে ছোট বেলা থেকে ওরা আমায় ঘিরে রেখেচে, ভাবে, আমি আটকা প'ড়ে গেছি একেবারে। মানুষ আর আমি নেই।

আমার আজ জন্মদিন।···দূরান্তে মোটরের শব্দ আর মিলের হুংকার মিলে একটা অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি ক'রে।

শুধু এমনি ক'রেই কি জীবনের ব'ছরগুলো কাটবে? এমনি ক'রেই? এই কি সত্যি-কারের বেঁচে থাকা? মনে হয় এর বাইরের জগতে আমার স্থান নেই। আমি আটকা পড়ে গে'ছি বদ্ধ কারাগারে, বুক ফাঁটা কান্নায় নিজের চোখের জলে······না, জীবনের একটা দিক আমি জানিনে, কোন দিকই বোধ হয় আমি জানিনে।

এই পরিবারের সংকীর্ণ সংস্কার এবং ভয়ার্ত পঙ্গুতার বাইরে আছে সারা সমাজ এবং সারা দেশ। জীবন ওখানে বিস্তৃত। দিগন্তে তার ছায়া দেখতে পাই। কতোবার তার মায়া মনে লাগে। কিন্তু জীবনে যত কিছু গেল না পাওয়া, মিছে আর কেন তা ভাবিতে যাওয়া।

আমাকে আড়াল ক'রে রেখেছে সংসারের সংকীর্ণ সংস্কার, আমার মনকে তো সে পারে নি। এত বাধা, এত ভয়, এত বিধি-নিষেধ এদের এড়িয়ে সে চলে গেছে; আমি জানি, মন আমার বাধা পরেনি। আর সেখানেই সকল বেদনা, সমস্ত দুঃখ লাঞ্ছনার শেষ সীমা, নিজেকে প্রতারণা করার চরমতা। তাই ভাবি মানুষের সব মরে, মরে না শুধু মন! মন বেঁচে থাকে, মনে হয় সে বেঁচে নেই, তবু সে যে বেঁচে আছে তারই অস্পষ্ট ইঙ্গিত ভেসে আসে বর্ষা সকালের মেঘলা আবহাওয়ায়, অথবা কঠিন বাস্তবের দৃঢ় সংঘাতে।

আমি বসেচি, আমার বুকের কাছে সাজানো টেবিল। বই, এক, দুই, তিন···আটখানা বই। দোয়াত-দানি, ফুলের টব একটা। বাবা বসেচেন আমার ধারে, মা সামনা-সামনি। রেখা বসেচে আমার আর এক পাশে। বাবার পাশে অরুণ, মার পাশে দ্বিজেন বাবু; তার পরে দুই মাসিমা, তিন মাসতুতো বোন, এক মাসতুতো ভাই। এরা সবাই রক্তের সম্পর্ক নয়, অনেকেই তৈরী ক'রে নেওয়া।

স্নুপ্তি' আই-এ পরীক্ষায় তুমি এত ভাল করেচ যে আমাদের বুক গর্বে ভ'রে উঠেচে। পরীক্ষার খবর জানবার পরেই তোমাকে আমার এ উপহার দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু রেখে দিয়েচি জন্মদিনের জন্যে। জন্মদিনে তুমি নতুন উদ্যমে বাপ-মায়ের প্রদর্শিত পথে সত্য, সংযত জীবনের উন্নতির শেষ ধাপে পৌঁছতে পারো ঈশ্বরের কাছে এই করো প্রার্থনা। এ বড়ো দুর্দিন। আধুনিকতার দৌলতে আমরা ভুলতে বসেচি অতীতের সকল গৌরব; এ যুগের ছেলেমেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত; তাই ঈশ্বরের এত অভিশাপ! গুরুজনদের অবাধ্য হওয়া, রীতি-নীতির প্রতি ঘৃণা ও অসম্মান, এই এ যুগের ধর্ম। সর্বনাশের ধর্ম এ। তোমার বাবা-মার সর্বপ্রধান কীর্তি তাঁরা সমাজের এই সর্বনাশের উর্ধে তোমাদের তুলে রেখেছেন। তোমরা ধর্মে ও কর্মে তাঁদের মুখ

মাসিমা।

সোনার ঝুমকো দুটি আমার কানে পরিয়ে দেওয়া হোলো। রেখা চুপি চুপি বল্‌লে 'ওটা কিন্তু বুক্‌ড্ আমার জন্যে।'

বাইরে টুপ-টাপ বৃষ্টি—এতো উৎসবে আনন্দ নেই প্রকৃতির, আনন্দ নেই আমার মনে। এ আমার কি হোলো। বলি দেওয়ার আগে পাঠাকে সিঁদূর পড়িয়ে আমরা পূজা করি, আমিও যেন আজ তেমনি পাচ্ছি পূজা আর সম্মান। জীবনের দাম নাকি এই ঝুমকো, জীবনের পাওনা না-কি এই শুকনো উৎসবের মামুলী বুলি।

না, ওরা জানে না। জানে না বাবা-মা। ওরা আমার জন্মদাতা। কিন্তু আমার জন্ম কি শুধু ওরাই দিয়েচে? না, আমার জন্ম ওরা দেয়নি। ওরা একটা উপলক্ষ মাত্র। রক্তের দাবীতে আমার জন্ম, ওরা কেবল উপলক্ষ। একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট। আমি তো জন্মাতে পারতুম একটা কুলির ঘরে, কাপড় কোমড়ে বেঁধে এ বয়সে আমার অন্তত তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে হয়তো রেল-লাইনে কয়লা কুড়াতে হোতো। আমার জন্ম দিয়েচে মানুষের সৃজন-প্রেরণা, না, দেহের-তাড়না।

আমাকে গড়ে তুলেছে এ যুগ-ধর্ম। এ-ও তোমরা জান না। তোমরা ভাবো তোমরা আমাকে তোমাদের মতো ক'রে গ'ড়ে তুলেচ, তোমাদের আদর্শে, তোমাদের পথে, তোমাদের মতে। কিন্তু···কি হয়েচি আমি! আমার মনের আসল প্রাণটুকু অবাধ্য, সে এ যুগের সন্তান, ব্যর্থতা তার চোখে, দীনতা তার রক্তে, হতাশায় ভরা তার জীবন।

—"সু, আজ তোমার উনিশ বছর পূর্ণ হোলো। তোমার জন্যে আমরা গর্বিত। তোমার ভেতরে আদর্শ নারীর বীজ অঙ্কুরিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য আজ সার্থক হয়েচে। নারী সমাজের প্রাণে, প্রাণ কখনো চঞ্চল, বিদ্রোহী, উচ্ছৃঙ্খল হয় না। ত্যাগের মাহাত্মে সেবার গৌরবে, তুমি নিজেকে ধন্য ক'রে তোলো। না-পাওয়ার বেদনা ভারতীয় নারীর নয়—তার কাছে দুঃখ-সুখ সব সমান; অন্তরের অনাবিল প্রেমে সব কিছুকেই সে সুন্দর ক'রে তোলে। অন্তরে সে পবিত্র, জীবন্ত, আনন্দময়ী। সেই আদর্শে তুমি অনুপ্রাণিত হও।

"দেশের কল্যাণ হোক তোমার মন্ত্র। কিন্তু দেশের কল্যাণ আসবে যে-পথে তুমি তা শিখেচ। সে পথকে তুমি হারিয়ো না। এ যুগের লোকদের নেই তত্ত্বজ্ঞান, আছে তথ্যজ্ঞান। জীবনটাকে নিয়ে দোকানদারী—ফাঁপা ফানুসের মতো ঘুরে বেড়ানো হাওয়ার ধাক্কায়। এ পথ থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো, দেশকে রক্ষা করো······"

বাবার চোখে জল···"আমার মা, আমার সব-কিছু,······"

বাবা তুমি যে কাঁদচ, এ কান্না তোমার আনন্দের কান্না! দুঃখ-বেদনায়, ব্যর্থতায়, হতাশায় লোকে কেমন করে কাঁদে তুমিও জানো না আমিও জানি নে। না আমি বোধহয় জানি। বুকের ভিতরটা যদি খু'লে দেখানো যেতো বাবা তা হ'লে বুঝতে আমারও জীবন ফানুস-উড়িয়ে ছেলে-খেলার মতো—কাঁচা হাতে লেখা একটা বিয়োগান্ত নাটক। তুমি আশীর্বাদ করলে, কিন্তু কিসের আত্মত্যাগ? কি পেয়েচি যে বিলিয়ে দেব? নেবে কেন লোকে একটা অপূর্ণ মনকে! দেব কেমন করে আমি? কাকে করবো সেবা—সেবায় যদি নিজেকে উজাড় ক'রে না দিতে পারি?

—'এই সু' তুমি কি ভাবচ? সকাল বেলার সলিউসনটা এখনো হয় নি? দোহাই, একটু হাসো এখন। সারাদিন তো জু-লজি, তোমাকে এবার আমি নিয়ে সত্যই জুতে রেখে আসবো।'

রেখা।

তাঁদের মুখে চোখে হাসি। রেখার মুখে হাসির রেখা সুস্পষ্ট।

মা বাবা আর সবাই কি আলোচনায় ব্যস্ত। আমি হাসতে পারচি না কেন? ওরে রেখা তুই পালা! তোর এখনো সময় আছে। রেখা তুই পালা! না, তোকেও আমার সঙ্গে আসতে হবে, যেখানে আমি এসে দাঁড়িয়েচি, সেইখানে।

অরুণ! আজকের উৎসবে অরুণও এসেচে! অরুণ মা-বাবার অতিপ্রিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে ক'রে ভালোই, কিন্তু সেটাই আসল কারণ নয়। এ যুগের বহু দূরে অরুণ—এগিয়ে নয় পেছিয়ে। চোখের চশমা শক্তি বদল ক'রে ক'রে চোখকে শক্তিহীন ক'রে তুলেচে। মুখে কথা নেই, মনেও আছে ব'লে মনে হয় না। চুলগুলি ছোট; সমান করে ছাঁটা, মাথা সোজা হ'লেও চোখ সোজা হয় না।

অরুণকে বাবা-মা খুব ভালোবাসেন। জীবনে কেউ ওকে প্রতিবাদ করতে দেখে নাই, সবার কথায় সায় দিয়েও নিজে কখনো হায়-হায় ক'রে না। অরুণ, বাবা বলেন, আপনাতে আপনি সম্পুর্ণ!

হয়তো তাই! কিন্তু…না, এখানে কিন্তু নেই। জীবনে কোনদিন কোনো কিছুও জাগেনি ওর প্রাণে, আজ কিন্তু দিয়ে ওকে বিচার করা অন্যায়! যাচাই ক'রে নি কোনদিন, বাছাই ক'রে নি কখনো, তাই ওকে হয় তুলে নাও, নয় ফেলে দাও! তবু মুস্কিল এই যে জীবন চলে যাচাই আর বাছাইয়ের ঘোড়ায় চড়ে। এখানে একটানা মৃদুলতার স্থান নেই…। কিন্তু, (হ্যা, এবারেও কিন্তু) অরুণ তা স্বীকার করবে না।

হাসি পায় যখন ভাবি এই অরুণের ভেতরও পুরুষের প্রাণ আছে! তবু, সত্যিই আছে। মাঝে মাঝে যখন বায়োলজির কথা বাবার সঙ্গে ও আলোচনা ক'রে মাঝে মাঝে যখন ক্যালকুলাসটা আমায় বুঝিয়ে বলে, তখন আমি যেন টের পাই, কিছুর একটা দমকা উত্তপ্ত হাওয়া ওর অজ্ঞাতে এসে আমার মুখে লাগে। অরুণ জানে না, ওর মধ্যে যে পুরুষ আছে, তাও ও জানে না।

—'অরুণদা একটি মানুষ-গাধা। পুরুষ যে কেমন ক'রে এমন হয়!'—রেখা ব'লে।

'কেন, আমরা কি আছি'?

—'আমাদের কথা বাদ দাও! কিন্তু এমনি মরে যাওয়া জীবন নিয়ে···দুত্তোর!'

আমারই বোন রেখা।

'মাই এক্স্‌পিরীয়েন্স উইথ্‌ ট্রুথ্‌'। মহাত্মা গান্ধীর জীবনী। আমার জন্মদিনে অরুণের উপহার। তার গায়ে লেখা, সত্যকে জানো।

তুমি জানো নাকি অরুণ সত্যকে? সত্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতা তোমার কী? না থাক··· বিজনের ভাষায় বলি, তুমি হচ্চ ghost of things that might have been.

—'তোমার উপহারটি চমৎকার! কিন্তু এই বইতে সরকারী কুনজর নেই তো?'

—আজ্ঞে না।

—আগে আমি পড়ে তারপরে সু'কে দোবো এখন।

মা। জীবনে এই ধারা সেন্‌সরসীপ্‌ সুশিক্ষার জন্যে দরকার। এই পরীক্ষায় পাশ না হ'তে পারায় বিজন বই পড়ানোর চাকরী ছেড়েছেন।

"সুপ্তির জন্মদিনে আমার কিছুই বলার নেই। ঈশ্বরের দয়ায় এবং আপনাদের আশীর্বাদে, আজ ওর জীবনে যে গৌরব ও লাভ করেচে, তা রক্ষা ক'রে ও চিরদিন চলবে।"

মা।

তুমি ঠিক বলেচো। চিরদিনই চলতে হবে আমাকে, মা। এর বাইরে ছাড়া নেই।···

ক্লান্ত দ্বি-প্রহর। কলেজের বন্ধুরা চ'লে গেল।···কেন এসেছিল ওরা? দিনটা এখনো ঘোলাটে—বৃষ্টি যে হবে তার চিহ্নমাত্র নেই। গুমড়ে গুমড়ে ওঠাই ওর স্বভাব—বর্ষা-দিনের। ওর স্বভাবে আমাদের অভাব জেগে ওঠে। নিজের রিক্ত, দীন-শূন্য চেহারাটা মনে প'ড়ে।

কোন্‌ দূরান্তে একদিন এমনি মেঘের ঘন-কৃষ্ণ কারাগারে কে যেন মুক্তি মেগেছিল—ব্যর্থ বিরহ-তপ্ত জীবনের বুক ফাটা হাহাকার কে-যেন কাব্যে জানিয়েছিল, জানিয়েছিল ছন্দে! সে যুগ আর নেই। পদ্য নেই, এটা গদ্য এবং মন্ত্রের যুগ। সদ্য-ফোঁটা জীবন বধ্য ভূমিতে অবরুদ্ধ। অন্ধকারে কেঁদে মরে। কবি নেই, কারো ব্যথা কেউ আর সার্বজনীন ক'রে তোলে না। আমাদেরো আর পড়তে ভালো লাগে না। ভালো-লাগে না বলতে, 'তোমাকেই যেন ভালো বাসিয়াছি শতরূপে শতবার'। মনে হয়, ফাঁকিকে খাঁকি পোষাকে সাজিয়ে মেকী ঢাকবার বৃথা প্রয়াস।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি এসেছিলেন······তাঁর কথা আজো আমার মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য নিজেকে মুক্ত করা। সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। মিথ্যা আমাদের

আটকে রাখে, তার চাপে ফাঁপড় হয়ে উঠি, সত্য আমাদের স্বপ্তি ঘুচিয়ে মুক্তি দেয়। ওখানে জীবনের খোলা-বাতাসের মেলা।

ওঁর কথাগুলো বেশ লাগে। বিজনের মতো ধারালো নয়! বিজনের কথা বেঁধে, ওর কথা পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। বিজনের চোখ দেয় দৃষ্টি-সূত্রে সুড়সুড়ি, ওর কথাগুলো হয় কাতু-কুতু নয় হাতুড়ি। ওঁর উপদেশ অমৃত, সে বাঁচারার আগে মেরে নেয় না। মরা দেহকেও উনি বাঁচিয়ে তোলেন।

তিনি বলতেন, 'জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো স্বপ্তি। আত্মাকে জানা সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা।' বিজন বলে, 'সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে যদি নিজেকে বলি দেন, দাম আছে। প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ব্যর্থ এই পঙ্গু, ধ্বংস-মুখী সমাজে। আত্মা বুঝিনে, নাস্তিক আমি, নাস্তিকও। সমাজকে জানা, জগতকে জানা, মানুষকে জানা, মানুষের কল্যাণকে জানা সব চেয়ে বড়ো কথা।'

ওদের ভেতরে রাত-দিন প্রভেদ।

'—একটু বাজাই, সু। তুমি বরং একটু কাণ বুজেই থাক।'

—হ্যাঁ রে রেখা, আমি কি মানুষ নই?

—না, মেয়েমানুষ!

—আমার বুঝি মন ব'লে কোনো পদার্থ নেই?

—পদের অর্থ কে ব্যর্থ ক'রে দিয়েই তুমি অনর্থ ঘটিয়েচ। মন আছে হয়তো, কিন্তু বিমনা তুমি হ'তে পারো কৈ? নিজেকে ভুলতে যদি না পারো মাঝে মাঝে তবে তুলতেও পারবে না। এই বাড়ী-ঘর-আসবাব-পত্র, এর উপদেশামৃত, এর আদর্শ তোমায় পিষে মেরে ফেলবে। তাইতো আমি সেতার বাজাই, কেউ শোনে না, তবু বাজাই একা একা।

ও-ঘর থেকে সেতারের আওয়াজ আসবে—'ভরা বাদর, মাহ ভাদর।'

'বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি, হরি বিনে দিন-রাতিয়া।'

বর্ষা-স্বপ্ন

অজিত দত্ত

বর্ষণ-ঘন অঞ্জন দিন নির্মম এল দুয়ারে
শৃঙ্খল পায়ে বন্দী হ'ল যে রাকা
বঞ্চনা শরে জর্জর তনু শান্তনু তনয়ের
শরশয্যায় অন্তরখানি ঢাকা।

মন্থিত হায় করেছি আকাশ খুঁজিয়াছি পারিজাত,
পরাজিত আজ, সাধনার চিতা জ্বলে।
যজ্ঞের ঘোড়া ধরেছি একেলা, দুর্জয়ে অনুরাগ,
দুঃসহ রণ যুঝিয়াছি পলে পলে।

সন্ধানী তব বর্ষার ধারা বরষার ধারা সম
দুর্বল ক্ষীণ অন্তর-লোক ছায়।
দুঃখের তীরে নির্বাণ মহা, মৃত্যু আসিবে কবে
অম্বর তলে উত্তরায়ণ, হায়!

ফাল্গুনী তব কণ্টক শরে রক্ত হরেছ মোর
বক্ষের তলে তৃষ্ণার দাহ জ্বলে।
উদ্ধত বীর, অলকনন্দা আনো আনো তব শরে
পিয়াসা আমার মেটে কি ধরণী-জলে?

পুত্রী

ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

চার

মৃত্যুঞ্জয়ের পেনশনার বন্ধু নিস্তারণ মিত্র লোক ছিল হুঁসিয়ার। পাঁচশ টাকায় সব-জজি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও, দ্বিতীয় বার সংসার করে এবং আটটী পুত্র-কন্যার পিতা হয়ে আর্থিক হিসাবে খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়েছিল—বিশেষতঃ অর্দ্ধেক পেনশন থোকে নিয়ে দক্ষিণ কলিকাতায় একখানা বাড়ী তৈরী করবার পর। নিস্তারণ মৃত্যুঞ্জয়ের কন্যাকে স্নেহের চোখে দেখ্‌ত না, অপরোক্ষে সে মৈত্রীকে উড়ন-চণ্ডী মেয়ে বলেই উল্লেখ করত এবং সময়ে-অসময়েই মৈত্রীকেও হিতকথার আবরণে অনেক ভর্ৎসনাই করত। কিন্তু প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র নিখিল যখন ডেপুটী পদে নিযুক্ত হ'ল, মৃত্যুঞ্জয়ের পত্নী প্রমদাই তখন মৈত্রীর সঙ্গে নিখিলের সম্বন্ধ আনবার জন্য ঔৎসুক্য জানাল। উল্লেখ মাত্রই সম্বন্ধটা নিস্তারণের মনঃপূত হ'ল। তার কারণ নিস্তারণ দেখ্‌ল যে মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যাঙ্কে যে আনুমানিক হাজার ত্রিশেক টাকা আছে, এই সম্বন্ধ হলে নিখিলই হবে কালক্রমে তার মালিক, কাজেই তার নিজের যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল তা কেবল দ্বিতীয় পক্ষের তিন ছেলেরই মধ্যে ভাগ-বাটোরা করা চল্‌বে। প্রমদা কিন্তু এ সব কিছু না ভেবেই সম্বন্ধের প্রস্তাব করেছিল; নিখিলকে গর্ভে ধারণ না করলেও তার প্রতি প্রমদার স্নেহের কোন কার্পণ্য ছিল না। কথাটা উত্থাপনের পর নিস্তারণের বাড়ীতে একদিন সকন্যা মৃত্যুঞ্জয়ের কিসের একটা উপলক্ষ্য করে নিমন্ত্রণ হ'ল। কিন্তু প্রমদা মৈত্রীকে দেখে খুব খুসী হল না, স্বামীকে ব'ল্ল "রংটা'ত ভালই, অসুখও কিছু বলে মনে হ'ল না. গায়ের গড়নেও মেয়েটী রোগা নয়, তবু যেন গায়ের মাংস কম এবং এবং মুখে লাবণ্য বলে কিছু নাই।"

কিন্তু নিস্তারণের সংসার বুদ্ধি যখন এ সম্বন্ধে একবার সায় দিয়েছে, তখন স্ত্রীর মতের জন্য সে পেছন ফেরবার লোক নয়। বিশেষতঃ অলক্ষ্যে নিস্তারণের একটা বদ্ধ ধারণা ছিল যে প্রমদা যখন নিখিলের সৎমা, তখন এ বিয়েতে প্রমদার মত নেবার তেমন আবশ্যক নেই।

মৃত্যুঞ্জয় প্রস্তাবটা শুনে ব'ল্ল "ভাই, নিখিলত ছেলে খুবই ভাল এবং সে তোমার পুত্র, কাজেই আমার দিক থেকে এ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছুই নাই। কিন্তু বুঝ্‌চত নিস্তারণ——"

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে নিস্তারণ ব'ল্ল "আরে ভাই, সে সব কথা কিছু নয়। ও ছেড়ে দাও। হাঃ হাঃ, বুঝ্‌লে মৃত্যুন্, এ কেবল পায়রার জোড়, একবার করে দিলেই হ'ল। ভুলে গেছ বুঝি Tennysonএর লাইন কয়টা,—"In the spring a fuller crimson comes upon the robin's breast"

"তার জন্যেই নিস্তারণ মেয়েছেলের নিজস্ব মতামতের উপর বিবাহটা নির্ভর করছে বেশী।"

"হাঃ হাঃ ভায়া, ও সব বাজে। ভেবে দেখনা এ শর্মার কথাটা। 'এই নিখিলের মার যখন মৃত্যু হয় তখন আমি বহরমপুরে—বহরমপুরে তখন তুমিও ছিলে হে—মনে নেই সেখানে Egerton সাহেব Session Judge ছিল, ব্যাটা আমায় একদিন খাস্ কামরায় বলেছিল "Nistaran Babu don't split your infinitives in your Judgement", ব্যাটা কত মন দিয়ে আমার রায় সব পড়ত, হাঃ হাঃ। ও যা তোমায় বলতে যাচ্ছিলাম সেখানে শ্রাদ্ধের পর কাজে হাজির হতেই হলধর বাবু Government Pleaderএর বাড়ীতে গিন্নীকে একদিন খাবার দিতে দেখেছিলাম। হাঃ হাঃ, ওসব কিছু নয় ভায়া, "In the spring a livelier iris changes on the furnished dove."

অনেক আলোচনার পর ঠিক হল যে তখন থেকে সপ্তাহ দুই প্রায়ই নিখিল মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে Indian Penal Code পড়তে আস্‌বে। নিস্তারণ বন্ধুকে এই বলে আশ্বস্ত করে বিদায় নিল যে দিন তিনেকের মধ্যেই কন্যার বে-আইনী অনুরাগে পিতার আইন্ অধ্যাপনা বন্ধ করতে হবে। ফলে হ'ল তাই।

নিস্তারণের প্ল্যান যাই থাকুক, মৃত্যুঞ্জয় কন্যাকে নিখিলের অধ্যয়ন-অনুরাগের নিভৃত কারণটা খোলা-খুলি ব্যক্ত না করে পারলো না। সে না পারা ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। কারণ পিতা-পুত্রীর মধ্যে যে একান্ত মানসিক ব্যবধানহীন বন্ধু-সুলভ নৈকট্য ছিল, তা'তে নিখিলের অধ্যয়ন-অনুরাগের মূখ্য কারণটা কন্যার নিকট দু'দিন পর্যন্ত অব্যক্ত রাখাতে মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিধাগ্রস্থ প্রাণের বেদনা অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল, তৃতীয় দিন বিকালে চা'য়ের টেবিলে পিতার মুখ খুলে গেল—মৃত্যুঞ্জয় কাতরভাবে মৈত্রীকে ব'ল্ল, "জান মা, একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি'। এই নিখিল ছেলেটী যে রোজ ক'দিন ধরে আমার কাছে আইন পড়তে আস্‌ছে তার সঙ্গে ওর বাবা তোমার সম্বন্ধ আন্‌তে চান"।

মৈত্রীর সামনের চায়ের পেয়ালা হাত লেগে পড়ে গিয়ে টেবিলে বিছান চাদরটাকে আর্দ্র করে দিল; তাঁর চোখে একটা রোষের দীপ্তি খেল্‌তে লাগল; মুখটাকে বিকৃত করে সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল "কি আশ্চর্য, তুমি এই ষড়যন্ত্রে সায় দিলে এবং আমার কাছে ঘেঁষবার জন্য ছেলেটাকে রোজ রোজ বসে বসে কষ্ট করে পড়াচ্ছ?"

"আমি ত তাই তোমায় বলেই দিলুম মা।"

"এ বলার মূল্য কি হল? বিয়ে যখন আমি করব না, তখন ছেলেটা সপ্তাহ কেন, বছর খানিক ধরে তোমার ওখানে আনাগোনা কল্লেও কিছু হবে না। আসুক না যত খুসী।

কিন্তু তুমি ত আমায় না জানিয়ে এ ষড়যন্ত্র পাকাতে বসেছিলে ! আশ্চর্য তোমার ব্যবহার—কি যে তুমি করছ কিছুদিন থেকে আমার সব ব্যাপারে, আমি বুঝিতে পারি না। এমন ধারা তুমি ত ছিলে না ”?

মৃত্যুঞ্জয় কথা না বলে চা খেতে লাগল এবং মৈত্রী টিপটে আর গরম জল না দেখতে পেয়ে চাকরকে ডেকে ধমকাতে লাগল এবং পরে গরম জল আনিয়ে পেয়ালায় চা ঢেলে নিঃশব্দে পান করতে লাগল। মিনিট দুই পিতা-পুত্রী কোন কথাই বল্‌ল না, পরে মৃত্যুঞ্জয় একটু কেশে বল্‌ল “মৈত্রী তুই ভুল বুঝেছিস্, আমার ত কোন ষড়যন্ত্র করার অভিপ্রায় ছিল না।”

“তুমি আমার কথায় ব্যথা পেয়োনা। তুমিই আমায় শিখিয়েছ লুকোচুরিকে ঘেন্না করতে, তাই আমি আজ সইতে পাচ্ছি না যদি তুমি আমার কাছে আমার সম্বন্ধে কোন কথা চেপে যাও।”

“তা যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন বাপু তোর যা ইচ্ছা নিখিল সম্বন্ধে তুই তা করিস্।”

“আমি আবার ওর সম্বন্ধে কি করব——”

এমনি সময় শ্রীমন্ত ঘরে ঢুকল এবং শিষ্টাচারান্তে একটা চৌকিতে বসে মৈত্রীকে বল্‌ল “কি গো মৈত্রী, বড্ড উত্তেজিত মনে হচ্ছে যেন ?” মৈত্রী উত্তর দিল “কিছু না।”

মৃত্যুঞ্জয় কথায় যোগ না দিয়ে ঈষৎ হাসতে লাগল। আলোচনা পাছে বন্ধ হয়ে থাকে এই ভেবে শ্রীমন্ত বল্‌ল “তোমার লজ্জিত বোধ করবার কিছু নেই মৈত্রী। আমি মনে করি যে মেয়েদের উত্তেজনাই হল তাঁদের প্রাণ-স্ফূর্তি। মেয়েদের প্রকাশ-ক্ষমতা আছে বলেই তাঁরা হাসেন বেশী, কাঁদেন বেশী, চটেন বেশী—কুলু কুলু কুলু নদীর স্রোতের মত—রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি মনে নেই।”

মৈত্রী গম্ভীরভাবে জবাব দিল “কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক সেটা বুঝুনগে আপনি কবিতা পড়ে। আমার কাছে কবিতার সাফাই গাইবেন না।” বলে অর্ধোচ্চারিত স্বরে আপন মনে মৈত্রী বল্‌ল “রবীন্দ্রনাথের কবিতা !”

শ্রী—তুমি বেজায় উত্তেজিত হয়ে আছ। ভালই, কিন্তু সেটাকে দমন করে ভাল করছো না। আমি না হয় উঠি তুমি যা বলচিলে তাই বল।

মৃ—হ্যাঁ, মৈত্রী আমার একটা——কি গো মা সেটা বলো শ্রীমন্তকে ?

মৈ—তোমার ইচ্ছা হলে বল না। আমার কি এসে যায় বল্‌লে।

মৃ—জান্‌লে শ্রীমন্ত, আমাদের এই নিস্তারণ বাবুর বড় ছেলেটী—এর যে—

শ্রী—নিখিল, এই গেল সপ্তাহে ডেপুটী হল।

মৃ—হ্যাঃ, সেই। কি বল্‌ছিলাম—এই যে ছেলেটী, নিস্তারণের ইচ্ছা যে মৈত্রীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাইতে——

মৈ—ওর কাছে আইন পড়বার ভাণ করে আমার সঙ্গে ঘেঁষতে আস্‌ছে এ কদিন থেকে এবং বাবা আমাকে সেটা আজ বল্‌চেন খুলে। বেহায়াপনার রকম দেখুন না এবং হয়েছে সেটা বাবার জানা সত্ত্বেও। উত্তেজিত হয়েছি কি শুধু শুধু ?

শ্রী—শুধু শুধু হও নাই বলে কেন মিথ্যামিথ্যি তোমার উত্তেজনার ন্যায্যতা প্রমাণ করছ, মৈত্রী। (খানিক থেমে) তবে ঘটক মারফত সম্বন্ধ ঠিক করার চাইতে আইন-অধ্যয়নের মারফতে ছেলে-মেয়ের জানাশোনা হয়ে বিয়ে হওয়া অনেক প্রশংসনীয় নয় কি ? এঁর বোধ হয়——”

মৈত্রী শ্রীমন্তকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বল্‌ল, আপনি থামুন ত, এ সব হিতকথা আপনি আপনার ক্লাসের ছেলে এবং মেয়েদের জন্য নোট-বুকে টুকে রাখুন গে।”

শ্রী—এ তোমার অন্যায় মৈত্রী। সবার সব কথার সঙ্গে সব-সময়ে মত মেলে না জানি। তুমি বল্‌লেই পার যে আমার সঙ্গে তোমার মত মিলবে না কিন্তু তা না করে তুমি আমায় থামতে বল্‌বে কেন ?

মৃ—আঃ আঃ——

শ্রী—(হেসে) আপনি ওসব কথা কানে তুলবেন না।

মৈ—আপনি কথা কইবেন গোড়ায়ই ভুল করে। যাচিয়ে দেখবেন যে কি রকম বিয়ের সম্বন্ধটা ভাল এবং বলবেন সে কথা আমার কাছে যার বিয়ের সম্বন্ধে কোন ভাবনাই নাই। তবে আপনাকে না থামিয়ে কি করি বলুন ? কথাগুলো ত শুধু শোনবার জিনিষ নয়; না-সইবারও ত জিনিষ বটে।

শ্রী—অবাক করলে মৈত্রী। তোমার কথা শুনবার মত সহিষ্ণুতাও নাই। সত্যি তোমরা মেয়েরা বড্ড অনুদার।

মৈ—আপনি আবার জ্যামিতির থিওরেম আওড়াতে সুরু করলেন মেয়েরা এই, মেয়েরা অই। এতে ঔদার্য রাখতে আমি পারি না।

মৃ—মিতি তুমি আলোচনা কর, অসহিষ্ণু হয়ে পড় কেন ?

মৈ—বাবা কি যে বল ? আলোচনা করতে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে আমি ত পেছোই না—তোমরাই পেছোয়। তুমি রাখতে চাও সব কিছুর ভিতর তুমি যাকে বল সমন্বয়, শ্রীমন্তবাবু দেখতে চান সব কিছুর ভিতর ব্যক্তিগত আদর্শের প্রভাব। তোমরাই ত বুদ্ধির পিঁজরা খুলে দিতে চাও না, চাও তাকে একটা-না-একটা শিক্‌লি দিয়ে এঁটে দিতে।”

শ্রী—আচ্ছা মৈত্রী, ধরে নেওয়া যাক যে মেয়েদের বা ছেলেদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আমার কথাগুলো অন্যায় কিংবা ধর নিখিলের আইন পড়ার ভান করে তোমাদের বাড়ীতে আসা তুমি পছন্দ কর না। তা নাই বা করলে কিন্তু তাতে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠো কেন ?

অজ্ঞানের প্রতি, অন্যায়ের প্রতি, অসুন্দরের প্রতি তোমরা মার্জনা নাই কেন? মৈত্রী প্রথমটা উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌ল "দেখুন, এটা আমার স্বভাবে নাই। আমার পছন্দের বাইরের যে জগৎ, সে আমার শত্রু-জগৎ। আপনার মত আমি বলতে পারব না যে স্ত্রীপুরুষের প্রত্যেকেরই আছে বিভিন্ন জগৎ। আমি বুদ্ধি দিয়ে যে কাজকে সমর্থন করতে পারব না, তাকে আমি ভৎর্সনা করব, ধিক্কার দেব, বলব না "আমার ত ভাল লাগে না, তবে তুমি দেখ ভেবে।" এ প্রকার ঔদার্য আমার নাই এবং নাই বলেই আমার গর্ব?

স্ত্রী—তা হলে ত বাপু তোমার অনেক বই পড়াই চলে না। Goneril এর চরিত্র কেউ ত বরদাস্ত কর্তে পারে না, তা হলে তোমার মতে কারো ত King Lear পড়া অসম্ভব।

মৈ—নিশ্চয়ই অসম্ভব—King Lear না হলেও অনেক বই ত বটেই। তাই ত আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা" পড়ে রাগের মাথায় এক জনার বইখানাই ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।

শ্রী—কেন, কবির এই দুরদৃষ্টের কারণ কি?

মৈ—দুরদৃষ্ট ত কোন লেখকের নয়, দুরদৃষ্ট তাঁদের যারা খেটে বই পড়তে চান।

শ্রী—তা যেন হল। কিন্তু "শেষের কবিতার" অপরাধ।

মৈ—অপরাধ এই যে সেখানে "লাবণ্য" বলে যে মেয়েটী তার অদ্ভুত আচরণ দেখে। বইখানাকে কবিতা বলে ভালই করা হয়েছে। সোজা করে যে কথা বল্‌লে সবাই ওর মুখে ছাই দিত, "লাবণ্য" সেটাকে কবিতার আশ্রয় দিয়ে "কালের যাত্রার ধ্বনির" মধ্যে তা আপনাদের কিছুই বুঝতে দিলে না। যাক্‌গে বেশী নিন্দায় কাজ নেই, আপনি হয়ত এর মধ্যেই কাণ ঢেকে বসে আছেন?

মৈত্রী খুব বেশী মিথ্যা বলে নি। কারণ শ্রীমন্তের তর্ক-শক্তি হঠাৎ যেন শ্লথ হয়ে এল। আরো পাঁচ সাত মিনিট অন্য দু'চার কথার পর সে সে-রাত্রির মত পিতা-পুত্রী কাছে বিদায় নিল।

মৃত্যুঞ্জয় সে রাত্রিতে শিরঃপীড়ার অজুহাতে আইন-অধ্যাপনার হাত থেকে মুক্তিলাভ করল। পরদিন নিস্তারণের নিকট ব্যাপারটা খুলে বলাতে সে বল্‌ল "মৃত্যুন, তুমি কন্যাকে যা ভয় পাও, আমরা বাড়ীতে দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারকে তত ভয় পাই না। তা হোকগে, নিখিলের কিছু হবে না, তুমিই বুদ্ধির দোষে ডেপুটী-জামাই হারালে। ডেপুটী-ছেলে, সে কি সোজা হে মৃত্যুন। এই এক রোখা মেয়েটিকে নিয়ে কষ্ট পাবে ভায়া। তুমি আর ক'দিন। বুঝচ না মেয়েটীর ত একটী আশ্রয় চাই।"

মৃত্যুঞ্জয় কোন কথাই না বলে নিস্তারণের উপদেশ গলাধঃকরণ করে গেল। নিস্তারণ এমন ইঙ্গিতও করলো যে মৈত্রী হয়ত বা বিপ্লবীদলের পাল্লায় পড়েছে। কথাটা মৃত্যুঞ্জয় কানে তুল্‌ল না।

পাঁচ

হেমবালার প্রস্তাব মত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হবার ব্যবস্থা হ'ল। সাক্ষাতের নিগূঢ় অভিপ্রায় ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে নিস্তারণের হৃদ্যতার সুযোগ নিয়ে নিখিলের জীবন-বীমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা। হেম-বালা কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে আলাপ করে দেখ্‌ল এ পথে বিঘ্ন বহু। প্রাথমিক শিষ্টাচারের অবসান হ'লে এবং মৈত্রী কোন কারণে বসবার ঘর থেকে উঠে গেলেই হেমবালা ব'ল্‌ল, "আপনার কাছে আমার আসার বিশেষ দরকার হ'ল মৈত্রীর বিয়ের একটা সম্বন্ধ। আমার ত ছেলেটীকে খুবই ভাল লাগে এবং কিরীটের কাছে আপনার কথা যতটুকু শুনেছি, তা'তে মনে হয় আপনি বোধ হয় রেজিষ্ট্রী বিয়েতে আপত্তি করবেন না। শৈবাল চাটুয্যে ছেলেটীর নাম আপনি শুনেচেন কি—হালে ষ্টোরস্ ডিপার্টমেণ্টে ৫০০৲ মাহিনার কাজ পেয়েছে।"

মৃত্যুঞ্জয় উত্তর দিল "ছেলেটী খুবই ভাল বলে মনে হচ্চে। তবে কি জানেন মেয়ে আমার বিয়ে কত্তে রাজি হচ্ছে না।"

"তা হবে নিশ্চয়। আপনি ওর জন্য কিছু ভাববেন না। আমার বাড়ীতে সেদিন মৈত্রী শৈবালকে দেখেছেও। আর কি জানেন, মেয়েদের বিয়ের ব্যাপার মেয়েরাই বুঝ্‌তে ও বোঝাতে পারে।"

"আমার একান্ত ধারণা যে মৈত্রীকে এখন বিয়েতে রাজি করাতে পারব না। এই দেখুন্ না আমার বন্ধু নিস্তারণ মিত্র——"

"—যার ছেলে হালে ডেপুটী হ'ল না।"

"হ্যা তিনিই বটে এবং সেই ছেলেটীর সঙ্গেই বিয়ের জন্য নিস্তারণ সম্বন্ধ এনেছিলেন। কিন্তু হলে কি হবে? মেয়েতো সম্বন্ধ এগোতে দিলেই না, তা ছাড়া মেয়ের ব্যবহারে নিস্তারণও আমার উপর খানিকটা বিরক্ত ও বোধহয় ক্রুদ্ধ হয়েছেন।"

হেমবালা অন্যমনস্ক ভাবে বলল "তাই না কি।" খানিকক্ষণ চুপ থেকে ব'ল্‌ল "আচ্ছা আপনার যদি নিখিলের সঙ্গে সম্বন্ধ চালাবারই বেশী আগ্রহ হয়—তা ছাড়া ও বিয়েতে অসবর্ণ বিয়েও হবে না—বাস্ তাই করুন। আমায় না হয় আপনি একদিন নিস্তারণ বাবুর বাড়ীতে নিয়ে যান, এদিকে আমি মৈত্রীকে নেড়ে দেখ্‌বখন। (স্মিত মুখে) আসল কথা আমি চাই মৈত্রীর বিয়েটা হৌক। চমৎকার আপনার এই মেয়েটী।"

মৃত্যুঞ্জয় রাজি হল না। কিন্তু অনেক কথার পর শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ের আপত্তি ও হেমবালার মৈত্রী-অনুরাগের রফা হল এই করে—যে শৈবাল চাটুয্যের সঙ্গেও ত নিস্তারণ তাঁর কোন কন্যার সম্বন্ধ কত্তে পারে কাজেই হেমবালাকে নিস্তারণের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট অপরাহ্ণে হেমবালা মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে গিয়ে প্রথমে প্রমদা এবং পরে নিস্তারণের সঙ্গে

কথা তুলবার সুযোগ পে'ল। শিষ্টাচারী মৃত্যুঞ্জয় কিছুদিনের মত হেমবালার মৈত্রী-অনুরাগের হাত থেকে পরিত্রাণ পে'ল।

বলা বাহুল্য যে কিরীট নিজে অনূঢ়া সহোদরার ব্যবসায়-চাতুর্যটা মোটেই প্রশংসা করত না। এতে তার আর্থিক সাহায্য হ'ত খুবই কিন্তু কিরীট আর্থিক সচ্ছলতাকেই জীবনে সবচাইতে কাম্য বলে মনে করত না। এ নিয়ে ভাই-বোনে মনান্তর ও মতান্তর হ'ত প্রায়ই কিন্তু হেমবালা ও তার চরিত্র বদলাত না কিংবা কিরীটও দিদির প্রগাঢ় স্নেহকে উপেক্ষা করে চলতে পারতো না।

নিখিলের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে আইন-চর্চা অবসানের প্রায় সপ্তাহ দুই পরে মৃত্যুঞ্জয় সত্য-সত্যই একদিন সামান্য জ্বরে আক্রান্ত হলেন ; কাজেই সেদিন সন্ধ্যায় যখন কিরীট ও শ্রীমন্ত বোসেদের বাড়ীর সান্ধ্য-বৈঠকে হাজির হ'ল তখন মৃত্যুঞ্জয় গল্প-আলোচনায় যোগ দিতে পারলো না। শ্রীমন্ত, মৈত্রী ও কিরীটের সঙ্গে শোবার ঘর থেকে ফিরে এসেই বল্‌ল "এখন আমি পালাই"। পরের মুহূর্তে কিরীটের দিকে ফিরে সে ব'ল্‌ল "কি বল হে কিরীট, আমাদের এখন সরে পড়াই উচিৎ, নয় কি ?"

কিরীট কিছু জবাব দিবার আগেই মৈত্রী বল্‌লো "কেন বসুন না। অসুখ হ'লে বাবা কারুরই কাছে থাকা পছন্দ করেন না। কিরীটবাবু'ত এলেন আজ প্রায় সপ্তাহ খানিক বাদে।"

শ্রী—তাইত হে কিরীট, তোমার আজকাল দেখা পাওয়া শক্ত হয়ে উঠেছে। গেল শনিবারে নাকি আমাদের ওখানে তোমার আসার কথা ছিল কিন্তু তোমার'ত টিকিও দেখা গেল না।

মৈ—বসুন আপনারা, বসেই কথা বলুন।

আগন্তুকদের সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রী ও একটা চৌকি টেনে বস্‌ল।

শ্রী—তাইত তোমার ব্যাপার কি ?

কি—ব্যাপার আর কি—সবারই যা আমারও তাই। দিদি দিব্যি কেইস্ আন্‌চে, ভাবচি এবার বে'থা করি।

শ্রী—চমৎকার খবর, চমৎকার।

মৈ—চমৎকারটা কিসে হল বুঝ্‌তে পারলাম না।

শ্রী—বিয়েটাত জীবনের একটা পর্যাপ্তি এনে দেয়—অন্ততঃ অনেকেরই পক্ষে—অন্ততঃ এই আমার ধারণা। কিরীটের এটা এতদিন অপূর্ণ ছিল—এখন পূর্ণ হবে।

মৈ—কি যে বলেন আপনি শ্রীমন্ত বাবু ?

শ্রী—কি অশোভন কথাটা বল্লাম মৈত্রী ?

মৈ—দিদি আন্‌বে কেইস্‌ এবং সেই ভরসার উপর উনি কোরবেন বিয়ে? আপনি এ উপহাসটা বুঝতে পারলেন না?

কি—উপহাস নয় বলছি মৈত্রী।

মৈ—একশ বার।

শ্রী—কি মুস্কিল, ও বলছে নয়, তবু তুমি জোর করে ওর মনের ভাবার্থ করবে।

মৈ—দিদির অর্থের উপর নির্ভর করে কোন ভাই বিয়ে করে না। কিরীট বাবু নিছক ধোঁকা দিচ্ছেন।

কি—অর্থার্জনটাকে অত বড় করে দেখচ কেন মৈত্রী? দিদির অর্থে ভাই অর্থী হতে পারে, পিতার অর্থে কন্যা অর্থী হতে পারে।

কথাটা শোনামাত্র মৈত্রীর মুখ রক্তিম হ'য়ে উঠল? কিরীট বুঝ্‌ল যে ওর কথাগুলোর ঘা গিয়ে কোথায় লেগেছে কিন্তু কোন প্রকার মার্জনা না চেয়ে সে চুপ করে রইল। মৈত্রীও নিজেকে সাম্‌লিয়ে নিয়ে ব'ল্ল "কথাটা হয়ত ঠিকই বলেচেন, তবে—"

শ্রীমন্ত বাধা দিয়ে ব'ল্ল "দেখ মৈত্রী, তোমার বোধহয় বাবার কাছে গিয়ে বস্‌লে ভাল হ'ত।"

মৈ—বল্লাম না আপনাকে যে উনি অসুখের সময় কারো পাশে বসা পছন্দ করেন না।

কি—শক্ত রোগে, শ্রীমন্ত, রোগীর সেবা পাওয়া যত আবশ্যক, অল্প রোগে নির্ভরশীল না হওয়া তার চাইতে বেশী দরকার।

মৈ—অতি খাঁটি কথা। কিন্তু এটা মুখ ফুটে বলবার কি যো আছে। শ্রীমন্ত বাবুর নিশ্চয়ই এ কথাগুলো মনঃপুত হচ্ছে না।

শ্রী—তোমার আদর্শের ব্যাখ্যা তুমি করলে, আমি তাই শুনে গেলাম। সে যাই হোক, আমি এখন পালাই। তুমি তোমার বাবার সেবা করতে যাও আর নাই যাও।

বলে দ্রুতপদে শ্রীমন্ত ঘরের বাইরে চলে এল। মৈত্রী এই আকস্মিক অপসারণে খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইল। কিরীট বল্ল "আচ্ছা মৈত্রী, তুমিকি সত্যি মনে কর যে দিদির অর্থে বয়ঃপ্রাপ্ত ভা'য়ের পুষ্ট হওয়া অনুচিত?"

"অনুচিত বলে অনুচিত, হাজারবার অনুচিত। কিন্তু আপনি আজ থামুন ত। আমি বাবার জ্বরটা এখন কত দেখিগে" বলে মৈত্রী উত্তরের অপেক্ষা না করেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিরীট মুখের অর্দ্ধ-স্ফুট হাসি চেপে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

নবযৌবনা

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোমল অধরে তব স্পর্শ কামনার
কমনীয়, নয়নের নীলাভ অঞ্জনে
বেদনা আভাস মাখা, নবীন যৌবনে
সহসা স্তম্ভিত যেন জাগর জোয়ার;
সঘন নিশ্বাসে ভাসে বসন্তসখার
সুরভিত ভস্মরেণু অদৃশ্য-গোপনে।
ভিতর বাহির ভরি' তোমার ভুবনে
নিয়ত নিগূঢ় কোন্ ভাবনা সঞ্চার!
মনের মধুকবনে বঁধুয়ার তরে
মুকুতার মালা গাঁথা অসমাপ্ত পড়ি'
ক্ষুব্ধ অভিমান ভরে; পত্রমরমরে
সলাজ হৃদয় আজ ওঠে নাকো নড়ি।
যৌবনউদ্বেল তব জীবনে সুন্দরী
বেদনামধুর একী শোভা মরি মরি॥

হিটলার ও ষ্টালিন এবং মানব সমাজের ভবিষ্যৎ

সমর গুহ

সর্বগ্রাসী-মহাসমরের প্রথমাংকের অবসান হয়েছে। এবার দ্বিতীয় অংকের পালা। প্রথমাংকের নায়ক ছিলেন চার্চিল ও হিটলার। পটপরিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে যোগ দিয়েছেন ষ্টালিন। সম্ভবত এ মহানাটকের যবনিকা টান্‌বেন চার্চিল ও তার মিতা রুজভেল্ট নন, অন্য কেউ—তারা হলেন—হিটলার ও ষ্টালিন।

সমগ্র মানবসমাজের ভাগ্য, তাদের শান্তি ও স্বস্তি নির্ভর করছে এই দুই বিশিষ্ট মানবের উপর। আগামী কালের মানবেতিহাসের সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপায়নের কৌশলী হলেন এরা। উৎকণ্ঠচিত্তে সমগ্র মানবসমাজ তাই এদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এরা কি কর্‌বেন? সমাজকে, সভ্যতাকে কোন পথে নিয়ে যাবেন? ক্লিষ্ট সমাজের আবদ্ধ কারাগার হ'তে কি এরা মুমূর্ষু মানবাত্মাকে মুক্তি দেবেন? উদ্দেশ্যহীন দিক্‌ভ্রান্ত মানবজীবনকে শত-সহস্রদলে সঞ্জীবিত করে তুলবেন—না আরো বিকৃত আরো কুৎসিত করে তুলবেন?

বিচিত্র এই দুই ডিক্‌টেটরের চরিত্র। মানব-চরিত্রের বিশিষ্ট কতকগুলি বৃত্তির অভাব সত্বেও, এ কথা আজ অপকটে স্বীকার করা যায়, যে জার্মাণী ও রাশিয়ার জনসাধারণ হিটলার ও ষ্টালিনকে জাতীয়তার অগ্রদূত বলে মেনে নিয়েছে। নিজস্ব প্রতিভা ও যুগধর্মের তাগিদই তাদের অবিসম্বাদী নেতৃত্বের মূল কথা।

হিটলার জার্মাণীর জাতীয় সমস্যা যথাযথ নির্ধারণ করেছিলেন। সে সমস্যা সমাধানের প্রয়াসই হিটলারের অভ্যুত্থানের গোড়ার কথা। ১৯১৮ সালের পর্যুদস্ত জার্মাণীর অস্থিমজ্জায় পরাজয়ের গ্লানিমা বিষাক্ত রক্তের মত জমে উঠছিল। সেই বিষাক্ত রক্তের অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত জাতি হয়েছিল অস্থির। এ রোগযন্ত্রণার প্রতিশেধক জানা ছিল একমাত্র হিটলারের। তাই হিটলার সমস্ত জনসাধারণকে ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার মন্ত্র দিয়েছিলেন। কোন এক লেখক সত্যই বলেছেন—'Hitler is the creation of Versailles Treaty.' হিটলারের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় কারণ হোয়েছে, জার্মাণ ভাষাভাষীদের একরাষ্ট্রের আওতায় আন্‌বার প্রয়াস। ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্মাণ জাতি ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি—রাইনলাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, পশ্চিম চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলিশ করিডরের (corridor) অংশগুলিকে একই রাষ্ট্রের অধীনে এনে পুরোপুরি একটি জার্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ ছবি, তিনি এমনভাবে জার্মাণ

জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছিলেন, যে সমস্ত জার্মাণ জাতি এই নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে হিটলারের পেছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য ব্যাংকার—(Fritz Thyssen) ফ্রিৎস থাইসেন ও বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের সমর্থনও হিটলারের ক্ষমতালাভে অনেক সাহায্য করেছিল। কিন্তু অভীষ্ট ক্ষমতা লাভে হিটলার জার্মাণীর আভ্যন্তরীন দলাদলির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। স্যোসিয়েলিষ্ট, কমুনিষ্ট, রিপাব্লিকান ইত্যাদি দলগুলি রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার কর্‌বার জন্য পরস্পর যুঝেছে অনেক কিন্তু জার্মাণীর সমসাময়িক সমস্যার সংগে তাল রেখে, সমগ্রজাতির সমস্যার সমাধানের কোন নূতন সন্ধান দিতে পারেনি। মতবাদের গোড়ামীতে এদের পেয়ে বসেছিল। দেশের সমস্যা সমাধান অপেক্ষা মতবাদের প্রতিষ্ঠার দিকেই এদের ঝোঁক ছিল বেশী, তাই সংখ্যাল্প হয়েও হিটলারের অনুগামীরা অল্পকালের মধ্যেই জার্মাণীতে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন কারণ তার মতবাদ ও কর্মপন্থার সংগে জাতির নাড়ীর যোগ ছিল।

হিটলার, সাময়িকভাবে জার্মাণির জাতীয় সমস্যার সমাধান করেছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সমস্যা সমাধানে এমন কতকগুলি প্রগতিবিরোধী, রাষ্টিক ও আর্থিক মতবাদ এবং বংশগত আভিজাত্যের প্রশ্রয় দিয়েছেন, যে জার্মাণ জনসাধারণ সম্বন্ধেই, এই মতবাদ মারাত্মক হোয়েছে যা সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও সংহতি বিনষ্টকারী হোতে বাধ্য। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে, ধনতন্ত্রবাদের উগ্রতায় যখন গণ আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক আকারে দানা বেঁধে উঠেছে এবং নবজাগ্রত জনশক্তির চাপে তথাকথিত গণতন্ত্রী মার্কা, পার্লামেণ্টারী সরকারের সহায়ে অগণিত গণসমাজকে শাসন ও শোষণ যখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তখন হিটলারের এই নূতন মতবাদ ধনতান্ত্রিকদের শেষ আশ্রয় স্থল হয়ে উঠলো। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে হিটলারের মতবাদ 'Fuherer Prinzip' নামে পরিচিত। এই মতবাদে গণতন্ত্রের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। রাষ্ট্র তথা নেতাই হলেন একচ্ছত্র অধিপতি। এই স্বৈরাচারী শাসনে জনসাধারণের মতামত খাটানোর কোন অধিকার নাই। জনসাধারণ প্রতিবাদ বা মতামত জানাবে না, নিরুত্তরে শুধু রাষ্ট্রের আদেশ মান্‌বে। এক কথায় এই মতবাদে জনসাধারণের স্বাধীন মতামত জ্ঞাপনের সুযোগকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই মতবাদ আরো মারাত্মক। এই মতবাদে ব্যক্তিতন্ত্রকে স্বীকার করে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, বণ্টন ও শোষণের উপায়কে মেনে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের স্বৈরাচারিতায় ব্যক্তি-প্রভূত্ব আংশিকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সত্য, তথাপি বিলিয়মান ধনতন্ত্রের শেষ এবং সাময়িক নিশ্চিত আশ্রয়স্থল লাভের তুলনায়, এ ক্ষতি স্থিত-স্বার্থবাদী ধনতান্ত্রিকদের নিকট অনেকটা সহনীয়। তাই হিটলার কেবলমাত্র জার্মাণীর ধনতান্ত্রিকদের সমর্থন ও আনুগত্য নয় পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের ধনিকদের সহানুভূতি আকর্ষণেও কৃতকার্য হয়েছেন। এই রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক মতবাদের ফলে, জার্মাণীতে কোন গণআন্দোলন বা দল গঠনের অধিকারই

জনসাধারণের নাই। তাই সরকারী চাপে বিরুদ্ধবাদী দলগুলিকে রূঢ়ভাবে দমন করা হয়েছে। জাতীয় কৌলিন্যের যে বুলি আমদানী করা হয়েছে (Racial superiority) তার একমাত্র পরিণতি হবে—অপেক্ষাকৃত আপাংক্তেয় জাতিগুলির উপর অধিকার লিপ্সায় জাতিতে জাতিতে কোন্দল।

জার্মাণি ও ইটালী এই দুই দেশে একই মত—আকারে বিভিন্ন হলেও প্রকারে এক। এই মতবাদ মুসোলিনির কথায়, 'anticipates the solution of a universal problem, which elsewhere have to be settled in the political field by the rivalry of parties, the excessive power of parliamentary regime, and the irresponsibility of political assemblies'......বিশ্বসমস্যা সমাধানের দাবী করে। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে ক্ষয়িষ্ণু বণিকতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদীগণ, এই নূতন মতবাদে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে কিছুকালের জন্য রেহাই পাবার ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করবার সন্ধান পেয়েছে। এ মতবাদ তাই বিশ্বের, ধনতন্ত্রীদের শেষ ভরসাস্থল—তাদের অমৃত রসায়ন। এ মতবাদ তাই জার্মাণী ও ইটালীর ভৌগলিক দেয়াল ভেংগে সমগ্র ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৩৬ সালের জাপ-জার্মাণ 'anti-comintern' বা কম্যুনিষ্ট বিরোধী চুক্তির ফলে এ মতবাদ এসিয়াতেও প্রসার লাভ করেছে। ফ্রাংকোর ফ্যালাঞ্জিষ্ট দলের প্রভাব আজ স্পেনে অপ্রতিদ্বন্দী, রুমানিয়া এবং হাংগারীও এই মতবাদের উপাসক। ঐ মতবাদের ছোঁয়াচ থেকে ফ্রান্স এমন কি ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত রেহাই পায়নি। ফ্রান্সের 'Neo-Socialist' দল এবং Moseleyর 'British Union of Fascists' তারই ইঙ্গিত। গণতন্ত্রী আমেরিকার সোরগোল ভেদ করেও দু'একটি বেসুরো কণ্ঠ শুনা যায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায় মাঝে মাঝে তা কলরবের মতই মনে হয়। কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনেলের মত ঘটা করে না হলেও, এ মতবাদ যে ধীরে ধীরে একটি আন্তর্জাতিক Fascist International এর রূপ নিচ্ছে তা'তে সন্দেহ নাই। এই ফাসিষ্ট ইণ্টারন্যাশনেলকে পাকা-পোক্ত করে তুলবার জন্য অধুনা হিটলারের, নববিধান বা New Order এর বুলি এবং Axis-Pact বা চক্রচুক্তির সহায়ে এই বুলিকে কার্যকারী করে তুলবার যে প্রচেষ্টা চলেছে, তা'তে মানবেতিহাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শংকাকুল হওয়ার যথার্থ কারণও রয়েছে।

রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভে ষ্টালিনকে হিটলারের মত এত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় নাই। রাশিয়ার জমি আগেই প্রস্তুত ছিল। বস্তুত জমি তৈরীর বেশীর ভাগ বাহাদুরী লেনিনেরই। যুগ যুগ লাঞ্ছিত ও অপমানিত গণসমাজ এই সবেমাত্র নূতন রাষ্ট্র, অর্থ ও সমাজনীতির আস্বাদ পেয়েছিল। পুরাতন বন্ধন শিথিল হয়ে নবজীবনের জোয়ার রাশিয়ায় সমস্ত গণসমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত হয়েছিল—এই নূতন জীবনের সঙ্গে পরিচয় এবং তাকে পুরোপুরি উপভোগ করা ছিল রাশিয়ার জনসাধারনের একমাত্র কাম্য। ১৯১৭ সালের পর থেকে ছিল রুশ গণসমাজের

নবরূপায়নের যুগ। বিপ্লবোত্তর কালে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্রকে পুনর্গঠন ও সমাজকে সংস্কার করবার দিকে জনসমাজের ঝোঁক ছিল বেশী। এর ফলে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে গণসমাজের বিশেষ স্পৃহা ছিল না। তা'ই নেতৃস্থানীয়দের রাজনৈতিক দলাদলি, রাষ্ট্রে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি এবং কর্মপন্থার মতান্তর নিয়ে মাথা ঘামাতে জনসাধারণ নিতান্তই ছিল নারাজ। ট্রট্স্কির 'Theory of permanent revolution' বা বিশ্ববিপ্লব এবং ষ্টালিনের 'Socialism in a single country' বা একদেশিয় সমাজতন্ত্রবাদের বিতর্ক ও দ্বন্দে জনসাধারণের বিশেষ কোন যোগ ছিল না বল্‌লেই চলে। আসলে জনসাধারণের মানসিক অবস্থা ছিল অনেকটা নির্বিকার ঔদাসিন্যময়। তারা চেয়েছিল তাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধান, অন্ন-বস্ত্র বাসভূমি, শিক্ষা ও আরামের ব্যবস্থা। বাস্তববাদী ষ্টালিন এই মানসিক অবস্থার পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাই একদিকে লেনিনের নামের দোহাই দিয়ে অন্যদিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে নববিধানের সূচনা এমন তোড়জোড়ের সংগে আরম্ভ করে কিছুটা সাফল্য তিনি এনেছিলেন—সমগ্র জনসাধারণ এই নূতন জীবনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ছিল ব্যস্ত। উর্ধ্বতন নেতাদের দলাদলির ব্যাপারে মাথা ঘামাবার ফুসরতও তারা পায় নাই। উপরন্তু জনসাধারণের নিজস্ব সমস্যার আংশিক সমাধান হওয়াতে, তাদের অসন্তোষের কারণ ছিল না। ষ্টালিনের সফলতার আরেকটী কারণ—রাশিয়ার একমাত্র দল কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর ষ্টালিনের একাধিপত্য। রাশিয়ার রাষ্ট্র পরিচালনায় কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান প্রভাব ষোলআনা। ষ্টালিন তাই আজ পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি এবং Communist International বা সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকের নেতা। কার্লমার্কসের স্বপ্ন ছিল, সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর সর্বহারা গণসমাজের মুক্তি আনয়ন করা। এই স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য মার্কস আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সংঘ গঠন করেছিলেন। লেনিন উত্তরাধিকারী হিসাবে এ সংঘকে ব্যাপক ও পুষ্ট করেছেন এবং এর অধুনাতম নেতা ষ্টালিন একে দিয়েছেন নূতন মতবাদ ও কর্মপন্থার সন্ধান। কম্যুনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশনেলের আদর্শ ছিল পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা করা এবং কর্মপন্থা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সর্বহারাদের সংঘবদ্ধ করে বিপ্লবের সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার ও সর্বহারাদের নেতৃত্ব বা 'Dictatorship of the proletariat' প্রতিষ্ঠা করা।

হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত কমিণ্টার্ণের বা কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের কেন্দ্রিয় পরিষদ থেকে এই মতানুযায়ী কাজ চল্‌ছিল। কিন্তু একদিকে জার্মাণী ও ইটালীতে ফ্যাসিষ্টবাদের ব্যাপক প্রসার লাভে এবং অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অক্ষমতায় ও ফ্যাসিষ্টবাদ প্রতিরোধের ব্যর্থতায়, ষ্টালিন সোভিয়েট রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় সন্দিহান হয়ে উঠলেন। এই সময় জাপ-জার্মাণ-ইটালীর 'কম্যুনিষ্ট

আন্তর্জাতিক বিরোধী' চুক্তিতে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হল। ফাসিষ্টবাদ ও সাম্যবাদে ঠোকাঠুকি তীব্র হয়ে উঠলো। ফাসিষ্টবাদের এই নবতম আক্রমণের সংগে সংগে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত হল। এ নীতির মূল লক্ষ্য হল আত্মরক্ষার জন্য সুদৃঢ় বর্ম তৈরী করা এবং বৈদেশিক নীতি হল অন্যান্য রাষ্ট্রের সহায়তায় আত্মরক্ষার পথ প্রশস্ত করা। কার্ল রাদেক-এর কথায় সোভিয়েটের নীতি হল, "The object of the Soviet Government is to save the soil of first proletarian state from criminal folly of a new war........The defence of peace and neutrality of the Soviet Union against all attempts to draw it into the whirl-wind of a new world war is the central problem of Soviet foreign policy." এই নীতির ফলে ফাসিষ্ট ব্যতীত অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংগে বৈরিতার চেয়ে মিতালির দিকেই ঝোঁক গেল বেশী। যেহেতু রাশিয়ার ভাগ্যের সংগে কমিণ্টার্ণের ভাগ্য জড়িত, সেহেতু কমিণ্টার্ণের নীতিরও সাময়িক পরিবর্তন হল।

এই নূতন নীতির নাম হল 'The front populaire' বা জনসংহতি নীতি। ষ্টালিন এই নূতন নীতির সমর্থনে যুক্তি দিলেন—সোভিয়েট রাশিয়াই পৃথিবীর সর্বহারাদের স্বপ্নের সর্বপ্রথম ও একমাত্র মূর্ত প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয় সোভিয়েটের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহায়তাই পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্রবাদের এত দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েটের সংগে বস্তুত পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভাগ্য একই সূত্রে বাঁধা—তাই সোভিয়েটের বাঁচা-মরার প্রশ্ন সমগ্র গণসমাজেরই বাঁচা-মরার প্রশ্ন। এই নীতি অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে অন্যান্য দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির আদর্শ ও কর্মপন্থার সাঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে নিতে হল এবং বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্নও সাময়িকভাবে চাপা পড়ল। ফ্রান্সের কম্যুনিষ্টগণ সে দেশের সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, মঁসিয়ে ব্লঁয়ের সরকার এবং তার সামরিক বাজেটকে (যে বাজেটের তারা এতদিন বিরোধিতা করেছিল) সমর্থন করতে ও বৃটিশ কম্যুনিষ্টগণ লেবার পার্টির সঙ্গে মিতালী করতে দ্বিধা বোধ করেনি। এমন কি আমেরিকার কম্যুনিষ্টগণ, সেদেশে ফাসিষ্টবাদের প্রসার অংকুরেই বিনাশ করবার জন্য নির্বাচনে রুজভেল্টকে পর্যন্ত সমর্থন করা প্রয়োজন মনে করেছিল। মোটকথা প্রত্যেক রাষ্ট্রেই প্রগতিশীল দলগুলি ফাসিষ্টবাদের প্রভাব নষ্ট করবার জন্য জোট বেঁধেছিল। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পপুলার ফ্রন্টনীতি ব্যর্থ হয়েছে।—ফাসিষ্টবাদের আক্রমণের তীব্রতা কমে নাই বরং চতুর্গুণ বেড়েছে। ফাসিষ্টবাদের শক্তি সঞ্চয় লক্ষ্য করে মিয়ুনিক প্যাক্টের প্রাক্কালে, ষ্টালিন শান্তি ও নিরপেক্ষতা নীতি ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সংগে একজোট হয়ে ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে দাড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দ্বৈতনীতির ফলে সে সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে গেল। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিটলার-ষ্টালিনের রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ

চুক্তি। মতবাদ, আদর্শ ও কর্মপন্থার সম্পূর্ণ বৈপরিত্যেও—চিরবৈরী দুই রাষ্ট্রনেতার সাময়িক মিলন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে উভয়ের মনে কোন সংশয় ছিল না। বর্তমান রুশ-জার্মাণ-যুদ্ধই তার প্রমাণ।

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্তও অনেকে ভেবেছিলেন পৃথিবীর সর্বহারাদের মুক্তি নাকি প্রত্যাসন্ন—যুদ্ধের অবসানের সংগে সংগেই নাকি তারা সমাজতন্ত্রবাদের সুশীতল ছায়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবেন এবং সারা পৃথিবী ব্যাপী নূতন সংস্কৃতি ও সভ্যতার সৌধ রচনা করবেন। ভাবাবেগের আতিশয্যে দু'একজন ষ্টালিনকে ভাবীসমাজতান্ত্রিক বিশ্বরাষ্ট্রের অগ্রদূত বলে সম্বোধনও করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও ফাসিষ্টবাদের কোন্দল বাঁধিয়ে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা তথা নিরপত্তা রক্ষার কৌশলে ষ্টালিনের বাহাদুরী আছে, সন্দেহ নাই। লড়াইয়ের বেকায়দার মুহূর্তে যুযুধানদের শক্তিক্ষয়ের সুযোগে, বিশ্বের সর্বহারা জনগণের চিরশত্রুদের বিরুদ্ধে 'দাঁও বুঝে কোপ মারলে' ষ্টালিন যথার্থই অভিনন্দনের পাত্র হতেন। কিন্তু কূটনীতির আবর্তে ষ্টালিনের কৌশল হয়েছে ব্যর্থ, সুরুতে সম্ভাবনা থাকলেও শেষ রক্ষা হয় নাই—রুষরাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষতাও রইল না—নিরাপত্তাও ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। ফাসিষ্ট ঈগল শ্বেত ভল্লুককে ছোঁ মেরেছে।

এই রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের সংগে শুধু ইয়োরোপ নয় সমগ্র বিশ্বের গণসমাজের ভাগ্য জড়িত। যদি এ যুদ্ধে হিটলারের পরাজয় ঘটে তাহলে ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশে রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় উপস্থিত হবে। কারণ হিটলারের ভাগ্যের সংগে বিজিত রাষ্ট্রগুলির ভাগ্যও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বিশেষ করে এ মহাযুদ্ধের বৈশিষ্টই হল, যে—এযুদ্ধ সর্বগ্রাসী যুদ্ধ বা Total war. জার্মাণ অধ্যুষিত সকল রাষ্ট্রের লোকবল, অর্থবল এবং রাষ্ট্রবল এযুদ্ধের জন্য নিয়োজিত হয়েছে। এ যেন অনেকটা বাজী রেখে পাশাখেলার মত। বিজয়ে হয়ত ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে পারে কিন্তু পরাজয়ে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন সমতা রক্ষা করা হবে অসম্ভব। তাই হিটলারের পরাজয়ে, সুধু জার্মাণী নয় সমগ্র ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর গণতন্ত্রীদের সেদিনই হবে অগ্নিপরীক্ষা। পূর্বাভাষ যা পাওয়া গেছে তাতে উৎসাহিত হবার কারণ নেই। যুদ্ধের গোড়ায় জনবুলের গাফিলতি ও 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার' নীতি, গণতন্ত্রের champion রুজভেল্ট সাহেবের নেপথ্যে মুহূর্মুহূ রণনাদ এবং পরবর্তীকালে রাশিয়াকে সাহায্য করা নিয়ে চার্চিল, ইডেন ও রুজভেল্টের বক্তৃতা নূতন মানসিকতার কোন রেখাপাত করে না। বলশেভিকবাদকে এরা আন্তরিক ঘৃণা করেন—প্রকাশ্যে এই ঘোষণা এত জোর গলায় করা হোয়েছে যে হিটলার এ ঘোষণাকে কাজে লাগাতে ছাড়বে না—হয়তো বা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় কিছুটা সফলকামও হতে পারে। রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, এর কোন পরিণতিই ইংলণ্ডের

পক্ষে শুভ নয়। জয়লাভেও মহাযুদ্ধোত্তর ইংলণ্ড অর্থনীতিতে এমন কি সাম্রাজ্য নীতিতেও [illegible] তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সমরোত্তর ইংলণ্ডে গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট অনিবার্য। এমতাবস্থায় ইংলণ্ডকে planned economy গ্রহণ করতেই হবে। সমাজতন্ত্র গ্রহণ ব্যতীত এই পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করতে হলে, ইংলেণ্ডের ধনিক শ্রেণীর ফাসিষ্টবাদ গ্রহণ ছাড়া উপায়ান্তর থাকবে না, কারণ এতে গণসমাজকে শাসন ও শোষণ করবার ক্ষমতা আংশিক ক্ষুণ্ণ হলেও সমূলে বিলুপ্ত হবে না। অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগে ইংলেণ্ডে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকলেও বৃটিশ লেবার পার্টির রাজনৈতিক ক্লীবত্ব ও কমুনিষ্ট পার্টির ক্ষীণ বল সে সম্ভাবনার ফলাফল সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক করে। যাই হোক না কেন জয়ে বা পরাজয়ে উভয় অবস্থাতেই বৃটিশ সিংহের সামনে কঠিন সমস্যা।

বর্তমানে রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের ফলাফলের সংগে সমগ্র পৃথিবীর গণসমাজের ভাগ্য জড়িত। যে সোভিয়েট রাষ্ট্র নিপীড়িত গণসমাজের মুক্তির স্বপ্নকে রূপ দিয়েছে, এবং যা তাদের আত্মিক প্রেরণা ও উৎসাহের আশ্রয়স্থল, গণসমাজের সেই প্রথম রাষ্ট্র আজ আক্রান্ত। যদি ষ্টালিনের ভাগ্যে পরাজয় থাকে তা' হলে অন্তত সাময়িকভাবে পৃথিবীর সর্বহারাদের মুক্তির সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু চিরদিনের জন্য সর্বহারাদের পরাজয় সম্ভব কি? ফাসিষ্টবাদের অন্তর্নিহিত অসংগতি ও পুঁজিবাদের ক্রমপরিণতির ইতিহাস কিন্তু অন্যরূপ ইংগিত করে।

বাহাদুর সিং

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

ইংরাজ মাত্রেই যেমন রাজা, নেপালী মাত্রেই তেমনি বাহাদুর সিং। কাঁধে ঝুলানো ব্যাগে যা কিছু স্থাবর সম্পত্তি ভরিয়া লইয়া জুতা পায় টুপি মাথায় হাফ্‌প্যান্ট পরিধানে কোমরে কুকরি বাহাদুর সিং ভাগ্যঅন্বেষণে হিমালয় হইতে বাংলার সমতলে অবতরণ করিয়াছিল। চেঙ্গিস, তৈমুর, নাদির ইত্যাদির দিন ছিল না, তাই বাহাদুর সিং তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। এতবড় বাংলাদেশে ভাগ্য তাঁর জন্য কোথায় লুকাইয়া আছে, খুঁজিতে খুঁজিতে বেচারা বাহাদুর সিং আধমরা হইয়া আসিয়াছিল।

গাছে চড়াইয়া দিয়া মই কাড়িয়া লইবার কথাই লোকে বলে, কিন্তু নীচে নামাইয়া আনিয়া উপরে উঠিবার মইটা সরাইয়া লইবার উল্লেখ তো কেহই করে না। যে আশা হাতছানি দিয়া পাহাড় হইতে সমতলে ডাকিয়া আনিয়াছিল, সে আশা বহু আগেই ফেরার হইয়াছে। নিরুদ্দিষ্ট আশার সন্ধানের ধৈর্য বাহাদুরের আর ছিলনা, লোভ বা উৎসাহ তো আগেই মরিয়াছে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে চাহিতেছিল, কিন্তু বাহাদুর সিংয়ের বর্তমানে পকেটে সম্বল মাত্র দুটী দু'আনি আর তিনটী পয়সা।

দেশের রাস্তা পরে খুঁজিলেও চলিবে, আপাততঃ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কিছু খাদ্যের বড় আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বাহাদুর সিং বাজারের মধ্যে এদিক ওদিক সকল দিক ঘুরিয়া দেখিল, একটা দোকানও খোলা পাইল না যে কিনিয়া কিছু খাইবে,—হরতালে সহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। কিন্তু ক্ষুধা কিছুতেই বন্ধ হইতে চাহে না, বরং উত্তরোত্তর তার প্রকোপ বর্ধিতই হইয়া উঠিতেছে। ইন্ধনের অভাবে অগ্নি নির্বাপিত হয়, কিন্তু পেটের আগুন ইন্ধনের অভাবে বাড়িতেই থাকে। বাহাদুর সিংয়ের মনে হইল, খাদ্যের ভাবনা পরে ভাবিলেও চলিবে, এখন অতি আবশ্যক নিদ্রার। একটু ঘুমাইতে না পারিলে সে নির্ঘাৎ মরিয়া যাইবে। ভাগ্য ভালো, ঘুমের জন্য দোকান পাট খোলা থাকার দরকার করে না, টান হইবার মত খানিকটা জমি পাইলেই চলিয়া যাইবে।

বাহাদুর সিং তার শরীরটাকে কোনমতে দুইপায়ে বহন করিয়া রাস্তার পাশে এক দোকানের একটা বেঞ্চির উপরে আনিয়া স্থাপন করিল। ক্ষুধার তীক্ষ্ণতাবোধ নষ্ট হইয়াছে, সমস্ত শরীরটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আফিংএর নেশার মত ক্লান্তি ও নিদ্রা ছাইয়া আসিতেছে, শরীরটাকে বেঞ্চির উপর টান করিয়া শোওয়াইয়া ঘাড়ের নীচে ব্যাগটাকে বালিশ করিয়া লইয়া বাহাদুর সিং

চক্ষু বুজিল। পৃথিবী অন্ধকারে ভরিয়া গেল,—সেই অন্ধকারে এক পাহাড়ী গ্রামের ঝাপ্‌সা ছবি কিছুতেই সে স্পষ্ট করিয়া লইতে পারিতেছিল না, অন্ধকারে রং ও ছবি মুছিয়া মুছিয়া যাইতেছিল, আর ঘুমের কালো জলে মন ডুবিতে ও ভাসিতেছিল। বাহাদুর সিং ক্ষুধা ভুলিয়া, গৃহে ফিরিয়া যাইবার কথা ভুলিয়া এবং নিজেকে ভুলিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

এক সময়ে একটা শব্দ শুনিয়া বাহাদুর সিংয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—Halt, ক্যাপ্টেনের আদেশে একদল স্বদেশী সেনা বাজারের রাস্তার মধ্যে থামিয়া দাঁড়াইল। ভলান্টিয়ারদল আদেশমত দলে দলে বিভক্ত হইয়া বাজারের বিভিন্ন স্থানে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে গিয়া মোতায়েন হইতে লাগিল। বাহাদুর সিং চোখ মেলিল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই শায়িত অবস্থাতেই বাহাদুর সিং মিলিটারী কায়দায় ডান হাতটা কপালে তুলিয়া একটা সেলুট্ ঠুকিয়া বসিল। ছড়ি শুদ্ধ বাঁহাতটা ঈষৎ উঁচু করিয়া ক্যাপ্টেন বাহাদুরের অভিবাদন স্বীকার করিলেন এবং চোখের ইঙ্গিতে কাছে ডাকিলেন।

বাহাদুর উঠিয়া বসিল। 'টুপিটা ঘুমের মধ্যে এক সময়ে গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, তুলিয়া মাথায় পরিল, ব্যাগটা কাঁধে ঝুলাইয়া লইল, তারপর ক্যাপ্টেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুই গোড়ালীর ঠোকাঠুকিতে আওয়াজ বাজাইয়া 'অ্যাটেশন' হইয়া দাঁড়াইয়া আবার ডান হাত কপালে ঠেকাইয়া সেল্যুট করিল।

শায়িত অবস্থায়ই···মিলেটারী কায়দায় ···সেলুট করিল।

—"কি নাম?"

—"বাহাদুর সিং।"

—"বেঁচে আছিস্? ক'দিন খাসনি?"

—"জী?"

"—থাক্, উত্তর দিয়ে কাজ নেই, চেহারাতেই মালুম হচ্ছে। কোথায় চাকুরী করিস?"

—"নকরী মিলছেনা, হুজুর।"

"—তাতো মিলবেই না, চাকুরী কি এত সস্তা জিনিষ বাপু! করবি?"

—"হুজুর" বলিয়া দাঁত বাহির না করিয়াই স্মিতবদনে বাহাদুর সম্মতি জানাইল, চ্যাপ্টা মুখের চোখ নামক বস্তু দুটী প্রায় বুজিয়া আসিয়াছিল, এবং নাসিকা নামক যে বস্তুটী মুখমণ্ডলে সামান্য মালভূমি হইয়া টিকিয়াছিল, হাসির আকর্ষণে প্রায় সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল।

ক্যাপ্টেন বলিলেন—"খুব হয়েছে। নে, বুঝতে পেরেছি যে খুশী হয়েছিস্। ঠ্যায়রো" বলিয়া বিভিন্ন ব্যাচের নায়কদের যথাযথ উপদেশ দিয়া ক্যাপ্টেন বাহাদুরের দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন, বলিলেন—"নে চল্। হেঁটে যেতে পারবি তো?"

বাহাদুর সঙ্গে চলিল।

পরের দিন দেখা গেল স্বরাজ-ক্যাম্পের বাড়ীর গেটে একটা টুল পাতিয়া বাহাদুরসিং উপবিষ্ট হইয়াছে; স্বরাজ-সৈন্যের ঘাঁটির সদর রক্ষার ভার তার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। বাহাদুর একই সঙ্গে দারোয়ান ও ভলান্টিয়ারের কাজ পাইয়া গেল।

প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু এজন্য বাহাদুরকে দায়ী করা উচিৎ হইবে না। তার উপর হুকুম ছিল যে বাহিরের লোক যেন বিনা অনুমতিতে ক্যাম্পে ঢুকিতে না পারে। কে বাহিরের লোক আর কে ভিতরের লোক, সে নূতন লোক, কেমন করিয়া ঠিক করিবে, কারু কপালে তো আর সাইনবোর্ড টাঙ্গানো নাই যে দেখিয়া চিনিয়া নিবে! অতএব, একটু আধটু অসুবিধা হইবে সে তেমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয় যা মার্জনা করা যায় না।

দ্বিতীয় দিন, টুল পাতিয়া বাহাদুর গেটে বসিয়া আছে, রাস্তা দিয়া যতলোক গেল আসিল সবাই তাকে একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। এত লোকের দৃষ্টিতে বাহাদুর মোটেই অপ্রতিভ হইল না বা অস্বাচ্ছন্দ বোধ করিল না। বাহাদুরের চোখমুখের ভাব তার কোমরের কুকরির চাইতে কোন অংশে কম ভয়াবহ ছিল না। কাজেই বাহিরের লোক বাহিরেই থাকিত, আগের মত বিনা প্রয়োজনে ক্যাম্পে ঢুকিয়া পড়িত না।

রোগা লম্বা এক ভদ্রলোক রাস্তা হইতে সোজা ক্যাম্পের গেটে ঢুকিয়া পড়িলেন। বাহাদুরসিং প্রথমটা খেয়াল করে নাই, বেড়ায় ঝুলানো স্লিপ-কাগজ হইতে একখণ্ড কাগজ টানিয়া লইয়া পেনসিল দিয়া কি একটা বস্তু অঙ্কনে বা লিখনে ব্যস্ত ছিল। একটা লোক সম্মুখ দিয়া পার হইয়া ভিতরে প্রায় ঢুকিয়া যাইতেছে মাথা তুলিয়া সে দেখিতে পাইল। কাগজ পেনসিল ফেলিয়া সে তড়াক করিয়া উঠিল, আগাইয়া গিয়া লোকটির জামার গলদেশ ধরিয়া টানিয়া সেখানে ফিরাইয়া আনিল যেখানটায় গেটের প্রবেশদ্বার।

ভদ্রলোক কহিতেছিলেন—"ছোড় দাও, ক্যা করতা হ্যায়?"

বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিল—"ক্যা মাঙ্গতা হ্যায়? ভিতরমে যাতা হ্যায় কাহে?"

—"ভিতরমে যাতা হ্যায় দরকার আছে বলে!"

বাহাদুর বলিল—"স্লিপ দাও। হুকুম মিলে তো ভিতরে যাবে।"

—"স্লিপ? আমাদের স্লিপ লাগে না।"

—"আলবৎ লাগে, লাটসাহেবকে ভি লাগে," বলিয়া বেড়ায় ঝুলানো শ্লিপের একখণ্ড কাগজ টান মারিয়া ছিড়িয়া আনিল, কাগজ পেনসিল ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বাহাদুরসিং হুকুম করিল, নাম লিখিতে হইবে, কি কাম আছে তাহাও লিখিতে হইবে এবং কাহার সঙ্গে মোলাকাৎ মাঙ্গতা তাহাও লিখিতে হইবে।

"ছোড় দাও, ক্যা করতা হ্যায় ?"

আদেশ মত কাগজে নামধাম লিখিয়া ভদ্রলোক বাহাদুরসিংহের হাতে দিলেন। গম্ভীর মুখে বাহাদুর বাঁ হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিল, বাহাদুর তার টুলের বিপরীত দিকে লম্বা বেঞ্চিখানা দেখাইয়া দিয়া কহিল—"ঠারো।"

ভদ্রলোক বসিলেন না, দাঁড়াইয়া ঠারিতে লাগিলেন।

যে ভদ্রলোক টেবিলে বসিয়া অফিসের কাজ করিতেছিলেন, শ্লিপ দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, বাহাদুর ততোধিক নিঃশব্দে পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। শ্লিপহাতে ভদ্রলোক আসিয়া মিলিটারী কায়দায় সেলুট করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। রোগা লম্বা ভদ্রলোক ডান হাতটা উঁচু করিয়া অভিবাদন স্বীকার করিলেন।

—"একে জোটালে কে ?"

—"ক্যাপ্টেন চাটার্জী।"

বাহাদুর ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিল না, গম্ভীর মুখে সামনে আসিয়া এ্যাটেনশন হইয়া দাঁড়াইল এবং মিনিট কয়েক আগে যাঁহার গলদেশ ধারণপূর্বক ব্যাকমার্চ করাইয়া গেটে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, তাঁহাকেই স-সম্ভ্রমে সামরিক কায়দায় সেলুট করিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোক মাথা ঈষৎ নীচু এবং বাঁ হাত ঈষৎ উঁচু করিয়া বাহাদুরের অভিবাদন স্বীকার করিয়া ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন।

বাহাদুর অফিসের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর, ইনি কে ?"

—"অফিসার কমণ্ডিং, বানার্জী সাহেব।"

শুনিয়া বাহাদুরের মনে কোন বৈলক্ষণ্য হইল কিনা বুঝা গেল না; শুধু বলিল যে তার কি দোষ' চিনিতে না পারিলে কি করিবে।

ব্যাপারটা শুনিয়া ভদ্রলোক হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, "বেশ করেছ বাবা, খোদ বড় কর্তাকেই ঘাড় ধরে টেনে এনেছো, তোর তলব বেড়ে যাবে দেখিস।"

সত্যই বাহাদুরের মাহিনা দুই টাকা বাড়িয়া বার টাকা হইল।

এরপরে ছ'মাস পার হইল। বাহাদুর সকলকেই চিনিয়া লইয়াছিল, আর কাহারও ঘাড়ে ধরিয়া টানিয়া আনার প্রয়োজন তার হয় নাই। কিন্তু বাহিরের লোক বাহিরের লোক হইয়াই রহিল, তাদের সম্পর্কে বাহাদুরের মুখের ভয়াবহ ভাব একটুও শিথিল বা মোলায়েম হইল না।

থানার বড় দারোগা সত্যপ্রিয়বাবু ঠিক সত্যিকার দারোগা হইতে পারেন নাই, স্বদেশীরা যদি দেশ স্বাধীন করেই, তাতে তিনি অসুখী হইবেন বলিয়া তিনি মনে করেন না। দেশ স্বাধীন হইলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে এমন গোঁড়া লোকও তিনি ছিলেন না। মোটকথা, তিনি স্বদেশীদের সম্বাদটা খবরটা দিয়া থাকেন যাতে তাঁরা পূর্বাহ্ণেই সতর্ক হইতে পারেন।

রাত্র তখন গোটা নয়েক হইবে, সত্যপ্রিয়বাবু স্বরাজ্য অফিসের গেটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একাই আসিয়াছিলেন, সঙ্গে কোন পুলিশ ছিল না, আর তাঁর নিজেরও ছিল সাদা পোষাক। তবু বাহাদুর বড় দারোগাকে বেশ চিনিতে পারিল। টুল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "ক্যা মাঙ্গতা।"

সত্যপ্রিয় বাবু কহিলেন "সুরেন বাবু আছেন! প্রেসিডেন্ট সুরেনবাবু?"

—"নেই প্রেসিডেন্ট সুরেনবাবু নেই।"

দারোগা পুলিশের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় ইতিমধ্যেই তা রীতিমত বাহাদুরের চরিত্রে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

বড়দারোগা বাবু কংগ্রেসের সেক্রেটারীর নাম করিলেন, "সেক্রেটারী আছেন, প্রতাপবাবু"।

—"বলতা হ্যায়, কোই নেই হ্যায়," বলিয়া বাহাদুর বাদপ্রতিবাদ বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল যে, ভোরে আসিবেন, এখন কাহারও সঙ্গে দেখা হইবে না, কাজেই বৃথা এখানে দাঁড়াইয়া তিনি যেন হল্লা না করেন, ইহাই বাহাদুরের বর্তমান অভিরুচি।

দারোগাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি। দেখনা, কে আছে, ডেকে দে।"

বাহাদুর জবাব দিল না, কানে যে তার কথা গিয়াছে, এমন কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

সত্যপ্রিয় বাবু শান্ত প্রকৃতির মানুষ, সত্যিকার দারোগা হইলে ধমক দিয়াই কাজ আদায় করিতে পারিতেন। শান্ত সুরেই কহিলেন, "তোমাকে একবার থানায় পাই" বাকীটা আর মুখে বলিলেন না, মনেই চাপিয়া রাখিলেন। পাইলে কি করিবেন তার ছবি চোখে ভাসিয়া উঠিল. দাগী

চোরদের লইয়া ছোটবাবুর সেই মার্জার-মূষিক সদৃশ্য ভয়াবহ ক্রীড়াই তিনি বাহাদুর সম্পর্কে পুনরভিনয় হইতেছে দিব্য চোখে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

বাহাদুর সত্যই এত অভদ্র ছিল না, ঐ ছোট দারোগাই তার ক্রোধের হেতু ছিল। সেই রাগটা বাগে পাইয়া বড় দারোগার উপরই সে ঝাড়িয়া লইতেছিল। সেকেণ্ড ক্লাশ হইতে অসহ-যোগ করিয়া ভলন্টিয়ার দলে নাম লিখাইয়াছিল স্থানীয় দুটী ছেলে। ঘোড়ায় চড়া শিখিবার লোভে ও প্রয়োজনে বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া মাঠে যায়, চড়িবার জন্য নয়, ঘোড়া ধরিবার জন্য। খেলার মাঠে থানার সামনেই ছোট দারোগার ঘোড়াটা চড়িয়া বেড়াইতেছিল, বাহাদুর হুকুম পাইয়া সেটাকে ধরিয়া আনে। কোয়ার্টার হইতেই ছোটবাবু অশ্ব-অপহরণ দেখিতে পান, সিপাইদের হুকুম দেন তস্করদের কান ধরিয়া তাঁহার সমুখে আনয়ন করিতে। সিপাইদের আসিতে দেখিয়া ছেলে দুটী চট্‌পট্ সরিয়া পড়ে, বাহাদুর একাকী গিয়া পড়ে সিপাইদের হাতে। সিপাই তিনজন আসিয়া বলে যে, ছোটবাবুর কাছে যাইতে হইবে, তার কান পাকড়াইয়া লইবার হুকুম ছিল বটে, কিন্তু তাহারা ততদূর পর্যন্ত যাইবে না যদি বাহাদুর ভালো মানুষের মত তাদের সঙ্গে যায়।

বাহাদুর কর্ণ-আকর্ষণ করার প্রস্তাবে আরও চটিয়া গেল, ছেলে দুটীর পলায়নে সে আগেই উত্তপ্ত হইয়াছিল, চটিয়া বলিল, "শালা লোককো আনে বল।"

ছোটবাবুকে শালা বলায় সিপাইরা খুশী হইল কিনা জানা গেল না, একজন জবাব দিল, "ও শালা আসবে না তুম শালা চল।"

বাহাদুর বাঘের মত খেপিয়া গেল, বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া লোকটার মুখে থাবার মত একটা ঘুঁসি বসাইয়া দিল। তিনজনের সঙ্গে একা একটা লোকের পারা সম্ভব লইল না, তাছাড়া সঙ্গে কুকরীও ছিল না। বন্দী বাহাদুরকে ছোটবাবুর সমুখে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে মার ধর কিছু হইল না বটে, কিন্তু ছোটবাবু হিন্দি, বাংলা, ইংরেজী তিন ভাষাতে যে সব গালি বর্ষণ করিলেন তাতেই বাহাদুরের রক্ত মাথায় উঠিয়া গিয়াছিল। থানার অতগুলি সিপাই শান্ত্রীদের সমুখে বিশেষ কিছু সে করিতে পারে নাই, শুধু পলাইয়া আসিয়াছে যে শালা ছোটবাবুকে পাইলে সে একদিন ভালো করিয়া দেখিয়া লইবে। ছোটবাবুকে আজ পর্যন্ত সে পায় নাই। বড়বাবুকে পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁকে দিয়া ছোটবাবুর উপরকার আক্রোশ মিটাইয়া তৃপ্তি পাওয়া যাইবেনা, সে বুঝিয়াছিল। ও, আজ যদি সত্যপ্রিয় বাবু না আসিয়া সেই শালা ছোটবাবু—

স্বরাজ্য ক্যাম্পের ভিতর বোধ হয় কংগ্রেস কমিটীর মিটিং শেষ হইয়াছে, অনেকগুলি পায়ের শব্দ গেটের দিকে আসিতেছে শোনা গেল। অনেকের সাথে প্রেসিডেন্ট সুরেনবাবু ও সেক্রেটারী প্রতাপবাবু গল্প করিতে করিতে গেটে আসিলেন, বাহাদুর আগেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রেসিডেণ্ট স্থুরেনবাবু গেটে আসিয়া সত্যবাবুকে দেখিতে পাইলেন,—"সত্যবাবু যে, খবর কি ?"

—"খবর আছে, আচ্ছা লোক গেটে বসিয়েছেন।"

—"চলুন, ভিতরে চলুন,"বলিয়া প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী সত্যবাবুকে সঙ্গে লইয়া আবার স্বরাজ্য অফিসের বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন।

বাহাদুর নির্বিকার বুদ্ধমূর্তির মত আপন টুলেতে আবার আসীন হইয়া রহিল। কিছু যে ঘটিয়াছে, তার মুখ দেখিয়া বুঝিবে এমন প্রজ্ঞাদৃষ্টি এ কলিতে সম্ভব নহে।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই ছোট্ট সহরে উত্তেজনার তুমুল ঢেউ উঠিল। বিনা নোটিশে দোকানপাট বন্ধ হইয়া গেল, স্কুলের ছেলেরা আজ আর স্কুল হইবে না জানিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। প্রেসিডেণ্ট স্থুরেনবাবু ও সেক্রেটারী প্রতাপবাবু, স্বদেশী সেনার কমাণ্ডিং অফিসার ব্যানার্জী, খিলাকৎ কমিটির প্রেসিডেণ্ট খাঁ সাহেব এবং স্বরাজ্য ক্যাম্পের দারোয়ান ও ভলণ্টিয়ার বাহাদুর সিং গ্রেপ্তার হইয়াছে। ছোট্ট ডোবায় যেন বান ঢুকিয়া তুফান ও তরঙ্গ তুলিল—এমনই সহরের অবস্থা। পুলিশ সাহেব স্বয়ং স্থুরেনবাবু ও প্রতাপবাবুকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, ইন্‌স্পেক্টর গ্রেপ্তার করিয়াছেন খাঁ সাহেবকে। সত্যপ্রিয়বাবু নিজে ছিলেন স্বরাজ্য ক্যাম্পে হানা দিবার দলের অধিনায়ক হিসাবে, কিন্তু সঙ্গে ছিলেন ছোট দারোগা মণিবাবু, তাঁর উপস্থিতিতে সত্যপ্রিয়বাবু শুধু দর্শক হিসাবেই যেন আসিলেন এবং গেলেন। সেনাধ্যক্ষ ব্যানার্জীকে এইখানেই গ্রেপ্তার করা হয়। যাইবার সময় ছোটবাবু বাধ্য হইয়া বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া যান।

বাহাদুরের গ্রেপ্তারের খবরটাই সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিল। সহরের সকলেই জানিল যে, বাহাদুরের সঙ্গে ছোট দারোগার কি প্রকার মধুর আলাপ হইয়াছিল। রান্নাঘরে মেয়েরা পর্যন্ত এ লইয়া বেশ খানিকটা হাসি হাসিয়া লইতে পারিয়াছিল। এই উত্তেজক ঘটনার মধ্যে বাহাদুর সিং খানিকটা রস-সঞ্চার করায় সকলের প্রিয় হইল, এমন কি দূর পাহাড়ীদেশের লোকটীর জন্য সহরবাসীরা একটা মমতা ও আত্মীয়তা পর্যন্ত বোধ করিল। ছোট ছেলেদের কাছে বাহাদুরতো একজন 'হিরো' হইয়া দাঁড়াইল।

বানার্জী গ্রেপ্তার হইয়াছেন, সেনানিবাস তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করা হইয়াছে, পুলিশ এত চেষ্টা সত্ত্বেও বোমা বা পিস্তল পায় নাই, তবে প্রকাণ্ড এক বোঝা কাগজ ও বই হস্তগত করিতে পারিয়াছে।

যাইবার সময় ছোট দারোগা বাহাদুরকে বলিলেন, "নে বেটা, তুইও চল্।"

শুনিয়া বাহাদুর খোঁৎ করিয়া উঠিল, "বেটা কাহে বল্‌তা তুম্।"

—"বেশ, বাবাই বলছি। চল বাপ, একবার থানায় চল।"

পিতা সম্বোধনেও বাহাদুর আপত্তি করিল—"এমন জানোয়ারকো পিতা হাম নেই হোতা হ্যায়।"

ছোট দারোগা সত্যপ্রিয় বাবুর মত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন না, অত্যন্ত রাগীমানুষ, কিন্তু সাপের মাথার মণির মত মণিদারোগার মাথার মধ্যে বিধাতা রসিকতা .জিনিষটা খানিকটা দিয়া দিয়াছিলেন। ছোটবাবু চোখ বড় করিয়া আশ্চর্যবোধক চিহ্ন প্রকাশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপ হতেও আপত্তি? কেন, কি দোষ করেছি?"

বাহাদুরের উত্তর বাংলাতে তর্জমা করিলে হয়, "তুমি কি মানুষ, তুমি তো কুত্তা হ্যায়।"

"—কেন?" সরল শিশুর সারল্য লইয়াই যেন ছোটবাবু প্রশ্ন করিলেন। দূরে দাঁড়াইয়া সত্যবাবু, বানার্জী সাহেব ও অপর সকলে মৃদুমৃদু হাসিতেছিলেন।

বাহাদুর কেনর উত্তর দিল,—"তুম গোলাম হ্যায়। নিজের দেশের লোককে সাহেবের হুকুমে ধরে নিয়ে যাচ্ছ, তুম্ বেইমান হ্যায়, তুম···বাচ্চা হ্যায়।"

কুত্তা, বেইমান ইত্যাদি পর্যন্ত ছোটবাবু হজম করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শেষেরটা আর পারিলেন না, কি জাতীয় মাতার পুত্র হইলে এ কাজ পারে—বাহাদুরের গালে এক প্রচণ্ড চড় কষাইয়া বলিলেন—"শালা,···বাচ্চা!"

বাহাদুরের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, কেবল বিদ্যুৎগতিতে খাপ হইতে দক্ষিণ হাতের মুঠার কুকরীটা বাহির হইয়া আসিল। ছোটবাবু ভয়ে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে মারিয়া গেলেন, দুইপা পিছনেও হাটিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকে স্বচক্ষে পলকের জন্য দেখিতে পাইলেন বাহাদুরের চোখের দৃষ্টিতে আর তার হাতের কুকরীতে। সিপাইদের বাধা দিবার সময় ছিল না, ছোটবাবুরও আত্মরক্ষার সামর্থ্য ছিল না, সমস্ত স্নায়ুই তার শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

কুকরীটাও ছোটবাবুর বুকের মাঝখানে বিদ্যুৎবেগে আসিয়া দাঁড়াইল একটা শব্দ, অফিসার কমাণ্ডিংএর গলা—"বাহাদুর টেন্‌শন।"

কুকরীসমেত উদ্যত মুঠি নীচে ফিরিয়া আসিল, বাহাদুর অ্যাটেনশন অবস্থায় পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু পাথরের দুই চোখ যেন অগ্নিউত্তাপে গলিয়া জল টলটল করিয়া উঠিল।"

[বাহাদুর টেন্‌সন]

সিপাইদের চমক ভাঙ্গিল, বীর বিক্রমে বাহাদুরকে কয়েকজনে জাপটাইয়া ধরিল, হাতটা মোচড়াইয়া কুকরীটা কাড়িয়া লইল।

বানার্জী কহিলেন, "আপনার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হয়। ছেড়ে দিতে বলুন, ও শান্তভাবেই সঙ্গে যাবে।"

ছোটবাবুর তেমন ইচ্ছা ছিল না যে, এমন হিংস্রলোককে মুক্ত অবস্থায় সঙ্গে লইয়া চলেন, কিন্তু সত্যপ্রিয় বাবু হুকুম করায় সিপাইরা বাহাদুরকে ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

অহিংসায় বাহাদুর সিং মহাত্মাগান্ধীরই প্রায় সমতুল্য, সহরের লোকেরা আলোচনার কালে সহাস্যে এরকম মতবাদ প্রকাশ করিল। কিন্তু কেহই বুঝিতে চাহিল না যে, কত বড় শক্তিমান মানুষ হইলে নিক্ষিপ্ত বাণ তূণে ফিরাইয়া আনিতে পারে। মহাভারতের অসংখ্য মহাবীরের মধ্যে একমাত্র অর্জুনই তেমন শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, হাজার গুরুজন ও মান্য ব্যক্তিদের অনুরোধে ইচ্ছা থাকিলেও অশ্বত্থমার মত লোকেরও সে শক্তি সম্ভব হয় নাই। বিদ্যুৎবর্ণ ভোজালী বাঁকা বিদ্যুতের মত আবার গিয়া খাপে ঢুকিল। বানার্জী সাহেবের আদেশের মধ্যে সে মন্ত্রশক্তি নিহিত ছিল না, ও শক্তি নিহিত ছিল ঐ বাহাদুরেরই মনের মধ্যে, যে-মন হুকুম পালন করিবে বলিয়া নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।—বাহাদুরসিং সেই যে চুপ করিয়া গেল, ঘণ্টা তিনচারের মধ্যে একটিও কথা বলে নাই। অতৃপ্ত ক্রোধ মাঝপথ হইতেই ফিরাইয়া লইল, এর ধাক্কা মানসিক কাঠামোতে লাগা সম্ভব। হয়তো বা, একটা অভিমানও মনে ছিল বানার্জী সাহেবের উপর যে, কেন তিনি এমন করিয়া দাঁড়াইলেন।

লোকে লোকারণ্য, কোর্টে লোক ধরে না, দরজা জানালা যেখানে যে ফাঁক ছিল বাদুরের মত লোক ঝুলিয়া আছে, বারান্দায় ঠাসাঠাসি করিয়া রহিয়াছে, বাকী বিশাল অংশটা আদালতের প্রাঙ্গণে জনতায় জনসমুদ্র হইয়াছে। বিচার দেখিতে ছোট সহরের সমস্ত লোকই প্রায় আসিয়া হাজির হইয়াছে। অসংখ্য কালো মাথার মধ্যে পুলিশের লাল পাগড়ীগুলি যেন হারাইয়া গিয়াছে এমনই মনে হইল। থাকিয়া থাকিয়া অসংখ্য কণ্ঠে বন্দেমাতরম চীৎকার উঠিতেছিল, আকাশটা মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছিল।—যাদের বিচার চলিতেছিল, তাঁরা এ সহরের আপন লোক, সহরের সুখদুঃখের সঙ্গে রক্তের মতই জড়ানো এঁরা। পরমাত্মীয়ই তাঁরা ছিলেন, তাই সহরের ভালোবাসা-শ্রদ্ধা এমন করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল। তা ছাড়া, বাহাদুরসিংকে একবার দেখিবার লোভও প্রায় সকলেরই ছিল।

বিচারে অধিক সময় লাগিল না।

আসামীর ডকের মধ্যে একটা লম্বা বেঞ্চি দেওয়া হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট সুরেনবাবু, তাঁর পাশে খিলাফৎ কমিটীর খাঁসাহেব, তাঁর পাশে সেক্রেটারী প্রতাপবাবু এবং তাঁর পাশে স্বদেশী-

সেনার সেনাপতি বানার্জী উপবিষ্ট ছিলেন। সকলের মাথাতেই সাদা গান্ধীটুপি। বাহাদুর প্রথমটা দাঁড়াইয়াই ছিল।

বানার্জী নিজের বাঁ পাশে খালি জায়গাটা দেখাইয়া কহিলেন, "বসে পড়"।

বাহাদুর গোলচক্ষু আরও গোল্ল করিয়া চাহিয়া রহিল।

বানার্জী আবার বলিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন, বসে পড়।"

বাহাদুর হুকুম পালন করিল, পাশেই বসিয়া পড়িল।

হাকিম একসময়ে প্রেসিডেন্ট সুরেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কিছু বলবার আছে?"

সুরেনবাবু জানাইলেন যে, না তাঁহার কিছুই বলিবার নাই, তিনি অসহযোগী কংগ্রেসকর্মী, আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন না, বা বিচারেও অংশ গ্রহণ করিবেন না।

খাঁ সাহেব, প্রতাপবাবু ও বানার্জীও তাহাই বলিলেন, কেহই আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন না।

অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলার আছে?"

"আছেই তো"—বলিয়া বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইল। কোর্টের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ও কৌতুক উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

—"কি বলবার আছে বল।"

—"এইসা গর্বমেণ্ট হাম কভি নেই মানতা—।" বাহাদুর ঘোষণা করিল। তার কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে, আসামীর ডকে তার পাশে যাঁরা উপবিষ্ট ছিলেন তাঁরাও বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে খ উঁচু করিয়া বাহাদুরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

নাটকের নায়কের প্রাপ্য সমস্ত মনোযোগ একপলকে বাহাদুরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং দম বন্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।
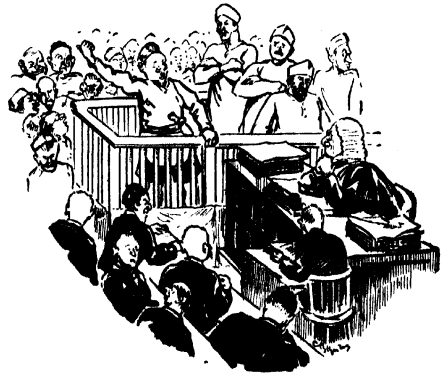
হাকিম 'হুঁ' বলিয়া একটা গরম আওয়াজ নাসিকাপথে মুক্ত করিলেন, মোটা চশমার আড়ালে দৃষ্টিকে যথাসম্ভব গুরু ও গম্ভীর করিয়া অক্ষিগোলক দুটীকে অপাঙ্গে আনিয়া লইলেন এবং তারপর কিছুক্ষণ চোখের সেই ফ্রন্টিয়ার হইতে ভীষণভাবে বাহাদুরের দিকে পলকহীন তাকাইয়া রহিলেন। লোকটার ব্যাবহারে ও কথায় এতগুলি লোকের সামনে হাকিম তাঁর এজলাস শুদ্ধ

একেবারে তুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই লুপ্ত মর্যাদা ও শক্তি যেন চোখের দৃষ্টিতেই তিনি পরস্বাপহারী চোরের নিকট উদ্ধার করিয়া লইবেন। কিন্তু চোখের দৃষ্টি ডকে দাঁড়ানো বুদ্ধমূর্তির মুখে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিল, বাহাদুরের গোলাকার চ্যাপটা মুখে কোন কুঞ্চন বা প্রসারণই দেখা গেল না।

হাকিম বলিলেন, "গর্বমেণ্ট নেই মানতা, হুঁ, কেন?"

বাহাদুর জবাব দিল—"এ শয়তানী গবর্মেণ্ট আছে। হাম স্বরাজ গবর্মেণ্ট মাঙ্গতা হ্যায়।"

বলার ঢংটী এমন চাপা ও চিবানো যে, শুনিলে মনে হইতে পারিত যে, স্বরাজ গবর্মেণ্ট যেন চিংড়িমাছের মুড়ো, পাইলে কি করিবে তাহা বাহাদুরের ভঙ্গীতে প্রকট হইল।

হাকিম যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করিলেন, সামান্য একটা অশিক্ষিত লোককে এতখানি গ্রাহ্য করার ভুল বুঝিতে পারিলেন। একটু হাসিয়া প্রেসিডেণ্ট সুরেনবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তালিম তো ঠিক দিয়েছেন দেখছি, জ্যান্ত সিদিশন।"

সুরেনবাবু জবাব দিবার আগে সরকারী উকীল মহিমবাবু জবাব দিলেন, জ্যান্ত সিদিশন কি বলছেন, ইউর অনার, জ্যান্ত জন্তু বল্লেই চলে, স্বাধীন দেশের জংলীলোক কিনা।"

মহিমবাবু ছিলেন সুরেনবাবুর আবাল্যবন্ধু সতীর্থ। বন্ধুত্বটা নিঃশেষ হয় নাই, তাই বন্ধুর হইয়া জবাব দিলেন। হাকিম অতি কষ্টে এই চোর-কিল হজম করিলেন। কিন্তু আক্রোশটা পড়িল বাহাদুরের উপর। হাকিমের ইচ্ছা ছিল, নির্দেশও ছিল, যে বাহাদুরকে বেশ ভালো করিয়া ধমকাইয়া ও শাসাইয়া ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু ইচ্ছাটা রায়ের সময় অন্যরূপ হইয়া গেল। বাহাদুরের ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

বাহাদুর বুদ্ধমূর্তির মত বিকারশূন্য হইয়া দণ্ডাদেশ শুনিয়া গেল, যেন এসবের সঙ্গে তার নিজের কোনই যোগ নাই!

বিরাট জনতা বন্দেমাতরম্ শব্দে আকাশ বাতাস ও মাটি কাঁপাইয়া পাঁচজনকে জেল গেট অবধি পৌছাইয়া দিল। বাহারেরর খাটো গলাও ফুলের মালায় ভরিয়া গিয়া তার নিস্কন্ধ বানাইয়া দিল। বাহাদুর প্রথম একটু লজ্জা পাইয়াছিল, কিন্তু সে সামান্যক্ষণের জন্য, হাসি, আনন্দ ও গর্বে তার ছোট চোখ দুটী পর্যন্ত উজ্জ্বল ও মনোরম হইবার উপক্রম হইল।

জেলগেটে আসিয়া বাহাদুর জনতার দিকে মুখ ফিরাইয়া হাত উঁচু করিয়া হাক দিল—বন্দেমাতরম।

জনতা তুফানের চাবুক খাওয়া সমুদ্রের মত গর্জন করিয়া উঠিল—"বন্দেমাতরম্।"

জেল অফিসে বাহাদুরকে লইয়া একটু হাঙ্গামা, হাঙ্গামা ঠিক নয়, ফ্যাসাদ করিয়াছিল। ফ্যাসাদটা বানার্জীই কাটাইয়া দেন।

সুরেনবাবু, প্রতাপবাবু ও খাঁ সাহেবকে জেলের ভিতরে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল জেলারের অনুরোধ সত্বেও বানার্জী ভিতরে যান নাই, বাহাদুরের সঙ্গেই একত্র গিয়া ভিত ঢুকিবেন, তাই অপেক্ষা করিতেছিলেন। জেলারও অনুমতি লইয়া কোয়ার্টারে ফিরিয়া গিয়াছেন অফিস ঘরে কয়েকজন ওয়ার্ডার ও জমাদার উপস্থিত ছিল। আর ছিল নায়েব জেলার। লোকটী বৃদ্ধি শুধু ঊর্ধের দিকেই ছিল, গায়ে মাংস নাই বলিলেই চলে, জ্যামিতির সরল রেখার মানবী সংস্করণ যেন। নায়েবের নাকটী খাড়ার মত, তা দুপাশে চোখ দুটী আবার ট্যারা। চেয়ারে উপর দুই পা তুলিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া মস্ত ব একটা খাতা টেবিলের উপর খুলিয়া বসিয়াছিল।

…জ্যামিতির সরলরেখার মানবীয় সংস্করণ যেন

কান হইতে বিড়িটা নামাইয়া তাহাতে অ সংযোগ করিলেন, এক মুখ ধুঁয়া ছাড়িয়া বাহাদুর দেখিবার জন্য বানার্জী সাহেবের দিকে চাহিলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নাম কি ?"

বানার্জী রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কা জিজ্ঞেস করছেন ?"

দৃষ্টি এবার বানার্জী সাহেবের উপর হইতে উঠিয়া বাহাদুরের উপর গিয়া বসিল, না কহিলেন,—"না না, আপনাকে নয়; ওকে জিজ্ঞেস করছি, ঐ নেপালিকে। খাতায় সব লি নিতে হবে কিনা।"

বানার্জী নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন, ট্যারাচোখে একদিকে চাহিয়া অন্যদিক দেখি হয় এ তাঁর খেয়াল ছিল না, কহিলেন,—"ও—" বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

নায়েব বলিলেন—"এই, নাম কি ?"

বাহাদুর জবাব দেয় না দেখিয়া কহিলেন—"আরে উত্তর দেয় না যে। কানে শে তো !" বলিয়া নায়েব বাহাদুরের উপর দৃষ্টি লইয়া বানার্জীকে দেখিলেন। বানার্জী ভালো কোন উচ্চ-বাচ্য করিলেন না।

জমাদার বাহাদুরকে ঠেলা দিয়া কহিল—"এই, বাবু নাম জিজ্ঞাসা করছেন, নাম বল বাহাদুর নায়েব জেলারকে নাম বলিল—"বাহাদুর সিং।"

নায়েব জেলার লোকটী নাকি উচ্চবংশের লোক, কিন্তু সেই নীল রক্তের কোন ছ তাঁর দেহে বা মনে ছিল না। যেটুকু বা ছিল তা বিড়ি-গাজা ও শস্তা মদ খাইয়া দে

করিয়াছিলেন। এই কুড়ি বৎসর যাবত জেলের অফিসে বসিয়া প্রত্যহ দুইবেলা চোরডাকাত ইত্যাদির নাম-ধাম পরিচয় খাতায় লিখিয়া আসিতেছেন, এরপরেও শরীরে বা স্বভাবে নীল রক্তের সন্ধান চাওয়া অন্যায়। নায়েব লিখিতে লিখিতে আপন মনেই বলিলেন—"বাহাদুর সিং, কি দেশ বাবা, সব ব্যাটাই এক নামে কাজ চালায়,—নামের বাজে খরচ আছে, এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।" খাতা হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপের নাম কি?"

বাহাদুর অপমান বোধ করিল, যেন বাপ তুলিয়াছে, কটু কণ্ঠে কহিল—"কেন, বাপের নাম দিয়ে কি কাম?"

—"আরে ম'লো, ফোঁস করে যে। খাতায় লিখতে হবেনা? বল, বাপের নাম কি বল—"

—"কেন, বাপের নাম কেন বলতে যাব? আমার নাম দিয়েছি, আর কি চাই—"

—"তাতো দিয়েছিস, কিন্তু বাপের নামও যে দরকার—" বলিয়া নায়েব ট্যারা চোখ ব্যানার্জীর উপর পাতিয়া বাহাদুরকে দৃষ্টিতে অনুরোধ জানাইল যে, খামোকা কেন দেরী করিতেছে।

—"না, কোন দরকার নাই। আমার জেল হয়েছে, আমার নাম বলতে আমি রাজি আছি। পিতার নাম কেন বলব। তিনি তো কোন কসুর করেন নাই।"

—"আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি—আরে কসুরের কোন কথাই হচ্ছে না। নিয়ম আছে, বাপের নাম, গ্রামের নাম এসব লিখতে হয়। ধর তুই যদি মরে যাস, তবে খবর দিতে হবে না! নাম ঠিকানা না জানা থাকলে কেমন করে তোর ঘরে খবর যাবে শুনি?"

—"সে আমি জানি না। পিতার নাম আমি কিছুতেই বলব না।" বলিয়া বাহাদুর মৌন অবলম্বন করিল। সিপাইরা বুঝাইল, জমাদার বুঝাইল, নায়েব ও আবার বুঝাইলেন যে, এতে ভয়ের বা দোষের কিছু নাই,—কিন্তু বাহাদুর কিছুতেই মৌন ভঙ্গ করিল না। দোষ সে করিয়াছে, তার বিষয়ে খাতায় লেখা হউক, এর মধ্যে পিতার কথা কেন আসিবে সে কিছুতেই বুঝিতে চাহিতেছিল না। পুত্র হইয়া পিতার নাম বলিয়া দিবে এমন কুপুত্র সে নয়।

নায়েব জেলার পোড়া বিড়িটায় নিরর্থক কয়েকটা টান দিয়া ব্যানার্জী সাহেবকে দেখিবার জন্য বাহাদুরের উপর ট্যারা চোখ পাতিলেন এবং কাতর ভাবে বলিলেন—"স্যার আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন না।"

ব্যানার্জী কহিলেন—"বাহাদুর, এতে কোন দোষ নেই, তোমার বাবার নাম বল।" হুকুম অমান্য সে করিতে পারে না, কিন্তু ব্যানার্জীর হুকুম পালন করার শক্তি তার ছিল না, প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বাহাদুর বলিল—"পিতার নাম হামি জানে না ভুলে গেছি, মনে নাই।"

নায়েব জেলার জমাদার সিপাই সকলের মুখ হাঁ হইয়া গেল এবং সেই হাঁ করা মুখেই হাসি ফাটিয়া পড়িল।

ব্যানার্জী নায়েবকে বলিলেন—"লিখে নিন ঈশ্বর সিং।"

নায়েব বলিলেন—"কি আর করি, তাই লিখি। ঈশ্বরতো ইউনিভার্সাল বাবা, বেটাদের বাইবেলেও নাকি তাই আছে।"

ঈশ্বরকে দিয়া ঠেকা কাজ চালাইয়া লওয়া হইল, বাহাদুরের পিতার নাম খাতায় লেখা হইল। বাহাদুরও বিপদ মুক্ত হইল।

জেলে সপ্তাহখানেক বেশ কাটিল। বাহাদুর জেলটাকে খেলাঘর বানাইয়া ফেলিল। ঢেঁকিতে তাকে জুতিয়া দেওয়া হইল ধান ভানিতে। যে পায়ে এতকাল সে পাহাড় চষিয়াছে, সেই পায়ের জোরেই ঢেঁকিটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দু-দুটা ঢেঁকির অপমৃত্যু ঘটায় তাহাকে ঢেঁকিশালা হইতে সরাইয়া যাঁতাঘরে কাজ দেওয়া হইল, যাঁতারও সে দুর্গতি করিয়া ছাড়িল। কাজেই এখানেও তাকে নিরাপদে রাখা গেল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জমাদার তাকে জেলের বাগানে কাজ দিল, এবার রৌদ্রে বসিয়া বাহাদুর আর যাই ভাঙ্গুক মাঠটা যে ভাঙ্গিতে পারিবে না, সকলেই এ বিষয়ে একমত হইয়া গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রামান্তে বাগানে আর একবার কাজ করিতে যাইবার নিয়ম। বাহাদুর চৌকায় গিয়া হাজির হইল, এক খামচা লবণ কাগজে মুড়িয়া জেল-ভাঙ্গিয়া ট্যাঁকে গুজিয়া লইল। কফির বাগানে পোকা ও পাকা পাতা বাছিবার কাজ তাকে দেওয়া হইয়াছিল। ফুলকফি তখন সবেমাত্র গুটি ধরিয়াছে, বাহাদুর লবণ সংযোগে সেগুলিকে মুখে ফেলিয়া পরম তৃপ্তির সহিত খাইয়া চলিল। ওয়ার্ডারের দৃষ্টি এড়ানো গেল না, দৌড়াইয়া আসিয়া ধমক দিল—"সব খা লেতা হ্যায়—এ্যাঁ তাজ্জব কাণ্ড।" ঝুকিয়া পড়িয়া দেখিল প্রায় একসারি ফুলকফির গুটিফুল ইতিমধ্যেই ছেঁড়া হইয়া গিয়াছে। রিপোর্ট গেল, শেষটা ঠিক হইল বাহাদুরকে জলের পাম্পে দেওয়া হইবে। জমাদারের ইচ্ছা ছিল যে, বাহাদুরকে ঘানিঘরে দিয়া একটু শায়েস্তা করিয়া লয়। কিন্তু জেলার স্বদেশীদের সামনে এতটা যাইতে সাহস পাইলেন না। সেখানেও গণ্ডগোল করায় বাহাদুর অবশেষে কাজ হইতে ছুটি পাইল, তাকে নাম মাত্র কাজ দেওয়া হইল।

দুই সপ্তাহও যায় নাই, বাহাদুর যেন কেমন হইয়া গেল। মনের সে ফুর্তি, সে উৎসাহ তার আর ছিল না, মনমরা হইয়া থাকিত। বাহাদুর দিনে দিনে শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। কথা-বার্তাও সে কম বলিতে আরম্ভ করিল, প্রায় সময়ই চুপ করিয়া কি ভাবিত।

অন্যান্য স্বদেশীরা উৎসাহ দিয়া তাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে ম্লান ছাপ মুখ হইতে কিছুতেই মুছিল না, দিন দিন বরং আরও কালো হইয়া উঠিল।

ব্যানার্জী একদিন একা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে তোর কি হয়েছে! এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন?"

বাহাদুর কোন কারণই বলিতে পারিল না, কেবল ম্লান হাসি হাসিল। ব্যানার্জী বুঝিলেন যে, জেল এতদিনে বাহাদুরের উপর জয়লাভ করিয়াছে, তার আনন্দ নিবাইয়া দিয়াছে।

একদিন সম্বাদ পাওয়া গেল যে, বাহাদুরের ভয়ানক অসুখ, জেল হাসপাতালে তাকে সরানো হইয়াছে। স্বদেশীবাবুরা তাকে দেখিয়া আসিল, রিপোর্ট দিল যে, না তেমন মারাত্মক কিছু হয় নাই, আমাশয়ে সে আক্রান্ত হইয়াছে, দুএকদিনের মধ্যেই ভালো হইয়া যাইবে।

বাহাদুর তা বিশ্বাস করে নাই, ছলছল চোখে নাকি প্রেসিডেন্ট সুরেনবাবুকে বলিয়াছিল—"হুজুর আমি আর বাঁচব না।"

সুরেনবাবু আশ্বাস দিয়াছিলেন "ভয় কি, ভালো হয়ে যাবি। তোর কি হয়েছে? এ সামান্য পেটের অসুখ, দুদিনেই সেরে যাবে।"

বাহাদুর শুধু বলিল, "হুজুর ব্যানার্জী সাহেবকে একবার আসতে বলবেন, তাঁকে বড় দেখতে ইচ্ছা করছে।"

এরপরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত।

ব্যানার্জী বিকালের দিকে বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলেন। পরদিন ভোরবেলা বাহাদুরকে আর জেলে দেখিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু খবরটা গোপন রহিল না, সকলেই জানিল ব্যানার্জী সাহেব হুকুম করিয়াছেন, তাই বাহাদুর 'বণ্ড' দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্যানার্জী সমালোচনায় কান দিলেন না,—খাঁচার দরজা খুলিয়া দিয়াছেন, বাঘ বনে ফিরিয়া চলিয়াছে—এই ছবিই তিনি দেখিতেছিলেন।

—

বর্ত্তমান যুদ্ধের গোড়ার কথা

দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান যুদ্ধকে বুঝিতে হইলে বিভিন্ন দেশের সমরপ্রস্তুতির গোড়ার কথা কিছু জা দরকার। যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে ইউরোপের রাজনৈতিক গগনে যে প্রবল ঝড় উঠে তাহার মূ ছিল নূতন সামরিক শক্তির আবির্ভাব। জাতীয়-সমাজতন্ত্রী জার্মাণী এবং সাম্যবাদী সোভি য়ুনিয়ন সম্পূর্ণ নূতন ধরণে সমরসজ্জা করে, সমরায়োজনে প্রাচীনপন্থী গ্রেট বৃটেন এবং ফ্র হইতে তাহা একেবারেই পৃথক। প্রয়োজনকালে অনতিবিলম্বে যাহাতে দেশের সমস্ত শক্তি সাম ও সম্পদরাশি সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত করা চলে, জার্মাণী ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন পূর্বা তেমন ব্যবস্থা করিয়া রাখে এবং উভয় দেশই রণনীতিকে আক্রমণাত্মক করিয়া তোলে। পক্ষান্ত গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স সেই প্রাচীন আত্মরক্ষাত্মক রণনীতিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে ফলে ভার্সাই সন্ধিতে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স সামরিক বলে যে প্রধান্য লাভ করিয়াছিল, ১৯৩০ হই ১৯৩৫ সালের মধ্যে তাহা লোপ পায় এবং পশ্চিম ইউরোপের সামরিক প্রাধান্য মধ্য ও ইউরোপের আশ্রয় লয়।

নাৎসী জার্মাণী ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন—এই দুই নূতন সামরিক শক্তির রাজনৈ উদ্দেশ্য পৃথক, কাজেই তাহাদের সমরায়োজনের লক্ষ্যও স্বতন্ত্র। অস্ত্র বাড়াইলেই পররাজ্য করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আক্রমণাত্মক সমর প্রস্তুতি আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পররাজ্য আক্রমণ এক কথা নয়। সামরিকক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক নীতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহ আত্মরক্ষাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের অস্ত্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্য ত রাজনৈতিক লক্ষ্যকে বাঁচাইয়া রাখা, জাতীয়-সমাজতন্ত্রী জার্মাণীর মত পররাজ্যমুখী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করিলেই তাহার প্রমাণ মিলে। ১৯২০ সালে পোলাণ্ড সোভি য়ুনিয়নকে আক্রমণ করিয়াছিল। ১৯৩১ সাল হইতে জাপান এবং ১৯৩৩ সাল হইতে জার্মাণী স তাহাকে আক্রমণের ভয় দেখাইয়াছে। কাজেই ইহাদের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার তাহার অস্ত্রবৃদ্ধি না করিয়া উপায় ছিল না।

নূতন সামরিক শক্তি জার্মাণী ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের তিনটি ব্যাপারে প্রাচীন সা শক্তি গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা আছে।

প্রথমতঃ তাহাদের প্রাকৃতিক ও সামগ্রিক সম্পদ বেশী, ইউরোপে সব চেয়ে বেশী লে বাস ঐ দুই দেশে এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই শৈল্পিক সামর্থ যথেষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ সমর সম্ভার নির্মাণে তাহারা যথেষ্ট সময় থাকিতে মন দেয় এবং তাহাদের অস্ত্রগুলি অতি আধুনিক ও উৎকৃষ্ট—একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা বুঝা যাইবে। এই যুদ্ধেও ফ্রান্সের গোলন্দাজ বাহিনীতে উনবিংশ শতাব্দীর কতকগুলি কামান ছিল; পক্ষান্তরে ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে জার্মাণী ও সোভিয়েট যুনিয়ন তাহাদের সমস্ত সেনাদলে অতি আধুনিক কামান সমূহের প্রবর্তন করে। সেনাদল গঠনে যান্ত্রিক উৎকর্ষের কোনটীকেই তাহারা বাদ দেয় না।

তৃতীয়তঃ জার্মাণী ও সোভিয়েট যুনিয়ন—এই দুই দেশেই ডিক্টেটরী ব্যবস্থা থাকায় (অবশ্য আদর্শ পৃথক) বৈপ্লবিক পন্থায় সেনাগঠনে সুবিধা হইয়াছে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্পসম্পদকে তাহারা যেমন পূর্বাহ্নেই সমরার্থক করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, তথাকথিত গণতান্ত্রিক পুঁজিপন্থী গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স তেমন পারে নাই। শিল্পকে সমরার্থক করার জন্য যুদ্ধ বাধিবার পর সমস্ত কলকারখানা বৃটিশ সরকারকে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে নিতে হয়। কিন্তু জার্মাণী ও সোভিয়েট যুনিয়ন এই ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছিল, কাজেই প্রয়োজন হওয়া মাত্রই তাহারা দেশের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ যুদ্ধে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছে। এই কারণেই তাহাদের সামরিক সামর্থ অধিক।

সামরিক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নাৎসী জার্মাণী ও সাম্যবাদী সোভিয়েট যুনিয়নের স্থান যে শীর্ষে তাহা অবিসংবাদিত সত্য, কারণ অর্থনৈতিক শক্তিসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে এই দুইদেশই কেবল সমরসামর্থ বাড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। আবার এই দুই দেশের মধ্যে বোধ হয় সোভিয়েটের স্থান আরও উচ্চে, কেন না জার্মাণীর তুলনায় তাহার কাঁচা মাল ও জনবল বেশী।

এই গেল প্রথম শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ে পরে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স। এই দুই দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি খুবই দৃঢ় এবং সাম্রাজ্য ধরিলে তাহাদের জনবলও যথেষ্ট, কিন্তু সেই তুলনায় তাহাদের সমরপ্রস্তুতি অন্ততঃ এই যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। সুসংগঠিত শিল্প, সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং প্রচুর জনবল থাকিতেও সেইগুলিকেই সমরার্থক না করায় এই দুই দেশ সামরিক শক্তিতে জার্মাণী এবং সোভিয়েট রুশিয়ার পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

সামরিক ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যায় ইতালী ও জাপানকে। এই উভয় দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল কিন্তু সমরায়োজন করিয়াছে আকণ্ঠ। ইহাদের অবস্থা গ্রেটবৃটেনও ফ্রান্সের অবস্থার ঠিক বিপরীত। শিল্পক্ষেত্রে ইতালী একেবারেই দুর্বল এবং কাঁচামালের অভাব উভয় দেশেই আছে। অস্ত্রসজ্জার আড়ম্বর থাকিলেও অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য এই দুই দেশের সমরসামর্থ কম। অতএব অর্থনৈতিক শক্তিসম্পন্ন সোভিয়েট যুনিয়ন, জার্মাণী, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স * ইহাদের কাহারও সঙ্গে ইতালী বা জাপানের দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইবার সামর্থ নাই।

---

* এখানে ফ্রান্সের পরাজয়ের পূর্বের অবস্থাই ধরিয়া লইতে হইবে।

ইউরোপে সামরিক শক্তির দিক দিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ফেলা যায় পোলাণ্ড, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াকে। শিল্পক্ষেত্রে ইহারা নিতান্তই অনগ্রসর—সৈন্যবল মাঝারি, অস্ত্রশস্ত্র নিতান্তই কম। কাজেই দলে ভিড়াইবার জন্য ইহাদিগকে লইয়া প্রবল রাষ্ট্রসমূহ যথেষ্টই টানা-হেঁছড়া করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পোলাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার সামরিকবল জার্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে এবং রুমানিয়া জার্মাণীর দলে ভিড়িয়াছে।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের সামরিক বল উল্লেখযাগ্য নহে। এই মানদণ্ডের সাহায্যে বর্তমান যুদ্ধকে বুঝিতে অনেকখানি সুবিধা। পটভূমি জানা থাকিলে ঘটনাপ্রবাহ সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়,—নচেৎ ঘটনার উত্তেজনা মানুষের নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধিকে অনেক সময়ই বিভ্রান্ত করে।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ

কাজী মোতাহার হোসেন,

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বর্তমানে বড় গুরুতর ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। বিশ, ত্রিশ বৎসর আগেও শুনেছি, রাজনৈতিক নেতারা বক্তৃতা মঞ্চে উঠে বলেছেন, "আমরা হিন্দু-মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই—একই মায়ের দুটি সন্তান, একই রথের দুটি চক্র, একই দেহের দুটি বাহু ইত্যাদি।" কিন্তু আজকাল তাদের বক্তৃতার ধারা যেন অন্য পথে চলেছে। এখন প্রায়ই শুনা যায়, "আমাদেরও দৃষ্টি পৃথক, মিলন প্রচেষ্টা বিফল, একে অন্যের সহায়তার ব্যতিরিকেই বা বিরোধিতা সত্বেও স্বদেশের উন্নতি-সাধন সম্ভব, এমনকি শাসন ব্যাপারে পরস্পারের প্রভাবাধীন অঞ্চল বিভাগ ক'রে নেওয়াই একমাত্র পন্থা।"

এই সময়ের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটেছে যার জন্য মনোভাবের এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে—তা' বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে দেখবার মত। সহজেই চোখে পড়ে, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে যে স্বদেশী আন্দোলন হয় তাতে হিন্দু যোগ দিয়েছিল, মুসলমান যোগ দেয়নি বললেও চলে। প্রতিবেশী হিন্দুর আহ্বান মুসলমান কর্তৃক কেন উপেক্ষিত হ'ল—এ বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার ভাবার্থ এই যে অবজ্ঞাত দুর্বল পক্ষ প্রবল পক্ষের গরজের ডাকে প্রাণ খুলে সাড়া দিতে পারে না। বিদ্যাবুদ্ধি ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় হিন্দু দীন-দরিদ্র মুসলমান দিগকে এবং ঐ অবস্থার হিন্দুকেও কোনোদিন হয়ত প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। তাই অকস্মাৎ উন্নতদের ডাকে অনুন্নতেরা প্রাণ খুলে সাড়া দিতে পারে না। তাদের মনে ছিল কতকটা সন্দেহ, কতকটা অস্পষ্ট উপলব্ধি-জনিত দ্বিধা। হুজুগের জোরে কাজ কিছুটা অগ্রসর হ'তে পারে কিন্তু অধিক দূর নয়। এজন্য প্রথম স্বদেশী আন্দোলন প্রধানতঃ শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে এবং তাদের দেখাদেখি, হুজুগ ক্রমে, হিন্দু জন-সাধারণের মধ্যেও কিছু প্রসার লাভ ক'রেছিল। মুসলমান যে উক্ত আন্দোলনে যোগ দেয় নি, তার থেকেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ঐ সময়ে তাদের স্বাতন্ত্র-বোধ পূরামাত্রায় না হোক, কিছু কিছু জাগ্রত হয়েছিল—অন্ততঃ তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশ খানিকটা স্বাতন্ত্র-বোধ জন্মেছিল। ঐ সময়ে বর্তমান ধরণের দাঙ্গা হাঙ্গামা কম হ'ত; কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে বিক্ষুব্ধ মনোভাবের অস্বিত্ব ছিল না, একথা জোর ক'রে বলা যায় না। তখনও কোরবাণী নিয়ে দুই একটা দাঙ্গা হাঙ্গামার বিবরণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে শোনা যেত, কিন্তু বাংলাদেশে তেমন ছিল না। প্রতাপশালী হিন্দু জমিদারের মাটিতে মুসলমান প্রজা কোরবাণী করতে সাহস করত না—এখনও অনেক স্থানে করে না—কিন্তু তাই বলে তারা যে নিজেদেরকে অধিকারচ্যুত

মনে করত, এরূপ প্রমাণিত হয় না। আজকাল একটা ধূয়া উঠেছে, বিচার-আচার, যুক্তি-তর্ক কি নয়, যার যার বর্তমান অধিকার বজায় রাখতে হবে—অর্থাৎ ন্যায়ভাবেই হোক আর অন্যায়ভাবে হোক, যে একটি সুযোগ পেয়ে বসেছে, সে কিছুতেই তা' ছাড়বেনা। আর যাকে একবা অসুবিধায় ফেলা গেছে, সে যেন চিরকাল ঐ ভাবেই নিষ্পেষিত হ'তে থাকে। এই প্রকা মনোবৃত্তির ফলে স্বাধীন জাতিদের মধ্যে বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হ'তে পারে, আর পরাধীন নির্বী জাতির মধ্যে স্বার্থগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধা কিছু আশ্চর্য নয়।

দেখা গেছে, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত পার্থক্য,—তা' সে আর্থিকই হোব শিক্ষা সংক্রান্তই হোক, বা বিচার নৈতিকই হোক,—বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। রাজা রামমোহনে আমলেও যে মুসলমান শিক্ষা-সম্পদ, রুচি-সভ্যতা এবং কর্মদক্ষতায় হিন্দুর চেয়ে নিকৃষ্ট ত নয় বরং উৎকৃষ্টই ছিল, অল্পকালের মধ্যেই সে হিন্দুর চেয়ে সর্বাংশে নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এর কার কতকটা ইংরাজ শাসনে জমিদারী বন্দোবস্ত, নিষ্কর বাজেয়াপ্ত, এবং ঐ কালের মুসলমানদের ওহাবী বিদ্রোহ, ইংরাজ-বিদ্বেষ এবং গতানুগতিকপ্রিয়তা। কিন্তু মুসলমানের সহিত শাসক জাতি অসৌহার্দই বোধ হয় এই অবনতির প্রধান কারণ। এজন্য মুখ্যতঃ হিন্দুকে দায়ী করা যায় না কিন্তু তবু মুসলমানের নিষ্ফল আক্রোশ সুবিধাভোগী হিন্দুর উপরেই গিয়ে পড়ল। যে কারণে অফিস ফেরতা বড়বাবু সাহেবের চোখ্ রাঙানী কিম্বা বিশিষ্ট সম্বোধন হজম ক'রে স্বগৃহে আপ পরিজন-বর্গের উপর ঝালঝাড়তে প্রবৃত্ত হয়, এ যেন কতকটা সেই ধরণের। হিন্দুও যে কোনোদি মুসলমানের প্রতি স্নিগ্ধ গদগদ ভাব পোষণ করতে পেরেছে বা আজও করছে, তেমন নয়। প্রতিদি সহরের কশাই খানায় কত গরু সামরিক ও বেসামরিক লোকের আহার্যে পরিণত হচ্ছে, তা বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় না' কিন্তু কোরবাণীর সময় গো-রক্ষিণী বৃত্তির বিশেষ প্রকাশ হয়। পক্ষান্তরে গোরাপল্টন ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে মসজিদের পাশ দিয়ে মার্চ ক'রে গেলে, কিম্বা মহরমের সম মুসলমান ঢাকঢোল পিটিয়ে মসজিদের সামনে দিয়ে গেলে কারও নামাজের ব্যাঘাত হয় না, অথ সংকীর্তন বা দোল-দশহরা প্রভৃতি হিন্দু উৎসব উপলক্ষে কাঁসর, সানাই বাজলেই নামাজে মনোযোগ রক্ষা করা অসাধ্য হ'য়ে পড়ে। এর থেকেই বোঝা যায়, এ সবের ভিতরে যতটা প্রপাগাণ্ডা ব জিদ আছে, ততটা আন্তরিকতা নিশ্চয়ই নাই।

দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বা অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেখা যায় মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান চাকুরীজীবি বা উকিল মোক্তার বা স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের সংখ্যা অনুপাতে দেখলে বলা যায়, প্রায় সমভাবেই যোগ দিয়েছিল। এতদিনে মুসলমানের ভিতর কিছু রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হ'য়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এই সময়ই সর্বপ্রথম বন্দেমাতরম ও আল্লাহো-আকবর একসঙ্গে ধ্বনিত হয়। মনে হ'য়েছিল হিন্দু-মুসলমান যেন

অনেকটা একীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অসহযোগের সঙ্গে খেলাফত আন্দোলনের সংযোগই বোধ হয় এদের সাময়িক ঐক্যের প্রধান কারণ হ'য়েছিল। এই জন্য, খেলাফত আন্দোলনরূপ বেলুনের হাওয়া বের হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে অনেকটা সরে পড়েছে—কংগ্রেসের সঙ্গে আর ততটা মাখামাখি করছেনা—বরং ঠাট বজায় রাখবার জন্য কংগ্রেস বিরোধী দলে ভিড়েছে বা ভিড়ছে। হিন্দুর প্রতি মুসলমানের এই নবজাত বিরূপতার প্রধান কারণ বোধ হয় অসহযোগ আন্দোলনের নিষ্ফলতা! বর্তমানে মুসলমান নেতাদের অধিকাংশেরই এই ধারণা জন্মেছে যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গোটা সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুর বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু মুসলমানের সমূহ ক্ষতি হ'য়েছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি প্রায় দশবৎসর পিছিয়ে গিয়েছে, হয়ত এ সবই ঐ গান্ধীর কারসাজী! মুসলমান নেতারা আরও দেখতে পেয়েছে; কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি দেশীয় প্রতিষ্ঠানে মুসলমানের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করা হয় নাই। এইরূপ ধারণা অবিশ্বাসের পরিপোষক এবং মিলনের পরিপন্থী। অর্থনৈতিক দুর্দিনের এইরূপ পরিণতির আশঙ্কা করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তা উপযুক্ত রূপে কার্যে পরিণত হয় নাই। এক শতাব্দীর অধিককাল যাবত হিন্দু সরকারী চাকুরী, অফিস, আদালত ব্যবসায় বাণিজ্য প্রায় একচেটে ক'রে রেখেছে। মুসলমান চেতনা লাভ করতেই নিজের অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পেরেছে। সরকারী নীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান কিছু কিছু অধিকার, শতকরা হিসাবে চাকুরী ইত্যাদি ভোগ করতে চাচ্ছে। এর ফলে হিন্দুর অধিকৃত সুযোগে বাধা পড়েছে। কোনো অফিস বা প্রতিষ্ঠান সেন্ট-পার-সেন্ট হিন্দু কর্মচারী থাকলেও হিন্দুর নিকট অভ্যাসক্রমে তাই স্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু দু-চার-দশজন মুসলমান কর্মচারী বা কেরাণী নিযুক্ত হ'লে তা অতিশয় অস্বাভাবিক সাম্প্রদায়িকতা রূপে বর্ণিত হয়।

অন্নবস্ত্রের সংস্থান ব্যাপারে এই প্রতিযোগিতাই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রধান কারণ। ভাণ্ডারে প্রচুর সম্পদ থাকলে দান-দক্ষিণা ক্রিয়াকাণ্ড করতে বাধে না, কিন্তু আমাদের জাতীয় সম্পদ এত স্বল্প যে কণাটুকু খসলেই নিতান্ত অসুবিধায় পড়তে হয়। হিন্দুও কিছু খেয়ে-পড়ে এমন সুখে নাই যে সে স্বচ্ছন্দে একটু ভাগ মুসলমানকে ছেড়ে দিতে পারে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ভিক্ষুক—অভাবের তীব্র তাড়নায় জর্জরিত। এরূপ অবস্থায় মানুষের আদিম প্রবৃত্তি—আত্ম-সংরক্ষণ বৃত্তি প্রবল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই জন্যই এত রোষ, গর্জন, হানাহানি। অবস্থার উন্নতি না হলে এর স্থায়ী প্রতিকার কিছুই দেখা যায় না। আমার বিশ্বাস, হিন্দু-মুসলমানের ঘরে যদি অভাব না থাকত, তবে ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বন্দ আপনা থেকেই থেমে যেত।

উপরে যা কিছু বলা হয়েছে, সবই সাধারণভাবে সমগ্র সমাজকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। কিন্তু উভয় সমাজেই মহৎ ভাবাপন্ন অনেক উদার ব্যক্তি আছেন যাঁরা জাতি ও সমাজের

ঊর্ধে মানুষকে স্থান দিয়ে থাকেন। দুর্যোগের কালমেঘের এক প্রান্তে এঁরাই একমাত্র আশার রজত-রেখা। দ্বেষপ্রচারক, স্বার্থান্বেষী নেতা ও খবরের কাগজের কবল থেকে, জাতিকে রক্ষা করার ভার এঁদের উপরেই। এঁরা যদি দেশে সুশিক্ষা বিস্তার করে জনমন বা জনচরিত্র সুন্দর করতে পারেন, তবে কোনও সুদূর ভবিষ্যতে দেশের সুখসম্পদ হয়ত ফিরে আসতে পারে। কিন্তু বর্তমানে এ আশা এত ক্ষীণ যে কিছুই ভরসা করা যায় না, কারণ এখনও মানুষ পর্যুদস্ত, পশুবলই প্রবল।

'রবিরে ঘেরিয়া গ্রহ— নিবেদন করে তার অসহ বিরহ'

লোকমান খান শেরওয়ানী

অবিরাম কি অদৃশ্য আকর্ষণ হানি'
আমারে তোমার পানে নাও তুমি টানি।
অহরহ এ রবিরে ঘেরি যেন গ্রহ
নিবেদন করে তার অসহ বিরহ।

অন্তরের অন্তঃস্থল মথিয়া পিষিয়া,
ব্যথা বিষে জর্জরিত মোর রিক্ত হিয়া;
নির্মমে দলিয়া মোরে করিয়াছে নিঃস্ব,
বেদনার তীব্র ঘাতে মৌন মূক বিশ্ব।
অভাগার দীর্ঘশ্বাস—ব্যথিল আকাশ;
অমৃতের মাঝে যেন মৃত্যুর বিকাশ।
হৃদয় অনলে দহে, সে নির্ধূম দাহ—
র'ল চির অপ্রকাশ—জানিল না কেহ।

অকালেতে আজ
হোথা যম রাজ
মেলিয়াছে বাহু।
একি পরমাদ
পূর্ণিমার চাঁদ
গ্রাসিয়াছে রাহু।

আমারে করিতে লয়
প্রতীক্ষিয়া আছে যে প্রলয়।

পাতাল ভূতল আর আকাশ ধ্বনিছে ;
বিষাক্ত নিশ্বাস মোর অন্তরে রণিছে।
জীবনের রূপ রস গন্ধের সঞ্চয়,
আরাধ্যা দেবীরে দানি' যেবা রিক্ত হয় ;
তাহারে নাশিতে হায়—হেরি আয়োজন,
নিরস্ত পর্বতে জাগে দুঃসহ দহন।

কিন্তু হায়, দুর্ভাগ্য আমায়—
টানিছে, সহসা দূরে অজানা দিশায়।
মরু মরে পিপাসায়, হায় তারি দাহ
শুষ্ক তরু মাঝে আনে অনল প্রবাহ।
ভীষ্মেরে ভস্মিতে পুনঃ একি সমারোহ !
ভস্মিল যে ভাগ্যহত, কাটেনা দশাহ।
আজিও রবিরে অই ঘেরিয়াছে গ্রহ
নিবেদন করে তার অসহ বিরহ ॥
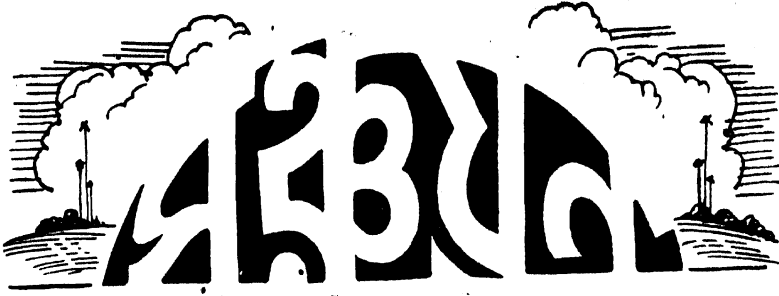
২৭০ বৎসরের বিমান আক্রমণের ইতিহাস

১৬৭০ সনে লেনা ডি টার্‌জি নামক একটী ইটালীয়ান সর্বপ্রথম উড়োজাহাজ আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখেন—যাদ্বারা শত্রুপক্ষের নৌবহর, ঘরবাড়ী দুর্গ ও সহর ধ্বংস করা যাবে।

১৭২৬ সনে এলেন জোনাথেন সুইফট, তাঁর নায়ক গালিভারকে লাপুটাতে পাঠিয়ে লাপুটার ভাসমান দ্বীপ দেখালেন। সে দেশের রাজা কোনো বিদ্রোহী নগরকে যদি শাস্তি দিতে চাইতেন তবে লাপুটাকে সে নগরের উপর দিয়ে ভাসবার ব্যবস্থা করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নগরের অধিবাসীদের উপর বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা হোতো। অনেকে আত্মরক্ষা কর্‌বার জন্য গহ্বরে বা মাটীর নীচের ঘরে ঢুকতে বাধ্য হোতো—এদিকে লাপুটার চাপে তাদের বাড়ীর ছাদ ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো হয়ে যেতো।

১৭৬৯ সনে ইরেসমার্স ডারউইন মঙ্গোলফিয়ারের বেলুন উঠতে দেখা পর্যন্ত খুব সম্ভব জীবিত ছিলেন। ১৭৯৩ সনে একটী ফরাসী আবিষ্কারক রিপাব্‌লিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী টুঁলো নগরীর উপর বেলুন থেকে ১৪ টনের উপর দুইটী বোমা ফেলবার প্রস্তাব করেন।

১৮১৮ সনে ইংলণ্ডে চার্লস রোজিয়ারি নামক চেশায়ারের এক অধিবাসীকে শত্রুর উপর দাঁতালো বোমা ফেলবার জন্য বেলুনে আকাশে উড়বার সম্ভাবনা সম্বন্ধে চিন্তা করতে দেখা যায়। ঘড়ির যন্ত্রের মত একটী যন্ত্রের দ্বারা বোমা ফেলবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

একশতাব্দী আগে, ইটালীয় দেশপ্রেমিক বিখ্যাত ম্যৎসিনি অষ্ট্রিয়ানদের ইটালী থেকে বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে কোন এক আবিষ্কারকের প্রস্তাব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। আবিষ্কারকটী একটী গতি নিয়ন্ত্রিত করা বেলুন আবিষ্কার করেছিলেন।

এই সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিমান যুদ্ধ সম্পর্কে ওৎসুক্য প্রকাশ কর্‌তে আরম্ভ করেন। ১৮৪৬ সনে একটী আবিষ্কারককে গভর্ণমেণ্ট থেকে বৃত্তি দেওয়া হয় তার আবিষ্কৃত বেলুন দুর্গ ও নগরের উপর বিস্ফোরক নিক্ষেপ করে বিপক্ষের সৈন্য ও অসামরিক জনমণ্ডলীর মধ্যে ভীতির সঞ্চর করতে পারে কিনা তা' প্রদর্শন করবার জন্য।

১৮৬২ সনে হেনরী কমউয়েল এই মত প্রকাশ করেন যে বেলুন দ্বারা আকাশে বোমা উত্তোলন করে নিক্ষেপ করা, কামানের সাহায্যে বোমা নিক্ষেপের চাইতে কোনো অংশে কম ফলপ্রদ হবে না।

১৮৮৪ সনে ইংলণ্ড সর্বপ্রথম যুদ্ধে উড়ো জাহাজ ব্যবহার করে। এই সনে ৫টী বেলুন ট্রান্সভালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এগুলি বিশেষ ভীতির উৎপাদন করে।

এর ফলে গাওয়ার নামক একব্যক্তি প্রস্তাব করে যে কোনো যুদ্ধে একটী বেলুন বহরে বিস্ফোরক কোরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাতে শত্রু পক্ষের উপর ভেসে যায়, সেভাবে ছেড়ে দিতে হবে। খার্টুমে গর্ডনকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে এই ধরণের কয়েকটী বেলুন পাঠাবার জন্য যুদ্ধ অফিসকে গাওয়ার অনুরোধ করে।

——চার্লস, এচ, লি,

—এ, আর, পি ও এ, এম, এস, রিভিউ

তেলের জন্য লড়াই

যে সব জাতি সবচেয়ে বেশী তেলের খনি আয়ত্ত করতে পারবে—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধে জয়লাভ করবে তারাই। পৃথিবীর শতকরা ৫০ ভাগ জাহাজ শতকরা ১০০ ভাগ বিমান এবং ৫০,০০০,০০০ যানবাহন তেলে চলে।

পৃথিবীর ৭০ ভাগ তেল আমেরিকার যুক্তরাজ্যে উৎপন্ন হয়। সোভিয়েট রুশিয়া, মেক্সিকো, রুমানিয়া, ইরাক, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও ভেনিজুয়েলাতে তেলই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণ।

গত মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিরা যে তেল ব্যবহার কোরেছিল তার প্রায় সবটাই যুক্তরাজ্য ও মেক্সিকো হোতে আমদানী। বর্তমানকালে তেলের খনি বহুগুণ বেড়েছে। যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়াও ট্রিনিডাড, ভারতবর্ষ, বৃটিশবোর্ণিও, কেনাডা এবং নিকট প্রাচ্য থেকে বৃটিশরা তেল সংগ্রহ করছে।

তবে ঠিক্ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে তেলই একমাত্র কাঁচামাল যা খুব কম আছে। পৃথিবীর উৎপন্ন তেলের শতকরা ২ ভাগ মাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে পাওয়া যায়। নিকট প্রাচ্যে বৃটিশের এতটা নজর দেবার কারণ এই অঞ্চলের প্রচুর তেলের খনি।

ইরাক, সৌদি আরব ও ইরাণ প্রতিদিন ৩৫০,০০ বেরেল তেল উৎপন্ন করে। এককালে যে বাহেরণ মুক্তার ডুবুরীর জন্য বিখ্যাত ছিল এখন সেখানে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টন তেল উৎপন্ন হয়। বৃটিশ কেলটেক্স কোম্পানী বাহরেণের উৎপন্ন তেল বাজারে চালান দেয়। এই কোম্পানী, সুয়েজ, বাহেরণ, কলম্বো সিঙ্গাপুর এবং ডার্বানে এই অঞ্চলের তেলের জন্য কয়লা গ্রহণের বন্দর স্থাপন করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন দু' এক বৎসরের মধ্যে বাহেরণ প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ টন তেল উৎপন্ন করবে। ইরাণের তেলের খনিও এংগ্লো-ইরানিয়ান কোম্পানীর মধ্য দিয়ে ইংরেজরাই পরিচালনা করে। এখানে প্রতিদিন ৩০০,০০ বেরেল তেল উৎপন্ন হয়।

প্রধানতঃ, ইংরেজের তেল উৎপাদনের স্থানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য এবং তার নিজের প্রয়োজনে জন্যও বটে জার্মাণী মধ্য-প্রাচ্যে যুদ্ধ আরম্ভ কোরেছে। ইরাকের পাইপ লাইন দিয়ে মশুল থেকে প্রতি বৎস

প্রায় ৪০০০,০০০ টন তেল পেলেষ্টাইনস্থিত হাইফাতে ও সিরিয়াস্থিত ট্রিপলিতে আনা হয়। যদি জার্মাণী এই তেল আমদানীর পথকে কোন প্রকারে বন্ধ করতে পারে তবে জার্মাণীর পক্ষে প্রথম শ্রেণীর জয় ও ইংরেজে পক্ষে এক সর্বনেশে ক্ষতি হবে।

অন্যদিকে জার্মাণীর তেলের আমদানী তিন প্রকার। রুমানিয়া, সোভিয়েট রুশিয়া ও তার নিজের সঞ্চিত তেল। রুমানিয়ার আমদানী অধুনা অনেকাংশে কমেছে প্রধানত ভূমিকম্পের জন্য। সঞ্চিত তেল বহু বিস্তৃর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্লিৎস্ আক্রমণে প্রায় নিঃশেষ হোয়ে এসেছে। সোভিয়েট রুশিয়ারও নিজের সামরিক প্রয়োজনের জন্যই তেল সঞ্চয় দরকার। ভূতত্ত্ববিদরা বলেন যে রুশিয়াতে এখনো বহু অনাবিষ্কৃত তেলের খনি আছে। একজন বিশেষজ্ঞের মতে পৃথিবীর শতকরা ৫৫ ভাগ তেল রুশিয়াতে পাওয়া যেতে পারে। ১৯৩৭ সনেই রুশিয়ার কাউন্সিল অব পিপলস্ কমিসার এক নিয়ম করেন যে তেলের ব্যবহার শতকরা ১২ ভাগ কমাতে হবে যাতে সমর বিভাগের জন্য বেশীর ভাগ তেল ব্যবহার হোতে পারে।

বাদামী ও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট (brown and bituminous) কয়লা থেকেও জার্মাণী যৌগিক (synthetic) উপায়ে তেল উৎপাদন করছে। এই উপায়ে প্রতিবৎসর ৫০০,০০০ টন তেল উৎপন্ন করছে। শান্তির সময়ের জন্য এই পরিমাণ তেলই যথেষ্ট।

——আর্থার সেটেল—Current History, জুন, ১৯৪১

তুরস্ক কি জার্ম্মাণির স্বাভাবিক বন্ধু?

যদিও সুদূর প্রাচ্যের প্রধান শক্তিগুলি আমাদের নীতিকে এখনো প্রভাবান্বিত করতে পারছেনা, নিকট-প্রাচ্যের প্রধান শক্তি তুরস্ক আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তুরস্ক আমাদের স্বাভাবিক মিত্র। তার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করা আমাদের অতি অবশ্য কর্তব্য। ত্রিশক্তি মৈত্রীর (Triple Alliance) আওতায় তুরস্ককে এর পূর্বে আনতে পারলে বিচক্ষণতার পরিচয় হোত। এ করলে তুর্ক-ইটালী যুদ্ধ বন্ধ করা যেতো। এই যুদ্ধে সমস্ত রাজনৈতিক অবস্থাকে পরিবর্তিত করবে এবং আমাদের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। এই মৈত্রীর দ্বারা তুরস্ক দুই ভাবে লাভবান হতো। রুশ এবং ইংলণ্ড এই দুই শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে সে যথেষ্ট শক্তিশালী হোতে পারতো এবং এই দুই শক্তিই আমাদের প্রধান শত্রু। একমাত্র তুরস্ক ইজিপ্টে ইংলণ্ডের প্রাধান্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং এই জন্যে ভারতে যাবার নিকটতম সমুদ্রপথ ও স্থলপথে যোগাযোগে বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে। ইংলণ্ড ও রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনার সময়ে এই রাজ্যের বন্ধুত্ব লাভ করবার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করাই উচিত। তুরস্ক ও আমাদের স্বার্থ এক। তুরস্ক যদি বসফরাস ও ডার্ডেনেলিসে তার আধিপত্য বজায় রাখতে পারে তবে তা ইতালীর পক্ষেও লাভজনক—এদ্বারা প্রধান চাবিকাঠিগুলি বিদেশীদের—বিশেষ ভাবে ইংলণ্ড ও রুশিয়ার হাতে পড়বে না।

Von Bern Hardy—
১৯১১ সনে লিখিত Germany and the next war হইতে।
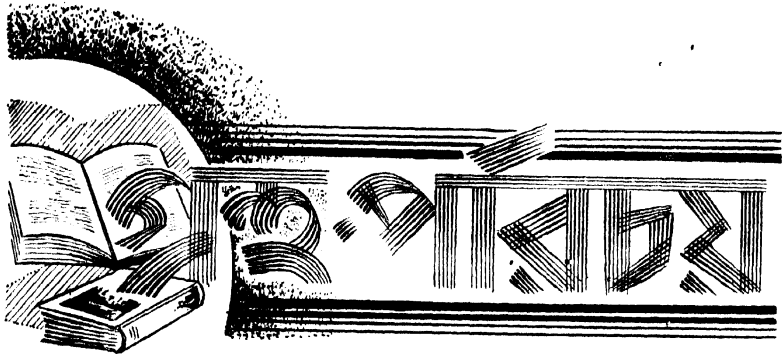
Dictators and Democracies—Calvin, B. Hoover, Published by Macmillan & Co., Ltd.

সবাই বলছেন বর্তমান যুদ্ধের ওপরেই নির্ভর করছে আধুনিক সভ্যতার ভবিষ্যৎ। বিশেষতঃ রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের পর থেকেই বিশ্ব-সমাজের পরবর্তি স্তর কি হবে সে সম্বন্ধে গবেষণা প্রবলতর হয়েছে। ফ্যাসিজম্ এবং কম্যুনিজমের এই সংঘর্ষের ফলে যা দাঁড়াবে তারই ওপরে নির্ভর করবে পৃথিবীর পরবর্তি চিন্তা ও চেষ্টা, এ কথা মনে করছেন সবাই। ফ্যাসিজম্ এবং কম্যুনিজম্, এই দুই মতের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি এবং এদের সাদৃশ্যই বা কি আর পার্থক্যই বা কি, এদের সংঘর্ষই বা কেন,—এসব প্রশ্নের গুরুত্ব বর্তমান যুদ্ধের পটভূমিকায় আরো বেড়ে গেছে। আলোচ্য বইখানাতে দুই মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে সমসাময়িক পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির প্রসঙ্গে। হুভার সাহেব আমেরিকার খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা ও লেখক। পাঁচটী অধ্যায়ে তিনি সংক্ষিপ্ত বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন (১) পার্লামেন্টিয় পদ্ধতির যুগ শেষ হয়ে পৃথিবী এখন ডিক্টেটরী যুগে পদার্পণ করেছে, যাকে বলা যায় "Caesarism" এর যুগ। ফ্যাসিজম্, নাজিজম্ ও কম্যুনিজম্ এই তিনই হলো সেই সিজারীয় ডিক্টেটারীর তিন রূপ। পারিপার্শ্বিকের নব পরিণতি ডিমোক্রেসীকে বাঁচতে দেবে না, "render the survial of a liberal, democratic and parliamentary state doubtful" (p 22). (২) বাহ্যতঃ পার্থক্য দেখা গেলেও আসলে মূলনীতি ও ব্যবহারে এই তিন মতবাদই একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। তিনটী অধ্যায়ে হুভার এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বিচার উপস্থিত করেছেন। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক দুই ক্ষেত্রেই এরা একই দিকে অভিযান করেছে। এই তিনেরই রাষ্ট্র হলো সার্বভৌমিক ও সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিকে খর্ব করে, পিষ্ট করে রাষ্ট্রকে অপ্রতিদ্বন্দ্ব করা এদের প্রধান বৈশিষ্ট হয়ে দাড়িয়েছে "জুলুম" বা Terror. তারপরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এরা তিনই হলো ক্যাপিট্যালিজম্এর শত্রু। তবে কম্যুনিজম্ যতখানি যায়, অপর দুই মতবাদ ততদূর যায়নি এখনো। কম্যুনিজম্ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ক্যাপিটালকে উৎখাত করবে, অপর পক্ষে ফ্যাসিজম্ ও নাজিজম্ করবে কঠোরতম নিয়ন্ত্রণ। কাজেই মূল প্রেরণা একই। এই তিন রাষ্ট্রই

উদ্বৃত্ত মুনাফা (surplus value) আদায় করে ব্যবহার্য পণ্যে ব্যয় না করে, ব্যয় করছে সামরিক প্রস্তুতির ব্যবস্থায়। ক্যাপিটালিজম্‌কে ধ্বংস করে এই ত্রয়ীই পৃথিবীকে সীজারীয় যুগে উত্তীর্ণ করেছে ও করবে। "Yet in National Socialism and in Fascism or in any similar system the capitalist as capitalist is bound to disappear as surely as if less painfully than, under communism." (p61) হুভার লিবারেলের পার্লামেণ্টি মনোবৃত্তি নিয়েই আলোচনা করেছেন। বইখানার গুরুতর অভাব হলো এতে পার্লামেণ্টি ডিমোক্রেসীর ক্রটীগুলোর সংশোধন কোন্‌ ব্যবস্থায় সম্ভব হবে, তার কোন ইঙ্গিতই এতে নেই। তবু বইখানা বিচারশীল যুক্তিপ্রবণতায় এবং ভাষার ও ভাবের সবলতা ও প্রাঞ্জলতায় মূল্যবান। প্রত্যেক চিন্তাশীল ও জিজ্ঞাসুর এই বইখানা পড়া উচিত এবং বিচার করা উচিত।

The Peoples' Front—G. D. H. Cole ; Victor Gollanz Ltd.

প্রায় চারশত পৃষ্ঠার এই বইখানা মিঃ কোলের অন্যান্য বইর মতই ঠাসা এবং বিস্তৃত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোল সাহেব দীর্ঘদিন ধরে জ্ঞান বিতরণ করে এসেছেন, এ পুঁথিখানাও তার পাণ্ডিত্য এবং তথ্যসংগ্রহের কৃতিত্বকে সূচিত করছে। বইখানা লেখা হয়েছে চার বছর আগে যখন স্পেনদেশ আত্মকলহে মুহ্যমান ও রক্তাক্ত হচ্ছিল। সেই যুগে ফ্যাসিস্ত বিরোধী ঐক্যের শ্লোগান সর্বত্রই সজোরে ঘোষিত হচ্ছিল। ফরাসী এবং স্পেনদেশে সত্যি সত্যিই বামপন্থী ঐক্য তখন দানা বেঁধে উঠেছিল। ১৯৩৬ সনের সাধারণ নির্বাচনে সমাজতন্ত্রী লিও ব্লুঁর (Leon Blum) নেতৃত্বে কোয়ালিশন গঠিত হয়েছিল ফ্রান্সে সোস্যালিষ্ট ও র‍্যাডিকাল দলের। কম্যুনিষ্টরা যদিও এতে যোগ দেয়নি, তবু সর্বনিম্ন প্রগ্রামকে সমর্থন করছিল। তারপর স্পেনদেশেও ১৯৩৬ সনের সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থীদের জয় হল এবং রিপাব্লিকান নেতা আজানার হাতে শাসন কর্তৃত্ব এসে গেল। সোস্যালিষ্টরা শরীক হয়নি, এনার্কিষ্ট, সিন্‌ডিক্যালিষ্টরাও বামপন্থী ঐক্যের বাহিরে ছিল। কিন্তু অন্তঃযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই (Frente Popular) পরিস্থিতির চাপে জোর ধরে উঠেছিল। কিন্তু বল্‌ডুইন সাহেবের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে এই বামপন্থী ঐক্য ফলবান হতে পারেনি। সেই ট্রাজেডীর ইতিহাস আজ পুরাণো হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে সমস্ত য়ুরোপে বামপন্থার চরম দুর্দশা ঘট্‌লো এবং ফ্যাসিস্ত অভিযান অমিতশক্তিতে য়ুরোপকে করায়ত্ব করে ফেললো। আজিকার পটভূমিকায় বইখানা অনেকটা সাবেকী হয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই। তবু এতে যে সুক্ষ্ম আলোচনা, বিস্তৃত বিচার ও ঐতিহাসিক তথ্যের সমবায় আছে তাতে সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ রাজনীতিক্ষেত্রে পুঁথিখানা অগ্রগতির সহায়ক হবে। প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীর বইখানা পড়া উচিত। কোল্‌ সাহেবের সব মতের সঙ্গে আমরা একমত নই কারণ প্রধানত: তিনি নিয়মতান্ত্রিক এবং বিপ্লবকে তিনি ভাল চোখে দেখেন না। তবু বৃটীশ রাজনীতিতে লেবার পার্টি এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে যে অহি-নকুল কলহ চলেছে তার প্রতিবাদ তিনি তুলেছেন। সমস্ত বইখানাই বামপন্থীয় ঐক্যের জন্য কাকুতিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু হায় ঐক্য কোথায়! আর, ভারতবর্ষ! আমাদের বেলায় চতুর বিলিতী শৃগালেরা সবাইই "এক-রা"। সোস্যালিষ্ট লিগ্‌, স্বতন্ত্র লেবার, সোস্যালিষ্ট, সিট্রিন-বেভিনের ও অ্যাট্‌লী-ক্রীপসের দল সবাই ভারতবর্ষের বেলায় "চুপ"। কোল্‌ সাহেব অতিকষ্টে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের

সুপারিশ করেছেন, কিন্তু তাতে জোর নেই। যাহোক বইখানা মূল্যবান ; বিশেষতঃ রুশ-জার্মাণ লড়াই এবং ইঙ্গ-রুশ মৈত্রীর ফলে আবার নতুন করে "বামপন্থী ঐক্যে"র দাবি চারদিক থেকেই উঠবে সন্দেহ নেই কাজেই বইখানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিজ্ঞান পরিচয় (মাসিক পত্রিকা) **১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, সম্পাদক শ্রীনীরদ কুমার সেন, ২৭নং পুরাণা পল্টণ, রমনা, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ৫৲ টাকা**

বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট হলো বিজ্ঞান। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আজ বিজ্ঞানের প্রভাব অপ্রতিদ্বন্দ্ব। কী তাত্বিক প্রশ্নগুলির সমাধানে, কী দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারে ও প্রয়োজনে, বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে চলবার উপায় নেই। বিজ্ঞানের শক্তিকে সমাজের প্রয়োজনে আজ লাগাতে হবে, একথা গান্ধীজী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করেন না। আমাদের দেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজন অন্য সব কিছুর চাইতে বড়ো। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ব্যতীত আমাদের এই জরাজীর্ণ, নিষ্প্রাণ সমাজকে রক্ষা করবার উপায় নেই। আলোচ্য পত্রিকাখানি এই সাম্প্রতিক প্রয়োজনকে সিদ্ধ করবে। পত্রিকাখানি দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। এগারটী প্রবন্ধে নানা তথ্য এই সংখ্যাটিতে পরিবেশন করা হয়েছে। আশা করি, উত্তরোত্তর উন্নতির পথে "বিজ্ঞান পরিচয়" সমাজের নিত্য নতুন কল্যাণের পথ উদ্ঘাটন করবে।

"দীপঙ্কর"

আর্থিক জগৎ

'টোডরমল্'

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৪০—৪১এর রিপোর্ট

গত ১১ই আগষ্ট তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৪০-৪১ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বর্তমান মহাযুদ্ধের সময় ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটী মোটামুটী ধারণা পাওয়া যায়। আলোচ্যবর্ষে ব্যাঙ্কের মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে পৌনে তিন কোটী টাকার উপর। ১৯৪০ সালে ৬ ম্যাসে ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছিল মোট ২৯ লক্ষ টাকা এবং ইহার পূর্ববর্তী বৎসর লাভের পরিমাণ ছিল মোট ২৩ লক্ষ টাকা। বর্তমান বৎসরের লভ্যাংশ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী অংশীদারগণকে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে ডিভেডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী আড়াই কোটী টাকার উপর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে লভ্যাংশ বাবৎ দেওয়া হইয়াছে। ভারতের রাজস্ব-সচিব এই অপ্রত্যাশিত মুনাফা পাইয়া নিশ্চয়ই বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছেন কারণ এই যুদ্ধের বাজারে অসঙ্কুলনের সময় এই টাকাটা বিবিধ কাজে লাগিবে।

এই অতিরিক্ত লাভের কারণ হিসাবে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে মহাযুদ্ধের দরুণ বিলাতের গভর্ণমেণ্ট ভারতে বহুল পরিমাণে সমর-সম্ভার ক্রয় করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষেও সমরোপকরণ তৈয়ার করিবার জন্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এই সব ক্রয়-বিক্রয় এবং লেন-দেনের ফলে কেবল যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই লাভ বাড়িয়াছে তাহা নহে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, সমরমুখী হওয়ায় স্বাভাবিক বাজার বন্ধ হইয়া সমরোপকরণের কার্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাস হইতেই এই উন্নতি নজরে পরে কারণ সেই সময় হইতে গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সমরোপকরণের জন্য প্রচুর কাঁচা মালের চাহিদা আসিতে থাকে। ফলে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যে স্ফীতি বৃদ্ধি পায় এবং কতকগুলি নূতন প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়। কাপড়ের কল, লৌহ এবং ইস্পাত, কাগজের কল এবং কতকগুলি রসায়ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাজই বিশেষ প্রসার পায়। চিনি ও পাটের কলগুলি তেমন লাভ করিতে পারে নাই। অন্যদিকে বহির্বাণিজ্যে ভারতের ক্ষতি হইয়াছে, কারণ যুদ্ধের দরুণ অনেকগুলি দেশ হইতে আমদানী-রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং যেখানে ব্যবসা চলিতেছে সেখানেও জাহাজের মাশুল ইত্যাদি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সাধারণ মালের আমদানী-রপ্তানী একেবারে বন্ধ বলিলেও চলে। মোটের উপর কতকগুলি ক্ষেত্রে সাময়িক আর্থিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে কিন্তু অপরে দূরের কথা রিজার্ভ ব্যাঙ্কই মন্তব্য করিতেছে যে এই আকস্মিক স্ফীতির উপর বিশেষ ভরসা করা উচিত হইবে না কারণ সমরপ্রয়োজন ফুরাইলে বিপর্যস্ত আর্থিক বনিয়াদের উপর এই সমর-সৌধের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে।

আলোচ্য বর্ষে সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৫৯ হইতে ৬৪ তে দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাদের শাখা আফিসও বাড়িয়াছে ১৩২২ হইতে ১৩৯৭। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুয়ায়ী সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তাহাদের অস্থায়ী এবং মেয়াদী আমানতের একটা অংশ গচ্ছিত রাখিতে হয়। ১৯৪১ সালের জুন মাসের শেষে উহার মোট পরিমাণ ছিল ৩ কোটী টাকার উপর; পূর্ববর্তী বৎসরে উহা ছিল মোট আড়াই কোটী টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মতে কতকগুলি ছোট সিডিউল ব্যাঙ্ক তাহাদের আইনানুযায়ী দেয় টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গচ্ছিত রাখিতে পারে নাই বা রাখে না। এই সব ব্যাঙ্কের জন্য রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক-আইনের সংশোধন করিতে হইয়াছে যাহাতে অনবধানতার জন্য ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার বা উর্ধ্বতন কর্ম্মচারীদের দায়ী রাখিতে পারা যায়।

১৯৩৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রস্তাব করেন যে ভারতের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির জন্য একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হউক যাহাতে স্বল্প কিম্বা অপ্রচুর মূলধন লইয়া কেহ ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় না করিতে পারেন কিম্বা যাহারা ব্যবসা করিবেন তাহারা যেন কতকগুলি অনুমোদিত নিয়মানুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকেন। এই আইনের প্রস্তাব লইয়া তখন দেশে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল এবং বিশেষতঃ বাংলাদেশে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে এই আইন প্রণয়ন দ্বারা বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে কতকগুলি অনর্থক এবং অহেতুকী বাধার সৃষ্টি হইবে। বর্তমান যুদ্ধের সময় এই আইন প্রণয়ন সমীচিন হইবে না মনে করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব যুদ্ধ-কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে সম্মত হইয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রিপোর্ট সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়াই এই আলোচনা শেষ করিব ১৯২৬ সালে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে তুমু আলোচনার ফলে কতকগুলি ধারা গৃহীত হয় যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষি-ঋণ সম্বন্ধে বিশে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কমনওয়েল্থ ব্যাঙ্ক অফ্ অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার ফেডারে ফার্ম লোন বোর্ড কৃষি-ঋণ দিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। অনেকে উহাদের আদর্শ ধরিয়াই রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক-আইনে কৃষি-ঋণ সম্বন্ধীয় ধারাগুলি গৃহীত হইয়াছিল কিন্তু এই সুদীর্ঘ ১৫ বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত প্রণালী অবলম্বন করি পারেন নাই। আলোচ্য বর্ষের রিপোর্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলিতেছেন যে তাহারা গত বৎ এ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৫ বৎসর পরে গবেষণা আ হইল। কাজ আরম্ভ করিতে সুতরাং অন্ততঃ আরো ৫০ বৎসর লাগিবার সম্ভাবনা! উ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই!

———০———

"বিশ্ববন্ধু"

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধ—

গত বিশ্বাবর্তে ১১।৭।৪১ পর্যন্ত রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের যে খবর ভারতে এসে পৌঁছেছে তার একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হোয়েছিল। তারপর এই চার সপ্তাহে রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের কোনো পক্ষেই চূড়ান্ত নিস্পত্তি কিছু হয়েছে বলে অনুমান করা কঠিন। ১৫ শত মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গণে প্রচণ্ড যুদ্ধ চল্‌ছে—যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময়ে সোভিয়েট বলেছিল তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করতে পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগবে, পাঁচ সপ্তাহ কেন, এখন যুদ্ধের সাত সপ্তাহ চল্‌ছে---কাজেই তাদের সমস্ত শক্তি এতদিনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। জার্মাণী পূর্ব থেকেই এ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল কাজেই উপযুক্ত সৈন্য সমাবেশ সে নিশ্চয়ই করেছে---আর এই পাঁচ সপ্তাহ কালের মধ্যে সে আরো বহু সৈন্য এনেছে ধারণা করা ভুল নয়। তাছাড়া ফিল্ড-মার্শাল ম্যনারহিমের অধিনায়কত্বে উত্তরে ফিনবাহিনী লেনিনগ্রাডের দিকেও দক্ষিণে রুমানিয়বাহিনী কিয়েভের দিকে অগ্রসর হোচ্ছে। তিনটী লক্ষ্য অবলম্বন কোরে যুদ্ধ চল্‌ছে—উত্তর-পশ্চিমে লেনিনগ্রাদ, মধ্যে মস্কো ও দক্ষিণ-পশ্চিমে কিভ এই তিন দিকের মধ্যে দ্বিতীয় দিকে জার্মান সৈন্য অগ্রসর হোচ্ছে। কিন্তু যতটা দ্রুত অগ্রসর হওয়ার আশা জার্মাণী কোরেছিল তা সম্ভব হয়নি—প্রথম জার্মাণবাহিনী দক্ষিণে অগ্রসর হোতে চেষ্টা করে কারণ কিয়েভ ইউক্রেনের রাজধানী এবং এই অঞ্চল যুদ্ধোপকরণ যোগাবার পক্ষে প্রকৃষ্টতম। কিন্তু এদিকে বিশেষ সুবিধা না কোরতে পেরে জার্মাণী উত্তরে লেনিনগ্রাড ও মধ্যাঞ্চলে মস্কোর দিকে অগ্রসর হয়। এর মধ্যে মস্কোর দিকেই জার্মাণ বাহিনী সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হোতে পেরেছে বলে মনে হয়। মস্কো থেকে ২৫০ মাইল পশ্চিমে স্মোলোনস্ক দখল কোরেছে বলে ১৭ই জুলাইর জার্মাণীর খবরে প্রকাশ হয়—কিন্তু স্মোলোনস্ক দখল সম্পর্কে সোভিয়েট এখনো স্পষ্ট কোনো কিছু প্রকাশ করেনি। তবে স্মলেনস্ক অঞ্চলের পূর্বে যে জার্মাণী বেশীদূর অগ্রসর হোতে পারছে না তা যুদ্ধের খবর থেকে বোঝা যায়।

উত্তরে লাডোগা হ্রদ ঘুরে পাস্কোভ ও টালিনের ভীষণ অরণ্য পার হোয়ে জার্মাণ সৈন্যের লেনিনগ্রাদ দখল করা কঠিন কাজেই সেদিকে এখনো জার্মাণবাহিনী বিশেষ অগ্রসর হোতে পারে নাই বলেই অনুমান করা যায়। সম্প্রতি বিমান আক্রমণে লেনিনগ্রাডকে ঘায়েল করবার চেষ্টা হোচ্ছে। মস্কোর উপরও সোভিয়েট বিমানবাহিনী আক্রমণ চালাচ্ছে। জার্মাণরা বলে এই বিমান আক্রমণের লক্ষ্য সামরিক স্থান—সোভিয়েটরা তার উত্তরে যথারীতি বলে যে সামরিক ঘাঁটিগুলির কোনো ক্ষতিই হয় নাই—একমাত্র বেসামরিক জনসাধারণই এর জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হোয়েছে।
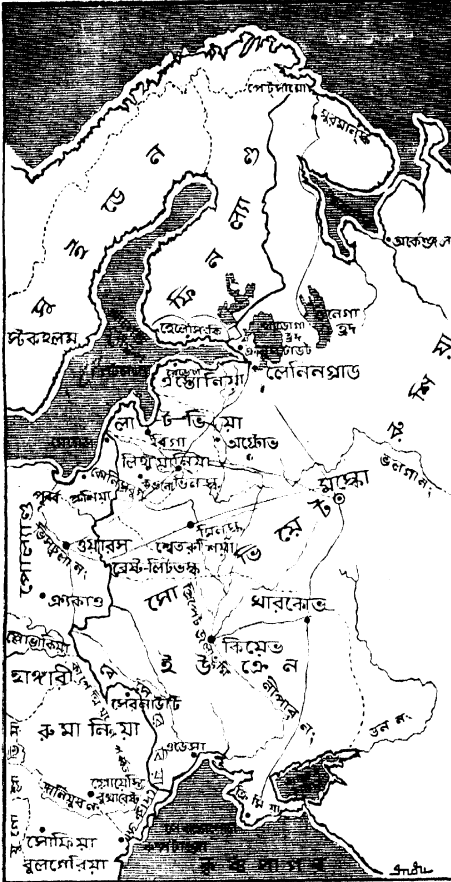
সুমেরু অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্য ও বৃটিশ নৌবহরের সমাবেশ হোয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ফিনল্যাণ্ডের বন্দর পেটসামোর উপর বৃটিশ বিমানের হানা দেবার খবরও এসেছে কাজেই সোভিয়েট ও বৃটিশ শক্তির সহযোগে ফিনল্যাণ্ড শীঘ্রই খুব একটা যুদ্ধ হবে অনুমান করা যায়।

সোভিয়েটরা বলছে যে জার্মাণী বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার আরম্ভ করেছে জার্মাণরা নাকি তা অস্বীকার করেনি। এদিকে ২০ শে জুলাইর খবরে প্রকাশ ষ্টালিন দেশেরক্ষা সচিবের দপ্তরও নিজে গ্রহণ করেছেন।

দক্ষিণে গত কয়েকদিন কিয়েভের ৮৫ মাইল পশ্চিমে জিতোমিরের চারপাশে তুমুল যুদ্ধের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে ২৬শে জুলাইর রুমানিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ যে রুমানিয়া বেসারেবিয়া অঞ্চল দখল কোরেছে। সর্বশেষ খবর যে জার্মাণ ও রুমাণীয়বাহিনী বেসারেবিয়ার

দিকে প্রবল বাধা পাওয়াতে জার্মাণ বাহিনীর কিছু অংশ কৃষ্ণ-সাগরের তীরে ওডেসা বন্দরের দিকে অগ্রসর হোচ্ছে। কিয়েভ ও ওডেসার যোগসূত্র ছিন্ন করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চল্‌ছে।

যুদ্ধের গতি দেখে মনে হয় শীঘ্রই এই যুদ্ধ শেষ হবার নয়। কারণ কোন পক্ষই কম নয় এবং চূড়ান্ত মীমাংসা হোতেও কাজেই দেরী হবে। এতে আর যার যাই হোক ইংলণ্ডের পক্ষে সুবিধা হবে বলেই মনে হয়।

জাপানের নীতি

জার্মাণী রুশ আক্রমণ কর্‌বার পর থেকেই জাপানের মতিগতি সম্পর্কে সকলে উৎকণ্ঠিত হোয়ে পড়েছিল। গত ১৬ই জুলাইর রয়টারের খবরে জাপমন্ত্রীসভার পদত্যাগ পত্র সরকারী ভাবে ঘোষিত হয়। এই পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে গবেষণা হোয়েছে তবে যথার্থ কারণ জানা যায়নি। কিন্তু জার্মাণীর রুশ আক্রমণের ফলে জাপান গভর্ণমেণ্টের মধ্যে জাপানের কর্তব্য সম্পর্কে যে বিভিন্ন মত দেখা দেয় তা অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে বলা যায়। মাৎসুওকা এবং সমর সচিব জেনারেল টোজো প্রভৃতি চরমপন্থীরা ইন্দোচীনের দিকে অগ্রসর হবার নীতি সমর্থন করেন। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র-সচিব ব্যারণ-হিরানুমা প্রভৃতি মধ্যপন্থীরা ইউরোপের যুদ্ধের ফলাফল আরো সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জাপানের নূতন কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হবার বিপক্ষে। এই দলকে জাপানের ব্যবসায়ী মহল সমর্থন কর্‌ছিলেন। প্রিন্স কোনোয়ো নূতন মন্ত্রী-সভা গঠনে নাকি নৌ ও সমর বিভাগের সমর্থন পেয়েছেন। নূতন মন্ত্রী সভায় কনোয়ে প্রধান মন্ত্রী, এড্‌মিরাল তিইজিরো তোয়েদা পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক সচিব মিঃ হারমিত স্বরাষ্ট্র সচিব জেনারেল হেডেকী তোজে সমর সচিব এবং ব্যারণ হিরানুমা, লেঃ জেনারেল তেইচি সুজুকি, লেঃ জেনারেল হিসুকি ইয়ানগাওয়া দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হোয়েছেন। নূতন মন্ত্রী সভা থেকে মাৎসুওকা বাদ পড়েছেন এটা সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয়।

এই মন্ত্রী সভা ঘোষণা করেছেন যে—মন্ত্রীসভার পরিবর্তনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে জাতীয় কর্ম নীতি এতদিন গৃহীত হোয়েছিল তার কোনো পরিবর্তন হবে না। বৈদেশিক নীতিরও কোনো মূলগত পরিবর্তন হবে না—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে মাত্র।

নূতন মন্ত্রীসভার প্রথম কাজ দেখা যাচ্ছে সমস্ত ইন্দোচীন দাবী কোরে ২৪ ঘণ্টার মেয়াদে ভিসিকে এক চরমপত্র দান। এক বছর আগে ফ্রান্সের পতনের সুযোগ নিয়ে উত্তরে ইন্দোচীনে কয়েকটী সামরিক ও বিমান ঘাঁটি দাবী করে ইন্দোচীনের স্বার্থহানির কথা স্মরণ কোরে এবং আমেরিকা ও বৃটেন চীনকে সাহায্য করবে—এই আশা নিয়ে ইন্দোচীন প্রথম এই দাবী অস্বীকার করে—কিন্তু যখন বৃটিশ ও আমেরিকার নিকট কোনো সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক—বৃটেন ব্রহ্ম-চীন

পথ বন্ধ কোরে দিল তখন ইন্দোচীন জাপানের দাবী মেনে নিল। এবার জাপান দক্ষিণ ইন্দোচীনের কতকগুলি ঘাঁটি দাবী কোরেছে। ভিসি বিশেষ প্রতিবাদ করেনি। জাপানও খুব প্রচার কোরেছে যে বৃটেন সিরিয়া দখল করেছে যে যুক্তিতে সেই যুক্তিদ্বারাই ইন্দোচীন অধিকার করতে পারে—কাজেই জাপান সে বিষয় নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। সুতরাং ভিসি ও জাপান মিলে ইন্দোচীনকে বিদেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ কোরেছে। এর ফলে প্রতিশোধ স্বরূপ আমেরিকা ও ইংলণ্ডে জাপানের যে সম্পত্তি ও অর্থ ছিল তা সব বাজেয়াপ্ত করা হোয়েছে, জাপানও তদনুরূপ ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমস্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত কোরেছে। জাপানস্থিত বৃটিশ রাজদূত জাপানে পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা কোরেছিলেন কিন্তু জাপান খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে বলেছে ইন্দোচীনের স্বাধীন সত্বা রক্ষার ভার সে গ্রহণ কোরোছে—যদি ইংলণ্ড এতে তাকে ভুল বোঝে তবে সে কি করবে? এতদিনে মন্ত্রীসভা পরিবর্তনের একটা যথার্থ কারণ হয়তো পাওয়া গেল। মার্কিন ও ইংলণ্ডের সঙ্গে আশু যুদ্ধের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রেখেই হয়তো এইরূপ বদল। ইন্দোচীনে জাপান একজন রাজদূত পাঠিয়েছে যাতে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব বাড়ে তার উদ্দেশ্যে। ভিসিও অগত্যা ইন্দোচীন রক্ষার যুক্ত দায়িত্ব স্বীকার কোরে নিয়েছে। এদিকে থ্যাইল্যাণ্ডতটস্থ হোয়ে উঠেছে তার এই নূতন প্রতিবেশীর শ্যেন দৃষ্টির সামনে। ফলে থ্যাইল্যাণ্ডে ইন্দোচীন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ হোয়েছে। সুদূর প্রচ্যের আশঙ্কাজনক অবস্থা সম্বন্ধে লণ্ডনের সমস্ত কাগজে মন্তব্য করেছে—খবর পাওয়া গেছে বৃটিশ বিমান বাহিনীর বহু অফিসার ও বৈমানিক এবং সামরিক বিভাগের কর্মচারী ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর এসে পৌঁছেছে, তারা সুদূর প্রাচ্যের বিশেষ ঘাঁটিগুলিতে শীঘ্রই চলে যাবে। অষ্ট্রেলিয়াতে সাজ সাজ রব উঠেছে। ঝড় উঠেছে কোন দিকে তার গতি দেখবার জন্য জগৎ শঙ্কিত আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

ইরাণে

সম্প্রতি ইরাণের ব্যবহারে বৃটিশসিংহ ক্ষুন্ন হোয়েছে। শোনা যায়, যে সব হোয়াইট রুশিয়ান ইরাণে আশ্রয় নিয়েছিল—জার্মাণ পঞ্চম বাহিনীর সঙ্গে নাকি তাদের খুব দহরম মহরম এতটা মেশামিশিতে ইংলণ্ড খুসী হোতে পারেনি—ইংলণ্ড ও সোভিয়েট ইরাণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ কোরেছে। ইরাণ সরকার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা ভাবে রটনা সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, আধুনিক ইরাণ অতীতের মত নয়—প্রয়োজনমত নিরপেক্ষভাবে শান্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম। নিজের নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য ইরাণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পের্কেও সম্পূর্ণ সচেতন। বৃটিশ সরকারকে ইরাণ যে উত্তর দিয়েছে তাতে বৃটিশ নাকি সম্পুর্ণ খুসী হোতে পারেনি, উপায় কি? সর্বত্র মনোমত ব্যবস্থা হওয়া কঠিন, বিশেষতঃ বর্তমানের খামখেয়ালী জগতে।

মিশরে মন্ত্রিসভার রদবদল

মিশররের সংবাদে প্রকাশ সিদি পাশার নায়কত্বে ৫ জন উদারনৈতিক ৫ জন স্বতন্ত্র ও ৫ জন সৈইদী দলের সদস্য নিয়ে নূতন মন্ত্রী সভা গঠিত হোয়েছে। বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক হবার বিশেষ ব্যবস্থা হোয়েছে। এজন্য একটী নূতন বিভাগ খুলে একজন মন্ত্রীকে ভার দেওয়া হোয়েছে।

ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী

গত জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত ও সরকারী ভাবে ঘোষিত হয়। চুক্তির সর্ত দু'টী—'উভয় গভর্ণমেণ্ট হিটলার অধিকৃত জার্মাণির সঙ্গে যুদ্ধে পরস্পরকে যথাসম্ভব সহায়তা করবে এবং পৃথক ভাবে কেহ সন্ধি করবে না। এর সঙ্গে সঙ্গে মিঃ চার্চিল জেনারেল স্মাট্‌সের মন্তব্য উল্লেখ কোরে বলেন যে এর দ্বারা কেউ যেন মনে না করে ইংলেণ্ড কম্যুনিষ্টদের দলে মিশেছে বা কমিউনিষ্টদের জন্যে যুদ্ধ করছে।

ইংলণ্ডের অবস্থা দেখ্‌লে বাস্তবিকই সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে কিনা শেষ পর্যন্ত সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে হোলো—কাজেই পাছে কেউ ভুল করে ফেলে যে ইংলেণ্ড আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নয়— তাই প্রধান মন্ত্রী মৈত্রীর সঙ্গে সঙ্গে একই নিশ্বাসে বলছেন—যদিও কমিউনিষ্ট ষ্টেট্‌কে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হোয়েছি—কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই – বা থাকতে পারে না।

সিরিয়া

সিরিয়াতে বৃটিশ ও ভিসির সঙ্গে চুক্তি হোয়েছে। চুক্তির ফলে সমস্ত বন্দী মুক্তি পাবে -- যে ভারতীয় বন্দীরা আছে তারাও মুক্তি পাবে। চুক্তির ২২টী দফা। বিশেষ দফাটী এইরূপ— মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ সমস্ত ঘাঁটিগুলি দখল করবে বলে স্থির হোয়েছে, ফরাসী সৈন্য এক বিশেষ অঞ্চলে থাক্‌বে। সৈন্যদের অস্ত্র-শস্ত্র থাক্‌বে কিন্তু তারা গুলি রাখতে পারবে না। সমস্ত সমরোপকরণ বৃটিশ কর্তৃত্বাধীনে থাক্‌বে। সমস্ত সিরিয়া ও লেবানন দখল করবার পর এবং মিত্রপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য মুক্তি পাবার পর বন্দী ফরাসীদিগকে মুক্তি দেওয়া হবে।

চুক্তিগুলি কাজে পরিণত করবার জন্য ৩ জন বৃটিশ ও ২ জন ফরাসীকে নিয়ে একটী কমিশন গঠিত হোয়েছে। এরা বেইরুটে থেকে চুক্তির সর্তকে কাজে পরিণত করবে ঠিক হোয়েছে। সিরিয়ার ব্যাপার আপাতত এভাবে নিষ্পত্তি হোলো।

১৩. ৮. ৪১

——:*:——

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ

গত বৃহস্পতিবার, ৭ই আগষ্ট বেলা ১২টা-১০ মিনিটের সময় রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেছেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন; তারপরে কলকাতায় এসে অবধি অসুস্থতা বেড়ে যায়। গত ৩০ শে জুলাই তাঁকে অস্ত্রোপচার করা হয়। তার পর থেকেই তাঁর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। গত বৃহস্পতিবার ৯টা-১০ মিঃ সময়ে অক্সিজেন দেওয়া হয়। ১০টার সময় ডাঃ বিধান রায় ও এল, এম্, ব্যানার্জি ঘোষণা করেন, কবির অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। তার পরে ১২টা-১০ মিনিটে সব শেষ হয়। শেষ দিকে কবির লোক চেনবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছিল। তাঁর শেষ কবিতা রচনা করেছিলেন ৩০ শে জুলাই, অপারেশানের পরে যখন জ্ঞান হয় তখন। সন্ধ্যাবেলা নিমতলা শ্মশানঘাটে কবির মৃতদেহ দাহ করা হয়। কলিকাতার লক্ষ লক্ষ নাগরিক শোকযাত্রায় যোগ দিয়েছিল। কবির ভস্ম ও অস্থি শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শ্রাদ্ধ ১৭ই আগষ্ট রবিবার শান্তিনিকেতনে সম্পন্ন হবে। প্রায় সত্তর বছর যাবৎ যে ব্যক্তিত্ব বাংলা ও ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত রেখেছিল আজ তার অবসান হল। আমরা কবির শোকার্ত আত্মীয়-স্বজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এই প্রসঙ্গে দেশবাসীকে অনুরোধ করছি, তাঁর স্মৃতিরক্ষা সূত্রে শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় যেন জনসাধারণের সহায়তায় স্থায়িত্ব লাভ করে।

দেশপ্রিয়

গত ৭ই শ্রাবণ দেশপ্রিয়ের মৃত্যুতিথি। এই দিনেই ৮ বছর আগে দেশপ্রিয় রাঁচিতে অন্তরীণ থাকা কালে মারা যান। দেশবন্ধুর একান্ত বিশ্বাসী সহকর্মী ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর উপর দেশবন্ধুর বিশ্বাস যোগ্যপাত্রেই অর্পিত হোয়েছে। দেশের সেবায় গুরুতর পরিশ্রম কোরেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়, ফলে তাকে দেশ হারায়। কিন্তু আমরা বলি তাঁকে হারাব কেন, এই সব জীবনইতো জাতির শাশ্বত সম্পদ। ভবিষ্যৎ বংশ এই সব জাতীয় সম্পদ থেকেই তো নিজেদের জীবনকে ঐশ্বর্য মণ্ডিত করবে। আজ তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আচার্য প্রফুল্ল জয়ন্তী

গত ১৭ই শ্রাবণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ৮০ বৎসর পূর্ণ হোলো। তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী ঐ দিন তাঁর জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত করলো। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও বহুমুখীন সাধনার বিষয় আজ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—সমস্ত ভারত এমন কি ভারতের বাইরেও অনেকে তা জানেন। তাঁর জীবন দিয়ে দেশসেবার যে জ্বলন্ত উদাহরণ, যে বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের অবদান আমাদের চোখের সামনে তিনি ধরেছেন সমস্ত জাতি তাতে সমৃদ্ধ হোয়েছে। তাঁর ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে তিল তিল কোরে জীবনের প্রতি মুহূর্ত তিনি স্বদেশসেবার কাজে ভরে তুলেছিলেন, সে দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তাঁর শিষ্যগোষ্ঠী আজ ভারতের ও জগতের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র-এ তাঁর পক্ষে কম আনন্দের কথা নয়। আমরা তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁর স্নেহের দান আমাদের কর্ম প্রচেষ্টাকে অজস্রভাবে উৎসাহিত ও সফল কোরেছে। আমরা কৃতজ্ঞ অন্তরে তা স্মরণ করছি এবং তাঁর এই অশীতিতম জন্মতিথিতে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এ কথাটাই মনে হোচ্ছে যে তাঁর মত জীবন আমাদের জাতীয় জীবনে কবে আরো অধিক সংখ্যায় দেখতে পাব, কবে আচার্যদেবের জন্মদিনের আকাঙ্খা বাস্তবিকই পূর্ণ হবে।

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়াকিং কমিটির বৈঠক

গত ২০শে ও ২১শে তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির ২দিন ব্যাপী বৈঠক সমাপ্ত হোয়েছে। সর্দার শার্দুল সিং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ৪টী জরুরী প্রস্তাব গৃহীত হয়। (১) রুশবাসীর প্রতি সহানুভূতি—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্য কাজেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে রুশদেশের প্রতি ফরোয়ার্ড ব্লক স্বভাবতঃই সহানুভূতিশীল। কিন্তু সেই সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের সুস্পষ্ট মত এই যে এই যুদ্ধে কোনো পক্ষ অবলম্বন করবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা ভারতের নাই। কাজেই ফরোয়ার্ড ব্লক ভারতের জনসাধারণকে স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে নির্দেশ দিচ্ছে। (২) যুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে ভারতবর্ষ একটী যুদ্ধমান জাতির অধিকৃত ব'লেই ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী, কাজেই এই আসন্ন আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার উপায় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা এবং এই উপায়েই ভারত [illegible] ক্ষেত্রে একটী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ কোরতে পারে। ফরোয়ার্ড ব্লক আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। (৩) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলেই দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো পাবে। এর হাত থেকে দেশকে রক্ষা কোরে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা নিবারণ ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য ভারতের নিজস্ব একটী জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন প্রয়োজন। এজন্য ফরোয়ার্ড ব্লক—[illegible]কে

দেশের সর্বত্র জাতীয় রক্ষিবাহিনী গঠন করবার অনুরোধ করছে এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে যে বিধি-নিষেধ আছে সেগুলির কঠোরতা হ্রাস করতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করছে। (৪) ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন জেল ও বন্দী শিবিরগুলিতে রাজনৈতিক বন্দী ও রাজবন্দীদের সম্পর্কে যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোয়েছে তাতে তারা স্থানে স্থানে অনশন আরম্ভ করতে বাধ্য হোয়েছেন। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের দাবী জার্মাণির কাছে ইংরেজ দাবী করেছে, ভারতবাসীরাও সেই দাবী গভর্ণমেণ্টের কাছে করছে। রাজনৈতিক বন্দীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কোরে যে বৈষম্যের সৃষ্টি করা হোয়েছে ফরোয়ার্ড ব্লক তার তীব্র প্রতিবাদ কোরছে।

উপরোক্ত চারটী প্রস্তাবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরোয়ার্ড ব্লক বর্তমান সংশয়াকুল ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরূপ সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে চিন্তা ও কর্মের পরিচ্ছন্নতা এনেছে, তারজন্য আমরা ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটিকে অভিনন্দিত করছি। আশা করি সর্বসাধারণ ও বিশেষ কোরে ভারতের নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে যথোচিত বিবেচনা করবেন। এগুলির মধ্যে এমন কিছু নাই যাতে কোন দলের গ্রহণ করতে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

কমন্সে ভারত সম্পর্কে গতানুগতিক বিতর্ক

গত ১লা আগষ্ট কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কে যে বিতর্ক উপস্থিত হয় তার উত্তর আমেরী সাহেবের উক্তি পাঠ করলে স্বভাবতই মনে হয় ইংরাজীতে যাকে বলে, playing to the gallery তাই হোয়েছে। এখানে আবার galleryর স্থান অধিকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র—যার সাহায্যের উপর বৃটেনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কাজেই আমেরিকার মনে যাতে ভারত সম্পর্কে বৃটেনের যথার্থ মনোভাব সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহই না জাগে তার ব্যবস্থা সর্বতোভাবে করতে হবে। কমন্সের বিতর্ক এই কাজ কতদূর করতে সক্ষম হোয়েছে জানিনা—তবে আমেরী সাহেব প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টির জন্য তিনি কংগ্রেসকে দোষ দিয়েছেন। সহযোগের পরিবর্তে যে বর্তমান নীতি কংগ্রেস অনুসরণ করছে তার ব্যর্থতা সম্পর্কেও তিনি উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে, যে ভারতবাসীরা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা দলের প্রতি আনুগত্য বেশী দেখায়। তারপর বড়লাটের সম্প্রসারিত পরিষদ ও জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদকে পঞ্চমুখে প্রশংসা কোরে তিনি বলেছেন—যখন বিভিন্ন দলকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যেতোনা তখন ব্যক্তিগত যোগ্যতার দ্বারাই এই কমিটি দু'টীর সদস্যদের বাছাই করা হোয়েছে এবং এরা যোগ্যতম যেহেতু এদের কোনো দল নেই। কারণ দল থাকলেই দেশের স্বার্থের উর্ধে দলের স্বার্থ এরা হয়তো দেখতেন।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সম্পর্কে তিনি বলেছেন—যে ভারতবাসীরা নিজেরা ভারতবর্ষ শাসন করবে, এতো বৃটেন সর্বদাই ইচ্ছে করেছে।—মুস্কিল হোচ্ছে কি ভাবে, কোন্ শাসনতন্ত্রের

মধ্য দিয়ে তা সম্ভব হবে। কারণ তাঁর মতে ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারী শাসনতন্ত্র অচল যেহেতু ভারতবর্ষের মেজরিটি ভুয়া মেজরিটি। বাংলা ও পাঞ্জাবের মত তৈরী করা মেজরিটি না হোলে শাসনতন্ত্র কার্যকরী হবেনা। ভারতবর্ষে নূতন মেজরিটি করতে হবে—কারণ ভারতবর্ষ বিচিত্র দেশ। তাছাড়া এখানকার আভ্যন্তরীণ মতভেদের কথা উল্লেখ কোরে বলেছেন ক্ষমতা দিতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত তবে এত মতভেদ যেখানে সেখানে আর আমরা কি করতে পারি, সকলে এক না হোলে শাসন হয় কি কোরে।

শিল্প সম্বন্ধেও আমেরীসাহেব বলেছেন যে ভারতের শিল্পোন্নতি যাতে হয় তার জন্য তাঁরা সকলেই আগ্রহান্বিত কিন্তু মুস্কিল হোচ্ছে অন্যস্থান থেকে ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি না আমদানী হলে শিল্পকারখানা চালানোই মুস্কিল। কাজেই যুদ্ধ বিরতির জন্য অপেক্ষা কোরে থাকতে হবে। ইতিমধ্যে আমেরীসাহেব ক্ষণে ক্ষণে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের মনে বিচিত্র ভাব উৎপাদন করতে থাকুন—ভারতের ভাগ্য তাতেই সুপ্রসন্ন হবে।

য়ুরোপীয় যুদ্ধের বোঝা—

ভারতবর্ষকে যুদ্ধের অংশী হতে হয়েছে, তারজন্য যে দুর্ভোগ তা'তো ভারতকে ভুগতেই হচ্চে; তার ওপরে যুদ্ধের ফলে আরো যেসব আনুষঙ্গিক বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তারও দুঃখ কম নয়। বাজারদরের বৃদ্ধি, নিষ্প্রদীপের মহড়া, পুলিশের ও গোয়েন্দার উৎপাত বৃদ্ধি ধরপাকড়, এমন কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বৃদ্ধি (অনেকেই বলছেন যুদ্ধের সঙ্গে দাঙ্গার সম্পর্ক আছে) ইত্যাদি অনেক রকমের যন্ত্রণা তো আছেই। তার ওপরে সব চাইতে লাঞ্ছনার বিষয় যেটী সেটী হলো মুহুর্মুহু করবৃদ্ধি। শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের একটী অতিরিক্ত (supplementary) বাজেট আবার ভারতবাসীর ঘাড়ের ওপরে ঝুলছে। সিন্দুরে মেঘ দেখলে যেমন দগ্ধ গাভীর আতঙ্ক হয়, অতিরিক্ত বাজেটের কথা শুনলেও এদেশে নতুন করবৃদ্ধির ভয় উপস্থিত হয়। ছুতোর অভাব হবে না, কারণ কোন দিনই হয় নাই। পেট্রোলের নিয়ন্ত্রণ দরুণ পেট্রোল শুল্ক থেকে আয় কমে যাবে; জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছেদন করার দরুণ আমদানী-রপ্তানীর শুল্ক-আয় লোকসান হবে; তাছাড়া যুদ্ধব্যয়ও বৃদ্ধি হচ্চে দিন দিন। আয়ের হানি ও ব্যয়ের বৃদ্ধি !! কাজেই সঙ্গে সঙ্গে উপকথার উটটীর পিঠের ওপরে সাধ্যমত ভার চাপান প্রয়োজন হবে !

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে গরীবের প্রাণ চিরকালই যায়। কিন্তু এটা আধুনিক যুগ। তাই প্রাণ দেবার আগেও গরীবেরা একবার জিজ্ঞাসা করে থাকে। পেট্রোল নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণের কোন সুবিধাই হয় নাই। বরং সাধারণের অসুবিধা বেড়েইছে। জাপানী কারবার বন্ধ হওয়ায় বহু ব্যবসায়ীদের অর্থহানি ঘটেছে আর দরিদ্র জনসাধারণের (consumers) পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ প্রাণান্ত কষ্ট হয়েছে। অথচ এই দুইটী ব্যাপারের জন্য জনসাধারণ মোটেই দায়ী নয়। তবু

তাদেরই এর বোঝা বহন করতে হবে। আর 'যুদ্ধব্যয়' বস্তুটী যে সত্যি সত্যি কী, তা' জনসাধারণ মোটেই জানে না; কারণ যুদ্ধের জন্য কোথায় কি হচ্চে তা' গুহ্যতত্ব, বহির্জ্জগতের গোচর করা চলেনা। কাজেই এই অনির্দ্দেশ্য যুদ্ধ খরচার জন্য অসহায় ভারতবাসীর রিক্ত ভাণ্ডারকে আরো উজাড় করতে হচ্চে। যুদ্ধ যতদিন চল্‌বে ততদিন এই নির্ম্মম পালা চল্‌তেই থাক্‌বে, বিরাম হবে না। য়ুরোপে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ক্ষমতা নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি চলেছে; সেই কাড়াকাড়ির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনতার; হতে হবে সর্বস্বান্ত। এই নিষ্ঠুর ভার ভারতবর্ষ কী করে বহন করবে? বাজেটের কর্তারা তা চিন্তা করছেন কি? ক্ষমতার অতিরিক্ত ভার চাপালে তার ফল কি শুভ হবে? কাজেই সাধু সাবধান!

ভারত-ব্রহ্ম চুক্তি

ভারতীয়দের ব্রহ্মে যাতয়াত নিয়ন্ত্রণ কোরে সম্প্রতি যে উভয় সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হোয়েছে তার সর্তগুলি দেখে আমরা বিস্মিত হোয়েছি। ভারত থেকে স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী প্রমুখ এক মিশন ব্রহ্মদেশে পাঠান হয়; তখনও একথা বলা হোয়েছিল যে মিশনের সদস্যরা কেবল মাত্র চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করবেন কোনো প্রকার চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল বাজপেয়ী মিশন চুক্তি সম্পাদন কোরে ফিরেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত প্রকার মতামত উপেক্ষা কোরে ভারত থেকে ব্রহ্মদেশ যখন বিচ্ছিন্ন করা হয় তখনই আমরা জানি ক্রমশঃ কি আস্‌ছে; যদিও ১৯৩৬এ পার্লামেণ্টে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তখনকার ভারত সচিব মিঃ আর এ বাট্‌লার জোর গলায় বলেছিলেন—'ভারতবাসীর মনে এই আশঙ্কা হোয়েছে যে বিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে ভারতবাসীর যাতায়ত সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা হবে কিন্তু আমি তাদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে বড়লাটের মতামত না নিয়ে কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ব্রহ্ম সরকার করতে পারবে না এবং বড়লাট নিজে ব্রহ্মদেশ গমনেচ্ছু ভারতবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য যত্নবান থাক্‌বেন।' এসব প্রতিশ্রুতি পরিবর্তিত প্রয়োজনের খতিয়ানে টিক্‌বে এরূপ আশা অবশ্য আমরা করি না। তবে প্রতিশ্রুতি করাই বা কেন?

চুক্তির উদ্দেশ্যে বলা হোয়েছে বর্মীদের মনে নাকি এ ধারণা হোয়েছে যে ভারতবাসীদের আগমনেই বর্মীদের বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে—কাজেই ভারতবাসীর যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ কোরে সেই ধারণা দূর করা প্রয়োজন। প্রথমত, বর্মী জনসাধারণের মনে এরূপ ধারণা হোয়েছে বলে কোনো প্রমাণ আমরা পাইনি, দ্বিতীয়তঃ, এক শ্রেণীর বর্মীর মনে যদি এ ধারণা হোয়েই থাকে তবে ভারতবাসীর স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে তার যুক্তিযুক্ত কারণ কি? তৃতীয়তঃ, বর্মীদের জাতিবিদ্বেষ জাগ্রত কর্‌লো কে?

এই সম্পর্কে সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত কোরে রিপোর্ট দেবার জন্য ব্রহ্ম ও ভারত সরকার পরামর্শ করে ব্যাক্সটার কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন যে সকল চুক্তির সর্ত নির্ধারণ করেছেন সেগুলি প্রধানতঃ কোনো প্রকার অনুমতিপত্র ব্যতীত কোনো ভারতবাসী ব্রহ্মে প্রবেশ করতে পারবে না—অনুমতি পত্র দুই প্রকার হবে (ক) এই শ্রেণীর অনুমতিপত্র যাকে দেওয়া হবে তিনি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ব্রহ্মদেশে থাকতে ও চাক্‌রী নিতে পারবেন। অনুমতিপত্র পেতে হোলে ৫০০৲ ফি দিতে হবে। (খ) এই শ্রেণীর অনুমতি বিশেষভাবে শ্রমিকদের জন্য, এর জন্য ১২৲ প্রবেশ ফি লাগবে এবং প্রতি বৎসর ৫৲ কোরে ফি দিতে হবে। এ শ্রেণীর অনুমতিপত্রে নির্দিষ্ট কালের জন্য বাস বা চাক্‌রী করতে পারবে কিন্তু ডোমিসাইলের অধিকার অর্জন করতে পারবে না।

একটী ইমিগ্রেশন বোর্ড গঠিত হবে তার সুপারিশ বিবেচনা কোরে ব্রহ্ম সরকার কাজ করবেন। এই মোটামুটি সর্ত। এখন প্রশ্ন হোচ্ছে ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীর যাতায়ত নিয়ে সরকার হঠাৎ কেন এই সময়ে এতটা উৎকণ্ঠিত হোয়ে উঠ্‌লেন বোঝা মুস্কিল। এই সঙ্কটের সময় যখন দুই দেশের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা ও ঐক্য স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল ঠিক্ তখনই এইরূপ বিধি বিশেষের ফল কি হবে বোঝা সহজ। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম সরকারের অনুমতি ব্যতীত যখন কেউ ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করতেই পারবে না তখন প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবার উদ্দেশ্যে প্রবেশ ফি ধার্য করবার হেতু বোঝা গেল না। শিক্ষা বা দেশভ্রমণ দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভের জন্য যদি কেউ যেতে চায় তাকেও ঐরূপ ফিস্ দিয়ে অনুমতিপত্র ক্রয় করতে হবে। অন্যত্র ছাত্র বা ভ্রমণকারীদের জন্য এরূপ ব্যবস্থা আছে বলে জানিনা। ভারত সরকার এখনো একে আইনে পরিণত করেন নাই। আইনে পরিণত করবার আগে এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করবেন এ আশা করবার কোনো হেতু দেখছি না।

কাজেই এবার ভারত ও ব্রহ্ম-বিচ্ছেদ পূর্ণ হোলো কিন্তু প্রশ্ন জাগে বর্মীদের বাস্তবিক বেকার সমস্যা কতটা মিট্‌বে—বর্মীদের কল্যাণের অছিলায় সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতিই বা কতটা কার্যকরী হবে।

এম, এস্ হায়দারির আত্মতৃপ্তি

কিছুদিন হোলো কল্‌কাতার এক ভোজ সভায় ইষ্টার্ণ গ্রূপ সাপ্লাই কাউন্সিলের মিঃ এম এস্ হায়দারি এক বক্তৃতা কোরোছেন। তার মূল কথা হোলো—সাপ্লাই কাউন্সিলে ভারতীয়দের যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হোয়েছে কিন্তু সে সম্পর্কে ভারতীয়রা যথেষ্ট সচেতন নয়। তাঁর নিজের সম্মান সম্পর্কে মিঃ হায়দারি যদি আত্মতৃপ্তি অনুভব কোরে থাকেন তাতে আমাদের আপত্তি করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু যদি তিনি বলেন যে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি ডোমিনিয়ানগুলির প্রতিনিধিদের যে মূল্য ও মর্যাদা, ভারতের প্রতিনিধিরও সেইরূপ—আমরা তা স্বীকার করতে নারি

নই। প্রথম কথা সেখানে ভারতের জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত কোনো প্রতিনিধি নেই—যে প্রতিনিধি আছেন তিনি সরকার মনোনীত প্রতিনিধি, তাঁর কার্যকলাপের উপর জনসাধারণের মতামত প্রতিফলিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ওদিকে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলেণ্ডের প্রতিনিধিরা তাঁদের স্ব স্ব দেশের জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত ও তাঁদের কাছে তাঁদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী।

তারপর, এই সাপ্লাই কাউন্সিলের কাজে ভারতের উপকার হোয়েছে কতটুকু? যদি এই সময় যখন বিদেশী মালের আমদানী অনেকাংশে কমেছে—দেশী শিল্পগুলি অপ্রতিহতভাবে উন্নতি করতে পারতো তবে কিছুটা স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নতি হয়তো বা ভারতের হোতো। কিন্তু আগে যে সব মেশিনে এক প্রকার জিনিষ তৈরী হোতো সেগুলি এখন সামরিক জিনিষ উৎপাদন করবার কাজে ব্যবহার করা হোচ্ছে একথা মিঃ হায়দারিই বলেছেন—কাজেই স্থায়ী উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? জরুরী কাজ চালাবার জন্য ভারতের প্রয়োজন। বিশেষতঃ ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সেই এই নীতি গৃহীত হয় যে অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যায়গায় যে সব সমরোপকরণ এখন তৈরী হোচ্ছে সেগুলি ভারতে তৈরী কোরে সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন নেই বরং ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহকারী হিসাবে রাখাটাই বেশী লাভজনক হবে। এরপর ভারতের শিল্পের কতটা উন্নতি লাভের সম্ভাবনা আছে তা অনুমান করা কঠিন নয় কাজেই মিঃ হায়দারি বৃথাই অতটা উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠেছেন।

রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি

রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে কিছু লিখলেই পুনরুক্তি ঘটবে। কারণ বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করে করে পত্রিকাগুলি হয়রাণ হয়েছে, কিন্তু সরকারপক্ষের তাতে কোনই ভাবান্তর হয় নাই। এই হতভাগ্য দেশে জনমতেরও মূল্য নেই, আর সংবাদপত্রেরও কদর নেই। অথচ গণতন্ত্রের ধূয়া ধরে বুরোক্র্যাসী দিব্যি খুশখেয়াল অনুযায়ী যা' তা' করে চলেছে। সেদিন বাংলা সরকার জানিয়েছেন যে সর্তাধীনে বন্দীমুক্তি দেবার অঙ্গীকারকে প্রত্যাহার করা হল। ১৯৩৯ সালের ১৪ই নভেম্বরের বিবৃতিতে ঘোষণা করেছিলেন চল্লিশজন বিশেষ বৈপ্লবিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে যদি তাঁরা নির্দিষ্ট সর্ত মানতে রাজী হন। বিগত প্রায় দুবছর কালের মধ্যে ১০জন বন্দী শর্তাধীন মুক্তি পেয়েছে; আর বাকী আছে ত্রিশ জন। হঠাৎ সরকার কেন এই ত্রিশজনকে শর্তাধীন মুক্তি পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করলেন, তা বোঝা দুষ্কর। শর্তাধীনে মুক্তির নীতি সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু বলছি না। এই রকম মুক্তি স্বীকার করবেন কিনা তা বন্দীদের ব্যক্তিগত রুচি ও মতামতের ওপরে নির্ভর করছে। কিন্তু বাংলাসরকারের এই আকস্মিক মত পরিবর্তনের কারণ কি? কোন নূতন পরিস্থিতির কি উদয় হয়েছে? না, যুদ্ধ পরিচালনা বা efficient prosecution of the war কিংবা public order বা safetyর দাবিতেই এমন

ইহাদের প্রতিক্রিয়া ঘটল ? বাংলা সরকারের মনোবৃত্তির পরিচায়ক অনেক অভূতপূর্ব কীর্তিই এ ক'বছরে মিলেছে। কিন্তু তাঁদের এই অধুনাতম কীর্তিটী সবার চাইতে সেরা। এই মেরুদণ্ডহীন শাসন কর্তাদের কি আত্মসম্মান বলে কিছু নেই ? সমস্ত দেশের নিন্দাভাজন হয়েও পরম নির্বিকার চিত্তে বছরের পর বছর বর্ধিত আয়ুষ্কাল উপভোগ করে চলেছেন এরা। পৃথিবীর ইতিহাসে এর জুড়ি মেলা ভার।

আর একটা কথা। ভাইসরয়ের কার্যপরিষদে নতুন সভ্য নেওয়া হয়েছে। তাতেই দেশে খুশীর কোলাহল উঠেছে কোন কোন মহলে। কিন্তু বাংলা সরকারের এইসব [illegible] অপচেষ্টা যে সকল প্রগতির গলাটিপে মারছে তার কোন প্রতিকার বা প্রতিবাদ কি আগন্তুক পরিষদ-সভ্যরা করবেন ? সার তেজবাহাদুর পর্যন্ত এ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন পুনা সম্মেলনে। যখন ধরপাকড় আর জুলুম অবিচারের মরসুম চলেছে, তখন দেশরক্ষা ও ভবিষ্যৎ সংগঠন ইত্যাদির নামে বড় বড় বুকুনীর কোনই মানে নাই। যাহোক ভারত-পরিষদের ও বড়লাটের কার্যপরিষদের সদস্যরা এবিষয়ে কি কোন কর্তব্য আছে মনে করেন ? যদি করেন, তবে আর অপেক্ষা করবার সময় নাই।

বড়লাটের নূতন পরিষদ

এতদিন পর ভারত সরকার বড় রকম একটা দাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন ভারতকে ! জঙ্গীলাট ছাড়া যেখানে শাসন পরিষদে ৪ জন সরকারী ও ৩ জন বেসরকারী সদস্য ছিলেন—সেখানে একেবারে ৩ জন সরকারী ও ৮ জন বেসরকারী সদস্য গ্রহণ করা হোয়েছে এটাকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ছাড়া আর কি বলা যায়। এই পরিষদে যাদের নেওয়া হোয়েছে তাদের নাম :— (১) সরবরাহ সচিব—স্যার হোরমুসজী মোদী ২। প্রচার সচিব—স্যার আকবর হায়দারী ৩। জনরক্ষা সচিব—মিঃ রাঘবেন্দ্র রাও ৪। শ্রম সচিব—মালিক স্যার ফিরোজ খাঁ নুন ৫। প্রবাসী ভারতীয় বিভাগ – মিঃ এম, এস, আনে ৬। আইন সচিব—স্যার সুলতান আমেদ ৭। মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি সংক্রান্ত।

ঐ নূতন সদস্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হোয়েছে যে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধান বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবীর সঙ্গে এই সম্প্রসারণের কোনো সম্বন্ধ নাই – পরিষদে নেওয়া হোয়েছে ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার জন্যই। দপ্তর বন্টন আরো কৌতূহলের উদ্রেক করে। দেশরক্ষা, অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও যানবাহন ভারতীয়দের দেওয়া হয়নি-বাজে কতকগুলি দপ্তর সৃষ্টি কোরে ভারতীয়দের মধ্যে ভাগ কোরে দেওয়া হোয়েছে। এই পরিষদে যুক্তদায়িত্ব থাক্‌বেনা বা পরিষদ আইন সভার নিকট দায়ীও হবে না।

এই নূতন আজব চীজের জন্মে কোনো শ্রেণীর নেতারাই আনন্দে উচ্ছসিত হোতে পারেন নি। মহাত্মা গান্ধি তো স্মিত হাস্যে জানিয়েছেন তার কিছু বলবার নেই। মিঃ জিন্না, তাঁর

ডিঙ্গিয়ে লীগের সভ্যদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ করাতে, এতদিন বৃটিশের ভেদনীতি আবিষ্কার কোরে সরকারকে বিবৃতি মারফৎ শাসিয়ে দিয়েছেন এবং যারা লীগের মত ব্যতীত সদস্যপদ গ্রহণ কোরেছেন তাঁদের লীগ সদস্যপদচ্যুত করবেন বলে হুমকিও দিয়েছেন। বোম্বের দল-নিরপেক্ষ নেতৃসম্মেলনেও স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু জয়কার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভারতীয়দের যেভাবে দপ্তর বণ্টন করা হোয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ কোরেছেন এবং এদ্বারা ভারতীয়দের যে নূতন কোরে অপমান করা হোয়েছে তাও বলেছেন। কিন্তু এত গবেষণার পর সরকার যে পরিষদটী গঠন করলেন তাতে তাঁদের কাজ সিদ্ধিই হবে, কারণ শেতাঙ্গদের হাতে আগে যেমন সমস্ত ক্ষমতা ছিল এখনো তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

ভারত-রক্ষা কমিটি

স্যার ওয়াভেল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের ১০ জন সদস্য নিয়ে ভারত রক্ষা কমিটি গঠন করেছেন (১) এতদ্বারা ভারতের যুবক সম্প্রদায় যুদ্ধে যোগদান করতে প্রবুদ্ধ হবে (২) এবং ভারতে প্রচুর সমরোকরণ তৈরী হোয়ে বৃটেনের সহযোগে ভারত নিরাপদ হবে। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করবার উপায় দেখে আমরা বিস্মিত হোয়েছি। সার ওয়াভেল দুঃখ করেছেন কংগ্রেস ও লীগ এই সাধু উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করছে না বলে, কেন করছেনা সে সম্বন্ধে কারণ আবিষ্কার করা তাঁর কাজ নয়। যাঁদের সদস্য নিয়েছেন, কোন্ সম্প্রদায়ের উপর তাঁদের প্রভাব আছে জানা যায়নি কাজেই তাদের কমিটিতে নেওয়াতেই ভারতের যুবক সম্প্রদায় দলে দলে অগ্রসর হবে প্রাণ দেবার জন্য, এ আশার কারণ কি আমরা জানিনা। যাহোক, ভারত সচিব আমেরী সাহেব বল্‌ছেন ভারত সম্পর্কে নূতন কিছু করবার নেই—যে সমর প্রচেষ্টা ভারতে চলেছে তাতেই তারা সন্তুষ্ট, তবে আর কথা কি? যুদ্ধ বাঁধিয়েছেন তাঁরা এবং এ যুদ্ধের জন্য কতটা সাহায্য তাঁদের দরকার তাঁরাই ভাল বোঝেন। কিন্তু যুদ্ধ যে ক্রমশঃ পশ্চিম ও পূর্বদিক থেকে ভারতের উপকূলের দিকে অগ্রসর হোচ্ছে তারজন্য ভারতবাসী উৎকণ্ঠিত হোয়ে উঠেছে বৈই কি? কারণ কর্তাভজার দেশ সত্বেও এতবড় ঝড়ের সামনে একেবারে নির্লিপ্ত থাক্‌তে পারছে না ভারতবর্ষ। একজন ভারতীয় আই সি এস্‌কে অতিরিক্ত ডিফেন্স সেক্রেটারী এবং ডিফেন্স এড্‌ভাইসারী কমিটীর সেক্রেটারী করে ভারতবাসীকে ভারতরক্ষা ব্যবস্থায় যথেষ্ট সুযোগ দান করা হোয়েছে বলে ভারতবাসী উচ্ছসিত হোয়ে উঠতে পারছে না। দেখা যাক্ কোন্ দিক্ থেকে কি আসে। প্রস্তুতির বালাই যখন নেই তখন কেবল অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কর্‌বার আছে কি?

পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ

গত জানুয়ারী মাসে নয়া দিল্লীতে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন হোয়েছিল। সেই সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী হিসাব পত্র সংগ্রহ করা হয়—সম্মেলনে পেট্রোল বাঁচাবার ব্যবস্থা অবলম্বনের

জন্য সুপারিশ করা হোয়েছিল। দেশে ১৭৫ হাজার মোটর যান বহন আছে, এগুলির জন্য বার্ষিক ১১ লক্ষ গ্যালন তেল প্রয়োজন হয়। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে পেট্রোল ব্যবহার অনেক কমে যাবে সন্দেহ নাই।

গত ৩১ শে জুলাই ইণ্ডিয়া গেজেটে ভারত গভর্ণমেণ্ট পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কোরে এক আদেশ জারী কোরেছেন। এই আদেশ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কুপন ছাড়া কোন ব্যবসায়ী কারো নিকট পেট্রল বিক্রী কর্‌তে পারবে না। যাতে আগে থেকে পেট্রোল কিনে সঞ্চয় করতে না পারে তার জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বন করবার প্রস্তাব দেওয়া হোয়েছে। এই সম্মেলনের প্রস্তাবানুযায়ী ১৫ই আগষ্ট থেকে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হবে। কলকাতা ও কল্‌কাতার উপকণ্ঠের জন্য রেশনিং অফিসার মিঃ পি, ডি, এল কেলীর নিকট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পরামর্শ পাওয়া যাবে। এই নিয়ন্ত্রণে বিশেষ বিশেষ horse power সম্পন্ন মোটরের জন্য মাসিক পেট্রোলের হার বেঁধে দেওয়া হোয়েছে। স্কুলের বাস, সাধারণ বাস ও অন্যান্য জরুরী কাজর জন্য যে সব যান-বাহন ব্যবহার হবে উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তারা পড়্‌বে না।

ভারতবর্ষ তাহোলে ক্রমশঃ যুদ্ধের আত্ততায় এসে উপস্থিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের শুধু মনে হয় প্রধান ব্যবস্থা না কোরে—দেশরক্ষার জন্য কোনো প্রকার ভারতীয় সহযোগিতা গ্রহণ না কোরে—নিষ্প্রদীপের মহড়া ও পেট্রোল ক্রয় সংঙ্কোচ কর্‌লে হবে কি ?

জমিদারী ব্যবস্থা

১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলা সরকার ভূমিরাজস্ব কমিশন বা ফ্লাউড্ কমিশন নিযুক্ত করেন। ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে কমিশন তার রিপোর্ট দেয়। তারপর মিঃ গার্ণার আই, সি, এস্‌কে এই কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশগুলি পরীক্ষা করবার ভার দেন। ১৯৪০ এর জুলাইতে মিঃ গার্ণার রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে মিঃ গার্ণারের রিপোর্ট প্রকাশ করা বা সে সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের কোন মতামত গঠন করবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে গার্ণার-রিপোর্ট প্রকাশ করা হোয়েছে। ফ্লাউড্ কমিশনের সর্বপ্রধান সুপারিশ ছিল জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা—এর সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রকার মতামত গার্ণার সাহেব করেন নি—তাঁর আর্থিক ফলাফলের দিক্ দিয়ে বিচার করেই তাঁর বক্তব্য তিনি বলেছেন। আর্থিক লাভ করতে হলে হয় প্রজার কর বৃদ্ধি করতে হবে না হয় খুব সামান্য মূল্যে জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব ক্রয় করে নিতে হবে এই দুটীর মধ্যে কোনটীই সহজ মনে হোচ্ছে না—প্রথমতঃ, প্রজার কর বৃদ্ধি সম্ভব নয়; খুব কম মূল্যে জমিদারী ক্রয় করবার ব্যবস্থা করলে বিল পাশ হওয়া মুস্কিল। মিঃ গার্ণার বলেন যদি ১৫ গুণ মূল্য দিয়ে জমিদারী বা মধ্য-সত্ব কিনে নেওয়া হয় তবেই ন্যায়সঙ্গত হয়। কিন্তু এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতির ও গোলমালে পড়বার সম্ভাবনা, কাজেই নির্দিষ্ট অল্প যায়গায় আগে এর ফলাফল দেখা গার্ণার সাহেবের মত।

এবিষয়ে বিরোধীদলের নেতা শরৎবাবুর সহিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শানুযায়ী জমির ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের উচ্ছেদ করার আমরাও সমর্থক।
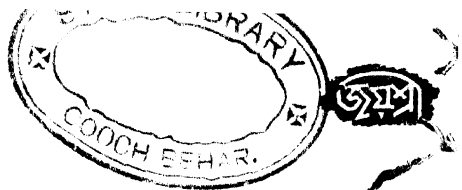
পাটক্রয়-কর বিল কাদের স্বার্থে ?

গত ৩০ শে জুলাই পাট-ক্রয়-বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ১০৩-২৭ ভোটে সিলেক্ট কমিটীতে প্রেরিত হয়েছে। ৮ই আগষ্টের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। কৃষক-প্রজাদলের পক্ষ থেকে সংশোধন প্রস্তাব আনা হয়েছিল, বিলটী সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহ করা হউক। কিন্তু প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। বিলের মর্ম অনুসারে, পাটকলের মালিক এবং রপ্তানী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা প্রতি দুই আনা হারে কাঁচা পাট ক্রয়ের উপরে কর আদায় করা হবে। এতে সরকারের বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা আয় হবে।

বাংলা সরকারের টাকার দরকার, কাজেই বিলটীতে সরকারের স্বার্থ আছে, বোঝাই যাচ্ছে টাকার যে দরকার, তার প্রমাণ দিয়েছেন এক লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করে মিঃ সুরাবর্দি। অর্থ সচিব মিঃ সুরাবর্দি আশ্বাস দিয়েছেন, যে ৫০ লক্ষ টাকা আয় হবে তার প্রায় ৩৬॥ লক্ষ টাকাই পাট-চাষীদের কল্যাণের জন্যই ব্যয় হবে। পাট চাষীদের কল্যাণ মানে হলো পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণ ও কড়াকড়ির ফলে নাকি গত বছর থেকে এ বছরে তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র পাট চাষ করা হয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও কড়াকড়ি বজায় রাখতে হবে, কারণ তা হলেই পাট চাষীর নাকি স্বর্গ সুখ হবে। কাজেই কার্যতঃ পাট ক্রয়-কর থেকে চাষীরই সুখ সুবিধার ব্যবস্থা হবে।

পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বলেছি যে এসব খণ্ড ও আদর্শহীন ব্যবস্থায় আর যারই হৌক চাষীদের লাভ হবে না। দূরদৃষ্টি সহ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কেবল নামকা-ওয়াস্তে যেনতেন কিছু করলে ঢাকঢোল পেটানোর সুবিধা হতে পারে, কিন্তু কোন সুফল হবে না। পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের কোন মানে হয় না যদি নিম্নদর বেঁধে না দেওয়া হয়। নিম্নদর বেঁধেও কিছু লাভ হবে না যদি বিক্রীর ব্যবস্থা না হয়। মিলমালিকদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনার দরকারই সর্বাগ্রে। যতদিন তা'না হবে, ততদিন এসব কৃত্রিম ব্যবস্থার কোন ফলই হবে না। চাষীর সুবিধা না হয়ে মধ্যবর্তী শ্রেণীরই লাভ হবে বেশী। সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় চাষীর আরো হয়েছে বিপদ। অথচ সরকার নিয়ন্ত্রণকে স্থায়ী করে তুলেছেন। তারই জন্য প্রধানত এই পাট-ক্রয় বিলের দরকার হয়েছে।
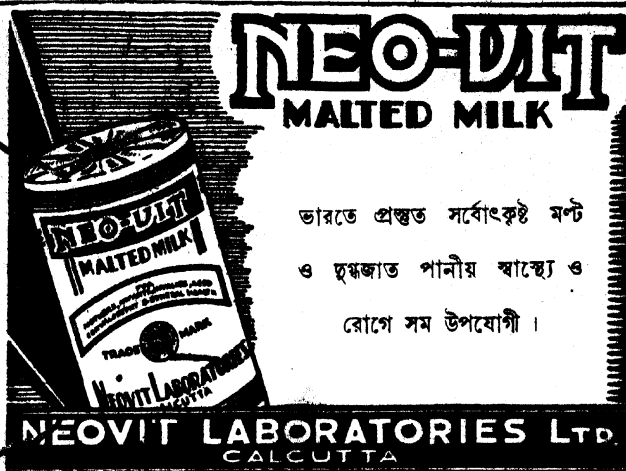
এই পাট-ক্রয় বিলেও চাষীদের যে সুবিধা হবে তার নিশ্চয়তা নেই। মিলমালিকরা করের দুআনা পাটের দামের থেকেই তুলে নেবে। অর্থাৎ চাষীকে বাধ্য করবে দুআনা কম দামে পাট বিক্রী করতে। চাষীর উপায় নেই, তাকে করতেই হবে। কাজেই এ ট্যাক্স আদায় হবে চাষীদের কাছে। তাতে চাষীদের সর্বনাশ হবে ; কারণ একেতো পাটের বাজার নাই, তার ওপরে ট্যাক্স দিতে হবে। এই কারণে কৃষক প্রজাদল চেয়েছিল চাষীদের মত সংগ্রহ করে তার পরে বিলটীর আলোচনা করতে। কিন্তু সরকারের সবুর সয় নাই। আসল কথা হল মিল মালিকদের মনোভাব। তারা যদি বিরুদ্ধতা করে তবে বিলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে সময় লাগবে না। তারপরে আমাদের মন্ত্রীদেরই বা বিশ্বাস কি ? মিলমালিকরা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কখন কি চুক্তিতে বদ্ধ হয় তার ঠিক কি ? কাজেই চাষীদের মত নিয়ে তারপরে বিলের আলোচনা হলে চাষীদের কল্যাণ কী পদ্ধতিতে করা সম্ভব হবে তার নির্ধারণ করা যেত। কিন্তু বাংলা সরকার সে কথা শুনবেন কেন ? চাষীদের হিতসাধনের নামে কতদিন এই অব্যবস্থা ও আদর্শহীন উচ্ছৃঙ্খলতা চলবে ?

ভোরের শীতে

শান্তিনিকেতনের পাশের গ্রাম

শ্রীনন্দলাল বসু

[illegible]

কে,সি,আই,ই,কে,সি,ভি,ও,
কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
এবং
মার্টিন কোম্পানী
দ্বারা পরিচালিত।

ঢাকা অফিস—
৮, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

আসাম অফিস—
শিলং রোড, গৌহাটী।

বিহার অফিস—
লোয়ার রোড, বাঁকিপুর,
পাটনা।

১টী—

ক্ষুদ্রতম ব্যাঙ্ক একাউণ্টের শক্তি অনেক। তার প্রাণ আছে। দিনে রাতে সুদে আসলে সে বেড়েই চলে।. তারপর একদিন সে বিরাট হয়ে উঠে—করে বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার আজ সে অবিচ্ছেদ্য সাথী।

কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান—

বোম্বে মিউচুয়ালে
জীবন বীমা করুন

প্রত্যেক বীমাকারীই এই কোম্পানীর অংশীদার ঃ

আমাদের কোম্পানী অসামরিক জীবন বীমার পলিসিতেও যুদ্ধের দায়ীত্ব গ্রহণ করেন তজ্জন্য অতিরিক্ত হার দিতে হয় না।

বোম্বে মিউচুয়াল
লাইফ য়্যাস্যুরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড
স্থাপিত—১৮৭১
চীফ এজেন্সি—দস্তিদার এণ্ড সন্স,
১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহোৎসবের
দিনে
দুর্গা পূজা! একটা দিনের মতো দিন! সমস্ত বছর আপনি এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করে' থাকেন। এমনি আনন্দময় দিনে আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে আপনার মধুরতর সম্পর্ক গড়ে' উঠুক, আর আপনার বাড়িতে হাস্যকলরবে মুখর নিত্যকার চায়ের মজলিশটি প্রচুর চায়ের পরিবেষণে প্রাণময় হয়ে উঠুক। এরূপ প্রত্যেক স্মরণীয় দিনেই অভ্যাগতদের চা দিয়ে অভ্যর্থনা করুন।
ভারতীয় চা
উৎসবে অতুলনীয়
টি মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IK 150

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জয়শ্রীর কথা

এই কয়েকটী পাতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় দেবার চেষ্টা আমরা করিনি ; তাঁর প্রতিভার পরিচয় এভাবে দেওয়া সম্ভব বলেও আমরা মনে করিনা। এ যুগ যথার্থ রাবীন্দ্রিক যুগ, কাজেই এ যুগকে বুঝতে হোলে এযুগের মানুষকে, একালের উপর সমস্ত দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে স্বীকার করতে হবে। সে একদিনের কাজ নয়। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক স্তরে স্তরে তাঁর সুদুর্লভ প্রতিভার যে ছাপ পড়েছে বহুদিন ধরে তার ঋণ এ জাতিকে স্বীকার ও বহন করতে হবে।

তাঁর প্রতিভার প্রদীপ্ত একাকিত্বের মধ্যেও জাতির সকল সমস্যা ও বেদনা যে তাঁকে গভীর ভাবে স্পর্শ করতো, তাঁর বিরাট ঐশ্বর্যের "মানস ভোজে" জয়শ্রীও যে নিমন্ত্রণ লাভ করেছিল এবং জয়শ্রীর বিশেষ সুরটীকেও যে তিনি গ্রহণ করে মর্যাদা দান করেছিলেন, তার উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায় দীর্ঘ কারাবাসের পর সম্পাদিকার মুক্তিলাভে তাঁর লিখিত চিঠিখানিতে ও জয়শ্রীতে তাঁর প্রেরিত কবিতাগুচ্ছের মধ্যে। সর্বসাধারণকেও আমরা সেই উদার ঐশ্বর্যের ভাগ এই পাতাগুলির মধ্যে দিচ্ছি। তাঁর সার্বভৌমিকত্ব ও বিরাটত্বের এ একটী অত্যাশ্চর্য পরিচয়। তাঁর এ ঋণকে স্বীকার করবে জয়শ্রী একদিনে নয়, তার জাতি-গঠন-সাধনার প্রতি ক্ষণে।

যে সকল লেখক-লেখিকা দয়া করে কবিতা, প্রবন্ধাদি পাঠিয়েছেন, তাঁরা এবং শিল্পী শ্রীহেমেন্দ্র নাথ মজুমদার ও শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেন তাঁদের আঁকা ছবি দিয়ে, এবং গৃহীত ফটোর ব্লক ব্যবহার করতে দিয়ে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীশম্ভু সাহা ও শ্রীসনন্দলাল ঘোষ, আমাদের ও জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। জয়শ্রীর পক্ষ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১। "জয়শ্রী-সম্পাদিকা"

শ্রদ্ধায় স্মরণ

জ্যোতির্ময়ী বসু
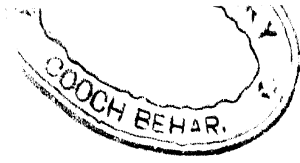
কত শত বৎসরের অনিশ্চিত অপেক্ষার পর তবে একজন মহাপুরুষের সম্ভব হয় পৃথিবীতে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পড়েছি বীর সন্তান লাভের জন্য কত পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কাহিনী, দেখেছি সুসন্তান লাভের আশায় জননীর কত সুদুঃসহ তপস্যার, অতুলনীয় আত্মত্যাগের চিত্র। বীর্য্যবান পুত্রলাভের কামনায় ধরিত্রীর কৃচ্ছ্রতা তার চেয়ে তো কম নয়। এ তো জন্মদান নয়, এযে আবির্ভাব। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন একজন অতিমানব। ভারতবাসীকে শুনিয়ে গিয়েছিলেন অহিংসার মোহন মন্ত্র। তাঁরই নামে সে যুগের আমরা নামকরণ করেছিলাম বৌদ্ধ যুগ।" তারপর কতশত শতাব্দী ধরে ভারতের চিন্তা-ধারা ভারতের কর্মধারা পরিচালিত হয়েছিল তার প্রদর্শিত পথে। এযুগে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এত বেশী যে **"রাবীন্দ্রিক যুগ"** বল্লেই তবে যুগের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। অর্দ্ধ-শতাব্দিরও অধিক কাল ধরে ভারতে যে সভ্যতা অতি দ্রুত ভাবে গড়ে উঠেছে, তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায়। আমাদের জীবনের এমন দিক খুব কম আছে যেখানে তাঁর স্পর্শ লাগেনি। কবি রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ, সমাজ-সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ, রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ, বক্তা রবীন্দ্রনাথ, এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মগুরু রবীন্দ্রনাথ—কতরূপে যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন আমাদের কাছে, বহু শতাব্দী পরে তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আজ আমরা শুধু গর্ব্বের সঙ্গে অনুভব করবো আমরা জন্মেছি রবীন্দ্র যুগে, আমরা পরিপুষ্ট হয়েছি রবীন্দ্র যুগে, আবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে যাবো রবীন্দ্রনাথের যুগে। আমাদের বুদ্ধ নাই, মহাবীর নাই, শঙ্কর, রামানন্দ, কবীর, শ্রীচৈতন্য নাই; রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের অনেকের জীবনে নাই। **কিন্তু আমাদের সকলের জীবনে আজ রবীন্দ্রনাথ আছেন।** বর্ত্তমান ভারত অতীতের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়।

আজ আমাদের চরম দুঃখের দিন, আমরা আমাদের যুগস্রষ্টাকে হারিয়েছি। তবুও বলব যে আমাদের হারাণোর দুঃখ যেমন আছে, তেমনি আমাদের প্রাপ্তির আনন্দও আছে, আমাদের সমৃদ্ধির গর্বও আছে। রবীন্দ্রকাব্যসাগরে শত শত বৎসর ধরে অবগাহন করা চলবে। জগতের ইতিহাসে আবার এমন দুর্দ্দিন হয়তো আসবে, যেদিন এই প্রবাহও হয়তো হয়ে আসবে স্তিমিত। সে দিন আবার ধরিত্রী যোগযুক্তা হবে বীর সন্তান লাভের কঠিন তপস্যায়। আমাদের জীবনে কিন্তু সে দুর্দ্দিন অপেক্ষা করে নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাবসিঞ্চনে আমাদের জীবনে ঘটেছে যে শুভ সঞ্চয় সে আমাদের বহুদূর নিয়ে যাবে।

(১৮ই আগষ্ট শিলং মহিলাসভায় রবীন্দ্র-তর্পণ উপলক্ষে পঠিত।)

র

বী

ন্দ্র

১

সৃষ্টি ও তুলনা

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-সৃষ্টির মত বিরাট কল্পনাকে ধারণ করবার শক্তিও অসীম হওয়া চাই। সে শক্তি আমার নেই। অতএব, তাঁর প্রতিভার যৎসামান্য অংশ নিয়েই আমি আলোচনা করতে পারি তাঁর সম্বন্ধে এই তিন সপ্তাহ যত কথা বলা হয়েছে তার একটি সুর এই যে তিনি বিদেশী সাহিত্যের মধ্যে গ্যেঠে, হি-উ-গো এবং দ্য-ভিঞ্চির সমকক্ষ। ভারতবর্ষের সাহিত্যে তাঁকে ব্যাস বাল্মিকী এবং তুলসীদাসের সমপর্য্যায়ে রাখা হয়েছে। এই রকম বিচারের সার্থকতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই। ঐসব মহাপুরুষদের রচনা সম্বন্ধে আমার পরিচিতি যৎসামান্য। তবে এটুকু জানি

যে পূর্ব্বোক্ত কী স্বদেশী কী বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে হাস্যরসের বালাই ছিল না, অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যের একাধিক অঙ্গ রসিকতায় ঝক্‌মক্ করছে। অবশ্য অ-বাঙ্গালীদের দোষ দেওয়া যায়না, কেননা রসিকতার অনুবাদ হয় না। কিন্তু বাঙ্গালীরা কেন রসিকতার উল্লেখ করে তাঁকে পৃথক স্থানে বসায়না বুঝিনা। গোপালভাঁড়ের রসিকতায় দীক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে কাজটী শক্ত নিশ্চয়। কিন্তু বৈদগ্ধে গর্ব্ববোধও আমাদের কম নয়। তবে কি আমরা রবীন্দ্রসাহিত্য না পড়ে এবং তাঁর কথোপকথন না শুনেই তাঁর জন্যে শোকোচ্ছ্বাস করচি? এক এক সময়, বিশেষতঃ এই কয়দিন মনে হয়েছে যে আমাদের জাতীয় সুনিশ্চিত দুঃখ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে অনিশ্চিত জ্ঞান ও প্রাদেশিক অভিমানের সঙ্গে যুক্ত, এমন কি তার পূরণও বলা যায়। 'চিরকুমার সভা' 'গোড়ায় গলদ' প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক নাটকের কথা ছেড়ে দিচ্চি, তাদের জনপ্রিয়তা নাট্যমঞ্চের আশীর্ব্বাদে। কিন্তু কজন 'পঞ্চভূত' পড়েছেন জানতে ইচ্ছে করে। আমি এমন লোক জানি যারা অন্ততঃ বাধ্য হয়ে প্লেটোর ডায়লগ্‌স্ পড়েছেন কিন্তু পঞ্চভূতের নাম পর্য্যন্ত শোনেন নি। অথচ রস ও জ্ঞানের অদ্ভুত সমাবেশে, রসিকতার দীপ্তি ও ক্ষিপ্রতায়, জীবনসমস্যার প্রাথমিক তত্ত্বের সুবিচারে 'পঞ্চভূত' প্রকৃতই অতুলনীয়।

সেদিন শুনছিলাম যে লিরিক্ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ইয়েট্‌সের সমকক্ষ। লিরিক কবিতার প্রাণ হল সুর, সেই জন্য তাকে গীতধর্ম্মী বলা হয়। ইয়েট্‌স তাঁর একখানি চিঠিতে বলেছেন যে তিনি কথার উপযুক্ত সুর, কিম্বা সুরের উপযোগী কথার অনুসন্ধানে ব্যগ্র। কিন্তু আমি ইয়েট্‌স সংক্রান্ত একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থে পেয়েছি যে ইয়েট্‌স কথা ও সুরের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য মোটেই উপযোগী ছিলেন না। 'Scattering Branches' নামক স্মারক গ্রন্থে আমার বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে। শ'—টেলার নামক একজন বিখ্যাত সঙ্গীত সমালোচকও লিখেছেন, 'His tone-deafness ruled him out as an authority, or even a witness, on the collaboration of the arts. স্বরের পিচ্‌এর মধ্যে ইয়েট্‌স পার্থক্য খুঁজে পেতেন না। তাঁর ধারণায় সঙ্গীতের একমাত্র সমর্থন আবৃত্তিতে। শ'—টেলার এই ধরণের সঙ্কীর্ণতাকে বলেছেন, 'This monstrous circumscription of the composer's creative genius and insight'. ক্লিন্টন্—ব্যাড্‌লে নামক আর একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ইয়েট্‌সের আদেশে কথার জন্য সুর খুঁজেছেন; তাঁর সিদ্ধান্ত এই, "No matter how well they are written, the words of a true song, will always be incomplete words." ইংরাজী কথার বদ্ধ স্বরবর্ণও নাকি কথা ও সুরের প্রকৃত সমন্বয়ের অন্তরায়। যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছেন তাঁরা অন্ততঃ অস্বীকার করতে পারবেন না যে (১) সুর থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের কবিতা আপন অস্তিত্বে গরীয়ান ও (২) বাংলা ভাষার মত হসন্তান্ত বদ্ধস্বরবহুল, ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুক্তাক্ষরপ্রধান ভাষার শব্দকে সুরের রসে ভরে দিয়ে তিনি অন্ততঃ দুটী চারুকলার যোগসাধন করেছেন। এই দিক থেকে এবং আমার মতে এইটাই লিরিক কবিতার প্রধান দিক, রবীন্দ্রনাথ ইয়েট্‌স অপেক্ষা অনেক পূর্ণ এবং বিশুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র যখন আমরা প্রথম দেখতে পেলাম তখন একাধিক রসজ্ঞ ব্যক্তি মন্তব্য করলেন যে তাঁর চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি আধুনিক ফরাসী, ইতালীয় ও জার্ম্মাণ পদ্ধতির অনুকরণ মাত্র। এ ক'দিন 'অনুকরণ' কথাটি কেউ প্রয়োগ করেন নি অবশ্য ; কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের সময় তাঁর 'সৌখীনত্ব', amateurishnessএর উল্লেখ অনেকেই করেছেন। তাঁরা কি ভাবেন আমি ঠিক জানিনা। স্কুলে না পড়লে যদি অ্যামেচার হয় তবে রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও প্রোফেশন্যাল নন, এবং পৃথিবীর একাধিক চিত্রকরের নাম জানা আছে যাঁরা খেয়াল মাফিক ছবি এঁকেছেন। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সে রুসোর বড় খাতির হয়েছিল, তিনি কাষ্টম্‌স অফিসের কেরাণী ছিলেন. এবং লুকিয়ে লুকিয়ে রঙ নষ্ট করতেন। সত্যই তিনি বড় আর্টিষ্ট ছিলেন। বিদেশে যখন রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনী হয় তখন নানা জায়গায় সুখ্যাতি বেরোয়। তার মধ্যে গোটাকয়েক ভাল লেখা আমি পেয়েছি—সেখানে কোথাও বিদেশী প্রভাবের উল্লেখ পাইনি। এবং তুলনার অজুহাতে তাঁর বিশেষত্বের প্রতি অবিচারের চিহ্ন দেখি নি।

'সভ্যতার সংকট' সম্পর্কে বক্তৃতা—১লা বৈশাখ, ১৩৪৮, শান্তিনিকেতন

তুলনামূলক বিচারের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু রাজনীতিতে যেমন এক স্বাধীন দেশের সঙ্গেই অন্য স্বাধীন দেশের বন্ধুত্ব, আদানপ্রদান সম্ভব, তেমনই রবীন্দ্র-সৃষ্টির মূল্যদানে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব-জ্ঞানের ওপরই, অন্যদেশের মহাজনের কৃতিত্বের তুলনা হওয়া উচিত।

রবীন্দ্র

জ্যোতির্মালা দেবী

পরমের শুভ্র ক্রোড় হতে
প্রাণের কপোত
জন্ম-মৃত্যু দুই পথে
ঢেলে যায় চিরন্তন স্রোত।

দুটি-ধারা, হায়.
যাত্রীসম ঘুরে ফিরে যেথা মিশে যায়
কপোতের সুচির পাখায়,
হে, অমর রবি!
অনন্ত রশ্মিতে তব হেরি আজ তারি দীপ্ত ছবি।
সান্ধ্য নভে যাত্রা-সুর—
গোধূলি-তারাটি কাঁদে বিয়োগবিধুর।
বন্ধু, তার উদাত্ত গরিমা
মোর বক্ষে ঝঙ্কারিছে দূরের মহিমা।

অন্তর-উৎপলে
পলে পলে
বিকশি' বিকশি' ওঠে অনন্তপ্রয়াণ
পারাবার-অভিযান।
চিরপ্রিয় কবি মোর,
ব্রহ্মপুত্র সৃজন বিভোর!
বিশ্বসখা সুস্নিগ্ধ তপন!
মৃত্যু আজ মৃত্যু নয়—
তোমার গমন
শুক্লপটে ধরিয়াছে মহা অভিযান
ওই মহানের পথে
কপোতের দুটি পাখা-স্রোতে।

রবীন্দ্রনাথের দেশবাসীর কর্তব্য কি ?

রাধারাণী দেবী

ভারতবর্ষ একদিন সমগ্র পৃথিবীর বন্দনা পেয়েছিল তথাগত বুদ্ধের দেশ বলে। তারপর দু' হাজার বৎসরেরও বেশিকাল পরে ভাগ্যনিপীড়িত ভারতবর্ষ আবার সারা পৃথিবীর সবিস্ময় প্রণতি পেলো রবীন্দ্রনাথের দেশ বলে। এ' সম্বন্ধে চিন্তা করার দিন এসেচে।

রবীন্দ্রনাথ যাকে আশৈশব অন্তরে বাহিরে অতি ঘনিষ্ঠভাবে ভালোবেসে ছিলেন,—সেই তাঁর প্রাণপ্রিয় ধাত্রী ধরিত্রী মায়ের কোল থেকে তিনি আজ চির বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের ক্ষতি অতি বিপুল, আর তার বেদনা দেশকে চরমতম গভীর ও ব্যাপক ভাবে স্পর্শ করেচে। সমগ্র দেশবাসী অসংখ্য ছোট বড় সভাসমিতির অনুষ্ঠান ও নানা রচনাদির মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে তাঁদের বেদনা ও শ্রদ্ধা নানাভাবে অভিব্যক্ত করচেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের ক্ষতি এবং বেদনা যেমনই হোক্‌না কেন, সে-বেদনাকে সে দুঃখকে এবং তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাতর্পণকে—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসীগণ কেবলমাত্র ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে প্রকাশ না করে দৃঢ় কর্তব্যের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত করলে তাঁর স্মৃতির প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধাতর্পণ করা হবে মনে করি।

দেশের যে কোনও জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, মনীষীর লোকান্তর-যাত্রার পর আমরা যে উপায়ে তাঁর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং অন্তরের দুঃখশোক প্রকাশ করে থাকি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিও সেই একই উপায়ে অন্তিম কর্তব্য সমাধা করলে আমাদের কর্তব্যের গুরুতর ত্রুটী ঘটবে। কারন রবীন্দ্রনাথের ঋণ আমাদের পিতৃমাতৃঋণেরও অধিক। আমাদের দেশে এ' সত্য উপলব্ধি করার দিন আজও আসেনি। কিন্তু একদিন আসবেই। সেদিন আমাদেরই উত্তর পুরুষেরা তাদের পূর্বপুরুষদের মূঢ়তায় লজ্জিত নতশির হবে।

যে ঋণ পিতৃমাতৃঋণেরও অধিক, সে ঋণ পরিশোধ সম্ভব নয়; কিন্তু স্বীকৃতি সম্ভব, কৃতজ্ঞতা সম্ভব। তাই জন্যই বলি আর সকল বিশেষ মানুষের মতো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সেই একই উপায়ে—স্বর্গতের প্রতি জীবিত মানুষের কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতা অভিব্যক্ত করলে, সে শুধু নিজেদেরই বিচারশক্তির অভাব আর উপলব্ধি শক্তির স্থূলতা সপ্রমাণ করা হবে মাত্র।

পাথরের মূর্ত্তি গড়ে, ইট কাঠের সৌধ রচনা করে, রাজপথের নামকরণ করে বা সংস্কৃতিমূলক কাজে সামান্য বৃত্তি বন্দোবস্ত করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা নিতান্তই নিরর্থক। এ যেন প্রদীপ্ত সূর্য্যকে বাতির আলো জেলে দেখাবার প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথ বিরাট ছিলেন। তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা, সর্বস্পর্শী অনুভূতি, সর্বাশ্রয়ী সাহিত্যকে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবার জন্য অনাগত কাল তার শত শত শতাব্দী নিয়ে অপেক্ষা করে আছে।

কাজেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং দান সম্বন্ধে এখনই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ না করলেও বেশি ক্ষতি নেই।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মানুষদের 'পরে কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্যভার রয়েচে, সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সময় এসেচে।

রবীন্দ্রনাথের লোকান্তরের পর তাঁর গুণানুরাগীদের কী ভাববার এবং কী করবার আছে? এই চিন্তাটি প্রত্যেক রবীন্দ্রানুরাগীর চিন্তা করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ, এণ্ডুজ ও রামানন্দবাবু

তাহলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনায় যে আদর্শকে রূপ ও প্রাণদান করতে চেয়েছিলেন, যে আদর্শের জন্য তিঁনি রাজপুত্র হয়েও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করেছিলেন, গৃহ, সংসার, আত্মীয়, পরিজন, সমাজ, নিন্দা-স্তুতি কোনও কিছুই তাঁকে বাঁধতে পারেনি, সে কোন্ আদর্শ? সে কী বস্তু?—যার পিছনে তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনা, ভাব-ঐশ্বর্য, পার্থিব ঐশ্বর্য, স্বপ্ন, কল্পনা, আশা, আকাঙ্খা, কর্মশক্তি সমস্ত কিছুই ঢেলে দিয়েছেন। সে ছোটো নয়, সে সামান্য নয়, সে তুচ্ছ করবার নয়।

তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব সংবরণ করে যথার্থ শ্রদ্ধাসহকারে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা লাভ করা এখন দেশবাসীর প্রধান কর্তব্য। বিশ্বভারতী আজও তার পরিণতি প্রাপ্ত হয়নি, মাত্র বীজ রোপণ হয়েচে মাত্র। সে বীজ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন। নিজের জীবন সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপনা করেচেন। এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সম্যক প্রকাশ রয়েচে।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের মানস-লোকের প্রতিচ্ছবি মাত্র। তাঁর মধ্যে যে বিরাট সংস্কৃতি, দেশ কালের পরিধি-উত্তীর্ণ যে মনন-শক্তি ছিল, যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, জ্ঞানচর্চার যে বিশাল দৃশ্য তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল, যে বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শ তাঁর মধ্যে অতি উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছিল, তারই বাস্তবরূপ বিশ্বভারতী। ভারতীয় সংস্কৃতি সমগ্র পৃথিবীর সাথে যুক্ত করবার এবং বিশ্বের সকল ঘরে পৌঁছে দেওয়ার অর্ণবপোত—বিশ্বভারতী।

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে দেশবাসীর কর্তব্য কী?

কেবল মাত্র অর্থ-ভাণ্ডার খুলে অর্থসাহায্য করলেই বিশ্বভারতীর প্রতি কর্তব্য শেষ হবে কিংবা বিশ্বভারতীর অভাব মোচন হবে তা'নয়। বিশ্বভারতীর জন্য চাই ত্যাগ। অর্থেরও চেয়ে অনেক বেশী অভাব বিশ্বভারতীর, ত্যাগের, সেবার। যে-সেবা, যে-ত্যাগ, যে-নিষ্ঠা, যে-আত্মোৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন বিশ্বভারতীর জন্য—তারপর তাঁর পিছনে আর কে এসে দাঁড়ালো ? একমাত্র ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী এই মহামনীষী এই মহাকবি এই মহামানবের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বিরাট ও মহৎ আদর্শকে অন্তরে যথাযথ উপলব্ধি করে। এই আত্মত্যাগী শিল্পীর একনিষ্ঠ সেবা বিশ্বভারতীকে আংশিকভাবে যে সফলতায় মণ্ডিত করে তুলেচে ও তুলচে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অর্থানুকূল্য তার কাছে তুচ্ছ।

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনারত রবীন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষের প্রত্যেক জ্ঞানী গুণী ও শক্তিশালী মানুষ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, বিশ্বভারতীকে রক্ষা করার আবেদন জানাচ্ছেন। বিশ্বভারতীর প্রয়োজন যে তাঁদেরকেই। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ, সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ, রাসায়ণিক, শিল্পী, যন্ত্রী, কর্মী—সর্বতোভাবে না হো'ক্ আংশিকভাবেও বিশ্বভারতীর সহিত নিজেদের যুক্ত করুন। তাঁদের শক্তির, জ্ঞানের, প্রতিভার ও মণীষার সেবাস্পর্শে বিশ্বভারতীকে উজ্জীবিত করে তুলুন।

রবীন্দ্রনাথের জীবন বিশ্বভারতীর আদর্শের মধ্যে নিহিত। এই আদর্শ যদি ভারতবর্ষ বাঁচিয়ে ও বলিষ্ঠ করে তুলতে না পারে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজগৎ থেকে ধীরে ধীরে কালের স্পর্শে অপসৃত হয়ে আসবেন। কেবল মাত্র ভারতবর্ষের মধ্যে বেঁচে থাকা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য বাঁচা নয়। এ'যেন সাত রাজার মহামূল্য ধনভাণ্ডার, মাটীর নিচে সমাহিত থাকার মতোই হবে।

ভারতের সমস্ত প্রদেশের শ্রেষ্ঠ গুণী, জ্ঞানী, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক শিক্ষিত সংস্কৃতিবান্ পুরুষ ও নারীর সামনে—অর্থসঙ্গতিবান্ ধনিজনের সামনে যে-কর্তব্যের আহ্বান অপেক্ষা করছে,—এর ডাকে সাড়া দেওয়ার দিন আজও কি আসেনি ? শুধুই কি মুখের শোকে আর মৌখিক শ্রদ্ধাতেই আমাদের রবীন্দ্রনাথের ঋণের মর্য্যাদা দান হবে ?

রবীন্দ্রনাথের সহিত কয়েকটী দিন

কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ, বি, এস্-সি।

কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ যখন গুরুদেবের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করে আমাকে আহ্বান করলেন, ওখানে থেকে তাঁকে সাহায্য করতে তখন গর্বের সঙ্গে যথেষ্ট ভয় মেশানো ছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মনীষীর চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করবার গুরুতর দায়িত্ব চিকিৎসকের জীবনে আসে খুবই কম। কিন্তু সমস্ত আশঙ্কা ও ভয় চলে গেল যখন সদানন্দময় রহস্যপ্রিয় ভারতীয় ঋষির পাশে এসে দাঁড়ালুম।

৩রা জুলাই (১৯৪১) শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলুম। সেদিন ছিল বাদ্‌লা হঠাৎ সবটা আকাশ কালো হয়ে ঝপ ঝপ করে হল বৃষ্টি সুরু, আবার থেমে গিয়ে রোদ ঝল্‌সে উঠ্‌ল চারদিকে, এমনিভাবে আষাঢ় দিনের লুকোচুরি চলছিল। গাড়ীর ঝাকুনিতে যতটা না অবসন্ন বোধ করেছিলাম তার চাইতে বেশী হোলো বোলপুরের বাদ্‌লায়-ভাঙ্গা তরঙ্গায়িত লাল সুরকীর সামান্য রাস্তাটুকু পার হতে। রাত্রি ৮৷৷০ টায় উদয়নে গুরুদেবের ঘরে গিয়ে হাজির হলুম। খুব অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাঁর মুখচ্ছবি, ক্লান্তি ফুটে উঠেছিল মুখে, কিন্তু বিরক্তির লেশমাত্র ছিলনা, সহজ স্নিগ্ধকণ্ঠে কবিরাজ বিমলানন্দবাবুকে বল্লেন, "দেখ, তোমার ওষুধ ও পথ্য আমি ঠিক নিয়ম করে খাচ্ছি, মন্দ আছি বলে মনে হচ্ছেনা, ওঁরা বল্‌ছেন জ্বরটাও কিছু কমেছে।" আমি ওঁকে প্রণাম করলুম, তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন—কবিরাজ মহাশয় আমার পরিচয় দিয়ে বল্লেন, ইনিই আপনার কাছে সর্বদা থাকবেন, আপনার সমস্ত উপসর্গগুলো ওঁর কাছে বলবেন, উনি প্রয়োজন মত আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন, তিনি সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে বল্লেন "বেশ ভাল"।

এভাবে আমার কাজে আমি বহাল হলুম—প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে গুরুদেবের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কোরে রিপোর্ট লিখে পাঠাতুম। আমার থাকবার ব্যবস্থা হোয়েছিল শ্যামলীতে, উত্তরায়ণের মধ্যেই। প্রতিদিনের আসা যাওয়ায় ও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমার সঙ্কোচ অনেকখানি কমে এসেছিল, সব চাইতে বেশী হয়েছিল গুরুদেবের সহজ ব্যবহারে। এই অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর মানসিক সমতা নষ্ট হয়নি। তাঁর পরমাশ্চর্য জীবনের দৈনন্দিন পরিচয় এ সময় কিছুটা পাই। এই অসুস্থ অবস্থাতেও গুরুদেব আমার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দের খোঁজখবর নিতেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সবাই। ক্রমে শরীরের খুঁটিনাটি খবর নেবার ও ব্যবস্থা দেবার গণ্ডী থেকে আমার প্রবেশাধিকার এসে গেল গুরুদেবের দৈনন্দিন চিন্তাধারা ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে। যে দিন তিনি শুনলেন এককালে বঙ্গীয় সরকারের রোষকবলিত হ'য়ে আমাকে ৫।৬ বৎসর বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছিল, তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন। চোখ কপালে তুলে বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বল্লেন, "তুমিত বড় সাংঘাতিক লোক হে"। তাঁর কণ্ঠে চাপা রহস্যের ভাব, সঙ্গে সঙ্গে একটু উৎফুল্লতারও,—"আমি যদি আগে থেকে জান্‌তুম্ তাহোলে তোমাকে এখানে আস্‌তেই দিতুম না।"

আমি নীরবে হাস্‌ছিলুম এরপর আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন আমি কোথায় কোথায় ছিলুম এবং আমার বন্দীজীবন কিভাবে কেটেছিল। আমার কথা তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিলেন, বল্লেন—"তোমার এ অভিজ্ঞতাগুলো, লিখো তাতে কাজ হবে।"

এ আলোচনার সময় শ্রীযুক্তা রাণী মহলানবীশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হেসে বল্‌লেন, "আপনি বেশ বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছেন, উনি এগুলো লিখুন, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার ওঁকে নিয়ে জেলে পুরুক"। গুরুদেব সহাস্যে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "ক্ষতি কি হে!" মুখে চোখে চাপা রহস্য ফুটে উঠেছে "দুবেলা খাবারটী জুট্‌বে কোন ভাবনা নেই, চিন্তা নেই।" সকলেই সমস্বরে হেসে উঠলুম।

নানা কথায় একদিন ওঁর 'চার অধ্যায়' সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লো। তিনি একটু দুঃখের সঙ্গে বললেন "তোমরা এই বইখানি গ্রহণ করনি"। আমি চুপ করে ছিলুম। তিনি বুঝলেন সেটা স্বীকার করে নিচ্ছি। পরে বল্লেন, "দেখ, আমি কোনদিন তখনকার ঘটনার সংস্পর্শে আসিনি। শুনেছিলুম তখনকার দিনে স্বাদেশিকতার নাম দিয়ে আমাদের দেশের অনেক স্বার্থপর লোক, লোক ঠকাবার ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। দেশের লোক ওঁদের চিনতে না পেরে নানা ভাবে নির্যাতিত হয়েছে। আমার খুব আতঙ্ক হ'ল, বুঝ্‌লাম দেশবাসীকে সতর্ক করে তুলতে হবে।" তাঁর ভাষায় উত্তেজনার আভাষ ফুটে উঠলো। "সেজন্যই আমি ও বইখানা লিখেছিলুম।" আমি বল্লুম, "আপনি যে সমস্ত ঘটনার সমাবেশ সেখানে করেছেন সেগুলো অন্ততঃ কয়েকটী ক্ষেত্রে না ঘটেছে তা নয় কিন্তু আপনার বইতে সেগুলোই বিপ্লবপন্থীদের কর্মপন্থা হিসেবে ফুটে উঠেছে। ওদের কাজগুলোকে ভাল বা মন্দ কিছুই না ব'লে এটুকু বলা চলে, যে সব তরুণ তরুণী এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকের চরিত্রে এমন নিষ্ঠা ও ত্যাগ ছিল যে দেশবাসীর কাছে তার জন্য শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তাঁরা আশা করতে পারেন। আপনার এই বইয়ে তাঁরা নিরাশ হয়েছেন নিশ্চয়ই।" তিনি বললেন, 'আমি সেটা নিশ্চয়ই মানি, আমার বইয়ে সেটা বাদ দিইনি, যদি তোমার মনে থেকে থাকে তা হলে তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। সেদিক থেকে তাঁদের পাওনা আমি দিয়েছি।" আমি সেটা মেনে নিয়ে বললুম, "তবুও সাধারণ পাঠক যাঁরা তাঁদের মনে অন্য দিকের ছাপটাই বড় হ'য়ে ফুটে ওঠে, সেদিকটা অন্ধকারেই থেকে যায়।" তিনি চুপ করে রইলেন। আমি বললুম, "যদি পাশাপাশি অন্য কোনও বইয়ে বিপ্লবী চরিত্রের এ দিকটা আপনি ফুটিয়ে তুলতেন, তা'হলে বোধ হয় কারুর কোন ক্ষোভ থাকত না।" তিনি মৌন হয়ে রইলেন। আমি ব'লে চললুম, "বিশ্ববিদ্যালয়ের কত ছাত্র ছাত্রী তাঁদের পড়াশুনাতে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, স্বেচ্ছায় কত লোক অকথ্য দারিদ্রকে বরণ করেছেন, অশিক্ষিতা কুলবধূ পর্যন্ত স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ীর লাঞ্ছনা সয়ে এঁদের সাহায্য করেছেন। মিছে করে হারিয়ে গেছে বলে নিজেদের যৎ-সামান্য গহনা তাঁদের পলাতক জীবনের সাহায্যে উৎসর্গ করেছেন, এঁদের ইতিহাস কেউ লিখবে না, এঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনও কেউ করবে না।" তিনি মৌন ভঙ্গ করে বললেন, "তুমি আমার 'বদনাম' গল্পটী পড়েছ?" আমি জানালুম

পড়িনি। তিনি বললেন, "আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে সেটা বেরিয়েছে তুমি আজই পড়ে নেবে। এ সম্বন্ধে তোমার মতামত শুনবো।" সেদিন এই পর্যন্তই আলাপ রইল। চিকিৎসা সংক্রান্ত কর্তব্য সেরে "শ্যামলীতে" এলুম। এবং সেইদিনই 'বদনাম' গল্পটী পড়ে রাখলুম।

পরদিন গুরুদেবের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি শুনলেন তাঁর স্বজনরা তাঁর অপারেশন করার সিদ্ধান্ত করেছেন। অস্ত্রোপচারের সম্বন্ধে ওঁর খুব অনিচ্ছা ছিল। তিনি বল্‌লেন, 'আমার যাবার বয়স ত হয়ে এল। কতদিন আর থাকব? একটা উপলক্ষ ক'রে আমাকে ত যেতেই হবে। না হয় এ অসুখটা উপলক্ষ করেই গেলুম। এর জন্য আর অস্ত্রোপচার কেন?' বারান্তরে বলেছিলেন, 'আমার একাশি বৎসর বয়স পর্যান্ত আমার গায়ে একটা ফোঁড়া ও খোস পর্যন্ত হয়নি, শেষ সময় একটা ক্ষত নিয়ে যাব?' ইত্যাদি। কিন্তু যখন সবার মতেই ওঁকে মত দিতে হ'ল, তখন তাঁর অস্বস্তি ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল, সে সঙ্গে কিছুটা উপসর্গও। এসময় তিনি গল্পচ্ছলে একদিন বলেছিলেন, 'আমায় একবার বিছেয় কামড়েছিল, সে কি অসহ্য যন্ত্রণা—প্রলেপ দিলুম, কিছুতেই কমল না। তখন হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল, আর অমনি মনকে দেহ থেকে সরিয়ে নিয়ে এলুম, দেখলুম, রবীন্দ্রনাথ অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে—এর পরই আমার সমস্ত যন্ত্রণা কোথায় চলে গেল—। এবারও (অস্ত্রোপচারের সময়) আমায় এই করতে হবে।"

আর একদিন নিয়মিত হাজিরা দিতে আমি এলুম। গুরুদেবকে জানালুম আমি 'বদনাম' গল্পখানা পড়েছি। তিনি খুব ঔৎসুক্য নিয়ে আমার দিকে তাকালেন, বল্লেন, 'কেমন লাগ্‌ল।' আমি বল্লাম, "খুব ভাল লেগেছে—আমি বিশ্বাস করি এ ধরণের ঘটনা সত্যিই ঘটে থাক্‌বে।" তিনি বল্লেন, আরও অনেকে একথা বলেছেন, 'আপনি যেগুলো কল্পনা থেকে লেখেন, সেগুলো অনেক সময় এমন বাস্তব যে বিশ্বেস হয় না আপনি না দেখে লিখেছেন।' হবেও বা।" তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন, 'আমি একবার স্বদেশীতে খুব মেতেছিলুম। তোমরা জান কিনা জানি না, সে সময় আমি নিজেকে পুরোপুরি ভাবে নিয়োগ করেছিলুম সভা-সমিতি-বক্তৃতাতে। কিন্তু এর পরই আমাকে সরে আস্‌তে হ'ল। তখন দেখেছি নেতৃস্থানীয় লোকদের চরিত্রে কত আবর্জনা জড় হয়ে ছিল। আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপই বল্‌ব। নিজের স্বার্থ নিয়ে এমন বিশ্রী কাড়াকাড়ি। আমার মন হাঁপিয়ে উঠ্‌ল—তারপর থেকে এখানেই এসে পড়েছি—লোকশিক্ষার আদর্শ নিয়ে। আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনই সব চেয়ে বেশী চরিত্র গঠনের জন্য, নৈতিক নিষ্ঠার জন্য।' আমি বল্লুম, "আপনার তখনকার কথা জানি—আপনার নাইটহুড্ প্রত্যাখানের চিঠিখানা আমার খুব ভাল মনে আছে, জাতীয় আন্দোলনে এর প্রভাবও বিস্ময়ের। আপনার 'সভ্যতার সংকট' ও মিস্ রাথবোনের নিকট লেখা চিঠি, এর তুলনা নেই।' তিনি একটু কৌতুক করেই বল্লেন, 'তবুও আমাকে গ্রেপ্তার করেনি কেন বলত?' আমি বল্‌লুম, 'বোধ হয় সাম্‌লাতে পার্‌বে না বলে তাদের মনে হয়েছিল।' তিনি সোৎসাহে বল্লেন, 'ঠিক বলেছ, শুধ্ ভারতবর্ষে নয় সমস্ত পৃথিবীতে এর তুমুল প্রতিবাদ হ'ত।"

ওঁর শারীরিক দুর্বলতার জন্য কোনও সমস্যামূলক আলোচনা তিনি করেন আমরা সেটা পছন্দ করতুম না। যদিও ওঁর কাছে থেকে অনেক কিছু আলোচনা করবার বাসনা দুর্বার হয়ে পড়তো। সুতরাং শুধু মাঝে মাঝে ওঁর প্রফুল্লতম মুহূর্তে তিনি যখন যা বলতেন তাতেই খুসী থাকতুম। এতটুকু প্রবন্ধে সেগুলো লিখে ওঠা সম্ভব নয়। তাই আজ সে লোভ সম্বরণ করলুম। এই কয়েকটী দিনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আলোর মত, সঙ্গে সঙ্গে ওঁর খণ্ড খণ্ড কথা ও পরিহাস, অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মির মত মাধুর্যমণ্ডিত ক্ষণগুলো। শ্রাবন পূর্ণিমার ম্লান চাঁদের আলোতে গঙ্গার তীর থেকে যখন গন্ধপূত নশ্বর দেহাবসানের শ্বেত ধুম্রজাল আবর্ত্তিত হয়ে ছুটেছিল তখনও মনে হয় নাই, যে ভাষা আজ শতাব্দী ধরে সকলের ভাষা জুগিয়েছে, যে কণ্ঠ সবার কণ্ঠে সঙ্গীত এনে দিয়েছে—সে ভাষা, সে কণ্ঠ আজ স্তব্ধ হয়ে গেল কত যুগান্তের জন্য কে জানে।

নাইট্-পদবী বর্জ্জন—বাইশ বছর আগে পাঞ্জাবে যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল তার তীব্র প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ নাইট্ পদবী ত্যাগ করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে লিখিত তাঁর পত্রখানার বিশিষ্ট অংশটী এখানে দেওয়া হলো।

"The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised Governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote.

Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification.

The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons.

দুনিয়ার বাঙালী যুগ

বিনয় সরকার

দুনিয়ায় সুরু হইয়াছে বাঙালী জাতির দিগ্‌বিজয়, বর্তমানে মাত্র এই তথ্যটার দিকে স্বদেশ

সতেছে উন্নতি অবনতির কথা, বাড়তি ঘাটতির

লক্ষণ কি কি, উন্নতি-অবনতির মাপকাঠি কিরূপ,

শ্লেষণ বাঙালী সমাজ-শাস্ত্রীদের অন্যতম গবেষণার

য় নরনারীর উন্নতি-অবনতি, আর বিশেষ করিয়া

সম্বন্ধে পঠন পাঠন, আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদির

ার অনুসন্ধান বাঙালী সমাজশাস্ত্রীদের মহলে মহলে

ধন, বিজ্ঞান, বিদ্যার ক্ষেত্রেও উন্নতিতত্ত্ব বর্তমান

১৯২৬ সনে এইরূপ গবেষণার সূত্রপাত করা

তির পথে বাঙালী" গ্রন্থ (১৯৩৪) উন্নতি-তত্ত্বের

ন্য দিক সম্বন্ধে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের

শ্বাস করি। সামাজিক উন্নতি-তত্ত্বের নানা কথা

য় সমাজ-শাস্ত্র) গ্রন্থে (১৯৩৬) আলোচনা করিয়াছি।

মান লেখক এবং বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের

জয়শ্রী

শারদীয়া সংখ্যা

১৩৪৮

বসিয়াছে। সত্যিই কি তাই? আমরা কি সত্য

লাতে আমাকে যাইতে হইয়াছে। আর অনেক

করিয়াছি। দেখিতেছি মাত্র যে, যশোহর, নদীয়া

। কিন্তু আর সব জেলাতেই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে

তে কান ঝালাপালা হইয়া যাইতেছে। আগেকার

ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারিত। আর এখন অনেক

পাশ করিয়াও বসিয়া আছে। কিন্তু একমাত্র

আর্থিক অবনতির দিকে যাইতেছে? সোজা

বুঝা যাইতেছে একমাত্র যে, লিখিয়ে পড়িয়েদের দল ভারি হইতেছে। কিন্তু মাথা পিছু মধ্যবিত্তের সমাজ কমিয়াছে তাহা বুঝিবার কারণ পাওয়া যায় না। গোটা দেশের সংখ্যা ধরিলে বরং উল্টা বোঝা যায়। মধ্যবিত্তের সুখ স্বচ্ছন্দতা হয় ত বাড়িয়াছে। বঙ্কিম-যুগে মধ্যবিত্ত লোক বলিতে আমরা যাহাদের বুঝিতাম তাহাদের মত এবং তাহাদের চেয়েও ভাল অবস্থার লোক এই পঞ্চাশ বৎসরে ঢের বাড়িয়াছে। একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই যে এত সব কংগ্রেস্, কন্‌ফারেন্স, শিল্প-প্রদর্শনী, আর্থিক সম্মেলন, সাহিত্য সম্মেলন হয়, এতে লাগে টাকা। মধ্যবিত্তের ট্যাঁকে টাকার জোর বাড়িয়াছে। না বাড়িলে এসব পোষাকি জিনিষ গণ্ডায় গণ্ডায় চলিত না। আর এত হাজার হাজার লোক এই সবে মস্‌গুল হইতে পারিত না। অধিকন্তু মধ্যবিত্তের সংখ্যাও খুব বাড়িয়াছে।

বাঙালী আজ কোন অবস্থায় আছে সে কথাটা বুঝিবার জন্য ১৮৩১ সনে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের উক্তিটা তলব করা যাউক। বিলাতের কমিশন তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—"তোমাদের দেশের লোক কি খায়?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "ভদ্রলোকেরা—যাহাদের সংখ্যা খুব কম, তাহারা খায় ভাত, মাছ, তরকারী আর মশলা (ডালের নাম করেন নাই); আর সবাই খায় ভাত আর নুন।" ভাত আর নুন একটা অতিমাত্রায় লম্বা-চৌড়া জীবন যাত্রার উপাদান নয়। ১৮৩১ এর তুলনায় ১৯৪১ এ বাঙালী জাত বড় অবস্থা হইতে ছোট অবস্থায় নামে নাই। যাহা-কিছু পরিবর্তন দেখিতেছি খুঁটিয়া খুঁটিয়া আলোচনা করিলে বুঝিব যে, তাহার মোট কথা ছোট হইতে বড়'য় উঠা। এই সব বিষয়ে বস্তু-নিষ্ঠ আর সংখ্যা-নিষ্ঠ গভীরতর আলোচনা চাই।—বর্তমানে মাত্র ঠারে ঠোরে বলিয়া যাইতেছি। অনেক লোক উন্নতি -অবনতি জরীপ করিবার কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন।

এইবার আর এক তরফ হইতে বাঙালী জাতের জরীপ করিব। বাংলার নরনারীকে ভদ্রলোকের "পাতে দেওয়া" যায় কি না এই প্রশ্নের সমালোচনায় অনেক বাঙ্গালীর উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। এ একটা বড় গবেষণার বস্তু। বাঙালীর প্রভাব "অ-বাঙালী" ভারতীয়ের উপর আর "অ-ভারতীয়" দুনিয়াবাসীর উপর কিছু পড়িয়াছে কি? যদি পড়িয়া থাকে, তবে কবে হইতে, আর কতখানি? যদি কোনো বাঙালী পুরুষ বা স্ত্রী অ-বাঙালীদের কোনো প্রকারে প্রভাবিত করিয়া থাকে, যাহাকে দেখিয়া যাহার কাজ হইতে "অন্য জাতের" লোকেরা বলিয়াছে "হাঁ, একটা মানুষ বটে," তাহা হইলে আমি বলিব সেই বাঙালীটা ভদ্রলোকের "পাতে দেবার" উপযুক্ত সেই বাঙালী "বাপকা বেটা।" অবশ্য বাঙালীর সৃষ্টিশক্তিতে বাংলার নরনারীর, মায় বুনো পাহাড়ী-আদিমদেরও উন্নতি হইয়াছে; একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু বাঙালীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি বা কৃষ্টি পাইয়া বাংলার চৌহদ্দির বাহিরের লোকেরা কতটা লাভবান হইয়াছে তাহাই আলোচনার বস্তু। ইংরেজ জাত এমন অনেক মানুষ দিয়েছে, যাহারা না জন্মিলে ইয়োরামেরিকা আর দুনিয়া গড়িয়া উঠিত না। ফ্রান্স ও জার্মাণীর বহু সন্তান আছে যাহারা পৃথিবীকে এই ভাবে গড়িয়া তুলিতে অনেক সাহায্য করিয়াছে। দুনিয়া এই সব ফরাসী ও জার্মাণের "খাইয়া মানুষ" হইয়াছে। তেমনি এমন কোনো বাঙালী জন্মিয়াছে কি, যে না জন্মিলে অবাঙালী ভারত আর অভারতীয় দুনিয়া দরিদ্র থাকিত? আর জন্মিয়া থাকিলেও কখন্ কখন্? হাজার পাঁচ-ছয় বছর আগে মহেনজোদড়োর যুগে বাঙালী কিরূপ ছিল জানা নাই।—বৈদিক যুগের জানা আছে নামজাদা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা, যেটা বোধহয় প্রায় পৌনে তিন হাজার বছর আগেকার সাহিত্য। কিন্তু তাহা অবাঙালীর সৃষ্টি। বৈদিকযুগে ভারতবর্ষের আদর্শ পাওয়া যাইত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মত গ্রন্থে। বৈদিক সাহিত্যের প্রাণের কথা ছিল দিগ্বিজয়, "অহমস্মি সহমান," "পরাক্রমের মূর্তি আমি, আমার নাম উত্তর বা সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি জেতা, বিশ্বজয়ী, জগৎ আমায় জানে দিগ্‌বিজয়ী বলিয়া" ইত্যাদি।

এই দিগ্‌বিজয়ের চিন্তায় ও কাজে তখনকার বাঙালীর দান কিছু ছিল কি না জানা যায় না। সেই সবের সৃষ্টিকর্তা বোধহয় পাঞ্জাবী বা কনৌজিয়া বামুন বা আর কেহ। তারপর তাদের চেলারা সেই যুগের "বয়স্কাউট" সব দিগবিজয় চালাইতে চালাইতে যখন সদানীরা দরিয়ার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন তারা দেখিল যে, প্রাচ্য ভারতে, বঙ্গবিহারে মানুষ নাই, আছে শুধু জঙ্গল। তাহারা

ফিরিয়া গিয়া গুরুদেবকে বলিল, "ওদেশের লোকেরা সব পক্ষিজাতীয় নর-নারী, ওরা খালি কিচির-মিচির করে"। দেখিতেছি যে, তারপর সেই সকল পশ্চিমা বামুন, ঋষি, পণ্ডিত ইত্যাদি লোক আসিয়াছিল আমাদের গুরু হইয়া। বাঙ্গালী আমরা আর্যামীর অ-আ-ক-খ পাইয়াছি অ-বাঙ্গলীর কাছে। সে যুগে বাঙালীর প্রভাবে অবাঙালী মানুষ হয় নাই। বাঙালীরা মানুষ হইয়াছিল অবাঙালীর খাইয়া।

শাক্য সিংহ নামক বুদ্ধের নাম আমরা নিই বটে, কিন্তু বুদ্ধদেব বাঙালী নন। বাঙালী বাদশা ধর্মপালের প্রভাব? বাংলার বাহিরের আবহাওয়ায় ধর্মপালের নাম হোমিওপ্যাথিক ডোজে ছড়ানো আছে মাত্র। অধিকন্তু ধর্মপাল খাঁটি বাঙালী কিনা সন্দেহ। এই সঙ্গে গবেষণার বস্তু—বাঙালী কাহাকে বলে? আমাদের বিক্রমপুরের অতীশ দীপঙ্করের নাম করিতে পারি। বলিতে চাই যে, বিক্রমপুরের "বাঙাল" বাচ্চা দীপঙ্কর "বাপকা বেটা" বটে। তিব্বতের উপর তাহার প্রভাব জবরদস্ত ও বিস্তর। অতীশ দশম শতাব্দীর লোক। আজও তিব্বতে "বাঙাল" অতীশ বীরের নামডাক জবর।

হিন্দু ছাড়িয়া বাঙালী মুসলমানদের কথা ধরিলেও অবস্থা তথৈবচ। বাংলার মুসলমানরা অবাঙালী মুসলমানদের খাইয়া মানুষ। বাঙালী মুসলমানদের অবাঙালী মুসলমানদের "পাতে দেওয়া" চলিবে না। এই সকল দিকে খোঁজ চলিতে থাকুক।

বাঙালী চৈতন্যদেব বোধহয় "সমগ্র ভারতের" শ্রদ্ধাযোগ্য ব্যক্তি। কম-সে-কম আসাম উড়িষ্যার উপর তাঁহার প্রভাব ছিল ও আছে। অবশ্য তাঁহার সম্প্রদায়ের আদিগুরু ছিলেন দক্ষিণী মধ্বাচার্য। আসল কথা, শেষ পর্যন্ত বোধহয় স্বীকার করিতে বাধ্য যে, রামমোহন রায়ই হইতেছেন প্রথম বাঙালী মানুষ, যাঁহাকে ইজ্জৎ দিয়াছে গোটা ভারতের নরনারী। এত সেদিনের কথা।

বাঙ্গালীরা চিরকাল মুখস্থ করিয়াছে পাঞ্জাবী পাণিনি, কনৌজিয়া বরাহমিহির, মালবীয়া কালিদাস, দক্ষিণী শঙ্করাচার্য ইত্যাদি। কিন্তু অ-বাঙালীরা কেহ কোনো বাঙালীর জিনিষ এমন "নিত্য-নৈমিত্তিকভাবে" গিলিতে চেষ্টা করিয়াছে কি না খোঁজ লইয়া দেখার দরকার। এই সঙ্গে বাঙালীর "নব্য-ন্যায়" কতটা বাঙালীর স্বাধীনসৃষ্টি, তাহা কষিয়া দেখা আবশ্যক হইবে। অধিকন্তু এই নব্য-ন্যায়ের ইজ্জৎ বাংলার বাহিরে কতটা তাহারও পরীক্ষা চাই। বাঙালী সমাজে অবাঙালী দর্শনের যে প্রভাব, বাংলার বাহিরে নব্য-ন্যায়ের প্রভাব ততখানি বা সেই ধরণের কি? বাংলাদেশে প্রচলিত গোটা হিন্দু সংস্কৃতি আর ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের তৈয়ারী সভ্যতা বোধহয় ষোল আনা অ-বাঙালীর সৃষ্টি। রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম "ভারত প্রসিদ্ধ" বাঙ্গালী। বর্তমানযুগে আমরা বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের গৌরব করি। কিন্তু বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরকে কয়টা অবাঙালী চিনে বা চিনিত? অধিকন্তু ইহারা ত একালের লোক, আমাদের সমসাময়িক বলিলেই হয়। তাহাতে বর্তমানে বাঙালীর বাড়্‌তি প্রমাণিত হয়, কিন্তু বাঙালী জাতের পুরাণো কোষ্ঠীটা ইজ্জৎ পায় না।

বিবেকানন্দ প্রথম বাঙালী যার নাম "তামাম দুনিয়া" ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতের ভিতরে ও বাহিরে ১৮৯৩ সনে বিবেকানন্দের হুঙ্কারে সারা দুনিয়ার লোক—সাদা, কালো ও হলদে সকলে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, দক্ষিণ গঙ্গার কিনারায় একটা জাত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাদের কাজ কর্ম না দেখিলে, না জানিলে পৃথিবী দরিদ্র থাকিয়া যাইবে। তারপর হইতেই, বিশেষতঃ ১৯০৫ সনের গৌরবময় স্বদেশী বিপ্লব

হইতে চলিয়াছে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে বঙ্গকৃষ্টির, বঙ্গীয় সংস্কৃতির আর বঙ্গ সন্তানের দিগ্বিজয়। মাত্রাটা অবশ্য অতি ছোট। কুছপরোয়া নাই। কিন্তু বাঙালীর জয়-পরাজয়, আশানৈরাশ্যের কাহিনী জগতের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গসংস্কৃতির প্রভাবে দুনিয়ায় একটা "বাঙালীযুগ" কায়েম হইতেছে।

আজকাল বাঙালীরা নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে যেসব গবেষণা করে, তাহার বৃত্তান্ত ফরাসী মার্কিণ, বিলাতি, জার্মাণ, ইতালীয়ান, জাপানী ও রুশ কাগজে প্রকাশিত ও বিবৃত হইয়া থাকে। তাহা না হইলে বিদেশীরা নিজেদেরকে খানিকটা অসম্পূর্ণ মনে করে। ভারতের নানা কেন্দ্রে সে সব শিল্প-সম্মেলন, সাহিত্য-সম্মেলন, রাষ্ট্র-সম্মেলন, মজুর-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এ সবের বৃত্তান্ত যদি ইয়োরামেরিকায় আর জাপানে পাঠানো যায় তাহা হইলে এই সকল দেশের লোকেরা সে সব গ্রহণ করিবে, প্রকাশ করিবে, পাঠ করিবে, সমালোচনা করিবে। এই সকল ভারত-সংবাদে বাঙালীর গন্ধও কিছু কিছু থাকে তাহা বলা বাহুল্য।

১৯৩৬ সনে সারা দুনিয়া,—ইয়োরামেরিকায়, চীন-জাপানে, আফ্রিকায়, রামকৃষ্ণ শত বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে সময় বাঙালীরা নৈরাশ্যে হাবুডুবু, সেই সময়েই দিকে দিকে একটা নবীন ভারতীয় সাম্রাজ্য ভিত্তি গড়িয়াছে বাঙালী জাতের দৌলতে। অর্থাৎ পাঞ্জাবী বা কনৌজিয়া ঋষিদের "অহমস্মি সহমান" মন্তরটা আজ বাঙালী ঋষিদের রপ্ত হইয়াগিয়াছে। এই বাণী আজ সারা দুনিয়ায় উচ্চারিত হইতেছে বাঙালীর মুখে। অর্থাৎ বাঙালীরা আজ দিগ্‌বিজয়ী। ইহার ভিতর অবাঙালীর দাগও আছে—বলা বাহুল্য। সম্প্রতি কেবল বাঙালীর কথাই বলিতেছি।

এই সব দেশী-বিদেশী বঙ্গ-প্রভাব আজও নেহাৎ সামান্য। এই সবের কিস্মৎ বড় বেশী নয়। তাহা লইয়া লাফালাফি করিবার কিছু নাই। তথাথি যদি আমাকে কেহ বলে বাঙালী মরিতে বসিয়াছে, তাহা হইলে আমি বলিব বিলকুল উল্টা। আমি বলিব যে, আর্থিক ও আত্মিক পথে এতটা উন্নত অবস্থা বাঙালীর কখনও ছিল কি না সন্দেহ। সমাজ-শাস্ত্রীরা সকলেই যাঁহার যেরূপ মর্জি মাপকাঠি লইয়া জরীপ সুরু করুন। এই দিকে অনেকগুলো গবেষণা সুরু হইলে সুখের কথা হইবে।

তবে আমরা উন্নতির বা বাড়্‌তির চূড়ায় গিয়া ঠেকিয়াছি এরূপ বুঝা ভুল হইবে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার অবস্থা এখনও আসে নাই। অবশ্য সে অবস্থা কোনো জাতির পক্ষে কোনোদিন আসে না। বৈদিক ঋষিই আবার বলিয়াছেন "অসতো মা সদগময়" প্রতি মুহূর্তেই নতুন "সৎ" নতুন "জ্যোতি" আর নতুন "অমৃতের" জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, খাটিতে হইবে, সাধনা চালাইতে হইবে। মানুষ যত বড়ই হউক, যত উঁচুই হউক, তাহার পক্ষে স্বাধীনতার, আলোর, উন্নতির চরম বলিয়া কিছু নাই। প্রতি মুহূর্তে নতুন স্বাধীনতার জন্য, নতুন জ্যোতির জন্য, নতুন দিগ্‌বিজয়ের জন্য লড়িতে হইবে। হরেক মুহূর্তেই চাই নয়া ঢঙের নয়া সাধনা অর্থাৎ নায়া-নয়া লড়াই। চাই নব-নব সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা রকমারি স্বর্গীয় অশান্তি।

স্বদেশী যুগে ১৯০৯—১১ সনে কোনো উপলক্ষে বলিয়াছিলাম যে, বাঙালী জাতির রাষ্ট্রিক ইতিহাস নাই। রাজপুত্র, শিখ, মারাঠা, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি জাতির মত বাঙালী জাতি রাষ্ট্রিক কর্মক্ষেত্রে গৌরবপূর্ণ কিছু দেখাইতে পারে না। "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে সেই মতটা খোদা আছে।

তখনও বাংলাদেশে বাঙালী জাতির রাষ্ট্রিক ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু সেই সময়ে গবেষণার সূত্রপাত হয়। বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির প্রতিষ্ঠা ১৯১১—১৯২১ সনে। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী সুধীরা নানা প্রকার গবেষণা চালাইতেছেন। আজ এই সকল গবেষণার ফলে বলিতে বাধ্য যে, সেই পুরাতন মতটা অনেকাংশে ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা আনন্দের কথা। এই পর্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, বাংলার নর-নারীরও রাষ্ট্রিক ইতিহাস আছে। এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলিবে না।

বর্তমানে বলিতেছি অন্য ধরণের কথা। সমস্যা দ্বিবিধ ; প্রথমতঃ, বাঙালী জাতি অ-বাঙালী ভারতীয় নরনারীকে রাষ্ট্রে, শিল্পে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভাবান্বিত করিয়াছে কি না, আর করিয়া থাকিলে কতখানি ? দ্বিতীয়তঃ, অ-ভারতীয় দুনিয়ায় যথা এশিয়ায়, বাঙালীর রাষ্ট্রশক্তি, শিল্পশক্তি, অর্থশক্তি, বিদ্যাশক্তি, কলাশক্তি ইত্যাদি শক্তিসমূহ, এক কথায় বঙ্গ-সংস্কৃতি, প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা, আর করিয়া থাকিলে কতখানি ?

প্রত্নতত্ত্বের অতি ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বলিয়া দিলাম যে, আসাম ও উড়িষ্যায় বঙ্গ সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় কিছু কিছু দেখা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গবেষণা সুরু হইলে আরও অনেক কিছু বাহির হইয়া পড়িবে বিশ্বাস করি। ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সকল জনপদেই হয়ত বঙ্গীয় ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছু কিছু চিহ্ণোৎ রাখিয়া ছাড়িয়াছে। অধিকন্তু, ভারতের বাহিরে, বর্তমানে একমাত্র তিব্বতে, বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরের পথে বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপময় ভারতে সাধিত হইয়াছে কিনা খতাইয়া দেখা আবশ্যক। তাহা ছাড়া ঘরের কোণে ব্রহ্মদেশ। এই জনপদেও বঙ্গপ্রভাব বর্মীয় জীবনের কোনো কোনো বিভাগে হয়তো লক্ষ্য করা সম্ভব। ভারতের বহির্ভূত এশিয়ার কোন্ কোন্ মুল্লুকে "বৃহত্তর বঙ্গ" জারি ছিল তাহার গবেষণা বিশেষ জরুরী। "বৃহত্তর ভারতের" পুষ্টি সাধনে "বৃহত্তর বঙ্গের" হিস্যা কিছু কিছু ছিল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সন, তারিখ সহ অকাট্য প্রমাণের জোরে সেই হিস্যাটা প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এই দুই দিককার কথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বাঙালী জাতির প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বন্ধে বর্তমানে যে সকল মত প্রচার করিতেছি তাহা হয়তো বদ্‌লাইতে পারিব।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীরা ভারতবর্ষের ভিতর কোথায় কবে কতখানি সৃষ্টি শক্তি দেখাইয়াছে তাহার বস্তুনিষ্ঠ খতিয়ান চাই। অধিকন্তু, ভারতের বাহিরে বাঙালী স্রষ্টারা কোন যুগে কতটা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের পরিচয় দিয়াছে তাহারও হিসাব নিকাশ আবশ্যক। এই দুই দিকেই বর্তমানে কিছু কিছু ঠারে-ঠোরে বলা চলে মাত্র। বিষয়টার দিকে কোনো সুনিয়ন্ত্রিত চর্চা অনুষ্ঠিত হইতেছে এরূপ বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙালীজাতি সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণার বেলায় বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন আছে। সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের শরণাপন্ন হইতে হইল। উন্নতি-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আর বিশেষতঃ বাংলার নরনারীর উন্নতি-অবনতি জরীপ করিবার জন্য ঐতিহাসিক মাল মশলার দিকেও নজর ফেলা আবশ্যক। সমাজ-বিজ্ঞানের পক্ষে ইতিহাস-নিরপেক্ষ আর প্রত্নতত্ত্ব-নিরপেক্ষ হওয়া চলিবে না। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বকে কলা দেখাইলে সমাজ শাস্ত্রীদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে।

স্বর্ণের ভবিষ্যৎ

অনাথগোপাল সেন

গত মহাযুদ্ধের অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন; শুধু বেঁচে আছেন নয়, তাঁদের কেহ কেহ বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন। আমরা আদারব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের দরকার না থাকলেও জাহাজ ত আমাদের ছাড়ে না। তার দূরাগত ঢেউয়ের ঠেলাতেই যে আমাদের ব্যাপারীর ডিঙ্গী কাৎ হবার জোগাড়। গতবারের ভুক্তভোগী অনেকেই তাই অনেক কথা চিন্তা করেন ও জিজ্ঞাসা করেন। তাই আজ স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূচনা।

গত লড়াইয়ের পূর্বে জার্মাণ মুদ্রা মার্কের মূল্য ছিল আমাদের টাকার মাপে ৸৵০ আনা; বিলাতী মুদ্রা পাউণ্ড-ষ্টার্লিংএর মাপে এক শিলিং। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হ'বার পর মার্কের মূল্য স্বর্ণহীন হয়ে এমন অভাবনীয় ও বিস্ময়করৰূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে সুরু করল যে ১৲ টাকায় বহু লক্ষ মার্ক কিনতে পারা যেত। অর্থাৎ মার্কের তখন আর কোনো মূল্যই মুদ্রা জগতে প্রায় ছিল না। জার্মাণীতে তখন লোকেরা ১ লক্ষ মার্ক দিয়ে ১ পেয়ালা চা খেত; এটা একটা ঠাট্টার বা তামাসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল—অবশ্য জার্মাণবাসীদের নিকট নয়, বিদেশীদের নিকট। বিদেশীদের অনেকেও জার্মাণ মার্ক নিয়ে ফটকা খেলতে গিয়ে অনেক টাকা খুইয়েছিলেন, আবার কেহ দু'দিনের জন্য বাদশাহী ভোগের অধিকারী হয়েছিলেন। মার্কের দাম যখন পড়তির মুখে তখন অনেকেই রাতারাতি বড়লোক হবার লোভে ২০০।১০০ টাকা, কিংবা সেই পরিমাণ ডলার বা ষ্টার্লিং দিয়ে ২ লক্ষ, ১০ লক্ষ, ২০ লক্ষ, মার্কের মালিক হচ্ছিলেন এবং আমাদের মত অনেক গরীব লোকেও তখন ২।৪ দিনের জন্য লক্ষপতি (মার্কের হিসাবে) হবার সুযোগ ও গৌরব লাভ করেছিলেন। কেউ তখন কল্পনা করতে পারে নি যে মার্কের একেবারে শেষ অবস্থা; সবাই ভাবছিলেন, আমিই সবচেয়ে সস্তায় আজ মার্ক কিনেছি, কাল থেকে মার্কের দর আস্তে আস্তে চড়বে। তারপর, পূর্বের অবস্থায় ফিরে না এলেও তার কাছাকাছি যখন আসবে, তখন আমাদের লক্ষ লক্ষ মার্ক মুদ্রাকে টাকা, ডলার, ষ্টার্লিং বা অন্য কোন মুদ্রায় পুনরায় পরিবর্তিত করে নিয়ে নিজের দেশে লক্ষপতি হয়ে বসব। কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য! দিনের পর দিন মার্কের দর পড়তেই থাকল, আর পূর্বের ক্ষতি খানিকটা পুষিয়ে নিয়ে averageটা একটু ভাল করবার দুরাশায় অনেকেই good money দিয়ে আরো মার্ক কিনতে লাগলেন। অবশেষে একদিন উপস্থিত হ'ল যেদিন জার্মাণ সরকার ঘোষণা করে দিলেন, তাদের মার্ক মুদ্রা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ এই মুদ্রার অস্তিত্বকে জার্মাণী আর স্বীকার করে না, সুতরাং এর দাবী আর তারা মিটাতে পারবে না। The old mark is dead. এই সময়ে মার্কের এমনি দুরবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, ১ পাউণ্ড বা ১৩।১৫ টাকা দিয়ে বিশ কোটী মার্ক কিনতে পারা যেত! সুতরাং আত্মহত্যা ছাড়া তার আর কোনো উপায়ান্তর ছিল না। যারা ২০০৲।৪০০৲ টাকা খরচ

করে লক্ষ লক্ষ জার্মাণ মার্কের অধিপতি হয়েছিলেন তারা যদি কাগজের নোটগুলিও হাতের কাছে পেতেন তাহলে সেগুলিও ওজন দরে বিক্রয় করে খানিকটা সান্ত্বনা লাভের উপায় পর্যন্ত ছিল না; কারণ তখন জার্মাণীতে একলক্ষ মার্ক অপেক্ষা কম মূল্যের নোটই ছাপা হত না! যারা সে সময়ে তাড়াতাড়ি জার্মাণী থেকে পণ্য খরিদ করতে পেরেছিলেন তারা খুব লাভবান হয়েছিলেন। আর লাভবান হয়েছিলেন তারা যারা তখন বিদেশ থেকে জার্মাণীতে গিয়ে থাক্‌তে পেরেছিলেন। অনেক ভারতীয় যুবক সে সময়ে ২০০।৪০০৲ টাকায় লক্ষ লক্ষ মার্ক কিনে নিয়ে জার্মাণীতে শিক্ষা লাভ বা ভ্রমণের জন্য চলে গিয়েছিলেন। তারা তখন মাসিক ৫৲।৭৲ টাকা মাত্র ব্যয় করে সেখানকার সকল রকম খরচ পুষিয়ে শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। যারা একবারে সমস্ত টাকা দিয়ে মার্ক না কিনে, বিলেতের ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখে যেমন যেমন মার্কের দর পড়ছিল, নিজ প্রয়োজন মত তেমন তেমন ২।১ পাউণ্ড মূল্যের মার্ক কিনছিলেন তারা আরো বেশী লাভবান হচ্ছিলেন। জার্মাণ প্রবাসী ভারতীয়দের মিলনস্থল, "হিন্দুস্থান এসোসিয়েস্যান" সে সময়ে দেড় লক্ষ মার্ক দিয়ে বার্লিনে প্রাসাদোপম গৃহ ক্রয় করেছিলো—যা তারা কখনো কল্পনাও করতে পারতেন না। প্রকৃত পক্ষে এর জন্য বোধহয় ৫।১০ পাউণ্ড কিংবা ১০০৲।১৫০৲ টাকার বেশী প্রয়োজন হয়নি! কিন্তু এ সময়ে সস্তায় কেনা সব সম্পত্তি জার্মাণ সরকার পরে বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন।

এই সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ও তাঁর বিশ্বভারতীর কি গুরুতর ক্ষতি হয়েছিল তা' কবিগুরুর নিজ ভাষায় শুনুন: "জার্মাণীতে আমার বই বিক্রি সুরু হয়েছিল প্রবল বেগে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। অবশেষে যখন হিসাব মেটাবার সময় এল তখন মার্কের এমন অধঃপতন হোলো যে তাকে টাকায় পরিণত করতে গেলে এক আঁজলাও ভরে না। সমস্ত আয় জার্মাণীকেই দান করে এলুম। তার মূল্য যদি হ্রাস না হোতো তা' হলে বিশ্ব-ভারতীর জন্যে আজ আমাকে ভিক্ষের ঝুলি বয়ে বেড়াতে হোতো না।*" এর মানে হচ্ছে এই যে যারা পাউণ্ড, ডলার, ফ্র্যাঙ্ক, টাকা প্রভৃতি বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে মার্ক ক্রয় করে জার্মাণীতে বসে তা' ব্যয় করেছেন কিংবা জার্মাণ পণ্য ক্রয় করেছেন, তাঁরা হয়েছেন অত্যন্ত লাভবান আর যাঁরা মার্কের হিসাবে পণ্য বিক্রয় করে সেই মার্ককে টাকা বা অন্য মুদ্রায় পরিণত করে নিজ দেশে তাই আনতে চেয়েছেন তাঁদের ভাগ্যে লক্ষ মার্কের বিনিময়ে এক আঁজলাও মেলেনি।

মুদ্রা সম্পর্কীয় ব্যাপারে যারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তাঁরা হয়ত ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝতে পারছেন না। এরই নাম inflation of currency বা মুদ্রা সম্প্রসারণ। পণ্যের মূল্য স্থির রাখবার জন্য বিক্রয়যোগ্য মোট পণ্যের অনুপাতে মুদ্রার পরিমাণ স্থির রাখতে হয়। তা না করে যদি কোনো দেশের কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালী বা অজ্ঞতাবশতঃ মুদ্রার পরিমাণ অকারণে বাড়িয়ে দেন বা কমিয়ে ফেলেন তাহলে পণ্যের মূল্য যথাক্রমে বাড়বে ও কমবে, প্রকারান্তরে মুদ্রামূল্য কমবে ও বাড়বে। একেই ইংরাজিতে quantity theory of money বলে। এখানে হয়ত অনেকে ভাববেন, টাকা কি ইচ্ছা করলেই বাড়ান যায়? কাগজের নোট বেশী ছাপিয়ে ও "ক্রেডিট" সৃষ্টি করে তা খানিকটা করা যায়। কিন্তু গত লড়াইয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইয়োরোপ ও আমেরিকার মুদ্রা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, কাজের সুবিধার জন্য কাজটা নোট, চেক, হুণ্ডি, যাই বাজারে দেনা পাওনা মেটাবার জন্য চলুক না কেন, এ সকলের পশ্চাতে ছিল স্বর্ণ;

* রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী—প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৮

কারণ পাওনাদার বা বেচনদার চেক বা নোট ইত্যাদির বিনিময়ে স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা চাইলে তার সে দাবী কর্তৃপক্ষকে পূরণ করতেই হবে। অর্থাৎ, সমস্ত বেচাকেনার মূল বাহন, সমস্ত দেনা-পাওনা মেটাবার আসল দালাল হল স্বর্ণ। অনেক সময় তিনি অন্তরালে অবস্থান করে তাঁর উপ-দালালদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নেন মাত্র। কাজেই এই স্বর্ণ দিবার দায়িত্ব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ইচ্ছামত নোট প্রচলন করে টাকার সংখ্যা বাড়িয়ে গভর্ণমেণ্ট নিজের বা দেশের টাকার অভাব পূরণ করতে সাহসী হন না। একটা সুনির্দিষ্ট সীমা রক্ষা করে তাকে নোট ছাপাতে হয় এবং প্রয়োজন মত দাবী মিটাবার জন্য স্বর্ণ তহবিল মজুত রাখতে হয়। এই স্বর্ণমান প্রথার একটা বড় সুবিধা এই যে কোনো গভর্ণমেণ্ট তার অমিতব্যয়িতা বা স্বেচ্ছাচারিতার জন্য নোট প্রচলন দ্বারা অযথা অর্থ সম্প্রসারণ (inflation) করে পণ্য মূল্যের বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বা সর্বসাধারণের অসুবিধা বা ক্ষতি সাধন করতে অনেকটা বাধা পায়। গত লড়াইয়ের সময় যখন যুদ্ধমান দেশ সমূহের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত হল এবং অর্থের প্রয়োজনের আর কোনো সীমা পরিসীমা থাকল না, তখন সকল নীতির সাথে অর্থশাস্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমান নীতিটিও পরিত্যক্ত হয়। কারণ তখন যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থ সৃষ্টির প্রয়োজন। বিদেশের দেনা স্বর্ণে মিটাতেই হবে; বিদেশীরা যুদ্ধের সময় অন্য দেশের কাগজী নোট নিতে অস্বীকার করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু 'প্যাট্রিয়টিজমের' দোহাই দিয়ে দেশের লোকের দ্বারা তখন সবই সহ্য করান সম্ভব। তাই গত যুদ্ধের সময় সকল দেশে inflationএর অবাধলীলা চলেছিল। সেই সময়েই এই দেশে সর্ব প্রথম আমরা ১৲ টাকার কাগজের নোট দেখ্‌তে পাই এবং নোটের বিনিময়ে টাকা চাইলেই পাওয়া যায় এই নীতির ব্যতিক্রমও তখনই ঘটে। এইরূপ সম্প্রসারণ নীতির ফলে আমাদের এদেশে পর্যন্ত টাকার (নোটের) ছড়াছড়িই আমরা দেখেছি! যুদ্ধের সময় লড়াইয়ের সাজ-সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র সরবরাহের সুযোগে কল্পনাতীত ভেজাল ও জোচ্চুরী চালিয়ে কত লোক প্রায় রাতারাতি ফেঁপে উঠেছিলেন এবং খেতাব ও উপাধিভূষিত হয়ে কেউ-কেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সস্তা টাকা কিছু হাতে পেয়ে বাংলাদেশে পর্যন্ত বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর অর্থে ও উদ্যোগে মাথা জাগিয়ে উঠেছিল। অবশ্য জল বুদ্‌বুদের মত কিছুদিন বাদেই প্রায় সবগুলিই মিলিয়েও গিয়েছিল। এই সস্তা টাকার দরুণ পণ্যমূল্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং তার ফলে নির্দিষ্ট বেতনের চাকুরীজীবী ও দরিদ্র সাধারণের অভাব অভিযোগ অনেক বেড়েছিল। কিন্তু কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ—এই প্রবাদবাক্যের স্বার্থকতা ও আমরা বহু লোকের ভাগ্যে দেখতে পেয়েছিলাম।

সেইবার শুধু কাগজের নোট ছাপিয়েই অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি করা হয় নাই। তার উপর সমরঋণের হুল্লোর পড়ে গিয়েছিল। ৩৷৷০, ৪৲, ৪৷৷০, ৫৲, ৫৷৷০, ৬৲ পার্সেণ্ট পর্যন্ত সুদে গভর্ণমেণ্ট পর পর টাকা ধার করে চলেছিলেন। এইরূপ অভূতপূর্ব উচ্চ সুদে গভর্ণমেণ্ট আগে আর কখনো টাকা ধার করেননি। তাই শতাধিক কোটি টাকা ভারতবর্ষের জনসাধারণ ঝুলি ঝেড়ে ধার দিয়েছিল। এই টাকাগুলির একটা অংশ যখন গভর্ণমেণ্ট এই দেশে যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা কাজে ব্যয় করতে বাধ্য হলেন তখন তার ফলেও বাজারে বেশ টাকার প্রাচুর্য উপস্থিত হল। স্বর্ণ ভ্রষ্ট হয়ে যুদ্ধরত প্রত্যেক দেশের অবস্থাই অল্পাধিক এইরূপ হয়ে দাঁড়াল। অন্যদিকে আমেরিকা দূরে দাঁড়িয়ে ইউরোপে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম জুগিয়ে তাদের স্বর্ণ তহবিল নিজের দেশে টানতে লাগলো। কারণ তারা বিদেশ থেকে স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছু গ্রহণ করবেনা। বিদেশীর দেনা স্বর্ণে

মিটাতে গিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ইংলণ্ডের স্বর্ণ তহবিল পর্যন্ত হাল্‌কা হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সকলের নিকট চোর দায়ে ধরা পড়ে, সকলের জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের দাবী মাথায় করে নিয়ে জার্মাণীর কি দশা হল তার পরিচয় ত পূর্বেই খানিকটা দিয়েছি। স্বর্ণ বলতে তার আর বিশেষ কিছু রইল না। অন্য দেশের সঙ্গে তার তফাৎ এই দাঁড়াল যে তারা তাদের অর্থের সম্প্রসারণ একটা সীমার মধ্যে রাখতে পেরেছিলেন, কাগজী নোট প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তারা স্বর্ণও ধার করছিলেন এবং ধার পাচ্ছিলেনও। কিন্তু ৫ বৎসরকাল একা সকলের সাথে লড়তে গিয়ে চারিদিকে আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়ে ভার্সাই সন্ধির চরম শাস্তির বোঝা মাথায় করে জার্মাণীকে সম্পূর্ণ দেউলে হতে হল। তার মুদ্রা স্ফীত হতে হতে একেবারে ফেটে পড়ল। পৃথিবীর মুদ্রা ইতিহাসে এ রকম দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় মেলে না।

যে স্বর্ণমান ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এরূপ প্রসার ও দেনা পাওনা মিটাবার এরূপ সুবিধা লাভ হয়েছিল তাকে যদি বহাল রাখতে হয় তাহলে প্রত্যেক দেশে তার প্রয়োজনানুযায়ী পণ্য সম্পদ বা জিনিষ কেনা বেচা করে তাকে তত বেশী স্বর্ণ দিতে হবে। আমি সম্পদ সৃষ্টি করবার বুদ্ধি ও শক্তি রাখি এবং আমার সম্পদের বিনিময়ে অপরের সম্পদ গ্রহণ করতে চাই; কিন্তু সম্পদ বিনিময়ের সুবিধার জন্য যে স্বর্ণরূপী দালালটি আমরা একদিন সৃষ্টি করেছিলাম তার অভাবে আমার বিরাট শক্তি ও আয়োজন পণ্ড হবে এ কেমন কথা? বিভিন্ন দেশের মধ্যে maldistribution of gold বা স্বর্ণের এরূপ অসমঞ্জস বণ্টনের ফলেই এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। একদিকে পণ্যসম্ভার শিল্পী ও বণিকের কাঁধে ভূতের বোঝার মত চেপে বসে আছে, মানুষের ভোগে তা আসতে পারছে না; অন্যদিকে মানবসমাজের একটা বিরাট অংশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটছে না। একদিকে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, অন্যদিকে অভাবের তাড়না, একদিকে প্রচুর ভোজ্য, অন্যদিকে সংখ্যাতীত বুভুক্ষু। এর কারণ হচ্ছে ২।৪টি ভাগ্যবান দেশ, বিশেষ করে গত যুদ্ধের ফলে, পৃথিবীর স্বর্ণতহবিলের উপর চেপে বসে আছেন, এবং স্বর্ণহীন জগৎবাসীর নিকট স্বর্ণের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয়ের ব্যর্থ ও হাস্যকর প্রয়াস করছেন। যুদ্ধের অস্বাভাবিক তাড়নায় পড়ে যে স্বর্ণমান সকলে ত্যাগ করেছিলেন যুদ্ধের পরে ১৯১৯ ও ১৯২৫ সালের মধ্যে তারা সবাই একে একে স্বর্ণমানে ফিরে এসেছিলেন—নইলে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সব অচল থাকতো। তার ফলে সমস্ত কাগজি মুদ্রা ও অতিরিক্ত অর্থকে বাতিল করে দিতে হয় এবং অকস্মাৎ একদিন যুদ্ধের কল্যাণে অর্থের বাজারে যে জোয়ার দেখা দিয়েছিল, ভাটার টানে সেখানে নিদারুণ নগ্নমূর্তি দেখা দিল। অর্থাৎ যেখানে ছিল inflation of currency সেখানে উপস্থিত হল contraction of currency (অর্থ-সঙ্কোচন)। তা' না করে উপায় ছিল না; কারণ ধন-তন্ত্রবাদের চিরপরিচিত পন্থায় স্বর্ণের মধ্যস্থতা ভিন্ন পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার অন্য কোন উপায় তারা ভাবতে পারে না। অন্ততঃ তখন পর্যন্ত ভাবতে পারেন নি। কিন্তু গত যুদ্ধে যারা মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিলেন তার মধ্যে স্বর্ণমানও অন্যতম। কারণ mal-distribution of goldএর জন্য ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা মূলতঃ দায়ী হলেও এর তীব্রতার জন্য গত লড়াই এবং ভার্সাই সন্ধিই প্রধানতঃ দায়ী। তাই প্রধান প্রধান দেশগুলির সমবেত চেষ্টায় ইয়োরোপে পুনরায় স্বর্ণমানের প্রতিষ্ঠা হলেও, সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইংলণ্ডকেই বিশ্বজোড়া ব্যবসা-মন্দার বিপাকে পড়ে ১৯৩১ সালে আবার স্বর্ণমান পরিত্যাগ করতে হয়। এবং মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা—

এই নীতি অনুসরণ করেন (ফ্রান্স, ইটালী এবং ছোট ছোট কয়েকটি মধ্যইউরোপীয় দেশ ব্যতীত) পৃথিবীর আর সবাই।

এই সময় ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশের স্বর্ণমান ত্যাগের সহিত রুশিয়া বা জার্মাণীর অবস্থার কোনো তুলনাই চলতে পারে না। ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিহার করেছিল পূর্ব হতে অনেকটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে; তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দেশের মধ্যে স্বর্ণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে স্বর্ণের অপচয় বা হস্তান্তর যথাসম্ভব বারণ করা। আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, স্বর্ণভ্রষ্ট মুদ্রার মূল্য হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ করে বিদেশী পণ্যের আমদানী হ্রাস ও দেশী পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি করে বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা এবং বিদেশ হতে স্বর্ণ আহরণ করা। কাজেই দেখা যাচ্ছে এরা বাহ্যত: স্বর্ণ পরিত্যাগ করেন নাই। নিজের দেশের বা সাম্রাজ্যের মধ্যে নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ মুদ্রা দেবার আইনসঙ্গত দায়িত্ব হতেই শুধু এঁরা নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণের ব্যবহার নিজেদের নিয়ন্ত্রণের গণ্ডীর মধ্যে বন্ধ করেন নাই। বরঞ্চ স্বর্ণের প্রতি অতিলোভ ও তার উপর অধিকতর নির্ভরশীলতার জন্যই বিদেশ হতে স্বর্ণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এ পথ অবলম্বন করেছিলেন।

এখানে জার্মাণী ও রুশিয়ার এই সময়কার অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক্। ১৯২৪ সালে জার্মাণীর মার্ক মুদ্রা ফুলতে ফুলতে যখন একেবারে ফেটে পড়ে গতায়ু হল, তখন জার্মাণী নূতন করে ১৯২৫ সালে মার্ক মুদ্রা সৃষ্টি করলো। অর্থাৎ দুনিয়ার দরবারে একান্ত মূল্যহীন ও অপদার্থ পুরাতন মার্ককে বাতিল ও অচল করে দিয়ে হালখাতায় নূতন মার্ক দিয়ে নূতন হিসাব খুল্লো। এই নতুন মার্ক কি স্বর্ণের, না, পূর্বের মত শুধু কাগজের? একেবারে স্বর্ণবিহীন কাগজের মার্ক দিয়ে কাজ চালান তার পক্ষে সম্ভব ছিল না—অন্তত: তখন পর্যন্ত। কারণ তখন লড়াইয়ের পর সব দেশেই পুনঃ স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্তন করেছে। দ্বিতীয়ত: শিল্প প্রধান, বহির্বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ক্রেডিট-বিহীন জার্মাণীকে বিদেশীরা স্বর্ণ ছাড়া মাল বেচবে না। তৃতীয়ত: দেশের লোকের মনে খানিকটা আশা ও আস্থা আনতে হলে, তাদের সম্মুখে তাদের অত্যন্ত চিরপরিচিত স্বর্ণমুদ্রা আবার উপস্থিত করা প্রয়োজন। চতুর্থত: বিদেশের নিকট যুদ্ধের বিরাট দেনা ও দণ্ডের টাকা স্বর্ণ দিয়ে দিতে হবে—তারা জার্মাণীর পণ্যের বিনিময়ে তাকে ঋণমুক্ত করবে না। তাই জার্মাণী তার দেশের রেলওয়ে বাঁধা দিয়ে আমেরিকা থেকে স্বর্ণ ধার করে ১৯২৫ সালে নূতন করে স্বর্ণমার্কের সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। ইংলণ্ড ও সেই সময়ে তাকে শতকরা ৮৲ টাকা সুদে বহু অর্থ ধার দিয়েছিল, যাতে রুশিয়ার 'বোলশেভিজম্' ও ফ্রান্সের বর্ধিত শক্তির বিপক্ষে প্রয়োজন হলে একটা তৃতীয় পক্ষকে দাঁড় করান যায়। এত উচ্চ সুদে টাকা ধার করে দেশের কৃষি ও শিল্পের পুন: প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিসাধন জার্মাণীর মত কর্মকুশল জাতির পক্ষেও বিশেষ সুবিধাজনক হয় নাই এবং তাকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত নানা প্রকার দুর্যোগ ও অন্তর্বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়েই চলতে হয়। সেই সময়ে ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে তখন অন্যান্য দেশের সহিত জার্মাণীও সেই পথ অবলম্বন করে হাফ ছেড়ে বাঁচে। পূর্বেই বলেছি, স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার অর্থ স্বর্ণকে একেবারে পরিত্যাগ করা নয়—প্রত্যেক নোটের বিনিময়ে স্বদেশে স্বর্ণ দিবার আইন-সঙ্গত দায়িত্ব হতে শুধু মুক্তি লাভ করা। যা হোক, শান্তির সময়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ও সম্পদশালী ইংলণ্ডের পক্ষে স্বর্ণমান পরিত্যাগ এবং অন্যান্য দেশকর্তৃক তার পদাঙ্কানুসরণ স্বর্ণমানের ইতিহাসে একটি

অভূতপূর্ব ও স্মরণীয় ঘটনা—যা' ধনতান্ত্রিক যন্ত্র এবং তার বাহন স্বর্ণের ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের পরিষ্কার সূচনা করে।

এই সময়েই জার্মাণীতে হিট্‌লারের আবির্ভাব ও ক্ষমতালাভের সূত্রপাত। অবস্থার দায়ে জার্মাণীকে মুদ্রার জন্য স্বর্ণের আধিপত্য বাধ্য হয়ে স্বীকার কর্তে হলেও রুশিয়াকে তা' কর্তে হয় নাই। কারণ রুশিয়ার ১৯১৯ সালের ঐতিহাসিক বিপ্লবের মূল নীতিই ছিল অর্থ বা স্বর্ণ-বিরোধী। সোস্যালিজম্ প্রতিষ্ঠা করে মুদ্রার সাহায্যে পণ্য বিনিময়ের পরিবর্তে দেশের প্রত্যেক অধিবাসী রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করে পণ্য উৎপাদন করবে এবং নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী উৎপন্ন পণ্য ভোগ করবার অধিকারী হবে, এই ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিন ও তাঁহার সহকর্মীদের উদ্দেশ্য। কাগজের নোট সেখানে নামেমাত্র রাখা হয়েছিল আয়-ব্যয়ের হিসাব ও পণ্যের মূল্য নিরূপণের শুধু একটা মাপকাঠি হিসাবে। রুশিয়া কৃষি প্রধান দেশ ও সর্ববিধ নৈসর্গিক সম্পদের অধিকারী হওয়ার দরুণই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছিল। কারণ বহির্বাণিজ্য শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় যতটা কঠিন, কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ততটা কঠিন নয়। বিদেশ হতে তাকে যে সব কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য আমদানি করতে হত, তার মূল্য সে স্বর্ণ দ্বারা না দিয়ে কৃষিজাত পণ্য দ্বারা পরিশোধ করত। তার দেশের লোককে মজুরিস্বরূপ অর্থ দিয়ে পণ্য উৎপাদন কর্তে হয়নি বলে সে অন্য দেশের তুলনায় সহজেই তার কৃষি-সম্পদ বিদেশে সস্তায় বিক্রি করতে পারত। তাই অর্থ বা স্বর্ণকে একেবারে বাদ দিয়ে যে ব্যবস্থা চালান রুশিয়ার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল জার্মাণীর পক্ষে ইচ্ছা সত্ত্বেও তা' সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া যদিও হিটলার পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করার পর দেশের অনেক বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিজ কর্তৃত্বাধীনে এনেছিলেন, তা'হলেও দেশ হতে রুশিয়ার মত ব্যক্তিগত ধনাধিকার বা শিল্প-প্রচেষ্টার বিলোপ সাধন করেন নি। এই অবস্থাটাকে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মাঝামাঝি একটা অবস্থা বলা যেতে পারে। একদিকে হিটলার দেশের ক্রমবর্ধমান ও শক্তিশালী কম্যুনিষ্টপার্টিকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করলেও কম্যুনিজিমের নীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি। অন্যদিকে আবার দেশের পুঁজিবাদী ও শিল্পপতিদের সকলকে খারিজ করে দিয়ে তাঁদেরও চটান নি। তিনি চেষ্টা করছিলেন, দেশের ধনিক ও শ্রমিক উভয় শ্রেণীকেই হাতে রেখে, জার্মাণ জাতির বিশেষ কৌলীন্য বা আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে দেশের চরম দুরবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দিতে। তাই সর্বসাধারণের নিকট জিনিসটাকে লোভনীয় করে তুলবার জন্য তিনি এই নীতির নাম দিয়েছিলেন জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (National Socialism)

রুশিয়ার আদি ও অকৃত্রিম সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে এর পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ধনতন্ত্রবাদের জুলুমবাজি হতে সমস্ত দুনিয়ার কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ না করে জার্মাণী শুধু নিজের দেশের কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ কর্তে চাচ্ছে। তবে মোটের উপর একথা অস্বীকার করা যায় না যে, race superiorityর মারাত্মক অহমিকাকে বাদ দিলে রুশিয়ার সঙ্গে জার্মাণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায় অনেক বেশী। যেটুকু বৈষম্য ছিল তার মূলে ছিল ভৌগোলিক কারণ। বিশালকায়, প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদশালী রুশিয়ার পক্ষে অন্য দেশের সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ ও আত্ম-সর্বস্ব হয়ে নিজের ঘর সামলানো ও জগতের মুক্তির কথা ভাবা যত সহজসাধ্য ছিল, এই সব অনুকূল অবস্থার অভাবে

জার্মাণীর পক্ষে তা' একেবারেই সম্ভব ছিল না। বৈদিশিক বাণিজ্য ভিন্ন তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব অথচ তার জন্য তার না ছিল ভূমি, না ছিল স্বর্ণ। সমদুঃখী, সমাবস্থাপন্ন কতকগুলি দেশ বা জাতিকে হাত করতে না পারলে, পরস্পরের সুবিধামত নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি দ্বারা পণ্য বিনিময়ের সাহায্যে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো সম্ভব নয়। তাই পুরাতন আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হিটলারের এই ভয়ানক গাত্রদাহ, জার্মাণীর এই ভয়ঙ্কর বর্তমান যুদ্ধ অভিযান, এবং পৃথিবীর স্বর্ণহীন, বিত্তহীন দেশ সমূহের সম্মুখে এই নব-বিধান (new order) প্রতিষ্ঠা সঙ্কল্পের সু-উচ্চ ঘোষণা। কতকগুলি দেশের সঙ্গে পণ্য বিনিময়ের পারস্পরিক চুক্তির সাহায্যেই স্বর্ণহীন জার্মাণী এই নরমেধ যজ্ঞের কল্পনাতীত বিপুল ব্যয়ভার বহন করে যাচ্ছে। সেইজন্যই হিটলার বারবার বড় গলায় বলছে, "labour is my gold" (কর্মক্ষমতাই আমার স্বর্ণ)..."যুদ্ধের ফলাফল আর যাই ঘটুক না কেন, দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে স্বর্ণকে আর ফিরে আসতে হচ্ছে না।" ভবিষ্যতে আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র হতে স্বর্ণকে বিতাড়িত করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আপোষ চুক্তির দ্বারা পণ্য বিনিময়ের সাহায্যে কাজ কর্ম চালানোই হিটলারের উদ্দেশ্য। তাঁর এই অভিলাষ যদি সিদ্ধ হয়, তা' হলে পর্বত-প্রমাণ স্বর্ণ সঞ্চয় করে আমেরিকা আজ যে মধুর স্বপ্ন দেখছে তা অনেকখানি ধূলিসাৎ হবে। অবশ্য চারিদিকের অবস্থা এমন অদ্ভুতভাবে জট পাকিয়ে উঠছে যে তার ভেতর থেকে ভাবীকাল কোন্ রূপ নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করবে তা অনুমান করাও কঠিন। কারণ তর্কের খাতিরে জার্মাণীর জয়লাভ যদি আমরা স্বীকার করেওনি, তা'হলে ভূমি ও স্বর্ণ লাভের রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হবার পর সে যে তার দুর্দিনের সঙ্কল্প ও প্রতিশ্রুতি পালন করবে তার নিশ্চয়তা কি? অন্যদিকে জার্মাণীর পরাজয় ঘটলেও বর্তমান এংলো-আমেরিকান মৈত্রীর মধ্যে ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ ও নূতন সঙ্কটের বীজ যে এই সময়েই রোপিত হচ্ছে না তাই বা কে জানে? কারণ এই জীবন-মরণ লড়াইয়ে জয়লাভের জন্য ইংলণ্ডকে যে কল্পনাতীত মূল্য দিতে হচ্ছে তার অনেকখানিই যাচ্ছে আমেরিকার বিরাট জঠরে। সুতরাং, এই যুদ্ধ ইংলণ্ডের অনুকূলে নিষ্পত্তি হলেও সারা ইউরোপে আবার যে অভিশপ্ত হাহাকারের সৃষ্টি হবে তা' নির্বাপিত করবার দায়িত্ব তখন পড়বে একমাত্র আমেরিকার উপর। আমেরিকা যদি তখন স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে তার স্বর্ণ-পাহাড়ের একটা বড় অংশ দান বা ঋণ হিসাবে প্রত্যর্পণ না করে, তা'হলে তাকে সম্পূর্ণ একঘরে হয়ে যক্ষের মত নিষ্ফল স্বর্ণসিন্দুক পাহারা দিতে হবে। বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যকেও সে তখন দলে টানতে পারবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং যুদ্ধে জার্মাণীর জয় (যা কখনো সম্ভব নয়) বা পরাজয় যাই হোক, নিকট ভবিষ্যতে আর্থিক জগতে স্বর্ণের প্রভুত্ব ও মহিমা আরো অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা। স্বর্ণমান ত গত যুদ্ধের ফলে পূর্বেই মরেছে, এখন এই যুদ্ধের পর স্বর্ণ বাঁচলে হয়।

গত যুদ্ধে মুদ্রা-সম্প্রসারণ নীতির কথা দিয়ে প্রবন্ধ সুরু করা গিয়েছিল। এবারকার যুদ্ধে সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা চলছে তৎসম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করছি। গতবারের অত্যধিক অর্থ-সম্প্রসারণ নীতির কুফল পরবর্তী কালে এমন একটা ভয়াবহ বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-মন্দার সৃষ্টি করেছিল যার স্মৃতি আজও এমন সুস্পষ্ট রয়েছে যে সকল দেশই তাই এবার আর্থিক ব্যাপারে অতি সন্তর্পণে কাজ করছে। অবশ্য যুদ্ধের অতিরিক্ত খরচের দাবী মেটাবার জন্য মুদ্রা সম্প্রসারণকে একেবারে বাদ দিয়ে কেউ চলতে পারছে না বটে; কিন্তু তাকে যথাসাধ্য সীমার মধ্যে রাখতে সবাই চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষে গতবারের মত এবারও

১৲ টাকার নোট চলছে সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্য মুদ্রা, অন্ততঃ এখন পর্যন্ত, একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে নি। তা' ছাড়া গতবার ক্রমান্বয়ে উচ্চতর সুদে গবর্ণমেণ্টের তরফ হতে ঋণ গ্রহণ করে টাকা তুলবার যে হিড়িক পড়ে গিয়েছিল সে পন্থা এবার যথাসম্ভব পরিহার করে চলা হচ্ছে। 'ডিফেন্স বণ্ডে' টাকা ধার দেবার জন্য সর্বসাধারণের নিকট যে আবেদন উপস্থিত করা হচ্ছে তার সুদ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করা হয় নি। এভাবে মুদ্রা-সম্প্রসারণকে যথাসম্ভব দমিয়ে রেখে এবার গতবারের মত জনসাধারণের পক্ষে সস্তা অতিরিক্ত অর্থোপায়ের পথ যেমন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে যুদ্ধের দরুণ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা ও ব্যবসাদারদের 'প্রফিটিয়ারিং' প্রবৃত্তিকে এবার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হতে কড়া ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা প্রথমাবধি চলছে—যদিও সে চেষ্টা সর্বতোভাবে সর্বক্ষেত্রে সফলকাম হয় নি। যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য ধনী ও সর্বসাধারণের উপর নূতন নূতন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর (tax) ধার্য করে অর্থের সংস্থান করবার চেষ্টাই এবার প্রধানতঃ চলছে। ঋণ না করে অতিরিক্ত ট্যাক্সের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহের একটা সুবিধা এই যে, ঋণের সুদ চলতে থাকে এবং জনসাধারণকে দীর্ঘকাল তার জের টানতে হয়। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ উচ্চতর সুদে টাকা ধার কর্তে সুরু করলে ব্যবসাক্ষেত্রে ও টাকার বাজারে একটা ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাই গতবারের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। আমাদের পক্ষে সেটা অনেকটা মন্দের ভাল বলতে হবে।

পুলকেশ দে সরকার

নিউ থিয়েটার্সের "পরিচয়" ছবিতে একটা দৃশ্য আছে। "আনন্দ বাজার পত্রিকার" রোটারী চল্‌ছে আর তারপরেই তাকে উঠ্‌ছে মোটা মোটা বাঁধান সাহিত্য। ছবির পরিচালনা হিসাবে দৃশ্যটা অচল, কাহিনীটাও সাইগলের চেহারার মত ডাল্‌। কিন্তু ওতে একটা সত্য ঐ ভুলের ফাঁক দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। একথা সত্য, সাহিত্য না হোক্‌ সাহিত্যের বাহন যে ভাষা—বাংলাভাষা—তা' আনন্দবাজার পত্রিকার রোটারীতেই জন্মাচ্ছে। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতি বিশেষ মোহবশতঃ যে একথা বল্‌ছি তা' নয়। আনন্দ-বাজার পত্রিকাকে আমি বাংলা দৈনিকের প্রতীক ব'লে ধরছি; প্রতিষ্ঠান ও প্রচারের দিক থেকে এ কাগজটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম। তবুও আমার মূল বক্তব্য হ'চ্ছে দৈনিকের ভাষার। এ ভাষা সম্পাদকীয়েও বিশেষভাবে পাওয়া যাবে না; তা আজও প্রাচীন-পন্থী। অবশ্য এর একমাত্র ব্যতিক্রম "কৃষক"—এর সম্পাদকীয় ভাষাও চিরাচরিত রীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

ভাষা সৃষ্টি সেখানে নয়। সংবাদের পাতায় সে ভাষার খোঁজ মিল্‌বে। যেখানে আছে ব্লিৎসক্রিগ প্যাঞ্জার, কনভয়, ইন্‌সেন্‌-ডায়ারী বোমা! যেখানে জাপানী অ্যাসেট ফ্রিজ করে, যেখানে মবিলিজেসান হয়, মিলিটারী অব্‌জেক্‌টিভসের ওপর ডিরেক্ট হিট্‌ হয়।

সাহিত্যিকদের এ বালাই নেই; এ ভাবচুরি বা ছায়াবলম্বনের কাজ নয় বা যেখানে ইংরিজীটা ভাল লাগে তা লাগিয়ে দিয়ে খালাস হওয়া নয়। এখানে প্যারাসুট আছে, প্যারাসট আছে, প্যারাট্রুপ্‌সের তো কথাই নেই। মার্কিনের লিজ অ্যাণ্ড লেণ্ড আইন, ইংরেজের স্টার্লিং এরিয়া আছে, এক্সিস আছে, এক্সিস ড্রাইভ আছে। সাহিত্যিকদের এসব দৈনন্দিন বালাই নেই।

আর কারও যে আছে তাই বা বলি কি করে? মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন ক'রতে হবে তাই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন একটা খেলা হ'য়ে গেল। শিক্ষার নামে এতবড় একটা বিরাট ফাঁকি যে হ'তে পারে পরিভাষা 'খেলার' আগে সে ধারণা আমাদের ছিল না; আর তেমনি ধরা পড়েছে অধ্যাপকদের বিপুল অজ্ঞতা। ইংরিজী শিক্ষায় তাঁরা এতই পেকে গেছেন যে বাংলা পরিভাষা তাঁদের দিয়ে অসম্ভব। হ'য়েছে ও তাই। যিনি বা যাঁরা দু'টো চারটে সংস্কৃত শব্দ জানেন তা উজাড় ক'রে দিয়েই সরে পড়েছেন। অর্থনীতি থেকে সুরু ক'রে শুক্রনীতি পর্যন্ত আপনি যাই কেন লিখ্তে যান না ওঁদের পরিভাষার তালিকা আপনাকে এতটুকু সাহায্য ক'রবে না। আপনি যে শব্দটি খুঁজবেন, দেখ্বেন ঠিক সেইটিই চতুর অধ্যাপকেরা এড়িয়ে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবেত চেষ্টা দূরে থাক্, যিনি ইকনমিক্সের প্রফেসার, তাঁর কাছে ধর্না দিয়ে পড়লে তিনি বড় জোর একটা ইংরিজী প্রবন্ধ দিতে পারেন কিন্তু বাংলায় অর্থনীতি সম্বন্ধে লিখ্তে বল্লে তাঁর সময়ের নিতান্ত অভাব হবে। যিনি রাজনীতি পড়ান—অত কেন, যিনি আইন পড়ান তাঁকে বলুন তো আগাগোড়া বাংলা পরিভাষায় একটা মামলার বিবরণ লিখে দিতে। জীবতত্ত্ব, প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞানের তো কথাই নেই। কাজেই অধ্যাপক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা থাক্। অথচ, চেষ্টা করলে তাঁরাই পারতেন; অবসরও প্রচুর—দর্মাহাও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু তাঁরা করবেন না।

করবেন না তার কারণ কমপ্লেক্স=মানসকুট। শিক্ষিত বল্তে আমরা বুঝি ইংরিজী শিক্ষিত এবং বাংলা থেকে সর্বত্র ইংরিজীকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি—সেই মানসকুট। যিনি বাংলায় প্রবন্ধ লিখতে পারেন তিনি বেশ লেখেন; কিন্তু যিনি ইংরিজীতে লিখ্তে পারেন তিনি একেবারে 'আহা বেশ!' বাংলা প্রবন্ধ লেখার অক্ষমতাকে আমরা এভাবে চেপে যাই। কিন্তু ইংরিজীটা কে বেশী জানে তার প্রমাণ হয় তখন যখন কোন একটা ভাল ইংরিজীর প্রবন্ধ অনুবাদ ক'রতে হয়। যাকে অনুবাদ করতে হয় তাকে ইংরিজীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, ধরণ পরিপূর্ণভাবে জান্তে হয়—আর জান্তে হয় পরিপূর্ণরূপে বাংলা। বাংলা দৈনিকের বাংলানবিশীরা বা উপেক্ষিত অনুবাদকেরা ইংরিজী দৈনিকের ইংরিজী নবিশদের চাইতে দ্বিগুণ কৃতিত্ব দাবী ক'রতে পারে। তাদের ইংরিজীও জান্তে হয়, বাংলা ও জান্তে হয় এবং অল্প জান্লে চলে না, ভাল ভাবেই জান্তে হয়। কিন্তু মজা এই ঐ মানসকুটের দরুণ আমরা এই সত্যটা ভুলে যাওয়াকেই গর্ব ও গৌরবের কারণ মনে করি। তাই একই কোম্পানীর বাংলা অনুবাদকের মাইনে যদি ধরি অতি কষ্টে ত্রিশ—তো ইংরিজী নবিশের মাইনে অতি সহজে ধরি পঞ্চাশ।

ইংরিজী ও বাংলা দৈনিকের সাব্এডিটারদের কাজের তুলনা ক'রলেই জিনিষটা আরও লজ্জাকর হবে। ইংরিজী সাব্এডিটার ইংরিজী সংবাদটাকে অনায়াসে প্রেসে পাঠিয়ে দিতে পারে; বাংলানবিশ পারে না—তাকে অনুবাদ ক'রতে হবে। ইংরিজী নবিশকে ফরাশী বা জাপানী উচ্চারণ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, প্যাঙ্গার হবে, না প্যান্ৎসার হবে ভাব্তে হবে না বা ইংরিজীর গঠন কৌশল নিয়ে চুল ছিঁড়্তেও হবে না। জার্মাণ ভন না ফন, ফরাসী গ্যামেলিন না গামেলাঁ, রুশীয় Pskov, পাস্কভ না স্কোভ, জাপানী টোয়োডো না টোজোদো, নিচি-নিচি সিমবুম না বাম, রুজভেল্টের "ফায়ার-সাইড চ্যাটটা" কি, চীনদেশের ওয়াং উই, মিশরের সাদিদল, ইরাকের বেইরুট না বিরাট, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। ভাবতে হয় না, ব্যাটলসিপ, ওয়ারশিপ, ফ্লিটে কোন তফাৎ আছে কি না। বাংলানবিশ তখন একাধারে চাক্রী আর

বাংলাভাষার নিকুচি করছে। অনেক কেঁদে ফুঁপিয়ে যাহোক একটা অবোধ্য কিছু দাঁড়াল—এবার তার হেডিং ; ইংরিজীনবিশ সংবাদ থেকেই দু'টো ভাল শব্দ শীর্ষে তুলে দিয়ে ছুটী পেতে পারে, বাংলানবিশ সে ভাগ্য করে নি।

ওদিকে হুড়্‌হুড়্‌ ক'রে রোটারী চলছে ; টক্‌টক্‌ লাইনো চলছে ; কপি চাই ব'লে প্রিন্টারের তাগিদ আসছে। স্পীড্‌ স্পীড্‌! বাংলানবিশের ঘিলু বেরিয়ে আসতে চায়। এরই মধ্যে আসছে টেলি-প্রিন্টারের লাভাপ্রবাহ : During the night of August 5th our troops continued fighting in the directions of kholm, Smolensk, Belaya-Tserkov and in the Estonian sector of the front. In other directions and sectors of the front no major operations took place. In the Baltic sea our submarine sank an enemy transport with troops and munitions. Our air force continued to strike at enemy mechanised units and his infantry and artillery and against enemy aircraft on their aerodromes.

প্রিন্টার তাগিদ দিচ্ছে 'স্পীড্‌ স্পীড্‌' ভাব্‌বার সময় নেই।

এবার বঙ্গানুবাদ : troops সৈন্য বা সৈন্যবাহিনী directions দিকে (?) ; তারপরে নামোচ্চারণ Belaya-Tserkov যার যা খুসি লিখুন। Estonian sector of the front ; front কি রণাঙ্গন? যেখানে বিমান যুদ্ধ হ'চ্ছে সেটা কি তবে রণাকাশ? ভাব্‌বার সময় নেই, directions and sectors of the front রণাঙ্গনের অন্যান্য দিকে ও ভাগে ; submarine সাবমেরিন ; enemy transport with troops শত্রুপক্ষীয় সৈন্যবাহী জাহাজ কিন্তু troops না থাকলে? শুধু transport? তাতো নয় transport with troops and munitions—munition = গোলাবারুদ = সৈন্য ও গোলা বারুদ সহ কি? জাহাজ? মালবাহী না যাত্রীবাহী—ship নয়, steamer নয়, barge নয়, স্রেফ transport. যাক্‌গে চুলোয় our air force আমাদের বিমান বাহিনী বা বহর continued to strike (এখন লেখা চল্‌বে না) at enemy mechanised units and his infantry and artillery and against enemy aircraft on their aerodromes = শত্রু-পক্ষীয় যান্ত্রিক units? বাহিনী নয় সৈন্য নয়, দল নয়, অংশ নয়, unit = ইউনিট কিন্তু যান্ত্রিকটাই বা কি—যাক্‌গে যান্ত্রিক বাহিনী, পদাতিক বাহিনী ও কামান বাহিনী এবং শত্রু-পক্ষীয় বিমান ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। aerodrome আর airbase এ তফাৎ কি? আমাদের কাছে ও দু'টোই বিমান ঘাঁটি অথচ ও দু'টো এক কথা নয়, এক ব্যাপারও নয়।

এর পর Red army units লালফৌজ বাহিনী (?) inflicted heavy losses on the German 16th motorised division operating—division কে আর বাহিনী করা চলে না, ডিভিসানই রাখ্‌তে হবে, ডিভিসান সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই—কি ক'রে থাক্‌বে বলুন? যাত্রাগানের যুদ্ধ ছাড়া যারা যুদ্ধ দেখ্‌ল না তারা এসব কি বুঝ্‌বে বলুন—অনুবাদকই বা কি বোঝাবে? তবে থাক্ ডিভিসান, অক্ষৌহিনীর ব্যাপার নয় যে মহাভারত থেকে চমূ, অনিকিনী এসব বসিয়ে দেব। ১৬ নং নয়, ষোড়শ ডিভিসান = operating যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু operation মানেই যুদ্ধ নয়। তেমনি enemy activity = শত্রুপক্ষীয় কমতৎপরতা কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে active হ'লে? অথবা ধরুন patrol activity.

আসুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। Front কে রণাঙ্গন আর Battlefield কে যুদ্ধক্ষেত্র করা যাক্; attack এর নামে আক্রমণ চালাই আর raid এর নামে হানা দি; কিন্তু যেখানে raided থাকে সেখানে আর হানা দেওয়া সম্ভব নয় আক্রান্তই হ'তে হয়। মুখে এরোপ্লেন বল্‌লেও লিখ্‌তে হবে বিমান, কেননা দৈনিকে ওটাই চালু। তাই বিমান হানা দিলে anti-aircraft কে বিমান-ধ্বংসী কামান ক'রতে হবে। যদি পারেন destroy মারফৎ ওদের ধ্বংস করুন না হয় brought down কে পাতিত করুন। চোখ বুঁজে ভূপাতিত করা মুস্কিল, কেন না অনেকগুলো জল-পাতিতও হয়; অতএব যে পতিত তাকে পাতিত করাই ভাল, ল্যাঠা চুকে যায়। Planes, aircraft = সবই বিমান। কিন্তু seaplane কি, সামুদ্রিক বিমান

আসুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি

নিশ্চয়ই নয়, অতএব Seaplane সিপ্লেনই। Fighter = জঙ্গী বিমান, Bomber = বোমারু বিমান, Dive-bomber? বাজ-বোমারু? waves of planes = বিমানের ঢেউ অসম্ভব, বিমানের ঝাঁক কিন্তু groups of planes? সেও তো ঝাঁক। এরা চায় mass attack ক'র্‌তে, তার মানে কি সমবেত ভাবে না যূথবদ্ধভাবে? না, একযোগে? তাহ'লে individual planes কি বলুব? বিচ্ছিন্ন, ছত্রভঙ্গ, একক? বিক্ষিপ্ত। একটারও মানে হয় না। Break through—ফাঁকতালে যাবার উপায় নেই; বাধা উপেক্ষা ক'রে যেতে পারেন, কাটিয়ে ও যেতে পারেন। কিন্তু দেখ্‌বেন Balloon barage আছে, Night fighter এর নৈশ জঙ্গীবিমান আছে। ওরা সব military objectives এ যে সামরিক লক্ষ্য বস্তু আছে তাতে direct hit ক'রে সরাসরি বোমা ফেলছে। ফলে civilian বে-সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে casualty = হতাহত? কিন্তু কেবল আহত
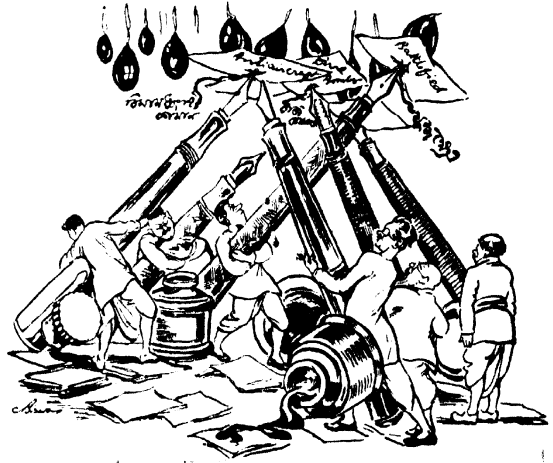
অবস্থাও তো casualty, ম'র্‌তে হবে কেন? উপায় নেই। সে কি যে সে বোমা? তারা সব incendiary = আগ্নেয় বোমা আর high explosive = অতি বিস্ফোরক বোমা। Time bomb, delayed bomb এর কথা আজকাল আর শোনা যায় না—বাঁচা গেছে। কিন্তু মরেছি A. R. P. আর ফায়ার ব্রিগেড নিয়ে; আজকাল আবার passive defence corps দেখা দিচ্ছে; যদি বলি বিমান আক্রমণ প্রতিকার তবে A. R. P. volunteer কে নিয়ে মুস্কিলে পড়ি। ফায়ার ব্রিগেড চোখের জল দেখে লজ্জা পায়। তবু National Defence work এ নেমে আত্মপক্ষ সমর্থন নয়, দেশরক্ষার কাজে লাগতে হবে কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য Defensive operation এ নেমে অন্ধকার দেখি যখন defence কে বিশেষণ ক'রে production উৎপাদন ইত্যাদি দেখা দেয়। কাজেই এই যে war effort এর যুদ্ধ প্রচেষ্টা বা war materials = রণবস্তু জোগাড়ের চেষ্টা তা দেশে যে resource ভাণ্ডার (!) আছে তাকেই tap ক'র্‌তে হবে exploit ক'র্‌তে হবে, utilise করতে হবে।

তবু আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে নিদারুণ ঐ ব্লিৎসক্রিগের তড়িতাক্রমণ কিন্তু ব্লিৎস্-এয়ার সাম্‌লাই কি দিয়ে বলুন না? আসে প্যাঞ্জার আসে পিনসারের সাঁড়াশি! ভয় হয় encirclement এর ঘেরাও বা অবরোধে শত্রুপক্ষের হয়তো বা bloody losses হবে "রক্তাক্ত ক্ষতি" কে হাসার অবসর না দিয়ে বিপুল বা নিদারুণ ক্ষয়। আস্‌ছে tank ট্যাঙ্কেররূপে, armoured car বা unit সাঁজোয়া গাড়ী বা বাহিনী-রূপে। আসুক না comouflage এর বিভ্রান্তকারী ফাঁকিঝুঁকির সাহায্যে শেষটায় rear-guard action চালাবে না অপরপক্ষ? তার কি হবে? হবে আর কি শত্রুপক্ষ collapse ক'র্‌বে। এতো আর ঘরবাড়ী collapse নয় যে ধ্বসে যাবে বা মানুষ নয় যে নেতিয়ে পড়্‌বে, অথচ এ কিন্তু শত্রুর ভেঙে পড়াও নয় পরাজয় ও নয়—সংগ্রাম-ক্ষেত্রে collapse = কোলাপ্স। ব্যস এবার নিন, বন্দী করুন, মেসিনগান, সাব্‌মেসিনগান, মাইনথ্রোয়ার সব আত্মসাৎ করুন, নইলে কলের গান (গ্রামোফোন?) অর্ধকলের কামান, মাইন নিক্ষেপক কোনটাই বাংলায় হজম হবে না। ওদের Communication = আদান প্রদান (?) বন্ধ, Communication line = যাতায়াতের পথ (?), রুদ্ধ, তা' ছাড়া supply base = সরবরাহ ঘাঁটি থেকে advanced unit = অগ্রসর দল বহুদূরে।

তবু আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে ব্লিৎসক্রিগের আক্রমণ।

এদিকে প্রথম আক্রমণের চোট সাম্‌লে লালফৌজের mobilisation সমাবেশ? প্রস্তুতি?—শেষ হ'ল বলে; তারপর ওরা ক'রবে counter attack = পাল্টা আক্রমণ। শত্রুরা অবশ্য সৈন্য re-inforcement ক'রতে পারে, মানে কি, না, আরও সৈন্য আমদানী করতে পারে; এক কথায় সৈন্যবৃদ্ধি, এছাড়া আর কি করব বলুন? ওরা হ'চ্ছে invading party তাই আক্রমণকারী, তবে aggressor এর কি হবে. কি হবে attacking party র? ভেবে পাচ্ছিনা, invasion কে অভিযান বলব কি না. তবে ইংলণ্ড অভিযান আর এভারেষ্ট অভিযান যে একাকার হ'য়ে যায়—মস্ত adventure. রোমান্স, রোমান্টিক, ক্লাসিকালের মত পরদেশীয়া। যাই হোক invasion এর আগে evacuation দরকার—কি করব—অপসারণ? কবরেজী রেচক তো আর বলতে পারি না। স্থানান্তর করণ বড্ড জবরদস্তি—বড্ড গুরু ও চণ্ডালের সংমিশ্রণ। Rufugee আশ্রয় প্রার্থীই হউক। Dugout বা Dug-in গর্তে পড়ে মরুক চলুন আমরা মাটি ছেড়ে জলে যাই। নাইবা চড়্‌লাম amphibian tank এ; Heavy বা Light ভারী (?) না বৃহৎ, হাল্কা (?) না ছোট ট্যাঙ্ক জলে চলে না, উভচর ট্যাঙ্ক চলে কিন্তু ও থাক্, আসুন Warship, Battleship = রণতরী বা fleet = নৌবহরে উঠি। Harbour বন্দর, না Port বন্দর; Dock—ডাক, Dry Dock শুকনো (!) ডাক, না, ডাঙার ডক; তবে Dockyard = জাহাজ কারখানা? Navy নিশ্চয়ই নৌবাহিনী; এর আবার Destroyer আছে, Cruiser

ভেঙে পড়াও নয়, পরাজয়ও নয়
সংগ্রাম ক্ষেত্রে collapse = কোলাপ্স

আছে (cruise, cruising আছে); এ ছাড়া merchantmen, cargoship, transport, tanker, barge থেকে বাণিজ্য জাহাজ, মালবাহী জাহাজ, তৈলবাহী জাহাজ, বজরা বের ক'রতে হবে। চারিদিকে শঙ্কার অবধি নেই—টর্পেডো বোট, সাবমেরিন, ডেপ্‌থ্‌ চার্জ, মাইন আছে—তাদেরকে ঘেঁটে লাভ নেই, বড় জোর মাইন লেয়ারের বদল মাইন সুইপার কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু ঐ পর্যন্ত—ওরা বিদেশী বন্ধু।

যুদ্ধের ধোঁয়া ছেড়ে চলুন Foreign office এর পররাষ্ট্র দপ্তরে যাই; সেখানে হয়তো পররাষ্ট্র সচিব (minister) আছেন; আবার অনেক ambassador বা minister আছেন যাঁরা উভয়েই রাষ্ট্রদূত। (Steretary of State for India = ভারতসচিব) পররাষ্ট্র দপ্তর, বৈদেশিক বিভাগ, দৌত্যবিভাগ। consulate, consul general এর অফিস, কিন্তু Embassyর ambassador, minister যদি বা রাষ্ট্রদূত হয় consul কনসালই। অথচ military attache হয়েছেন দৌত্যবিভাগের সামরিক সহকারী। এদের কার যে কি position মর্যাদা, কার যে কি status = পদগৌরব (?) তা আমাদের মত অনভিজ্ঞ রাজনীতিকদের (রাজনৈতিকদের নয়) পক্ষে বলা শক্ত; কারণ এঁরা official হ'লেও officer নন; কেননা officer

যদি কর্মচারী হয় তবে সামরিক officer তো সামরিক কর্মচারী হ'তে পারে না। তাঁরা অফিসারই থাক্‌বেন; Govt. officials হ'লে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃপক্ষ হবেন। আবার authorities ও কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষ মহল। Politics = রাজনীতি; Political leader = রাজনীতিক নেতা; political shibboleth = রাজনৈতিক (দলবিশেষের) বুলি। আপদ কালে এঁরাই morale = মেরুদণ্ড (?) সঙ্কল্প (?) ঠিক রাখেন বা ভাঙেন। কেননা এঁদেরই মধ্যে কারা যে Fifth column = বিভীষণ বাহিনী (পঞ্চম বাহিনী নয়, আমাদের আর চারটে বাহিনী সম্বন্ধে ধারণা থাকত, তবে না?) তা ঐ আপদ কালে জানা যায়; বিদেশী গভর্ণমেণ্ট খুসীমত সহস্র security prisoner = (নিরাপত্তা রক্ষার্থে আটকবন্দী !!!) ক'রলেই তাদের ও ঐ কলঙ্ক হবে এমন কোন কথা নেই; বরং ওরা detenu র মতই সিকিউরিটি বন্দী হ'য়ে থাক্। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকে, তাই থেকে কূটনীতিজ্ঞদের অবস্থার আর তাঁদের Diplomatic mail bag কূটনীতির চিঠির থলি (?) থাকে; তাঁদের ও হয়তো আবার C. C. বা Private Secretary = খাস সেক্রেটারী (গোপন বা ব্যক্তিগত সম্পাদক নয়) থাকে; বড় বড় কর্তাদের personal envoy = খাসদূত থাকে—যেমন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের হ্যারি হপকিন্স ছিলেন। President সভাপতি কিন্তু রুজভেল্ট সভাপতি নন, প্রেসিডেণ্ট; Chairman = সভাপতি কিন্তু President আর Chairman এক জায়গায় হ'লে গোলে হরিবল হবে। অতএব রুজভেল্ট ছাড়া অন্য কোথাও যদিও বা President = সভাপতি হয় Chairman কে চেয়ারম্যানই থাক্‌তে দিন। ওঁরা election কে নির্বাচন ক'র্‌লেও vote কে ভোটই রেখেছেন, এমন কি কাষ্টিং ভোট পর্যন্ত। Premier, Prime minister, Chief minister সব প্রধান মন্ত্রীতে একাকার। এঁদের পক্ষ থেকে announcement, declaration = ঘোষণা জারী হয়। অনেক লোকে মিলে conference = সম্মেলন হয়, এদের দু'জনের মধ্যেও conference = সাক্ষাৎকার হয়, interview র প্রসাদে মোলাকাৎ ও ক'র্‌তে পারেন। আপনার চাক্‌রী confirmed = পাকা হোক না হোক্ এদের সংবাদ সরকারী ভাবে confirmed = সমর্থিত হওয়া চাই-ই। meeting সভা কিন্তু cabinet meeting = মন্ত্রিসভার অধিবেশন; sitting ও অধিবেশন। সভার ফলাফল broadcast = বেতারে প্রচার হবে; জায়গা বিশেষে বেতার বক্তৃতা হবে আবার যেখানে Marshal Petain will broadcast a message = সেখানে মার্শাল পেতঁ্যা বেতার যোগে বাণী দিবেন বা প্রেরণ করিবেন; (message = বাণী, বিবৃতি, বক্তৃতা) internal policy = আভ্যন্তরীণ নীতি কিন্তু minister for interior [for internal (home) affairs] হবেন স্বরাষ্ট্র সচিব (আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী (!) নয়। রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে মতানৈক্য ঘট্‌লে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ওপর একে অপরকে চাপ দেবার জন্য embargo, prohibition, sanction এর আশ্রয় নেয়, কিন্তু বাংলায় এক নিষেধাজ্ঞা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু Demarche এর কি বাংলা হবে বলুন তো; মনোভাব জ্ঞাপন করাকে মনোবিজ্ঞপ্তি বলা চলে না—শুধু বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। এই ধরুন না state of siege যদি অবরোধাবস্থা করি তবে encirclement কে অবরোধ করা চলে না, ঘেরাও ক'রতে হয়।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। রোটারীর স্পিডের সঙ্গে সঙ্গে এম্‌নি দৈনন্দিন নিত্যব্যবহার্যের মত আমাদের ঘরে ঘরে নতুন শব্দ আস্‌ছে—সরকারী Black-outএর হুকুমে এসেছে দুর্নিরীক্ষ্য নিষ্প্রদীপ!

রাজনীতির দিগ্‌ভ্রম

অনিল চন্দ্র রায়

ভাবালুতার বিরুদ্ধে স্পীনোজা একদা ডাক দিয়ে বলেছিলেন, চোখের জল নয়, মিষ্টি হাসিও নয়, শুষ্ক বুদ্ধির চর্চা চাই: হৃদয় দিয়ে নয়, স্নায়ু দিয়ে নয়, শুক্‌নো মগজ দিয়ে, "not to weep or laugh but to understand." কিন্তু আমাদের এ দেশ নাকি শুধু রোমান্সেরই দেশ। এ পোড়া দেশের ট্রপিক্যাল আবহাওয়ায় নাকি মগজের চাষ হয় না; এখানে কেবলি নরম ফুলের ফসল আর তরল মধুর চাষ হয়; অর্থাৎ কেবলি হৃদয়ের তাপ আর স্নায়ুর জ্বলুনী। এহেন দেশে বাস্তবের সঙ্গে ঠোকাঠুকির ইচ্ছা কোথা থেকে হবে? এখানে বায়বলোকের অস্পষ্ট রঙ্‌ মেখে হাসিকান্নার খেলা খেল্‌তে পারলেই হোল! আর কিছু চাইনে!

অথচ আমরা নতুন যুগকে নির্মাণ করতে চাইছি, ইতিহাসকে আমরা নতুন করে সৃষ্টি কোরবো। কিন্তু ইতিহাসকে সৃজন করতে হলে চাই কালপুরুষের মতন অপার নির্মমতা; পুরাণোকে গুড়োগুড়ো করে, বর্তমানকে মথিত করে তবে তো নতুন ইতিহাসকে গড়তে হবে! কোথায় সে অবিকম্প নিষ্ঠুরতা, মমতাহীন নিষ্ঠা! "হৃদয়তাপের ভাবে-ভরা ফানুষেরা" এ শক্ত কাজ কী করে করবে? এরা তো একটা পিনের খোঁচাও সইবে না। কুলিশের মত ধারালো একাগ্রতা যেখানে চাই, সেখানে স্নায়ু-মত্ত বেতালের দল কী ইতিহাসকে তৈরী করবে? এরা হিষ্টিরীকে কী গড়বে? হিষ্টিরিয়াই এদের চিত্তকে গ্রাস করেছে। তাই আজ নতুন স্পীনোজার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে সেই অবিচল স্থিতবুদ্ধির, সেই ক্ষুরধার, তীক্ষ্ণ বাণীর। যে বাণীর জ্বলন্ত আহ্বানে আমাদের দেহমনের সকল বাষ্পের আতিশয্য নিমেষে শুকিয়ে যাবে। বুদ্ধি-জাগ্রত, স্বচ্ছ চক্ষু দিয়ে আমরা চারপাশের পৃথিবীকে দেখবো।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ রোমান্সের হাওয়া উঠেছে। এখানে একদিকে নেতিবাদী গান্ধীজীর রোমান্টিক বৈরাগ্-যোগ। অন্যদিকে "বৈজ্ঞানিক-সমাজতন্ত্রীদের" রোমান্টিক উচ্ছ্বাস-যোগ। এক্‌দিকে অহিংসার স্বপ্ন দিয়ে অদৃশ্য জাল বুনানো হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যর্থ আকাঙ্খার রঙ মিশিয়ে গাঁথা হচ্ছে কথার কিল্লা। চিত্তধর্মে দুই-ই সমান রোমান্টিক, কারণ দুই-ই হলো বাষ্পলোকের ব্যাপারী, কাজেই, অবাস্তব। গান্ধীজী বা সমাজতন্ত্রী কেউ-ই অবশ্য স্বীকার করবেন না। তাঁরা, ডানদিক্ ও বাঁদিক, উভয়দিক থেকে উভয়েই বলবেন, তাঁরা অবাস্তব নন, অকাট্য এবং অনিবার্য। কারণ গান্ধীজীর কারবার হলো চরকা নিয়ে, আর চরকা হলো নিছক বস্তু। অপরপক্ষে বিজ্ঞান-সম্মত (!) সমাজবাদী বলবেন, তাঁরা হলেন "অনেকান্ত বস্তুবাদের" মালিক, কাজেই তাঁরা

অবাস্তব হতেই পারেন না! কিন্তু 'অনেকান্ত বস্তুবাদ' যে আজ একান্ত ভাবে অবাস্তব ধূয়োঁর রাজ্যে তাঁদের নিয়ে চলেছে তার উপায় কি?

যুদ্ধ এসেই আমাদের সব ওলটপালট করে দিয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা দিব্যি ছিলাম। একদিকে আমরা নিশ্চিন্তে অহিংসার মন্ত্রপাঠ করেছি, মোলায়েম ছন্দে ও মধুর সুরে। ব্রিটিশের প্রবল কামান আর চক্‌চকে ব্যায়োনেট মাথার ওপরে শান্তির ছত্র নির্মাণ করে রেখেছে, সেই ছত্র-ছায়া তলে আমরা নির্ভয়ে অহিংসা ও প্রেমের অজেয় শক্তির ব্যাখ্যা করেছি। অপরপক্ষে আমরা সমাজতন্ত্রের স্তুতিবাচন করেছি, সুগম্ভীর ছন্দে ও দীপক রাগিনীতে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ জিহাদ। সাম্রাজ্যবাদী কাড়াকাড়ি থেকে কী করে অনিবার্য হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী লড়াই, আর সে লড়াইর প্রতি আমাদের কী অপরিসীম ঘৃণা, সব আমরা জলদনির্ঘোষে ব্যক্ত করেছি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সভ্যতার কতো বড়ো শত্রু তা' সূক্ষ্মভাবে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি; কেবল তাই নয়; আমরা সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অনিবার্য সৃজন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ওপরে অব্যর্থ কাগজী গোলাগুলিও বর্ষণ করেছি। কিন্তু হায়, যুদ্ধ এলো আজ প্রলয়ঙ্কর সত্যের বেশে। এক নিমিষে সে আমাদের সকল মিথ্যাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল; আর চিনিয়ে দিয়ে গেল আমাদের সত্যিকার পরিচয়! গর্জমান কামান আর উদ্যত বোমার সামনে অহিংসার কল্পিত বজ্র শিশুর খেলনার মতো টুকুরো টুকুরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। কোথায় রইলো প্রেম, আর কোথায় রইলো মমতাময়ী অহিংসা। আর বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র? তারও দশা তথৈবচ। কথার কিল্লা আর কাগজী গোলাগুলি যে আসল গোলাগুলির কাছে ছেলেখেলা মাত্র, তারও প্রমাণ হলো হাতে হাতে। যুদ্ধের নিকষে কষেই আজ ধরা পড়ছে সকল আস্ফালন আর সকল মিথ্যার নির্জলা স্বরূপ।

ইলেকট্রিসিটি কখনো করে তড়িতায়িত, প্রাণচঞ্চল; কখনো করে আড়ষ্ট, প্রাণহীন। যুদ্ধও বিদ্যুৎশক্তিরই মতো। কোনো জাতিকে করে তোলে বেগশীল, কাউকে করে নিঃসার ও হিমশীতল। ভারতবর্ষ আজ যুদ্ধের প্রবল আঘাতে কেমন অসার হয়ে পড়েছে। তার অঙ্গে অঙ্গে আজ পক্ষাঘাত। সবগুলো দলই কেমন জড়সড় হয়ে আছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে যে হাঁকাহাঁকি ছিলো আজ তা নেই। ইংরেজের শাসনও আজ রুদ্র মূর্তিতে দেখা দিয়েছে, যুদ্ধের মূর্তিও আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রলয়ঙ্কর। ভারতবর্ষেও তাই আমরা এই রুদ্রতাকে দেখে ভড়কে গেছি এবং শিষ্টভাবে বিবরে প্রবেশ করে নিরাপদ হয়েছি। গান্ধীজী মাঝে মাঝে কাগজে ও মুলাকাতে বড় বড় বিবৃতি দিয়ে এখনো অহিংসার জগজ্জয়ী শক্তির স্তুতিব্যাখ্যা করে থাকেন। আর ভয় দেখান যে, ইংরেজের সঙ্গে তার যুদ্ধ আরো দীর্ঘদিন চলবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে তার যুদ্ধ যে কল্পনা ব্যতীত আর কোথাও নেই, এ অপ্রিয় সত্য তিনি সযত্নে চাপা দেন। সত্যাগ্রহ আজ যুদ্ধ-কোলাহল আর হিন্দু-মুসলমানের রক্তারক্তিতে নিঃশব্দে ডুবে গেছে। কিন্তু তা স্বীকার করবার মতন নৈতিক

সাহস সত্যাগ্রহের নেতার নেই। "যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি" করে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধায়োজনকে ব্যাহত করা চলে না, ধ্বনি যে শুধুই ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, তাতে যে ইস্পাতের আর শীষার বেগকে প্রতিরোধ করা যায় না, এ কথা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্পষ্ট কথাকেও ভণ্ডামীর কুয়াশা দিয়ে অস্পষ্ট করে তোলা যায়। কংগ্রেসীদেরও রাজনৈতিক বিবেকে কাঁটার খোঁচা না লাগে তা নয়। মিঃ মুন্সীর মতন দু'একজন কংগ্রেস থেকে বেরিয়েও আসেন। কিন্তু আমাদের জাতীয় স্বভাব তো যাবার নয়! ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় হলো আমাদের একমাত্র পুঁজি। সত্যকে স্বীকার করবার পৌরুষ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। পরাধীনতার আফিম আমাদের চিত্তকে করেছে বিযাক্ত। চমকপ্রদ কথার চাকচিক্য আর মিঠে রসের বিলাসিতা দিয়ে আমরা আমাদের ক্লীবত্বকে সতত ঢাকা দিই। কাজেই সত্যকে কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও আমরা স্বীকার করিনে; নাটকীয় বীরত্বের আস্ফালনে লোকের চোখে ধূলো দিয়ে থাকি। কাজেই দুএকজন মুন্সীতে কী হবে? সাধারণ কংগ্রেসীদের চোখে ধূলোপড়া পড়েছে, তারা অন্ধ। আর নেতারা তো স্বার্থ-সিদ্ধির দক্ষিণাচারী সাধনেই মত্ত আছেন। সত্যমূর্তি-জাতীয় নেতাদের গান্ধীভক্তি ও অহিংসাপ্রীতি কোন দরের তা' সবাই জানে। তাই শার্দুল সিং যখন এ-আই-সি-সি'র সভা ডেকে যুগানুযায়ী প্রোগ্রাম বদলানোর প্রস্তাব করেন তখন কৃপালিনী-সত্যমূর্তিরা গান্ধীভক্তির প্রেমবিকারে সগর্বে গর্জন করতে থাকেন। কিন্তু গর্জন যতই করুন, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন আজ লজ্জাকর প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এর পেছনের তত্ত্ব হলো ক্লীবত্ব এবং স্বার্থ ও ক্ষমতার লোভ। আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ব্যাপারে ভারতীয় নেতাদের নিষ্ক্রিয় জড়ত্বের কারণ হলো ভয় ও লোভ। তাই আজ সমস্ত জাতীয় সংগ্রাম মধ্যপথে এসে স্তব্ধ হয়ে আছে।

দক্ষিণাচারীদের কথা থাকুক, বামাচারীরা কী করছেন? তাহাদেরও সেই একই পক্ষাঘাত আক্রমণ করেছে। প্রহরে প্রহরে কোলাহল করে এরাও আপনাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে আসছিলেন, কিন্তু সে কোলাহলও কিছুদিন যাবৎ বন্ধ ছিলো। মানবেন্দ্র রায়ের র‍্যাডিক্যাল দল, কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট দল, ন্যাশনাল ফ্রন্ট দল,—সবাই যেন মূর্চ্ছিত হয়ে ঝিমোচ্ছে। প্রবল বেগ নেই, তীক্ষ্ণ গতি নেই; জোয়ার শেষ হয়ে ভাটার মৃদুতা আরম্ভ হয়েছে। এই স্তিমিত অবস্থায় কংগ্রেস, ট্রেডইউনিয়ান কংগ্রেস, কিষাণ সভা, সব প্রতিষ্ঠানেই ঘুণ ধরেছে, জাতীয় জীবনের পাঁকে পাঁকে জীর্ণতা; প্রাণপুরুষ আজ ব্যাধিজর্জর দেহ নিয়ে কবরের প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু আমাদের যাই হৌক না কেন, যুদ্ধ চলেইছে। তার রক্তাক্ত রথের চাকা দেশের পর দেশের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। যুদ্ধের অক্টোপাশ আমাদে দেশকেও চারদিক থেকে বেষ্টন করেছে, আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিষ্ঠুরভাবে শুষে নিচ্ছে। এই সংকটকালে আমাদের একদল বলছেন, ইংরেজকে সাহায্য কর। কারণ ইংরেজ হলো ডিমোক্রেসীর শেষ ধ্বজাধারী। ইংরেজ বাঁচলেই ডিমোক্রেসী

বাঁচলো, আর তাহলেই আমরাও বাঁচবো। মানবেন্দ্র রায়ের দল হলো এই ব্রিটিশ বিজয়ের প্রধান গভীরথ। আর সঙ্গে আছেন হিন্দুসভার দল, ইংরেজকে আশ্রয় করেই এদেরও সকল আশা জোর ধরেছে। অন্যদিকে 'বিজ্ঞানসম্মত সমাজবাদীরা' এতদিন দিশেহারা হয়ে চুপ করে ছিলেন। কারণ সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি রুশিয়া গত দেড় বছর ধরে ফ্যাসিজ্‌মের সঙ্গে মিতালীতে লিপ্ত থাকায় এদের অবস্থা সবিশেষ অস্বস্তিজনক হয়ে উঠেছিল।

এই দেড় বছর ফ্যাসিস্ত জার্মাণীর বিরুদ্ধে জিহাদ কিঞ্চিৎ ফিকে হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ রুশজার্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার এদের প্রাহরিক কোলাহল আরম্ভ হয়েছে। এবার সুর বদলে এরা যুদ্ধসঙ্গীত সুরু করেছেন। যুদ্ধে রুশ দেশকে সাহায্য করতে হবে, ভারতবর্ষের হবে তাই এখন নৈমিত্তিক কর্মযোগ, কারণ সমাজতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে, তবেই আমরা বাঁচবো। আর ভারতের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ লতার মত মুঞ্জরিত হবে রুশ বনস্পতিকে আশ্রয় করে। কাজেই কর্তব্য হলো যুদ্ধে শরীক হওয়া। একদল বলেছেন, ইংরেজকে সাহায্য করতে হবে, অপর দল বলেছেন, রুশকে। কিন্তু অবস্থার যোগাযোগে দুই রাস্তাই একই স্থানে গিয়ে মিলেছে। কাজেই দুই যজ্ঞের একই ফল। রুশকে সাহায্য করবার মানেই ইংরেজকেও সহায়তা করা। এপথে বিপদ নেই, কারণ এ হলো সরকারী বাঁধা সড়ক। রুশকে সহানুভূতি দেখানো নিরাপদ রাষ্ট্রনীতিও বটে, আর সমাজতান্ত্রিক আনুগত্য প্রকাশ করাও এতে হয়। এদিকে কংগ্রেস কিন্তু বিপরীত পথে পা দিয়ে ফেলেছে। হরিপুরা থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধবিরোধীনীতি প্রচার করে এখন ইংরেজকে সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ হেন পরিস্থিতিতে কোন্ পথে হবে ভারতীয় জনগণের কল্যাণ? যুদ্ধ সম্বন্ধে, সংগ্রাম সম্বন্ধে কোন্ মনোভাব হবে নির্ভুল পথের দিশা?

ভারতবর্ষের মনোভাব নির্ধারণ করতে হলে বিচার করতে হবে যুদ্ধের প্রকৃতি ও গতিকে এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক কল্যাণকে। যুদ্ধের স্বরূপ কী? ভারতবর্ষেরই বা কোন্ অপবর্গ সিদ্ধ হবে এই লড়াইয়ের শরীকী করে? যুদ্ধবিরোধ ও যুদ্ধসমর্থন, দুই মতেরই মূল্যনিরূপণ হবে এই মানদণ্ডের বিচারে। প্রথম প্রশ্নের নিঃসংশয় জবাব হল এই যে, বিংশ শতকের এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হল অবিমিশ্র সাম্রাজ্যবাদী লড়াই। প্রথম মহাযুদ্ধের পেছনে ছিলো যে সব কারণ, অদ্যকার লড়াইয়েরও পশ্চাতে আছে সেই একই কারণের পূর্ণ সমবায়। ক্যাপিটালিজ্‌মের প্রয়োজন হয় সাম্রাজ্যের, দরকার পড়ে জগৎজোড়া বাজারের! কাজেই বাণিজ্যলোভ থেকে সাম্রাজ্যলোভ আসে; বিত্তের মোহ থেকে আসে মাটীর ক্ষুধা। কেবল তাই নয় জলপথেরও ওপরে পড়ে টান। আসে কাড়াকাড়ি, আসে উন্মত্ত হানাহানি। গত-যুদ্ধের জন্ম হয়েছিল দুই সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্ব থেকে। একদিকে পুরোনো সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ জলে-স্থলে ইঙ্গ-আমেরিকান্

বাণিজ্যশক্তির অক্টোপাস-বন্ধন। অন্য দিকে তরুণ জর্মাণ সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ পূর্বতনের একচেটীয়া দখলের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। সেই যুগে ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯১৫) সুইজার-ল্যাণ্ডের জিমারওয়াল্‌ডে (Zimmerwald) যুদ্ধবিরোধী সমাজতন্ত্রিরা আন্তর্জাতিক সভা করে ঘোষণা করলেন, "এ যুদ্ধ হলো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, "the outcome of Imperialism." লেনিন এই সভায় নেতৃত্ব করেছিলেন! কিন্তু সমস্ত য়ুরোপে তখন সমাজতন্ত্র দুভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বেশী সংখ্যক সমাজবাদী তখন যুদ্ধ-বাজেট সমর্থন করছে। কিন্তু অল্পসংখ্যক তখনো আন্তর্জাতিক শ্রমিকমৈত্রীর বাণী প্রচার করছেন, কারণ জিমারওয়াল্ড ঘোষণায় স্পষ্ট বলা হয়েছিলো সেই যুদ্ধ ক্যাপিটালিষ্টদের লোভ থেকে জাত। (১) তারপর সে যুগেও যুদ্ধোদ্দেশ্য বা war aims সম্বন্ধে ঘোষণার দাবি উঠেছিল; ১৯১৭ ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ লেবারসংঘগুলিই এ দাবি তুলেছিলেন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে। সে যুগেও জাতীয় ঐক্যের নামে বা united front করে যুদ্ধ চালাবার ভাবপ্রবণতা সব দেশেই পেয়ে বসেছিল। ১৯১৪ সনের ১লা আগষ্ট ফরাসী সমাজবাদী জরেকে (Jaures) হত্যা করে ফেলা হয়। ৪ঠা আগষ্ট তাঁর সমাধিকালে কার্ডন্সিল-সভাপতি রেনে ভিভিয়াণী (Rene Viviani) ফরাসী জাতির কাছে চিত্তোন্মাদী আবেদন করেছিলেন, সর্বশ্রেণীর জাতীয় ঐক্যের জন্য, "a l'apaisement national, a la concorde supreme"—এর জন্য। সেই দিনই সন্ধ্যায় চেম্বারে সমাজতন্ত্রীরা যোগদিলেন 'পবিত্র সংহতিতে', "L' union sacree"তে; সেই দিনই যুদ্ধঋণের পক্ষে ভোট দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার সমর্থন করলেন্ন। এর পরেই তিনজন সমাজতন্ত্রীর মন্ত্রীসভায় প্রবেশ। কিন্তু সেদিন লেনিন ও অন্যান্য জিমারওয়াল্ডীরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শরীকী করবার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী বণিকস্বার্থের সংঘর্ষ বই কিছু নয় তাতে জনগণের ও বিপ্লবীদের স্বার্থ নেই।

আজকে আবার ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন ঘটছে। ১৯১৪ সনের পুরোণো অধ্যায়ই আবার রক্ত দিয়ে নূতন করে লিখা হচ্চে। ১৯৪১ সনের যুদ্ধ কি ১৪ সনের লড়াই থেকে পৃথক? পৃথক নয়। এবারও সেই পুরোণো পটভূমিকাই দেখা দিয়েছে এই নতুন অধ্যায়ের পিছনে। ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদের লড়াই শুরু হয়েছে। যুদ্ধের বাদী সুর হলো এই দুই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্ব; তবে এর সঙ্গে আছে নানা সংবাদী সুরের জটিলতা। এর মধ্যে রুশিয়ার স্থান একান্ত মামুলী; তার কোন বিশিষ্ট অর্থ নেই। রাষ্ট্রনৈতিক দাবা খেলায় দুটো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই হলো প্রাধান খেলোয়াড়; অপরেরা হলেন চালের গুটী, খেলার যন্ত্র মাত্র। রুশিয়াও এ খেলায় জড়িত হয়েছে; আবর্তের টানে, স্বেচ্ছায় নয়। শান্তি-নীতিই (peace policy) তার স্বার্থের অনুকূল, সেই নীতিই সতর্ক কৌশলে রুশিয়া এযাবৎ মেনে এসেছে।

(১) "outcome of the endeavours of the capitalist classes of every nation to satisfy their greed for profit········" (Zimmerwald manifesto).

তা ছাড়া যারা মনে করেন এটা হলো রুশিয়া ও জার্মাণীর ঐতিহাসিক সংঘর্ষ, তারা ভুল করেছেন। এ লড়াই ফ্যাসিজ্‌ম্‌এর সঙ্গে কমুনিজমের লড়াই মোটেই নয়। বর্তমান দুনিয়ায় অশরীরী ভাবধারার বা ideologyর নামে এমন লড়াই বিরল হয়েছে; এ হলো পাউণ্ড-শিলিঙের যুগ; নিরেট স্থূল স্বার্থ ও সোণাদানার কারবার নিয়েই যতো লড়াই বাঁধে। রুশিয়ার সঙ্গে জার্মাণীর বাণিজ্যস্বার্থের কোনো আড়াআড়ি নেই। কারণ রুশদেশ আজো বহু পশ্চাতে। জার্মাণীর সঙ্গে টক্কর দেবে এমন শিল্পব্যবস্থা আজো সেখানে হয়নি। জার্মাণীর প্রত্যক্ষ শত্রু হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, যার পিছনে আছে আমেরিকার ধনতন্ত্র। তাই রুশিয়া এ যুদ্ধে সদর দরজা দিয়ে সোজা রাস্তায় আসেনি, খিড়কীর দুয়ার দিয়ে বাঁকা পথে তার অঙ্গনে প্রবেশ। কাজেই আসল যুদ্ধ হলো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের, রুশিয়া হলো যাকে বলে pawn in the game. কাজেই রুশ যোগ দিয়েছে বলেই যুদ্ধের স্বরূপ বা প্রকৃতি বদ্‌লে যায়নি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তাই এক মুহূর্তে সমাজতান্ত্রিক ক্রুসেডে পরিণত হয়নি। যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ভর করে তার ঐতিহাসিক ভিত্তি ও ভূমিকার ওপরে। এক মুহূর্তের ইন্দ্রজালে একটা বিশ্বযুদ্ধের চেহারা ও স্বরূপ বদ্‌লে যায় না।

কাজেই যারা রুশের যুদ্ধে শরীক হবার মুহূর্ত থেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ভাবছেন, এ যুদ্ধ ডিমোক্রেসীর লড়াই, বিশ্বমানবের মুক্তির লড়াই, তারা হলেন অপরাজেয় রোমান্টিক। যুদ্ধ শান্তির পরক্ষণেই ভাঙ্‌বে তাদের মোহ। পূর্ব যুদ্ধে যেমন বিশ্বমানবকে ঠকিয়ে পৃথিবীকে বাটোয়ারা করে নেয়া হয়েছে তেমনি এবারও বিশ্বাসী রোমান্টিকরা ঠক্‌বেন; পৃথিবীর গলায় শিকল আর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা পুনরায় তার সকল বিত্তহরণ করতে ছাড়বেন না। সেদিন রুজভেল্ট-চার্চিলের গুরুগম্ভীর ঘোষণা পৃথিবীকে রোমাঞ্চিত করলো; সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাচনিক স্তুতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু অবিকল এই ভাষায় একদা উইলসন্ সাহেব কি পৃথিবীর চিত্তহরণ করেননি? ১৯১৭ সালের ২রা এপ্রিলের ঐতিহাসিক ঘোষণা কি এই একই আকাশপুষ্প দিয়ে মানুষকে ঠকায়নি? (২) আজও সেই বাক্যের পুষ্পায়ন চলেছে বক্তৃতায় আর মায়াকান্নায়। লড়াই চলেছে সাম্রাজ্যবাদের;—আর কথার মোহে মুগ্ধ হয়ে আমরা স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখ্‌তে আরম্ভ করেছি। এরই নাম অদৃষ্টের পরিহাস।

যুদ্ধ যে সাম্রাজ্যবাদী তার পরিচয় মিল্‌বে ব্রিটিশের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারে আমাদের সঙ্গে। ডিমোক্রেসীর যুদ্ধ যদি হত, তবে সর্বপ্রথম থাকত ভারতের উল্লেখ এসব গুরুগম্ভীর ঘোষণায়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, ইজিপ্ট সম্বন্ধে, ইরাক সম্বন্ধে, আরব সম্বন্ধে, ব্রিটিশ কণ্ঠ নির্বাক্। আর যাকে

(২) "We are glad·········to fight thus for the ultimate peace of the world and for the liberation of the peoples, the German peoples included; for the rights of nations, great and small and the privilege of men everywhere to choose their way of life and of obedience. The world must be made safe for democracy······" (President Wilson's address to the Joint session of the chambers on the 2nd of April, 1917).

বলে দৃষ্টি-কোণের বদল, তার চিহ্নও তো নেই। অত বড় রূপান্তর যদি হয়েই থাকৃত,—সাম্রাজ্য-বাদের যুদ্ধ থেকে ডিমোক্রেসীর ও সমাজতন্ত্রের লড়াইতে পরিণতি—তবে ইংরেজের ব্যবহারে ও বন্দোবস্তে তার ছাপ পড়তো। কিন্তু কই? চিরপুরাণ কূটশাসন এদেশে চলেছে একটানা, সেই সাম্রাজ্যবাদী ক্রূর কৌশল! সেই ভেদনীতি! সেদিন বড়লাটের পরিষদকে বাড়িয়ে নতুন সভ্য নেওয়া হলো, কিন্তু তাতে আমাদের মধ্যে লাগলো কলহ; যে নীতিতে এটা করা হল, তাতে এদেশীর ঘরভাঙ্গানো আর মনভাঙ্গানো দুই-ই হলো। দল থাকতেও দলের মত না নিয়ে মিঃ অ্যানেকে নেয়া হল পরিষদে; হক্‌-সিকান্দর-সাহুল্লাকে নিয়ে মুসলীম লীগে লাগ্‌লো অন্তঃকলহ। এমনি করে বড়লাটের নীতি সৃষ্টি করলো আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা। এ হলো সাম্রাজ্যবাদের চিরন্তন ঔপনিবেশিক নীতি, colonial policy.

অথচ এই নীতির মর্মভেদ আমরা করতে পারছিনে। আমরা রুশের প্রতি দরদ দেখাতে গিয়ে রোমান্টিক হয়ে উঠি। যুক্তি ও বুদ্ধিকে জলাঞ্জলী দিয়ে আমরা কেবল কাগজী প্রস্তাব পাশ করি আর সাত্বিক ভাবে উচ্ছ্বসিত হই। রুশ নাম মর্মে প্রবেশ করলে আমরা আত্মহারা না হয়ে পা...নে; তাই দেখি সমাজতন্ত্রীরাও আজ জাতীয় ঐক্যের ধূয়া তুলছেন। শ্রেণীচরিত্রের ইঙ্গিত, যুদ্ধের স্বরূপ ও প্রকৃতি, ভারতের ভবিষ্যৎ, এসব বিচারের প্রয়োজন নেই; কেবল ডিমোক্রেসীর দোহাই দিয়ে নামমাহাত্ম্যে বিগলিত হলেই হবে। হিন্দু ও মুসলমান, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল, গোঁড়া ও উদার, বিপ্লবী ও লিবারেল—সবাই এসে এক প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়াও, সকল শ্রেণীর "জাতীয়" ঐক্যের বা consolidationএর শ্রীক্ষেত্র রচনা কর। গত মহাযুদ্ধেও য়ুরোপের দেশে দেশে এই ধরণের "জাতীয়" ঐক্য গড়ে উঠেছিল; রুশিয়াতেও কেরেন্‌স্‌কী এই ঐক্য গড়বার চেষ্টা করেছিলেন, যুদ্ধপরিচালনার সৌকর্যার্থে। লেনিন এই ঐক্যের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, "I hear that in Russia there is a trend toward consolidation, consolidation with the defensists—that is betrayal of socialism."

সমাজতন্ত্রের কল্যাণে আমাদের কি কর্তব্য তবে? একথা আজ বুঝতে হবে যে ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে স্বাধীনতার অচ্ছেদ্য যোগ। দুশো বছরের পুরোণো সাম্রাজ্যবাদ এখানে মাটীর স্তরে স্তরে শিকড় বসিয়েছে। এই নিদারুণ বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে সমাজতন্ত্রের আশা মরীচিকা মাত্র। স্বাধীনতাকে অর্জন করাই ভারতবর্ষের প্রাথমিক কর্তব্য। ইতিহাসের এই হলো বাস্তব পর্যায় বা ক্রম। এই হলো সাম্প্রতিক রাষ্ট্রনীতির প্রথম সূত্র। দ্বিতীয় সূত্র হলো এই যে এ যুদ্ধের স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদী এবং অন্যান্য দেশ হয়েছে যুধ্যমান সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র। এই দুই সূত্রের বিচারে কংগ্রেসের নীতির যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হয়। পথের দিশা কংগ্রেসের ঠিকই আছে, কিন্তু সে নীতির দিক দিয়ে,

ব্যবহারের দিক থেকে নয়। 'ধ্বনির' শক্তি যা-ই হোক, তাতে যুদ্ধবিরোধ হয় না; স্বাধীনতাও নৈতিক বচনের প্রভাবে আয়ত্ত হয় না। স্বাধীনতার জন্য চাই সক্রিয় কর্মপ্রচেষ্টা। সেই সক্রিয় কর্মপ্রচেষ্টার অভাব ঘটেছে বলেই আজ কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিকল। ঘটনাস্রোতের ওপরে আজ তার কোন হাত নেই। কেবল কংগ্রেস নয়। অন্যান্য দলেরও সেই কথা। চলমান কর্মপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ আবদ্ধ পঙ্কিলতা এবং জড়ত্ব। তাই আজ কাজের বদলে কথার পূজা আর সংগ্রামের বদলে অশ্রুবিসর্জনই আমাদের নিত্যকর্ম হয়েছে। তাই সমাজতন্ত্রী রুশিয়ার জন্য মৌখিক সহানুভূতির ভাবালুতা আছে কিন্তু ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের গোড়া পত্তনের প্রথম যে দুরুহ কাজ তার বালাই নেই। তাই আজ সংবাদপত্রে কোলাহল উঠেছে রুশিয়াকে সম্প্রীতি জানানোর জন্য; কার কত প্রীতি জানাবার জন্য ধুম পড়েছে Cables পাঠাবার।

আজ যে আন্তর্জাতিক সংকট পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলছে, তার কার্যকরী ব্যবহার কী ভাবে ভারতবর্ষ করবে, তা-ই আজ ভারতের সম্মুখে জাগ্রত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব চালাকীর দ্বারাও দেওয়া যাবে না, ক্লীবত্বের দ্বারাও নয়। ঘর সামলাবার কঠিন প্রয়াস আজ আমাদের করতে হবে। পরকে মৌখিক সহানুভূতি দেখানো বা মিথ্যা ডিমোক্রেসীর নামে মাতামাতি করা, ভারতবর্ষের আজিকার পরিস্থিতিতে অপ্রাসঙ্গিক। ইতিহাসের এই দারুণ সংকটে আমরা পরাজয়-মূলক মনোবৃত্তি নিয়ে ভাবালুতায় সময় কাটাচ্ছি। রোমাঞ্চের ট্রপিকাল ব্যাধি আমাদের আক্রমণ করেছে; সেই ব্যাধিরই জয় হবে? না, সুস্থ বাস্তবতার দৃষ্টি সাহায্যে আমরা লেগে যাবো বৈপ্লবিক সংগঠনে। ইতিহাস জবাব চেয়েছে, আমরা আজ কী জবাব দেবো?

—*—

ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

একজন আধুনিক ইংরাজ কবি ও যশস্বী সাহিত্যিক C. Day. Lewis মন্তব্য করিয়াছেন—Literature will be more concerned with the relation between masses and less with relation between individuals, more definitely a partisan in life's struggle. In fact, it will moralise more. এই ভবিষ্যদ্বাণী লিউইস্ কবির লেখনী নিসৃত হইলেও ইহা তাহার একান্ত নিজস্ব মত নহে—ইহা বর্তমান বাম-পন্থী সাহিত্যিক মাত্রেরই বক্তব্য বিষয়। সাহিত্যের বাজারে বেসাতি করিতে হইলে আজ আর নাকি গায়ক-গায়িকার ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা, ভাব-অনুভূতি, জয়-পরাজয়ের কাহিনী লইয়া আবেদন সৃষ্টি করিলে চলিবে না—ব্যক্তিকে ব্যক্তি মনে করিবার যে ব্যর্থতা তাহা আজিকার সাহিত্যিক না হইলেও অনাগত যুগের সাহিত্যিক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন—সেই ভবিষ্যৎ যুগের সাহিত্য সাধনা বৈষয়িক জীবনের সংগ্রাম সাধনার অঙ্গমাত্র হইবে—এক কথায়, সাহিত্যকে নীতির ক্ষেত্রে আপনাকে উজাড় করিয়া তবে তাহার

স্বার্থকতা অর্জন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য এ সাহিত্যাদর্শ সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য কিন্তু অগ্রাহ্য হইলেও তাহা গভীর বিচার-সাপেক্ষ।

উপরে উদ্ধৃত মতবাদের প্রামাণ্য নির্ভর করিতেছে বিশেষতঃ গোড়ার দুই-চারিটী কথা মানিয়া লওয়ার উপর। প্রথমতঃ লিউইস্ প্রমুখ বাম-পন্থী সাহিত্যানুরাগীরা মনে করেন যে সাহিত্য এবং মানুষের বাহ্য জীবন একই প্রকার কিংবা একই স্তরের সত্য সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। যদি তাহা মনে না করিবেন তবে সাহিত্য চর্চাকে জীবনযাত্রার পরিধিভুক্ত করিবার কোন কারণ নাই কিংবা সাহিত্যকে কর্মযোগীর আদর্শের সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইবার ও কোন কারণ থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক বাম-পন্থী মনে করেন যে সমাজ-বন্ধনে মানুষের যে সমষ্টিগত রূপ তাহাই তাহার একমাত্র ব্যাষ্টিগত নিজস্ব প্রকাশ; নহিলে বাম-পন্থীরা এ ভবিষ্যদ্বাণী কিছুতেই করিতে পারিতেন না যে, অনাগত কালের যে সাহিত্য তাহাতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ থাকিবে না, থাকিবে তাহাতে শুদ্ধ মানুষের সাঙ্ঘিক বন্ধনের পরিচয়। তৃতীয়তঃ মার্ক্স দর্শনে প্রভাবান্বিত হইয়া আধুনিক সাহিত্যসেবীরা মনে করেন যে, সত্যের কোন ভাবাত্মক পরিচয় নাই এবং বাস্তব জীবনে উপলব্ধ যে সত্য, তাহা ব্যতিরেকে সৌন্দর্যের কোন বিভিন্ন প্রকাশ নাই, অতএব বাস্তব সত্য যা কর্মযোগীর আদর্শ এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য অভিন্ন বস্তু।

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। প্রথমতঃ জীবন ও সাহিত্যের কথা। এ দু'য়ের সম্বন্ধ লইয়া সাহিত্য সমালোচনা আসরে বহু বাক্-বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে, এখানে সেই সকল যুক্তি ও প্রতিকুল যুক্তির অবতারণা করিয়া লাভ নাই। এ কথা আজ মানিয়া লইতেই হইবে যে, সামাজিক আবেষ্টনের সঙ্গে বিচ্যুতি ঘটাইয়া কোন সাহিত্যিকই সাহিত্য-সাধনা পরিচালনা করিতে পারেন না। বাহ্য জীবনের প্রভাব নিরপেক্ষ যে, একান্ত স্বপ্নময় ভাববিলাসিতা তাহা হইতে সাহিত্য স্রষ্টার মনের পরিচয় পাওয়া গেলেও কোনও গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া আধুনিক সাহিতিাক ইচ্ছা করিলেও নিজেকে আবেষ্টন-মুক্ত করিতে পারেন না—প্রতিবেশ-সমস্যা তাহার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লাগিয়াই থাকিবে। জীবন হইতে সাহিত্যিকের পলায়নের দ্বার আজ শুধু রুদ্ধ তাহা নহে, তাহা নিরর্থক। কাজেই প্রাক্ আধুনিকেরা জীবন ও সাহিত্য লইয়া যে বাদানুবাদ এক কালে চালাইয়াছিলেন তাহার আজ ঐতিহাসিক ভিন্ন অন্য কোন মূল্য নাই। তবে আজিকার আধুনিকেরা জীবনের রুদ্র আহবে মত্ত হইয়া সনাতনী সাহিত্যের কাছে যে বাস্তব জীবনের ভিটা-ছাড়ার পরোয়ানা জাহির করিয়াছেন তাহাতে জীবন ও সাহিত্যের সম্বন্ধকে আজ আবার নূতন করিয়া বিচারের কাঠামোয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হইয়াছে। বাম-পন্থীরা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন যে সাহিত্য অনেক সময় মানুষের কর্মচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করিলেও সাহিত্য রচনা কোন কর্ম-চেষ্টা নহে—বরং যিনি কর্ম-প্রযোজনায় সহিত্যিক তিনি কিছুতেই কর্মী হইতে পারেন না। সাহিত্য বস্তুনিষ্ঠ হোক কিংবা ভাব-প্রবল হোক তাহার নিজস্ব সংজ্ঞা সম্পূর্ণই ভাবাত্মক। কর্মযোগীর লিখিত মতবাদ সাহিত্য রচনা নহে; কর্মজীবন ও সাহিত্য-সাধনা পরস্পর বিরোধী। জীবনের কর্ম-পরিধি সাহিত্যের ভাব-পরিধি হইতে অনেক বৃহৎ, অনেক ব্যাপক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্য-বৃত্ত জীবন-বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত নহে। কর্মজগতে আদর্শের স্থান আছে; কিন্তু তাই বলিয়া আদর্শ কর্মকে ভাবে পরিণত করিতে পারে না কিংবা বাস্তবতা ভাবকে কর্মসংজ্ঞায় রূপান্তরিত করিতে পারে না। সাহিত্য জীবন হইতে উৎসারিত হইলেও কর্মজীবন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বামপন্থীর দ্বিতীয় স্বীকার্য মানুষের সাঙ্ঘিক সর্বস্বতা। ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি কতখানি সুনিহিত তাহা হয়ত ব্যক্তি-কেন্দ্রগ বিত্ত-সর্বস্ব সাধনার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া এ-কালের নর-নারী অনেকেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে সাহিত্য সাধনা কোন কোন স্থলে লেখকের স্বগত উক্তিতে পরিণত না হইলেও বিশিষ্ট বন্ধু মহলের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের উপভোগ্য সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া বামপন্থীর এ কথা সত্য নয় যে সাঙ্ঘিক ছাড়া ব্যক্তির রূপ নাই, শ্রেণী বিভাগ ছাড়া মানুষের কোন সংজ্ঞা নাই, গণ-সম্বন্ধ ছাড়া নর-নারীর নিজস্ব বৃত্তিগত, কল্পনাগত, আদর্শগত ব্যক্তি-জীবনের কোন সমস্যা নাই। ব্যক্তি সাধনাকে খর্ব করিতে হইবে সত্য কিন্তু তাহা করিতে হইবে আধুনিক জীবনে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া। সে যাহাই হউক, সাহিত্যাদর্শের আলোচনা করিতে গিয়া এখানে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মানুষ সঙ্ঘ-সর্বস্ব নয়, তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ, আশা, আদর্শ, ভাব-অনুভূতি সাহিত্যের একমাত্র না হইলেও বহুল পরিমাণে যে সাহিত্যিকের ধ্যান-ধারণার উপজীব্য সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই হইতে পারে না।

পরিশেষে বামপন্থীর তৃতীয় মতবাদের আলোচনা করা যাক্। তাঁহারা বলেন যে সত্যের কর্ম-নিরপেক্ষ ভাবগত কোন রূপ নাই। এই মার্ক্সীয় জড়-বাদের বিস্তৃত আলোচনা দর্শনের ক্ষেত্রেই করা সম্ভব। আমরা শুধু এখানে এতটুকুই বলিব যে মানুষ তাহার সত্য-সন্ধানের চিরন্তন অভিসারে এতাবৎ কাল চিন্তার জগতেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, সত্যকে উপলব্ধির বস্তু বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ সাহিত্যের যে সত্য তাহা প্রধানতঃ এবং বিশেষভাবে সৌন্দর্যের সত্য। সাহিত্য, দার্শনিক মতে যাহা সত্য তাহাকে খর্ব করিতে পারে কিন্তু ভাবের সৌন্দর্যকে আঘাত করিতে পারে না। কাজেই সত্য ও সৌন্দর্যের যে অভিন্নতা তাহা দর্শনের ক্ষেত্রে যথার্থ হইলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার কোন প্রামাণ্য নাই। সাহিত্যের উপজীব্য, সৌন্দর্য বা ভাবের সত্যতা। এই সাহিত্যিক সত্য দার্শনিক সত্য হইতে বিভিন্ন কিন্তু দার্শনিক মতে এই সাহিত্যিক সত্যেরও একটা নিজস্ব সত্যতা-গৌরব আছে। কাজেই একথা বলা চলে না যে কর্মনিরপেক্ষ যে ভাব প্রকাশ তাহার কোন দার্শনিক মূল্য নাই। আসল কথা মার্ক্স-বাদী বিবর্তমান বিশ্ববিধানের চঞ্চল রূপটী প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রত্যেক মানুষকেই সেই লীলায়িত বিবর্তনের অংশ মাত্র মনে করিয়া তাহার ব্যক্তিগত ভাবের সত্ত্বাকে নিরর্থক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সুরমা মিত্র

শরতের নির্মল প্রভাতে আজ সুনীল আকাশে শুভ্র মেঘখণ্ডের লীলা অপরূপ সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। উজ্জ্বল আলো শ্যামল পল্লবে দূর্বাদলে স্নিগ্ধ হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মৃদু বায়ুর হিল্লোলে বাতায়নের সম্মুখের চাঁপা গাছের পত্রদলে কৌতুক-নৃত্যের আভাস দেখা যাচ্ছে, সব মিলে মনে হচ্ছে—কি সুন্দর, কি আনন্দ। কিছুদিন পূর্বে বর্ষার ঘনঘটার আড়ম্বরে যখন দিনের আলো ম্লান ও স্নিগ্ধ হ'য়ে থাক্‌তো, অবিরল বর্ষণে সিক্তপত্র বৃক্ষ, জলপ্লাবিত শ্যামল মাঠ, যখন সরল চিক্কণ শোভায় দেখা দিয়েছিল তখনও আনন্দে বলেছিলাম কি সুন্দর, কি স্নিগ্ধ, প্রকৃতির এই রসভারাবনত মূর্তি! এমনি করে ঋতুতে ঋতুতে বিচিত্র সৌন্দর্যের লীলা চলে প্রকৃতির অঙ্গনে, দিন হ'তে রাত্রে, রাত্রি হ'তে দিনে। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারের স্তব্ধতায়, তারকার উজ্জ্বল জ্যোতিতে, আবার রাত্রির প্রান্তভাগে প্রভাত আলোর স্ফুরণে দিবসের পদসঞ্চরণ রেখায় রেখায় প্রোদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে ক্ষণ হতে ক্ষণে, দিন হতে দিনে, বিহঙ্গের কলগুঞ্জরণে, বর্ষার মেঘচ্ছায়ায়, শরতের সুনীল আকাশে, শুভ্র কাশ পুষ্পের বিকাশে—প্রকৃতির বিচিত্র বিভ্রম বিলাসে মানুষের মন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, আনন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ হ'য়ে যায়। প্রকৃতির এই যে বিচিত্র রূপের

প্রকাশ, তার মধ্যে একদিকে সৃষ্টি, আর একদিকে বিনাশ, একদিকে নূতনের বিকাশ, আর একদিকে বিলয়। অজস্র দাক্ষিণ্যে চলে প্রকৃতির সৃষ্টির লীলা, আবার নির্মম হস্তে সেই সৃষ্টকেই সে নাশ করে। যে ফুলটিকে অম্লান শোভায় প্রভাত আলোয় বিকশিত ক'রে তোলে, সন্ধ্যার অন্ধকার তাকেই ঝরিয়ে ফেলে ভূমিতলে, বসন্তে নূতন পল্লবে যে বৃক্ষকে মুঞ্জরিত করে তোলে, গ্রীষ্মে তাকেই দাবদাহে শুষ্ক করে, বর্ষণে যাকে সঞ্জীবিত ক'রে, শীতবায়ুর স্পর্শে তাকেই বিশুষ্ক বিবর্ণ ক'রে অবহেলায় ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত ক'রে ; আবার আসে নূতন পত্রোদ্গমের উৎসব, এইরূপে পরিবর্তনের পটভূমিকায়, সৃষ্টি ও বিনাশের ক্রমিক পদসঞ্চরণে প্রকৃতির সৌন্দর্য বহুধা বিকশিত হ'য়ে ওঠে। তাই বর্ষার দিনে বর্ষণমুখর প্রকৃতি আমাদের আনন্দে অভিষিক্ত ক'রে আবার শরতের মেঘমুক্ত আকাশ আমাদের অভিনন্দিত ক'রে। অসীম সাধনায় ও নৈপুণ্যে যেরূপ রেখাটি বিশ্ব-শিল্পী ফুটিয়ে তোলেন ফুলের পাপড়িতে, মেঘের রেখায়, পাখীর পাখায়—আবার নির্মম ঔদাসীন্যে তাকেই অবলীলায় মুছে ফেলেন। রূপ হ'তে রূপান্তরে প্রকৃতির নিত্য বিহরণ, আনন্দে মুখর ও সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। তাই তার মধ্যে যেমন আছে সৃষ্টির বিলাসলীলা, তেমনি আছে নির্মম বৈরাগ্য, যার শক্তিতে সে যা কিছু গড়ে তুলেছিল তাকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে যায়, কিন্তু তাতে তার প্রাচুর্যের ক্ষয় হয় না, আনন্দ পরাজিত হয় না। সকল পরিবর্তনের মধ্যে, উদয় ও তিরোধানের মধ্যে আমরা কৌতুকময়ীর নৃত্যচপল নুপুর গুঞ্জন শুনতে পাই, প্রভাতের আলোকরেখায় সন্ধ্যার বর্ণোদ্ভাসে, বৃক্ষপল্লবের ঈষৎ আন্দোলনে এক অনন্ত আনন্দ-উৎসের ধারার স্পর্শ পাই। মনে হয় প্রাণপর্যায়ের এই বুঝি মূলরহস্য যে রহস্য অফুরন্ত লাবণ্যে প্রাণের সঞ্জীবনে, নিত্য উৎসারিত হয়ে উঠেছে, দিকে দিকে শ্যামল পল্লবে, মানুষের প্রাণে ও মনে।

প্রকৃতির শতসহস্র বিকাশের মধ্যে মানুষও ত একটি, তাই প্রকৃতির রহস্যের ছায়া মানুষের মধ্যেও আমরা প্রতিফলিত দেখতে পাই। প্রকৃতির যে দুইটি বিভিন্নরূপ দেখতে পাই, একটি তার খণ্ড খণ্ড, ক্ষুদ্র সৃষ্টিতে, আর একটি তার সকল সৃষ্টিকে অতিক্রম করে, যে শাশ্বত স্বরূপ আছে, আবির্ভাব ও বিনাশের মধ্য দিয়ে যা রূপে, বর্ণে, গন্ধে, স্পর্শে আপনাকে নিরন্তর প্রকাশ ক'রে কিন্তু তাহাতেই নিঃশেষিত নয়। মানুষের মধ্যেও সেই দ্বৈত আমরা প্রত্যক্ষ করি। আমাদের একটি সাংসারিক সত্ত্বা আছে যে সকল প্রকারের জীবন ধারণের উপযোগী আয়োজনে ও ভোগে নিত্য ব্যাপৃত, জৈবপ্রয়োজনে একান্তভাবে শৃঙ্খলিত, আর একটি সত্ত্বা আছে যে সকল প্রকার প্রয়োজন ও হিসাবের বাহিরে। একটি স্বরূপ আমাদের দুঃখে সুখে, উত্থান পতনে একান্ত বিপর্যস্ত পরিবর্তনশীল জীবনের প্রবাহে নিরন্তর স্পন্দমান, আর একটি স্বরূপ আছে—সকল প্রয়োজন বিনির্মুক্ত, প্রসন্নতায় সমুদ্ভাসিত। এই মুক্ত স্বরূপটির আভাস আমরা পাই কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, জ্ঞানীর সাধনায় যোগীর যোগাসনে। মানুষ যখন সর্ববিধ দৈব প্রয়োজনের প্রাণিসুলভ প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে, আর একটি গহন অন্তর্লোকের আভাস পায়—তখনই সে আপন বিশুদ্ধতর সত্ত্বা ও গভীরতর আনন্দের সন্ধান পায়। সৌন্দর্য ও আনন্দের সেই উৎসকে তুচ্ছতার স্পর্শ আবিল করতে পারে না, লোভ, ঈর্ষা মলিন করতে পারে না। যে ঘাত ও সঙ্ঘাত জীবনকে নিরন্তর সংক্ষুব্ধ করে তোলে—বিচিত্র অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে—তারই তটদেশে দাঁড়িয়ে উদাসীন, শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত যে স্বরূপ আমাদের অন্তরে প্রোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তারই আলোকে নূতন সত্য, নূতন অনুভূতি, নূতন তথ্য, নূতন আনন্দ জীবনকে অভিষিক্ত

করে সকল ক্ষয়-ক্ষতিকে তুচ্ছ করে। ব্যক্তিকে অতিক্রম ক'রে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই যে অন্তর্যামী আছেন তিনি আনন্দে আত্মপ্রকাশ করেন কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, সেবায়, মানুষের প্রতি প্রেমে। সেই গহন লোকের উদ্ভাসে আমরা এমন প্রেমের স্পর্শ পাই যা বৃহৎ ক'রে,—এমন আনন্দের সন্ধান পাই যা স্বচ্ছ সাবলীল প্রবাহে জীবনকে অভিষিক্ত ও মধুর ক'রে তোলে, এবং যে প্রীতি কোনও প্রাপ্তির অপেক্ষা রাখে না, কেবলমাত্র আপ্লাবনে হৃদয়কে সুস্নিগ্ধ ক'রে, যে দেওয়াতে প্রার্থনা থাকে না, আপনার মহৎ ঐশ্বর্যের পরিচয় যে আপনি বহন ক'রে আনে—সেই প্রীতি, ও আত্মদানেই সেই অন্তর্মহিমাকে বাহিরের জগতে সূচিত ও উদ্ভাসিত করে তোলে।

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আশৈশব প্রকৃতির লীলানিকুঞ্জে আনন্দের উৎসে যে রহস্যটি নিরন্তর নির্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে—তারই স্পর্শে, নিয়মে আমরা নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত হয়ে এসেছি। প্রকৃতির বিধানে আমাদের আবির্ভাব। তারই বৈশিষ্টের ছাপ আমাদের অন্তরে আমাদের প্রকৃতিতে তাকেই অনুসরণ করার প্রেরণা অনুভব ক'রতে পারি। সেইখানেই আমাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র, সেই লীলা নিকেতনই আমাদের শিক্ষালয়। সামাজিক ও সাংসারিক বিধানে মানুষ নানাবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তার মধ্যে দুইটি বিভাগ দেখতে পাই একটি জৈব প্রয়োজনের অনুকূল শিক্ষা, যান্ত্রিক ও ব্যবহারিক নানা প্রকারের। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গ ও অবসরে সেই বিষয় এখানে আলোচ্য নয়। শিক্ষার আর একটি বিভাগের উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে সকল প্রয়োজনের বাহিরে, যে ব্যাপকতর মুক্তস্বরূপ আছে তাকেই জাগ্রত করা। তাই আমাদের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প প্রভৃতির পাঠের, আলোচনার ও শিক্ষার ব্যবস্থা দেখ্‌তে পাই। যুগে যুগে যে লোকাতীত আনন্দের আস্বাদে মানুষের চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে—তারই স্পর্শ ও উদ্বোধনে শিক্ষার্থীদের চিত্ত জাগ্রত হোক, এই উদ্দেশ্য তার মূলে আছে। আপনার অন্তরের যে রসমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে কালিদাস পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, শেক্সপীয়র মানব-চিত্তের যে রহস্য উন্মোচন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যে সৃজনানন্দে আত্মহারা হোয়েছিলেন, দার্শনিক যে অভিনব তত্ত্বের আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, যে প্রেমে বুদ্ধ প্রভৃতি নিমগ্ন হ'য়েছিলেন—তারই সঙ্গে ঐক্যতানতায় মানুষ আপনার মধ্যে আর একটি বৃহত্তর, সুন্দরতর, মহত্তর স্বরূপকে উপলব্ধি ক'রতে পারে। আমাদের নিজেদের মধ্যেই সেই অতি-মানবের স্পর্শ লাভ ক'রতে পারলে সকল দুঃখ সুখ ঘাত-সঙ্ঘাত আমাদের বিপর্যস্ত ক'রতে পারে না, আনন্দকে মলিন ক'রতে পারে না, সে সকল তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে রমনীয় ক'রে। দুঃখশোকের ও ব্যর্থতার মধ্যেও প্রকৃতির অঙ্গনে নটরাজের যে নৃত্যধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠ্‌ছে, তারই রেশ শুন্‌তে পাই এবং তখনই সংসারের মধ্যে থেকেও সংসাররতীতের দর্শন আমরা পাই। পুষ্পকোরক যেমন ক'রে তার পাপড়ির আবরণ উন্মুক্ত ক'রে বিশ্বসভার সৌন্দর্যকে অভিনন্দিত ক'রে, তেমনি ক'রে যেন শিক্ষার্থী আপন আবরণ উন্মোচন করে গহনলোকে প্রস্ফুটিত হতে পারে। আপনার নির্মল স্বরূপকে উপলব্ধি ক'রতে পারে, সকল দৈনন্দিন আবর্জনাকে ধৌত ক'রে, প্রেমে সহজ, আনন্দে সার্থকতায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, নূতন উন্মেষে জ্ঞানের ও প্রেমের দীপ্তিতে জগতকে সুন্দর ও মধুর ক'রতে পারে নিজেকে সৃষ্টি ক'রতে পারে নূতন রূপে।—নূতন আলোকে তার হৃদয়দল বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে—এই হ'ল শিক্ষার মূল রহস্য। প্রকৃতির এই মর্মকথাটি তাই বাণীহীন নিঃশব্দ সঙ্গীতে আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে।

ভারতীয় স্থপতি শিল্পের দাবী

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্থাপত্য-বিশারদ

আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্যা এতদূর জটীল হইয়া উঠিয়াছে যে সমস্যার সমাধানকামী নেতারা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত, সমাজ ও জাতির কল্যাণকর সংস্কার-কার্যে মনোনিবেশ করিতে অবসর পান না। তাঁহারা বলেন যে রাজনৈতিক পরাধীনতা হইতে দেশকে মুক্ত না করিতে পারিলে দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির উদ্ধার সম্ভবপর নয়। পরাধীন, দরিদ্র অবস্থায় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা যে সম্ভবপর নয় সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই অজু-হাতেই যে শিল্প ও সংস্কৃতিকে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত, একেবারে অনাহারে রাখিতে হইবে এইরূপ যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে অক্ষম। বিগত পঞ্চান্ন বৎসর যাবৎ কংগ্রেস, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। আরও বহুবৎসর কংগ্রেসকে এই সম্পর্কে যুদ্ধ করিতে হইবে হয়ত। কিন্তু দুই সহস্র বৎসর কালের জ্বলন্ত স্থাপত্যের অনল ততদিনে নিভিয়া যাইবে যে। অতঃপর, স্বরাজ পাওয়া সত্ত্বেও জাতির শ্রেষ্ঠতম গৌরব, ও পৃথিবীপ্রসিদ্ধ ভারতের স্থাপত্যকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে না, অবিলম্বে যদি সমগ্র ভারতবাসী তাহা করিতে সচেষ্ট ও সক্রিয় না হন। সে কথা তাঁহারা ভাবেন কি ?

বহু সহস্রবর্ষব্যাপী সুসভ্য জাতির সনাতন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম অবদান স্বরূপ, আমাদের [যে অনিন্দ্য সুন্দর, মহান, স্থাপত্য-শিল্প তাহাকে রক্ষা করা অবিলম্বে প্রয়োজন। স্থাপত্য-শিল্পের মহীরুহকে পুনর্জ্জীবিত করিলে, চিত্র ও ভাস্কর্য প্রভৃতি সুকুমার চারু ও কারু শিল্পের শাখা-প্রশাখাগুলি সহজেই রক্ষা পাইবে। যেহেতু স্থাপত্যই সুকুমার শিল্পের জননী স্বরূপিনী। সভ্য জগতের সর্বদেশে এবং সর্বকালে উক্ত সুকুমার শিল্পগুলি, স্থাপত্যকলার বিশিষ্ট অঙ্গরূপেই বিবেচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ স্থাপত্যের প্রসারিত পক্ষপুটে আশ্রয় লাভ করিয়াই অন্যান্য শিল্পগুলি প্রবর্দ্ধমান ও পরিপুষ্ট হইত। ভারতের প্রাচীন দেবায়তনের গাত্রে, সৌধপ্রাসাদে, ভারতীয় চিত্র, তক্ষণ, মৃন্ময়, ধাতু ও দারু-শিল্প অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত থাকিত। স্থাপত্যের অনুষ্ঠানই যাবতীয় শ্রেণীর রূপ-কর্মীর গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া দিত।
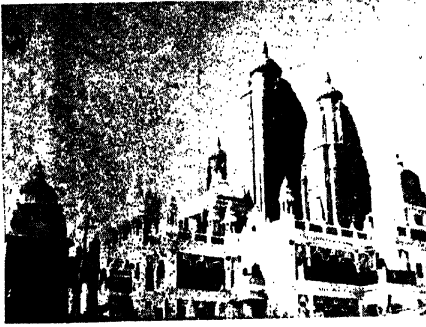
লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, নয়াদিল্লী।

মন্দির ও শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু জাতির চিত্ত ও চরিত্রের অনুশীলন ও পরিস্ফুরণ হইয়াছিল। হিন্দুর শিক্ষা ও সভ্যতা, রাষ্ট্র ও সমাজ, সাহিত্য ও শিল্প বিজ্ঞান ও দর্শন এবং তাহার আচার, অনুষ্ঠান, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই মন্দিরের আশ্রয়ে যুগে যুগে নব নব রূপে গঠিত হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক ও বৌদ্ধ যুগে, এবং পরবর্তী গুপ্ত যুগে, শিল্পের ধ্যান ধারণায় ভারতের নাগরিক জীবন বিভোর থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য পার্থিব সম্পদ হইতে তাহা বঞ্চিত ছিল না। তৎকালীন রাজন্য ও শ্রেষ্ঠীবর্গ, এমন কি গৃহস্থ নাগরিক পর্যন্ত, চিত্র ও ভাস্কার্যবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। আর্যভারতে স্থাপত্যবিদ্যা উপবেদের অন্তর্ভুক্ত হয়। মহাভারত ও রামায়ণের রাজসভা বর্ণনায় সুবিন্যস্ত স্থাপত্যকলার আভাস পাওয়া যায়।

বিড়লাপার্কে শিবমন্দির, কলিকাতা।

পিতৃদেবের অসুখের সংবাদ শ্রবণে ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যাতে আসিবার কালে রাজধানীর প্রবেশ তোরণের সম্মুখে দশরথের তক্ষণ মূর্তি দেখিয়া বিলাপ করেন। স্বর্গগত নরপতির প্রতিমূর্তি সহর প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রথা ছিল তৎকালেও। স্বর্ণসীতা পাশে বসাইয়া রামচন্দ্র যজ্ঞের আহুতি দিয়াছিলেন। দশাননের ছায়াচিত্রকে স্মরণ করিয়া সীতাদেবী অযোধ্যার রাণী-মহলের প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রতিকৃতি আঁকিয়াছিলেন।

মগধ অর্থাৎ গিরিব্রজের রাজধানী, আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার বিম্বিসার ও অজাত-শত্রুর রাজগৃহ, স্থাপত্য সৌধমালায় পরিশোভিত ছিল। সেই যুগে কপিলবস্তুর রাজকুমার শাক্য সিংহকে বিবাহের পূর্বে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল যে তিনি শুধু সুপণ্ডিত নহেন, চিত্র-সঙ্গীত-ভাস্কর্যাদি কলা বিদ্যাতেও তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী। নৈরঞ্জনা তটবর্তী বুদ্ধগয়ার ছায়া শীতল বোধিদ্রুম নিম্নে বজ্রসিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিতে অসমর্থা মারের তনয়া, পিতৃসকাশে বুদ্ধের মহিমা বর্ণন করার কালে খেদ করিয়াছিলেন—আকাশের পটে রঙীন চিত্র অঙ্কিত করা সাধ্যায়ত্ত কিন্তু নারীর রূপ ও ছলাকলা দ্বারা বুদ্ধের চিত্ত জয় করা অসম্ভব। পালি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে বুদ্ধদেব রাজগৃহে জীবকের আম্রবনে নির্মিত বিহারের স্থাপত্যের তত্ত্বাবধান করিতেন।
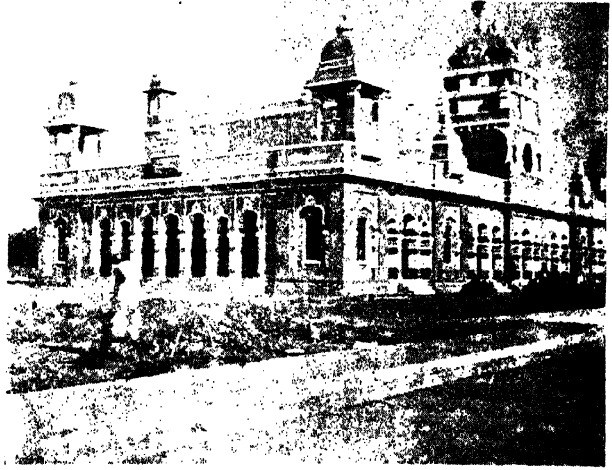
হিন্দুমহাসভাভবন, নয়াদিল্লী।

প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠী ও বণিকবর্গের প্রেক্ষাগৃহ, প্রমোদশালা, সঙ্গীত ও নৃত্যমণ্ডপ—স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও উজ্জ্বলবর্ণের চিত্রদ্বারা শোভিত করা হইত। "মৃচ্ছকটিক" নাটকে বসন্ত-সেনার আবাস ভবনের বর্ণনায় তৎকালীন স্থাপত্য ও শিল্পকলার বৈশিষ্ঠ লিপিবদ্ধ আছে। বৈশালী, উজ্জয়িনী, মথুরা ও পাটলিপুত্রের নায়িকারা চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেন। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, আবৃত্তি, চিত্র ও মূর্তি নির্মাণ বিদ্যায় পারদর্শিনী না হইলে সেই যুগের গণিকারাও নিন্দনীয় হইতেন। সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির গ্রন্থমালা প্রত্যেক

মহিলার পাঠাগারে সজ্জিত থাকিত। রূপে, গুণে, পাণ্ডিত্যে অতুলনীয়া ও সর্ববিধ কলাকুশলা, বারঙ্গনা শ্রেষ্ঠা অম্বপালিকার অভিজাত সমাজের প্রত্যেক স্তরে অসামান্য প্রভাব প্রতিপত্তির ও সর্বশেষ তাঁহার বুদ্ধের চরণে আত্ম-নিবেদনের কাহিনী ভারতের ইতিবৃত্তে স্থান পাইয়াছে।

ফুলগাছের আধার—পদ্ম পত্রের উপরে পদ্মকোরক।

সেকালের শিল্পীরা রাজা-প্রজা সকলেরই পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হইতেন। দরিদ্রা-মহিলা এবং বিধবারা প্রাসাদ ও মন্দির কক্ষ, গৃহ ও প্রমোদ ভবন, সুকুমার শিল্পধারা সুসজ্জিত করিয়া অর্থোপার্জন করিতেন। এই যুগেও এবম্বিধ কলাকুশলার অস্তিত্ব বর্তমান। কয়েক বছর পূর্বে মবাল্লোর পর্যটন কালে আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম মহারাণাদের প্রাসাদের একটি কক্ষের দেওয়ালগাত্রে চিত্রাঙ্কণে ব্যপৃতা মলিন বসনা রাজপুত রমনী। শুনিয়াছিলাম যে রমণী চুরির অপরাধে জেলের কয়েদী। দরিদ্র কৃষক কন্যা। রাজস্থানে একদা চিত্র-কলার কিরূপ প্রসার ছিল তাহা উক্ত রমণীর দৃষ্টান্ত হইতে বোধগম্য হয়। মেবার রাজ্যে কৈলবারা ও কুম্ভলগড় (কমলমীর) প্রভৃতি মধ্য যুগের শহরে অদ্যাপি গৃহস্থ বাটির দেয়ালগুলি স্ত্রী লোকের দ্বারা চিত্রিত করা হয়। আমি কয়েকটা চিত্রের আলোক চিত্র লইয়াছিলাম। যোধপুর ও মেবারের সঙ্গম স্থলে ভীল পল্লীর পর্ণকুটীরে দেখিয়াছি স্ত্রীলোকেরা ভৈঁরো (ভৈরব) সিংহবাহিনী প্রভৃতির মৃন্ময়মূর্তি নির্মান করিতেছেন। দক্ষিণ ভারতের জননী ও কন্যা আবহমান কালের অলিখিত শিল্প-রচনার রীতি-পদ্ধতিকে নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের সহিত বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

পোড়া মাটি ও সিমেন্টের কাজের নমুনা।

অধুনাতন ভারতের ধন-কুবেরগণ প্রভূত অর্থব্যয়ে আধুনিক আমেরিকান ও রোমান ধরণের সৌধ মন্দির ও উদ্যান প্রস্তুত করাইয়াছেন। কিন্তু সেই সকল উদ্যানে গমন করিলে প্রাচীন ভারতের প্রমোদ উদ্যানের কোনও প্রতি-চ্ছবি পরিলক্ষিত হয় না। সংস্কৃত ও পালি-সাহিত্যে নরপতি ও শ্রেষ্ঠীদের প্রমোদ কাননের, অচ্ছোদ সরসী-নীরে ভাসমান বিলাস ভবনের যে উজ্জল বর্ণনা আছে তাহাতে সমগ্র চিত্রটি পাঠক-পাঠিকার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। প্রাচীন ভারতের যন্ত্রধারা গৃহ, প্রেক্ষাগার, নৃত্যশালা, সাগরগৃহ, মনিশিলাপট্ট, মানমন্দির, বসন্তমঞ্চ, দোলকুঞ্জ, মাধবীকুঞ্জ, তমাল বীথিকা, বকুল বীথিকা তাহাদের প্রাচীন নামের মোহ-মাধুরিমা লইয়া কেবল মাত্র প্রাচীন গ্রন্থেই অধিষ্ঠিত আছে কিন্তু এই কালে ও আমাদের ফুলবাগানে তাহাদের সন্নিবেশ করা কষ্টসাধ্য অথবা অর্থ-সাপেক্ষ নহে। বীকানের, যোধপুর, উজ্জয়িনী ও কাশ্মীরে সেরূপ উদ্যান আমি দেখিয়াছি।

সুদূর অতীতের পঞ্চনদের তীরে যে আর্য-সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল, পাঁচহাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকার মোহেন-জো-দড়ো এবং হরপ্পায় যে দ্রাবিড় সাহিত্য ও শিল্প-কলার নিদর্শন পাইয়াছি, তাহাই পরবর্তী যুগের হিন্দু ভারতের সংখ্যাতীত মঠ ও মন্দিরের বিজয় বৈজয়ন্তির তলে পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়। অজন্তা, এলোরা, ভুবনেশ্বর, দিলবারা, মাদুরা, পশুপতিনাথ, ওঁকারধাম ও তাজমহল বিশ্ব-সভ্যতার দরবারে ভারতবাসীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান নিরূপিত করিয়াছে। ভারতের স্থাপত্য ও ললিতকলা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিরূপী মহাদ্রুমের ফুল ও ফলের স্বরূপ। ভারতের দেবায়তন হইতেই ভারতের সভ্যতা ও প্রতিভার সর্বমুখী বিকাশের প্রমাণপঞ্জী পাওয়া যায়। ভারতের অসাধারণ স্থাপত্যকলা, ভারতের অনবদ্য শিল্পসুষমা মণ্ডিত মন্দির ও হর্ম্য, দেউল ও মঠ মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য নিরীক্ষণ করিলে যে কোনও সভ্যমানব, সুদূরের বিদেশী, ভারতের সভ্যতার অন্তরাত্মার আলেক্ষ্য পাইবেন যাহা বেদ পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত, ধর্ম, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষ, শিল্প-শাস্ত্র, সাহিত্য ও কাব্য হইতে বহুকাল ধরিয়া অধ্যয়ন করিলে পাওয়া যায়। হিন্দুর এক একটি দেব মন্দির, বিজয়নগরের এক একটি প্রাসাদ নিকেতন, হিন্দুর শিক্ষা ও সভ্যতার, কল্পনা ও সৃজন শক্তির প্রস্রবন স্বরূপ।

কাল চক্রের আবর্তনে এবং বিভিন্নমুখী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সভ্যতার আকর ভূমি ভারতবর্ষ আজ নানা ভাবে বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্থ। সেই হেতু হিন্দুর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন ও অধোগামী, ভিতরের ও বাহিরের নানা সংঘর্ষ ও সংঘাতের কবল হইতে সে আজ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ। দারিদ্র, কু-শিক্ষা ও কুসংস্কার আজ তাহার অন্তরাত্মাকে আহত ও কলুষিত করিয়াছে।

ভারতের স্থাপত্যের পূর্ণচন্দ্রমাতে আজ গ্রহণ লাগিয়াছে। স্থাপত্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার শিল্পের প্রেরণা ও প্রয়োজনীয়তা অন্তর্হিত প্রায়। পৃষ্টপোষকতার অভাবে শিল্পীর সংসারে অন্নবস্ত্র নাই। এ হেন সমস্যার জন্য দায়িত্ব আরোপ করা যায় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উপর, যাঁহারা স্থাপত্য বিজ্ঞানকে বিদ্যামন্দিরের পাঠ্যতালিকা হইতে জাতি-চ্যুত করিয়াছেন এবং আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিচার-শক্তি হীনতার উপর—যাহা পাঁচহাজার বছরের অধিক প্রাচীন, পৃথিবী প্রসিদ্ধ, নিজস্ব স্থাপত্যের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র চিত্র ও মূর্তি-শিল্পের প্রশংসা প্রচার ও প্রসারের জন্য আন্দোলন, সাহিত্য সম্মেলন ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, বছরের পর বছর ধরিয়া।

চিত্রকলার পক্ষপাতী বিগত ত্রিশ বৎসর ব্যাপী, এবম্বিধ আন্দোলন স্থাপত্যের আবেদনকে প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছে। চিত্রের সঙ্গে যদি স্থাপত্যেরও পুনরুদ্ধারের [illegible] পরিচালিত হইত তাহা হইলে, সর্বাঙ্গীন ভাবে পরিণত ও প্রসারিত হইয়া, ভারতের সর্বশ্রেণীর শিল্পগুলি ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ হইয়া উঠিত। উদরান্নের জন্য শিল্পীদের হাহাকার করিতে হইত না।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে নয়াদিল্লীর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির এবং অন্যত্র সৌধ, ভবন, বিহার, মন্দিরের নির্মান কার্যে আমরা বহুসংখ্যক চিত্র, ভাস্কর, ধাতু ও দারুশিল্পীদের প্রচুর পরিমানে পরিশ্রমিক দিয়াছি। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়র কণ্ট্রাক্টর মেসার্স এম, এল, ডালমিয়ার তত্ত্বাবধানে কলিকাতার সেণ্ট্রাল এভিনিউএ যে আকাশচম্বী স্মৃতি ভবন ও মন্দির (মহাত্মা সূরজমল নাগরমল জালানের স্মৃতি রক্ষাকল্পে) নির্মিত হইয়াছে তৎপ্রসঙ্গেও দেশীয় শিল্পীরা প্রভূত অর্থোপার্জন করিয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার জনপ্রিয় অর্জ্জুনপ্রসাদ ডালমিয়া, ভারতে স্থাপত্যের রক্ষাকল্পে একনিষ্ঠভাবে কার্য করিতেছেন এবং ছাত্রশিল্পী ও রাজমিস্ত্রী তৈয়ার করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় সাধারণ গৃহস্থের অনাড়ম্বর ভাবের, সস্তা বসত বাটিও দেশীয় ভাবে নির্মিত হওয়ায়, স্ত্রী পুরুষ শিল্পীরা কাজ পাইয়া উৎসাহিত হইয়াছেন।

স্থপতি সম্পর্কে আমাদের দেশের পুরুষেরা তো উদাসীনই অন্যপক্ষে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থা এরূপ যে তাহাতে স্থপতি শিক্ষার কোনো সুযোগই মেয়েদের পক্ষে উন্মুক্ত নয়। অথচ অতীত ভারতে মেয়েরা সুধু সুকুমার শিল্প নয়, স্থপতি শিল্পেও যথেষ্ট পারদর্শিনী ছিলেন। অথচ ইহা নাকি প্রগতির যুগ, তবে এইদিক দিয়া ভারতীয় মেয়েরা নিজেরাই যে ক্রমে ক্রমে উৎসাহী হইয়া উঠিতেছেন তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ও তাহাতে আশাও হয়। কিন্তু নেতাদের এ বিষয়ে অমার্জনীয় উদাসীনতার একটি উদাহরণ দিতেছি।

কলিকাতায় একটি ভারতীয় স্থাপত্য-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হ'লে, নিখিল ভারতের স্থাপত্য শিল্পের একটি বিশিষ্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করার প্রয়োজনীয়তাও বিবেচিত হয়। তজ্জন্য শ্রদ্ধেয়া লেডী প্রতিমা মিত্রের আবাস ভবনে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক মণ্ডলীর একটি সভা আহুত হয়। সেই সভার সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া স্থানীয় কলেজগুলির কতিপয় ছাত্রী ও অধ্যাপিকা এক আবেদন পত্র পাঠাইয়াছিলেন এই মর্মে, যে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ মেয়েদের স্থাপত্য অথবা সুকুমার শিল্প শিক্ষার কোনও প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই, এমন কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে এবং গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলেও দেশীয় স্থাপত্যের শাখা নাই। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাঙ্গালী ছাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্রস্তাবিত স্থাপত্য-বিদ্যালয় ও প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষেরা যেন এরূপ ব্যবস্থা করেন যাহাতে ছাত্রীরা শ্রেষ্ঠতম স্থাপত্যশিল্পের শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিতা না হন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে কংগ্রেস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ সে সভায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ছাত্রীদের আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই।

আমার বিশ্বাস চারু ও কারু শিল্পের সৌন্দর্য সুষমা পরিকল্পনা করিবার যোগ্যতা পুরুষের চেয়ে মেয়েদের কোন অংশে কম নয়। বাসভবন কিরূপে প্রয়োজনের উপযোগী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে বরং তাঁহাদের আগ্রহ, ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা বেশী দেখা যায়। উত্তর ব্রহ্মের শাণ, কোচিন ও চীন প্রদেশের গণ্ডগ্রামেও আমি দেখিয়াছি স্থানীয় রমণীদের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে সুদৃশ্য অথচ অনাড়ম্বর কুটীর ও মন্দির নির্মিত হয়। তাহার কারণ ব্রহ্মদেশের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ব্রহ্মরমণীর যেরূপ স্বাধীনতা আছে পৃথিবীর অন্যত্র স্ত্রীলোকের সেইরূপ অবাধ স্বাধীনতা নাই। ফলতঃ বনে জঙ্গলে হাতীধরা হইতে জেলের দারোগা হওয়া পর্যন্ত কর্মজীবনের প্রতিস্তরেই ব্রহ্মমহিলার প্রাধান্য। সুখ ও শান্তির লীলা-নিকেতন, স্বচ্ছন্দগতি সামাজিকজীবন প্রবাহের ঐক্যতান, ঐ স্বচ্ছতোয়া ইরাবতীর তটচুম্বী সুবর্ণ-ভূমিতে বিরাজিত ও মুখরিত।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত মন্দির, ভবন ও শিল্পকার্যের নমুনাগুলি লেখক শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্থাপত্য বিশারদ, কর্তৃক পরিকল্পিত ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে নির্মিত। তাঁহার সহকারী স্থপতি ও কৃতীছাত্র শ্রীযুক্ত মণিলাল রায়ের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদীয়মানা স্থাপত্য শিল্পী, বিবিধ কলাকুশলা, কুমারী বুলবুল মিত্র, এম,-এ. পরিকল্পনা ও মডেল নির্মাণের কার্যে আংশিক ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর মেসার্স এম, এল, ডালমিয়া কোম্পানীর সুযোগ্য কর্ণধার শ্রীযুক্ত অর্জুন প্রসাদ ডালমিয়া কয়েকটী মন্দির ও ভবন নির্মাণের জন্য দায়ী।

[প্রবন্ধ লেখক

দক্ষিণ ভারতীয় রমণীর স্বাধীনতা বঙ্গবালার অপেক্ষা অনেক অধিক। বহুশতাব্দীকাল সেখানকার স্বাস্থ্যবতী, সদানন্দময়ীরা বাহিরের মুক্ত আলো ও বাতাস উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত নৃত্যের প্রতি অনুষ্ঠানে মারাঠী, গুজরাটী, পার্শী মহিলাদের প্রভুত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়।

হ্যাভেল লিখিয়াছেন "কেবল মাত্র রুচির অনুরোধেই যে ভারতের স্থাপত্যকে সংরক্ষণ করিতে হইবে, তাহা নহে, জাতির কার্যকারিতা শক্তি ও চরিত্রের আদর্শের রক্ষাকল্পেও করিতে হইবে। সহস্র সহস্র বর্ষজীবী অনাবিল শিল্পধারাকে বিদেশী-শিল্পের চরণে আহুতি প্রদানের প্রতিদান স্বরূপ, প্রতীচ্যের প্রদত্ত সকল সাহিত্য ও সমগ্র বিজ্ঞান লাভেও তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে না। অধীনতার কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভেও নয়। দেশের শিল্পের ধ্বংসের বিনিময়ে "স্বরাজ" পাইলেও দেশবাসীকে বিদেশীর ক্রীতদাস এবং জড় হইয়াই থাকিতে হইবে।"

চিমনীর ওপর শকুনি

গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

রেল লাইনের এপারে শ্রমিকদের বস্তী। ওপারে মিল। কাজে যায় সব রেল লাইনের তলা দিয়ে। এফোঁড় ওফোঁড় একটা সুড়ঙ্গ।

ভোর সকালে ওপারে ভোঁ বাজে। এপারের যত সব পিলপিল করে গর্তে গিয়ে ঢোকে। নীরব ব্যস্ততায় দিনের শেষে যেন পরিশ্রান্তি নেমে আসে! চিমনীর মুখে ধোঁয়া পড়ে এলিয়ে। পাশ দিয়ে মেল গাড়ীটা ঝক্‌ঝক্ করে চলে যায়। রেলের লাইন থেকে রোদ গিয়ে পড়ে চিমনীর গায়ে। আলোর পৃথিবী আসে নিভে। মাঠ থেকে পাখীগুলো কোলাহল তুলে বাসায় ফেরে।

কলের ছুটি হয়, ভোঁ বাজে। যেন মোষের পাল, কাতারে কাতারে বেরিয়ে আসছে। ওপারে রেল লাইন। নীচে সুড়ঙ্গ। অন্ধকার পাতালের ভিতর দিয়ে তারা এপারে উঠে আসে।

খেমন ক্রমেই পিছিয়ে পড়ে। ভীড়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে না। পরিশ্রান্ত, তার ওপর জ্বর এসেছে। দেহটা গুটিয়ে গেছে। হাড়ের খিলেনগুলো গেছে খুলে। কোন রকমে শরীরটাকে সামনে ঠেলে নিয়ে চলে।

ঘরে এসে আর দাঁড়াতে পারে না। বাইরে খাটিয়া পাতা থাকে, শুয়ে পড়ে।

দুর্গা ঘরে ছিল, বেরিয়ে আসে। বলে, এখন আবার শুলি কেন? চল্ খাবি চল্!

—তুই খেগে, আমি খাব না। আমার জ্বর এসেছে। বলে খেমন পাশ ফিরে চোখ বোজে। ক্ষোভে আর দুঃখে দুর্গা গুমরে ওঠে, বারণ করলে শুনবি না তো। বল্লাম যাসনি, জ্বর গায়ে কষ্ট হবে। যেমন শুনলি না। নে এবার মর, আমার কি!

খেমনের পক্ষে কাঁদুনি অসহ্য। বলে, নে নে থাম, খুব হয়েছে, আর চেঁচাসনা!

সর্বাঙ্গে বেদনা। ভাল লাগে না! রাগ ধরে! গা হাত পাগুলো যদি একটু টিপে দেয় তাও নয় হয়। নিরুপায়ে খেমন অস্ফুট শব্দ করে। ঘন ঘন পাশ ফেরে।

দুর্গা কপালে হাত দেয়। নিঃসহায়ে খেমন লাল চোখ দুটো খুলে দেখায়। লাল চোখ দুর্গা অনেকবার দেখেছে। ও তার সয়ে গেছে।

খেমন কিন্তু সইতে পারে না। অধীর হয়ে গোঙ্গায়। খাটিয়াটা মাঝে থেকে কঁকিয়ে ওঠে। দুর্গার ভয় করে। মমতায় চোখের পাতা দুটো কাঁপে। বলে, হ্যাঁ রে কষ্ট হচ্ছে, গা হাত পা টিপে দেবো?

মানুষ হয়েও কেন যে এর উত্তর চায় খেমন ভাবতেও পারে না। তবু বলতে হয় ভিখারীর মত, দিবি তো দে, শরীরটা বড় কামড়াচ্ছে!

—সর, বসতে দে!

খেমন সরে যায়। দেহ যেন জুড়িয়ে যায়। দুর্গা পা টিপে দেয়। সন্ধ্যার হাওয়া বয়। গাছের পাতা নড়ে। দুর্গার কপালে চুল ওড়ে। দড়ির খাটিয়া দোলে। ঘুমের আবেশে খেমনও দোল খায়।

ওদিকে ঘরের ভিতর মেয়েটার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ব্যগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, মা নেই। ঘর অন্ধকার। থাবা মেরে উঠে বসে। হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা অন্ধকারে ঘুরপাক খায়। শেষে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারে। গুড়ি মেরে মাকে দেখে হাসে। দুর্গা জানতেও পারে না। হঠাৎ পায়ের ওপর কি যেন কিলবিল করে ওঠে। চেয়ে দেখে দুল্লী। দুর্গা হাত বাড়াল, আয়!

দুল্লী যেন গলে যায়। সোহাগে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

খেমন নড়ে ওঠে, আঃ, কি হলো?

—কি হলো চেয়ে দেখনা! দুর্গা হেসে বলে। দুল্লীকে নিয়ে লোফালুফি করে। খেমন চেয়ে থাকে। তারপর একটু একটু করে দৃষ্টি বুজে আসে।

মহাদেও আসে বেড়াতে। দুল্লীকে নিয়ে দুর্গা গিয়ে ঘরে ঢোকে। খেমন টেরও পায় না। মহাদেও ঝুঁকে পড়ে বলে, এই! তারপর আস্তে আস্তে ধাক্কা দেয়, শুয়ে কেন, ওঠ্!

—জ্বর এসেছে।

—এক্ষণি ভাল হয়ে যাবে। উঠে বোস্, বলছি।

ঠিক সময়ে মানসিংও এসে দাঁড়ায়। মহাদেও সাক্ষী মানে। বলে, বোতল দেখলে ভূত পলায়, তো জ্বর!

—নিঃসন্দেহে। কিন্তু আস্তে।—সায় দিতে মানসিং দেরী করে না। বলে, কই হাত দেখি?

খেমন হাতখানা বাড়িয়ে দেয়। চোখ বুজে মানসিং শক্ত করে নাড়ী টিপে ধরে। সকৌতুকে মহাদেও কৌতূহলী হয়ে ওঠে, কি রকম মনে হয়?

—বিশেষ কিছু নয়। দু'ঢোক পেটে পড়লেই ছেড়ে যাবে।

তপস্যা ভেঙ্গে যায়। চোখ খোলে।

মহাদেও দু'জনকে দুটো বিড়ি এগিয়ে দেয়। বলে, তবে আর দেরী কেন, হয়ে যাক তা হলে?

খেমন উঠে বসে, বেশ আনাও তা হলে।

—পয়সা? আসল জায়গায় মানসিং এতক্ষণে ঘা দেয়। সমাধানে মহাদেও দেরী করে না। বলে, কেন তিনজন রয়েছি, সমান সমান দাও!

যুক্তিতে বাঁধুনি আছে। কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

মুস্কিল হয় খেমনের। বলে, আমায় কিন্তু আজ ধার দিতে হবে। কঠিন বাস্তবে মহাদেও সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে, না বাবা এ সব ব্যাপারে ধার-ধোর চলে না। নগদ চাই, নগদ।

বিভোরের মত মানসিং মাথা নাড়ে, একশোবার। সঙ্গে সঙ্গে খেমনকে চোখ ঠাওরায়, কেন ছুল্লীর মায়ের কাছ থেকে কিছু নে না ?

খেমন হাত জোড় করে, ওরে বাপ্‌রে, তাহলেই হয়েছে ! মদ খাওয়া বার করে দেবে।

—মদ ! সবিস্ময়ে মহাদেও মানসিংকে প্রশ্ন করে, মদ মানে ?

মানসিং অসহায় চমকে ওঠে, সত্যি মদ মানে ? কিসের মদ ! খেমন ঘাবড়ে যায়, তার মানে !

—মানে ওষুধ। মহাদেও গদগদ হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই, মানসিং পরিষ্কার করে দেয়, অসুখ হয়েছে, ওষুধ চাই না ? পয়সা খরচ না করলে অসুখ কি অমনি সারবে ?

যুক্তিতে কৌশল আছে। উৎসাহে খেমন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। নম্র হেসে শুয়ে পড়ে।

পরামর্শ করে দুর্গাকে ডাকা হয়। মহাদেও সকলের বয়সে বড়। যথাসম্ভব গুরুত্ব নিয়ে বলে, যে রকম দেখছি তাতে মনে হয় অবস্থা খারাপ। সময় থাকতে ওষুধ দিলে অবশ্য কোন ভয় নেই। বলা যায় না, পেটে ওষুধ পড়লে হয় তো এখুনি ভাল হয়ে যেতে পারে।

দরজার পাশে দুর্গা ঘোমটা মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। মানসিং আশ্বাস দেয়, তা ছাড়া আমরা যখন রয়েছি, নিয়ে যাই, তারপর ডাক্তার দেখিয়ে নয় পৌঁছে দিয়ে যাব।

মহাদেও বলে, যেতে হলে কিন্তু এখুনি ওঠা দরকার। মানসিং উঠে পড়ে, বেশ তা হলে ওঠো ! মহাদেও দ্বিধাবোধ করে, তা নয় হলো। কিন্তু পয়সা না দিলে তো ভালো ওষুধ দেবে না। অসুখ সারবে কি করে !

নূতন সমস্যা ! মানসিং চিন্তিত হয়ে ওঠে। বলে, আচ্ছা আটগণ্ডা পয়সা তো নিয়ে যাওয়া যাক। বেশী লাগে যদি তখন দেখা যবে।

—সেই ভাল ! নিশ্চিন্ত হয়ে মহাদেও উঠে দাঁড়ায়।

দুর্গাকে আর দরজার পাশে দেখা যায় না। ওরা দেখে দুটো সিকি সেখানে চক্‌চক্ করছে। মহাদেও ইসারা করে। সসম্ভ্রমে মানসিং গিয়ে তুলে নেয়।

দূর বেশী নয়। ব্যবস্থা ভাল। ওপারেই শুঁড়ি খানা। খেমন যেন শিশু, হাঁটতে জানে না। দু'জনের কাঁধে ভর করে পা পা করে চলে যায়।

রাতের আকাশে তারা জ্বল্‌জ্বল্ করে। রাত করে খেমন ঘরে আসে। দুর্গা ধরে ফেলে মুখে তার মদের গন্ধ।

বলে, তুই মদ খেয়েছিস্ !

খেমন ঘুরে দাঁড়ায়, হ্যাঁ খেয়েছি, কেন ?

—কেন খাবি ?

খেমন টাল সামলাতে পারে না। চোখ দুটো তার অসম্ভব লাল। বলে, তুই কেন আমার পেছনে লাগবি ? কারুর বউ কাউকে কিছু বলে না। তুই কেন বলবি ?

—যারা বলে না তারাও খায়, বলবে কেন।

—কারা খায় ?

—জানি না।

ফণা তুলে যেন সাপ দুলছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেমন বলে আর দোলে, মদ খাব না। একটু সখ করবো না। তবে করবো কি ? খাই তো খালি রুটি আর মদ, তাও খেলে রাগ করবি !

ভেতরে নেশার ঝাঁজ ওঠে। খেমন প্রায় কেঁদে ফেলে। সদয় কণ্ঠে দুর্গা আশ্বস্ত করে মদ খেলে পেট ভরে না, তাই বারণ করি। নইলে খাবার জিনিষ খাবি বারণ করবো কেন।

উৎসাহে খেমন প্রায় লাফিয়ে ওঠে, খেটেখুটে তা বলে একটু আমোদ করবো না ?

—বেশ তো কর না। তাবলে মদ ছাড়া কি আমোদ নেই ?

—ছাই আছে ! সুবিধে পেয়ে খেমন এগিয়ে যায়, কি আমোদ আছে বল্ ?

কোণঠাসা হয়ে দুর্গা ভাবে। শেষে বলতে পারে না। খেমন হাসে। লাল চোখ দুটো উদ্ধত করে বলে, একটা আমোদ আছে—বলবো না।

কৌতূহলে দুর্গা কাছে সরে আসে, কি ?

স্থির দৃষ্টিতে খেমন তাকিয়ে, বলে তুই

সলজ্জে দুর্গা ঘুরে দাঁড়ায়, ধ্যেৎ !

ব্যাঘ্রের ব্যগ্রতা ওঠে জেগে। খপ্ করে খেমন ওর চুলের মুঠি ধরে ফেলে। ডাকে, আয় শোন !

আচম্কা বেদনায় দুর্গা লাতিয়ে পড়ে, আঃ কি হচ্ছে—? ছেড়ে দে, লাগছে ! খেমন উল্লসিত হয়ে ওঠে। অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে। বলে, মদ খাবি।

—না !

—কেন খা না ; তাহলে লাগবে না।

মুখে উৎকট গন্ধ। খেমনের বুকে দুর্গা নাক টিপে ধরে। খেমন আদর করে আর দুঃখ করে, মদ খাই তাই তো ঘুম আসে না। নইলে ঘুমিয়ে গেলে তুইওতো ঘুমোবি। এর চেয়ে দু'জনে মরে পড়ে থাকলেই ভাল হয়।

দুর্গা কথা কয় না।

খেমন বলে, খেটে খুটে দেহে এতটুকু সার থাকে না। মদ খাই তাই তোকে পাই ঘুমিয়ে গেলে তো মরে যাব ভুলে যাব।

দুর্গা কথা কয় না।

—খাটবো আর ঘুমুবো ; কেন রে ? খেটে তবে লাভ কি ? খাটুনির কম নেই। ফুর্তিও নেই। মদ আছে তাই ! যাহোক তবু পৃথিবীটা একটু কাঁপে। একটু তো আমোদ পাই।

এক ধারে খাটিয়া ছিল। দুর্গাকে বুকে টেনে নিয়ে খেমন সরে এলো। ইচ্ছাটা, একটু বসবে। কিন্তু পায়ের নীচে পৃথিবীটা হঠাৎ দুলে ওঠে। খাটিয়ার ওপর দু'জনে আছড়ে পড়ে। খাটিয়ার বাঁধন যায় ছিঁড়ে। দুর্গা তো রেগে মরে। যেন জালের মাছ, দু'জনে কিলবিল করে। হেসে রেগে দুর্গা উঠে পড়ে। খেমন পড়েই থাকে।

প্রেমের এমন বিসদৃশ পরিণতি ! অপ্রস্তুতে বেচারা লজ্জায় মারা যায়। দুর্গা যত হাসে, নেশা কেটে আসে। রাত্রিও কেটে যায়।

সকালবেলা ভোঁ বাজে ওপার থেকে। দুর্গার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ডাকে, এই ওঠ্, কাজে যা !

খেমন সাড়া দেয় না। কলবল করে শ্রমিকরা কাজে যায়। খেমন শুয়ে শুয়ে শোনে। চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তখনও ভোঁ বাজছে। ওকে ডাকছে।

দুর্গা ধাক্কা মারে, ওঠ্ ওঠ্ ! তাড়াতাড়ি যা, নইলে দেরী হয়ে যাবে।—এই শুনছিস !

খেমন যায় রেগে। চীৎকার করে ওঠে, কি ?

অযথা ধমকে দুর্গা ঘাবড়ে যায়। বলে, নে ওঠ্—যাবি না ? ওরা যে সব চলে গেল।

—যাক গে, তোর কি ?

দুর্গার রাগ হয় ! চোখ দুটো ছলছল করে। বলে, খা, মদ খা ! কলে যাবি কেন ? শুয়ে থাক। আপনি পেট ভরবে।

—ভরবেই তো। তুই খাওয়াচ্ছিস নাকি ? ঘাস বেচে ক'টা পয়সা পাস, যে অত মুখ নাড়ছিস ?

—যাই পাই তবু তো খেতে কসুর করিস না। তুই যা পাস সবই তো মদ খাস। আমি আছি তাই খেতে পাচ্ছিস। আবার গোমর করিস ?

সতেজে খেমন চীৎকার করে উঠে পড়ে, বেশ করবো মদ খাবো। তোর বাবার পয়সায় খাচ্ছি। তুই বলবার কে ?

—কে ? দাঁড়া দেখাচ্ছি ! বলতে বলতে দুর্গা কেঁদে ফেলে। দুল্লী ঘুমুচ্ছিল। তাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে আছাড় মেরে বসিয়ে দেয়।

দুল্লী প্রস্তুত ছিল না। চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। খেমন ওঠে আগুনের মত জ্বলে। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে এগিয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সজোরে চুলের গোছা ধরে চেপে, কেন তুই ওকে মারবি ?

—ছোড় দে বলছি ! দুর্গা প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করে।

উপর্যুপরি খেমন মারে লাথি। বেপরোয়া তেজে সে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। অব্যক্ত বেদনায় দুর্গা বিকৃত হয়ে আসে। এলোচুল আর চোখের জলে ছটফট করে।

একখানা ঘর। দুল্লী কাঁদছে। দুর্গা কাঁদছে। রাগী পাগলের মত খেমন গজরাচ্ছে আর ঠেঙাচ্ছে। হঠাৎ ঘরের ভেতর ছায়া পড়ে। বাইরে ভীড় জমে গেছে। খেমন ভ্রূক্ষেপ করে না। ছিটকে বেরিয়ে যায়।

গুম হয়ে দুর্গাও বসে থাকে। সাদা দুটো চোখ। জলে যেন দুটো কড়ি ভাসছে। একাগ্র দৃষ্টি। হিংস্র তারা দুটো জ্বলছে।

নিজেও কিছু খেলে না। মেয়েকেও মাই দিলে না। শক্ত করে চুল বেঁধে উঠে দাঁড়াল। দুল্লীকে নিলে পিঠে বেঁধে। হাতে নিল ঘাস-কাটা খুরপী। তারপর ঘরে শিকল তুলে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

কোথায় দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর? হাতে তার খুরপী। দুর্গা চলে যাচ্ছে। শুকনো মাঠের ঘাস তাকে ডাকছে! চাইতে পারে না। চোখের সামনে তীব্র রোদ! সর্বাঙ্গে নিদারুণ বেদনা! চোখের সামনে বিশ্ব যেন দুলছে। পিঠে বাঁধা দুল্লী। সেও দুলছে।

*　　*　　*　　*　　*

মহাদেও বলে, ভেবে কি করবি? রাগ করে গেছে, আবার ফিরে আসবে।

মানসিং স্বীকার করে না। বলে, হ্যাঁ বাপের বাড়ী গেছে কিনা, তাই ফিরে আসবে!

ছটুলালের বুড়ো দিদিমা মাথা নাড়ে বিজ্ঞ কণ্ঠে বলে, ভাবিস না। দু'দিন সবুর করে দেখ। কোথায় আর যাবে। ফিরে আসবেই!

—তা আর নয়! মানসিং বাদ সাধে, যেখানেই যাক, ফিরে সে কিছুতেই আসবে না।

মহাদেও খোঁচা দেয়, না আসবে না, তোকে বলে গেছে।

পাঁচজনার মাঝে কথাটা চাবুকের মত পড়ে। মানসিংয়ের চোখ দুটো বেরিয়ে আসে, বলে, একটু মুখ সামলে, বুঝেছ মহাদেও!

—যা যা তোর মত অনেক দেখেছি—যা! তুড়ি মেরে মহাদেও উড়িয়ে দেয়। মানসিংও ছাড়ে না। সজোরে চেপে ধরে, বটে নাকি? দেখাও না মুরোদ কতখানি?

ঝাঁঝ গলায় দিদিমা এবার ঝেঁজে ওঠে, থাম থাম খুব হয়েছে, বাজে বকিস না। সবটাতেই তোর পাকামী।

—তা বলে মহাদেও কেন ওকথা বলবে?

—বেশ আর বলবে না, চুপ কর! দিদিমা স্নিগ্ধ হয়ে আসে। বলে, খেমনের খাওয়া বোধ হয় এখনও হয় নি?

—হবে কোত্থেকে! মহাদেও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, একে মনের ঠিক নেই, তার ওপর পাঁচজনে পাঁচ কথা বল্লে কখন মাথার ঠিক থাকে?

পাঁচজনা মানেই মানসিং। মানসিং গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

মহাদেও উঠে পড়ে। খেমনেরও হাত ধরে টানে, নে ওঠ্ চ'!

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? ব্যগ্রস্বরে বৃদ্ধা যেন ধমকে ওঠে। সবিনয়ে মহাদেও হাসে। সারা মুখে কাঁচা পাকা দাড়ী।—কোথাও নয়, এই একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। জোছনা রাত। বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। একটু ঘুরে আসি না?

বৃদ্ধার মনে ধরে, বলে, বেশ যা। তবে বেশী রাত—করিস্ না। সারাদিন কিছু খায় নি।

—জানি জানি, কিছু ভেব না। বলে খেমনকে টেনে নেয়, আয়!

লুব্ধ দৃষ্টি তুলে মানসিং তাকায়। ব্যক্তিত্ব স্ফীত করে মহাদেও হাসে। যাবার সময় একটা চোরা চাহনী মারে। মানসিং জর্জরিত হয়ে ওঠে। পরাজয়ের আক্রোশে মনে মনে ফেটে পড়ে।

নীচে চাঁদের আলোয় গাছের ছায়া পড়েছে। ওপরে রেলওয়ের বাঁধ। খেমনের ইচ্ছা হয় বাঁধের ওপর দিয়ে সেও কোথাও চলে যায়। যতই কাছে আসে ততই অভিভূত হয়ে পড়ে।

হঠাৎ চাঁদের আলো যায় নিভে। অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর খেমন দাঁড়িয়ে পড়ে। অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে, ওপারে কোথায় যাচ্ছ?

—যেখানেই যাই না। আয়তো!

—না!

রীতিমত মহাদেও স্তম্ভিত হয়ে ওঠে, প্রশ্ন করে কেন?

—মদ আমি খাব না!

স্পষ্ট দেখা যায় না। অন্ধকারে মহাদেও খেমনের হাতখানা চেপে ধরে, পাগলামী করিস না। আমি বলছি সে ফিরে আসবে। সমস্ত দিন কিছু খাস নি। খামকা মন খারাপ করিস না। আয়!

দাঁড়াতেও কষ্ট হয়। খেমনের মনে হয় পাগলের মত কেবলই সে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। পথ তাকে ডাকছে। সে চলেছে।

বাইরে ছোট একটা মাঠ। অদূরে কল। খেমন আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। অপলকে চেয়ে থাকে। আকাশের ওপর ভাঙ্গা চাঁদ।

মহাদেও এসে পাশে দাঁড়ায়। বলে, কি দেখছিস?

—ওটা কি?

—কই?

—ওই যে চিমনির ওপর কালো।

দেখে মহাদেও বিস্মিত হয়ে ওঠে। বলে, শকুনি। কেন?

স্থির দৃষ্টির ওপর ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে আসে। খেমন কথা কয় না। আবার চলতে সুরু করে। মাঠের পরেই ক'খানা খোলার ঘর। তারপরেই বড় একটা পুকুর। পাশ দিয়ে চলে গেছে মিহি ধূলোর একটা কালো রাস্তা। ওরা গিয়ে সোজা বাজারে ঢোকে।

ফিরতে একটু দেরী হয়। খোলা জ্যোৎস্নায় পুকুর পাড়ে তখন হাওয়া উঠেছে। খোলা চোখে খেমনও রাস্তার ধূলোর ওপর শুয়ে পড়েছে।

মহাদেও বলে, এই ওঠ্ খেমন শোনে না। ধূলোর ওপর গড়াগড়ি যায়। অতি কষ্টে মহাদেও টেনে তোলে। উঠে খেমন তখন গান ধরে।

উল্লাসে মহাদেও চীৎকার করে ওঠে, বেশ, বেশ!

রাস্তায় কুলায় না। উৎসাহের আতিশয্যে খেমন বড় বড় পা ফেলে রাস্তা জুড়ে চলেছে।

মহাদেও বলে, এই থেমে গেলি কেন, গা না?

অকস্মাৎ খেমন গর্জে ওঠে, পালা!

চকিতে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মহাদেও। ভাল করে পরিস্থিতিটা অনুধাবন করে। দেখে, চিমনীর দিকে মুখ তুলে খেমন গজরাচ্ছে। চোখ দুটো জ্বলছে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে।

মহাদেও বলে, কি হলো?

খেমন বলে, ওটা এখনও বসে রয়েছে।

চোখের ওপর পৃথিবী যেন পাক খাচ্ছে। দেখে মহাদেও চিতিয়ে ওঠে। তারপর উঁচুমুখে আকাশে ঠোনা মারে, মার ওটাকে মার—মার!

পায়ের কাছে পড়ে ছিল রেলওয়ের পাথর। কুড়িয়ে নিয়ে খেমন ছুড়ে মারে। মহাদেও হাঁ করে চেয়ে থাকে। সোঁ করে কালো পাথরখানা ওপর পানে ওঠে যায়।

অভ্রভেদী স্পর্ধা চিমনীটার যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। পাথরখানা অতদূর পৌঁছায় না। অদূরে খট্ করে শব্দ হয়। মনের আক্রোশ যেন মাটির ওপর মুখ থুবড়ে ছিট্‌কে পড়ে।

নিষ্ফল রাগে খেমনের পলক পড়ে না। অবাক হয়ে মহাদেও শূন্যপানে চেয়ে থাকে। যেন বিপুল এক ছায়া দাঁড়িয়ে আছে, বিরাট চিমনী! মাথার ওপর বসে আছে বুড়ো শকুনি। কান পর্যন্ত তার ডানায় ঢাকা।

খেমন আর একবার গর্জে ওঠে, হতভাগা!

———*———

নিশাচরের পায়চারী

জ্যোতির্মালা দেবী

বাড়ীটা নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু আমার এখানে আসাটাই হচ্ছে অসাধারণ। খুলে বলি।······

একদিন দুপুরে হঠাৎ মনে পড়ল বড়দাদার বাড়ি যাওয়া দরকার, কিন্তু দাদা কি এখনো ফিরেছেন ইউনিভার্সিটি থেকে? বড় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে হল—ফেরেননি, হাতের ছোট ঘড়িতে কিন্তু সময় এগিয়ে চলেছে খুব দ্রুতবেগে। কোনটা ঠিক ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মতন ড্রাইভারকে বললাম, "বালিগঞ্জে চলো।"···দাদা থাকেন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের দিকে, আমি চললাম বালিগঞ্জে। বাইরের দৃষ্টিতে দেখলে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। অদৃশ্যের কথা তখন কে জানত!

বালিগঞ্জের এবাড়িখানা সুন্দর, ছোটখাট। কর্তা আমারই ছোট ভাই অরুণ। মাত্র মাস তিনেক হল স্ত্রী ও দুটি মেয়ে নিয়ে উঠে এসেছে এখানে। আমার ছোট বোন অনিমাও এদের সঙ্গেই থাকে। আর থাকেন "লর্ড মিণ্টো", বঙ্গজ নাম অনিলবরণ। সৌভাগ্যক্রমে আমি তাঁর মাসিমা হই।

এবার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক সকলেরই—বাড়ি ও মানুষ সবাইর।

এ বাড়ির উপর কেমন একটা আকর্ষণ হয়েছিল আমার—প্রথম যেদিন আসি সেইদিনই। সে তো প্রায় মাসছয়েক আগের কথা। আকর্ষণের কারণ—পাশের অযত্নরক্ষিত আধো-জঙ্গল বাগান: ফুল ও ফল দুইই আছে ওখানে, কিন্তু সবই জঙ্‌লী ধরণের। কলকাতায় যে এমনটি দেখব, তা দেখবার আগে সত্যিই ভাবিনি।

বাড়িটা আসলে দোতালা, কিন্তু ছাদের উপরে একটি ঘর আছে—লর্ড মিণ্টোর আস্তানা। অতএব তাঁর ও আমাদের মর্যাদা বাড়াবার জন্য আমরা বলি তেতলা।

সময় নেই অসময় নেই, এখানে এলেই যখন তখন ছাদে ছুটে আসি। এটি আমার রোগ এবং বিশেষভাবে আমারই। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আমার আসবার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ সবাইর মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যায়। ধীর গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে আমার বোন অনিমা, ছুটোছুটি ভালো বাসে না, তবু উঠে আসে—গম্ভীরভাবেই অবশ্য। পেছন পেছন উঠে আসে উষসী, অরুণের স্ত্রী। তারও পেছনে বেবি আর বিবি; একটি চার বছরের, অন্যটি তিন বছরের—ঠিক দুটি পুতুল যেন, রোগা পাতলা আর ফর্সা।—দুটিকে দুই হাতে দিব্যি তুলে নেওয়া যায়।

বাকি থাকে অরুণ। সন্ধ্যার ছায়া ঘনতর হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছাদের আড্ডায় হাজিরী সংখ্যা সম্পুর্ণ হয়। অরুণ আসে।

এ পর্যন্ত সবই সহজ, সাধারণ—মামুলী। কিন্তু আমি যেখানে যাবো, অসাধারণ সঙ্গে যাবেই; কিংবা অসাধারণ যেখানে আছে, আমিই হয়ত যাই সেখানে! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গেলে ও একই কথা। যাক! যা বলছিলাম আকাশের হাজার তারার নীচে, চারদিকের রেডিও ঝঙ্কারে কণ্টকিত সন্ধ্যা, বাঙলাদেশের সন্ধ্যা, বিলেতের নয় মাদ্রাজের নয় ব্রহ্মদেশেরও নয়—খাঁটি বাঙলার। কোথাও কোনো অসাধারণত্ব নেই বাইরে। তবু দেখ, এক পলকে কী অসাধারণ হয়ে উঠল সন্ধ্যা! কোথায়? ছাদের নীচে ওই বাগানে।

আবেশে আমার চোখ মুদে আসে, এক দিনের জন্যে এসে এ বাড়িতে থেকে যাই বহুদিন। অরুণের জিজ্ঞাসার উত্তরে আজও বেশ নিশ্চিন্ত মনেই বললাম, "দাদার কাছে? আজ না গেলে ও চলে।"

ওরা জানত, একেবারে না গেলেও চলে। উষসী একটু হেসে বললে, "দিদি, ওই বাগানটায় কি আফিমের ফুলও ফোটে? নিজেও সে নিঝুম, তোমাকে ও শেখালো ঝিমোতে।"

অনিমা চুপ করে শোনে। উষসীর বয়স অল্প, স্বভাবেও উচ্ছাসিনী, সে আবার হেসে বললে, "আমারও কিন্তু টান আছে ওদিকে। সাহস দাও তো বলি—" কটাক্ষে অরুণের দিকে চেয়ে বললে, "ছোট মামাকে বলেছিলাম, শুনে কী রাগ ওর। এখানেও আবার কেউ রাগ না করলে বাঁচি।"

অরুণের বোধ হয় 'সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স' ছিল, না থাকলেই আশ্চর্য হতাম। তরুণী ভার্যার মামার চেয়ে সে যে সুপিরিয়র, একথা ভার্যাকে বোঝাতে না পারলে বিয়ে করাই বা কেন? অতএব সেও বেশ প্রতিদান-কটাক্ষ হেনে, নীরব বেতারে অন্তরের জটিল ব্যাপারটা উষসীকে চমৎকার বুঝিয়ে দিল।

মেয়েটি দুষ্টু হাসি হেসে বললে, "তবে শোনো। দিনকতক আগেকার কথা। ভর-সন্ধ্যেয় ওই ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম—ছাদের দেয়ালে এই এতখানি কাছে। বাগানের কথাই ভাবছিলাম। কী রকম যেন! মনে হয় ওপর থেকে নীচে টানছে, টানছে—কী টান উঃ—"

অনিমা শিউরে উঠল, "বৌদি, বৌদি!"

অরুণ মুখ কালো করে বললে, "চেঁচামেচি কেন?"

কাঁপতে কাঁপতে বললে অনিমা, "ওকে চুপ করতে বলো, দাদা।"

বিংশ শতাব্দীর মেয়ে! ছি!

অরুণ হুকুম করল, "উঠে যা।"

অনিমা গেল না, জোর করে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

চেয়ে দেখলাম উষসীর হাত দু'খানি শিথিল ভাবে পড়ে আছে কোলের উপর, চোখের দৃষ্টি ভীত, মুখের ভাব রহস্যঘন। ঈষৎ জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "কি হল? আমি তো ভয় দেখাবার জন্যে বলিনি কিছু। আচ্ছা থাক, আর বলব না।"

একবার ভাবলাম অরুণকে বলি—পৌরুষ নির্জীব কেন? বকো ওদের।

কিন্তু দেখলাম মেয়ে দুটি সত্যিই ভয় পেয়েছে, ভয়টা আগে ভাঙানো দরকার। চেপে না রেখে খুলে দেওয়াই ভয় তাড়াবার এক মাত্র উপায়।

তাই খুব খানিকটা অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললাম, "কি সব ছেলেমানুষ! বাগান যদি আমায় টানে—টানে, না হয় লাফিয়েই পড়ব বাগানে, তাই বলে এত কান্নাকাটি, শিহরণ? তার চেয়ে যাও না বাপু, যে কোন ফিল্ম্ ডিরেক্টারের কাছে।"

উষসীর মুখে হাসি ফুঠল আবার, সাহসিকা বলে একটু খ্যাতিও আছে ওর। বললে, "আমার কিন্তু ইচ্ছে হ'ল অন্যরকম। রাগ করো না তোমরা, বাগান যখন আমায় টানে, তখন—তখন, নিজে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে না, আশেপাশে খুঁজি অন্য কাউকে। হয়েছে কি জানো? পেছনে পেছনে সেদিন বেবিও এসেছে, বিবিও। ফিরে দেখলাম। তার পর———"

"বৌদি, পায়ে পড়ি—পায়ে পড়ি তোমার!" মূর্চ্ছাহতের মতো অনিমা মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল মাটিতেই। অরুণ পদশব্দে ভীষণ রাগকে জানান্ দিতে দিতে নীচে নেমে গেল। সুপিরিয়রিটি ভুলেই।

এ বাড়ির অসাধারণত্বের অভিজ্ঞতায় এই আমার প্রথম রাত্রি।

তারপর কিছুদিন এবিষয়ে কেউ আর কোনো কথা বলেনি।

অত্যাশ্চর্য যদি থাকে, সে হয়ত আমায় হাতছানি দেয়। কিন্তু বড়ই সঙ্গোপনে, সাবধানে কাউকে বলবার মতন কিছুই পাইনে খুঁজে। লিখতে গেলেও লোকে ভাববে—জাল বুনছে কথার।

কাজেই ওসব থাক।

সাদা ভাষায় সাদা কথাই বলি। এবাড়ি ছেড়ে কোথাও আর যেতে পারিনে আমি। যেন বন্দিনী। কেন বা কার, জানিনে। শুধু জানি কেউ আছে এখানে, কেউ চায় আমায়। দেখা দিতে চায়—পারে না। কথা বলতে চায়—ভাষা ফোটে না। একটা আকুল তৃষ্ণা, মরুর মধ্যে ওয়েসিসের পিপাসা; একটা অস্ফুট সৌন্দর্য—অস্পষ্ট ঝলক দিয়ে যায়, বুঝতে পারি মর্ত্যের রূপে রূপময় হবার জন্যে আমারাই চোখের সামনে সে তার স্বপ্নরূপ ধরে দাঁড়ায়, অধীর বাসনা তার। কিন্তু ছায়া কি দেহকে পায় খুঁজে?

এই ছায়াময় জগতে ধীরে ধীরে সে টেনে নিচ্ছে আমায়। এইটেই বুঝতে পারি কিন্তু বোঝতে পারিনে।

নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়া আর হয় না। উষসী অবাক হয়, মুখে কিছু বলে না। অনিমা তাকায় সন্দিগ্ধভাবে মাঝে মাঝে ভাবি ওদের বলব, কিন্তু বলতে গেলেই কে যেন কণ্ঠ চেপে ধরে। অনুভব করি একটা সুগভীর অভিমান, চোখে না দেখেও মনের মাঝে বুঝি তার দারুণ হতাশা।

নিবিড়, নিবিড়তর ভাবে সে এগিয়ে আসে—অস্তিত্ব নয় সে, একটা অনুভূতি। আমি অনুভব করি তার চোখ, অনুভব করি তার মুখ, অনুভব করি তার—আলিঙ্গন।

পাগল হয়েছি? হয়ত। নিজেকে কতটুকুই বা জানি!

শুধু জানি এই যে, দূরে ঠেলতে চাইলে, অনাদরে অবহেলায় অবিশ্বাসে ঘৃণায় বর্জন করতে গেলে, অশরীরির কান্না আমারই বুকের মাঝে গুমরে ওঠে। সাগরতরঙ্গের মতো আমারই প্রাণের বালুতটকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায় আমার অবিশ্বাস।

তাই আমি যেতে পারি না এবাড়ি ছেড়ে।

অনিমা কিছু বুঝেছিল কি?

রাত্রে তো আমরা একই ঘরে শুই। কত বার তাকে উঠে বসতে দেখেছি, কতবার দেখেছি, সে ঘুমোতে পারে না, ছটফট্। কারণ কি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি—সেও বলেনি।

মাঝে মাঝে, চাঁদের আলোতে একটা জিনিয লক্ষ্য করেছি—মনে হয়েছে গভীর মনোযোগে সে যেন কী শুনছে। শুনতে শুনতে মুখে তার ফুটে উঠেছে কাতরতা, দুই হাতে কাণ চেপে ধ'রে শুয়ে পড়ে।

হয়ত এমনিই কেটে যেত দিনের পরে দিন।

কিন্তু একদিন সকালে অরুণ বড় বিরক্ত হয়ে মিণ্টোকে বললে, "রাত্রে কি তোর পায়চারি না করলেই চলে না? সারাদিন খেটে-খুটে ক্লান্ত হয়ে আসি, কিন্তু না বুঝলে সেকথা বলা বৃথা।"

মিণ্টো আশ্চর্য হয়ে বললে, "কি বলচ মামা!"

দেখলাম, অনিমার মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে—হাতে চায়ের পেয়ালা কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তেই সে বিনাবাক্যে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অরুণ অবাক। উষসী রাগ করে বললে, "একি কাণ্ড!"

অনিমা কিন্তু আর এলো না।

সারাদিন মনটা আমার সন্দেহে দুলতে লাগল। যতই ভাবি—

স্পষ্টই বুঝতে পারি ছায়া শুধু আমার একলার নয়। আমি অনুভব করি, ওরা শোনে। আমি দেখি, অনিমা বোঝে।

তা হ'লে ?

অনেক ভেবে ঠিক করলাম—যে অনুভব করে সে শুনতেও পারে, যে দেখে সে বুঝবেও।

মনের কথা কিন্তু ভাঙলাম না কারো কাছেই।

তারপর—এলো নিশীথ রাত।

দেখলাম অনিমা উঠে বসেছে—সমস্ত আকৃতিতে সেই নিবিষ্টতা, সেই ম্লান দুঃখ।

উঠে বসলাম আমিও। কাণ পেতে শুনতে লাগলাম। কই, কিছুই না বাইরে বাগানে কেবল অবিশ্রান্ত ঝিঁ ঝিঁ-ডাক, নিশাপোকার উল্লাস।

শুনতে শুনতে মন আমার নিবিষ্ট হতে লাগল নিজের মধ্যে—এগিয়ে আসছে এগিয়ে আস্‌ছে, আঃ গৌরতনু তরুণ !

চুপ—চুপ ! ওই যে সে ফিরে চলল ! আমাদেরই ঘরের দোর খুলে, মৃদু পদসঞ্চারে··· সিঁড়ি বেয়ে······

মিনিটখানেক পরেই পায়চারি—ছাদে, স্পষ্ট—আরো স্পষ্ট—স্পষ্টতর—

তারও পরে—সজোর পায়ের শব্দ—পুরুষের, চঞ্চল, অশান্ত, অস্থির চিত্তের—পায়চারি।

দুই হাতে কাণ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়লাম বিছানায়। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। জ্ঞান ফিরে এলে উঠে বসলাম। অনিমার কথা মনে পড়ল, চেয়ে দেখলাম—

শুভ্র শয্যা ধপ ধপ করছে চাঁদের আলোতে—অনিমা নেই !

চীৎকারে অরুণ ও উষসী উঠে পড়ল। কাঁপতে কাঁপতে বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, "অনি—"

ছুটে ছাদে এলাম সবাই। মিণ্টো অকাতরে ঘুমোচ্ছে, বালিগঞ্জও ঘুমন্ত, চাঁদের আলোও যেন ঘুমে ঢলে পড়েছে সারা বালিগঞ্জের উপর। চারিদিকে এত আলো—অনিমা কই ?

অবাধ্য স্তম্ভিত পা দুখানিকে কোনোমতে টেনে ছাদের দেওয়ালের কাছে এলাম—উষসীর বর্ণনার সেই দেওয়াল। নীচে বাগান। এই শুক্লপক্ষের ছায়া-আলোয় সবুজ রঙ তার কালীর মতো করাল। ওখানে আমার বোন কই, অনিমা কোথায় ?

সহসা উষসী চেঁচিয়ে উঠল, "ওগো দেখ দেখ, ওটা কি ?"

এদিকে ছাদের আলিসা ছোট একফালি বারান্দার মতো চওড়া, একটি মানুষ স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাকতে পারে। অনিমার শাড়ি প্রান্ত জড়িয়ে আছে কোণের গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কে, অন্য প্রান্ত এখনো তার পরণে—আর সে নিজে·········

ভীষণ চীৎকারে পাড়া কেঁপে উঠল। মিণ্টোর জেগে উঠে কী কান্না !

অতি বড় ভাগ্য আমাদের—অনিমা ছিল মূর্চ্ছায়। জেগে থাকলে এই বিষম চেঁচামেচি হট্টগোল আর আতঙ্কেই সে মরে যেত। উদ্ধার করতে গিয়েই উপসংহার করে দিতাম ওর—জীবনের।

ভোর হতে না হতেই আমরা অন্য বাড়িতে—বড় দাদার বাড়ি।

কিন্তু……

এ জীবনে আমার ব্যথা আর ঘুচলনা। সেই বন্দী— একাকী বন্দী, সাথী নেই—নেই দরদী! সেই অশান্ত পায়চারি! কী চেয়েছিল সে আমার কাছে, কী-ই বা তাকে দিতে গিয়েছিল অনিমা?

রহস্যের মতন পড়ে আছে ওই বাড়ি, কেউ সাহস করে না ভাড়া নিতে। লোকে বলে, বড্ড জানাজানি হয়ে গেছে। কেউ গাল দেয় বাড়িওয়ালাকে, বলে—ভাড়ার লোভে এতদিন গোপন করেছিল। নিজেরা জেনেশুনে চলে গেছে।

হায় বন্দী নিশাচর, হায় নিশীথের পিপাসা!

এর পরে কত দেশ-বিদেশ ঘুরলাম তারই—অশান্তি বুকে নিয়ে। জীবন হয়ত আমার ঘটনা বহুল, কিন্তু বহু ঘটনার মধ্যেও এটির তুলনা মেলে না। তাই ঘুরে ফিরে আজ আমি আবার সেই বালিগঞ্জে। নিতান্ত সাধারণ—বাহ্য দৃষ্টিতে নেহাত নির্দোষ ওই বাড়িটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। একটু শ্যাওলাধরা একটু পুরানো, পরিবর্তন এইমাত্র।

প্রতিবেশীরা জিজ্ঞেস করলে, "ভাড়া নেবেন? কিন্তু—"

বাধা দিয়ে বললাম, "জানি। কিন্তু বাড়িটা আমার ভালো লাগে, তাই জিজ্ঞেস করছি—কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল কি?"

কেউ বলতে পারল না। একটা রহস্যঘন আবরণ, একটা অহেতুক শঙ্কার ছায়ামাত্র; এবং তারও কারণ অনিমার সেই 'এ্যাক্সিডেন্ট' আর আমাদের কানে-শোনা 'পায়চারি'। তারপর থেকে বাড়িটা পড়ে আছে, কেউ সাহস করে না ভাড়া নিতে।

জিজ্ঞেস করলাম, "যাঁদের বাড়ি তাঁরা থাকেন কোথায়?"

উত্তর—"এই তো কাছেই। দু'মোড় ঘুরে গেলেই সাদা-নীলে মেশানো দ্বিতীয় বাড়িখানা।"

তখনই রওনা হয়ে পড়লাম।

বসবার ঘরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। কর্তা বা কর্ত্রী কেউ বাড়িতে নেই। বড়দিদিমণি আছেন।

বললাম—তাঁকেই ডেকে দেওয়া হোক।

মিনিট দশেক পরে যে মেয়েটি ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম, রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, "করুণা, তুমি?"

"একি, সীতা ?"

"চিনতে পেরেছ ?"

"পারবার কথা নয়। কতকাল পরে দেখা বলো তো ? সেই ডায়োসেসানে... তুমিও বি, এ পাশ করলে আর আমি গেলাম মুসৌরী—"

"বিয়ে হয়েছে না ?"

করুণা হেসে বললে, "লোহা সিঁদুর দুইই দেখছ তো। কিন্তু তুমি এত অন্যমনস্ক কেন ? রোগাও হয়ে গেছ বড্ড। আমি তো এখানে থাকি না নইলে খোঁজ নিতাম অনেক আগেই—"

"থাকো না এখানে ? কোথায় ছিলে এতদিন ?"

"মধ্যভারতের নানান্ জায়গায়। ওঁর কাজ ওদিকেই। ভালো কথা, তুমি কোথায় আছ এখানে, তা তো বললে না।"

"কোথাও নেই। তবে থাকতে চাই। তাই তো এসেছি তোমার কাছে।"

করুণা হতবুদ্ধি হয়ে বললে, "তার মানে ?"

"মানে না হয় পরে বলব। আগে বলো তোমাদের———রোডের বাড়িখানা ভাড়া দেবে কিনা।"

এক মনে লক্ষ্য করছিলাম করুণার মুখ, দেখলাম—ওই কথা বলামাত্র সুগৌর বর্ণ তার আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ কোনো উত্তরই দিল না। তারপরে কথা যখন বলল তখন কণ্ঠ ঈষৎ রূঢ়। বললে, "ও বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় না।"

"কিন্তু আমার যে চাই-ই। করুণা, আমায় দয়া করো।"

বিস্ফারিত চোখে করুণা অনেকক্ষণ ধরে আমায় দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বললে, "সীতা ব্যাপার কি—বলবে আমায় ?"

"বলব।"

"তাহলে ওপরে আমার শোবার ঘরে এসো, এখানে যে কেউ এসে পড়তে পারে।"

*   *   *

সামান্যই বলবার ছিল আমার।

বাকি কথাগুলো করুণার। বললে, "সীতা, তুমি আমার বাল্যবন্ধু। আমার যা বলবার আছে বলছি। তারপরে কি করতে হবে না হবে তুমিই বুঝে দেখো।" খানিক নীরব থেকে, রুদ্ধ-কণ্ঠ পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বললে, শোনো।"

আমার ছোট কাকা, নাম অভী, বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে। তার আঠারো বছর বয়সের সময় ঠাকুরদা মারা গেলেন, ঠাকুরমা গিয়েছিলেন আগেই।

অভীকেই লিখে দেওয়া হয়েছিল ওই বাড়ি। ওর বাবা মারা যাবার বছর তিনেক পরে, কাশী থেকে ফিরে এসে অভী ওখানেই থাকত। একলাই থাকত, বাড়িতে শুধু ঠাকুর আর চাকর।

তারপরে কি হল জানি না, কিন্তু বাবার কানে নানা গুজব রটতে লাগল। কেউ বলল, অভী বাড়িতে একলা থাকে না। কেউ বা বলল সে মাঝে মাঝে কোথায় যেন যায়।

অল্পবয়সী ছেলে, বুঝতেই পারো বাবা একটু চিন্তিত হলেন। ঠাকুর চাকরকে অনেক জিজ্ঞাসা ও জেরা করে যা জানা গেল তা খুবই রহস্যময়। ওরা দিব্যি করে বলল যে দিনের বেলা বাবুকে ছাড়া কাউকেই ওরা দেখতে পায় না, কিন্তু রাত্তিরে ছাদে পায়চারি শুনেছে—স্পষ্ট দুটি লোকের।

অভীকে জিজ্ঞেস করতে সে তো হেসেই উড়িয়ে দিল। বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন ওসব ঠাকুর চাকরের রটনা। কিন্তু অভীকে বললেন এ বাড়িতে এসে থাকে যেন, আমাদেরই সঙ্গে। সে রাজি হল না। বাবা তখন ওবাড়ির পুরানো লোক দুটিকে ছাড়িয়ে নতুন লোক রাখলেন।

কিছুদিন সব চুপচাপ।

বলতে ভুলে গিয়েছি, অভী চাকরী বাকরী করত না। অবস্থা ভালো, বাপ যথেষ্ট দিয়ে গেছেন, সখের পেশায় সাহিত্যিক। অনেকের সঙ্গে জানাশোনা ছিল, অনেকেই আসত কাছে। কখনো কখনো মেয়েরাও। একটি মেয়ে প্রায়ই আসত, কিন্তু একলা নয়, তার দাদার সঙ্গে। নাম শুনেছ হয়ত? সাহিত্যে বেশ নাম করেছেন—হ্যাঁ, সে-ই—মিত্তির। জিজা তারই বোন। না, সুন্দর নয়। কিন্তু চেহারায় কিছু একটা ছিল। তবু কেউ ভাবেনি অভী তার প্রেমে পড়বে। মেয়েটির কথা আলাদা। আমার কাকাকে দেখোনি তুমি। গৌরতনু, অসাধারণ কোমল মুখ—পুরুষের পক্ষে একটু বেশিই কোমল, দেখেছো—"

"দেখেছি। তারপর?"

"কোথায়?" করুণা কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে বসে থেকে বললে, "থাক বোলো না, মনে পড়েছে। কি বলছিলাম? জিজার কথা। কবি মেয়ে। অভীকে সে ভালোবাসত। শুধু ভালোবাসত বললে ঠিক বলা হয় না, ওর জন্যে প্রাণ দিতে পারত। কেমন করে তাদের বিয়ে হল কেউ জানে না। পরে শুনলাম কাশীতে। গোপন রাখবার কি দরকার ছিল তাও তখন ভেবে পাইনি। মনে করতাম কবি ও সাহিত্যিকের খেয়াল। এখন সে রহস্যও আর রহস্য নয়। একটু বোসো তুমি—" বলে করুণা হঠাৎ উঠে গেল। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলো, হাতে একখানা ছবি। খুলে ধরে বললে, "দেখ।"

ছবি একটি মেয়ের, প্রতিভাদীপ্ত মুখ, অধরে আর চোখে অসাধারণত্ব আছে। জিজ্ঞাসুভাবে তাকালাম, করুণা ঘাড় হেলিয়ে বললে, "হ্যাঁ, জিজা। বাঙালী বলে মনে হয় কি? বাপ

বাঙালী, মা দক্ষিণী। রহস্য ওখানেই। জিজা আর—মিত্রের বাবা একই। জিজার মা—মিত্রের মা নন। কে তিনি? বলছি। ভারতের দক্ষিণে ডি—স্টেটের নাম শুনেছ? জিজার মা ওখানকারই এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মেয়ে। রূপেগুণে রাজার নজর পড়ল। প্রথম যৌবন, পিতার অধীন, অনভিজ্ঞ মেয়ে, অতএব যৌবনের কয়েকটা বছর এমনিই কেটে গেল। তার পরে দেখা হল মিত্রের বাবার সঙ্গে। শুনেছি মস্ত গুণীলোক ছিলেন সুশীলবাবু—কণ্ঠস্বরে নাকি বনের পশু পোষ মানত, রাজার অন্তঃপুরিকা কোন্ ছার! ফলে ঘটল এক ইলোপমেণ্ট। রাজা নিলেন প্রতিশোধ—সুশীলবাবুর গর্দান, লোকে কিন্তু জানল মোটর এ্যাক্সিডেন্ট। সত্য যারা জানত তারা কেউ দিনের আলোতে বা সরকারী কোর্টে সাক্ষ্য দিতে আসে না। অতি কষ্টে জিজার মা কাশীতে পালিয়ে এলেন। যথাসময়ে পালাতে পারলে যে বিয়ে হত, তারই জন্য আফশোষ করতে করতে এবং ভগ্নস্বাস্থ্যে একটি দুর্বল শিশু প্রসব ক'রে, অকালে মারা গেলেন এই কাশীতেই।—মিত্তির তখন কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে। অন্য লোক হলে হয়ত ভাবত, অনেকখানি ইতস্ততও করত—জিজার পিতৃপরিচয়ের নিশ্চয়তা কী? কিন্তু মিত্তিরের মনে কোনো সন্দেহই উঠল না। সমাদরে জিজাকে গ্রহণ করলে। ক্রমে লোকে ভুলে গেল যে জিজা মিত্তিরের আপন বোন নয়। জানতই বা ক'জন? বাঙলাদেশে তো কেউই নয়।

এখন বুঝতে পারছ অভীর বিয়ে গোপনে কেন হল, কেনই বা সে পরমাত্মীয়ের কাছেও নিজেকে লুকিয়েছিল! অদৃষ্ট। তাছাড়া আর কী বলব।

চাকরেরা মিথ্যে বলেনি। মাঝে মাঝে ও বাড়িতে একাধিক লোকই থাকত, গোপনে রাত্রে একাধিক লোকই ছাদে পায়চারি করত। রহস্য ঘনতর হচ্ছে দেখে বাবা কোনো বন্ধুর শরণ নিলেন। সখের ডিটেকটিভ চাকরদের বশ করে ওখানে রাত্রি যাপন করলেন—কয়েক রাত। শেষের দিকে অভী ও জিজা ধরা পড়ল একসঙ্গে। জ্যোৎস্না রাত্তির, বালিগঞ্জ গভীর ঘুমে অচেতন, দু'জনে ঠিক দুপুর রাতে উঠে ছাদে বেড়াচ্ছে হাতে হাত জড়িয়ে। জিজার কালো চুল হাওয়ায় উড়ে অভীর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে, দুখানি মুখ কতবার পাশাপাশি হল—কত চাওয়া-চাওয়ি চোখে চোখে। তারপর হঠাৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত রইল সেই মুখ সেই দুজোড়া চোখ। সেই ছাদের ঘরে দপ করে আলো জ্বলে উঠেছে! প্রদীপ্ত আলোকে দাঁড়িয়ে বাবার বন্ধু, জ্বলছে তাঁর চোখও—রাগে। একটি কথা শুধু বললেন অভীকে—"ব্যাভিচারী!"

চোখের পলক না ফেলতে এক কাণ্ড। জিজা কি লাফিয়ে পড়ল ছাদ থেকে, না অভীই তাকে ফেলে দিল? অনেক চেষ্টা করেও বন্ধু তা স্মরণ করতে পারেন নি। শুধু ছুটে গিয়ে অর্ধ-উন্মত্ত অভীকে তিনি জোর করে চেপে ধরলেন, ছাদের দেয়ালের কাছে এসে দেখলেন অভীর সঙ্গিনীর

শাড়িখানার আধেক আটকিয়ে আছে কোনের ট্যাঙ্কে, বাকি আধখানা ঝুলছে আলিসায়। জিজা নেই। উপরে, নীচে, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। ইহলোকে অভীর সঙ্গে ওই তার শেষ মিলন, সেই তাদের শেষ দেখা।"

"কিন্তু করুণা!"

"আমার কথা এখনো শেষ হয় নি।

বন্ধু ও বাবা মনে করলেন জিজা কোনোরকমে পালিয়েছে। মরে নাই যখন, তখন অনর্থক হাঙ্গামে লাভ কি, এই ভেবে পুলিশে খবর দেওয়া হল না। অভীকে ঘরে বন্দী করে রাখা হল। যে ঘরে তোমরা দুবোন শুতে, সেটিই ছিল ওর শোবার ঘর। সেখানেই মারাও যায়। কি করে মরল? বলছি। বড় কষ্ট সীতা, গলাটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রকারান্তরে এর জন্যে আমার বাবাই দায়ী কিনা, তাই অভীর স্মৃতিতে আমাদের বড়ই জ্বালা। তবু শোন—

অভীকে এর পরে আর প্রকৃতিস্থ বলে মনে হত না। ওর উপর কড়া নজর রাখা হল। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শমতে যতদূর সম্ভব ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেওয়া হত—বাড়ির সীমার মধ্যেই অবশ্য। রাত্রে, বিশেষত চাঁদের আলোয় সে কী যেন খুঁজে খুঁজে ফিরত—ওই বাগানে। ওর বিশ্বাস ছিল জিজা কোথাও যায়নি, ওখানেই আছে। সেজন্যেই আমরা ওকে পাগল ভাবতাম।

তুমি ওবাড়িতে তো ছিলে। মনে পড়ে কি, চালতা ও জামরুলগাছে জড়াজড়ি ঘন বনের মতো একটা জায়গা? ওখানে কুয়ো ছিল, কাঁচা কুয়ো, বাগানে জল-সেঁচের জন্যে। অভী মনে করত জিজা ওখানেই আছে। কতবার চাঁদের আলোয় বেড়াতে বেড়াতে জিজা নাকি বলেছে, ধরা পড়লে সে ওখানেই ডুব দেবে। বাবাও সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু কুয়োর ভিতর লোকজন নামিয়ে কিছুই পাওয়া যায়নি।

তাই অভীর এ পাগলামিকে আমরা প্রশ্রয় দিতাম না।

ক্রমে সেই দুঃসহ ব্যথা—অভীর অপ্রকৃতিস্থতা অভ্যস্ত হয়ে এলো সবাইর। পাগল তো নয়, কেবল একটা বদ্ধমূল ধারণা, ছাদে বাগানে জিজাকে খুঁজে খুঁজে বেড়ানো। মাঝে মাঝে বলত, 'আমিই তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম ছাদ থেকে, মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করেছে ওই বাগানে। এখন রোজ রাত্তিরে আমার কাছে আসে—ডেকে যায় ছাদে বেড়াতে।' শুনে আমরা হাসতাম।

আরো কিছুদিন পরে ওর উপর আর আমরা নজরও রাখতাম না। যখন ইচ্ছা বাগানে ঘুরে বেড়াতে, বইহাতে, কখনো বা খাতা পেন্সিল নিয়ে। পুরানো স্বভাব ফিরে আসছে ভেবে সবাই খুসি।

কিন্তু ওর মনে মনে মতলব ছিল। টের পেলাম সেদিন, যেদিন বাগানের বুড়ো মালী ছুটে এসে বললে যে খোকাবাবু অনবরত ডুব দিচ্ছে কাঁচা কুয়োর জলে। বারণ মানছে না।

আত্মহত্যা করতে সে চায়নি, খুঁজছিল কেবল জিজ্ঞাকে।......

যাক্ আর বেশী নেই। এই বাড়ির এই বাগানেই একদিন তার সকল খোঁজার অবসান হয়েছে। না সীতা, আত্মহত্যা নয়, অসুখে মারা গিয়েছিল অভী। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, জিজ্ঞাকে খুঁজেছে।· তারপর চরম হতাশায়, এই মর্ত্যের অন্বেষণ ছেড়ে চির-অন্বেষণের পথেই বেরোবার জন্যে, কান্নাকাটি করে ওই বাগানেই তার শেষ শয্যা পেতেছিল। অভীর কথা আর নেই।"

*　　*　　*

একটা অননুভূত বেদনায় আজো হৃদয় যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে চায়। নিশীথের বন্দী—অতৃপ্ত পিপাসা—

জিজা শুধু তার প্রেমের প্রতীক। সে শরীরিণী নয়, তাই তরুণ তাকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। শুধু বাগানে নয়, ছাদে নয়; শুধু জলে নয়, স্থলেও নয় শুধু। অভী আজো তাকে খুঁজে বেড়ায় মানবের অনুভূতিতে, তার অস্থির অন্বেষণ-ধ্বনি ধরা পড়ে মানুষের শ্রবণে, তার সৃষ্টির তিয়াস ঝল্‌কে ওঠে মেদিনীর চোখে।

আমি তাই তার বন্দিনী। বাড়ি? হ্যাঁ ও বাড়ি ছেড়ে এসেছি। তাই অভীও আজ সেই বাড়ি ছেড়ে, দৃঢ়তর ভিত্তি গেড়েছে আমারই অন্তরগৃহে। সেখানে তরুণের অন্বেষণ, অভীর পিপাসা—অক্লান্ত।

বন্দিনীর বন্দনা

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

রেণু দেবী আজ চুল বেঁধেছেন অনেক সময় নিয়ে। আর কি সেই চুলের গোছা আছে! তবু, শত হলেও, বাইরের লোকের কাছে একটা পেত্নীর মতো তো আর যাওয়া যায় না। হলেনই বা চার সন্তানের মা! বয়স তবু কী আর এমন! এখনো ভাঁটার ডাক আসতে তাঁর অনেক দেরী।

শ্যামবাজারে নেমন্তন্ন। স্বামী আজ সন্ধ্যের আগেই আপিস থেকে বাসায় ফিরবেন। বলে গেছেন; সেজেগুজে তৈরী হয়ে থাকতে।

রেণু দেবী প্রস্তুত। এখন শুধু পরণের আধ-ময়লা শাড়িটা বদলে ফেললেই হয়। খোঁপা বেঁধেছেন, টিপ পড়েছেন, সিন্দুর দিয়েছেন সিঁথিমূলে, মুখে মেখেছেন স্নো। বেশ খানিকটা পাউডারও ঘষেছেন সারা মুখে; আবার তা মেশাতে হয়েছে এমনি করে যে, দেখে কেউ বুঝেও যেন বুঝতে না পারেন।

ছেলেমেয়েদেরও, সাজিয়েছেন—টুনিকে, বেলাকে, মণ্টুকে, খোকনকে। কোলের ছেলেটার দুষ্টু চোখে আবার কাজলও পরিয়েছেন। পরাতে গিয়ে কি জানি কেন আজ মনে পড়ে কবেকার সে কথা! আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে একটা কৃত্রিম তিল এঁকে দিলেন নিজেরই বাম-গণ্ডে। স্বামীর খুব ভালো লাগত এককালে। দোষ কী তাতে? কিন্তু আরশির মধ্যে ডাগর চোখ দুটিতে ফুটে উঠল কেমন একটু লজ্জা যেন—এই একা ঘরে, নিজেরই কাছে। রীতিমতো রাগ হয় রেণু দেবীর। আয়নার উপরই ফিক্ করে হেসে ফেললেন—পান-খাওয়া লাল টুকটুকে ঠোঁটে! এখনো সে সুন্দরী! আর কারু চোখে না-ই বা যদি, ওঁর কাছে ত বটেই। কিন্তু কথাটা ভাবতে গিয়ে বার বছর আগের সেই আকাশ থেকে ধপাস্ করে যেন খসে পড়েন বর্তমানের শক্ত মাটিতে। তবু আজ সেজেছেন বহুদিন পরে। মিথ্যে ভেবে আর লাভ কী? লক্ষ্য আজ স্বামীই। স্বামীর কাছে আজ এই সুযোগে, একটু ছন্দিত হয়ে ওঠেনই যদি, তার ফলে ব্রহ্মাণ্ড আর রসাতলে যাবে না! কী এমন বয়েস তাঁর টুনি এখনো দশ-ই পেরোল না!

কাজের লোকটাকে আজ যা হোক পাওয়া যাবে অনেকক্ষণ। আপিস থেকে ফেরেন সেই রাত ন'টা, কোনো কোনো দিন আরো অনেক পরে। অসুখ হয়ে দু'দিন যদি বিছানায়ও পড়ে থাকেন, তা হলেও রেণু দেবী বুঝি কটা দিন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। লোকটা মানুষ, না মেশিন?

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। রেণু দেবী চট্ করে খোঁপাটা ঠিক করে নেন। মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে! পরণের কাপড়খানায় হেঁশেলের ও-বেলাকার যত সব ছাপছোপ লেগে আছে এখানে ওখানে। শাড়িখানা পরে নিলেই ভালো ছিল।

সুশান্ত ঘরে ঢোকেন। পাঞ্জাবীটা খুলতে খুলতে প্রশ্ন করেন, "নেমন্তন্নে যেতেই হবে?"

"বা-রে! আমাদের সব তৈরী হয়ে থাকতে বলে এখন তুমি—"

"কাজ ছিল যে অনেক।"

"সে তো রোজই থাকে।"

"প্রেস থেকে ফোন্ করে জানিয়েছে, আমার জন্যে টেবিলের উপর একগাদা প্রুফ্ আজ কাঁদছে বসে।"—বলেই সুশান্ত শুষ্ক হাসি হাসেন।

"বল্‌লে না কেন, আজ নেমন্তন্ন রয়েছে?"

"তখন কি আর ও কথা ছাই মনে ছিল।"

তার মানে, ছেলেমেয়েদের নাচিয়ে-তুলিয়ে সে কথা অনায়াসে ভুলে থাকাটাই কাজ, এ-তুনিয়ায় বাদবাকী আর সবই অকাজ।

"চট্‌ছ কেন? যাব।—যাব বলেই তো সকাল করে ফিরে এলাম।"

অপার দয়া! রেণু দেবী মনে মনে অভিমানে ফুলতে থাকেন। কারণটা অবশ্য আলাদা এত করে যে সেজেছেন আজ, লোকটার একটিবার চোখেও পড়লো না!

বাইরে সন্ধ্যা নামছে। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। তারই জন্য নজরে এখনো পড়েন নি বুঝি? হয় তো তা-ই। রেণু দেবী সরে এলেন দেওয়ালের গায়। হাত বাড়িয়ে সুইচ্ টিপে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঐ চোখ ধাঁধানো বিজ্‌লী আলোর নিচেই। সুন্দরী সে আজো!

সুশান্ত প্রশ্ন করেন, "প্রিমিয়ামের টাকাটা আজ মনে করে ধীরেশকে দিয়েছিলে তো?"

হা, হতোহস্মি! রেণু দেবী ফুলে ফেঁপে ওঠেন ভেতরে ভেতরে। এরি জন্য এত সাজ? এতখানি কাঙালপনা? কেন? মুখ থেকে কী একটা কথা বুঝি বার হয়ে আস্‌ছিল, ঘরে ঢোকে টুনি—বড় মেয়ে।

"ওরা সব কোথায়?"

"নিচে—মাসীমাদের ঘরে।"

"ডেকে নিয়ে আয়।"

"আমরা কি এখনি যাব মা?" উল্লাসে প্রশ্ন করে মেয়ে।

"হ্যাঁ রে !—যা এখন।"

মেয়ে ছুটে ঘরের বার হয়ে যায়। এই শেষ সুযোগ। রেণু দেবী এগিয়ে আসেন আধ-শোওয়া স্বামীর মাথার কাছে—তক্তপোষের ধারে।

"তোমার শরীর ভালো নেই আজ ?"

"না তো !"

"তবে অমন চুপ করে আছ যে !"

"এমনি," পরিশ্রান্ত সুশান্ত একটা হাই তোলেন, "কাজের চাপ এত বেড়ে গেছে আজকাল !"

"অত খাট কেন ?" মুখেচোখে এক-ঝলক দরদের আভাস ফুটিয়ে রেণু দেবী ঝুঁকে পড়েন স্বামীর মুখের উপর।" থাক্। নেমন্তন্নে আজ গিয়ে কাজ নেই।"

"কেন ?"

"তোমার শরীর ভালো নেই।"

"খুব ভালো আছে।"

"রইলই বা। একদিন না হয় গল্প করেই কাজের সন্ধ্যা মাটি করলে।"

সুশান্ত জবাব দেন না। রেণু দেবী তাঁর চোখে পরিষ্কার বুঝতে পারেন, ও-চোখের দৃষ্টি এখন এ-ঘরে আর নেই।

"ভাবছ কী ?"

আনমনা সুশান্ত হেসে ফেলেন, "ভাবছিলাম, কালকে আমায় পাঁচ পাঁচটা ফর্মার ফাইনাল প্রুফ্ দেখতে হবে।"

ছেলেমেয়ের দল হৈ চৈ করে সিঁড়ির মুখে পৌঁছে গেছে। নিবিড় সান্নিধ্য হয় দুর্নিবার ব্যবধান !

রাত দশটায় বাসায় ফিরেই সুশান্ত শুয়ে পড়লেন স্বস্থানে। বেলা আর মন্টু তো বাসের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। টুনিও ঝিমুতে ঝিমুতে কোনো মতে যা হোক্ বাসায় এসেই সটান। ঘুমন্ত কোলের ছেলেটাকে দুধ গরম করে খাইয়ে শুইয়ে রেণু দেবী যখন গামছায় পায়ের তলা মুছে বিছানায় এসে উঠ্লেন, স্বামীর তখন নাক ডাকে।

আষাঢ় মাসের সন্ধ্যা কাল। আজ যেন একটু বসন্তের হাওয়া দিয়েছিল বহুদিন পরে, বিয়ে-বাড়ীর কলগুঞ্জনের মধ্যে সানাইএর সুর সেই তরলতাকে আরো বেশী তরঙ্গায়িত করে ছেড়েছে।··· কেন ? লোকটীর এরি মধ্যে নাক ডাকবে কিসের জন্য ? যত ঝঞ্ঝাট শুধু একলা তাঁরই ঘাড়ে ?

খোকনকে দুধ খাওয়াতে হবে, মণ্টুর মাথাটা বালিশে টেনে তুলে দিতে হবে, বেলা এরি মধ্যে কুকুর কুণ্ডলী হয়ে পায়ের তলায় গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে—তাকেও ঠিক করে শোয়াতে হবে, টুনিরও শোওয়া খারাপ—মাঝে একটা পাশবালিশের বেড়া দিতে হবে—যত ভাবনা, যত চিন্তা কি তাঁর ? সন্তানরা কি শুধু রেণু দেবীরই ? জোড়া-দায়িত্বের দায়ভাগ কেবল একেরই ঘাড়ে ?

"ঠিক হয়ে শোও না গো !"—স্ত্রী আস্তে একটু ধাক্কা দেয় ঘুমন্ত স্বামীকে।

"হুঁ !" 'তন্দ্রাজড়িত অর্থহীন সাড়া।

"কেবল হুঁ আর হুঁ !"—একেবারে মশারিটার উপরে গিয়ে পরেছ। এ আবার কেমন ধারা শোওয়া ! এক্ষনি পটাস্ করে ছিঁড়ে পড়বে মশারিটা সকল গোষ্ঠির গায়ের উপর।—শুনছ ?"

জবাব দিল সুশান্তের নাসিকাগর্জন। মশারির মধ্যে ভুর ভুর করে এসেন্সের মৃদুগন্ধ। রেণু দেবী ইচ্ছে করেই শাড়িখানি আজ বদলাতে ভুলে গেছেন।

"বেড্ সুইস্‌টা টিপে দাও না গো !—তোমার হাতের কাছেই।" দেবে না কেউ, তা রেণু দেবী বেশ জানেন। তবু আজ তিনি বলবেনই, এক শ বার বলবেন এই অন্ধকার নির্জন ঘরের সঙ্গেই না হয় কথা কইবেন মনে মনে। দিন তাঁর ফুরিয়ে গেছে ! আজ যেন তিনি বাসি ফুলের মালা। ফুল কি আর আছে ! ফুলের আজ ফল-পরিণতি। তবু কেন হায় ফলের মধ্যেও আজ ফুলের স্মৃতি কাঁদে ?......

"আবার তুই পায়ের তলায় গেছিস্ ?" অন্ধকার বিছানায় মা গর্জে ওঠেন, "যেমন ঘরে জন্মেছিস তেমনি তো হবি ! কথা বললে যদি কানেও তোলে ; বাতিটা নেবাবার উপকারটুকু হয় না বাবা !—তোদের আর দোষ কী ! এক ঝাড়েরই তো বাঁশ।"

আবার চুপচাপ। সুশান্ত নাক ডাকে। রেণুর চোখে ঘুম আসে না। কেবলি করে এপাশ-ওপাশ। মনে পড়ে সেই কলেজ জীবনের কথা। এক যে ছিল তরুণী ! সম্মুখে কত আশা, কত বড় বড় কথার রাজত্ব। সেই মুকুলিত মনের সামনে সেদিন বিমুগ্ধ বিস্ময়ের এক বিশ্ব নিয়ে দেখা দিয়েছিল যে তরুণ রাজপুত্র, তার এখন নাক ডাকে। বাইরের ডাক আজ তাঁকে অনেকখানি ঘর ছাড়া করেছে মনের দিকে। আর রেণু দেবীর কাছে হেঁশেলই আজ সারা দুনিয়া, ভাঁড়ার হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড !......

কোলের ছেলেটা ঘুমের মধ্যে একবার কেঁদে ওঠে। ইচ্ছে করেই মা থাকেন অন্ধকারে দূরে সরে। কাঁদুক না খানিক। কান্না শুনে তবু ঘুম ভাঙুক্ ঐ লোকটার। ভুগুক না সে-ও অন্ততঃ এই একটা দিন।...ও-ঘুম কি আর ভাঙ্গবে আজ ? কুম্ভকর্ণ !...

মাতৃস্তন্যতুষ্ট শিশু আবার ঘুমায়। রাস্তায় কোন্ দূরে একটা রিক্‌শা করে টুন্‌টুন্। মশারির বাইরে এসে রেণু দেবী বসলেন জানালার কাছে। নিঝুম নিশীথ নগরী। ঘুমের অবাধ রাজত্ব। ঘুম নাই শুধু তাঁরই চোখে!……

কেন? মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় এক মস্ত কেন?…স্বামী আর ভালোবাসেন না তাঁকে? তা-ও তো নয়। এই তো সেদিন তাঁর দু'দিনের জ্বরেই স্বামীর সে কী অস্থির কাণ্ড! ডাক্তার আনতে ছুটে যায়, শ্বশুর-শাশুড়ীকে খবর পাঠান, দু'দিন আপিস পর্যন্ত কামাই করেন। দিশি মার্চেন্ট আপিস! তবে?…

সে পুরুষ! ঘরকে কেন্দ্র করেও তাঁর চক্রখানি বেড়ে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকখানি, অনেক দূরে। বৃহত্তর বাহিরের পরিধি তাঁকে ছোটো করে ফেলেনি বলেই ঘর আজ তাঁর পর নয়। প্রেমই তাঁর কাছে একান্ত নয় বলেই এখনো সে ভালোবাসে অনায়াসেই। উৎস-মুখের নদী আজ সমতলে নেমেছে—হয়েছে শান্ত ও গভীর। রেণু দেবীর সেই ভারসাম্য কৈ? তাঁর কাছে ঘরই সর্বস্ব—তাই সে সর্বস্বান্ত! স্বামীর ভালোবাসাই জীবনের একান্ত ও একমাত্র মূলধন বলেই সুদের অঙ্ক বাড়ে না—তাতে একটু কমতি হলেই দেউলে হবার কল্পিত শঙ্কায় শিউরে ওঠে। এ-ও যদি যায় তবে রইল কী?

জানালার বাইরে চেয়ে রেণু আজ ভাবতে বসেন যত সব আবোল-তাবোল—কত কী আকাশ-পাতাল। বইয়ে পড়া, তর্কে-শোনা, মনে-গড়া, স্পষ্ট-অস্পষ্ট এমন অনেক অশিষ্ট অসংলগ্ন কথা এক সঙ্গে মনের মধ্যে ভীড় করে এসে দাঁড়ায়। সত্যি সে দেউলে আজ? মুক্তি কি সত্যই নেই?……

আবার ফিরে যান বিছানায়। সারি সারি শুয়ে আছে তাঁর বন্ধনের বেড়ি—এক, দুই, তিন, চার। সম্প্রতি অনাগত পঞ্চমেরও আগমনের নোটিশ এসে গেছে। আবার!…

আবার। আবার সে অন্তঃসত্ত্বা। রেণুর আচ্ছন্ন জীবনখানি যেন গুমরে ওঠে। ঘেন্না হয় নিজেরই উপর। এই ঘর-সংসার, ছেলেমেয়ে, সুশিক্ষিত সুসজ্জিত স্বামী—ঘেন্না হয় সব কিছুরই উপর। ঘেন্না হয়, করুণা হয় গোটা মেয়ে-জাতের উপর। সৃষ্টির প্রধান দায়িত্ব তাকে করেছে অপ্রধান যন্ত্র—পঙ্গু আর পরাশ্রিত। এরি নাম জীবন?……

বন্দিনী সে! সেকালের লোহার খোঁয়াড় একালে আজ সোনার খাঁচা! দামে ভারী! এই যা তফাৎ। বন্ধনদশা ঘোচে কৈ? তাই প্রেমের দুয়ারেও কাঙালপনা করতে হয় বার বার। এককালের ভরা জোয়ারে ভাঁটার ডাকের দিন যতই এগিয়ে আসে, মন ভোলাবার প্রয়োজন আজ ততই বেশী। অনিবার্যকে গ্রহণ করতে পারে না। স্বাভাবিককে সহজ মনে মেনে নিলে ফতুর হয়ে যায়। তাই নতুন করে ছলাকলা শিখতে হয়। আজ সে অভিনেত্রী।……

"ওগো শিগ্‌গির ওঠ, ছ্যাখো খোকন হঠাৎ কেমন যেন করছে," অন্ধকারে বেজে ওঠে রেণুর ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

সুশান্ত ধড়ফড় করে উঠে বসেন বিছানার উপর। রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "কী হ'ল?"

"খোকন হঠাৎ 'বিষম' খেয়ে চোখ কপালে তুলেছিল।"

ইতিমধ্যে সুশান্ত আলো জ্বেলে দিয়েছেন। ফুলের মতো কোমল শিশু নিশ্চিন্তে মায়ের কাছে ঘুমিয়ে আছে। খানিক আগে তার উপর দিয়ে যে অত বড় একটা বিপদ ঘটে গেছে, তার কোনো লক্ষণ নেই।

সুশান্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করতে থাকেন, "তোমায় কদ্দিন বলেছি, ঘুমুতে ঘুমুতে ছেলেপেলের মুখে—। কথা কানেই তোল না। একটা বিপদ ঘটলে বুঝবে তখন।"

"ঢের হয়েছে। থামো এবার।" ঝংকার দেন রেণু দেবী।

"অ্যাঁ! আবার রাগ দেখাচ্ছ। —এত লেখাপড়া শিখেছ না ছাই। তোমায় আর কত দোষ দেব কাঁঠাল গাছে আম হয় না। আমাদের সমাজটাই এই—"

"রাত দুপুরে তোমার ঐ পুরণো লেক্‌চার এখন বন্ধ রাখো দিকি নি। —ঘুমুতে দাও। সারাদিন তো খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মরি। রাত্তিরে পেটের শত্তুররা জ্বালাবে একদিকে, তার উপর তুমি যদি আবার—"

"শুধু রেগেই জিততে জানো—আর কিছু শেখো নি," বলে সুশান্ত পাশ ফিরে শোন।

মিনিট কয়েক বাদে রেণু দেবী পুলকিত হয়ে ওঠেন। স্বামীর জাগ্রত ডানহাতটা তাঁরই দেহের উপর। কিন্তু হঠাৎ-জাগা এই উচ্ছ্বাসটুকু পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়। পিতা জননীকে ডিঙিয়ে সন্তান খোঁজে। হাত বাড়িয়ে খোকনের কপাল ছুঁয়ে সুশান্ত গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে কথা বলেন, "খোকনটা বড্ড দুষ্টু হয়েছে আজকাল। না রেণু?"

রেণু দেবী চুপ করে থাকেন।

"এবার জ্বর থেকে উঠে একটু কাহিল হয়ে পড়েছে। তাই না?"

অপর পক্ষ সায় দেয় না।

"ঘুমুলে না কি গো?"

অভিমানিনী মরার মতো পড়ে আছেন নির্বাক, নির্বিকার। সুশান্ত আবার পাশ ফিরে শোন। মশারির মধ্যে ছয়টি প্রাণীর ঘুমন্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সম্মিলিত মৃদু শব্দের সঙ্গে এসেন্সের মরে-আসা গন্ধ, খানিক তখনো যে রয়েই গেছে!

পরদিন।

ভোর না হতেই উঠতে হয় রেণু দেবীকে। স্বামী চা খেয়েই বেড়িয়ে পড়বে টিউশানে। নটার মধ্যে আবার চাই আপিসের ভাত। দু'মুঠো মুখে গুজে সেই যে লোকটা বেরিয়ে যাবে বেলা সাড়ে ন'টায়, আর আসবে রাত দশটায়—সন্ধ্যার পর প্রেসের কাজটা সেরে এখানে ওখানে নানা ফিকির ফন্দিতে কাটিয়ে চাকুরিতে চলে না, করতে হয় আরো অনেক ছোট-খাটো উঞ্ছবৃত্তি!

"ছাত্র পড়ানো ছেড়ে দাও।—কতবার বলেছি, এত খাটুনি সইবে না তোমার। কথা যদি কানেও তোল।" চা দিতে গিয়ে রেণু দেবী বলেন। সুশান্ত খুব খাটে সত্য, তাই বলে তাঁর অমন সুপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ ভেঙ্গে পড়ছে এমন কথা তাঁর শত্রুও বলবে না। জবাব দিলেন, "আমার এই লোহার মতো শরীর—"

"অত কেনই বা খাটবে, শুনি। তোমার কাছে কোনো দিন টাকা-টাকা করেছি শুনেছ কখনো। কত লোকের তো চলে-না চলে-না করেও চলে যায়। তোমার টিউশানের টাকাটা ছাড়াও এ-সংসার না খেয়ে আর মরবে না।"

"তা জানি! সেটা হচ্ছে বর্তমানের কথা। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। মেয়েটা বড় হয়ে উঠছে না? বিয়ে দিতে না পার, পড়াবে তো? আর দুদিন বাদে চার-জন মিলে যখন স্কুল-কলেজে বেরোবে, তখন? মরার কথা কেউ বলতে পারে না। লাইফ-ইন্‌সিওরের প্রিমিয়ামটা চালিয়েই যেতে হবে।"

কথাগুলো একেবারে পুরাণো। সুশান্তও বহুবার বলেছেন এমনি গড় গড় করে, রেণু দেবীও শুনে গেছেন এমনি তন্ময় হয়ে।

সুশান্ত ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। রেণু দেবী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকেন পথের দিকে—বন্দিনী তাকিয়ে থাকে বন্দীর গমন-পথে! মায়ায়, অনুকম্পায় বুকখানি ভরে ওঠে! কাল রাতের হিংসার পাত্র আজ সকালে শিকল-পরা পুরুষ!......

ঠিকে-ঝি মানদা এসেছে—রান্না ঘরের চাবী চায়। এরি মধ্যে দু'বাড়ীর বাসন-মাজা শেষ করে এসেছে সে। এর পড়েও আরো দু'বাসায় তার কাজ বাকী। মনে পড়ে রেণু দেবীর—মাঘ মাসের শেষ রাত্রে রোজ এসে মানদা কড়া নাড়ে—"বৌদিমনি গো দোর খোল।" কনকনে শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে একরাশ বাসন নিয়ে মানদা দেখতে দেখতে গরম হয়ে ওঠে কাজের ঠেলায়। মানদা কারু ঘাড়ে বসে ভাত ধ্বংস করে না! খাঁচা-ছাড়া পাখীর পায়ে স্বাধীনতার শিকল!

এই দোতলা বাড়ীর পাশেই খানকয়েক খোলার ঘর রেণু দেবীর পাড়াপড়শী—তবু চেনেন না ওদের। শুধু জানেন মোটর এসেও ঐ চট-লাগানো দোর-গোড়ায় দাঁড়ায়—অবশ্য

মাঝে মাঝে, রাত্রিবেলা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কিন্তু কর্পোরেশনের ফ্রী স্কুলে পড়তে যায় রোজই—মানুষ হতেই চায়!...

রেণু দেবীর কাছে এই কতবার দেখা তুচ্ছ-করা ঘরগুলো আজ বড় হয়েই দেখা দেয়। কেন যেন মনে হয়, তাঁর কথাও কোথায় যেন গিয়ে মিশে গেছে ওদের কথার সঙ্গেই; কোথায় যেন স্বামীর সঙ্গেও মিলে গেছেন একই প্রান্তরে। ভাষা দিয়ে সে-কথা এখন বোঝাতে পারবেন না।—এক বোবা অন্ধ অনুভূতির মধ্যে শুধু ধরা পড়ে সবটা।...

বন্দিনী সে বন্দীর ঘরে! তাকিয়ে আছেন সামনের বড় বাড়ীটার বাগানের দিকে। দেখতে দেখতে পূর্বদিকের কোণের ঐ ছোট গাছটা বড় হয়ে উঠেছে—একদিন তার ফুলও ফুটবে, ফলও ধরবে হয় তো।

ছেলেমেয়েরা এখনো কেউ ওঠে নি রেণু দেবী একলা—বড় একা আজ। সকালের কাঁচা রোদ অজস্র ছড়িয়ে গেল বাগানের সর্বাঙ্গে। ঝলমল করে উদ্ভিদরাজ্য—কাল রাতের বৃষ্টি-ভেজা ঘাসগুলোও হাসে যেন। জেগে উঠেছে জীব-জগত। ঢেউএর পর ঢেউএর মতো এই অব্যাহত অফুরন্ত স্রোতের যে আর শেষ নেই। এই তো ভালো, এই না জীবন! রেণু দেবী উন্মনা হয়ে ওঠেন—এই বিশ্বসৃষ্টির মহাসঙ্গীতের মূলসুরেরই বাহন হয়ে আজ কেন সে এত বেসুর, এমন বেখাপ, এতখানি বেমানান? অনাগত কালের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্র বাঁধতে গিয়ে সে কি শুধু যুগে যুগে নিজেই পড়বে বাঁধা? আষাঢ়ের এই নির্মেঘ আকাশের নিচে এই জীবধাত্রী বসুন্ধরার শতলক্ষ ঘটনার বিপুল প্রবাহের মাঝে দাঁড়িয়ে, এ-কথা যে মন মানে না—স্বীকার করতে পারে না এই নিষ্ঠুর পরিহাস, এই চূড়ান্ত অপমান!...তবু মানতে হয়। কাঁঠাল গাছে আম হয় না—রাগের মুখে বলা স্বামীর কালরাত্রের কথাগুলি হায় এতখানি সত্য!...

কোথায় যেন রয়ে গেছে মস্তবড় গোঁজামিল। মানুষের নিজের হাতের মুখর সৃষ্টিই কি নির্বাক বিশ্ববিধানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে সব অপরাধ, সব অভিযোগ? অনিবার্যই যদি, তবে আকাঙ্ক্ষণীয় নয় কেন?...

"বৌদিমণি! উনুন ধরিয়ে দিয়েছি।"

"আমি যাচ্ছি পরে, তুমি যাও।"

মানদা চলল তার অন্য কাজে।

"মানদা!"

মানদা যেতে যেতে সিঁড়ির মুখে ফিরে তাকায়।

"তোমার ছেলেটার অসুখ সেরেছে?"

"সারলো আর কৈ?—কালও আবার জ্বর এসেছে।"

"ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?"

"কাল হাসপাতালে নিয়ে যাব ভাবছি," মানদা সিঁড়ির অর্ধেক নেমে গেছে, "বৌদিমণি ও-বেলা এসে সব বলব ভাই! আজ তোমার এখানেই দেরী হয়ে গেছে অনেক।"

রেণু দেবী ঘরে ফিরে আসেন। খবরের কাগজ এসে গেছে। মানদাই রোজ উপরে ওঠার সময় নিচ থেকে নিয়ে আসে সঙ্গে করে।

"আনন্দবাজারের" পাতা জুড়ে মহাযুদ্ধের 'ব্যানার'!—কালো মোটা বড় বড় হরফে পুরনো পৃথিবীর শেষ-নিঃশ্বাসের পূর্বাভাস? দু'হাজার মাইল ফ্রন্ট্ জুড়ে ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ। এদিকে জাপানী সৈন্য ঢুকে পড়েছে ইন্দোচীনে। ওদিকে মার্কিন মুলুকও লাগাম ছিঁড়তে চায় যেন। পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—লাগুক আগুন সব খানেই! জমকালো হেডিংগুলোর উপর চোখ বুলিয়েই রেণু দেবী কাগজখানা সরিয়ে রাখেন। মাতা মৃত্তিকার কী বিপুল গর্ভযাতনা! নবজীবনের জন্মলগ্ন আর কতদূর? রেণু দেবীর অশান্ত প্রশ্নের জবাব মিলবে সেই দিন?— আজ মাথা খুঁড়ে মরলেও কি মুক্তি নাই?

মিথ্যা সান্ত্বনা? রঙীন কল্পনা? সেই ভাবী দিনের আভাস যে রেণু দেবী পেয়েছেন— যেমন তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে, সারা মনপ্রাণ দিয়ে, টের পেয়েছেন তাঁর গর্ভস্থ অজানা অদেখা পঞ্চম আত্মজের সুনিশ্চিত আগমনের সত্যটাকে। পলে-পলে দিনে-দিনে বেড়ে' গড়ে' বেড়িয়ে আসে নবাগত রক্তস্রোতে স্নান করে। জীবন থেকে আর এক জীবন! পুরনো দেহ থেকে নতুন দেহ। বিশ্বসৃষ্টির সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার! ব্রহ্মাণ্ডের সব'চেয়ে সহজ-সুন্দর-প্রবল-নিষ্ঠুর।

ইতিকথা! জীবনকে যে মুক্ত করে, তারই মুক্তি থেমে থাকবে কতকাল?

"মা!"

টুনি মুখ ভেঙ্গে উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

"কী মা!" স্নেহের আবেগে জননীর কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়। রেণু দেবী মেয়ের মুখের দিকে খনিক চেয়ে থাকেন নিষ্পলক। টুনি যে বড় হয়ে উঠছে দিনের দিন! ভাবীকালের এক রেণু দেবীর ফ্রক্ পরার দিন ফুরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। তারপর?......

সংবাদপত্রের একটানা হেডলাইনের কালো বড় অক্ষরগুলি যেন লক্ষ লক্ষ নরনারীর জমাটবাঁধা রক্ত। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রেণু দেবী আত্মজার বাসী মুখেই একটা চুমু খান কপালের উপরে। টুনি কিন্তু অবাক হয়ে চেয়েই আছে উদ্বেল জননীর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানির দিকে। মায়ের কাছে এত আদর বহুকাল সে পায় নি। ব্যাপার কী?

"লজ্জা কিলো! আমি যে তোর মা!" রেণু দেবী মেয়েকে তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে খানিক বিমুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকেন; ঐ বিছানার উপর ঘুমিয়ে আছে বেলা আর মণ্টু আর খোকন।—ঘুমিয়ে আছে আগামীকাল!

দুর্দিনের বান্ধবী

ইন্দ্রানী রায়

এখনই সে আসিবে। ঠিক এই মুহূর্তে না হইলেও ঘণ্টা খানেকের মধ্যে নিশ্চয়ই সে আসিয়া পড়িবে।* খোলা অর্গ্যানের রীড্‌গুলোর উপর অগোছাল ভাবে মুখখানা রাখিয়া বসিয়াছিল মেয়েটি। কণ্ঠস্বর ওর মূক; একটা গানের কলি বুকের মধ্যে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে সুরে সুরে। কতদিন···ওঃ, কতকাল আগে ওরই কণ্ঠে ফুটিয়াছিল এ গান, উষ্ণ-বিরহে ঘনীভূত। মধুর চঞ্চলতায় অকস্মাৎ মিষ্টি রাঙ্গা মুখে মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইল;—আজই যেন প্রথম ফুল ফুটিয়া উঠিল ওই নুতন রজনী-গন্ধার ঝাড়ে। বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া ওঠে মন, গন্ধে নয়; চাঁদের আলোর তলায় ওই অসূর্যম্পশ্যা রূপের অভিনব বিকাশে। আজ এইখানে বসিয়া বলা চলে, চোখ মুদিয়া অনুভব করা চলে পরিচিত ফুলেদের গন্ধ বিধুরতা। কিন্তু সর্বক্ষণই পরিমাপ করা চলেনা কুঁড়ির অবগুণ্ঠন ভাঙ্গিয়া পড়িলে কাহার কতখানি লাবণ্য খুলিয়া যায়।

প্রকাণ্ড আয়নাটার গায়ে চোখ তুলিয়া মেয়েটি চাহিয়াছিল। ঊর্দ্ধমুখীন রজনী-গন্ধা ও নয়, তবে আজ ওর ওই তনুদেহে জড়িত হিমানী-শুভ্র রেশমের শাড়ীর কোলে ঘন সবুজের প্রান্ত, প্লাটিনামের কর্ণাভরণ, সর্বোপরি কালো কবরী বেড়িয়া মল্লিকার শুভ্র মালা···কবিচিত্তে ওর তুলনা হয় তো বা রজনী-গন্ধা। আপনাতে আপনি মুগ্ধ হইয়া গেল মেয়েটি, এত মাধুরী! ও ভুলিয়া গেল ও যে শিখা। ছোট করিয়া কানের কাছে কহিতেছে সে—"বিদ্যুৎ আর আগুন নিয়েই যে আমার খেলা, তোমার মধ্যে চাইনে আমি সে ছবি। তুমি—তুমি শিখা নও, স্বপ্ন। আমার সকল কর্মের অবসানের পর, বিরাম হলো তোমার কাছে, তুমি স্বপ্ন-লেখা, ক্লান্ত অবসন্ন মনের সঞ্জীবনীসুধা।" চমকিয়া আয়নাটার সম্মুখ হইতে ও সরিয়া আসে, কানের কাছে এমনি করিয়া পুরানো কথাগুলার সুর টানিতেছে, সুপ্রিয় কি তবে আসিয়া পড়িল! কিন্তু না, সে আসে নাই। বারান্দা হইতে ঘরে ঢুকিবার দরজাটা ভেজানো, কাঁচের সার্সিগুলো অসম্ভব জ্বলিতেছে, পশ্চিম আকাশ সোণালি-লালে আচ্ছন্ন, সূর্য বিদায় হইতেছেন। তাইতো, পাঁচটা যে বাজিয়া যায়, তবু যে আসে না সুপ্রিয়।

আপন হাতে সাজানো চায়ের টেবিলের ধারে আসিয়া দাঁড়ায় শিখা। দুই জনের মত আয়োজন, সুপ্রিয় আর শিখা। নীলাভ চীনেমাটির পেয়ালা প্লেটে সোণালি লতা আঁকা, টেবিলের আবরণটি পর্যন্ত নীল,—আজিকার আকাশের চেয়েও নীল! গোলাপী আর সবুজ সুতোয় লতাপাতার

বাহার দেওয়া তাতে। এ তো সেদিনের কথা, এই তো এই বারান্দার রেলিং ঘেঁষা কেদারাটায় বসিয়া ও টেবিল ঢাকনিটায় ফুল তুলিতেছে, সুপ্রিয়র পায়ের শব্দ নীচের সিঁড়িতে, ওর চলা ওই রকমই। ধীরে সুস্থে কথা বলা বা চলাফেরা সুপ্রিয়র অভ্যাসের বাইরে।

—বাঃ! চমৎকার হচ্চে তো! রেখে দিও রেখে দিও, কী জানি ওটা শেষ হবার আগেই যদি পাড়ি জমাতে হয় অন্যত্র, টেবিলে বিছিয়ে চা খাওয়া আর হবে না তখন। যদি ফিরে আসি……। ওঃ! তাইতো, শিখা হিসাব করে। এতো সেদিনের কথা নয়। এ যে বহুদিন—একটি দুইটি বছরও নয়, সুদীর্ঘ আটটি বছর পর ফিরিয়া আসিয়াছে সুপ্রিয় টোকিও হইতে ভারতবর্ষে। রাজরোষ ওর কাটিয়াছে সম্প্রতি, তাই কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে গতকাল। এতকাল একটা চিঠি লেখার পর্যন্ত হুকুম ছিলনা সুপ্রিয়র। কিন্তু রওনা হওয়ার পথে নিশ্চয়ই ছিলনা সে নিষেধাজ্ঞা এবং, অবশ্যই শিখাকে সে নিজে পারিত সংবাদটুকু দিতে; আজ ভোরে সংবাদ দিয়া গেল সুনীল আর বিভূতি, আজ বৈকালে আসিবে শিখার বাড়িতে সুপ্রিয়। এর উপরে সেসময় যেন জিজ্ঞাসা করিবার মত কিছু ছিল না—সুনীল আর বিভূতি চলিয়া গেল। তারপর আয়োজনে আয়োজনে নামিল সন্ধ্যা, সুপ্রিয় এখনও আসিল না। সুপ্রিয় এইরকমই—হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় হয় তো ওকে আসিয়া দিবে চমকাইয়া। আশ্চর্য নয়, হয়তো বা ও আসিয়া পড়িয়াছে অনেকক্ষণ আগেই, আত্মগোপন করিয়া আছে এ বাড়িরই কোনও স্থানে। বুকের মধ্যটা শিখার গুরু গুরু করিয়া উঠে, এ বাড়ির ধূলিকণার সঙ্গে যে পরিচয় সুপ্রিয়র, আর অপরের চোখে ধূলা দিয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে ও যা ওস্তাদ…। একবার আসন্ন সন্ধ্যায় নিতান্তই অসময়ে এক পুলিশ আসিয়া বাড়ি ঘিরিল, দোতলায় প্রবেশ করার সিঁড়ির মুখের বন্ধ দরজাটা লাথি মারিয়া তারা ভাঙ্গিয়া ফেলে আর কি। শিখা ছুটিয়া গেল স্নানের ঘরের মধ্যে, অর্ধ স্নাত হইয়া একটা জানালার ফাঁকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পুলিশ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, দশমিনিট…কাপড় ছেড়ে দরজা খুলছি। সেই অভিনয়টুকুই কাজে লাগাইয়া ফেলিল সুপ্রিয়, কারণ বাড়ি সার্চ করিয়া তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

সুপ্রিয় যে সময় ভারতের বাইরে গেল, সে সময় হইতে এতগুলা বছর নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত হইয়া কোন সময়ের জন্যই শিখাকে স্বস্তি বা অবসর দেয় নাই। সুপ্রিয় গেল, রাখিয়া গেল তার অনুচরবৃন্দ, আর আশ্রয়দাত্রীর দায়িত্ব দিয়া গেল শিখাকে। এ বাড়িতে সামাজিক প্রশ্নের বালাই নাই, নিজের অভিভাবক বলিতে শিখা নিজেই। তারপর অর্থ আছে, বিদ্যা আছে, বাইরে নামও আছে দানশীলা বলিয়া। দুঃসময়ে অনেকেই আসিল ওর কাছে! বিজন, অতুল, সমর, পরিতোষ—অবশেষে প্রফেসর বিভূতি মৈত্র পর্যন্ত। তারা ওকে করিয়াছে সম্ভ্রম, শিখা করিয়াছে স্নেহ—সুপ্রিয়রই অনুগামী যে ওরা। এত কাল ও ছিল অনেকেরই নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল, অবশেষে

ওরও জীবনে কি প্রয়োজন আসিল একটা পরম নিশ্চিন্তকর আশ্রয়ের! নতুবা সুদীর্ঘ আট্‌টি বছর ধরিয়া কিসের এ প্রতীক্ষা! কিন্তু না—যা এতকাল হয় নাই তা হইতে দেওয়া চলে না। নিজের মনের কাছে ও অভিভাবক হইয়া যুক্তির জাল বুনিতে থাকে। ইচ্ছা করিয়াই যেন জালের বুনট্‌টা ওর ঢিলে দিতে একটু ভাল লাগে,—আর সেই ভাল লাগাকে গাঢ়তর করিয়া কহিতে থাকে সুপ্রিয়—"মানুষের জীবনে সুখকর স্বপ্ন জীবন্ত নয় বলিয়াই তা অতুলনীয় দুর্লভ। সেই স্বপ্ন এল আমার জীবনে প্রাণের রসে টলমল করে…আমি জানি, আমি জয়লাভ করবো, সকল প্রকার অসমতার বিরুদ্ধে আমার যে সংগ্রাম, ব্যর্থ ত'া হতে পারে না" ক্রমশঃই দেহের রক্তধারার মধ্যে একটা অধীর আকুলতা উষ্ণতর হইয়া উঠিতে থাকে। নীচে নামিবার সিঁড়ির ধাপের উপর গিয়া দাঁড়াইল শিখা, এই মাত্র যেন সুপ্রিয় আসিয়াই চলিয়া গেল, প্রত্যেকটি সিঁড়ির গায়ে গায়ে এখনও যেন শব্দের রেশ…কী চঞ্চল, আস্তে চলিতে আর শিখিল না সে। কী আশ্চর্য, নিজে দিলনা ও শিখাকে একটা সংবাদ…উষ্ণ অশ্রু স্রোত দীর্ঘ কালো চোখ দুইটিকে দৃষ্টিহারা করিয়া তুলিতে চায়। চোখের উপর হাত চাপা দিয়া ও হাসিল, ও অস্বীকার করিতে চায় এ বেদনা। আবার ও ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল বাজনাটার কাছে, কি বিষাদ-মধুর আজিকার দিনটা। অর্গ্যানের রীড্‌গুলার উপর ও খুশীমত হাত চালাইতে থাকে…নীচের রাস্তায় মোটরের সচকিত হর্ণ। ছুটিয়া গিয়া শিখা প্রবেশ করিল স্নানের ঘরের মধ্যে। এ কী যুক্তিহীন চঞ্চলতা ওর অনুভূতির মধ্যে। সুপ্রিয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ও নিজে ছাড়া দ্বিতীয় কেহ যে আর নাই। একী ছেলেমানুষী কাণ্ড। আর সুপ্রিয়…খুঁজিতে খুঁজিতে নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া হাজির হইবে—ওঃ সে যে অচিন্ত্যনীয়…। ছুটিয়া শিখা বাহির হইয়া পড়িল স্নানের ঘর হইতে। আলোর সুইচ টিপিয়া সিঁড়ির দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিল সুপ্রিয়,—একা নয়; সঙ্গে আছে অপ্রত্যাশিত অপরিচিতা মহিলা একটি। শিখার দেহ মন ব্যাপী এতক্ষণের স্বপ্নাচ্ছন্ন জড়িমাটুকু মুহূর্তের মধ্যে ঝরিয়া পড়িল। অতি স্বাভাবিক ভাবে মার্জিতা মেয়েটির মত সবিনয় নমস্কারে তাদের বসিবার জন্য সম্মুখস্থ সজ্জিত সোফা দুইখানা নির্দেশ করিয়া দিল। দুইজনের মত আয়োজন, তৃতীয় আসন আর ছিল না, অগত্যা শিখাকে বসিতে হইল অর্গ্যানের ধারে ছোট টুলটার উপর। স্নিগ্ধ হাসিতে চতুর্দিক ভরিয়া দিয়া কহিল সুপ্রিয়, বন্ধু-বান্ধবদের ছাড়াও সহরটারই বা কত পরিবর্তন দেখ্‌ছি। কিন্তু আশ্চর্য তুমি, সেই আট বছর আগেকার মতোই—অপরিবর্তনশীল, এ যেন এই সেদিনকার তুমি!…

পার্শ্বস্থিত মহিলাটির প্রতি সুপ্রিয় এইবার দৃষ্টিপাত করিয়া শিখার সঙ্গে পরিচয়ের জের টানে। ইনিই শিখা, বুঝলে চিত্রা…আর ইনি চিত্রা মুখার্জি, মানে তোমাদের হতভাগা সুপ্রিয়ের পরিণীতা।

বাজ্‌নাটার গায়ের সঙ্গে ভাল করিয়া আঁটিয়া বসে শিখা, ছোট করিয়া শুধু বলে, ওঃ, জান্‌তুম না—।

—সে একটা সঙ্কট গেছে জীবনে বুঝ্‌লে, সুপ্রিয় কহিল, প্রবল প্রয়োজন এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এদিকে আমার অবস্থাটা কোন রকমেই জানাতে পারিনি। আমার নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় চিত্রার সঙ্গে দেখা, ওরও মা তখন সদ্য মারা যাওয়ার পর বাপ একজন জাপানী মহিলার অধিনায়কত্ব মেনে নিলেন, দু'জনেরই বিপন্ন অবস্থায় বন্ধুত্বটা আমাদের গাঢ় হয়ে উঠতেই, ওকে বিয়ে করে আলাদা হয়ে অন্য বাড়ীতে উঠে গেলুম ওর বাপের আস্তানা ছেড়ে। শিখা চাহিয়াছিল চিত্রার পানে। গোল ধরণের পুরন্ত মুখ, স্থূল দেহ বেড়িয়া জমকাল ফুলকাটা শাড়ী। সুপ্রিয়র কথার শেষে দেখা গেল চিত্রার বৃহৎ মুখখানা একটা আত্মতৃপ্তির খুসীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বনির্দেশ মত শিখার দাসী আসিয়াছে। টিপট্ ভর্তি তৈরী চা রাখিয়া গেল টেবিলের ধারে। চিত্রাকে দেখা গেল একটু ইতস্ততঃ করিতে, তারপরই শিখার পানে চাহিয়া কহিল, আমাদের দু'জনের মতোই দেখছি আয়োজন, আপনি কি বস্‌বেন না?

সুপ্রিয় স্থির দৃষ্টিতে চাহিল শিখার শ্বেতপাথরের মত কঠিন মুখের পানে; এ মুখের পানে চাহিয়া এখন কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না যে ওরও চোখে সাধারণ মেয়েদের মতই চোখের জল দেখা দিতে পারে। সুপ্রিয়র স্মরণে আসে শিখার কান্না ভরা মুখ, তারই সঙ্গে মনে পড়ে দেশ ছাড়িয়া যাইবার রাত্রিটি। ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া সুপ্রিয় চাহিয়া রহিল শিখারই দেহ আড়াল দেওয়া সঙ্গীত যন্ত্রটার প্রতি। চা-প্রিয় লোক চিত্রা, পেয়ালায় চা ঢালিবার মুখে শিখাকে কহিল, আপনার দাসীকে আদেশ করুন আরেকটা কাপ্ আন্‌তে, গল্প করার মতো সময় আজ আর নেই, আসুন চা-টা একসঙ্গেই আনন্দ করে খাই।

সবিনয় ভঙ্গীতে হাত দুটি জড় করিয়া কহিল শিখা, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দয়া করে মাপ করতে হবে আমায়, এ সময়ে চা যে আমি খাইনে। সুপ্রিয় চমকিয়া উঠিল; সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য কথা শিখার মুখে। কিন্তু অসম্ভব ও সম্ভব হইয়াছে, এতো তুচ্ছ চা পান। তথাপি জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে না সুপ্রিয়—আচ্ছা বিভূতি চা খায় না বলে তুমি কেন নিজের রুচিটা বিসর্জন দিলে?

—বিভূতি—? একটা বিস্ময়ের ধাক্কায় একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে শিখা। তারপর সহজ সুরে কহিল, বিভূতি বাবু তো চা খান। আমার এই খানেই তিনি চা-তে অভ্যস্ত হয়েছেন।

অথচ তুমি ছেড়ে দিলে···সুপ্রিয় যেন ক্লান্ত হইয়া উঠিল।

—হাঁ ছেড়ে দিলুম, শিখা কহিল।—কবে থেকে? সুপ্রিয় আবার প্রশ্ন করে। শিখা একটু থামিয়া বলে, এই তো আজ থেকে।

নিঃশব্দ হাসিতে চিত্রার মুখ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, চায়ের পেয়ালা মুখ হইতে নামাইয়া কহিল, তুমিও যেমন ! শিখা দেবীর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি আমি, বহু আগ থেকেই চায়ের প্রতি আসক্তি ওঁর টুঁটে গেছে, আজকেই নূতন নয়। দ্যাখতো, চায়ের পাত্র সামনে রেখে আমিতো পারলুম না বসে থাকতে, দু'কাপ হয়ে গেল এরই মধ্যে। কথার মধ্যেই খাবারের থালাটা চিত্রা একটু সামনে টানিয়া লয়, সামান্য একটু মুখে তুলিয়াই স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়ায়। কি একটা ত্রুটি ঘটিল বুঝি, শিখা ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল। আপনাদের সঙ্গে বসতে না পারার অপরাধ আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করছেন, তবু কেন একরকম না খেয়েই উঠে পড়লেন ? রুমালে মুখখানা মুছিয়া কহিল চিত্রা, নীচতলার ফুলের বাগানটুকুর মতোই সুন্দর আপনার অতিথিপানার আয়োজন। মিষ্টিমুখ আমি করেছি, এখন না গিয়ে আর উপায় নেই, মেয়েটাকে রেখে এসেছি ঝিয়ের জিম্মা করে, অস্বস্তিতে আর বসা হলো না, বিভূতিবাবুকে নিয়ে যাবেন একদিন আমাদের ওখানে। আচ্ছা চল্লুম, নমস্কার ! বিদায় দিতে শিখা এই বার উঠিয়া দাঁড়ায়, দুই চোখ মুদিয়া অতি আরাম-দায়ক ভঙ্গীতে সিগার ফুঁকিতেছে সুপ্রিয়। শিখা কহিল, মেয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে চলেছেন, ইনি যে রইলেন। চিত্রা হাসিয়া উঠে—পরম নিশ্চিন্তের সুরে বলে, সোনা জহরতের পোট্‌লা নয় যে চুরি যাবে। ওঁর এই রকমই, নিজের ইচ্ছে না হলে সাধ্যি নেই যে ওকে কেউ কোন বিষয়ে মত করাতে পারে। গাড়ি পাঠিয়ে দেব ঘণ্টাদেড়েক পর, এখন ওকে তোলা যাবে না। নিঃশব্দে শিখা চিত্রার অনুসরণ করিল সিঁড়ির ধাপ পর্যন্ত, হাসিমুখে নামিয়া গেল চিত্রা, নীচের রাস্তায় মোটরের হর্ণ বাজিয়া ওঠে।···সুপ্রিয়র সম্মুখে শিখা আর ফিরিয়া আসে না—স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে সিঁড়ির ধাপে। অর্ধদগ্ধ সিগারটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া লাফাইয়া ওঠে সুপ্রিয়।—বিভূতি কখন আসবে ? কখন সে বাড়ী ফেরে ? প্রশ্নের জবাব দিতে শিখা প্রবেশ করিল ঘরে ; কহিল, কেন আসবে এখানে ? সুপ্রিয় কহিয়া উঠিল, তার মানে ডিভোর্স করলে নাকি তাকে ?

শিখার মুখের উপর উপেক্ষা-মিশ্রিত হাসির ঝিলিক্ খেলিয়া যায়। এসব কী রকম ধারণা তোমা—আপনার ?

সুপ্রিয়র ক্ষুদ্রায়তন চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়া ওঠে। ওর স্বাভাবিক ক্ষিপ্র কণ্ঠস্বর স্থির হইয়া আসে। এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা কহিয়া ফেলিল সুপ্রিয়। ধীরে ধীরে ও কহিতে থাকে, টোকিওর একটা রেঁস্তরায় দেড় বছর আগে সুশীল চন্দর সঙ্গে দেখা, বয়নশিল্প শিখতে গেছে জাপানে। কলকাতার বহু খবরের মধ্যে বিশেষ খবর সে দিলে যে তুমি সংসারী হয়েছো বিভূতিকে নিয়ে। তারপর থেকে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল, এখানে সেখানে কাজ করে টাকাকড়ি কিছু সঞ্চয় করেছিলেম, ব্যাঙ্কে জমা ছিল···আর আমি উপোস করে ঘুরে বেড়াতে

লাগলেম পথে পথে। তখন সব ভুলে গিয়েছিলেম—টাকা-পয়সা—খাওয়া, ঘুম—সব। বাঙ্গালীর ছেলের দুর্দশা দেখে চিত্রার বাবা নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ী। তাদের সেবা যত্নে সুস্থ হলুম, চিত্রাকে পেলুম কাছে, কী রকম একটা প্রতিহিংসা জেগে উঠলো বুকের মধ্যে—তাই করলুম ওকে বিয়ে, ভালোবেসে নয়, ভালোবাসার অপমান করে।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল শিখা, এই তো বিপ্লবীর পরিচয়। ভেঙ্গেচুরে সব কিছুর মধ্যেই নূতন কিছু করবার চেষ্টা—

—পরিহাস রাখো, হঠাৎ চীৎকার করিয়া ওঠে সুপ্রিয়, এত বড় নির্ম্মম তুমি, মৃত্যুর চেয়েও কঠোর দণ্ড দিলে আমায়। তোমাকে—তোমাকে আমি, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতে চায় সুপ্রিয়র—তোমাকে আমি……

—পাগলামো করোনা, আদেশের সুরে কহিল শিখা, তোমার ভুলে যাওয়া অন্যায় যে শুধু স্বামী নয়, সন্তানেরও দায়িত্ব—

হাঃ হাঃ করিয়া জোরে হাসিয়া উঠিল সুপ্রিয়। বিগতদিনের বহু হাসির রেশ দেওয়ালে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল যেন।

—কারুরই ভুলে গেলে চলবে না, সুপ্রিয় কহিল, যত নিষ্ঠুরই হোক সে কাজ, কাজের পথে বাধা যদি পায় বিপ্লবী, ভেঙ্গে সে তা দেবেই। ওদেশে মানুষ হয়ে চিত্রাও বিশ্বাস করেন এ কথা, আর ভালো করেই জানেন তিনি—সর্বক্ষণই মুক্ত আমরা দুজন দুজনের কাছে। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইয়া দিল সুপ্রিয়, বিদ্যুতের মত ছুটিয়া গিয়া দরজা আগলাইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় শিখা। সুপ্রিয় হাসে, দুটি চোখ অসম্ভব চক্ চক্ করিয়া উঠিল—হয়তো বা অশ্রুজল।

বিকৃত মানব

নৈমুদ্দিন আহাম্মদ

পায়ে-চলা লাল সরু পথটী নীল পাহাড়ের বাঁকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেখানে মুছে গেছে; তারই আশে পাশে দেখা যায় চা-বাগানের কুলিবস্তী। সারবাধা অপরিচ্ছন্ন, অসংখ্য ছোট, ছোট, জীর্ণ খড়ের ঘর। এই জীর্ণ খড়ের ঘরগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে কুলিবস্তী,—গড়ে উঠেছে এর অধিবাসী, সহস্র সহস্র কুলির জীবন যাপন প্রণালী। জীর্ণ ঘরগুলির সাথে রয়েছে অপূর্ব সামঞ্জস্য এর অধিবাসীদের। ঘরগুলির মতই

এরা জীর্ণ, পরিত্যক্ত। ঝড়ের মুখে জীর্ণ ঘরগুলির মতই এরা অসহায়—এদের জীবনে নেই বৈচিত্র্য, নেই কোন বৈশিষ্ট। কালের অপ্রতিহত প্রবাহে জীর্ণ ঘরগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করে এরা ছুটে চলেছে ধ্বংসের অভিমুখে, লোকচক্ষের অন্তরালে।

প্রতিদিনের মত ভোর পাঁচটায় নিয়মিত, দূরে কলের বাঁশী বেজে ওঠে। জানিয়ে দেয় এদের যন্ত্রদানবের গভীর আহ্বান। চকিতে চঞ্চল হয়ে উঠে এরা,—ক্ষণিকের তরে দেখা দেয় কর্মচাঞ্চল্য, ফিরে আসে ক্ষীণ প্রাণের মৃদু স্পন্দন।

যন্ত্রদানবের গভীর আহ্বান মৃত্যুদূতের আহ্বানের মতই বাজে এদের কানে। ঘুম-জড়িত চোখে টলতে টলতে, ছেলে, মেয়ে, জোয়ান বুড়োর ছোট ছোট দল একে একে জড়ো হয় সরু লাল পথটার ওপর। এদের ক্ষীণ কোলাহল মুহূর্তের জন্য মুখরিত ক'রে তোলে আশপাশের বনভূমি। লাল পথটা ধরে, চা-গাছের পাশ দিয়ে এঁকে, বেঁকে—এগিয়ে চলে ছোট, ছোট দল। এমনি অবিশ্রাম গতিতে এগিয়ে গিয়ে ছোট ছোট দলগুলি একে একে আশ্রয় নেয় যন্ত্রদানবের বিরাট অগ্নিগহ্বরে।

সমস্ত দিন ধরে চলে এই ক্ষীণপ্রাণ, জীর্ণ লোকগুলির সাথে বিরাট যন্ত্রদানবের অশ্রান্ত, অবিশ্রাম সংগ্রাম। যন্ত্রদানবের অপরিসীম ক্ষুধার বেদীমূলে নিঃশেষে এরা ঢেলে দেয় নিজেদের শ্রমশক্তি, বুকের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত। রাঙিয়ে তোলে নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে চায়ের প্রত্যেকটী পাতা।

দিনের শেষে, এমনি অবিশ্রাম সংগ্রামের মাঝে কলের বাঁশী বেজে ওঠে। জানিয়ে দেয় এদের সেদিনকার মত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চকিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে এরা, মুখে ফুটে ওঠে ম্লান হাসির রেখা। টলতে টলতে, ছোট, ছোট দলগুলি বেরিয়ে আসে মুক্ত বাতাসে, উন্মুক্ত আকাশতলে।

কর্মক্লান্ত, ধূসরমলিন লোকগুলি চা-গাছের পাশ দিয়ে, লাল পথটা ধরে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলে দূরের ঐ ঘরগুলির উদ্দেশে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কুলিবস্তীর জীর্ণ খড়ের ঘরগুলিতে মুহূর্তের জন্য ফিরে আসে সজীবতা, ফিরে আসে কর্মব্যস্ততা। সান্ধ্য আকাশ ক্ষণিকের তরে মুখরিত হয়ে ওঠে এদের ক্ষীণ আনন্দ কোলাহলে। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে, এদের আনন্দ কোলাহল যায় থেমে। প্রগাঢ় নীরবতা ধীরে ধীরে নেমে আসে কুলিবস্তীর বুকে। কুলিবস্তীর সহস্র সহস্র অধিবাসীর ইহাই দৈনন্দিন জীবন। এর ব্যতিক্রম এরা কল্পনা করতে পারে না, ভাবতে পারে না এর বেশী দুনিয়ায় পাবার, জানবার কিছু আছে; তাই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এদের কোন অভিযোগই নেই। এরা জানে এই ব্যবস্থা, এই পারিপার্শ্বিকের ভেতরই মানুষ হয়েছে এদের বাপ, পিতামহ, গড়ে উঠেছে এদের নিজেদের জীবন। এই ব্যবস্থাকেই এরা জেনেছে চরম এবং পরম সত্য বলে; তাই এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই এরা করেনা, নীরবে সহ্য করে যায় সমস্ত অত্যাচার, উৎপীড়ন।

কুলিবস্তীর শেষ সীমায়, পাহাড়ের কোল ঘেসে যেখানে নতুন ছোট ছোট ঘরগুলি তৈরী হয়েছে, তাদেরই একটায় দালিয়া পেতেছে তার নতুন সংসার। দালিয়া আর লছমি বিধাতার অপূর্ব সৃষ্ট জীব দুটী। এদের স্বাস্থ্য, এদের ভালবাসা কুলিবস্তীর ঈর্ষার বস্তু। কুলিবস্তীর এরা গৌরব, আপনার প্রেমে এরা মসগুল। কুলিবস্তীর সর্বগ্রাসী দারিদ্র আজও এদের মন থেকে যৌবনের মধুর স্বপ্ন নিঃশেষে মুছে দিয়ে যায়নি; তাই এরা প্রাণরসে ভরপুর।

নতুন রিক্রুট হয়ে এখানে যারা আসে, তাদেরই শুধু থাকতে দেওয়া হয় নতুন বস্তীতে। এখানকার এমনি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার জোরে দালিয়া স্থান পেয়েছে নতুন বস্তীর ছোট ঝক্‌ঝকে একখানি ঘরে। আজ এক হপ্তা দালিয়া কাজে গিয়েছে; এরি মধ্যে দু'হপ্তার মজুরি সে অগ্রিম পেয়েছে। হাতে নগদ পয়সা পেয়ে আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে দালিয়া। এ' ক' দিনের ভেতরই দু' দু' বার ম্যানেজার সাহেব নিজে বাড়ী এসে তাদের খবর নিয়ে গেছেন, আর এও বলে গেছেন প্রয়োজন হলেই আরও দু' হপ্তার মজুরি সে অগ্রিম পাবে। কৃতজ্ঞতায় ভেঙ্গে পড়ে দালিয়া, ম্যানেজার সাহেবের অপরিসীম দয়া সে ভুলতে পারে না। ভোর পাঁচটায় নিয়মিত কলের বাঁশী বেজে ওঠার সাথে সাথে, চারটে পান্তা, পেঁয়াজ, নুন দিয়ে খেয়ে দালিয়া কাজে বেরিয়ে যায়,—ফেরে সে বিকাল ছ'টায়। নানা কাজের ভেতর দিয়ে, এমনি এদের দিন কেটে যায়। ম্যানেজার সাহেবের অপরিসীম দয়া, বর্তমান জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই এদের মনে স্থান পায় না।

নতুন যায়গা, প্রকৃতির শ্যামল সৌন্দর্য লছমির মন্দ লাগে না। প্রকৃতির শামল সৌন্দর্যের মাঝে নিজের অজ্ঞাতে লছমি হারিয়ে ফেলে নিজের অস্তিত্ব। ছোট সংসার, কাজ কর্মও নেই তেমন কিছু, সুদীর্ঘ অবসর। অবসর সময়টা বাজে কাজে, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেই কাটিয়ে দেয় লছমি; এখনও এই পরিবেশ ও প্রতিবেশীদের সে ঠিক আপনার করে নিতে পারেনি।

ভোর পাঁচটায় দালিয়া কাজে বেরিয়ে গেছে। প্রতিদিনের মত অন্যমনস্ক লছমি আজও বাইরের দাওয়ায় বসে দূরের শ্যামল পাহাড়ের কোলে বিছিয়ে দিয়েছিলো আপনার শ্রান্ত দৃষ্টি। ভারী বুটের শব্দে লছমির ধ্যান ভেঙ্গে গেল। ত্রস্ত বিস্মিত লছমি ফিরে দাড়ালো। সামনে দাড়িয়ে বাগানের ম্যানেজার, মুখে তার জলন্ত সিগার আর সুস্পষ্ট মৃদু হাসি। সপ্রতিভ লছমি সরমজড়িত কণ্ঠে বললে—"উনি ত বাড়ী নেই।"

কোন উত্তর না দিয়েই ম্যানেজার সাহেব নীরবে বেরিয়ে গেলেন। অন্যমনস্ক ম্যানেজারের পকেট থেকে একখানা কাগজ বেরিয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি কাগজখানি কুড়িয়ে নিয়ে লছমি ডেকে বললে—"হুঁজুর, আপনার কাগজ।"

ম্যানেজার সাহেব ফিরে দাড়ালেন। হেসে বল্লেন—"উঁ, আচ্ছা—এ এখন তোমার কাছেই থাক।" কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই ম্যানেজার সাহেব সামনের লাল পথটী ধরে দ্রুত এগিয়ে গেলেন।

বিস্ময়াবিষ্ট লছমি দশ টাকার নোটখানি হাতে করে দাওয়ায় ফিরে গেল। আজকের এই অযাচিত দানের কোন অর্থই সে খুঁজে পায় না।—ম্যানেজার সাহেবের অর্থপূর্ণ মৃদু হাসি, এরই বা কি অর্থ থাকতে পারে? ভাবতে ভাবতে, শিউরে ওঠে লছমি। মনে পড়ে সাঁওতাল পরগণায় তাদের সেই ছোট কুঁড়ে ঘরখানির কথা, ছেলে বেলার কথা, বাপ মার কথা। সাঁওতাল পরগণার স্মৃতির সাথে জড়িত কত সুখ-দুঃখের কথা। বাসন্তী পূর্ণিমার রাতে দালিয়ার সাথে প্রথম মিলনের কথা; প্রথম মিলনের মাধুর্যে পূর্ণ কত মান, অভিমানের কথা। মনে পড়ে পাশের বাড়ীর ঝরিয়া, মনিয়ার কথা। লছমি আসার সময় গলা ধরে দু'বোনের কি কান্না। এদের কথা ভাবতে, ভাবতে লছমির চোখের পাতা দু'টী ভারি হয়ে ওঠে।

"লছমি !" স্বামীর সাড়া পেয়ে লছমি চোখ মুছে উঠে দাড়ায়। আনন্দে আত্মহারা দালিয়া কাছে এসে বলে—"দেখেছিস ! আমি ত আগেই বলেছিলাম, সাহেবের চোখে যখন পড়েছি তখন ভাল কাজ একটা হবেই।" জিজ্ঞাসু নেত্রে লছমি তাকিয়ে থাকে। দালিয়া বলে চলে—"এবার হলো ত ? কুড়ি টাকা মাইনে। খাস্ বড় সাহেবের আরদালী, দশ টাকা পেয়েছি আগাম ; এবার তোর কি চাই বল দেখি ?" লছমির দিক থেকে কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। "খাবার কিছু থাকে ত দে, আমাকে সহরে যেতে হবে,—আজ আর ফিরবো না, কাল ভোর নাগাদ হয়ত ফিরবো।" ব্যস্ত লছমি উঠে দাড়ায়। দালিয়া ডেকে বলে—"শোন্ ! তোর জন্য একখানি লাল শাড়ী আনবো। লাল শাড়ীতে তোকে মানায় বেশ।" স্বামীর প্রতি কটাক্ষ হেনে লছমি রান্না ঘরে চলে যায়। একথালা শুকনো ভাত, একটু ডাল, আর এক বাটী মাছের ঝোল পরিশ্রান্ত দালিয়ার সামনে ধরে দেয়। ভাত ক'টী খেয়ে মুখ ধুয়ে দালিয়া উঠে দাড়ায়। লছমি পান নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তাড়াতাড়ি পানটুকু মুখে দিয়ে দালিয়া সহরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। আজ তার প্রাণে এসেছে আনন্দের জোয়ার; কিছুতেই আর সে বাঁধ মানছে না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কুলিবস্তির বুকের উপর ধীরে ধীরে নেমে এসেছে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার। সমস্ত বস্তিটাই যেন ঘুমে অচেতন, কোথাও প্রাণের এতটুকু স্পন্দন নেই। দূর থেকে এখনও মাঝে মাঝে ভেসে আসে মাদলের মৃদু আওয়াজের সাথে অসংলগ্ন হিন্দি গানের দু' একটি টুকরো। দু' একটী জীর্ণ ঘরে এখনও দেখা যায় ক্ষীণ আলোকের রশ্মি। এছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই, সমস্ত বস্তিটাই যেন মৃত্যুর মত নীরব।

নৈশ বাতাসে দূর থেকে ভেসে আসে নারী-কণ্ঠের কাতর আর্তনাদ। চকিতে জেগে ওঠে কুলিবস্তির প্রত্যেকটী প্রাণী। নৈশ গগন মুখর করে বেজে উঠে দামামা। শব্দ লক্ষ্য করে যুবকের দল ছুটে চলে লাল সরু পথটী ধরে। অধীর ঔৎসুক্যে অপেক্ষা করে মেয়ে বুড়োর দল, সমবেদনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রত্যেকটী প্রাণ। নতুন বাড়ীর পাশে এসে যুবকের দল থমকে দাড়ায়। বিজলী বাতির আলোর সাথে ম্যানেজার সাহেবের জড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। পরস্পরের মুখ চেয়ে যুবকের দল ধীর পদক্ষেপে ফিরে আসে। ঘটনা শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বস্তির প্রাণীগুলি একে একে এসে আশ্রয় নেয় নিজেদের ঘরগুলির ভেতরে। এমনই এদের স্বভাব। দুঃখ হলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করে, প্রতিকার করতে ছুটে আসে না। এরা সবই জানে, সবই বোঝে ; তবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়া অন্য কোন প্রতিকারের কথাই এরা ভাবতে পারে না। আর এ ত নতুন নয়, এমনি ঘটনা ত চিরদিনই ঘটে আসছে ;—এতে বৈচিত্র্য থাকলেও নতুনত্ব নেই। সেদিন ত এমনি ঘটনাই ঘটে গেল পাশের বাড়ীতে। কৈ, কেউ ত প্রতিবাদ করেনি। এদের ধারণা, নিয়তির মতই এ নিষ্ঠুর, এর গতি দুর্নিবার, মানুষের সাধ্য নেই এর গতিরোধ করে। সুন্দরলালের স্মৃতি এরা আজও ভোলেনি। নিরপরাধ সুন্দরলাল এর প্রতিবাদ করতে গিয়েই আজও কারা-প্রাচীরের অন্তরালে দিন গুনছে।

ভোর হওয়ার সাথে সাথে এদের মধ্যে কর্মব্যস্ততা ফিরে আসে। অপ্রতিহত গতিতে চলে এদের দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ। পূর্ব রাত্রির ঘটনা কোন দাগ কাটতে পারেনি এদের মনে, এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি এদের জীবনের গতি। এই সামান্য ক' ঘণ্টার ভেতরই বিগত রাত্রির সমস্ত গ্লানি এদের মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। এমনি করেই এরা ভুলে থাকে দুনিয়াকে। ব্যথা অন্তরে চেপেই এদের হাসি মুখে এগিয়ে যেতে হয়।

ভোরের আবছা অন্ধকারে গা ঢেকে ত্রস্ত পদে এগিয়ে চলেছে দালিয়া। পূব আকাশের লাল আভা নীল পাহাড়ের বুকে মায়াপুরী সৃষ্টি করেছে। এমন প্রাণ ভরে দালিয়া কোনদিন প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেনি। আজকের ভোরের আলো তার মনে যেন নতুন রঙ ধরিয়ে দিয়েছে, তাকে করে তুলেছে মাতাল। আনন্দে ভেঙ্গে পড়ে দালিয়া বাড়ীর কাছে এসে ডাকে—"লছমী !"

কোন সাড়া না পেয়ে দালিয়া এগিয়ে যায়। অজ্ঞাতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে প্রাণ। ঝকঝকে সুন্দর ঘরখানির বিশৃঙ্খল আসবাব প্রাণে ব্যথা দেয় ; শঙ্কিত দালিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকে—"লছমি !"

দালিয়ার সাড়া পেয়ে পাশের বাড়ীর কালো মেয়েটী ছুটে আসে। সালঙ্কারে বর্ণনা করে পূর্ব রাত্রির ঘটনাবলী ;—সান্ত্বনার সুরে অনেক কথাই সে বলে যায়, বোঝাতে চায় এতে দুঃখ করবার নেই কিছুই। হতভাগ্য দালিয়া !

ইনি কে ?

১৯২৭এ ইতালী পরিদর্শনের পর ঃ "আমি যদি ইতালীয় হতাম তবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেনিনিজ্‌মের পশুচিত ক্ষুধা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তোমাদের (ফাসিস্ত) বিজয়াভিযানের সঙ্গে থাকতাম।

এখন ফ্যাসিজমএর আন্তর্জাতিক দিক সম্পর্কেও আমি কিছু বল্‌বো। বাইরের দিক্‌ দিয়ে তোমাদের এ আন্দোলন সমস্ত জগতের উপকার করেছে।

ইতালী রুশীয় বিষের যথার্থ প্রতিশেধক আবিষ্কার করেছে। এর পর কোনো শক্তিশালী জাতিই এ ধরণের বিযাক্ত উৎপত্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হবে না।"

১৯৩৮, ১১ই নবেম্বর ঃ "আমি চিরকাল বলে এসেছি যে, যুদ্ধে যদি আমরা হারতাম তবে জাতিসঙ্ঘের মধ্যে আমাদের যথার্থ স্থানে ফিরে নিয়ে যাবার জন্য আমি আকাঙ্খা করতাম যাতে হিটলারের মতই একজন নেতা পাই।"

হিটলার ? না মুসোলিনী ?

—ইনি চার্চ্চিল—

১৯৪১, ২২শে জুনে বল্‌ছেন :

> "হিট্‌লার একজন রক্তপিপাসু নরপিশাচ। সমস্ত ইউরোপ পদানত অথবা বশীভূত করেও তার রক্তপিপাসা মিটে নাই।......তাই দরিদ্র রুশকৃষক ও শ্রমিকদের বঞ্চিত করে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্য এই নৃশংস অভিযান।"

শৈশবে ইনি রুশীয়বিষের বিরুদ্ধে টিকা নিয়েছিলেন তাতে যে বিষ শুধু নিরপেক্ষই (neutralized) হোয়েছে তা নয় সম্পূর্ণ স্বপক্ষে এসেছে। তার প্রমাণ উপরে পেয়েছি আমরা।

দুঃখের বিষয় হিট্‌লারের মত একজন নেতার অভাবে ইনি "যথার্থ স্থানে" এখনো যেতে পারেননি—যে স্থানে ছিলেন সে স্থানেই অচল হোয়ে আছেন ও থাকবেন। **ইনি একা নন,—**

ভারতসচিব আমেরী ১৯৩৫ সনে,—"মুসোলিনীর আবিসিনিয়া অভিযান সম্পর্কে আমাদের মত যাই হোক না কেন—পক্ষপাতহীনভাবে দেখতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে সিনর মুসোলিনীর মত আর কেউ বর্তমান সময়ে য়ুরোপের শান্তিরক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করেন নি।"

লর্ড বিভারব্রুক্‌ ১৯৩৮ সনের ৩১ অক্টোবরে,—"আমরা হিটলারের সাধুতা ও আন্তরিকতার প্রশংসা করি, আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করি..."

ইতরজনে কহে ঃ—"সাধু !! সাধু !!"

ভিন্নরুচির্হিলোকঃ

রুশ জার্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় ২২শে জুন ১৯৪১। নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক কৃপালিনী হঠাৎ ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হোয়ে ২২শে জুন এক বিবৃতিতে গভর্ণমেন্টকে দোষারোপ কোরেছেন সামরিক ও যন্ত্রের দিক দিয়ে ভারতবর্ষকে বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার মত উপযুক্ত না করবার জন্য। রুশজার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে কংগ্রেসের পক্ষে কোনো পথ পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই একথা প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলছেন "কাজেই বিশ্বাস ও শান্তি দ্বারা আমাদের অন্তর পূর্ণ করে ছোট ছোট ভয় ও চিন্তাকে দূর কোরে সমস্ত অবস্থার জন্য আমরা প্রস্তুত থাক্‌বো", তিনি বলেছেন কংগ্রেসীদের কাজ হচ্ছে "দেখা ও অপেক্ষা করা।"

অন্যান্য যুধ্যমান জাতির মত ভারতবর্ষও যে বৈদেশিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হোচ্ছে—কৃপালিনী কি তা জানেন না—আম্বালাতে যুধ্যোদ্যম সুরু হোয়ে গেছে। ভাবী সংগ্রামের অস্ত্রস্বরূপ চরকার গণনা সুরু হোয়েছে -- এরপরও কি বলা হবে ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা সম্পর্কে উদাসীন?

নিখিল ভারত কিষাণ সভা

গত ৭ই জুলাই এক প্রস্তাব পাশ করে বৃটিশ ও আমেরিকান জনসাধারণকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তারা যেন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে পুঁজিদারদের প্রচার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হন্ এবং ঐ দুদেশের গভর্ণমেণ্টকে সোভিয়েটের সঙ্গে অর্থ নৈতিক ও সামরিক মৈত্রী স্থাপন করতে বলেছেন।

এঁদের দৃষ্টিশক্তিও ক্ষুদ্র লক্ষ্য দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এঁদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিকটের জিনিষকে ফেলে রেখে দূরের জিনিষ দেখবার অসাধারণত্ব আয়ত্ব করেছে…এঁরা আরো বল্‌ছেন যে সোভিয়েটকে সাহায্য করতে হোলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন হোতে হবে—কিন্তু সোভিয়েট যদি জয়ী হয় এ যুদ্ধে, তা হোলে?

নিখিলভারত ট্রেড্ ইউনিয়ান কংগ্রেসে, প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছে যে রুশ-জার্মান যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের শ্রমিকদের যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো মনোভাব পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসাবে এর স্বরূপ বদলায়নি কাজেই যুদ্ধ সম্বন্ধে নীতি অপরিবর্তিত থাকবে।

মিঃ এম্ এন্ রায়, রুশজার্মানযুদ্ধসম্পর্কে বলেছেন নাজীদের সোভিয়েট আক্রমণের পর এই যুদ্ধকে আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলা চলে না, কাজেই ভারতীয় শ্রমিক সঙ্ঘের এসম্পর্কে উদাসীনতা বা নিরপেক্ষতা রক্ষা করা আর সম্ভব নয়। কাজেই নাজীদের বিরুদ্ধে আরো চাপ দেবার জন্য ভারতীয় শ্রমিকেরা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে। এক ঢিলে দুই পাখী মারার চমৎকার কৌশল!

আহ্বান

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

আধখানি গান গাহিয়া উড়িয়া গেলে
ছোট দুটি ডানা মেলে
হ'লে যে উধাও সে গানের মাঝখানে !
নানা কথা নানা তানে
মোর অন্তরে তারে পূর্ণতা দিতে চাই নিতিনিতি,
তাই অফুরান গীতি
গাঁথিয়া চলেছি মালিকায় মালিকায়,
অন্তরাটিরে কণ্ঠ আমার ধরিবারে নাহি পায়।

ফিরে এসো মোর পাখী,
শ্রবণে পরাণ রাখি'
বাকিটুকু তার শুনি।
সে গানের জালবুনি'
ঊর্ণ আমার গাঁথে জঞ্জালমালা,
ফুরাক্ তাহার পালা,
মৌনের মাঝে সুরে তব হোক লয়
গীতি তৃষার্ত নিরাকুল এ হৃদয়।

বিবর্ত্তন

অজয় ভট্টাচার্য

মেঘের নীলাম্বরীতে লেগেছে জ্যোছনার জরিপাড়,
হাওয়ার আকাশ আজ নাকি হলো স্বপনের পারাবার,
নিশিগন্ধার বীথি-ছায়াপথে চন্দ্রাহতের দল—
আদম-ইভেরা আজো চিনিল না আদি নিষিদ্ধ ফল।

বুকের তলায় ফুঁসিছে হাপর কহে কালিয়ার বাঁশি—
ওমর খায়াম আর সাকী সুরা হয়ে গেছে কবে বাসি,
গতিচক্রের চক্রনেমীতে দেমাকীর গুঁড়া দেহ,
কালো বুভুক্ষা শুষিয়া নিয়েছে পৃথিবীর অমুলেহ।

এই তো সাগর চিনিতে পার' কি ক্ষীরদ-সায়র বলি'—
সপ্ত ডিঙার সদাগর সবি উবিয়া গিয়াছে চলি—
রক্তে যাদের নোনা ধরিয়াছে একটু নুনের লাগি
লবণাম্বুর তীরে হাত পাতি তাহারাই আছে জাগি।

আজিকার ঝড়ে উড়ে গেল শুধু পিয়ালের পাতা নয়,
ছিন্ন পুঁথির কত ছেঁড়া কথা ছড়ানো আকাশময়।
ধোকা-ভগবান পারেনি রাখিতে ফাঁকির সিংহাসন
মানুষ হয়েছে আপন বিধাতা আপনার নারায়ণ।

দেখিতে পাও কি অকাশে উড়িছে অশ্বক্ষুরের ধূলি,
বল্গাবিহীন আগুনে জ্বলিছে কত পৃথিবীর খুলি—
পাথরে পাষাণে কালো ইস্পাতে মানুষের পরিচয়
আজিকার রাত হল্‌দে চাঁদের আর কুসুমের নয়।

ঘর সন্ধানে

তড়িৎ কুমার ঘোষ

ডিগবাজী-খেকো দাগীজীবনের নভে
চূণমাখা চাঁদে থ্যাবড়ানো-আশা জাগে !
বিটকেল্ পোড়া বাধা-মেঘ ঠেলি কবে—
দম্-ফাটা-শাস্— মুক্তিরে পাবে বাগে ?...

পিছলানো পথ্ উঁচু নীচু আর— কাদা !
'জোড়াতালি-দেহ' কোনো মতে হায় নড়ে !
থ্যাত্লা পায়ের চাম্ড়া হয়েছে সাদা,—
চ্যাপ্টা পরাণ পায়নাকো ঠাঁই ঘরে !

ফুট্বল্ জমে পিত্তি পড়িয়া পেটে ;
পইটিক ঘুষি হজম হইতে চলে !
বরফের স্নেহ পাড়িদেওয়া ভার হেঁটে,—
ফোস্কার জ্বালা দাঁত্ মুখ্ খিঁচে জ্বলে !

চলি তবু চলি— খোঁচা-খেকো চোখ্ মেলি' !
ভেল্কী দেখানো বজ্জাত-পথ্ ঠেলি !!!
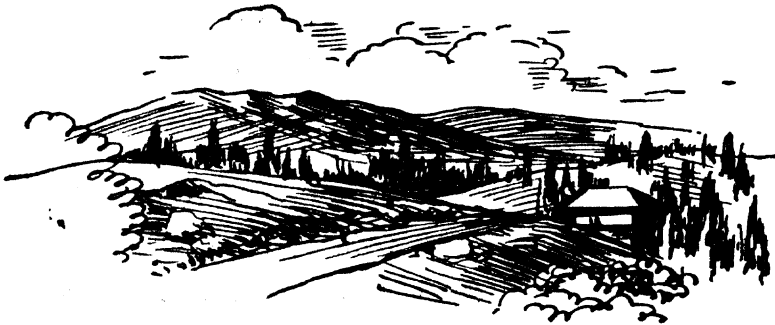
সারথি

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

মস্তিষ্কের ঠোকাঠুকি, মল্লযুদ্ধ বর্ধিষ্ণু 'ইজম' এ,
অনার্যের নির্বাসন, প্রাণদণ্ড অবাধ্য আর্যের ;
মুখরুচি জ্ঞানরুচি ভেদ ; সদাসৎ দ্বন্দ্ব চিরন্তন ;
ইষ্টমন্ত্র অনিষ্টজ ;—ইষ্ট আর কতদূর !

খৃষ্টবুদ্ধ ক্ষীণকণ্ঠ, গণ্ডগোলে ব্যর্থ উপদেশ ;
বক্সিং শব্দাঘাতে মানবিক কর্ণে শূন্যবাদ।
বাসরের মৃত্যুবাণী ! কুণ্ঠাভয়ে মধ্যাহ্নে মিলায় ;
নির্বিকার বধির আকাশ।

তুমি, কোথা তুমি !—
চক্ষে যার বহ্নি জ্বলে, বরাভয় তীক্ষ্ণ হাসি মুখ,
শুধু যার একবার অঙ্গুলি সঙ্কেতে
মিলাবে তরল গীতে আত্মঘাতী জীবনের
সমস্ত সংঘাত—
ভালমন্দ স্বার্থ-দ্বন্দ্ব উন্নত-অধম।

আবছায়া

জীবনানন্দ দাস

ভোরের বেলায় আজ একটি কঠিন অবসাদ
বিকেল বেলায়ও আজ একটি কঠিন
বিষন্নতা লেগে আছে পৃথিবীর বুকে।
একটি কৃষাণ এসে ছুয়ে ছুয়ে যোগ ক'রে তিন

লিখে যায় সারাদিন মাঠের ভিতরে।
কোথাও ফসল নেই তার।
ঠাণ্ডা কঙ্কালের কাছে সারারাত গুড়িস্মুড়ি মেরে শুয়ে থাকে ;
কিছুই করে না অস্বীকার।

২

নিমীল জলের ঢেউয়ে নদী চ'লে যায়।
জল ছাড়া কিছু নেই তার।
কখন সকাল বেলা বিকেল হয়েছে
আমাদের চেনা শতাব্দীও চ'লে গেছে।
চ'লেছে সে জলপায়রার নীড় খুঁজে।
নদীর কিনারে
বাদামী মাটির পরে ঝ'রে পড়ে পাতা।
এই সব সাদা সাধারণ বিশ্বস্ততা।

আমারো আঙুলে প'ড়ে থেমে থাকে—যতদিন আছে—
একটি হলুদ পাতা। নিকটের গাছে
কোথাও কোকিল হিম শূন্যতার পানে গান গায়,
পাখিটির ভয়াবহ একাগ্রতার তুলনায়

কেবলি সময়ান্তর এসে পড়ে সভ্য পৃথিবীতে ;
বার বার অপরাহ্নের মৃত্যু হয়।
জানেনা কি বস্তু নিয়ে তৃপ্ত হতে হবে
পুরাতন খসড়ায়—অথবা বিপ্লবে।

পুনর্মূষিক

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

হাজার হাজার কুলী ও কামিন চলেছে আঁধার সাঁঝে
পাতাল-পুরীর অন্ধ কোটরে কয়লা-খাদের মাঝে।
মাথার উপরে বিচালীর গাদা,
চটের থলেতে পিঠে ছেলে বাঁধা,
রাত-কাটানোর কি এমন বাধা—মরদ রয়েছে সাথে ;
আঁধারের কীট আঁধারে লুকাবে, নূতন কি আছে তা'তে !

ছু'টো চানা-ভাজা, মহুয়ার মদ, মাদল সঙ্গে আছে,
ছুনিয়ায় আর কিবা দরকার, কি-বা চাই কা'র কাছে ?
খাওয়া-শোওয়া আদি প্রকৃতির কাজ,
আঁধারেই চলে, নাহি বাধা-লাজ ;
মন-ভুলাবার ছু'টো ফুলসাজ—নাই আর প্রয়োজন ;
হাত চিনে মুখ, অন্ধ কীটের সেই কামনার ধন !

এমনি করে তো বনের পশুরা ছিল গিরি-বনবাসে ;
ছু'দিনের আলো যদি-বা ফুরালো, কি এমন যায় আসে ?
দিনের কর্ম্ম খাদ কাটিবার—
সেও তো এমনি বিকট আঁধার,
রাত কাটাবার শোওয়ার ব্যাপার, হ'লই না হয় নীচে ;
নসীবের লেখা রয়েছে যখন—ভাবনা তাহার মিছে।

পাতালে তাদের স্বাধীন রাজ্য গেল বুঝি এতকালে ;—
মনিবেরা আজ তাদেরই গর্ত্তে ঢুকিতেছে পালে পালে।
আসমানে নাকি দুষমন আসে,
দুম্‌দাম্‌ গোলা ফাটিছে আকাশে,
বাবুদল ভয়ে কাবু নিজবাসে পালা-পালা মুখে বলে,
পোকার মতন পিল-পিল করে' খাদে ঢোকে দলে দলে।

পাতাল-রাজ্য জয়লাভ হয়ে গেল বুঝি এইবার,
সাদায়-কালোয় মন্দে-ভালোয় হ'ল বুঝি একাকার!
সাপ এসে ঢোকে ব্যাঙের গর্ত্তে—
কেউ আর কারে চাহেনা ধর্‌তে,
কোনও ভেদ নাই স্বর্গে মর্ত্তে, সভ্যতা গেল চুকে'।
গুহার মানুষ প্রাণ রাখে আজ গুহারই মধ্যে ঢুকে'॥

পদাতিক
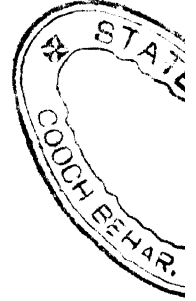
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যের আলো বক্ষের কাছে
মারে ঝিলিক্
উদ্ধত বুকে স্পর্ধায় চলি পথ—
বাঁকা তলোয়ারে স্বর্ণ-রশ্মি
প্রতিফলন্
হিংস্র আবেগে হাতিয়ায় ঝল্সায়।

হুঁসিয়ার ভাই, কাজ সমাপ্ত
প্রস্তুতির
প্রকাশ ব্যথায় কাঁপে সীমান্ত দেশ—
তীর্থের পথে গনতান্ত্রিক্
আগন্তুক্
তৃতীয় নয়নে দ্বিতীয় সূর্য জ্বলে।

যুগ-শতাব্দী ঘূর্ণায়মান
রাত্রিদিন
পথের কমলে কাজ নাই কমরেড—
লক্ষ্যের গানে অপ্রতিহত
কুচ্ কাওয়াজ্
বৈশাখী-ঝড়ে রক্ত নিশান ওড়ে।

মিথ্যে ক্ষতির পুঁজির বড়াই
তুলে রাখো
ঝল্মল্ করে সোনালি ভবিষ্যৎ—
বাঁকা তলোয়ারে স্বর্ণরশ্মি
প্রতিফলন
উদ্ধত বুকে স্পর্ধায় চলি পথ!

"বিশ্ববস্তু"

যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর শেষ হল

গত ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হল। দ্বিতীয় বৎসরে যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে, দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলবে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমস্ত পৃথিবীকে এই রক্তাক্ত রণাঙ্গনে এসে এই নিষ্ঠুর মারণ যজ্ঞে যোগ দিতে হবে, আজ তা' সবাই বুঝতে পারছে। দিন গড়িয়ে চলেছে, আর যুদ্ধ নিত্য নূতন স্তরে প্রবেশ করে বিস্ময়কর জটীলতায় আটকা পড়ছে। একবছরের সংক্ষিপ্ত কাহিনীও নভেলের মত রোমাঞ্চকর। গত আগষ্ট (১৯৪০) মাসে একাকী ও নিঃসঙ্গ ব্রিটিশ প্রবল জার্মাণীর বিরুদ্ধতা করেছিল। ভূমধ্যসাগরে তখন মুসোলিনী দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছে, ১৮ দিনে ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড তার হাতে গেছে। আটলান্টিকে জার্মাণ ইউ-বোট অক্লান্ত আক্রমণ চালিয়েছে ইংরেজের সরবরাহ জাহাজগুলোর ওপরে। তারপরে ৮৪ দিন ব্যাপী জার্মাণ ব্লিৎস্‌ক্রিগ্ (বিমান আক্রমণ) ইংরেজের আশ্চর্য জাতীয় ঐক্য ও নিষ্ঠার কাছে হার মানলো। পৃথিবীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধাকে ইংরেজ সেদিন জয় করেছিল। আটলান্টিকের যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ হলো বিব্রত, সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা এলো সাহায্যে এবং "ইজারা ও ঋণদান" আইন পাস হয়ে গেল। যুদ্ধের মালপত্র ইংলণ্ডে পৌঁছে দেয়া দায়, তাই আমেরিকা কতকটা দূর পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিল; এই উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র দখল করল আইসল্যাণ্ড। অগণিত ব্রিটিশ জাহাজ ডুবিয়ে জার্মাণী অপূরণীয় ক্ষতি করেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু ব্রিটিশের নৌশক্তিরও প্রবল আত্মপ্রকাশ হলো জার্মাণ জাহাজ বিসমার্ককে ডুবিয়ে দিয়ে। কিন্তু অতঃপর জার্মাণী নতুন পথে যুদ্ধকে চালনা করল। বলকানের দিকে এলো জার্মাণ যুদ্ধরথ। ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪০) রুমানিয়া হার মানল, ফলে হাঙ্গারী নিল ট্র্যানসিল্‌ভানিয়া, সোভিয়েট নিয়ে গেল বেসারাবিয়া, দক্ষিণ দোব্রুজাকে নিল বুলগারিয়া। আফ্রিকাতে জেনারেল ওয়াভেল ডিসেম্বর মাসে প্রতি-আক্রমণ করলেন ইটালীর গ্রাৎসিয়ানীর বিরুদ্ধে। টৌরোণ্টো ও মাটাপানের ব্রিটিশ বিজয়, লিবিয়ায় সাইরেনিকা দখল, ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড

পুনর্দখল, ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ড ও এরিট্রিয়া এবং সর্বশেষে আবিসিনিয়ার পুনর্বিজয় আফ্রিকাতে ইতালীর প্রতাপকে খতম করলো। ৫ই মে হাইলেসালাসী আদিসআবাবা পুনঃ প্রবেশ করলেন, ডিউক অব আওস্টা, ইতালীয় বড়লাট, ২০শে মে আত্মসমর্পণ করলেন। এদিকে জার্মাণীর অভিযান চলেছে অবারিত। ১৯৪১এর ১লা মার্চ বুলগারিয়া জার্মাণীর পক্ষে এলো; যুগোস্লাভিয়া ২৫শে মার্চ্চ জার্মাণীর দিকে পা বাড়াল; কিন্তু ২৭শে মার্চ আবার জার্মাণবিরোধী বিদ্রোহের ফলে বালকরাজা পিটার সিংহাসনে বসলেন। ৬ই এপ্রিল জার্মাণরা যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করে ১২ দিনের মধ্যে দখল করে নিল। ব্রিটিশ শক্তি ক্রীট দ্বীপে শেষ বাধা দান করে ১৫০০০ সৈন্যকে ক্রীটের ধূলিতে রেখে পরাজয় স্বীকার করে ফিরে এলেন। ইরাকে রশীদ আলীর বিদ্রোহ দমন এবং সিরিয়াতে ভিসি-শক্তির পরাজয় ইতিমধ্যে ইংরেজের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করল মধ্যএশিয়ায়। এর পরই যুদ্ধ নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করলো। ২২শে জুন ১৫০০ মাইল ব্যাপী জার্মাণীর আক্রমণ আরম্ভ হল সোভিয়েটের বিরুদ্ধে। লেনিনগ্রাড, মস্কো, কিভ ও ওডেসা এই চারিটী অঞ্চলে জার্মাণীকে রুশিয়া প্রাণপন বাধা দিচ্ছে। আজপর্যন্ত সেই অভিযান অনির্দ্দেশ্য পথের দিকে চলেছে। সুদূর প্রাচ্যেও যুদ্ধের হাওয়া উঠেছে। থাইল্যাণ্ডকে বেচারা ইন্দোচীনের এক টুক্‌রো অংশ নির্বিবাদে দখল করতে দিয়ে জাপান শেষে নিজেই ইন্দোচীনকে গ্রাস করবার আয়োজন করেছে। এদিকে নূতন ঐক্য গড়ে উঠেছে সোভিয়েট-ইঙ্গ-আমেরিকার। চার্চিল এবং রুজভেল্ট জাহাজী মোলাকাত ও পরামর্শ করে মিলিত ঘোষণায় পৃথিবীকে আশ্বাস দিয়েছেন, যুদ্ধশেষে সর্বমানবের মুক্তি ও সর্বব্যাপী শান্তি স্থাপন করা হবে, পৃথিবীর সর্বত্র। তারপরে গত ২৫শে আগষ্ট ইঙ্গ-ব্রিটিশ মিলিত শক্তির দুদিক থেকে ইরাণ আক্রমণ করে বিনা বাধায় দখল পাওয়ায় ব্রিটিশ প্রাধান্য মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপদ হয়েছে। রুশ-জার্মাণ যুদ্ধই পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে নিরূপণ করবে এবং এই যুদ্ধের দিকেই সবাই তাকিয়ে আছে। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে রূপান্তরিত হবে কে জানে?

চার্চিল-রুজভেল্ট ঘোষণা—'পৃথিবীর মুক্তিপত্র!'

মিঃ রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিল স্ব স্ব স্থান থেকে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তারপরে রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়েছে এবং লর্ড প্রিভিসীল মিঃ অ্যাটলী গত ১৪ই আগষ্ট রেডিওতে জানিয়েছেন যে রুজভেল্ট ও চার্চিল সমুদ্রের বুকে গোপনে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করেছেন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা এবং যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে। একবার সাক্ষাৎ হয়েছে ব্রিটিশ রণপোত "প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্"-এ; দ্বিতীয় বৈঠক হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের "অগাষ্টা" নামক ক্রুইজারের ওপরে। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন দু'পক্ষের সরকারী মহারথীরা, যথা, ব্রিটিশ জেনারেল ষ্টাফ নায়ক জেনারেল জন্ ডিল, যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টাফ-নায়ক জেনারেল মার্শাল, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-নায়ক অ্যাড্‌মিরাল হ্যারল্ড ষ্টার্ক,

ইজারা-ঋণ-নিয়ন্ত্রক মিঃ হ্যারিমান ইত্যাদি। এই সাক্ষাৎকার নিয়ে একটা হট্টগোল পড়ে গেছে, কারণ এর ফলে চার্চিল-রুজভেল্ট এক "৮-দফা ঘোষণা" পৃথিবীর সম্মুখে প্রচার করেছেন। ঘোষণার মর্ম হলো : (১) ইঙ্গ-আমেরিকার কোনো রাজ্যে লোভ নেই (২) স্থানীয় লোকের মত না নিয়ে কোথাও কোন পরিবর্তনই করা হবে না (৩) প্রত্যেক জাতির রাষ্ট্রগঠনের আত্মকর্তৃত্বকে অব্যাহত রাখা হবে এবং যাদের স্বাধীনতা হৃত হয়েছে তাদের স্বায়ত্বশাসন উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হবে (৪) বিজিত বা বিজয়ী, ছোট বা বড়, সকল রাষ্ট্রকে কাঁচা মাল ও বাণিজ্যের সমান অধিকার দেওয়া হবে, অবশ্য এখন যে সব চুক্তি ও বাধ্যবাধকতা আছে তাদের মর্যাদা হানি না করে। (৫) শ্রমিক জীবনের উন্নতি, আর্থিক প্রগতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করা হবে (৬) নাজী জুলুমের বিনাশের পরে অভাব ও ভয়ের তাড়না থেকে সর্বমানবকে মুক্তি দিয়ে এমন বিশ্বশান্তি স্থাপিত হবে যাতে প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব দেশে নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারবে। (৭) এই বিশ্বশান্তিতে প্রত্যেক মানুষের সমুদ্র পারাপার করবার অবাধ অধিকার থাক্‌বে (৮) পশুশক্তিকে বর্জন করতে হবে সব জাতিকে এবং যারা অপরের ওপরে হামলা করবে তাদেরই নিরস্ত্র করতে হবে।

এই ঘোষণায় কোথাও কোথাও আনন্দ কোলাহল উঠেছে, কারণ মাটীর পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নেমে আসবে যুদ্ধ শেষ হতেই। মানুষ যুগান্ত থেকে যে স্বপ্ন দেখেছে এতদিন পরে এই স্বার্থবিধ্বস্ত মানবসমাজে সেই স্বপ্ন সত্য হতে চলল। কিন্তু আমরা আশ্বস্ত হতে পারছি না। কাঁটা যে কোথায় বিঁধে আমরা ভারতবাসীরা তা' ভালো করেই জানি। মিষ্টি মিষ্টি কথা, ভালো ভালো প্রতিশ্রুতি বিপদের সময়ে সবাই শুনিয়ে থাকে। শিশুরা এসব শুনে ভোলে, অন্যে নয়। আমরা কেবল ভাব্‌ছি ১৯১৪ সনের কথা। কানে আজো বাজ্‌ছে প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের সেই ঘোষণা : "We desire no conquest, no dominion. We seek no indemnities for ourselves, no material compensation for the sacrifices we shall freely make. We are but one of the champions of the rights of mankind,....we shall fight for....democracy,....for the rights and liberties of small nations, for a universal dominion of right by such a concert of free peoples as shall bring peace and safety to all nations and make the world itself at last free." হায় ডিমোক্রেসী! হায় বিশ্বশান্তি! চৌদ্দ-দফা উইল্‌সনী শান্তি মিথ্যার অন্ধকারে লুপ্ত হয়েছে। আবার ১৯৪১ সনে সাম্রাজ্যবাদী বীণায় বাজছে আট-দফা শান্তির রাগিণী। টীকা নিষ্প্রয়োজন, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট-সামরিক-কমিটীর চেয়ারমেন ডিমোক্র্যাট রেনোল্‌ড্‌ সাহেবই টীপ্পনি করেছেন, তা' হলে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করেই এই বিশ্বশান্তির উদ্বোধন হোক্‌ না কেন? প্রশ্ন শুনে ইতিহাস বিধাতা হয়ত নেপথ্যে হাস্‌ছেন। কিন্তু আমরা নীরব থাকাই সঙ্গত মনে করছি।

লড়াইর অবস্থা অনিশ্চিত

মহাযুদ্ধের আসল নাট্য অভিনীত হচ্চে রুশ-জার্মাণ সীমানায়। গত একমাসকালের মধ্যে সেখানে কোন গুরুতর পরিণতি কিছু হয়নি। লেনিনগ্রাড্ সহরে এবং ওডেসার কাছে যুদ্ধ তীব্র হয়ে উঠেছে। লেনিনগ্রাড্‌কে চারদিকে জার্মাণ ফৌজ ঘিরেছে এবং রেলওয়ে লাইন কেটে মস্কো থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে বলে জার্মাণী দাবী করছে। ৮ই সেপ্টেম্বর জার্মাণী শ্লুসেলবুর্গ দখল করেছে বলে প্রচার করেছে, শ্লুসেলবুর্গ হল লেনিনগ্রাডের ২৫ মাইল পূবে এবং এতে চারিদিকে চক্রব্যূহ সম্পূর্ণ হলো। কিন্তু রুশিয়া বলছে এ সব অলীক; মোটেই লেনিনগ্রাডকে ঘিরে চক্ররচনা হয়নি। মস্কো লাইন ছাড়াও দক্ষিণে রাইবিন্স লাইন, পূবে ভোলোগ্‌দা লাইন, এবং উত্তরদিকে মুরমন্সক্ রেলওয়ে লাইন, এই তিনটে লাইন রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বা পূবে জর্মাণ সৈন্যের চিহ্নও নেই। যদি উত্তর থেকে ম্যানারহাইমের ফিন্ সৈন্যদল এসে পূবে ও দক্ষিণে জার্মাণদের সঙ্গে মিলতে পারে তাহলে উত্তর রুশিয়ার সঙ্গে মস্কোর যোগ ছিন্ন হবে। ফিন সৈন্য স্বীর নদীতে পৌঁচেছে খবর এসেছে কিন্তু ঠিক কোথায় তা' জানা যায়নি। এতে লেনিনগ্রাডের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। হয়তো এখন রুশ সৈন্য পিছে হঠে এসে মুরমন্সক্ রেলওয়ে লাইন ও ষ্টেলিন খালকে পাহারা দিচ্ছে। জার্মাণ ও ফিন সৈন্য এখন ২৫০ মাইল পরস্পর থেকে দূরে আছে; যদি এদের মিলনকে রুশসৈন্য না আটকাতে পারে তা' হলে বিষম অবরোধে লেনিনগ্রাড আবদ্ধ হয়ে পড়বে। তবে লেনিনগ্রাডের ত্রিশলক্ষ লোকও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সহর রক্ষার জন্য প্রস্তুত আছে; তা ছাড়া দক্ষিণপশ্চিমে তিন তিনটে দুর্গ-বেষ্টনী দাঁড়িয়ে আছে; আর এছাড়া সহরের প্রান্তে অগণিত খালবিলেরও বেষ্টনী আছে। পূবে ৪০০ গজ চওড়া নেভানদী রয়েছে। ওদিকে দক্ষিণে ওডেসার ও প্রায় সেই অবস্থা। সহরের ৭টী বিমানঘাটী আছে, কিন্তু এরা কেবল বিমান সরবরাহ করতে পারে, সামরিক পীঠভূমি (base) হতে পারে না। নীপার নদী এখনো জার্মাণ সৈন্য পার হতে পারেনি। রাশিয়াকে প্রায় একাই লড়তে হচ্চে। তবে কিছু কিছু ব্রিটীশ বিমান লেনিনগ্রাডে রুশকে সাহায্য করছে। কিন্তু গত ৩০ শে আগষ্ট কভেন্ট্রিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ ইডেন জানিয়েছেন, আমেরিকার সাহায্য ধরেও মিত্রশক্তির সমবেত যুদ্ধসম্ভার প্রয়োজনের থেকে অনেক কম। তবে জার্মাণীরও রুশযুদ্ধে ক্ষতির আকার বিপুল হয়েছে। কাজেই ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে বলা শক্ত, এখনো সবই অনিশ্চিত।

ইরাণে ইঙ্গ-রুশ আক্রমণ

গত ২৫শে আগষ্ট ভোরে ব্রিটিশ ও রুশীয় সৈন্য ইরাণ আক্রমণ করেছে; রুশ সৈন্য প্রবেশ করেছে উত্তরে ককেসাস থেকে আর্দেবিল, তাব্রিজ হয়ে। ব্রিটিশ সৈন্য এসেছে আবাদান, বন্দরশাহ, খানাকিন হয়ে। খানাকিন থেকে তৈলকেন্দ্র নফ্‌তিশাহ ও কসর-ই-শিরিন্‌ও বিনা

বাধায় দখল করা হয়। রেজা শাহ বাধা দেবেন না স্থির করেছেন ; তার এই বিনম্র আত্মসমর্পণে দুটা সুবিধা ইঙ্গ-রুশ শক্তির হলো ; প্রথমতঃ জার্মাণীর পূব অভিযান বন্ধ হল, ভারত থেকে ১০০০ মাইল দূরে জার্মাণ সৈন্য রইল। দ্বিতীয়তঃ বস্‌রার বন্দর দিয়ে রুশিয়াকে সত্বর সাহায্য পাঠান সম্ভব হবে। তৃতীয়তঃ তৈল সরবরাহের বন্দোবস্তও অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ইরাণের প্রচুর ; এখান থেকেই তৈল সরবরাহের স্নায়ুকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত হয়, তৈল হল যুদ্ধের প্রাণ। কিছুদিন থেকে ইরাণ সম্বন্ধে ইঙ্গ-রুশ শক্তি চিন্তিত হয়ে উঠেছিল, কারণ দুহাজারেরও ওপরে জার্মাণ ন না ছলে ইরাণে বসবাস করছিল এবং জার্মাণীর গুপ্তচর হয়ে এখানে প্রভাব বিস্তার করছিল। কিছুদিন আগে ইঙ্গ-রুশ চরমপত্র দেয়া হয় জার্মাণদের ইঙ্গ-রুশের হাতে সমর্পণ করবার দাবি করে। তারপরেই আক্রমণ। স্যার আচিবল্ড ওয়াভেল ভারত থেকে ইরাণ অভিযান চালনা করেছেন এবং ভারতীয় সৈন্যেরাই এই চেষ্টার প্রধান সহায়। জার্মাণী নির্লিপ্ত ও উদাসীন হয়ে এই অভিযানকে সফল হতে দিয়েছে। এদিকে ইরাণে শান্তিনীতিকে অব্যাহত রাখবার জন্য নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে আলী ফারুক্কীর নেতৃত্বে। দীর্ঘদিন আলোচনার পর ইরাণ সরকার গত ৯ই সেপ্টেম্বর সমস্ত ইঙ্গ-রুশ দাবি মেনে নিয়েছে বলে প্রধান মন্ত্রী ফারুক্কী পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছেন। ৮ই তারিখে ইরাণী জবাব বিজয়ী শক্তির কাছে দেওয়া হয়েছে। এই দাবি অনুসারে (১) ইরাণে জার্মাণ, ইতালীয় ইত্যাদি শত্রুপক্ষীয় লিগেশান বন্ধ করে দেওয়া হবে। (২) সমস্ত জার্মাণকে বন্দী করে ইঙ্গ-রুশের হাতে সমর্পণ করা হবে। (৩) ইরাণ সৈন্যকে অস্ত্র রাখতে দেওয়া হলেও একটা বিশেষ অংশে ইরাণী সৈন্য থাকতে দেওয়া হবে না। ইরাণের স্বাধীনতা অপহৃত হল, ইংরেজ ও রুশীয় প্রভাব সুদৃঢ় হয়ে বসল। যেমন ১৯০৯ সনে ইরাণকে দুভাগ করে ইংরেজ ও রুশ নিয়েছিলেন ইঙ্গ-রুশ চুক্তি অনুসারে। ইতিহাসের পুনরাবর্তন হচ্ছে সন্দেহ নেই।

মাঞ্চুকুয়ো-মঙ্গোলিয়া সীমান্তে রুশ-জাপান

জাপানের সঙ্গে রুশিয়ার স্বার্থের হিসাবনিকাশ একদিন করতেই হবে। এই দুই শক্তির রাজ্যের পরিধি ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে হয়ে শেষে একই সীমানায় এসে স্থগিত হয়ে রয়েছে। জারের আমল থেকেই রুশের অভিযান এশিয়ার উত্তরাংশকে গ্রাস করেছে ; সমুদ্রের তীরে বন্দর ভ্লাডিভোষ্টক রুশ অধিকারের বৈজয়ন্তী বুকে ধারণ করছে বহুদিন। আর মঙ্গোলিয়ার ওপরেও রুশের বজ্র-আটন কোনদিন শিথিল হয়নি। সোভিয়েট রাষ্ট্রও রোমানফ বংশের সাম্রাজ্যবাদী উত্তরাধিকারকে বর্জন করেননি। তারা মঙ্গোলিয়াতে রুশীয় শাসনকে দৃঢ়তর করেছেন ; ভ্লাডিভোষ্টকে বিমান ঘাটী করে জাপানকে শঙ্কিত করে রেখেছেন। জাপানও চুপ করে নেই। পশ্চিম দিকে তার অভিযান ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে। তার ছোট রাজ্যকে বাঁচাতে হলে সীমান্ত রাখতে হবে নিরাপদে বহু

দূরে। তাই মাঞ্চুকুয়োকে দখল করে জাপান আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করেছে। মঙ্গোলিয়া হল সমাজতন্ত্রী রুশের আশ্রিত; মাঞ্চুকুয়ো সাম্রাজ্যবাদী জাপানের তাবেদার। মাঞ্চুকুয়ো-মঙ্গোলিয়া সীমানা নিয়ে অহরহ উৎপাত লেগেই আছে। দুই পক্ষই দিন-রাত সঙ্গীন উঁচিয়েই আছে। কিন্তু এদের কলহটা ঠিক সত্যিকারের নয়। এদের কলহের পিছনে আসল সংঘর্ষটা হল রুশ-জাপানের; বহুদিন ধরে এই ঝগড়া চলেছে। মাঝে মাঝে এক দল অপরের রাজ্যে ঢুকে কিছু জোর-জুলুম করে আসে; কিছু গোলাগুলি চলে, আবার যার যার হিস্‌সায় এসে প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ রুশ-জাপানের সম্পর্কটা কিছু মোলায়েম করে আনবার চেষ্টা দুপক্ষই করছেন। কারণ দুপক্ষেরই অন্যদিকে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। জাপানের চীনা হাঙ্গামা আর আমেরিকা-ফ্যাসাদ আছেই, আর রুশেরও জার্মাণ-বিপদ মারাত্মক হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ ভ্লাডিভোষ্টক দিয়ে, প্রশান্ত সমুদ্র দিয়ে রুশকে অস্ত্রশস্ত্র আনাতে হবে। আমেরিকার সাহায্য ওপথেই আন্‌তে হবে। কিন্তু জাপান কালান্তক যমের মত পথ আগ্‌লে আছে। ভ্লাডিভোষ্টক দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী জাপান কিছুতেই করতে দেবে না। ২১শে সেপ্টেম্বরের "কোকুমিন সিম্বুন" তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছে, এখান দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিলে য়ুরোপের যুদ্ধ সুদূর প্রাচ্যেও শুরু হবেই। জাপানের সুর এতে স্পষ্ট। কাজেই সীমান্তে রুশ-জাপান সম্পর্ককে যথাসম্ভব নিরাপদ রাখা দুইয়েরই একান্ত স্বার্থ।

আর কিছুদিন আগে "মাঞ্চুকুয়ো-মঙ্গোলিয়া সীমান্ত কমিশন" নামে এক মীমাংসা কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। এতে রুশ-জাপান দুই দলেরই প্রতিনিধি আছেন; এর নায়ক হলেন বৈদেশিক বিভাগের "রাজনৈতিক পরিচালনা বুরোর" নেতা নোবুসদা শিমৌরা। এই জয়েণ্ট কমিশন সীমানা নির্ধারণের কাজ একুশে আগষ্ট শেষ করে ফিরেছেন। এরা নিজ নিজ রাজধানীতে এসে ঘোষণা করেছেন যে দুপক্ষের প্রতিনিধিরা আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে হারবিন্‌ নামক স্থানে বৈঠক করবেন এবং সেই দিনই সীমান্তচুক্তিতে চূড়ান্ত ভাবে স্বাক্ষর করবেন। এতে বাহ্যত মনে হয় সাময়িক শান্তি স্থাপিত হলো। কিন্তু অনেকে মনে করছেন, জাপান জার্মাণীর ত্রিশক্তি-চুক্তির মিত্র, কাজেই রুশিয়াকে পূর্বদিক থেকে আক্রমণ করে সে মিত্রকে সহায়তা করবেই। এতে কেবল বন্ধুত্বই আছে তা' নয়; এতে আছে বহু দিনের ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বের মীমাংসার সুযোগ, রুশ-বিপদকে এই সুযোগে জাপান তাড়াবে পূর্ব এশিয়া থেকে। আসল কথা হলো, জমি আর সীমানার কাড়াকাড়ি এতো সহজে সন্ধি-আলোচনার দ্বারা মীমাংসা হয় না। তরবারি শেষ পর্যন্ত আস্‌বেই। কাজেই উভয় পক্ষের সাময়িক স্বার্থের ঠেলায় এখন দোস্তালি হলেও ভবিষ্যতে কী হবে তার ঠিক কি? ইতিমধ্যে ২২শে সেপ্টেম্বরের বৈঠকে কী হয় দেখা যাক্।

১০-৯-৪১

সম্পাদকীয়

ভারত-বর্মা-চুক্তি

কিছুদিন হ'ল ভারত-বর্মা-চুক্তি পাকাপাকি করা হয়েছে, এই খবরটা অকস্মাৎ ভারত সরকার জানিয়েছেন। চুক্তির উদ্দেশ্য হলো ভারতীয়দের বর্মায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত ও সংকুচিত করা। চুক্তির ইতিহাস অতি দুর্জ্ঞেয় রহস্যে আবৃত। চুক্তিটি ব্যাক্সটার (Baxter) রিপোর্টকে ভিত্তি করেই তৈরী হয়েছে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যাক্সটার সাহেব তদন্ত করে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, তার সম্বন্ধে একটা অকারণ গোপনতা অবলম্বন করা হয়েছে। ১৯৪০ সনের অক্টোবর মাসে সেই রিপোর্ট বর্মা সরকারের হাতে ছিলো, কিন্তু ভারতসরকার কবে রিপোর্ট পেয়েছেন তা না জানলেও একথা বলা চলে যে দেশের লোক সে রিপোর্ট চোখে দেখেনি বহুদিন। এমন কি বর্মায় যে ভারতীয়দের কমিটী গঠিত হয়েছিল তাদেরও রিপোর্ট দেওয়া হয়নি, যদিও ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা সে কমিটীর মতামতও জানতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া ভারতীয় কমিটীকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জমিবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য (যিনি ভারত গভর্মেণ্টের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন) বলেছেন যে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বর্মীদের খুসী করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার অনেকদূর যাবেন। বর্মীদের চটানো এখন অসম্ভব। কাজেই চুক্তির স্বরূপ যে কী হবে এতেই বোঝা যাচ্ছে। তাছাড়া ভারতীয় কমিটীকে এঁরা বরাবর বলেছেন যে বর্মা সরকারের সঙ্গে বর্তমান কথাবার্তা প্রাথমিক এবং শুধু মীমাংসার পথ অনুসন্ধান বই আর কিছুই নয়। কিন্তু কথাবার্তার পরে রিপোর্ট দেখিয়ে তাদের বলা হয় চুক্তি একেবারে চূড়ান্ত এবং আর রদ্‌বদল চলবেনা। এর ওপরে আবার এদিকে রটনা হয় যে বর্মার ভারতীয়গণ এ চুক্তিকে সমর্থন করেছে। অথচ এর চাইতে অমূলক কথা আর কী হতে পারে?

চুক্তির মর্ম অত্যন্ত ভেদমূলক এবং ভারতবাসীর পক্ষে চরম অপমানজনক। চুক্তি অনুসারে ভারতবাসীর বর্মায় খুশীমত প্রবেশ করবার অধিকার হরণ করা হয়েছে। ১লা অক্টোবর (১৯৪১) থেকে যারা বর্মায় যেতে চান তাদের দুই শ্রেণী-ভুক্ত করে দু'রকম পাস দেওয়া হবে। কাদের পাশ দেওয়া হবে, কতজনকে দেওয়া হবে, কাকে ও কতজনকে কোন্ শ্রেণীতে কেনা হবে, তা সবই বর্মা সরকারের ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করবে। তাছাড়া যে সব ভারতীয় আগে থেকেই বর্মায় আছেন তাদেরও তিনটী শ্রেণীতে ভাগ করা হবে। অর্থাৎ (১) যারা বর্মাতেই জাত, লালিত

ও বর্মারই স্থায়ী বাসিন্দা (২) যারা ১৫ই জুলাইর আগে সাত বছর ধরে বর্মায় বাস করছেন। (৩) যারা ১৫ই জুলাই তারিখে বর্মায় বাস করছিলেন। এই তিন শ্রেণীর এবং উপরোক্ত দুই শ্রেণীর ভারতীয়দের অধিকার ও মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের তো অসম্ভব ক্ষতি ও অসুবিধা হবেই, যারা বেড়াতে যাবেন তাদেরও লাঞ্ছনা ও বিরক্তি কম হবে না। এই চুক্তির আগে গত ফেব্রুয়ারী মাসেই ভারত-বর্মা বাণিজ্য-চুক্তি নিষ্পন্ন হয়ে গেছে। যদি এই বর্তমান চুক্তি এবং বাণিজ্য চুক্তি একত্র সম্পাদন করা হত তবে ভারতীয়দের পক্ষে এমন ক্ষতিজনক একটা চুক্তি হতেই পারত না। কারণ তা হলে বাণিজ্য ব্যাপারে ভারতীয়রা তখন চাপ দিতে পারতেন এবং বর্মা সরকারও ভারতীয় বাণিজ্যে ক্ষতি স্বীকার করতে সাহস করতেন না। কিন্তু তা হয়নি। বরং তখন ভারতসরকারের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সদস্য বেসরকারী পরামর্শদাতাদের বলেছিলেন যে বাণিজ্যে ভারত বর্মাকে সুবিধা করে দিলে পরে বর্মাও খুশী হয়ে ভারতীয়দের বর্মাপ্রবেশ ব্যাপারে উদারতা দেখাবে। এই আশ্বাসের ফলেই বে-সরকারী পরামর্শদাতারা ভারতের বাণিজ্য স্বার্থের ক্ষতি স্বীকার করে বাণিজ্য চুক্তিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু উদারতার ফল এখন হাতে হাতে পাওয়া গেলো।

এই চুক্তির প্রতিবাদে ভারতবর্ষের জনমত প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমস্ত প্রতিষ্ঠান এর সংশোধন দাবী করেছে। গান্ধীজীও গত ২৮শে অগাষ্টের বিবৃতিতে এই চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে এই চুক্তি ভারতবর্ষ ও বর্মার পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক এবং বর্মাবাসীর কাছে ভারতবাসী বিদেশী হতেই পারে না। "Indians in Burma and Burmans in India can never be foreigners in the same sense as people of the west. This agreement must be undone because it breaks every cannon of international propriety." আমাদের মতে এই ভেদনীতি হলো সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিছুদিন যাবৎ সিলোনভারত বিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। এখন বর্মা-ভারত বিভেদের সূচনা হলো। বর্মার প্রধান মন্ত্রী মিঃ উ-স (U Saw) ব্রিটিশ স্বার্থের হাতে ক্রীড়নক হয়ে বর্মার ও ভারতের অকল্যাণকর এই চুক্তির সৃষ্টি করেছেন; বর্মা ও ভারতের জনসাধারণ এই বিভেদ চায় না। ভারতে ও বর্মায় এই চুক্তির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে এসেছে। এই বিলটীর বিরুদ্ধে সমস্ত বাংলাদেশে যে পরিমাণ আন্দোলন ও উত্তেজনা হয়েছে আর কোন বিল নিয়ে ইদানীন্তন এমন হয়নি। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই বিলের বিস্তৃত সংশোধন দাবী করা হয়েছে;

বহুদিন যাবৎ কোয়ালীশন-সরকারী পক্ষের সঙ্গে একটা আপোষের চেষ্টা ও আলোচনাও চলেছে। কিছুদিন আগে একটি বিশেষ কমিটীর (special committee) ওপরে এ বিল সম্বন্ধে বিবেচনা করে একটী সর্ব-স্বীকৃত সিদ্ধান্তে আসবার ভার দেওয়া হয়েছিল। গত পনর দিন ধরে 'বিশেষ কমিটী' বহু বাদবিতর্কের পরে বিলের অনেকগুলি বিষয় সম্বন্ধেই নাকি একমত হতে পেরেছিলেন; কিন্তু শিক্ষাবোর্ডের গঠন এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিদের সংখ্যা সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে পরিষদের অধিবেশনে রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিলটীকে সিলেক্ট কমিটীতে দেবার জন্য একটী মোশান আনেন কিন্তু তাঁর প্রস্তাব ৫৬-১২৪ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়, অবশ্য, তিনদিন পুরো বিতর্কের পরে। সেদিন কৃষকপ্রজা দল সরকার পক্ষকে সমর্থন করেছিলেন এবং কোয়ালিশানী ব্যতীত অন্যান্য সব হিন্দুই মোশানটীকে সমর্থন করেছিলেন। কাজেই বাহ্যতঃ প্রায় সাম্প্রদায়িকভাবেই ভোটাভোটি হয়েছিল। ইউরোপীয়দের চিরন্তন প্রথা অনুসারে তারা সরকার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। তারপরে গত ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে বিলটীর প্রতি দফা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। ঐ দিন বিরোধী পক্ষের সংশোধন প্রস্তাব নিয়ে তুমুল বিতর্ক হওয়ায় শ্রীযুক্ত শরৎ বসু মহাশয় সেদিনের জন্য ভোটাভোটী স্থগিত রেখে আপোষের শেষ চেষ্টা দেখবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী বলেন, তার ব্যক্তিগত মত বা ইচ্ছা যাই হউক না কেন, কোয়ালীশান দলের আদেশের বাইরে তিনি যেতে পারবেন না, তাঁর হাত পা বাঁধা। অতঃপর স্কুলের অনুমোদন সংক্রান্ত সংশোধনটী ৫০-৯২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

শিক্ষাবিলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারুরই কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল সংখ্যার জোরে পাশ হলেই কি যে কোন আইন চলতে পারে? পারে না, কারণ কল্যাণ করবার শক্তি না থাক্‌লে কোন বিলই দীর্ঘদিন ধরে জনসাধারণের সমর্থন পেতে পারে না। আর জনসাধারণের সমর্থন ব্যতীত আইনের কোন ভিত্তিই থাকে না। শিক্ষাবিল সম্বন্ধে হিন্দু বা মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোভাব যাই হোক না কেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে বিলটী ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল বলে সবাই স্বীকার করবেন। প্রথমতঃ বাংলার বর্তমান মন্ত্রীসভা সকল রকমে প্রতিক্রিয়াশীল, তাঁদের জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপ বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। বাংলার দেড়হাজার হাই স্কুলকে ব্রিটিশের ইঙ্গিতে পরিচালিত এই বাংলাসরকারের হাতে তুলে দিতে কোন যুক্তিশীল ভারতবাসীই চাইবেন না। রাষ্ট্র-পরিচালিত শিক্ষা দেশের কল্যাণে আসে তখনই, যখন রাষ্ট্র হয় উচ্চ আদর্শে কোন প্রগতিশীল দলের দ্বারা পরিচালিত। বিশ্বজগতের বৈজ্ঞানিক প্রগতির যারা কোনই ধার ধারেন না, যারা মধ্যযুগীয় সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে

জীবনকে এই বিংশ শতকেও যাচাই করেন, তাঁদের হাতে কোটী কোটী অজ্ঞ জনতার ভবিষ্যৎ গঠনের দায়িত্ব কে দেবে? যে মন্ত্রীসভা বাংলার সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংগ্রামকে গলাটিপে মেরেছেন, অগণিত কর্মীকে জেলে দিয়ে নাগরিক স্বাধীনতার অবসান ঘটিয়াছেন, শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে তাঁদের কর্তৃত্ব বাঙালী জাতির পক্ষে মারাত্মক হবে। দেশ স্বাধীন হলে, দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে আমরা শিক্ষাকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে দিতে আপত্তি করবো না। কিন্তু আজিকার শোচনীয় পরিস্থিতিতে সরকারী কর্তৃত্বের আমরা বিরোধী। বিরোধী দল যে সংশোধন দাবী করেছেন তাতে কোয়ালীশানী মন্ত্রীসভার আপত্তি করবারই বা কি আছে? শিক্ষাবোর্ডকে স্বাতন্ত্র্য দানকরা, শিক্ষায় কর্তৃত্ব বোর্ডকেই দান করা, বোর্ডকে পাকা আইন করে আর্থিক বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য দানকরা, সিলেবাস ও পরীক্ষার ব্যাপারে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধটি স্পষ্ট নির্ধারণ করে দেওয়া—ইত্যাদি দাবির মধ্যে আপত্তিকর কীইবা থাকতে পারে? আসল কথা, মন্ত্রীসভা জাতির কল্যাণ চান না, চান এক বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি; কাজেই শিক্ষাবিল নিয়ে এত তীব্র জেদ ও গোঁড়ামী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলার এই অবস্থা বেশী দিন থাকবে না। সমস্ত সম্প্রদায়ের যুক্তিশীল অংশ এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। ভোটের জোরে পাশ করলেও, এ বিল সচল হবে না। বাংলার মন্ত্রীসভা কি সময় থাকতে সচেতন হবেন না?

চার্চিলের অপূর্ব ডিমোক্রেসী

চার্চিল-রুজভেল্ট ঘোষণাটি পৃথিবীব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেছে, কারণ এর স্বপক্ষে প্রচার কম হয়নি। ঘোষণাটীকে বিলেতের ইডেন সাহেব সেদিন বলেছেন "মুক্তমানবের মুক্তিপত্র," "charter of free nations," কারণ বিশ্বশান্তি ও পৃথিবীজোড়া ডিমোক্রেসীর প্রতিশ্রুতি এরা দিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চার্চিল এই মুক্তিপত্রের ব্যাখ্যা করে আমাদের অতিরিক্ত আশান্বিত হতে মানা করেছেন। মানা না করেই বা করেন কি? চারদিক থেকে রব উঠেছে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দাও। অথচ লোকগুলোর বিবেচনা নেই; স্বাধীনতা কি এক সহজেই দেওয়া যায়? না, দেওয়া সঙ্গত? বিশ্বশান্তি, নিপীড়িতদের স্বাধীনতা হলো এক জিনিষ! ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক হলো অন্য ব্যাপার। কারণ দীর্ঘ আত্মীয়তার দরুণ ভারত সম্বন্ধে ইংলণ্ডের একটা বিশেষ বাধ্যবাধকতা জন্মে গেছে, এখন চট্ করে সে দায়িত্বকে ছাড়লে অকৃতজ্ঞতা হয় না? কাজেই বিশ্বশান্তি ঘোষণা হলো একটা ব্যাপক, সাধারণ ঘোষণা, বিশেষ বিশেষ দেশ বা ব্যাপারের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি এসব সাধারণ ঘোষণার দ্বারা হয় না। ভারতবর্ষ হলো সেই রকমের বিশিষ্ট একটা ব্যাপার। চার্চিলের ভাষায়, "ভারতে, বর্মায় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যত্র নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে সব পলিসির বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, চার্চিল-রুজভেল্টের সম্মিলিত ঘোষণায় তাদের কোন পরিবর্তন

হতে পারে না। ভারতের নানা জাতি, ধর্ম এবং স্বার্থের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। এই সব দায়িত্ব জাত হয়েছে ভারতের সুদীর্ঘ সম্পর্ক থেকে। বৃটিশ কমনওয়েল্‌থের সমান সদস্য হোতে সাহায্য করা সম্বন্ধে ১৯৪০ সনের আগষ্ট মাসের আমাদের যে প্রতিশ্রুতি তাকে পালন করতে পারবো আমরা এই শর্তে যে, বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি দায়িত্বকেও আমরা অবহেলা করতে পারবো না।...আমরা কেবল প্রধানতঃ য়ূরোপের নাজী-পদানত রাষ্ট্র ও জাতিগুলোর কথা মনে করেই ওসব স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদির কথা বলেছিলাম। ইত্যাদি...”

এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। চার্চিল সাহেবের মতে ভারতে যা কিছু হচ্চে সবই ন্যায় ও স্বাধীনতার নীতিসঙ্গত। কাজেই যাঁরা উচ্ছ্বসিত, আশান্বিত হয়েছেন তাঁরা অবহিত হৌন। বড় বড় অস্পষ্ট কথার মধ্য দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, আর চার্চিলের মধ্য দিয়ে কথা বল্‌ছে রোদে-পোড়া, কঠিন-প্রাণ গোঁড়া ইংরেজ, ষ্টীল-ফ্রেমের হৃদয়হীন নেতা। গত যুদ্ধের বড় বড় বাণী যেমন লোক ভুলাবার মন্ত্র বই কিছু নয়; এবারও যে উদার বাণীর ছড়াছড়ি আরম্ভ হয়েছে তার অর্থ যে কি, চার্চিলের টীপ্পনীতেই তা' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের পিছনে আসল মতলবই বা কি, তাও ধরা পড়বে এই স্বীকারোক্তি থেকে। য়ূরোপে ডিমোক্রেসী ও স্বাধীনতার কোলাহলে ভারতবর্ষ বা এশিয়ার কিছু এসে যায় না। ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরে।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষণ

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর প্রায় এক মাস হয়ে গেছে, শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস শান্ত হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে ভারতে ও ভারতের বাইরে সার্বজনীন দাবি উঠেছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে স্থায়ী রূপ দিয়ে। যদি বর্তমান যুগের কোনো মানব আমাদের স্মরণে শাশ্বত হয়ে বেঁচে থাকতে পারেন, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি তুচ্ছ কাজে, প্রতি ক্ষুদ্র কল্পনায় ও চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকবেন। কিন্তু তবু স্থূল রূপ দিতে চায় মানুষের মন। এসম্বন্ধে প্রথমেই মনে আসে বিশ্বভারতীর কথা। যে প্রতিষ্ঠানকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কল্পনা দিয়ে, মননা দিয়ে, দেহের রক্ত দিয়ে লালন করে গেছেন, তাকে পোষণ করে বিকশিত করা তাঁর অনুরাগীদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। তাঁর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখলেই রবীন্দ্রনাথ বাঁচবেন সেই আদর্শের মধ্যে। বিশ্বভারতী হলো সেই আদর্শের স্থূল রূপ। কাজেই বিশ্বভারতীর চিন্তাই হবে স্মৃতিরক্ষকদের প্রথম চিন্তা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ শুধু এক বিশ্বভারতীতেই শেষ হয়নি। কারণ তাঁর সৃষ্টির চাইতে তিনি অনেক মহৎ। তাঁর অনবদ্য সাহিত্য-ও তাঁর আদর্শেরই ধারক, এবং বিশ্বমানবের মধ্যে সে আদর্শ প্রচার করবার যন্ত্র। তাই তাঁর স্মৃতিরক্ষার দ্বিতীয় পথ হলো তাঁর সাহিত্যকে বিশ্বমানবের উপযোগী করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া। এ ছাড়া জাতির সংস্কৃতি-জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ বহুমুখী ছিলো। সেই সংস্কৃতি-জীবনের ক্ষেত্র রচনা করে তাঁর নামে উৎসর্গ করলেও তাঁর

স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হয়। সার তেজ বাহাদুর সপ্রু অনুরোধ করেছেন রবীন্দ্রসাহিত্যকে ইংরিজী অনুবাদ করে একটী শোভন সংস্করণ প্রকাশ করতে এবং তার একখানা ভাল জীবনচরিত রচনা করতে। শ্রীযুক্ত শরৎ বসু প্রস্তাব করেছেন, মহাজাতিসদনকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র স্মৃতিসদন নাম দেবার, কারণ মহাজাতি সদন হবে ভারতীয় কৃষ্টিজীবনের উদার ক্ষেত্র আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর যোগও ছিলো নানা রকম। এই সব বিবিধ প্রস্তাবের সবগুলিই গ্রহণ-যোগ্য এবং একটীকে কাজে পরিণত করলে অন্যটী গ্রহণ করা চলবেনা এমন নয়। মহাজাতি সদনের নামকরণ নিয়ে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবু আপত্তি করেছেন এবং শরৎ বাবুও তার জবাব দিয়েছেন। অন্য কাগজেও এই নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছে। রবীন্দ্র স্মৃতি সকল বিতর্কের উর্দ্ধে, তা নিয়ে এই অশোভন বাদানুবাদ আমাদের মর্মপীড়া দিয়েছে। আমরা আশা করি, এ অপ্রিয় প্রসঙ্গটী অচিরেই শেষ হবে। আর সকল শ্রেণীর ও মতবাদের লোক নিয়ে একটী কমিটী করে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার যতোরকম ব্যবস্থা সম্ভব তার যথোচিত আলোচনা করে উপযুক্ত ভাবে বন্দোবস্ত করলে শোভন হবে। আর একটী কথা, সেদিন টাউন হলে যে রবীন্দ্রস্মৃতিসভা হয়েছে তার শোচনীয় অব্যবস্থা আমাদের পীড়া দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুরুচি ও শালীনতার প্রতিমূর্তি। তাঁর অভাব জাতীয় জীবনের এই সংকটকালে আমাদের দুর্বল করেছে। কাজেই তাঁর স্মৃতিসভায় যে হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে তাতে আমাদের জাতীয় চরিত্রে রুচি ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

বীর সাভারকারের তার

চার্চিল-রুজভেল্ট ঘোষণা বের হবার পরেই হিন্দুসভার সভাপতি বীর সাভারকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে কেব্‌ল্ পাঠিয়েছেন। তাতে দাবি করেছেন, রুজভেল্ট-চার্চিল ঘোষণার মুক্তিবাণী ভারতের বেলায়ও প্রয়োগ হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত শরৎ বসু এ বিষয়ে মিঃ সাভারকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে বিদেশীদের ঔদার্যের ওপরে নির্ভর করবার দিন গত হয়েছে, কারণ স্বাধীনতা কখনো কেউ কাউকে দান করেনা।' শ্রীযুক্ত সাভারকার এর জবাবে শরৎ বাবুকে জানিয়েছেন যে তাঁর প্রেরিত কেব্‌ল্ একটা রাজনৈতিক চালমাত্র ; তাতে দুটো সুফল হবে। প্রথমতঃ ইঙ্গ-আমেরিকার ভণ্ডামী প্রমাণিত হবে, দ্বিতীয়তঃ ভারতের ফরোয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি যে সব রাজনৈতিক দল রুশিয়াকে উদ্ধারকর্তা মনে করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তাদেরও চোখ খুলবে। আমরা বীর সাভারকারের এই বীরত্বব্যঞ্জক উচ্ছ্বাসে মোটেই বিস্মিত হইনি। কারণ রুজভেল্টের কাছে আবেদনটা যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলেই বলা হোক না কেন, আসল কথা হলো, তাঁর এখনো কিছু আস্থা রয়েছে বৈদেশিক ধুরন্ধরদের ওপরে। কারণ রুজভেল্ট সাহেবকে ভণ্ড প্রমাণ করে ভারতের স্বাধীনতা কতদূর এগোবে তা' বুদ্ধিমানরা সবাই বোঝেন। বীর সাভারকারও যে বোঝেন না, তা' নয়। বিশ্বরাজনীতির ধুরন্ধরেরা আজ পর্যন্ত

কতো আশ্বাস ও কতো প্রতিশ্রুতি যে মনোজ্ঞ ভাষায় ইতস্ততঃ ছড়িয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সে সব হাওয়ায় মিলে গেছে। কাজেই অপরের অসাধুতা উদ্‌ঘাটন না করে, স্বাবলম্বী হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করাই ভালো। বীর সাভারকার কি হিন্দুসভাকে সেই বন্ধুর পথে নিয়ে যাবেন ? না, কেবল রাজনৈতিক চাল দিয়ে বাজীমাত্ করবার কাজেই নিযুক্ত থাকবেন ?

মোসলেম লীগে গৃহবিবাদ

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই শহরে মোসলেম লীগের ওয়ারকিং কমিটীর (কার্যপরিষদ) অধিবেশন হয়ে গেল। বিষয়টী সামান্য হলেও শেষ পর্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড়লাট যে নতুন "দেশরক্ষা কাউন্সিল" নিয়োগ করেছেন তাতে মোসলেম লীগের মিঃ হক্, সার সিকান্দর হায়াৎ এবং সার সাদুল্লা এই তিনজন বিশিষ্ট সদস্যকে সভ্য বলে মনোনয়ন করেছেন। এদিকে মোসলেম লীগের সর্বেসর্বা নেতা হলেন জিন্না সাহেব। এ ব্যাপারে মোসলেম লীগ বা জিন্না সাহেব দুইয়ের কারুকেই বড়লাট আমল দেন নি। মোসলেম লীগের প্রস্তাব অনুযায়ী দেশরক্ষা কাউন্সিলে লীগসভ্যদের প্রবেশ বারণ। কাজেই বড়লাট বুদ্ধি করে লীগ্ ও জিন্না সাহেবকে উপেক্ষা করেই এদের তিনজনকে গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে জিন্না সাহেব সংবাদপত্রের মারফৎ ব্রজনির্ঘোষে আমাদের জানালেন, নিয়মভঙ্গের অপরাধে এদের তিনজনের ওপরে শাস্তিবিধান করা হবে। তিনি স্বয়ংই মাদ্রাজ প্রস্তাব অনুসারে তাঁর ডিক্টেটরী ক্ষমতার বলে শাস্তি দিতে পারতেন ; তবে তা না করে কার্যপরিষদকে দিয়েই উচিত ব্যবস্থা করাবেন। তাই বোম্বাই অধিবেশন হলো। প্রধান মন্ত্রী হিসেবে বাধ্য হয়ে সরকারী আদেশে এই পদ গ্রহণ করতে হয়েছে বলে আসামী পক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। কিন্তু এসব যুক্তি কাজে আসেনি, অপরাধ সাব্যস্ত হয়েছে, এবং দশদিনের মধ্যে "দেশরক্ষা কাউন্সিলের" সদস্যপদে ইস্তফা দেবার আদেশ হয়েছে। সার সিকান্দর এবং সাদুল্লা ইস্তফা দিতে রাজী হয়েছেন। মিঃ হকও ইস্তাফা দেবেন, তবে অন্যকারণে, লীগের আদেশে নয়। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জিন্নার উদ্ধত ব্যবহারের প্রতিবাদে মোসলীম লীগের ওয়ারকিং কমিটী ও কাউন্সিলের সভ্যপদও ত্যাগ করেছেন। মিঃ হক্ যুদ্ধে সাহায্য করাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। দেশরক্ষা কাউন্সিলে মিঃ জিন্নাকে অগ্রাহ্য করেও তিনি থাকতেন। তবে মোসলেম ঐক্যরক্ষা করবার জন্য এবং অপর দুজন না থাকলে একাকী দেশরক্ষার সুবিধা হবে না মনে করে তিনি বাধ্য হয়ে ইস্তফা দিচ্ছেন। হক সাহেব ও সার সিকান্দরের সঙ্গে জিন্নাসাহেবের কলহ বরাবরই রয়েছে। হক্ সাহেব ও সার সিকান্দর দুটো প্রধান মোসলেম প্রদেশের নেতা, মোসলেম শক্তির চাবি-কাঠিও তাঁদেরই হাতে, অথচ নেতৃত্ব করবার সময়ে জিন্না সাহেব করেন, এটা এদের কাছে সঙ্গত মনে হয় না। কাজেই এটা'ই হল বিবাদের গোড়ার কথা। অন্ততঃ হক্ সাহেবের পদত্যাগ-পত্র পড়লে তো তাই মনে হয়। তবে আমরা এই কলহের জন্য চিন্তিত নই মোটেই, কারণ এর ভিতর নীতির কোন বালাই নেই। আছে ব্যক্তিগত পদমর্যাদার প্রতিদ্বন্দ্ব। তাই প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের মতো এই কলহ বহ্বারম্ভ থেকে লঘুক্রিয়ায় এসে দাঁড়াবে, তাও আমরা জানি।

শ্রীযুক্তা নাইডুর সত্যভাষণ—কংগ্রেসে অসন্তোষ

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কয়েকটি সত্য কথা বলেছেন। গত ১লা সেপ্টেম্বর অ্যাডহক্ বিপিসিসিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন কার্যকরী হয়নি, লোকের উৎসাহও এতে নেই, "....there had been waning of enthusiasm." সত্যাগ্রহ এখন যে কেবল একটা নামেমাত্র ব্যাপারে পরিণত হয়েছে তা' আমরা বহুদিন থেকেই বলে আস্‌ছি। কারুর উৎসাহ নেই, কারণ কংগ্রেসীরা গান্ধীজীর নীতির বিফলতা বুঝতে পেরেছেন। বৃথা কাজে সময় ও শক্তিক্ষেপ করবার উৎসাহ কারুর থাকেও না। কংগ্রেসীদের মধ্যে বর্ত্তমানে যে অসন্তোষ জমে উঠেছে তাও তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে "There was a good deal of dissatis faction among the Congressmen who felt that there was nothing spectacular in the movement. It was a terrible sign of their failure...." কংগ্রেস ভারতের সব চাইতে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অথচ সেই বিপুল শক্তি আজ অব্যবহারে মরচে-ধরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গান্ধীজীর অসঙ্গত খেয়াল এবং গোড়ামীর জন্য এই শক্তি ব্যর্থ হতে চলেছে। এই নিঃশেষিত গান্ধীবাদীয় নীতির বাঁধন কাটিয়ে না উঠতে পারলে ভারতের রুদ্ধ জনশক্তি মুক্তি পাবে না। তাই অবিলম্বে নিখিল ভারত কংগ্রেসকমিটীর সভা ডেকে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ পূর্ব্বক কালোপযোগী প্রগ্রাম গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সরোজিনী দেবীর এই সত্যভাষণে কি কংগ্রেসীদের চেতনা হবে?

কৃপালিনী-সত্যমূর্তির গোঁড়ামী

ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রেসিডেন্ট শার্দূল সিংহ কবিশের মহাশয় এ-আই-সি-সি'র সম্পাদক আচার্য কৃপালিনীর কাছে পত্র দিয়েছিলেন অবিলম্বে এ-আই-সি-সি'র সভা ডাকবার জন্য। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাবে জানিয়েছেন কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তনের কোনই প্রয়োজন নেই, কারণ সবই ঠিক আছে। মিঃ সত্যমূর্তি জেল থেকে বেড়িয়েই কংগ্রেসের নীতি ও কৌশল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তায় উল্লেখ করেছেন। শার্দূল সিংহজী তাঁকেও অনুরোধ করেছিলেন, নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা আহ্বানে সহায়তা করবার জন্য। কিন্তু তৎপরতার সঙ্গে মিঃ সত্যমূর্তি জানিয়েছেন, তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস আছে গান্ধীজীর ও কংগ্রেসের বর্তমান নীতির ওপরে, তবে তিনি শুধু মন্ত্রীত্বগ্রহণটা চান, আর কিছু নয়। কিন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে হলে যে কংগ্রেসের বর্তমান নীতি বর্জন করতে হয়, সেটা হয়তো মিঃ সত্যমূর্তি খেয়াল করেন নি। মন্ত্রীত্ব নিলে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বও নিতে হবে, কিন্তু কংগ্রেস যুদ্ধবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছেন। একদিকে যুদ্ধায়োজন করা, অন্য দিকে যুদ্ধবিরোধিতা করা—এই দুটাই এক সঙ্গে চলবে নাকি? তা ছাড়া এই প্রসঙ্গে সর্বসাধারণ কংগ্রেস-সভ্যদের একটু তলিয়ে দেখ্‌তে ও বিচারপ্রবণ হতে অনুরোধ করছি।

বোম্বাইতে ছাত্রদলন

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রিরা উৎসবের প্রধান বক্তা সার মরিস্ গায়ারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। সার মরিস্ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে গতবৎসর দিল্লীর দু'জন ছাত্রকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে উপাধি থেকে বঞ্চিত করেন। বোম্বাইর বিক্ষোভ সার মরিসের কৃতকর্মের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাত্র। কিন্তু বুরোক্র্যাসীও ছাড়বার পাত্র নয়, কাজেই তার ফলে, লাঠিতাড়না ও গ্রেপ্তার ইত্যাদি হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা শান্তি অথবা নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটায়নি, এ খবরটা আমরা পেয়েছি নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে বিশজন ব্যবহারজীবীর প্রতিবাদপত্রে। রাজনীতির রং বদলে যাচ্ছে দ্রুত, তবুও প্রয়োগক্ষেত্রে আইনের যারা মালিক তাদের পরিবর্তন নেই। ডিমোক্রেসীর খোলস নিয়ে যেখানে কারবার সেখানে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আস্‌বে কোথা থেকে?

বাংলা সরকার কী করছেন?

আমরা শুনে আনন্দিত হয়েছি যে যুক্তপ্রদেশের নিরাপত্তা-বন্দীদের ভারতে প্রকাশিত সমস্ত সংবাদপত্র এখন থেকে পড়তে দেওয়া হবে। ইতিপূর্বে সরকারী পছন্দ মত ক'খানা নরমপন্থী কাগজ ব্যতীত কোন জাতীয়তাবাদী কাগজ এদের দেওয়া হত না। এখন সে নিষেধ উঠিয়ে নেওয়ায় আমরা যুক্তপ্রদেশ সরকারকে তাদের এই সুমতির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এদের জন্য গরমের দিনে বাইরের প্রাঙ্গণে ঘুমাবার অধিকারও দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু বাংলাসরকার করছেন কী? এখানে হিজ্‌লীতে ও অন্যান্য জেলে যে সব বন্দী আছে তাদের কি কি কাগজ দেওয়া হয়? গরমের সময়ে মাথা কুটলেও বাইরে ঘুমাবার অনুমতি এখানে মেলেনি এবার। সেই সন্ধ্যায় তালাবন্ধ এবং তারপরে বহুজন-অধ্যুসিত কক্ষে ঠাসাঠাসি করে গরমে বিনিদ্র রজনী যাপন; বাংলা গভর্ণমেণ্টকে আমরা যুক্তপ্রদেশ সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে অনুরোধ করছি। সার নাজিমুদ্দিন কি মনে করেন তাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়বে?

দায়িত্বজ্ঞানের নমুনা

বাংলা সরকারের দায়িত্বশীলতার একটী নমুনা হল এই যে ঢাকার দাঙ্গায় কত টাকার, কী পরিমাণ সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে তার একটী মোটামুটি ধারণা চাওয়ায় সরকার পক্ষের জবাব হল "had no information". এতদিন পরে সরকার ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে একটা ধারণাও করতে পারেননি, এতে অনেকেই আশ্চর্য্য হবেন। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা আশ্চর্য হইনি। এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। দাঙ্গার জন্য সরকারের যে অতিরিক্ত খরচা হয়েছে তার জন্য ঢাকাবাসীকে অতিরিক্ত ১॥০ লক্ষ টাকার পিউনিটিভ ট্যাক্স দিতে হবে। দায়িত্বশীলতার চূড়ান্ত! লোকজনের ধনপ্রাণ রক্ষার দায়িত্ব হল সরকারের, তার জন্যই পুলিশ আছে, ফৌজ আছে, উচ্চ কর্ম্মচারী আছে। আর তারই জন্য দেশবাসীও ট্যাক্স দিয়ে থাকে। কিন্তু এখানে অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা! ধনপ্রাণ-রক্ষা তো করবোই না, বরং শাস্তি স্বরূপ তোমাদেরই আরো অর্থদণ্ড দিতে হবে। কোথায় সরকারের কর্ত্তব্যস্খলনের জন্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণের ক্ষতিপূরণ দিবেন; তা না হয়ে হলো, উল্টো সমঝ্‌লি রাম! এরই নাম, অদৃষ্টের পরিহাস।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী

রবীন্দ্র প্রয়াণের আকস্মিক বিপর্যয় সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এই আর্তি ও দুর্যোগের মধ্যে একটী অর্থপূর্ণ অনুষ্ঠান নীরবে সম্পাদিত হয়ে গেল, যার মহত্ব ও মর্যাদা জাতীয় জীবনে অবিস্মরণীয়। অবনীন্দ্রনাথের সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ইচ্ছানুসারে শান্তিনিকেতনে এবং কলকাতায় জয়ন্তীউৎসব হয়েছে। একটা জাতির সংস্কৃতির বিশিষ্ট প্রকাশ হয় তার শিল্প-সাধনার মধ্য দিয়ে। আমাদের জাতীয় জীবনের যে জাগরণ হয় ১৯ শতকে, সেই

সর্বাঙ্গীন জাগৃতির অংশ হিসেবে শিল্পকলারও নতুন জাগরণ আরম্ভ হয়। অবনীন্দ্রনাথ সেই জাগরণের প্রাণপুরুষ। তাকে ঘিরেই আমাদের সৌন্দর্যসাধনার প্রবল গুঞ্জরণ ঘটেছিল। আজ জাতি তার ভবিষ্যৎকে যদি গঠন করতে চায় তবে তাকে এই শিল্পঋষির ঋণ শোধ করতেই হবে।

"বীরবল"-জয়ন্তী

গত ২০শে ভাদ্র (১৩৪৮) আশুতোষ হলে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জয়ন্তী উৎসব হয়ে গিয়েছে। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মঙ্গলাচরণ করেছেন এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন করেছেন। বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মানপত্রও শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে দেওয়া হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই যদি কোন সাহিত্যিক স্বকীয়তায় অদ্বিতীয় থাকেন, তবে তিনি প্রমথ চৌধুরী মশায়। এই রাবীন্দ্রিক যুগে বাংলা সাহিত্যকে অভিনব পথ দেখাবার প্রতিভা একমাত্র প্রমথ চৌধুরীরই আছে এবং এই প্রতিভার বিস্ময়কর প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত প্রভাবান্বিত করেছে। "সাহিত্যে নূতন পথপ্রদর্শক" বলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার জয় ঘোষণা করেছেন। উজ্জ্বল রসিকতার দীপ্তিতে, গভীর মননশীলতার প্রাখর্যে, নির্ভীক সত্যনিষ্ঠার পৌরুষে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর অতুলনীয় সৃজনীশক্তি বাঙ্গালীর সাহিত্য ও জীবনকে কী অপরিমেয় ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেছে, তার যথোচিত হিসাব আজও জাতি করতে পারেনি। দীর্ঘকাল ধরে এ ঐশ্বর্যের হিসাব করলে তবে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর যোগ্য মর্যাদা দান বাঙ্গালী করতে পারবে। আমরা তাঁর মনীষার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং কামনা করছি, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করে আমাদের সাহিত্য ও জীবনকে আরো নব নব সমৃদ্ধিতে ভরে তুলুন।

রেণুকা-স্মৃতি গ্রন্থগৃহ

বিশিষ্ট দেশকর্মী, জয়শ্রীর পরিচালিকা রেণুকা বসুর স্মৃতিরক্ষার্থে জয়শ্রীর পরিচালনায় একটী গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব বহু বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের নিকট থেকে এসেছে। আমরা প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ কোরেছি—প্রথমতঃ জয়শ্রীর সঙ্গে রেণুকার যোগাযোগ এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে তার স্মৃতি-রক্ষা সম্পর্কে তার সহকর্মীদের আগ্রহান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। ২য়তঃ কলকাতায় একটা ভাল প্রগতিশীল গ্রন্থগৃহ করবার আকাঙ্খা রেণুর ও আমাদের দীর্ঘদিন যাবৎ ছিল। তার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এই পথটীকে প্রকৃষ্টতম বলে মনে করছি। আমাদের ইচ্ছা আগামী স্বাধীনতা দিবসে এই গ্রন্থগৃহের প্রতিষ্ঠা হয়। এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কম পক্ষে একহাজার টাকার দরকার হবে। আশাকরি রেণুকার বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীরা এবং জয়শ্রীর পাঠক-পাঠিকা এবং সর্বসাধারণ এই উদ্দেশ্যে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। এই সম্পর্কে অর্থাদি ও চিঠিপত্র নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সুনীল দাস
জয়শ্রী—অফিস
১৯০।১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। সম্পাদিকা

দশম বর্ষ { কার্তিক, ১৩৪৮ } ৫ম সংখ্যা

সাহিত্যে শ্রেণীবাদ

অনিল চন্দ্র রায়

সাহিত্য নিয়েও আজ তর্ক উঠেছে। যেমন তর্ক উঠেছে জীবনের অন্যান্য সব কিছু নিয়ে। এ তর্কটা হলো আরো একটা বড়ো তর্কের অংশ মাত্র। সেই আসল তর্কটা হলো মানুষের জীবন সম্বন্ধে, মানুষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে। তর্কটা প্রবল হয়ে উঠেছে, কারণ সংশয় ও প্রশ্নও প্রখর হয়ে উঠেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রই আজ প্রশ্নের দ্বারা আকীর্ণ; সর্বত্রই আঁকা রয়েছে বড় বড় অগণিত প্রশ্নবোধক চিহ্ন যাকে ওয়েলস্ সাহেব বলেছেন এ যুগের মশার ঝাঁক, 'mosquitoes of modern world'. এরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের আক্রমণ করেছে এবং প্রশ্নের মশকদংশনে আমরা আজ সংশয়বিষে জর্জরিত হয়ে উঠেছি,—'now they swarm on every path and infect us with a fever of doubt,' (Wells) এই তাড়নায় আমরা আরম্ভ করেছি বিচার, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান। এরই ফলে ঘটছে আমাদের আদর্শের দ্রুত রূপান্তর। আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে গড়তে চাই। কিন্তু ভাঙ্গাগড়ার পরিকল্পনা নিয়ে মতভেদ আছে। এবং মতভেদ থেকেই দলভেদের উৎপত্তি হয়েছে। সমাজনীতি ও রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের সংঘর্ষ আজ সাহিত্যেও এসে পড়েছে, কারণ সাহিত্য সমাজনীতির এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যিককেও তাই পলিটিশিয়ান ও সমাজতাত্ত্বিক হয়ে বিতর্কের আসরে নামতে হয়েছে।

কথা উঠেছে সাহিত্যের মূল্যবিচার নিয়ে, সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে। একদল বলছেন সাহিত্যের কারবার হলো ব্যক্তি নয়, সমষ্টির জীবন এবং সাহিত্য হলো সমাজ-বিপ্লবের যন্ত্র মাত্র। কথাগুলো পুরাণো নয়, এবং অনেকেই ইতিপূর্বে একথা বলেছেন। কিন্তু একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে একদল আজ কথাগুলো বলছেন। এরা হলেন মার্ক্সবাদী এবং একটা স্পষ্ট সমাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে এরা সর্বত্র দল গঠন করেছেন। এই দল একটা বিশিষ্ট মানদণ্ডে সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনকে বিচার করে কতকগুলো সিদ্ধান্তকে উপস্থিত করেছেন। সাহিত্য সম্বন্ধেও এদের একটা সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে এবং এ সিদ্ধান্ত তাদের সমাজতাত্ত্বিক মতবাদেরই একটা প্রয়োগ বই আর কিছু নয়। মার্ক্সীয় সাহিত্য মানেই হলো মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব, এবং সে সাহিত্যের বিচারে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বকেই বিচার করতে হবে। এ বিচারে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব যেমন সঙ্কীর্ণদৃষ্টি বলে প্রতিপন্ন হয়, তেমনি মার্ক্সীয় সাহিত্যও প্রতিপন্ন হয় একদেশদর্শী বলে।

মার্ক্সীয়দের প্রথম সিদ্ধান্ত হলো সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে। ব্যক্তির সুখদুঃখ, ব্যক্তির জীবন নিয়ে যে সাহিত্য তা এই মতে অপাংক্তেয়। ওরা বলছেন, এ যুগের সাহিত্য হবে সমষ্টির ব্যাপক ও বহুজনীন সুখদুঃখ নিয়ে। আর এ সমষ্টি বলতে মার্ক্স-বাদী বোঝেন একটি বিশেষ ধরণের সমষ্টিকে ; মানে, শুধু কিষাণমজুরের গোষ্ঠীকে। এই হলো মার্ক্সীয় শ্রেণীবাদ ; সমাজ দুটো অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত,-একদিকে ধনিক এবং অন্যদিকে কিষাণ-মজুর। সভ্যতার ইতিহাসই হলো এই দুপক্ষের লড়াইর ইতিহাস ; যে যুগে যে পক্ষ প্রবল হয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে দখল করে সেই বিজয়ী প্রবল পক্ষই সেই যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কোন্ পক্ষ বিজয়ী হবে তাও কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তদানীন্তন অর্থনৈতিক শক্তিসংঘাতের দ্বারা। কাজেই (১) অর্থনীতিই মানুষের ও সমাজের প্রেরক ও নিয়ন্ত্রক (economic determinism), (২) অর্থনীতি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে শ্রেণীদ্বৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে (class dichotomy), (৩) বর্ত্তমান যুগ হলো ধনিকপ্রতিপত্তির যুগ ; বুর্জ্জোয়া শাসন, সভ্যতা ও সাহিত্যের যুগ, এ যুগে কিষাণমজুরের জিহাদ শেষ হবে ধনিকের মহতী বিনষ্টিতে এবং কিষাণমজুরের অনিবার্য বিজয়ে (inevitability of classless society) (৪) অনিবার্যতার প্রমাণ ও গ্যারান্টি হলো হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতি। (৫) এই নীতির ফল হবে বর্ত্তমান কালের বিলীয়মান বুর্জ্জোয়া বা ধনিক সাহিত্যের (ও সভ্যতার) পরিবর্তে উদীয়মান শ্রেণীর (কিষাণমজুরের) শ্রেণী-সাহিত্য বা প্রলেটারীয় গণ-সাহিত্যের অসপত্ন প্রতিষ্ঠা (decadence of bourgeois & the rise of proletarian literature). এই পাঁচটি সিদ্ধান্তকে ছেঁকে চুম্বক আকারে মার্ক্সবাদীদের বক্তব্য দাঁড়াল এই যে কেবল মাত্র কৃষাণ মজুরের শ্রেণী-জীবনকে নিয়েই চলবে নবযুগের সাহিত্যসৃষ্টি। কিংবা কিষাণমজুরের স্বার্থের দিক থেকে যে সাহিত্য রচনা হবে তাই হবে সত্যিকার যুগসাহিত্য।

এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান বক্তব্য হল এই যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে বিরোধটি নিতান্ত কাল্পনিক বই কিছু নয় ; এদের পরস্পরের যোগাযোগটী অতি নিবিড়, এবং একে অন্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এরা চিরকাল জড়াজড়ি করে আছে। তাছাড়া এদের পরস্পরের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব তো নেই-ই, বরং এককে বাদ দিয়ে অপর ক্ষণকালও বাঁচতে পারে না। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে একটা চিরকম্প্র ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে আসছে সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তরে। সেই ভারসাম্যটীর বিচ্যুতি ঘটলেই সমাজজীবনে ঘটে বিপ্লব। সামাজিক ক্রমবিকাশের একটী গতি আছে, সেই গতিমুখে কখনো কোনো দিকে আতিশয্য হলেই ভারচ্যুতি ঘটে থাকে। তাই কোনো যুগে ব্যষ্টির ওপরে পরে জোর, ব্যক্তিবাদ হয় প্রবল ; কোনো কালে সমষ্টির ঘটে প্রাবল্য, গোষ্ঠী হয়ে দাঁড়ায় প্রধান। ১৯ শতকে ব্যক্তিতন্ত্রবাদ চরমে উঠেছে, যার ফলে ধনতন্ত্র ও স্বার্থপূজার জয়জয়কার আরম্ভ হয়েছে। আজ তার প্রতিক্রিয়ার মুখে সমাজতন্ত্র এসেছে, এসেছে সমষ্টির ডাক ; অবাধ ব্যক্তিপ্রাধান্যকে খর্ব করবার রব উঠেছে চারদিকে। ব্যক্তিকে টিপে মারতে হবে, কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আজ আসামী, সভ্যতা ও সাহিত্য উভয়েরই আদালতে। তাই আজ কম্যুনিষ্ট চান এমন সাহিত্য যেখানে ব্যক্তির স্থান নেই, যেখানে শ্রেণীরূপী সমষ্টির হবে ষোড়শোপচার পূজা। কিন্তু চাইতে গিয়ে মার্ক্সবাদী হয়ে পড়েন ভাবপ্রবণ এবং আতিশয্য দোষে তার সিদ্ধান্ত হয়ে পড়ে একদেশদর্শী। তবে মার্ক্সীয় মতবাদের কোন স্থায়ী, প্রামাণ্য ব্যাখ্যান নাই ; মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে মার্ক্সবাদীদের মধ্যেও নানা মুনি আছেন। তবে যারা গোঁড়া সম্প্রদায় তাদের কথাই এখানে হচ্ছে। মিঃ আপওয়ার্ড (Upward) (১), মিঃ রাল্‌ফ্‌ ফক্স (Ralph Fox) (২), মাইকেল গোল্ড (Michael Gold), মিরস্কী (Mirsky) ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল (Christopher Caudwell) (৪) গ্রেন্‌ভিল হিক্স (৫) ইত্যাদি লেখক এই গোঁড়া শ্রেণীবাদের সমর্থক। এঁদের মতে ব্যক্তি হিসাবে মানুষের কোনো মূল্য নাই, শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবেই তার অস্তিত্ব ও ব্যবহারের অর্থ আছে। এঁদের এই গোড়ামী ও আতিশয্য হলো ১৯ শতকীয় ব্যক্তিপ্রাধান্যের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এরা বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক প্রগতির দিকেচোখ বন্ধ করে আছেন। মানুষের মন যে একটী জটীল মিশ্র সত্ত্বা, তার মানসিকতা যে নানা বর্ণের আলোকসম্পাতে বিচিত্র ও বহুরঙীন একথা এঁরা ভুলে যান। মানুষের ওপরে তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়ে, একথা ঠিক। জীবিকা অর্জ্জনের সূত্রে মানুষ যে পারিপার্শ্বিক নিজের চারদিকে সৃষ্টি করে তার প্রয়োজন ও তাগিদ তার মনকে ও ব্যবহারকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু শ্রেণী-প্রভাব ছাড়াও বহু বিচিত্র অবস্থার প্রভাব তার ওপরে অহরহ কাজ করছে ; যেমন তার বংশ, রক্ত ও দৈহিক উত্তরাধিকার (race), যেমন তার

(1) "The mind in chains" by Upward. (2) "The Novel and the People" by Ralph Fox. (4) "Illusion and Reality"—by Christopher Caudwell. (5) "The great tradition"—by Grenville Hicks.

দেশ ও কাল, তার পুরুষ-ও-স্ত্রীত্ব বা লিঙ্গভেদ (sex), তার পরিবার-গত স্থান ও পদ-মর্যাদা (status), তার ধর্ম ও জাতি (caste)। সে কেবল ব্যবসায়ীই নয়, ধনিক ও শ্রমিকই নয়; মঙ্গোলীয় বা নিগ্রো রক্ত তার মধ্যে আছে, তার প্রভাব আজ জনন-শাস্ত্র (genetics) স্বীকার করবে; সে পুরুষ কি নারী তারও প্রভাব তার মানসিক গড়নকে অনুরঞ্জিত করবে, একথা যৌন শাস্ত্র আজ বলবে; সে পিতা কি ভ্রাতা কি স্বামী, মাতা কি জায়া কি কন্যা এই পারিবারিক সম্পর্ক-জালের চাপও তার চেতনাকে কিছু অভিভূত করবে, একথা মনস্তত্ত্ব অস্বীকার করে না; সে নাস্তিক কি আস্তিক কি ফেটীশ-পূজক, তান্ত্রিক কি ইহুদী কি বৈষ্ণব, এসব ব্যাপারের প্রভাবও কম নয়, সমাজতত্ত্ব একথা স্বীকার করবে। মানুষের ব্যক্তিত্ব মিশ্র পদার্থ, তাকে কেবল একটা দিক থেকে, একটা cross section হিসেবে দেখলে, সে দেখা আংশিক ভাবে সত্য হবে। কেবল ব্যবসায়গত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে তাকে দেখলে তার ব্যক্তিত্বের সবটুকু ধরা পড়ে না। ব্যক্তি হিসেবে, মানুষ হিসেবে তার ব্যক্তিত্বের একটা দিক আছে। রাসেল বলেছেন, যার দাঁত ব্যথা হয় সেই জানে ব্যথার অনুভূতিকে; এ তার একান্ত নিজস্ব; এখানে প্রত্যক্ষ ভাগ দেবার উপায় যেমন নেই, এখানে অন্য কারুর ভাগ নেবারও পথ নেই। গোলাপ দেখে বা সূর্যাস্ত দেখে যে আনন্দের উপলব্ধি কারুর হয়, তা তারই বিশিষ্ট উপলব্ধি। বাইরের সমাজের সঙ্গে, অপরাপর মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক না এক সূত্রে যোগ আছে। কিন্তু সমস্ত মানুষের সঙ্গে সকল যোগসূত্রের বাইরে একটী নিরালা অন্তর্লোক আছে যেখানে অপরের প্রবেশপথ নেই। সেখানে মানুষ একক। বাহির ও ভিতর, এই দুইয়ের সমবায়েই মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ। এদের একে অন্যের উপরে সততই প্রভাবপাত করছে, এই অন্যোন্যতাকে স্বীকার করেও ভিতর ও বাহির দুইয়েরই সত্তার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না করে উপায় নেই। সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ অপর দ্বীপ বা দেশ থেকে পৃথক্, সমুদ্র তাদের মধ্যে অন্তরাল রচনা করে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সমুদ্র আবার, অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে, দুইয়ের মধ্যে যোগসেতু হিসেবেও রয়েছে। সমুদ্র ব্যবধানও বটে, সংযোগও বটে। তেমনি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যও যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার সমষ্টির অন্তর্ভুক্তি ও সংযোগ। মানুষ যেমন একক ও পৃথক, তেমনি মানুষ বহুর সহযোগী এবং সমাজেরও অংশীদার। ব্যক্তির সুখদুঃখও যেমন সত্য, তেমনি সমষ্টিজীবনের সাধারণ সুখদুঃখও সত্য; ব্যক্তি নানা ক্ষেত্রে নানা লোকের সঙ্গে সমান সুখদুঃখের ভাগী; সেই কারণে বহুতর লোকের সঙ্গে ব্যক্তির গোষ্ঠীবন্ধন ঘটে, এবং ব্যষ্টি তাই বিবিধ গোষ্ঠী-জীবনের (group life) অন্তর্ভুক্ত, ফলভাগী এবং প্রভাব-লালিত। তার বিবিধ সম্পর্ক-বন্ধনের মধ্যে কেবল জীবিকাসম্পর্কিত সম্বন্ধ ও সংযোগই তাকে মাটীর ঢেলার মত ষোল আনা গড়ে তুলবে, একথা কোন বিজ্ঞানই সমর্থন করে না। কারণ এ হলো নিছক একদেশ-দর্শন মাত্র এবং যাকে বলে 'over-simplification' সেই আতিশয্য দোষেরই নামান্তর।

সাহিত্য কেবল মানুষের অর্থনৈতিক শ্রেণী-চরিত্রেরই প্রকাশ মাত্র, একথা এই এক-দেশদর্শী গোঁড়ামী বই আর কিছু নয়। মানুষের মনোভাব তার শ্রেণী-স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়, সত্য। কিন্তু সে কতটুকু? তাছাড়া সেই প্রভাবকে অপরাপর স্বার্থ, তাগিদ ও প্রভাব খর্ব এবং এমনকি, বিলুপ্তও করতে পারে। কেন পারে তার জবাব দিয়েছে সমাজতত্ত্ব। সমাজে ও জীবনে বিবিধ শক্তি ও স্বার্থ কাজ করছে, ক্রমবিকাশের মূলে রয়েছে এই বিচিত্র ও অসংখ্য শক্তিসমূহের সমবেত ও পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত। এই পারস্পরিকতা (reciprocity) হলো আজকার সমাজতত্ত্বের সর্বস্বীকৃত তথ্য। মার্ক্সীয়দের অর্থনৈতিক শ্রেণীবাদ দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের সামাজিক ক্রমবিকাশবাদের ওপরে। এই বিবর্তনবাদের ভিত্তি হলো একরৈখিক (unilinear), অপরাবর্তনীয় (irreversible) কার্যকারণক্রমের থিওরী যা' আজকার দর্শনে ও বিজ্ঞানে অচল। অর্থনীতি যেমন জীবনের অপরাংশকে প্রভাবিত করছে, অপরাংশগুলোও তেমনি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে। শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ সাহিত্যে থাক্‌বে, সন্দেহ নেই; কিন্তু সকল রকমের গোষ্ঠীজীবনের স্বার্থই সাহিত্যের মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত হবে, একথাও অনস্বীকার্য। অধিকন্তু কেবল গোষ্ঠীজীবনই নয়, ব্যষ্টি-জীবনেরও আশানিরাশার কাহিনী সাহিত্যে ভাষা পাবে। সমষ্টিজীবন দানা বেঁধে উঠেছে ছোটবড় নানাবিধ গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে। ছোট বড় নানা আকারের সমকেন্দ্রিক বৃত্তের অন্তর্ভূক্ত হয়েও ব্যক্তির একটা স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে। তাই আজ মার্ক্সীয়দের, মধ্যে যারা যুক্তিশীল তারা ব্যক্তিকে নিয়েও সাহিত্য হতে পারে একথা স্বীকার করেছেন। বিখ্যাত মার্কস্‌বাদী জন্ ষ্ট্রাচীও (Strachey) বলছেন, "Literature, for the most part, attempts to illuminate some particular predicament of a particular man or a particular woman at a given time and place." এই স্বীকৃতির জন্য গোঁড়া মার্ক্সীয়রা খুশী হননি। এমনকি গ্রেন্‌ভিল্ হিক্‌স্ এর জন্য ষ্ট্রাচীকেও এক হাত নিতে ছাড়েননি। কিন্তু আমেরিকার আর একজন মার্ক্সীয় সাহিত্যিকও ব্যক্তির মূল্যকে স্বীকার করে ষ্ট্রাচীকে সমর্থন করেছেন। তার নাম ফ্যারেল (J. T. Farrell). তিনি বলছেন, সামাজিক শক্তিগুলো এমন ভাবে দানা বেঁধে উঠে কাজ করেনা যাতে এক একটা বিপুল আকারের পিণ্ড বিরুদ্ধ দিক থেকে এসে পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে। মানুষকে কেবল পিণ্ডের অংশ হিসেবে দেখলে আবার পুরোণো যান্ত্রিকতারই সমর্থন করা হয় —"the treatment of them as such is a fall back to the materialism that preceeded Marx........We cannot treat social forces as mechanical and the basis of this is the common intellectual conception of cause and effect as rigidly opposite poles." (৬) ফ্যারেলের মতে সাহিত্য শ্রেণীকে নিয়েও হতে পারে, ব্যক্তিকে

(6) "A note on Literary criticism" by James T. Farrell.

নিয়েও হতে পারে। আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যের মূল্য যে কম একথাও স্বীকার্য নয়। উপন্যাসের শ্রেণীভাগ করে হিক্স্ যে "সমষ্টি-কেন্দ্রিক" উপন্যাসের নামকরণ করেছেন তাও ফ্যারেলের মতে অবৈজ্ঞানিক। (৭)

জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যা দুইই স্বীকার করে থাকে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য যেমন আছে তেমনি প্রভেদ-ও আছে। কোনো কোনো বিষয়ে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকে আবার অন্যদিক থেকে থাকে অসাদৃশ্য। জীবিকা-স্বার্থের সাদৃশ্য যাদের মধ্যে রয়েছে তারা হলো মার্ক্সীয় "শ্রেণী"। তেমনি অন্যবিধ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অন্যরকমের গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে মানুষের কেবল এক ধরণের সাদৃশ্যটীকেই চোখের ওপরে রেখেই সাহিত্য সৃষ্ট হবে, কেবল অর্থনৈতিক শ্রেণীর স্বার্থ নিয়েই সাহিত্য গড়ে উঠ্‌বে, এ দাবি ও কল্পনা ভিত্তিহীন। আরেকটা কথা আছে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির একটা প্রভেদও আছে; সকল সাদৃশ্যের পিছনেই জেগে রয়েছে এই প্রভেদ বা অসাদৃশ্য। এইদিক থেকে দেখলে প্রত্যেকটী ব্যক্তিরই আছে একটী বিশিষ্টতা বা uniqueness. এইখানে প্রত্যেকটী ব্যক্তি স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর! দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ও রীতিতে, উভত্রই, এই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। আকৃতিতে যেমন প্রতিটী ব্যক্তি প্রতি ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন, প্রকৃতিতেও তাই প্রতি মানুষের একটী পৃথক স্বকীয়তা আছে। (৮) এই কারণে মোটা-মোটি ভাবে শ্রেণী হিসেবে কোন মানুষ-সংহতির ব্যবহার সদৃশ ও সমপ্রকৃতিক হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও কোন ব্যষ্টির ব্যবহার সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যৎ-বাচন চলে না। ব্যক্তির প্রায়শই বিশিষ্ট-প্রকৃতি ও স্বতন্ত্রধর্মী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে statistical average'এর পদ্ধতি খানিক দূর কার্যকরী হলেও, বেশী দূর নয়। যেখানে মানুষ স্বতন্ত্রধর্মী সেখানে তার ব্যবহার শ্রেণী-ব্যবহার না হয়ে হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিক ব্যবহার যা স্বকীয় বৈশিষ্টে স্বয়ংসিদ্ধ। এই ব্যক্তি-

(7) "Therefore, because a novel happens to deal with the particular predicament of a particular man or woman···it does not necessarily follow that it is tainted with individualism, nor, because it is tainted with individualism, does it necessarily follow that it belongs in a lower category than the collective novel;......Actually there is nothing astounding in the fact that novelists are likely to go on writing about the individuals, because, after all, the world is made up of individual human beings."—(ibid, pp. 111-112).

(8) "Besides being members of classes and groups, they are intractable individual entities, each uniquely different and in some respects, from every other human being on this planet.......In other words, in every individual there is an aspect of uniqueness and intractability and this makes him not completely predictable in every potential situation." (ibid, pp 117).

ধর্মকে নিয়ে যে সাহিত্য-রচনা হয়, তার শ্রেণীস্বার্থ-সম্পর্কিত মূল্য কম হলেও সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও ব্যক্তি হিসেবে বা মানুষ হিসেবে সাদৃশ্য আছে; শ্রেণী-স্বার্থের পার্থক্যকে বাদ দিয়ে যদি মানবীয় সাদৃশ্যকে মাত্র ভিত্তি করে সাহিত্য তাকেই রূপ দেয়, তবে সে সাহিত্যকে কুসাহিত্য বলবার কোনই যুক্তি নেই। কিষাণ আর জমিদারের, মজুর আর ধনিকের মধ্যে মানুষ হিসেবে কতকগুলি সমধর্ম আছে। বৃহত্তর গণের (genus) মধ্যে ক্ষুদ্র জাতি (species) অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে; জাতি হিসেবে পরস্পরের বিরোধ বা প্রভেদ থাকলেও সবগুলি ব্যক্তিই গণ হিসেবে বৃহত্তর মানবসমাজের অংশ। দাম্পত্য-প্রীতি, বাৎসল্য-প্রেম, আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তি ইত্যাদি বহু বিষয়ে মানুষ বিরোধী শ্রেণীভুক্ত হয়েও সমস্বভাব হতে পারে। এই বিশ্বমানবিক মানবধর্মও সাহিত্যের অনবদ্য বিষয়বস্তু হতে পারে। শ্রেণী-সংগ্রাম এই মানবধর্মকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে না। (৯)

যারা শ্রেণী-সাহিত্য নিয়ে মেতে উঠেছেন তারাও এক ধরণের রোমান্টিক ভাবপ্রবণতার মোহে আটকা পড়েছেন। তবে তাদের এই মত্ততা আজ কিষাণমজুরকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত হচ্চে, এই যা তফাৎ। কোনো সাহিত্যে রাজরাজড়াদের নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখা যায়; কিংবা ধনীদের বিলাস-ঐশ্বর্যের সসম্ভ্রম বর্ণনায় সাহিত্য প্রায়শঃই মুখরিত হয় এ-ও দেখা যায়। কিন্তু মার্ক্সীয় সাহিত্যিকদের আধুনিক রচনায় দরিদ্রের, এমন কি দারিদ্র্যের সপ্রশংস স্তুতিবাচনে আজ রোমান্টিক ভাবালুতারই অন্য রূপ দেখা দিয়েছে। এ সেই সংকীর্ণ বাতিক যা সব জটিলতাকে সরল ফর্ম্মুলায় বেঁধে সহজ সাহিত্য সৃজন করতে চাইছে; সাহিত্য হলো মানব-মননার দিগন্ত-প্রসারী অরণ্য; এখানে আলোতে-ছায়াতে, লতাপাতা-পল্লবে, কীটপতঙ্গজন্তুজানোয়ারে, কন্টকে-ফুলে-ফলে, মেঘবর্ষণে আর তুফানে-বিদ্যুতে অজস্র জটিলতা। একে সংক্ষিপ্ত নির্যাসে পরিণত করতে চান এরা, দারিদ্র্যের ঘর্মজলে আর বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাসে। কিন্তু এ যুগ-সাহিত্য হবে না, এ হবে সহজিয়া ভাব-সাহিত্য ('literature of simplicity'); এই নব রোমান্স রচনা করবে কেবল, "songs of 'stench and sweat", "it tends to idealise the worker and the worker-writer". শ্রেণী-সাহিত্যের তিন রূপ হতে পারে, (১) কিষাণমজুর লেখকের রচনা (২) কিষাণমজুর সম্পর্কে রচনা (৩) কিষাণমজুরের স্বার্থের দৃষ্টিভূমি থেকে রচনা, অর্থাৎ কিষাণমজুরের স্বার্থকে সমর্থন করে রচনা। লেখক কিষাণমজুর হলেও তার রচিত সাহিত্য কিষাণ মজুরের স্বার্থকে সমর্থন না-ও করতে পারে। কেবল কিষাণমজুর সম্পর্কে রচনা হলেই

(৯) "The class struggle however does not in any sense produce so complete a differentiation of human beings that there are no similarities between men who objectively belong to different social classes." (ibid 125 pp.)

নয়, তাদের শ্রেণী-স্বার্থকে সমর্থন করে রচনা হওয়া চাই। তাই তৃতীয় পর্যায়ের সাহিত্যই সত্যিকার শ্রেণী-সাহিত্য। এই শ্রেণীসাহিত্য এক শ্রেণীর সাহিত্য হতে পারে কিন্তু একমাত্র সাহিত্য নয়। কারণ 'শ্রেণী' নামক সংজ্ঞা বা categoryটী সাহিত্যবিচারে একমাত্র মাপদণ্ড নয়, একথা পূর্ব্বেই বিবৃত হয়েছে। গোঁড়া শ্রেণীবাদীরা অপর সাহিত্যকে স্বীকার করেন না। বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর সাহিত্যিকরা যা' লিখে থাকেন তা যতই বাস্তব ও সত্য হোকনা কেন, তার মূলপ্রেরণা, এদের মতে, স্বার্থসিদ্ধি বই কিছু নয়। জয়েসের লেখায় যে বাস্তব ও অবিকল বর্ণনা আছে তার কারণ হ'লো, মিরস্কির (Mirsky) মতে, জয়েসের অতিরিক্ত ও অন্যায় বস্তু-প্রীতি বা সম্পত্তি-প্রীতি। জয়সের বাস্তবতার কারণ নাকি জয়সের লুব্ধ ক্যাপিটালিষ্ট মনোবৃত্তি। এরই নাম মার্ক্সীয় সাহিত্যসমালোচনা! আঁদ্রে জিদ (Andre gide) একজন নামকরা মার্ক্সীষ্ট্। ১৯৩৫ সালে তিনিও লিখেছিলেন, সকল শ্রেণীকে অতিক্রম করে সকল শ্রেণী-স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান আছে সত্যিকারের সাহিত্যের। (১০) হেনরী হ্যাজ্‌লিট্ (Henry Hazlitt) আমেরিকার নামজাদা সমালোচক। তিনিও সাহিত্যে এই শ্রেণীমত্ততার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এমন কি ট্রট্স্কী পর্যন্ত বলেছেন, "Personal lyrics of the smallest scope have an absolute right to exist within the new art." ব্যক্তির অনুভূতি নিয়ে অনুপম সাহিত্য হয়েছে, এবং চিরদিনই হবে। শ্রেণী সত্য, শ্রেণী-প্রভাবও সত্য কিন্তু শ্রেণীকে অতিক্রম করে মানুষ উর্দ্ধলোকে উঠতে পারে, যে লোকে মানুষ কেবল শ্রেণী নয়, দেশ, কাল, জাতি, লিঙ্গ ও বংশ ইত্যাদি সকল গণ্ডীর বন্ধন ও সংস্কারের অতীতে স্থিতিলাভ করতে পারে। একথা হ্যাজলিট্‌ও স্পষ্টভাষায় বলেছেন। (১১) মার্সেল প্রুস্তের লেখা ফরাসী পরিবেশের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছে এবং ইংলণ্ডে বাস করলে তার লেখার মধ্যে কিছু ইতরবিশেষ হতোই। কিন্তু তাই বলে প্রুস্ত্-'এর ফরাসীত্বের দরুণ কি আমেরিকার পাঠকদের কাছে প্রুস্ত'এর সাহিত্যিক মূল্য কমেছে কিছু? ড্রেজার (Dreiser) পুরুষ বলে মহিলাদের কাছে তার লেখা কিছু কম প্রিয় নয়। তেমনি জর্জ্জ ইলিয়াট বা দেলেদ্দার লেখা পুরুষেরা পড়বে না এমন হতে পারে না। অর্থাৎ শ্রেণী, লিঙ্গ, দেশকালের উর্দ্ধে একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে সাহিত্যিক রসের অব্যাহত থাকবার কোনই বাধা হয় না।

(10) "In every enduring work of art......one that is capable of appealing to the appetite of successive generations, there is to be found a good deal more than mere response to the momentary needs of a class or a period."—Andre Gide.

(11) "The great writer with great imaginative gifts may universalise himself. If not in a literal sense, then certainly in a functional sense, he can transcend the barriers of nationality, age and sex. But centainly he can, in the same functional sense and to the same degree, transcend the barrier of classes" (H. Hazlitt in an the article in 1932).

শ্রেণীর প্রভাব বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে কোন যুক্তিশীল সমালোচকই বাদ দিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে শ্রেণীকেই সাহিত্যবিচারের একামেবাদ্বিতীয়ম্ মানদণ্ড করে দাঁড় করানোর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই নেই। ইতিপূর্বে অর্থাৎ মার্ক্সীয় সাহিত্য সৃষ্ট হবার আগেও সমালোচকেরা পারিপার্শ্বিকের ও এমন কি, শ্রেণীর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কুরথোপ্ (Courthope) তার বিখ্যাত এক প্রবন্ধে ("Poetry and the people") শ্রেণী-প্রভাবের গুরুত্ব সম্বন্ধে লিখেছিলেন। (১২) এমন কি, বুর্জোয়া উদারনীতির বর্তমান বিশৃঙ্খলা যে সমষ্টিবাদ ও ব্যক্তিবাদের সংঘর্ষ থেকে জন্মেছে এবং তাই তদানীন্তন কাব্য যে এই বিশৃঙ্খলার ছাপ বহন করেছে, তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করা এক কথা, আর তার অন্ধ মাহাত্ম্য কীর্তন করা হলো অন্য ব্যাপার। মার্ক্সীয় সমালোচনার আতিশয্য দোষ এবং একদেশদর্শিতা তাই বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নয়। এমনকী ট্রট্স্কীও এ সম্বন্ধে মার্ক্সীয় গোঁড়ামীর তীব্র সমালোচনা করেছেন। শ্রেণীসংস্কৃতি বলে কোন বস্তু নেই, কাজেই প্রলেটারীয় সংস্কৃতি বা সাহিত্য বলেও আলাদা কিছু থাকবার কল্পনা করবার কোনই অর্থ নেই। যে শক্তি ও আনন্দের উপাদানকে মানুষ যুগে যুগে সঞ্চয় করেছে, সেই সব উপাদানকে কোন বিশেষ শ্রেণীর সংস্কৃতি বলে ছাপ মেরে দেবার কোনই কারণ নেই। ইলেকট্রিসিটি, ষ্টীমএঞ্জিন, এরোপ্লেন, মোটর, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রেডিও, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি হলো আধুনিক সভ্যতার উপাদান, এর মূলে বহু লোকের অবদান রয়েছে। সর্বমানবের কল্যাণে এদের ব্যবহারে ও প্রয়োগে কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। তবে বর্তমান যুগে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্য বাণিজ্যে ও রাষ্ট্রে রয়েছে; তাই এসব মানব-ব্যবহার্য উপাদান কতিপয় ধনিকের দখলে ও ভোগে আটক আছে। সর্বহারাদের এতে কোন অধিকার নেই। কিষাণ-মজুরের রাজ হলে, এই যুগান্তের ক্রমসঞ্চিত ঐশ্বর্য কিষাণ-মজুরের ভোগেও আস্বে। যা ছিলো সংখ্যাল্পের আয়ত্তে, তা হবে অগণিতের উপভোগ্য। যে সংস্কৃতি বা সভ্যতা আজ এক শ্রেণীর একচেটীয়া, সেই সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়বে সকল স্তরের মধ্যে। শুধু এই হবে পার্থক্য। কাজেই "বুর্জোয়া" বা "প্রলেটারীয়" বলে মার্কামারা কোন সংস্কৃতি নেই; এ হলো শব্দের দুষ্ট প্রয়োগ মাত্র। আসল কথা আজিকার বুর্জোয়ার অধিকৃত ও উপভোগ্য সংস্কৃতিকে আমরা চাই প্রলেটারীয়েট'এর দখলে এনে দিতে। অনাগত বিপ্লব হবে এই হস্তান্তরের বাহক। কাজেই বিপ্লবোত্তর সংস্কৃতিকে "সমাজতান্ত্রিক"

(12) "All through the history o England we see a tendency in the life of the nation to concentrate itself in...some particular class which becomes for the time being the sovereign power, rallies round itself all the faculties of the people......" (Courthope).

বা "প্রলেটারীয়" সংস্কৃতি নাম দেওয়া একান্ত নিরর্থক। অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক পরিভাষাকে সাহিত্যিক ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করলে অর্থবিভ্রাট ঘটবেই। সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে যারা রাজনৈতিক লেবেল দিয়ে খণ্ডিত করে দেখেন তারা সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা করেন। ফ্যারেলের ভাষায়, "When one freezes the categories of bourgeois and proletarian and insists that they be standards of measurements in literature, one shuts out the enduring element that Gide speaks of." এঙ্গেল্‌স্ (Engels) মার্ক্সীয় ডায়ালেকটীক জড়বাদকে যান্ত্রিক জড়বাদে পরিণত করেছেন, "বুর্জোয়া," "প্রলেটারীয়" ইত্যাদি পরিভাষাকেও কাষ্ঠকঠিন, অনড় সংজ্ঞায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে মার্ক্সবাদীরাও "বুর্জোয়া" ইত্যাদি লেবেল ব্যতীত সংস্কৃতি, সাহিত্য বা সমাজ-জীবনকে ভাবতেও পারেন না। এই গোঁড়ামীর পথ এঙ্গেল্‌স-ই দেখিয়েছেন। তিনিই প্রথম "প্রলেটারীয় সংস্কৃতি"র কথা রাজনীতি ক্ষেত্রে আমদানী করেছেন। কিন্তু এই ধরণের ভাগাভাগি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চলে না। বিশেষতঃ যে মনোভাব বুর্জোয়া সংস্কৃতি বিলীয়মান বলে নাসিকা কুঞ্চিত করে, তা কেবল বিশুদ্ধ অজ্ঞতা বই অন্য কিছু নয়। প্রেলেটারীয় সংস্কৃতি বলে যে নতুন সংস্কৃতির কাহিনী মার্ক্সবাদীরা প্রচার করে থাকেন, তা সোণার পাথর বাটীরই মতন কল্পনার অলীক সৃজন। ট্রট্‌স্কীর মত গোঁড়া মার্ক্সবাদীও একথা স্বীকার করেছেন। ডিক্টেটরী যুগের অন্তে নতুন সমাজ সংগঠন হবে শ্রেণী-হীনতার ভিত্তিতে। সে যুগের সংস্কৃতি হবে সর্বমানবের সংস্কৃতি, "প্রলেটারীয়" নামক শ্রেণীচিহ্নে লাঞ্ছিত সংস্কৃতি নয়। (১৩) এমন কি মার্ক্স স্বয়ং-ও সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেণীবাদের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন বলে মনে হয় না। তথাকথিত "বুর্জোয়া"-মার্কা বলে মার্ক্স এ যুগের ও পূর্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্যকে অগ্রাহ্য করেন নি; বরং সাহিত্যকে রাজনৈতিক মতসংঘর্ষের উর্দ্ধে রেখে তিনি অবিমিশ্র সাহিত্যরসাস্বাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। এস্কাইলাস্ (Æschylus), হোমার থেকে দান্তে, সেক্‌স্‌পিয়ার, সার্‌ভেন্‌টে (Cerventes) গ্যয়েটে (Goethe), হায়নে (Heine), ইত্যাদির বইগুলো তাঁর দৈনন্দিন শান্তি এবং সারাজীবনের সান্ত্বনার উৎস ছিল। পল লাফার্গ বলেছেন, মূল গ্রীক ভাষায় এস্কাইলাসের বই মার্ক্স অন্ততঃ

---

(13) "There is no workers' culture and that there will never be any and in fact there is no reason to regret this. The worker acquires power for the purpose of doing away for ever with class culture and to make way for human culture; We frequently seem to forget this. The main task of the proletariat intelligentsia in the immediate future is not the abstract formation of a new culture,......but definite culture-bearing, ie, a systematic, planful and of course, critical imparting to the backward masses of the essential elements of the culture which already exists." (Trotsky—Literature & Revolution.)

বছরে একবার আগাগোড়া পড়তেন। "বুর্জোয়া" কবিতা-সাহিত্যেই ছিলো তাঁর অফুরন্ত আনন্দ। (১৪) রোমান্সের নামে আমাদের আধুনিক মার্ক্সবাদীরা আৎকে ওঠেন; কিন্তু সারভেন্টের ও বালজাকের (Balzac) রোমান্সগুলিকে মার্ক্স সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমান্স বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন; বালজাকের "La comedie Humaine" এর প্রতি তার প্রশংসা ছিলো অপরিসীম। (১৫) তাছাড়া স্কট্ (Scott) ফিল্ডিং (Fielding) ডুমা (Dumas) ইত্যাদিও তাঁর প্রিয় ছিলো; "Old mortality" এবং দিদেরো'র (Diderot) "Le Neveu de Rameau" কে মার্ক্স প্রতিভাদীপ্ত অসাধারণ সৃষ্টি, masterpiece, বলে মনে করতেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মতামতে এরা সবাই মার্ক্সের কাছে ঘৃণ্য reactionary মাত্র, কিন্তু সাহিত্যলোকে এরা তার কাছে নমস্য প্রতিভা। এতেই প্রমাণ হয় যে সাহিত্যবিচারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা judgmentই চূড়ান্ত নয়, মূল্যবিচারে সাহিত্যের আছে নিজস্ব কতকগুলি মানদণ্ড ও আদর্শ। ফ্রান্‌জ্ মেহরিং (Franz Mehring) বলেছেন, "In his literary judgments he was completely free of all political and social prejudices, as his appreciation of Shakespeare and Walter Scott shows.......". লেনিন-পত্নী ক্রুপস্‌কায়ার স্মৃতি-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অবসর কালে লেনিনও এই বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল ও decadent সাহিত্য থেকেই চিরজীবন আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করে গেছেন। কিন্তু অধুনাকার মার্ক্সবাদীরা মার্ক্সের থেকেও বেশী মার্ক্সীস্ট্ এবং লেনিন থেকেও থেকেও বেশী লেনিনিষ্ট। কাজেই 'বুর্জোয়া' বলতেই তাদের উদ্গত বিতৃষ্ণা দমন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রাণহীন আড়ষ্ঠ শ্রেণীবাদে এদের বিচার-শক্তি ও উপভোগ-প্রবৃত্তি উভয়কেই পঙ্গু করে ফেলেছে। ক্রুপ্‌স্কায়ার বইয়ে এর শিক্ষাপ্রদ ও আমোদজনক দৃষ্টান্ত রয়েছে। একদল কম্যুনিষ্ট "তরুণ"কে লেনিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা পুশ্‌কিন্ (Pushkin) পড়ো ?" জবাবে তরুণ মার্ক্সিষ্ট্‌রা বললেন, "না, না, পুশ্‌কিন্ যে বুর্জোয়া! আমাদের হলো মায়াকভ্‌স্কী।" লেনিন মুচকি হেসে বললেন, "আমি কিন্তু পুশ্‌কিনকেই বেশী ভালবাসি!" বেচারি লেনিন! গণ্ডুষ জলে ফরফরায়মান খুঁদে মাছরা চিরকাল এবং সকল দেশেই এই রকমের হয়ে থাকেন। তারা একটু অধিক আতিশয্য ব্যাধিতে ভোগেন। কিন্তু তাই বলে বৈজ্ঞানিক বিচারে আতিশয্য বা উচ্ছ্বাসের স্থান নেই।

সমাজে আজ ধনীদরিদ্রের শ্রেণীসংগ্রাম প্রখর হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যৎ সমাজে কিষাণ

---

(14) "......he would read Eschylus again in the original text, regarding this author and Shakespeare as the two greatest dramatic geniuses world had ever known, for Shakespeare he had an unbounded admiration." (Lafargue).

(15) "The greatest masters of romance were for him Cerventes and Balzac.... His admiration for Balzac was so profound that......"(Riazanov).

মজুরের স্বার্থকে জয়যুক্ত করে নতুন অর্থ-ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। কিন্তু তাই বলে মানুষের সংস্কৃতি ও সমস্তসভ্যতাকে শ্রেণীবাদের লোহার ছাঁচে ফেলে মাপতে বা গড়তে হবে, এই Neuveau-মার্ক্সীয় সমালোচনা-রীতির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। একই যাদুদণ্ড দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই সবকিছুর সম্পূর্ণ সমাধান করা চলেনা। একটা সীমা পর্যন্ত এ নীতি কিছুটা কার্যকর হতেও পারে কিন্তু তার পরে এ অদ্বৈতী পদ্ধতি অচল। সমাজ ক্ষেত্রের যে পদ্ধতি বা standard তাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে হুবহু প্রয়োগ করার স্বপক্ষে কোনই লজিক নেই। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও আজ মার্ক্সবাদীরা ডায়ালেকটিক ও শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্র হাতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং "বুর্জোয়া" সাহিত্যের মৃত্যু-দণ্ডের হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু ট্রট্স্কীর লেখনীতেই বেরিয়ে পড়েছে মার্ক্সীয় স্বীকৃতির সত্যভাষণ, "It is very true, one cannot always go by the principles of marxism in deciding whether to reject or accept a work of art." ১৯১৭ সালের পরের জগতে যে সব নতুন ঘটনাবিবর্তন হয়েছে তার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত হলো এই যে বাস্তব পরিস্থিতির চাপে মার্ক্সবাদীদের সাহিত্যিক গোঁড়ামীর একদিন সংশোধন হবে।

বিচারশীল চিন্তা

ডাঃ মেঘনাদ সাহা

"স্বাধীন চিন্তা ভাল কিন্তু নির্ভুল চিন্তা আরো ভাল"। কথাগুলো লেখা আছে উপশালার বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ দেশে। শোনা যায় এটা নাকি দার্শনিক ও মিষ্টিক Schwendenborg এর উক্তি। কথাগুলো শুনতে ভাল, কিন্তু একে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা মুস্কিল। কারণ মানুষ যখন উত্তেজিত হয় তখন উত্তেজনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে নির্ভুল চিন্তার নীতি প্রয়োগ করতে প্রায়ই পারে না। এদিক্ দিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক সকলেই সমপর্যায় ভুক্ত।

মাত্র বছর তিরিশ আগেও উদ্ধত আধুনিকেরা অযৌক্তিক চিন্তা ও কাজের জন্য প্রাচীনদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখ্ তো। প্রাচীনেরা নিজেদের দেবতাদের বিশেষ অনুগ্রহভাজন বলে মনে করতো, অথচ কারু ও চারুশিল্পে, এবং সাহিত্যে তাদেরই মত উন্নত অপর জাতিদের বর্বর আখ্যা দেবার মত মূর্খামি করতো। আধুনিকদের নিকট এ অত্যন্ত যুক্তিহীন ও অন্যায় মনে হয়।

গত তিরিশ বছরের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে এবিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিকে কোনো প্রভেদই নেই। গত মহাযুদ্ধে দুই পক্ষই মনে কোরতো তারাই একমাত্র ন্যায় ও সত্যের অধিকারী এবং দুই পক্ষই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতো ন্যায় ও সত্যকে সাহায্য করবার জন্য। দু'পক্ষের রাজনীতিক ও ধর্মযাজকেরাই শুধু নয় এমন কি বৈজ্ঞানিকেরাও নিজ নিজ বিশেষ মার্কা ন্যায়-পরায়ণতার স্বপক্ষে এমন সব অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করতো যে, দুই পক্ষের বিশিষ্ট আইনজীবীর মধ্যে পড়ে হাইকোর্টের জজ্ দের যে অবস্থা হয়—ভগবানেরও সেরূপ অসুবিধাজনক অবস্থায় নিশ্চয় পড়্ তে হোয়েছিল। যুদ্ধের পর ফরাসী দেশের প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেন্শ যখন পিরামিড্ দেখতে গিয়ে নিজেদের মৃতদেহের উপর কৃত্রিম স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মাণ কর্বার মূর্খামির জন্য মিশরীয় ফেরয়াদের সম্পর্কে উদ্ধত মন্তব্য করেন তখন মিশরীয় খবরের কাগজগুলো তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, হয়ত দু'শ বছর পরে ভার্সাইর সন্ধিপত্র, যার জন্ম দাতাদের মধ্যে ক্লেমেনশ একজন—পিরামিডের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নির্বুদ্ধিতার স্মৃতিস্তম্ভ বলে বিবেচিত হবে।

জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, মার্কসবাদ, ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদ প্রভৃতি বিচিত্র মতবাদ অতীতের দেবতাদের স্থান অধিকার করেছে; এবং এই সব বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী মত-বাদ নিয়ে অতীতের বর্বর জাতিদের যুদ্ধের মতই হিংস্র ও নিষ্ঠুর যুদ্ধ চলেছে। এই বিভ্রান্তকারী 'ইজম্' এর বন্যার মধ্যে কোনটি নির্ভুল কে বলবে। সংঘর্ষগুলিকে সম্পূর্ণ ভুল ও সম্পূর্ণ নির্ভুলের সংঘর্ষ বলা কঠিন—বরং সত্য সম্পর্কে দুই বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সংঘর্ষ বলাই ঠিক্, হেগেলের একথার নৈরাশ্য থেকে জন্ম। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতিতে বিচারশীল চিন্তার সংজ্ঞা দেওয়া যেমন প্রায় অসম্ভব কাজ, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ যেসব বিষয় মানুষের উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না সে সব ক্ষেত্রে সেরূপ নয়। কিন্তু মধ্যযুগের অবস্থা সেরূপ ছিল না। তখন ধর্ম ও সংস্কারের শিক্ষাতে মানুষের মন এমন অভিভূত ছিল যে—জ্ঞানের ক্ষেত্রেও নির্ভুল চিন্তা করবার অভ্যাস মানুষ

হারিয়ে বসে ছিল, ফলে পূর্বপুরুষদের চেষ্টাদ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে নির্ভুল মনে করা ছিল রীতি—প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অতি অকিঞ্চিৎকর হওয়া সত্বেও তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু মতামত প্রকাশ করলে, তাকে এ জগতে সমাজের অত্যাচার ও পরজগতে নরকাগ্নির ভয় সহ্য কোরতে হোতো।

১৫ শতকে পশ্চিম ইউরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই বিচারহীন চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করবার মনোভাব প্রচলিত হয়। সাধারণতঃ গ্রীক্ প্রভাবের পুনরাবৃত্তি থেকেই "বিচারশীল চিন্তার" জন্ম-কাল গণনা করা হয়। কিন্তু এছাড়াও অন্যান্য যুক্তি-প্রবণতার যুগ আছে। কিন্তু নানা কারণে রেঁনাশাসকেই প্রধান স্থান দেওয়া হয়। এই রেঁনাশাসের প্রভাব ইউরোপে ৪০০ বৎসর কাজ করেছে। এতে বুদ্ধি ও কৌশলের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হোয়েছে যার ফলে সমস্ত জীবনযাত্রার প্রণালীতে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। প্রথম প্রথম রাজনীতি, সমাজতত্ব ও ধর্মের ক্ষেত্রে রেঁনাশাসের প্রভাব ছিল কম। কিন্তু ক্রমে এসব ক্ষেত্রেও প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে রেঁনাশাসের প্রভাবই জয়লাভ করে। রেঁনাশাসের প্রভাব কত বেশী হোয়েছিল একটি উদাহারণ তা থেকে বোঝা যাবে—ফরাসী বিপ্লবের কালে—ফরাসী জাতি তাদের পুরোণো ধর্মকে বর্জন কোরে তার পরিবর্তে বিচারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে। তারা বোঝেনি যে এ কাজটাই একটা যুক্তিবিরোধী কাজ।

কিন্তু রাজনীতি, সমাজতত্ব, ধর্ম এসব ক্ষেত্রে বিচারশীল চিন্তার প্রসার কমই হোয়েছে, তার ফলে বর্তমান কালে সর্বাপেক্ষা বড় ট্র্যাজেডী—ইউরোপীয় জাতিগুলিদ্বারা অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান জাতিগুলির ঔপনিবেশিক শোষণ এবং বিগত ও বর্তমান মহাযুদ্ধ—দেখা দিয়েছে। মানব-সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে "বিচার প্রবণ চিন্তা"র প্রয়োগ করা কি একেবারে অসম্ভব? দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিহাসের একদর্শী শিক্ষার জন্য বর্তমান যুগের মানসিক অবস্থা এই সকল বিষয় প্রশস্ত দৃষ্টি দিয়ে বিচার করবার পক্ষে অনুপযুক্ত। কিন্তু হয়ত কয়েক শত বৎসর পর কোনো দার্শনিক একালের সংঘর্ষগুলিকে প্রাচীন যুগের সংঘর্ষের মতই যুক্তিহীন মনে করবেন। বিশেষ সুবিধাভোগ করবার জন্য পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতিগুলি গত মহাযুদ্ধে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বর্তমান যুদ্ধকে বিভিন্ন দুই মতবাদের যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু চরম সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে আরম্ভ কোরে, চরম মার্কসবাদ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ পরীক্ষা কোরলে দেখা যাবে কোনটিই সম্পূর্ণ খারাপ নয়, কোনটিই সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নয়। বস্তুতঃ রাশিয়া যেমন চরম মার্কসবাদ থেকে সুরু কোরে দেখ্‌ছে যে ধনতান্ত্রিক দেশদ্বারা পরিবেষ্টিত হোয়ে পুরোণো ব্যবস্থার কিছু কিছু তাকে গ্রহণ করতেই হবে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান দুর্গগুলিও শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্কে বিভিন্ন পরিমাণের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত করবার প্রয়োজন বোধ করেছে।

ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যে যে সকল দেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাদেরও শাসন-কৌশল একই প্রকারের হোয়ে উঠ্ছে এবং কোনো ব্যবস্থার যে সব উপাদানকে অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হোতো কয়েক দশক পরে সেগুলির ও অভাব লক্ষিত হোচ্ছে। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের উপর নাজিবাদ ও ফ্যাসীবাদ গড়ে উঠেছে। জগতের বড় বড় সাধারণতান্ত্রিক দেশগুলি দৃশ্যতঃ এই নীতিকে নিন্দা করে থাকে কিন্তু তাদের বাক্য ও কার্যের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের অধীনে ১৫০ লক্ষ "কালার্ড" জাতি বাস করে। হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভে এদের কয়েকটি মাত্র "জেনিটর" রয়েছে। প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃটিশ সাম্রাজ্য অধিকতর উদার বলে দাবী করা হয়—কিন্তু রোমীয় সাম্রাজ্যের অধীনে সকলেই রোমীয় নাগরিক হবার অধিকার লাভ করতো—বৃটিশ সাম্রাজ্যে এরূপ আইন এখনো বহুদূরে। কাজেই জগতের তথাকথিত উন্নত জাতিগুলি যখন ডিমোক্রেসীর সুবিধা সম্বন্ধে বাক্‌বিস্তার করেন তখন সেগুলি নিজেদের দেশকে লক্ষ্য করেই করেন। এধরণের কথাবার্তা অপেক্ষাকৃত মন্দভাগ্য জন-সংঘের পক্ষে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তকারী। ইতিহাস বার বার এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছে যে যারা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা চালিত হয় কিছু আগে কি পরে এর ফল তারা ভোগ করে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের এই দেশে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পর্যন্ত বিচারশীল মননার অভাব; আর রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা অর্থনীতির ক্ষেত্রে তো কথাই নাই। বর্তমান ভারতবর্ষের নানা বিরুদ্ধ চিন্তাধারার সংঘর্ষকে যদি কেউ দূর থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেন তবে তাঁর পক্ষে এখানকার নানা দল ও সম্প্রদায়কে এভাবে বর্ণনা করা অন্যায় হবে না, যে এই সব দল হলেন অগণিত মাছের ঝাঁকের মতন, জালে আটকা পড়ে প্রত্যেকেই বিপরীত দিকে জালকে টানছেন। অল্প কিছু দিনের জন্য একটা ঐক্যের মনোভাব এখানে দেখা গিয়েছিল, তার কারণ হলো একটা সার্বজনীন অন্যায় ও অবিচারের উপলব্ধি। কিন্তু যে মুহূর্তে এই অন্যায় ও অবিচারের কিছুটা দূর হবার সম্ভাবনা দেখা দিল, অমনি পুরোণো কুসংস্কার ও মানসিক সংকীর্ণতাগুলো আবার ফিরে এসে জাতীয় জীবনের ক্ষতিসাধন করতে শুরু করলো। বলা বাহুল্য এই সব সংস্কারের জন্ম হয় ইতিহাসের ভ্রমাত্মক শিক্ষা থেকে। নিরপেক্ষ ও যথার্থ অনুসন্ধিৎসার মনোবৃত্তি নিয়ে সমস্যাগুলোকে না দেখতে পারলে—এই দুরবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব।

কেউ হয় তো তর্ক তুলবেন যে রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে আলোচনা করা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য রকম; কারণ কংগ্রেসের 'জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির' আলোচনায় যোগ দিয়ে আমরা অন্য-রকমটী দেখেছি। ক্যাপিটালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট, শিল্পপতি ও শিক্ষাব্রতী, সব রকম মতবাদের লোকই

এই কমিটীর সভ্যদের মধ্যে ছিলেন, এমনকি হয়তো যতজন মেম্বার ছিলেন ততটী মতবাদও ছিলো কমিটীতে। বিশেষ বিশেষ বিষয় ও সমস্যার আলোচনার জন্য আলাদা আলাদা ২৯টী সাবকমিটী গঠিত হয়েছিল। এই সব সাবকমিটীর সভ্যদের মধ্যে সব রকমের বিভিন্ন ও বিরোধী মতই ছিলো। আর বিষয়গুলোও সব এমন ছিলো যা নিয়ে তুমুল তর্ক বাঁধবার খুবই সম্ভাবনা ছিল, যথা যন্ত্রশিল্প, কিষাণ-মজুর, ব্যাঙ্ক ও কারেন্সী, শিল্প-নীতি ইত্যাদি। তবু পরিকল্পনা কমিটী ও সাব-কমিটীগুলির সকল মেম্বারেরই এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, নিরপেক্ষ ভাবে সকল বিষয়ের সবগুলো সমস্যাকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হলে, দেখা গেল সকলের মনেই একই ধরণের সমাধান উপস্থিত হয়েছে: আর খুব তর্ক-বহুল বিষয়েও প্রভূততম মতের ঐক্য উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কাজেই রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা গুলোর সম্বন্ধে বিচারশীল মননার নীতি প্রয়োগ অসম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু আজকালকার রাজনৈতিক নেতারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমস্যার বিবেচনা করবেন, এমন মানসিক গঠনই তাদের নেই। এ কাজের জন্য গড়ে তুলতে হবে একেবারে নতুন ধরণের মনকে। অবশ্য রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা গুলির বৈজ্ঞানিক সমাধান পাওয়া গেলেও বিনা বিরোধে ও বিনা সংগ্রামে তাদের কাজে প্রয়োগ করা যাবে কিনা সেটা বিবেচনার বিষয়।

পলিবিয়াস্ (Polybius) নামে একজন গ্রীক ঐতিহাসিক কয়েক বছর বন্দী হয়ে রোমে ছিলেন এবং এই সূত্রে বড় বড় রোমানদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর মনে এই প্রশ্ন জাগলো; রাজনীতিতে গ্রীকরা কেন সফল হতে পারলো না, অথচ তাদেরই কাছে শিক্ষা পেলো যে রোমান জাত এবং যে জাত সামান্য মাত্রও মৌলিকতা দাবী করতে পারে না, তারাই বা কেন জগতে হলো সব রকমে সার্থক ও সফল? তাঁর মনে হলো, এর এক মাত্র কারণ এই হতে পারে যে রোমানদের শাসনপদ্ধতিতে রাজতান্ত্রিক (monarchical), সম্ভ্রান্ততান্ত্রিক (aristocratic) ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সুন্দর সামঞ্জস্য ও মিলন ঘটেছিল। অর্থাৎ গ্রীকরা তাদের শাসন-পদ্ধতি গঠন করেছে নিছক অবাস্তব বুদ্ধিশীলতার সাহায্যে, কিন্তু রোমান জাতি তাদের রাষ্ট্রকে গড়ে তুলেছে দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম ও সংঘর্ষে, সঞ্চিতঅভিজ্ঞতার সাহায্যে। তাদের এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কোন একজন লোকের নয়, বহুজনের সৃষ্টি; এর নিখুঁত পরিণতি ঘটেছে এক জীবনের চেষ্টায় নয়, বহু পুরুষের এবং অনেক যুগের সাধনার ফলে। বর্তমান বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে যুগোপযোগী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থ-নৈতিক সমাজ পদ্ধতি গড়ে উঠতে পারে যদি সমস্যাগুলোর সমাধান করবার চেষ্টা করা হয় নিরপেক্ষ ও বাস্তব বুদ্ধির সাহায্যে এবং যদি ইতিহাসের যথার্থ শিক্ষাকে স্মরণ রেখে তার অভিজ্ঞতাকে সমগ্র সমাজের কল্যাণে নিয়োগ করা হয়।

'Science and Culture' পত্রিকায় প্রকাশিত ডাঃ মেঘনাদ সাহার বক্তৃতা হইতে—জঃ শ্রঃ

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের তিনটি স্তম্ভ

পুলকেশ দে সরকার

ইতিহাস এবং খবরের কাগজ যাঁরা পড়ে থাকেন তাদের মাথায় ঘুরে ফিরে এই প্রশ্নটা আসে আচ্ছা, ভারতের কি হবে?

প্রশ্নটায় অনেক গুলো কথা জড়িত আছে। নেহাৎ সংকীর্ণ মুহূর্ত ছাড়া স্রেফ ঢিলে প্রশ্ন করতেও, ভারতের অন্য প্রদেশের কথা জানিনে, বাঙালী প্রশ্ন কর্তা "ভারতের" কথাই ভাবেন। এ শিক্ষা বা সংস্কার তাঁর মোটেই নূতন নয়; ইংরেজ রাজত্বের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর মগজে এই ভারতের মানচিত্রও সেই অনুপাতে অংকিত হয়েছে; বাঙালী অনুপ্রেরণা পেয়েছে শিবাজী থেকে, পৃথ্বীরাজ থেকে আর রাজপুতনার ইতিহাস থেকে। তা'ছাড়া দেবদেবতার যত কাণ্ডমাণ্ড সবই পশ্চিমের অর্থাৎ অযোধ্যা থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত। ব্যাপক ইতিহাস উপেক্ষা করলেও আধুনিক রাজনীতিতেও এ সংস্কার তার ইংরেজ রাজত্বের প্রায় সমসাময়িক। এর নিদর্শন তার সাহিত্যে।

তারপর ভারতের কি হবে? এ প্রশ্নে একথাই নিহিত আছে যে, ভারতের কিছু হওয়া দরকার। অর্থাৎ, প্রশ্নকালে ভারতের পরাধীনতা তাঁর মাথায় চাড়া দিয়ে ওঠে; তাইতে দীর্ঘশ্বাসের বদলে এই নৈরাশ্য-কোটেড্-আশার কথাটা পেড়ে বসেন।

কেন পাড়েন?

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধে হারতে হারতেও রুশিয়া যখন মরণপণ প্রতিরোধ করতে থাকে তখনও প্রশ্ন জাগে; আবার ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও যখন জার্মাণেরা এগোতে থাকে তখনও এই একই প্রশ্ন জাগে। এই শৌর্যের উত্তেজনা প্রশ্নকর্তার রক্তে ছড়িয়ে পড়ে। জার্মাণী একের পর অপর দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে—আশ্চর্য এই, তখনও এই বিস্ময়কর প্রশ্ন জাগে। রয়টার যখন বলে, জার্মাণ পদানত চেকোশ্লোভাকিয়ায় নির্মম পীড়ন নীতি চলছে, কিন্তু চেকদেশপ্রেমিকরা বধ্যভূমিকেই তীর্থভূমি করে তুলছে, তখন এই স্তিমিত স্তব্ধ নির্জীব ভারতের দিকে চোখ পড়েই, আর সেই অতলস্পর্শী প্রশ্ন জাগে। কোথাও হয়তো একটা অতি সাধারণ কু'দেতা হয় এবং—ধরুন না কেন, এই সেদিনকার কিউবা অথবা গতকালের পানামার কু'দেতা—তাতেই মনে এই চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন জাগে। লাভ ক্ষতির কোন বিবেচনাই যেন সেখানে নেই। চেম্বারলেন-চার্চিল যখন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার কথা তোলেন তখনও একবার গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করি—আমরা? আমাদের? লজ্জার বালাই না রেখে তারা যখন বলেন, না—না—তোমরা কি? তখনও আমরা লজ্জার মাথা খেয়ে

ঐ প্রশ্নটাই জপ্তে থাকি। অপমানাহত হয়েও যখন শুনি রুজভেল্ট-চার্চিল কি একটা ঘোষণা করেছেন, তখন ফের এই প্রশ্ন তুলি।

পরাধীনতা রোগের এ যেন ডিলিরিয়াম। বল্‌তে লজ্জা নেই, চীনেরা যখন জাপানীদের অগ্রগতিকে বাধা দেয়, তখন আমরা খুসী হই বটে কিন্তু আরও খুসী হই যখন শুনি জাপানীরা ইংরেজের গালে চড় মেরেছে; ভাবি, কোথায় যেন জিতে গেলাম। যখন ইউরোপে যুদ্ধ লাগে তখন আত্মতুষ্টির একটা ভঙ্গী করে বলি—এইবার! নাৎসী জার্মাণী অপর দেশকে পদানত করছে শুনেও, যে ইংরেজ আমাদের পদানত করে ক্রমাগত আমেরির নির্বোধ বুলির ঝড়ে আমাদের উত্যক্ত করে তুলছে, তাকে কেউ আঘাত করছে জান্‌লে আমাদের মনে হাল্কা নির্বুদ্ধিতার ছোঁয়াচ না লেগেই পারে না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়ে উলুখাগড়ার যে কি হবে তা সবিশেষ জানা সত্ত্বেও এ অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া আমাদের মনে কোথা থেকে একটা তৃপ্তি জাগিয়ে তোলে। ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছে তাতেই আমরা দর্শকের গ্যালারিতে বসে হাততালি দিচ্ছি। শুধু ঐ ডিলিরিয়ামের গাম্ভীর্যটা এলে চির পুরাতন প্রশ্নটা করি: আচ্ছা, ভারতে কি হবে?

চীন জিত্‌লেও আমরা স্বাধীন হব না—রুজভেল্ট-আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করলেও আমরা স্বাধীন হব না—ইংরেজ বা জার্মাণ জিত্‌লে তো হবই না। তবুও এই প্রশ্ন কেন?

এজন্য দায়ী পুঁথিবদ্ধ ইতিহাস ও দৈনন্দিন ইতিহাস বা সংবাদ পত্র।

ধরুন, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম (যার তারিফ আজ ইংরেজরাই করে এবং তৎকালীন যে বিদ্রোহীদের কাছে ইংরেজেরাই ভিক্ষাপ্রার্থী ও যাদের কলকোলাহলে স্তব করে); স্বল্পসংখ্যক প্রায়-নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসৈন্য—গাদাবন্দুকের যুদ্ধ। থার্মোপলি থেকে ফরাসী বিপ্লব, ম্যাট্‌সিনি থেকে লেনিন। রুশবিপ্লবের দীর্ঘ কুটিল ইতিহাস।

প্রশ্ন না জেগে উপায় কি?

কেবল এই জন্যই কি জাগে?

জাগে, বিদেশী নিপীড়িতদের আহত অভিমানের সঙ্ঘবদ্ধ গোপন ষড়যন্ত্র ও আকস্মিক অগ্ন্যুদ্‌গারের সাফল্যে নিজেদের সাফল্য স্বপ্নরচনায়। মনে হয় এই তো পথ! যে শাসনের নাম নির্যাতন, যে বিদেশী নিষ্করুণ শোষণের নাম দুর্ভিক্ষ সেখানে তো বিসুবিয়াসের সৃষ্টি অনিবার্য। এই চাপা অসন্তোষই বিদ্রোহের বীজ।

তবে আর ভাবনা কি? যে শাসনে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ জন্মায় সে শাসনই তো সিডিসান—বিদ্রোহাত্মক। ওদের ঐ ১২৪-ক ধারাটা তো মিস্‌নোমার যদি না ওটা ওদের ওপরেই প্রযুক্ত হয়।

আমাদের ঐ স্বপ্ন এই মতবাদের ওপরই রচিত হয়। আমরা টেবিল চাপ্‌ড়ে বলি, ভাবনা কিরে, কিসের ভয়, এই অসন্তোষ-বিদ্বেষই হবে আমাদের নেতা, নেবে মুক্তির তোরণদ্বারে।

ধরে'নি, এই অসন্তোষই যখন বিদ্রোহ-কাম্-মুক্তির প্রসূতি তখন যেহেতু ভারতে বিদেশী শাসন জনিত অসন্তোষ আছে সেই হেতু মুক্তির আলোক ও দেখা যাবে।

আর চাই স্বার্থত্যাগ। দুর্ভিক্ষের মধ্যেও ভোগের প্রশ্ন যেন কোন সূত্রে মগজে প্রশ্রয় না পায়। অতি কষ্টেও আমরা তা মেনে নিয়েছি। যেদেশে অহিংসা মন্ত্র ধর্মের মত লোকে গ্রহণ করে, পুলিশের মৃদু লাঠি চালনায় পিঠের হাড় ভাঙ্‌লে হিংসার টু শব্দটি পর্যন্ত করে না, পিনালকোড ও পুলিশকে সেলাম জানিয়ে সুশৃঙ্খল মিছিলে জেলে যায়, দেহকে নিরাবরণ ও কাপড়কে হাঁটু ছাড়িয়ে বহু ঊর্ধে তুলতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করে না, নেতার নির্দেশে ঘাসের মধ্যে ভাইটামিন খোঁজে সেদেশে স্বার্থত্যাগের চরম ও চূড়ান্ত হয়েছে—তবুও ভারত যে তিমিরে সে তিমিরে। কেন ?

অসন্তোষ আর স্বার্থত্যাগ দুই বলদকে জুড়ে দিয়েও গাড়ী চালান গেল না কেন ?

এমনও নয় যে, এরা ভয়ে অহিংস হয়েছে। এরা নিরস্ত্র হয়ে মরতে জানে ; এরা হাস্‌তে হাস্‌তে ফাঁসীতে যেতে পারে ; এরা ভক্তির চোটে 'জয় জনবুল' বলে সৈন্যদলে যোগ দিতে পারে, আফ্রিকার মরু কান্তারে প্রাণ দিতে পারে (যত্রতত্র নির্ভয় নিঃসংকোচে গোয়েন্দাগিরিও করতে পারে), হিন্দু মুসলমান মারামারি একে অপরের লহুপানের জন্য উন্মত্তও হতে পারে। মরতে বা সইতে এরা ভয় পায় না।

এরা নিয়ম-শৃঙ্খল মানে না এ দুর্ণামও কেউ দেবে না। একলক্ষ অহিংস সৈন্যের কেউ হিংস তো হয়ই নি ; এত বড় যে আইন অমান্যের আন্দোলন তাতেও কোথাও এতটুকু আইন অমান্য করেনি ; নেতার নির্দেশে বিবেকদষ্ট হত্যাকারীর মত পুলিশের কাছে স্বীয় অপরাধের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং জেলে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে মাথা কুটেছে। জেলারকে কোনদিন এই সুবোধ "অপরাধীদের" নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি।

গান্ধীজী এই নূতন শাস্ত্র শিখিয়েছেন। বাস্তবিক অভক্তির নামে কত ভক্তি (মানে রাজ ভক্তি) গান্ধীজী আমাদের শিখিয়েছেন তা অবশ্য আমরা আজও উপলব্ধি করিনি, কিন্তু আমেরির মত দু'একজন নির্বোধ (বোধহীন) রাজকর্মচারী ছাড়া বৃটীশ কূটনীতিকদের বুঝ্‌তে বেশী দেরী হয়নি। তাঁরা জানেন, ভারতে বৃটীশ অস্তিত্বের মস্ত বড় স্তম্ভ হচ্ছেন গান্ধীজী এবং গান্ধীবাদ। এই গান্ধীবাদ নইলে অসন্তোষটা হয়তো ভারতের জীবনে সত্য উঠ্‌তে হ'য়ে পার্‌ত। গান্ধীজীর সূক্ষ্ম অবোধ্য সেফ্‌টি ভাল্‌ভের ভেতর দিয়ে তা মিথ্যে হ'য়ে গেছে। সেকথা গান্ধীজীও জানেন, বৃটীশ কূটনীতিকেরাও জানেন।

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের তিনস্তম্ভের তিনি অন্যতম। আর দু'জন হ'চ্ছেন মুসলিম লীগ নেতা মিঃ জিন্না এবং হিন্দুমহাসভাপতি বীর সাভারকর। এই ত্রয়ীর লক্ষ্য বস্তুনিরপেক্ষভাবে এক, সামান্য কিছু দৃশ্যতঃ পথের গড়মিল আছে। কিন্তু সে গড়মিল সম্পূর্ণ দৃশ্যতঃ এর বেশী নয়।

গান্ধীজীর সবচাইতে বড় চাল বাজি হচ্ছে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। বিশেষণগুলো দ্রষ্টব্য। রাজশক্তির সঙ্গে অসহযোগ সে বড় সহজ কথা নয় এবং ঠিক এই বৃহতের মোহেই হয়তো যাদের সত্যি সত্যিই কিছু বিপ্লবী মনোভাব ছিল তারাও ঝুঁকে পড়্‌ল। ধরে নেওয়া হল, শতকরা এক'শ জন ভারতীয় যদি (অহিংস) অসহযোগ করে তবে একদিকে ইংরেজ রাজত্ব তাসের ঘরের মত পড়ে যাবে আর একদিকে সংজ্ঞাহীন স্বরাজের মোয়াটি (ভারতীয়দের) হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ব্যস তাতেই কেল্লা ফতে। কিন্তু সাবধান, পিনাল কোডে যেমনটি লেখা আছে তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলো। পুলিশ ধর্‌লে বিবাদ করো না, জেল দিলে আপত্তি করো না, মারলে চুপটি করে থেকো। এই বলে গান্ধীজী আন্দোলনের ঘুড়িটি দিলেন উড়িয়ে নাটাইটি রাখ্‌লেন হাতে। ভারতের অসন্তুষ্ট গণেশ শিক্ষিতদের দেউলে দেউলে চরকার সূতোয় বাধা পড়লেন। সূতোয় কোথায় একটু কড়া পাক পড়্‌তেই গান্ধীজী নাটাই গুটোলেন। ততদিনে সমস্ত মন্থিত শক্তি গান্ধীজীর সূক্ষ্ম মাকড়সার জালে ধরা পড়েছে। শাসকশক্তির কঠিন কাজ নিজেই সমাধা করলেন। ধূমায়িত বহ্নি জ্বলে উঠে ছাই হ'য়ে গেল।

কিন্তু অসন্তোষের কারণ যায়নি। তাই দলিতা ফনিনী আবার যখন যখন উঠ্‌তে চাইল, গান্ধীজী আস্থা অর্জনের জন্য আগেকার অপকীর্তিকে হিমালয় প্রমাণ ভুল বলে আরও মহিমাময় করে তুল্‌লেন। আবার বিপ্লবীশক্তি সংহত হ'ল। বলেছি গান্ধীজীর আন্দোলনের মূলসূত্র পিনাল কোডের প্রতি একনিষ্ঠ-ভক্তি। বিদ্বেষ-অসন্তোষ ছড়ানো চল্‌বেনা, তা'হলে অহিংস হওয়া দায়। হ'ল ১২৪ ক ধারার ব্যবস্থা। সত্যাগ্রহী ধরা দেবে, সাজা নেবে। পালাবে না; মার খাবে, মারবে না। রাজকর্মচারীদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানাবে। সংক্ষেপে: পুলিশ এবং আইনের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা রেখে অহিংসভাবে যা হয় কর।

কথাটা বড়লাট ও বল্‌তে পার্‌তেন। কিন্তু তিনি বল্‌লে অসন্তুষ্ট শ্রেণীটা সন্দেহের চোখে দেখ্‌বেই এবং সংজ্ঞাহীন স্বরাজের পতাকাতলে সমবেত হয়ে বিচারের হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দেবে না। সেকাজ গান্ধীজীর।

গান্ধীজীর সঙ্গে সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর তফাৎ এই যে শেষোক্ত স্পষ্ট এবং ভক্তির নামেই ভক্তি প্রকাশ করেন এবং পূর্বোক্ত অস্পষ্ট এবং অভক্তির নামে ভক্তি চালান ও তাতে ক'রে অভক্তদের সমাবেশে তাদের সর্বনাশ ক'রে ছাড়েন। জনগণ যাতে না জাগে সে জন্য গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষ থেকে সতর্ক পাহারা দেন; জনগণ যাতে বিচ্ছিন্ন হয় সেজন্য তিনি নির্দোষ আত্মকেন্দ্রিক চরকা হাতে তুলে দেন। ইংরেজ যখন আক্রান্ত হয়, অন্যত্র যখন বিব্রত থাকেন, তখন গান্ধীজী স্বয়ং অসন্তুষ্ট ভারতকে চেপে রাখেন, "শান্তি"র সময় অ-বিব্রত ইংরেজের দরবারে অসন্তুষ্টদের নিয়ে মিছিল করেন এবং সত্যাগ্রহীরা চিহ্নিত হ'য়ে যায়। পিনাল কোডের রক্তচন্দন তো পড়্‌ছেই।

অহিংস গান্ধীজী এদিকে হাত গুটিয়ে নিলেও সহিংস যুদ্ধরত সৈন্যদের কম্বল সরবরাহে অকুণ্ঠ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকেন। গান্ধীজীর শত্রু কেউ নেই, অতএব গান্ধী ভারতেরও নেই; তা নইলে হয়তো বা রুশ-জার্মাণেরা পরস্পরের শত্রু হিসেবে যে আচরণ কর্‌ছে, ভারত হিংস না হ'য়েও সেই শত্রুতাচরণ কর্‌তে পার্‌ত। কিন্তু গান্ধীজী তার পক্ষপাতী নন—অতএব গান্ধী ভারত ও নয়। সেই গান্ধী ভারত বা কংগ্রেস আজ ইচ্ছা-সুপ্ত।

গান্ধীজী এভাবে ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে আত্মস্থ ক'রে মোহগ্রস্ত ভারতের নাকের ডগা দিয়ে তাকে ভক্তির খাতে বইয়ে দিয়েছেন। আজ তিনি সার্থক। ইংরেজ রাজত্বের জয় হোক্।

কংগ্রেস খেলাফত সহযোগিতার দিনে যে ঐক্য ও সুপ্তশক্তি বিদেশী শাসনকে চিন্তাকুল ক'রে তুলেছিল সেই বেদনাকে মুক্তি দিলেন মিঃ জিন্না; কংগ্রেসের মধ্যে কীলকের মত ঢুকে বেরিয়ে যখন এলেন তখন ভারতের জনশক্তি দ্বিধাবিভক্ত। বৃটীশ কূটনীতিকেরা একস্তম্ভ নিরাপদ মনে না করে এই স্তম্ভের পেছনে শক্তিব্যয় কর্‌লেন। অকস্মাৎ ভারতীয় মুসলমানেরা জান্‌তে পারল, তারা বিদেশী এবং অপর ভারতীয় অ-মুসলমানের সঙ্গে তারা সমস্বার্থ সম্পন্ন নয়। অখণ্ড জনশক্তির উত্তাল চাঞ্চল্যকে একহাতে ধ'রে রাখার দায় থেকে গান্ধীজী রেহাই পেলেন—জনশক্তি হিন্দু ও মুসলমান নামক দুই দ্বন্দমান শিবিরে দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল।

গান্ধীজী রাজনীতিকে ধর্ম্মের পর্যায়ে ফেললেন, মিঃ জিন্না সেই ধর্ম্মকে সম্প্রদায়ের পর্যায়ে আনলেন। রাজনীতি সাম্প্রদায়িক নীতিতে পর্যবসিত হ'ল। ঠিক এইখানেই বীর সাভারকর দেখা দিলেন। গান্ধীজী অহিংস না হ'লে কাউকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন না; সাভারকর জিন্নাজীর হুবহু পাল্টা জবাব দেন।

আবার একটা ভেদ দেখা দিল। যাঁরা জাতীয়তাবাদী এবং অহিংস সত্যাগ্রহী তাঁরা গান্ধী শিবিরে গেলেন কিন্তু যারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে বড় ক'রে দেখেন তাঁরা সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত হ'লেন।

এঁরা কেউই গণ-আন্দোলনের পক্ষপাতী নন; উপরন্তু গণ-আন্দোলন ভয় পান। গান্ধীজী বলেন, "I dread mass movement." এরূপ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে; গণ-আন্দোলনকে ব্যর্থ ক'রে দেবার জন্যই তিনি দু'বার জনগণকে আহ্বান করেছেন। জিন্নাজীর কখনও গণ-আহ্বানের প্রয়োজন ঘটেনি—ধর্ম্মের নামে প্ররোচনা দেওয়া ছাড়া। রাজনীতিতে তিনি গণ-আন্দোলন করতে চান না; তাদের সকল উৎসাহ ধর্ম্মের খাতেই বইয়ে দেন—মানে সম্প্রদায়ের খাতে। বীর সাভারকর মহাসভার সভাপতিরূপে যে কর্ম্মসূচী দেন তা স্বস্তিকা মার্কা। পরম কৌতুকের বিষয় এই, এঁরা জনগণের নামে কথা বলেন, তার কারণ আপন আপন সঙ্ঘবদ্ধ ক্ষমতার অনুপাতে এঁরা জনগণকে ঠুঁটো ক'রে রেখেছেন। জাতীয় আন্দোলনের কণ্ঠ এঁরা তিনজনে সজোরে টিপে ধ'রে আছেন।

গান্ধীজী যুদ্ধে যোগদান ক'রতে চান না—কিন্তু যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তাদের বাধা দিতে চান না। ক্ষীণ আপত্তি কেবল সেইখানে যেখানে জবরদস্তি ক'রে টাকা আদায় হয় এবং সেই আপত্তির আবেদন তাদের দরবারেই পৌছায় যারা এই আপত্তির কারণ। সহিংস যুদ্ধে সৈন্যদের কম্বল সরবরাহে গান্ধীজী কোন আপত্তি দেখ্‌তে পান না। যুদ্ধ বিরোধী আপত্তি সাধারণে ক'রবে না,

ক'রবে বাছাইকরা সৈন্যেরা—সাধারণের ওপর যদি জুলুম না হয় তবে তারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে সাহায্য বা যোগ দেবে। পুলিশ বা শাসন কর্তৃপক্ষ বিব্রত না হয় এজন্য গান্ধীজীর উৎকণ্ঠার অবধি নেই।

জিন্নাজী সম্প্রদায়ের গণ্ডী থেকে এই একই নীতি অনুসরণ করেছেন। লীগের গণ্ডীতে থেকে লীগের নির্দেশে লীগের পরিকল্পনায় যে পাকা ব্যবস্থা তার ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই কেবল সহযোগিতা হবে; তবে ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত মর্যাদা অনুযায়ী সহযোগিতায় কোন বাধা নেই।

সাভারকর পরিত্রাহি হিন্দুকে যুদ্ধে যোগ দিতে বল্‌ছেন।

অর্থাৎ যে জাতীয় গণ-আন্দোলনকে আইনের অছিলায় ইংরেজদের দমন করতে হ'ত ভারতীয় আন্দোলনের এই ত্রিস্তম্ভ নানা অছিলায় সেই কাজটিই নির্বিচারে ও নির্বিকারে ক'রে যাচ্ছেন।

ভারতের এই "বিধিলিপি" সম্পর্কে আশা করি, প্রশ্নকর্তার এর পর আর কোন বক্তব্য থাক্‌বে না।

দশ বছর অন্তর চার্চিল *

"ভারতবর্ষ আমাদের সকল ব্যাপারে এবং আলোচনায় শুধু অংশীদার নয়, শক্তিশালী অংশীদার হিসাবে ক্রমেই স্থান কোরে নিচ্ছে। ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধে ভারতের দান যে কত বেশী তা আমরা জানি।" * * *

"আমরা ভারতের কাছে গভীর ঋণে আবদ্ধ এবং আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে সেদিনের অপেক্ষা কর্‌ছিলাম যখন ভারত সরকার ও ভারতের জনগন সম্পূর্ণভাবে তাদের ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ পাবে।"

চার্চিল—১৯২১

দশবছর পর—বলেন তিনি উপরোক্তক্ষেত্রে ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ শব্দটী কেবলমাত্র ব্যবহারিক অর্থে বলেছিলেন এবং জয়েন্ট-সিলেক্ট কমিটিকেও বলেন যে তিনি কেবলমাত্র একটী উৎসব উপলক্ষ্যে 'শুন্‌তে ভাল এরূপ একটী বক্তৃতা দিয়েছিলেন রাজনীতিকদের যা অনেক সময়েই করতে হয়।'

চার্চিল—১৯৩১

"ভারতের প্রতি আটলান্টিক চুক্তিপত্র প্রযোজ্য নয়"

চার্চিল—সেপ্টেম্বর ১৯৪১

"কেবিনেটের কোনো সভা, মানুষের গননার মধ্যে আনা যায় এরূপ কোনো সময়ের মধ্যে ভারতের ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার কথা বলা দূরে থাক্ ইঙ্গিত করার কথা ভাব্‌তেও পারেন না। *

—যথার্থ চার্চিল

* ৮ই অক্টোবরের হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড হইতে গৃহীত।

বাস্তার রাজ্যে দশহরা

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রায়ই শুনিতে পাই, অনুন্নত সমাজ উন্নত সমাজের সহিত সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। সভ্য সমাজ অসভ্য সমাজের সুবিধা অসুবিধা নিজেদের স্বার্থের দিক দিয়েই চিরকাল বিচার করে এসেছে, তাই অসভ্য বা অর্ধসভ্য সমাজ সভ্যতার আলোক হতে বঞ্চিত রয়েছে—বা সভ্য সমাজের সুবিধায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সমাজ একে অন্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা করতে পারে না, পারবেও না, তাই হিন্দু তার সভ্যতা ও কৃষ্টি বজায় রাখতে, হিন্দুরাজ্য স্থাপন করবে। মুসলমান পাকিস্থানে তার বৈশিষ্ট দৃঢ় করবে। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের আজ কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র রক্ষা করাই প্রয়োজন যে তা নয়, সামাজিক বৈশিষ্ট ও তেমনি প্রয়োজনীয়, তাই দেখতে পাই গ্রামে গ্রামে আজ নমঃশূদ্র বা তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভদ্রলোকদের সহিত একরকম অসহযোগ আরম্ভ করেছে, যার ফলে, তপশীলভুক্ত 'জাতির' পত্তন হয়েছে। শ্রেণী বিভাগ ও সমাজভেদের জন্য ভারতবর্ষ বহু অসুবিধা ভোগ করেছে, আজ 'জাতি' ভেদের জন্য, আরও কত লাঞ্ছনা পাবে, তার কল্পনাও ভয়াবহ। কিন্তু, এই জাতি ভেদের ভিত্তি এত কায়েমী করে গড়ার কি কোনও প্রয়োজন রয়েছে? এর উত্তর বাস্তার রাজ্যের দশহরার বিবরণ হতে পাওয়া যাবে। কী করে একটী হিন্দু উন্নত সম্প্রদায়, অসভ্য, বন্য জাতিদের নিজেদের কৃষ্টির আবেষ্টনীতে দৃঢ় করে বেঁধেছে, কেমন করে অসভ্য সমাজ সভ্য সমাজের গণ্ডীর ভিতর এসে, সভ্য সমাজের রীতিনীতি ধর্ম-কর্ম নিজেদের বলে গ্রহণ করেছে, সভ্য সমাজই কী করে অসভ্য আচার ব্যবহার নিজেদের কৃষ্টির অঙ্গীভূত করেছে—তা এই দশহরা উৎসব হতে প্রমাণিত হবে।

মধ্যপ্রদেশে বাস্তার সব চেয়ে বড় করদ রাজ্য। ১৮৬৩ খৃঃ অঃ ক্যাপ্টেন হেকটব মেকেঞ্জির রিপোর্ট হতে দেখা যায়, পূর্বে 'বাস্তার রাজ্য' আরও বিস্তৃত ছিল। উত্তর-দক্ষিণে ২৩৫ মাইল ও পূর্ব-পশ্চিমে ১৮২ মাইল। সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার হিসাব মতে এর বিস্তৃতি ১৩,৭২৫ বর্গ মাইল মাত্র। বাস্তারের উত্তরে কাঁকড় রাজ্য ও রায়পুর জেলা, পূর্বে ভিজগাপত্তম জেলার জয়পুর জমিদারী, পশ্চিমে চান্দা জেলা ও হাইদ্রাবাদ রাজ্য এবং খরস্রোতা গোদাবরী নদী দক্ষিণ প্রান্তদেশ বেষ্টন করে চলেছে। রাজ্যের বেশীর ভাগই বিস্তৃত বনভূমিতে পরিপূর্ণ। রাজ্যের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পর্বতাকীর্ণ, মধ্যভাগে স্থানে স্থানে উচ্চ নীচ পাহাড় এবং নীচে মালভূমি। পূর্বভাগে সুন্দর সবুজ মাঠ, মালভূমির দক্ষিণে ইন্দ্রাবতী নদীর তীরে বাস্তারের রাজধানী জগদলপুর।

বাস্তারের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে আবুজমার পর্বতশ্রেণী চলেছে, এই পর্বতে বাস্তারের সব চাইতে অসভ্য, আদিম অধিবাসী 'মার'দের বসতি। 'মার' বা 'মারিয়া'রা তথাকথিত গন্দ জাতির বংশধর, এখনও 'গন্দাল' ভাষায় কথা বলে, এবং গন্দদের প্রায় সব রকম আচার ব্যবহারই তারা মেনে চল। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, গন্দরা মেডিটেরেনিয়ান (Mediterranean) জাতির বংশধর, কিন্তু কোল, ভীল, সাঁওতাল ও অন্যান্য অষ্ট্রালিয়ড (Australoid) জাতির সহিত মিশে এক নূতন 'বংশ-জাতির' পত্তন করেছে। গন্দ জাতির অন্যান্য শাখা, যথা মুরিয়া, ডাণ্ডামি মারিয়া, ধ্রুব, ভাতরা, ঝোরিয়া-মুরিয়া এবং আরও ছোটখাট অনেক উপজাতি, অতি প্রাচীনকাল হতেই বাস্তারে বসতি করছে। উহাদের জীবন যাপনের বিধি-নিয়ম—এখনও হিন্দুদের মত হয় নাই সত্য—কিন্তু ক্রমে ক্রমেই উহারা হিন্দুর যাগ-যজ্ঞ, হিন্দুর প্রথা, আচার-ব্যবহার, হিন্দুর পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি গ্রহণ করছে ফলে ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে গন্দদের যে বৈশিষ্ট এখনও আছে তাও লোপ পাবে বলে মনে হয়।

বাস্তারের রাজবংশ রাজ কুলোদ্ভব। কিম্বদন্তি আছে, যে রাজা অনম দেও, যিনি বর্তমান বাস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম ওআরাঙ্গালে (Warangli) ছিলেন। রাজা অনম দেও ধর্মপরায়ণ এবং পূজা পার্বনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। জনৈক পরাক্রান্ত মুসলমান নরপতি জানতে পারলেন, যে অনমদেওর নিকট একটি পরশ পাথর আছে যা, যে কোনও ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারে। ঐ পরশ পাথরের জন্য রাজা অনমদেওর রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা অনম দেও যখন কি করা কর্তব্য ঠিক করতে পারছিলেন না, তখন দেবী 'ধান্তেশ্বরী', রাজার কুল দেবী, স্বপ্নে রাজার নিকট প্রস্তাব করেন যে অমন দেও যেন শীঘ্র ওয়ারাঙ্গাল পরিত্যাগ করেন। রাজা স্বপ্নে দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করাতে দেবী সাহায্য দানে প্রতিশ্রুতা হন এবং জানান, যে রাজা যখন রাজত্ব পরিত্যাগ করে যাবেন, তিনি পেছনে পেছনে যাবেন এবং তাঁর পায়ের নুপুরের শব্দ যেখানে থামবে রাজা যেন সেখানে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু, রাজা বা তার অনুচরেরা পেছনে তাকাবেন না যদি তাকান তবে নুপুরের শব্দ থামবে এবং রাজার গতিরোধ হবে। রাজার সহিত, রাজগুরু, কতিপয় সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় পরিবার ও রাজার একদল শরীররক্ষী হালবা (Halba) সেনাদল ভিন্ন আর কেহ আসে নাই। ধান্তেশ্বরী দেবীর তলোয়ারখানা রাজা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। রাস্তা চলতে চলতে রাজা ও তাঁর সঙ্গীরা পাইরি নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। নদীতে জল খুবই অল্প ছিল, রাজা নদী পার হচ্ছেন এমন সময় নুপুরের শব্দ অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর লাগল, রাজা দেবীর আদেশ ভুলে, শব্দ অনুসরণ করে পেছনে তাকালেন। নুপুরের শব্দ বন্ধ হল রাজা অত্যন্ত অনুতাপের সহিত, পাইরি নদীর অপর তীরে রাজ্য স্থাপন করলেন। এই পাইরি নদী আজ কাঁকড় ও বাস্তার দুই রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করে। এখনও ধান্তেশ্বরীর মন্দিরে বাস্তার রাজের আদেশে দেবীর তলোয়ার নিত্য মন্দিরে পূজা হয়।

পূর্বেই বলেছি বাস্তার গন্দদের দেশ এবং মারিয়ারাই সব চেয়ে প্রাচীন অধিবাসী। যারা এখনও আবুজমারে বাস করে তারা বাস্তবিকই অসভ্য জীবন যাপন করে, কিন্তু যারা সমতল ভূমিতে বসবাস আরম্ভ করছে, তারা কৃষি কাজ করে এবং অনেক বিষয়েই তারা অন্যান্য কৃষিজীবিদের মত জীবন আরম্ভ করেছে। কেবল আবুজমারের মারিয়া ভিন্ন আর সবাই নিজেদের দেব-দেবীর সহিত, হিন্দুর দেব দেবীর পূজা ও হিন্দু তিথি ও উৎসব নিজেদের বলে মনে করে, এবং প্রত্যেক গন্দ গোত্রজাতিই আজ বাস্তারের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দশহরাতে যোগ দেয়। এই উৎসব দীর্ঘ এক পক্ষকাল ধরে চলে এবং সমগ্র বাস্তারবাসী এই উৎসবের জন্য পথ চেয়ে থাকে।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিকেয় অমাবস্যায় অপরাহ্নে জগদলপুরবাসী ও নিকটবর্তী স্থান হতে আগত প্রজাপুঞ্জ রাজপ্রাসাদের দ্বারে সমবেত হয়। তন্মধ্যে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ও থাকে। মাহারারা বাস্তারের অস্পৃশ্য সম্প্রদায় কিন্তু বাস্তারের অধিবাসীরা মাহারাদের তাঁতে তৈরী কাপড় পরিধান করে। এখনও বাস্তারে মিলের কাপড়ের কাটতি খুব বেশী নাই—সাধারণ লোকে এখনও মোটা তাঁতের কাপড় পরে, দূর গ্রামে এবং পাহাড়তলীতে পরিধান বস্ত্রের আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে সকলে একমত নয়, তাই এখনও কেহ কেহ উলঙ্গ জীবন যাপন করে। দশহরা উৎসবে ধান্তেশ্বরীরই পূজা হয় কিন্তু অন্যান্য দেবদেবীর পূজাও এই উৎসবের অঙ্গীভূত হয়েছে। কেবল হিন্দুদের দেবদেবীর পূজাই যে হয় তা না, বহু গন্দ দেবদেবীও ভক্তিভাবে উপাসিত হয়। তাই আজ বাস্তারে দশহরা উৎসব এক বিচিত্র ব্যাপার হয়ে উঠেছে—এমন কোনও শ্রেণী বা উপজাতি নেই যারা এই উৎসবের কোনও না কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে সাহায্য না করে এবং এই সাহায্য ব্যতীত দশহরা উৎসব যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না তা সকলেই জানে। তাই অনেক রীতি ও আচার, নানাভাবে এই উৎসবের অঙ্গীভূত হয়েছে—যার প্রকৃত উৎপত্তি খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। ধান্তেশ্বরীর পূজা ভিন্ন, এই উৎসবে পাট দেবতা, কেশ দৈবতা, জঙ্গলা দেবতা, হিঙ্গল মাতা, পরদেশী মাতা ও বাবি মাতার পূজা হয়। পাট দেবতা রৌপ্য নির্মিত পালঙ্কে বসান সর্পমূর্ত্তি এবং বাস্তারে খুব জাগ্রত দেবতা বলে ওর খ্যাতি আছে। দশহরার সময়, দেশবাসী এই দেবীর নিকট দুগ্ধ, কলা ও অন্যান্য সুস্বাদু ভোগ স্থাপন করে পূজা দেয়।

অপরাহ্নে ধান্তেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিয়ে বাস্তার রাজ হস্তিপৃষ্ঠে, কাচিন দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করেন। অগণিত জনতা এই শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। পূর্বেই কাচিন দেবীর মন্দির প্রাঙ্গনে রাজাকে অভ্যর্থনা করার বন্দোবস্ত থাকে। মন্দির প্রাঙ্গনে পূর্বেই একটী দোলা বসান হয় এবং দোলার আসনে বেল কাঁটা স্তরে স্তরে সাজান থাকে যাতে কণ্টকাসনে বসা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব হয়। রাজা হস্তিপৃষ্ঠ হতে নামলে সাত আট বৎসর বয়সের একটী মাহারা

কন্যা চারিদিকে পরদা বেষ্টিত হয়ে দোলার নিকট উপস্থিত হয় এবং তার সঙ্গিনীরা কাচিন দেবীর গুণ কীর্তন করে। এই মাহারী কন্যা পূর্বেই কাচিন দেবীর পুরোহিতের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় যদিও এই বিবাহ কতকটা দাক্ষিণাত্যে তালীকেতু বা সম্বন্ধন বিবাহের মত। পুরোহিত ঠিক স্বামীত্বের সমস্ত অধিকার দাবী করেন না, কিন্তু মেয়েটীর ও পুনর্বার বিবাহ হয় না। যখন ইনি যৌবন প্রাপ্তা হন তখন নিজের ইচ্ছামত অন্য কোনও ব্যক্তিকে নিজের জীবন সঙ্গী করতে পারেন এবং করেনও। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই তার প্রকৃত স্বামী, কিন্তু কোনও প্রকার ধর্ম বিবাহ হয় না কারণ পূর্বেই মেয়েটী বিবাহিতা। মেয়েটী দোলাটিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে এবং পরে সঙ্গিনীদের হাত থেকে একটী তলোয়ার ও ঢাল গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে যুদ্ধসাজে সজ্জিত একজন তেলী মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে এক মাহারা কন্যাকে যুদ্ধে আহ্বান করে। এই তেলীর সহিত মাহারা কন্যার দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ হয়। ক্রমে ক্রমে মাহারা কন্যার মুখে ফেনা ওঠে, সমস্ত শরীর কম্পিত হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং সমস্ত শরীর বিবর্ণ ও শক্ত হয়ে যায়—তেলী এখন পরাজিত হয়ে মাহারা কন্যার পাদুকা স্পর্শ করে এবং পরে মেয়েটীকে দোলার উপর শায়িত করায়। এই অবস্থায় মেয়েটী প্রায় ১৫ মিনিট স্থির নিশ্চল ভাবে কাটায় এমন কি জীবিত কি মৃত তাও বুঝতে পারা যায় না। রাজা পূজারীকে দেবীর নিকট প্রার্থনা করতে বলেন, যেন দশহরা উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। পূজারীর আবেদনে, মেয়েটী যেন প্রাণময় হয়ে ওঠে এবং আস্তে আস্তে নিজের গলা হতে একটা ফুলের মালা খুলে পূজারীর হাতে দেয়, পূজারী মালা রাজার গলায় পরিয়ে দেয়। মেয়েটী আস্তে আস্তে রাজাকে আশীর্বাদ করে, আশীর্বাদ পেয়ে রাজা ত্বরিতপদে দরবার গৃহাভিমুখে অভিযান করেন।

দরবার গৃহে কাচিন দেবীর আশীর্বাদের কথা সভাস্থ সকলের নিকট বিবৃতি করেন। তখন রাজপুরোহিত অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত বিচার করে দশহরা উৎসবের নানারকম যাগযজ্ঞ পূজা ও বলীর সময় নিরূপণ করেন। এই অনুষ্ঠানপত্র ধাম্বেশ্বরী দেবীর নিকট পড়ে শোনান হয় এবং ঢোল পিটিয়ে প্রজাবর্গকে জানান হয়।

রাজা তখন সমগ্র স্বজনদের সমক্ষে দেওয়ানকে রাজত্বের ভার অর্পণ করেন এবং নিজে যাতে সম্পূর্ণরূপে দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হতে পারেন তার ব্যবস্থা করেন। মহামূল্য পরিধান ত্যাগ করে সামান্য যোগীর বেশ গ্রহণ করেন, একখানা পরিষ্কার ধুতি ও চাদর পরেন, মাথায় সুবেশ শিরস্ত্রাণ পরিত্যাগ করে ফুলের মালা জড়ান, এবং নগ্নপদে দেবীর ঈপ্সিত কাজে লিপ্ত হন। এমন কি এইসময়ে রাজা কোন ও যান-বাহন চড়েন না বা কাউকে প্রণাম করেন না বা কারও প্রণাম গ্রহণ করেন না।

মধ্যরাত্রে, পৌরজনের সঙ্গে রাণী ও তাহার সহচরীরা জল নিমন্ত্রণ করতে যান এবং জলপূর্ণ কলসী দেবী ধাম্বেশ্বরীর মন্দিরের সামনে মণ্ডলে ও দরবারগৃহে স্থাপন করেন। দ্বিতীয়

দিন বরুণ দেবের পূজা হয়। অপরাহ্নে রাজা মাওয়ালী দেবীর মন্দিরে যান এবং সেখানেও কলস স্থাপন করা হয়। এই মন্দির প্রাঙ্গনে কালাঙ্কী দেবী ও অনেক দেবদেবীই আছে। রাজা প্রত্যেক মন্দিরেই পূজা করেন। দরবার গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে সেই রাত্রেই রাজা একজন যোগীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজার অঙ্গরক্ষী হালবা সেনারা, উহাদের মধ্য হতে একজনকে এই কাজে ব্রতী করায়। এই যোগীর কাজ রাজার প্রতিনিধি হিসাবে নবরাত্র কঠোর জীবন যাপন করা। রাজা অমাত্যদের সামনে এই যোগীকে নিজের সিংহাসনে স্থাপন করেন, যতদিন যোগী রাজপ্রতিনিধি হিসাবে থাকে, ততদিন এক অবস্থায় বসে থাকতে হয়। দরবার গৃহের মধ্যে একটা গর্ত করে যোগীকে রাখা হয় তাঁর উরুর উপর একখানা কাঠ রাখা হয়, তার মেরুদণ্ড সোজা রাখার জন্য, আর একখানা সোজা দাড়ান কাঠের সহিত বেঁধে দেওয়া হয়। এবং তাকে দড়ি দিয়ে এমন করে বাঁধা হয় যে একই অবস্থায় যেন সে নবরাত্রি অতিবাহিত করে। তাকে প্রায়ই অভুক্ত রাখা হয়, যদি একান্ত দরকার হয় তবে, কিছু দুধ দেওয়া হয়। এই অবস্থায় থাকার পুরস্কার স্বরূপ পূর্বে যোগীকে না-খারাজ গ্রাম দেওয়া হত। এখন কাপড়, টাকা ও খাদ্য দিলেই হয়। যোগী যখন দরবার ঘরে অমনি আবদ্ধ থাকে, রাজপরিবার তাদের নিজ নিজ কাজে মন দিতে পারে, রাজাও একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন। যে কৃচ্ছসাধন রাজার করা উচিৎ ছিল, যোগীই তা করে তাতেই রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ হয়। নবরাত্র পার হলে, যোগীকে মুক্ত করা হয়, কিন্তু যোগীকে এমন ভাবে রাজধানী থেকে সরিয়ে ফেলা হয়, যেন প্রজারা বা রাজপরিবারের লোক পরে ঐ যোগীকে ঐ বেশে না দেখেন।

নবম দিবসে ধান্তেশ্বরীর মন্দির হতে তলোয়ার ও দেবীর মূর্তি রাজধানীতে শোভাযাত্রা সহকারে আনা হয়, এবং রাজা পৌরজন ও অমাত্যদের সহিত দেবীকে ভক্তিভরে গ্রহণ করেন। মহা ধুমধামের সহিত দেবীর পূজা দরবার গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা শেষে, রাজপুরোহিত রাজার পুনরভিষেকের সময় জ্ঞাপন করেন এবং ১০ দিনের দিন রাজা নানা রত্নবিভূষিত হয়ে দরবারে অভিষিক্ত হন, এবং দেওয়ানের নিকট হতে রাজকার্য ভার গ্রহণ করেন। এই দরবারে সমস্ত প্রজাগণ, নাগরিক ও রাজ্যের কর্মচারীরা রাজাকে অভ্যর্থনা করে। স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা, ধান্য ইত্যাদি নানা উপহারে রাজাকে অভিনন্দিত করা হয়, রাজা উচ্চনীচ সকলের সহিত কোলাকুলি করেন এবং পান সুপারি ও মিষ্টি বিতরণ করেন।

এগারদিনের দিন রাজাকে সন্ধ্যাকালে তাঁর বন্য প্রজারা চুরি করে জঙ্গলে নিয়ে যায়। রাজাকে অসভ্য প্রজারা বনে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত ভক্তিভাবে পূজা করে, এই তাদের দশহরা উৎসব। যদিও কতকটা অতর্কিতে রাজাকে সরিয়ে ফেলা হয়, রাজা এই অবস্থার জন্য প্রস্তুতই থাকেন, এবং তাঁর দিক দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থা থাকে না। কতটা

বিশ্বাস রাজা বন্য প্রজাদের উপর ন্যস্ত করেন, এ থেকেই প্রমাণিত হয়। বন্য প্রজারা বনে জঙ্গলে শীকার করে নানারকম বন্য ফুল পাতা দিয়ে সাজিয়ে রাজাকে তাদের আনন্দ অভিবাদন জ্ঞাপন করে। এই চুরির প্রথা বহুদিনের।

রাজা রাজধানী থেকে এইভাবে অপহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীরা রাজার অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠে—এবং রাজধানী হতে হালবা সেনা পাঠান হয়, রাজাকে নিয়ে আসার জন্য—বিরাট রথে শোভাযাত্রা করে, মহা ধূমধামের সহিত বন্য প্রজাদের সঙ্গে —রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন--প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন পতাকা শোভাযাত্রার সৌন্দর্য বর্ধন করে। তীর-ধনু হাতে ভাতরা প্রজা ও মুরিয়ারা মুরুব্বিয়ানা চালে শোভাযাত্রাকে পরিচালনা করে–এবং উচ্চনীচ, উন্নত-অনুন্নত, কোনও প্রকার প্রভেদ থাকে না, মনে হয় যেন সবাই এক জাত, এক গোত্রসম্ভূত, যেন একই বংশ এই প্রতীয়মান হয়।

সভ্য অ-সভ্যের প্রভেদ থাকবেই। কৃষ্টির পার্থক্য থাকা খুবই সম্ভব। সংস্কারের বিভিন্নতা শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি, কিন্তু তাই বলে বিভিন্ন কৃষ্টির সামঞ্জস্য হ'তে পারে না—একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রমূলক বা বংশমূলক জাতির স্থান হবে না—এটা একান্ত ভ্রান্ত ধারণা। বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন গোত্রমূলক বা বংশমূলক জাতি থাকবেই—সমাজ গড়ে তুলতে হলে স্তরে স্তরে সমাজের গঠনমূলক আচার নিষ্ঠা ও অনুষ্ঠান নিয়ে তা করতে হবে। বিভিন্ন সমাজের সুষ্ঠু সুন্দর আচার ব্যবহার রীতিনীতি নিয়ে সমাজ গড়াই দেশের পক্ষে মঙ্গল। তাতে সভ্য ও অসভ্য সমাজ দুইএরই অবদান থাকবে। যারা এই সামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে কাজ করেন তারা সমাজের কল্যাণ চান না। বিভিন্ন কৃষ্টির সংযোগে যে কৃষ্টি গড়ে উঠে—তার মূল্য সমাজ সংস্কারকেরা যেন উপলব্ধি করেন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো।

ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সে রাত্রে মৈত্রীর ভাল করে আহার হল না। মৃত্যুঞ্জয়ের জ্বর অল্পই ছিল, কাজেই পিতার শারীরিক অবস্থার জন্য যে কন্যার রাত্রির আহারের ব্যাঘাত হয়েছিল, তা নয়—সে ব্যাঘাত হয়েছিল নিজের উপর মৈত্রীর একটা অন্তর্নিহিত ক্রোধ জন্মাতে এবং সেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়েছিল কিরীটের সেই সন্ধ্যাবেলাকার গোটা কয়েক কথায়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৈত্রীর মনে কেবলই তর্ক উঠল সে যে তাঁর পিতার অর্থে পরিপুষ্ট হচ্ছে, সেটা কি তার পক্ষে খুব অন্যায়? মৈত্রী যতই ভাবতে লাগল ততই সে আশ্চর্য বোধ করতে লাগল যে এ চিন্তাটা এতদিন তার মনে একবার উঠে নাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই জীবিকা-হীনতা আর ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারের মধ্যে রইল না, সে একেবারে ঠিক ক'রে ফেলল যে তাকে যতটা সম্ভব একটা উপার্জনের পথ খুঁজে বার করতেই হবে। পরীক্ষায় মৈত্রী ম্যাট্রিকের কোঠা-ও পার হয় নাই, কাজেই এটা সে স্পষ্টই বুঝতে পার্ল যে টিচারি, যা মেয়েদের সব চাইতে বেশী মেলে, সেটা তার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে না! উষ্ণ মস্তিষ্ক ঘন্টাখানিক আলোড়ন করেও মৈত্রী সে রাত্রে কোন উপার্জনের পথ মনে মনে স্থির করে উঠতে পার্ল না।

পরদিন সকালে মৈত্রীর নজর পড়ল এক দেশী ইংরাজী কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা ই আই রেলওয়ে কোম্পানীর চাকুরীর বিজ্ঞাপনে। এ'তে দুটী মহিলা টিকেট-বিক্রেত্রীর পদ-খালির কথা ছিল। মৈত্রী বিজ্ঞাপনটা পড়েই পিতাকে জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা, বাবা, এই ই, আই, আর, কোম্পানী টিকিট-বিক্রেত্রীর কাজে বাঙালী মেয়েদের নেয় না?"

মৃ—বোধ হয় নেয় না।

মৈ—কেন নেবে না, এ বিজ্ঞাপনে ত কিছু লেখে নাই যে শুধু এংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদেরই নেবে?

মৃ—তা হ'লে হয়ত বাঙালী মেয়েদেরও নেয়, দেখেছিও বোধহয় দু একজন। তা তুই খোঁজ নিচ্ছিস কিসের জন্য?

মৈ—আমি ভাবছি এর জন্য উমেদার হ'।

মৃ—ক্ষ্যাপা মেয়ে!

মৈ—বাবার যে কথা! ক্ষ্যাপামোটা কিসে হল বল দেখি? আমায় ত তুমি আর দশটা পরীক্ষায় পাশ করাওনি যে আমি অন্য কোন কাজ করে উপার্জন করব?

মৃ—তোর কিছু কর্তে হবে না, মিতি মা।

বলে মৃত্যুঞ্জয় মুহূর্ত্তের জন্য কন্যার চিবুকে ছড়ান চুলটা মাথায় তুলে দিলেন। মৈত্রী আর কোন কথা বল্ল না।

দিন সাতেক বাদে মৈত্রী পিতাকে জানাল যে তার ই আই আর কোম্পানীতে বেরিলীর, অফিসে টিকেট-বিক্রেত্রীর কাজে নিযুক্তি হয়েছে এবং সামনের মাসের পয়লা তারিখে অর্থাৎ প্রায় আরও বারো দিন পরে তাকে সেই কাজে লাগ্‌তে হবে। মৃত্যুঞ্জয় প্রথমটা শুনে হেসে উঠলেন এবং পরে যখন ব্যাপারটা যথার্থ বলেই বুঝতে পার্লেন, তখন উপস্থিত ক্রোধের হাত থেকে এড়াবার জন্য বল্লেন "এ সম্বন্ধে রাত্রে কথা হবে।" সে দিন সায়াহ্নে শ্রীমন্ত-কিরীট দুজনই ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে এসে খবর পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল যে মৃত্যুঞ্জয় পদব্রজে একাকী বেড়াতে গিয়েছেন এবং মৈত্রী গেছে পাড়ার এক বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রাইজ-সভায়।

মৃত্যুঞ্জয় সেদিন সন্ধ্যাবেলা দারুণ মনোক্ষোভে গোটা রাসবিহারী এভিনিউটা একা একা ঘুরে বেড়ালেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মনে কন্যার উপার্জনচেষ্টায় যতটাই আঘাত লাগুক না কেন, এটা ঠিকই বুঝতে পারলেন যে মৈত্রীর আচরণে গর্হিত কিছুই ছিল না। উপার্জন-চেষ্টা ত কিছুই নিন্দনীয় নয়, মেয়েদের পক্ষেও তাহা অ-শ্লাঘার ব্যাপার হতে পারে না। মৃত্যুঞ্জয়ের শুধুই মনে হতে লাগল যে কন্যা একবার ভেবেও দেখল না যে তার এই কর্ম্ম-চেষ্টাতে পিতার মনে কতটুকু আঘাত লাগ্‌বে। মেয়ের নিজের কর্তৃত্বাভিমান হয়ে থাকে ত হোক—মৃত্যুঞ্জয় নিজেই ত কতবার কন্যাকে আত্ম-নির্ভরশীল হতে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু পিতার মনের দিকটা কেন মৈত্রী তলিয়ে দেখ্‌ল না? মৈত্রী কি জানেনা যে তার পিতার কর্ম্মজীবনের আর্থিক প্রেরণা ছিল সে নিজেই, মৈত্রী কি জানে না যে সে পিতার জীবন-নেত্রের মণি—তার কোন অর্থের প্রয়োজন নাই, তার সম্বন্ধে কোন উপার্জনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। ভাবতে ভাবতে বৃদ্ধের এক একটী করে মাতৃহীনা শিশুকন্যার বহুদিনকার ছোটখাট অনেক ঘটনা মনে পড়তে লাগ্‌ল। ক্রমে মৃত্যুঞ্জয়ের আহত প্রাণের মেঘভার উচ্ছ্বসিত স্নেহ-বাত্যায় উড়ে গেল। তিনি ঠিক কর্লেন যে তার কোন প্রকার দুশ্চিন্তা করা নিতান্তই অনাবশ্যক, কেন না মিতিকে বুঝিয়ে বল্লেই চলবে যে তার উপার্জন-চেষ্টায় পিতার মনে নিদারুণ আঘাত লাগ্‌বে। মনের এই সহজ ভাবটা নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় যখন ল্যানসডাউন রোড একষ্টেনশনে কয়েক পা এগিয়েছেন, অমনি সাক্ষাৎ হল নিস্তারণ মিত্রের সঙ্গে।

নিস্তারণ—এই যে ভায়া মৃত্যুঞ্জয়। তোমার কথাই আজ বিকালে গিন্নির সঙ্গে হচ্ছিল। বলি তোমার এক-রত্তি মেয়েটার কিছু গতি কর্লে? যদি না করে থাক, তবে ভায়া এখনও বলছি ভেবে দেখো নিখিলের সঙ্গে সম্বন্ধটা।

মৃ—তোমায় ত বলেছি, নিস্তারণ, যে মেয়ে আমার রাজি হয় না?

নি—সব ব্যাটাবেটী কি একই ঠাকুরের গড়া ?

মৃ—কেন হে, চট্‌ছ কার উপর ?

নি—কার উপর আর—এই হারামজাদা আমার এই ডেপুটী মুর্খের উপর। খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছিল হে, বড় এটর্ণীর একমাত্র মেয়ে-সন্তান। তাড়াতাড়ি করে ব্যটার নামে ১০০০০৲ টাকার একটা বীমা করিয়ে premium অবধি দিলুম। এখন শ্রীমান কুষ্মাণ্ড বলে কিনা মেয়ের বাপের চরিত্র দোষ। দোষ হয় ত বুঝবে তোর শ্বাশুড়ী, তোর ব্যাটার কি ? হ্যাঁ ?

"কি আর করা যাবে" বলে মৃত্যুঞ্জয় কথা শেষ করে পথ হাঁটতে লাগ্‌লেন।

পিতার স্নেহ-বিগলিত কাতরোক্তিতে কন্যার প্রতিজ্ঞা শিথিল হল না। মৃত্যুঞ্জয় যখন মৈত্রীকে বুকে টেনে বল্লেন, "মিতি, তুই আমাকে এ ব্যথা দিস্ নে মা", উত্তর হল "তুমি যদি অন্যায়-ভাবে ব্যথা পাও, তবে আমি কি কত্তে পারি বল" ? মৃত্যুঞ্জয় কন্যার ঘাড়ে বেষ্টিত নিজের হাত গুটিয়ে নিলেন আর কোন কথাই বলতে পার্লেন না। দুশ্চিন্তায় এবং আহত অভিমানের বেদনায় সে রাত্রে মৃত্যুঞ্জয় এক প্রকার বিনিদ্র ভাবেই কাটালেন। পরদিন মৃত্যুঞ্জয় ক্রমে ক্রমে শ্রীমন্ত ও কিরীটের শরণাপন্ন হলেন। মৈত্রী কড়া কথায় শ্রীমন্তকে ইচ্ছা করে অপমান করার জন্যই বল্ল "মাষ্টারিতে বুদ্ধি লোপ পায় তা আগেই জান্তাম। আপনি না কতবার বলেছেন যে জীবনে প্রত্যেকের আদর্শ স্বতন্ত্র, তবে কেন এখন আমায় বাবার দিক থেকে ভাবতে বল্‌চেন" ? কিরীট এসে বল্লে "মৈত্রী, রোজগার করবে ভালই, তবে কি জান মেয়েদের রোজগারে সমাজের আর কারোই উপকার হয় না ততটা, যতটা হয় শাড়ী-ওয়ালার। এই একচোখোমিটা বাঁচিয়ে চলতে পারবে ত ?" মৈত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে ঘর ত্যাগ কর্ল। মৃত্যুঞ্জয়ের সমস্ত সুপারিশ ও অনুনয় অগ্রাহ্য করে মৈত্রী ই, আই, আর এর চৌরঙ্গীর অফিসে কাজে হাজির হ'ল।

বিদ্রোহী কন্যার নির্মম আচরণের দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় দিন কাটাতে লাগলেন। পিতাপুত্রীর খাওয়া দাওয়া পূর্ববৎই এক সঙ্গে চল্‌তে লাগ্‌ল, খবরের কাগজ পড়ে আলোচনা তেমনি পিতাপুত্রীর প্রশান্ত জীবন-যাত্রাকে বাক্য-বহুল করে তুলতে লাগল, কিন্তু ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে তেমন ভাবে আর সান্ধ্য-বৈঠক জম্‌ত না। তার কারণ ছিল একাধিক। প্রথমতঃ, মৃত্যুঞ্জয় কন্যার চাকুরী গ্রহণের পর থেকে প্রায়ই সন্ধ্যায় হাওয়া খেতে বেরিয়ে যেতেন, কোন কোন দিন বা কন্যাও সঙ্গিনী হত। দ্বিতীয়তঃ, আগন্তুকদেরও ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে আলাপে যোগ দেবার ইচ্ছা অনেকটা মন্দীভূত হয়ে এল। তৃতীয়তঃ পিতাপুত্রী বাড়ী থাকলেও এবং শ্রীমন্ত-কিরীট বৈঠকে উপস্থিত থাক্‌লেও যেন আলাপ-আলোচনায় পূর্বেকার সরসতার অভাব লক্ষিত হত। মানুষের মন প্রকাশ্য বিরোধে যতটা না ছন্দহীন হয়ে পড়ে, তার চাইতে ঢের বেশী হয় অপ্রকাশ্য বিরোধে।

সান্ধ্য-মিলনের প্রসন্নতা মন্দীভূত হ'ল বটে কিন্তু মৈত্রীর কর্ম-জীবনের সূত্রপাত হতে তার প্রতি কিরীটের অনুরাগ গেল অনেকখানি বেড়ে এবং সে অনুরাগের প্রকাশও হ'ল কিরীটের স্বভাবানুগত বিকৃত-রূপে। কিরীট সুযোগ পেলেই বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে চৌরঙ্গীর কাউণ্টার এ গিয়ে তাঁদের জন্য টিকেট কিনে দিত এবং সেই সময় বিক্রেত্রীকে তাঁদের কাছে বন্ধুস্থানীয়া বলে পরিচয় করিয়ে দিত। পরিচয়ের এ রকমটা মৈত্রীর মোটেই ভাল লাগল না। তবুও হয়ত কিরীটের প্রতি তার ক্রোধ হ'ত না, যদি না বীমার দালালটী প্রায় দিন সাতেক কাউণ্টারে যাবার পর একদিন গিয়ে মৈত্রীকে তার আফিসের মান্দ্রাজী কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য প্রস্তাব না কর্ত্ত। মৈত্রী সরোষে সে প্রস্তাবেতো অস্বীকৃত হ'লই, তার পর দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে মৃত্যুঞ্জয়ের সামনেই কিরীটকে এই প্রকার আলাপ করিয়ে দেবার ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত ভৎসনা কর্ল। কিরীট এতে অপ্রতিভ বোধ না করে হেসে বল্ল "এটা বুঝছ না কেন মৈত্রী যে বীমার কাজটা আমার সখের ব্যাপার নয়"। মৈত্রী শুনে ক্রোধের আতিশয্যে কথা কইতে না পেরে গৃহান্তরে চলে গেল।

মৈত্রী জেদের মাথায় ও নিজের বিচার-বুদ্ধিকে চরিতার্থ করবার একান্ত ব্যগ্রতায় চাকুরী করতে এল বটে কিন্তু টিকেট অফিসের হালচালটা তার আদৌ ভাল লাগল না। যন্ত্রচালিতের মত ছ-সাত ঘণ্টা টিকেট হাতড়ান ও পাঞ্চ করা কাজটায় যত অবসাদই থাক্, মৈত্রী সেটাকে কোনরকমে বরদাস্ত করতে পারত। কিন্তু সব চাইতে তাকে পীড়া দিত সমস্ত আফিসের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী মেয়ে বলে তার উপর পুরুষ-কর্ম্মচারিদের কৌতূহলী দৃষ্টি এবং টিকেট ক্রয়েচ্ছুদের গায়ে পড়ে তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা। লজ্জাশীলতা বল্লে যা বোঝায়, মৈত্রী কোনকালে সে হিসাবে লজ্জাশীলা ছিল না। তার নারীত্বের প্রতি কোন আঘাত হলে সে তাকে প্রতিঘাত না কর্লেও উপেক্ষাই করত। কিন্তু কাউণ্টারের পাশে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে মৈত্রীর যেন সেই আগেকার স্বাভাবিক তেজস্বিতায় ঘাটতি পড়ল। এইরূপ মানসিক পীড়ায় সপ্তাহ তিন কাটলে পর, মৈত্রীর সৌভাগ্যক্রমে টিকেট-অফিসে একটী দ্বিতীয় বাঙ্গালী মেয়ে নিযুক্ত হল—নাম দুর্গাবতী দত্ত। মেয়েটীকে দেখে মনে হত মৈত্রীরই সম-বয়স্কা, যথার্থ দুর্গার বয়স ছিল উনিশ কি কুড়ি। নব-নিযুক্তাকে মান্দ্রাজী-কর্ত্তা মৈত্রীর কাছে সাত দিন কাজ শেখাতে দিয়ে গেলেন, মৈত্রী জিজ্ঞাসা কর্ল, "আপনার নামটা কি—জানা যে দরকার।"

"দুর্গা।"

"দুর্গা কি?"

"দুর্গাবতী দত্ত।"

মেয়েটীর সাজ-সজ্জার প্রাচুর্য্য দেখে মৈত্রীর প্রথমটা দুর্গাকে ভাল লাগেনি, তার ওপর নিজের নামটা যে মেয়ে ভাল করে বলবার ভদ্রতা জানে না, সে আবার কাজ করতে এসেছে ভেবেই সে আশ্চর্য হয়ে গেল।

কিন্তু দুর্গা সম্বন্ধে মৈত্রীর প্রথম দিনের বিশ্রী ভাবটা ক্রমশঃই কমতে লাগল। কারণ দ্বিতীয় দিন থেকেই মেয়েটী হয়ে পড়ল একেবারে মৈত্রীর প্রতি শ্রদ্ধানতা।

সে বল্ল, "আপনি আমায় দুর্গা বলেই ডাকবেন কিন্তু আমি ডাকব আপনাকে মৈত্রীদি।"

"আমার নাম মৈত্রী কে বল্লে? এ নামে ত অফিসে কেউ ডাকে না, আমিও তোমায় বলিনি ?"

"তা আমি জানি।"

ব্যক্তিত্বাভিমান যাঁদের তীব্র, অপরের শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকারে তাদের মনের ওপরে পড়ে স্নিগ্ধ প্রলেপ। মৈত্রীরও দুর্গার শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়ে হল তাই—সে এই নব-পরিচিতা, বেশী-বিলাসিনী অ-মার্জ্জিত-ভাষিনীর প্রতি আকৃষ্টা হয়ে পড়ল। মৈত্রী তাকে উঁচু গোড়ালির জুতা ছাড়িয়ে নাগরাই ধরাল, উৎসারিত হাসিকে খর্ব করে খাটো রুমালের নূতন ব্যবহার শিখাল, দুর্গার দন্ত্যস-এর উচ্চারণটা নির্ভুল ও সরস করে তুললো। আশ্বর্য যে, দিনের পর দিন এই গুরু-বৃত্তিতে মৈত্রীর ধৈর্য বিদ্রোহী হল না এবং রুচির দিক থেকেও এই অনুন্নত মনের সংস্পর্শে তার ক্লান্তি এলো না।

মাসখানেকের ভিতরই মৈত্রী দুর্গার চরিত্রের ও জীবনের ষোল আনা পরিচয় পেয়ে গেল। দুর্গা মনে করত তার জীবন অভিশপ্ত, কেননা তার নিজের কোন পিতৃ-পরিচয় ছিল না; মাতার মৃত্যুও তার কাছে ততখানি শোকের ব্যাপার ছিল না, যতটা ছিল মাতা-মাতামহীর পঙ্কিল জীবনের গ্লানি। দেহকে আঘাত দিবার জন্য দুর্গার দিদিমা তাকে যতটা লেখাপড়া শিখিয়েছিল, সেটুকুন লেখাপড়াই তার অন্তরের ঠাকুরকে তখন পিষে মারছিল। নিজের ক্ষুদ্র জীবনের বছর দুয়ের কথাও দুর্গা না শিউরে ভাবতে পারত না। কিন্তু তবু ভাল যে বিধাতা সেই ঘোর দুর্দিনেই পাঠিয়েছিলেন তাঁর মঙ্গলদূত। এ সব কথা যে দুর্গা ঠিক মৈত্রীকে মুখ ফুটে ব'ল্ল তা নয়, তবে মৈত্রীর অবিকৃত স্বরের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ও দুর্গার অশ্রুরুদ্ধ গলার আত্মানুশোচনা মিলে যে সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী দাঁড়ায়, তা মোটামুটি এই প্রকারের। যেদিন চৌরঙ্গীর ময়দানে দাঁড়িয়ে দুই সহকর্ম্মিনীর বেশী খোলাখুলি ভাবে কথা হয় সেদিন ছিল শনিবার। বাড়ী ফেরবার পথে আধঘণ্টার মত কথা হবার পর দুর্গা হঠাৎ মৈত্রীর প্রায় পা জড়িয়ে ধরে বল্ল,

"মৈত্রীদি, দোহাই তোমার, তুমি আমাকে ঘৃণা করো না।"

মৈত্রী তাড়াতাড়ি পা'টা সরিয়ে খানিকটা ধমকের সুরে ব'ল্ল "ও কি করছ, দুর্গা, এ মাঠের মাঝে অভিনয়! তুমি কি করেছ যে আমি তোমাকে ঘৃণা করব? তোমার মা দিদিমার কাজের জন্যত আর তুমি দায়ী নও।"

"আমার মধ্যে ত তাঁদেরই রক্ত। তা ছাড়া আমিই বা——"

"থাম, দুর্গা, থাম। ধনী লোকে টাকা খরচ করে যা করে, তার জন্য ঘৃণ্য হয় না, আর ঘৃণ্য হবে তুমি, তোমার মা, যারা টাকার জন্য ঐ একই কাজ করে। এ সব বুজরুকি আমার কাছে বলতে এসো না। যাও এবার বাড়ী পালাও, আমিও যাচ্ছি।"

সেদিন মৈত্রীর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরবার একটা বিশেষ কারণ ও ছিল, কারণ সেদিন ছিল সন্ধ্যার পর বোসেদের ওখানে স্বামীর সঙ্গে রত্নার আসার কথা। প্রায় বছর দুই হল রত্নার বিয়ে হয়েছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই দিনই রত্না প্রথমে আসছে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে। রত্না যে কখনো মৈত্রীর বাড়ীতে আসে নি কিংবা মৈত্রীও যে কখনো রত্নার বাড়ীতে যায়নি তার কারণ ছিল রত্নার স্বামীর পরিচিতদের প্রতি অনুরাগের একান্ত অভাব। রত্নার স্বামী ছাড়া যে সংসার ছিল, তা'তে ছিল ওর মা, ভাই, বোন ইত্যাদি, বড় জোর ওদের বিয়ের আগেকার দুচার জন বন্ধু। শ্রীমন্তের স্ত্রীর কূর্ম-স্বভাবটা বেশ জানা ছিল, কাজেই স্ত্রীর কথা বোসেদের বাড়ীতে অনেক উল্লেখ করলেও কখন ও স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে যায় নি। তা হলে ও হয়ত এমনটা হত না যদি মৈত্রীর স্বভাবটা হত সাধারণ মেয়েদের মত। নূতন বৌ দেখার যে অনূঢ়াদের সখ থাকে, মৈত্রীর সে সখ্ ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় শ্রীমন্তের বিবাহের অব্যবহিত পরে মৈত্রীকে দু'চার বার বলে ও ছিল। "মিতিমা, তোমার শ্রীমন্তের স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দেওয়া উচিত।"

"হবে'খন। হোক না বৌটি একটু পুরোন। এখন এলে আস্‌বে একগা গয়না পরে। কি ন্যাকা এই বৌগুলো, যেন কিউরো দোকানের পশার। দেখে গা জ্বলে।"

মৃত্যুঞ্জয় বুঝলেনে যে কোন কারণেই হোক, কন্যা রত্নার উপর হতশ্রদ্ধা। কাজেই নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা কর্লে ও সেটা খুব শোভন হবে না।

সে যাই হোক মৈত্রী চাকুরীতে ঢুকবার মাস দুই পরে একদিন শ্রীমন্ত স্ত্রীকে বল্ল যে ওর মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসা উচিত, কেননা বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী মেয়ের ব্যবহারে আঘাত পেয়ে খানিকটা মন মরা হয়েই দিন কাটাচ্ছিলেন। রত্না প্রস্তাবে রাজি হল, খুলে বল্ল "ভালই বলেছ, দেখে আসা যাবে মৈত্রী বোস্‌কে ও, মেয়েটীত পথ ছেড়ে চল্‌ছে অন্য পথে"। শ্রীমন্ত সস্ত্রীক শনিবারে আস্‌বে বলে বোসেদের আগেই জানিয়ে গেল এবং মৈত্রী যখন সেদিন ময়দানের কথা বন্ধ করে বাড়ী এসে হাত মুখ মাত্র ধুয়েছে, এমনি সময় ওদের বস্‌বার ঘরে এসে হাজির হল রত্না ও শ্রীমন্ত। মৃত্যুঞ্জয় সে ঘরে ওদের জন্য অপেক্ষাই করছিলেন, মিনিট দুই পরে প্রশান্তভাবে এসে ঘরে ঢুকল মৈত্রী।

শিষ্টাচার ও প্রথামাফিক পরিচয় সমাপ্ত হলে রত্না তার ছোট চৌকিটা ছেড়ে বসল গিয়ে মৈত্রীর পাশ ঘেসে, বড় কৌচেতে ও স্মিত মুখে ব'ল্ল "আপনার কথা কত শুনচি কিন্তু দেখা করা হয়ে উঠে না একটা না একটা ফ্যাসাদে।"

মৈত্রী জবাব দিল "আমার ত কোন ফ্যাসাদ নাই, তবুও আপনার সঙ্গে দেখা হল আজই প্রথম"।

মৃত্যুঞ্জয় বল্ল "তোমারই কি ফ্যাসাদ বৌমা—কি বলহে শ্রীমন্ত, আমি একে বৌমাই বলি—(শ্রীমন্ত মাথা হেট করে সম্মতি জানাল) ফ্যাসাদ মা তোমার ও কিছু নেই। তা হলে ও এটা ঠিক যে আমাদের ঘর-কন্নার যা বিলি ব্যবস্থা তা'তে মেয়েদের সময়ের উপর টান হয় অত্যন্ত বেশী। শ্রীমন্ত—একথা কেন বল্‌চেন। আমারত মনে হয় আমরা মেয়েদের খাটুনি সম্বন্ধে আজকাল অতখানি সজাগ যে তাদের সময়ের উপর আমরা অনাবশ্যক কোন দাবীই করি না।

এমনি সময় রত্না বল্ল "চলুন না মিস্ বোস, আমরা আপনার ঘরে যাই"।

মৈত্রী তাঁর বিস্ময়কে যথাসাধ্য অতিক্রম করে বল্ল "চলুন" বলে কৌচ ছেড়ে উঠ্‌ল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক মেয়ে দুটীতে অনেক কথা হ'ল। রত্না স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই অনেক কথা মৈত্রীকে বল্ল, তার মা বোনের কথা, স্বামীর গিলেদার পাঞ্জাবীর প্রতি বিতৃষ্ণা, রাত জেগে পৌরানিক আখ্যান ও ইংরেজী উপন্যাস পড়ার বাতিক ইত্যাদি; এমন কি প্রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই শুধু গলায় গান গাইল "ওহে সুন্দর মরি মরি! তোমায় কি দিয়ে বরণ করি।" মৈত্রীর কোন কথাই খুব ভাল লাগছিল না, কিন্তু সব কথাই সে খুব বিস্ময়ের সহিত শুন্‌ছিল। রত্নার কথা বার্ত্তায় কোন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছিল না, তবে তাতে মৈত্রীর মতে অসাধারণ প্রকাশ ছিল। মৈত্রীর মনে ভাবটা একটা রূপক দিয়ে বলতে গেলে বলা চলে যে মানুষ যেন সবাই এক একটী নল-কূপ, বিধাতাৰ্জ্জুনের শর-সন্ধানে প্রত্যেকের বুদ্ধি ধারা বুঝি একেবারে পাতাল সম্পী। কিন্তু রত্নাকে দেখে মনে হল এ যেন বর্ষার জল-পুষ্ট অগভীর বাপী-তট, তৃণ-পুষ্পের সবুজ-শ্রীতে গৌরবময় হয়ে রয়েছে। রত্নার স্বাভাবিক প্রকাশশ্রী যত কমই থাক্‌না কেন, এটা ঠিক যে মৈত্রীর সঙ্গে প্রথম রাত্রিকার সাক্ষাতে সে আপনাকে প্রকাশ করেছিল চমৎকার রূপে। তার কারণ রত্নার ধারণা ছিল যে মৈত্রীর সঙ্গে কথা বলে নিজেকে হীন বলেই বোধ করবে মৈত্রীর রূপ, গুণ ও বিদ্যা এমনি হবে। সাক্ষাতে রত্নার সেই হীনতা বোধের আশঙ্কা একেবারে গেল কেটে—রত্না তখন যেন অন্তরে অন্তরে একটা জয়োল্লাসই বোধ করতে লাগ্‌লো এবং তাই আশ্চর্য নিবিড়তার সহিত তার অপ্রকৃত স্বভাবকে ও মূর্ত করে তুল্‌ল—হাসিতে, গানে ও কথার ভঙ্গিতে।

যে রাত্রে নটায় রত্ন ও শ্রীমন্ত মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ী ত্যাগ কর্ল।

দুর্গার সঙ্গে মৈত্রীর পরিচয়টা অল্পদিনের মধ্যে আরো ঘনাইয়া আসিল। শনিবারের অপরাহ্নে মাঠে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হবার প্রায় সপ্তাহ দুই বাদে মৈত্রী দুর্গাদের বিডন স্কোয়ারের বাড়ীতে অফিস ফেরবার পথে চা খেতে এল। এসে মৈত্রী বেশীক্ষণ বস্‌ল না। বন্ধু সুলভভাবে অপর মেয়েদের মত গল্পগুজব জমান মৈত্রীর ধাতে নাই, তা ছাড়া সেদিনের আসাটা হয়েছিল একেবারে আকস্মিক। দুর্গার প্রতি মৈত্রীর যতটা করুণামিশ্রিত পক্ষপাতিত্বই থাক্, দুর্গার

দিদিমাকে দেখে মৈত্রীর মোটেই ভাল লাগ্‌ল না। একে ত হরমোহিনী ছিল অতিশয় স্থূলাঙ্গিনী, তা ছাড়া মেজের উপর ঢালা বিছানায় বসে সে যেমন ধারা হাতের কাছের পিকদানে প্রতিমুহূর্ত্তে পানের পিক্ ফেলছিল, তাতে মৈত্রীর মেজাজ গিয়েছিল বিরক্তিতে ভরে। ঘরে ঢুকেই দুর্গা সহকর্ম্মিনী মৈত্রীদিকে দিদিমার কাছে এবং তাঁরই অনতিদূরে অর্দ্ধশায়িত অখিলদার সঙ্গে পরিচিতা করে দিল। অখিল বিশেষ কোন কথাই আগুন্তকার সঙ্গে কইতে পার্‌ল না কিন্তু হরমোহিনী মৈত্রীর সঙ্গে বিড়বিড় করে গেল মেলা। মৈত্রী যখন বল্ল যে সে গান গাইতে জানে না, হরমোহিনী হেসে হেসে হাঁপিয়ে উঠ্‌ল এবং পরে অখিলকে বল্ল "শুনলে নাতি, ছুঁড়ীর কথা শুনলে, গাইতে শেখে নি। তুমি ত জান আমি আমার দুর্গাকে কের্ত্তন শেখাবার জন্য গোস্বামী চোঁড়াটাকে আমার ওখানে আসবার জন্য কত খোসামুদী করেছি।"

অখিল মেজের দিকে তাকিয়েই সংক্ষেপে বৃদ্ধার কথার জবাব দিল "হুঁ"। মৈত্রী অসহিষ্ণু হয়ে দূরের চৌকি হতে উঠে দাঁড়াল, ইচ্ছা তখনই পালায়। এমনি সময় খাবারের রেকাব হস্তে ঘরে ঢুক্‌ল দুর্গা এবং পেছনে পেছনে চায়ের বাটি হাতে করে বাড়ীর ঝি। চা-খাবার খানিকটা গলাধঃকরণ করে মৈত্রী মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে দুর্গার নিকট হতে বিদায় নিল। খানিকটা অসহিষ্ণুতার জন্য ও খানিকটা বাহ্য হৃদ্যতাহীনতার জন্য মৈত্রী দুর্গাকে একবার ওর সঙ্গে বসে নিজের চা-খাবার খেতে বল্‌ল না। এমন কি ঘর থেকে বেরোবার সময় মৈত্রী অখিল কিংবা হরমোহিনীর প্রতি শিষ্টাচার পর্য্যন্ত করল না।

পলাতক

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পেরিকপ ছেড়ে যখন বেরোলাম তখন আমাদের মেজাজ যতদূর খারাপ হবার; খিদেয় অস্থির, সারা দুনিয়ার লোকের ওপর রাগে গা যাচ্ছে জ্ব'লে। সুদীর্ঘ বারো-তেরো ঘণ্টা কাটিয়েছি খোঁজাখুঁজি লাফালাফিতে—সামান্য কিছু খাবার যদি হাতানো যায় এই মনে ক'রে, কিন্তু সব বৃথা। শেষকালে কিছুতেই কিছু হবে না দেখে অগত্যা সামনের দিকে এগোনোই ঠিক করলাম কিন্তু কোন্‌দিকে এবং কোথায় তা' তখনও অনিশ্চিত।

এতদিন জীবনধারার যে খাত ধ'রে বয়ে এসেছি আজও সেই খাতেই বইব, একথাটা আমরা প্রত্যেকেই মৌনভাবে স্থির ক'রে নিলাম,—ক্ষুধিত চোখের ম্লান দৃষ্টিতে সহজভাবে জ্বলজ্বল করছিলো সে কথাটা, আমাদের তিনজনের ভাব হয়েছে খুব বেশী দিন নয়; তা' হয়েছিলো

নীপার নদীর তীরে খার্সন সহরের একটা মদের দোকানে। একজন আগে কাজ করত রেলসৈন্যদলে পদাতিক সৈনিকের, পরে বোধ হয় ভিসচুলা রেল কোম্পানীতে প্রধান কর্মচারী হয়েছিলো। তার চুলগুলো সব কটা, হাড়শক্ত বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ, পাণ্ডুর চোখ দুটী ঔদাসিন্যে ভরা। জার্মাণ ভাষা তার খুব বেশীরকম জানা আর বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিলো তার বিস্তর। নিজেদের অতীত জীবন সম্বন্ধে খোলসা ক'রে বেশী কিছু বলতে আমাদের মত অবস্থার লোকে বিরক্তি বোধ করে, তার পেছনে সময় সময় অবশ্য ন্যায়সঙ্গত কারণও থাকে। কাজেই আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস ক'রেই নিলাম, বাইরে অন্ততঃ সেটুকুর অভাব নজরে পড়বার যো ছিলনা।

দ্বিতীয় সঙ্গীটী নিজেকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ব'লে পরিচয় দিলে। আমি আর সৈনিকপুরুষটী দুজনেই একথায় বিশ্বাস করলাম। লোকটা যেমন বেঁটে তেমনি রোগা, সব সময় সে তার পাতলা ফিনফিনে ঠোঁট দুটী চেপে থাকে; তাই তাকে খুব বেশী সন্দেহবাদী ব'লে মনে হয়। তা' সত্বেও তার কথায় বিশ্বাস করবার হেতু আছে; সে ছাত্রই হোক, গোয়েন্দাবিভাগের কোনো কর্মচারীই হোক আর চোর বাটপাড় যাই হোক না কেন, এ অবস্থায় তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। শুধু জানি, দৈবদুর্বিপাকে ছন্নছাড়া অবস্থায় যখন পরিচয় হয়েছে তখন আমরা তিনজনেই সমান। খিদের জ্বালা কারুর কম নয়, তিনজনের ওপরই পুলিশের কড়া নজর। আমাদের প্রত্যেককেই দুনিয়ার সবকিছুর ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে এটা যদি সে ভাবে তা' হ'লেই হয়।

আমার তরফ থেকে বলতে গেলে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে নিজের সম্বন্ধে সব সময় একটা বড় ধারণা পোষণ করবার বাতিক আমার ছিল।

সামনে সৈনিকপুরুষটী, পেছনে আমি আর আমার পেছনে সেই ছাত্রটী। ছাত্রটীর কাঁধ বেয়ে একটা কি ঝুলছিলো জ্যাকেটের মতন। তার তেরছা মাথায় ছিলো চওড়া একটা জরাজীর্ণ টুপি, মাথার চুল খুব ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা। সরু সরু পা দুটো একটা আঁট-সাট পায়জামার মধ্যে ঢোকানো, জায়গায় জায়গায় তার রঙবেরঙের তালি আর পায়ের তলায় সে বেঁধে রেখেছে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া উঁচু গোড়ালীওয়ালা একটা বুট জুতোর শুধু ওপরের দিকটা, জ্যাকেট থেকে ছেঁড়া খানিকটা ফালি দিয়ে। সে বলে সেটাই তার 'স্যাণ্ডাল'।

কোনো কথা না বোলে চুপটী ক'রে সে হাঁটছিল রাস্তার ধূলো উড়িয়ে, স্বচ্ছ নীল চোখদুটো তার ঈষৎ মিটমিট করছিল।

আর সৈনিকপুরুষটীর গায়ে লালরঙের তুলোর সার্ট, খার্সন থেকে নিজহাতে সেটা সে জোগাড় করেছে, সার্টের ওপরে একটা বেশ গরম ওয়েষ্ট কোট, মাথায় বহু পুরোণো এক সৈনিকের টুপি, তার রঙ্ ঠিক করা যায়না; প'রে আছে একটা লম্বা পায়জামা, পা দুটো খালি।

আমারও পরণে এই রকম একটা পোষাক ছিল, তবে পায়ে দেবার আর কিছু জোটেনি।

আমাদের চারপাশে বিরাট তরঙ্গায়িত প্রান্তর তার অপূর্ব শোভা নিয়ে। তার ভেতর দিয়ে পথ গিয়েছে এঁকেবেঁকে, ধূলিকংকরময় বিঘ্নসংকুল রৌদ্রোত্তপ্ত পথ। পা আমাদের পুড়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো সামনে পড়ে ফালি ফালি শস্যক্ষেত্র, সবেমাত্র সেখানে শস্য কাটা শেষ হয়েছে। সেগুলো দেখাচ্ছিল সৈনিকদের বহুকাল-না-কামানো গালের মতন।

পথ চলতে চলতে আনন্দের আবেগে সৈনিকবন্ধুটী গান ধরে। যেমন উগ্র কর্কশ তার গলা, তেমনি গম্ভীর সে গানের সুর। চাকরী করবার সময় সে সৈন্যদলের গীর্জায় সঙ্গীতাধ্যক্ষের পদ পেয়েছিলো। আমাদের কথাবার্তা জুড়িয়ে এলে ফাঁকে ফাঁকে সে তখনকার শেখা গোটাকতক ধর্মসঙ্গীত গেয়ে সঙ্গীতবিজ্ঞানের বৃথাই অপচয় ক'রে চলত।

সামনে দিগন্তে নজরে পড়ল নক্সাকাটা রঙবেরঙের ছোট ছোট আকৃতি।

—ওগুলো নিশ্চয়ই ক্রিমিয়া পাহাড়ের চিহ্ন! শুষ্ক গলায় ছাত্রটী মন্তব্য করে।

—পাহাড়? অনেক দেরী, বন্ধু, অনেক দেরী। দেখ্‌চোনা, ওগুলো কেবল সারিসারি মেঘ। কেমন দেখাচ্ছে বলত?—ঠিক যেন দুধেমাখা ক্র্যান্‌বেরী (১) জেলির মতন। সৈনিকটী হাসতে থাকে।

মেঘগুলো বাস্তবিকপক্ষে জেলির তৈরী হ'লে কি মজা হোত তাই নিয়ে আমি একটু রসিকতা করবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তাতে খিদে যেন আরো বেড়ে গেলো প্রচণ্ডমাত্রায়, দুর্দিনের কি নিদারুণ অভিশাপ!

—কি আপদ, একটা জ্যান্ত লোকেরও যদি দেখা পেতাম! কিন্তু কেউ নেই এ সময়! সৈনিকটী থুথু ফেলে জোর গলায় চেঁচায়।

—কিন্তু আমি ত তোমায় বলেছি বেশ লোকজন আছে এমন একটা জায়গার খোঁজ করতে।—ছাত্রটী পরামর্শ দেয়।

—তুমি ত বলবেই, বিদ্যে বেশী তাই চুপ ক'রে ত আর থাকা যায়না! কিন্তু লোকের বসতি কোথায় তা' কোন্ শালা জানে?—সৈনিকের কণ্ঠে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ।

ছাত্র চেপে যায় ঠোঁট দুটী এক ক'রে। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিআভায় দিগন্ত-ঘেরা মেঘের দল বিচিত্র রঙে রঙীন্ হ'য়ে ওঠে। মাটীর গন্ধ ভেসে আসতে থাকে বাতাসে ভর দিয়ে।

কিন্তু এই গন্ধে আমাদের খিদে যেন নতুন ক'রে চাড়া দিয়ে উঠল। মনে হোলো দেহের রস যেন মাংসপেশীর নালা বেয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে আর পেশীগুলো তত ক্ষীণ, নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে। সারা মুখে আর গলায় কেমন যেন ক্লেশকর নীরস ভাব, মাথা ঝিমিয়ে

(১) লালরঙের জম্বু ফল বিশেষ, খেতে টক্ লাগে।

আসছে আর চোখের সামনে যেন সর্বক্ষণ কালো কি একপ্রকারের দাগ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কখনো মনে হচ্ছে ওগুলি বুঝি ধোঁয়াওঠা গরম মাংসের টুকরো, নয়ত পাঁউরুটী এবং আরও অন্য কিছু; কখনো বা তাদের বিশিষ্ট গন্ধগুলো পর্যন্ত শুঁকতে পাচ্ছি।

যাই হোক্ পরস্পরের কাছে ভাব বিনিময় ক'রে আর চারদিকে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রেখে আমরা এগিয়ে চলি; প্রাণে আশা জাগে হয়তো ভেড়ার পাল কোথাও চোখে পড়বে, নয়ত আর্মেনিয়ার বাজার অভিমুখী তাতার দেশের ফলবাহী গাড়ীগুলোর ক্যাঁচর্ম্যাচ শব্দ ও বা শুনতে পাব।

কিন্তু উন্মুক্ত নির্জন প্রান্তর খাঁ খাঁ করতে থাকে।

দুঃখধান্দার দিনে আজ সেই কোন্ সকালে তিনজনে মিলে আমরা খেয়েছি মাত্র চার পাউণ্ডটাক গমের রুটী আর পাঁচটা তরমুজ, তার ওপর হেঁটেছিও বড় কমখানি নয়, তাই পেরিকপের বাজারে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ার পর যখন জাগলাম তখন খিদেয় আর চোখে দেখতে পাচ্ছিনা।

না শুয়ে বা ঘুমিয়ে চুপটী ক'রে রাতটা ঠায় পাহারা দেবার পরামর্শ দিলে ছাত্রটী। কিন্তু ভদ্রসমাজে অপরের জিনিষ ছিনিয়ে নেবার মতলবের কথাটা জোর গলায় প্রচার করবার রেওয়াজ নেই, তাই এমনিতেই আমি বাক্‌রোধ ক'রেছিলাম। সত্যি কথা বলার ইচ্ছেটা আমার অসাধারণ, তাই বোলে অপ্রিয় সত্য আমার মুখ দিয়ে সহসা বেরোয়না। এটী আমার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। আমি জানি এই সুসভ্যতার যুগে মানুষের অসৎ আচরণের মাত্রা যত বেড়ে চলেছে ঠিক সেই ভাবে তার মনপ্রাণ কোমল থেকে কোমলতর হ'য়ে উঠছে। আমি ত নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতায় দেখেছি লোকে যখন প্রতিবেশীর গলা টিপে ধরে তখনো তার মুখখানিতে দয়া বা সৌজন্যের অভাব ঘটেনা; এযুগ উন্নতির সোপান বেয়ে এগিয়ে চলেছে অথচ জেলখানাই বল, মদের দোকানই বল, আর দুশ্চরিত্র লোকদের আড্ডাই বল, এদের সংখ্যা কমা ছেড়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

রাস্তা থেকে একটা ছোটখাটো কাঠের গুঁড়ি তুলে নিয়ে সৈনিকটী উৎসাহ দেয়ঃ কমরেডস্, আগুন জ্বালাবার জোগার দেখা যাক্। আজ রাতটা এই মাঠের মাঝখানেই কাটাতে হবে ত, তার ওপর এই শিশির পড়চে।

দল ছাড়া হ'য়ে প্রত্যেকে রাস্তার আশেপাশে যা' কিছু পাওয়া যায় তারই খোঁজ করতে লাগলাম, গাছের লতাপাতা, শুকনো ঘাস, আরো অন্যকিছু, যাতে চট্ ক'রে আগুন লাগে এমন। যখনই মাথা নীচু করি তখনই মনে হয় মাটীতে শুয়ে পড়ি, নড়নচড়নরহিত হ'য়ে মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকি আর প'ড়ে প'ড়ে অঘোরে ঘুম দি।

—যদি কোনো গাছের শেকড়বাকড়ও পাওয়া যেত! সৈনিকটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

কিন্তু কালো চষা মাটীর ওপর শেকড়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দেখতে দেখতে পৃথিবীর বুকে

রাত নামল, দিন শেষের রাঙা রোদ মিলিয়ে যেতে না যেতে সুনীল অন্ধকার আকাশপথে ছোট ছোট তারা জ্বলে উঠল, আর আমাদের চারধারে নিকষ কালো ছায়া এলো ঘনিয়ে।

—কমরেডস্! ওই, ওইদিকে বাঁয়ে একটা লোক শুয়ে রয়েছে, নয়?—চাপা গলায় ছাত্রটী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

—লোক! সন্দেহভরে সৈনিকটী প্রশ্ন করে: ওখানেই বা শুয়ে থাকতে যাবে কেন?

—বেশত, কাছে গিয়ে জিগ্যেস্ করোনা, ওর কাছে হয়তো রুটী মিলতে পারে—ছাত্রটী আমাদের সন্দেহ দূর করবার চেষ্টা করে।

লোকটা যেদিকে শুয়েছিল সেদিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থুথু ফেলে দৃঢ় গলায় আবার সে হেঁকে ওঠে: চলো ওদিকে যাওয়া যাক্।

পঞ্চাশ সাজিন্ (২) দূরের ঐ অন্ধকারে ঢাকা মানুষের দেহ কেবল তারই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো। লাঙল চষার দাগের ওপর দিয়ে দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি তার দিকে যেতে লাগলাম, খাবার কিছু পাবার সম্ভাবনায় ক্ষুধাবোধ যেন আমাদের পেয়ে বসল। কাছে গিয়ে দেখি লোকটা নড়েওনা চড়েওনা, প্রাণের স্পন্দনও যেন থেমে গেছে।

—এ নিশ্চয়ই মানুষ নয়, অন্য কিছু—বিরস বদনে সৈনিকটী তিরস্কার করে।

আমাদের সন্দেহ দূর হোল তাকে ন'ড়ে চ'ড়ে উঠতে দেখে। অন্ধকারের মধ্যেই দেখতে পেলাম লোকটা প্রকৃতই জ্যান্ত মানুষ, হাঁটু গেড়ে আমাদের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে আছে।

তারপর অস্পষ্ট কাঁপা গলায় হাঁক দিল: কাছে এসোনা, তা হ'লে গুলি খাবে।

আকস্মিক তীব্র শব্দে বাতাস ভারী হ'য়ে ওঠে।

আমরা হতচকিত হ'য়ে থেমে যাই, তার এই অদ্ভুত কথার ভঙ্গীতে অভিভূত হ'য়ে থাকি।

—শালা বদমাস আছে। সৈনিকটী বিড়বিড় করে।

—যা বলেচো: ছাত্রটীকে চিন্তিত দেখা যায়: ওর হাতে একটা বিভলভারও আছে।

—হাঁ, হাঁ। ওর মাথায় কিছু একটা মতলব আছে হে! সৈনিকটী চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকটা নির্বাক হ'য়ে আগের মতই প'ড়ে রইল।

—ওহে, শোনো ত। আমরা তোমায় কিছু বলতে চাইনা, কিছু রুটী ছাড়ো দেখি। দোহাই তোমার।—সৈনিকের কথা মাঝপথে আটকে যায়।

লোকটা তবুও নীরব হ'য়ে থাকে।

রাগে আর হতাশায় কাঁপতে কাঁপতে সৈনিক আবার বলে: শুনতে পাচ্ছোনা? আমাদের খানিকটা রুটী দেবার কথা বলছি। তোমায় কিছু বলবোনা, শুধু আমাদের দিকে ছুঁড়ে দাও।

---

(২) প্রায় সাড়ে তিনশো ফুটের সমান।

—আচ্ছা বেশ ! লোকটা অল্পক্ষণের মধ্যেই জবাব দেয়।

মুখে হাসি টেনে শান্ত গলায় সৈনিকটী ব'লে চ'লে : ছাখো, আমাদের দেখে তুমি ভাই ভয় পেওনা। আমরা নি[illegible] লোক, যাচ্ছিলাম রাশ্যা থেকে কুবানের দিকে—পথে টাকা পয়সার খাঁকতি পড়ল, তার ওপর যা' কিছু ছিলো তা'ও খেয়ে খরচ হ'য়ে গেছে, আজ দুদিন হ'ল না খেয়েই দিন কাটছে, বুঝলে না ?

প্রায় বিশ গজটাক দূরে থাকায় তার সেই মিষ্টি হাসি লোকটার নজরে পড়লনা।

—ধরো, ব'লে বাতাসে হাত ঘুরিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে। অমনি কালো মতন কি একটা যেন উড়ে এসে আমাদের খুব কাছে চষা জমির ওপর পড়ল। ছাত্রটী ছুট দিল সেটা কুড়িয়ে আনবার জন্যে।

—ধরো, আবার ধরো ! বাস্ সব শেষ, আর আমার কাছে কিছু নেই।

সে সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনলে দেখলাম তা' পাউণ্ড চারেক শক্ত রুটী হবে। আর শক্ত শুকনো রুটী খেতেও লাগে বেশ !

—এই হোলো তোমার, এই হোলো আমাদের পণ্ডিতের, আর এই হোলো আমার। না দাঁড়াও, পণ্ডিতমশাই তোমার থেকে আরও কিছুটা দাও নইলে ওর ভাগে কম প'ড়ে যাবে। সতর্ক হ'য়ে ভাগ করতে করতে সৈনিকটী ধীর গলায় বলে।

ছাত্রটী তাই মেনে নেয়।

আমি রুটি চিবোতে লাগলাম, কণ্ঠনালী দিয়ে যখন সে গুলো নীচে নামতে লাগলো তখন আমার ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ক্ষুধার্ত দিনগুলির কথা আর আমার স্মরণ রইলোনা, ভুলে গেলাম বন্ধুদের কথা, জগতের কথা। কি এক অব্যক্ত আনন্দের গুরুভারে আমি যেন তলিয়ে গেলাম।

কিন্তু শেষ টুকরোটা যখন গলা দিয়ে নেমে গেলো তখনো খাবার ইচ্ছে আমার জুড়োয়নি।

আমার কাছটাতে মাটীতে ব'সে পেটে হাত বুলোতে বুলোতে সৈনিকপুরুষ চেঁচিয়ে ওঠে : ওশালার কাছে আরো মাংসটাংস আছে নিশ্চয়ই।

—আমারো তাই মনে হয়, রুটীতেও ত সেই রকমই গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাছাড়া রুটীও ওর কাছে আরও আছে : চাপা গলায় ছোকরাটী ফিস্‌ফিস্ করে : হাতে রিভলভার থেকেই যে যত মুস্কিল করেছে·········

—লোকটা কি ধাতের ব'লে মনে হয় ?

—আমাদেরই মত একজন······

—একটা আস্ত কুকুর, সৈনিকটী ছোকরার কথায় বাধা দেয়।

ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সে আমরা রিভলভার হাতে লোকটার দিকে আড়চোখে চেয়েছিলাম। সেদিক থেকে কোনো শব্দ বা জীবনের কোনো চিহ্ন তখন টের পাওয়া যাচ্ছিলনা!

আমাদের পাশে আঁধারের পর আঁধার নামল ওপর থেকে, মৃত্যুকাতর নিস্তব্ধতায় প্রান্তর গেছে ছেয়ে। পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। পাহাড়ে ইঁদুরের আর্তরব থেকে থেকে বাতাসে ভেসে আসছে। আর ওপরে আকাশের সুনীল বুকে তারার দল আলোর খেলা খেলে চলেছে। আমাদের ক্ষুধাবোধের বেগ বেড়ে চলেছে আবার।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে আমি বললাম: চলো ওর দিকে ফের যাওয়া যাক্। ওকে কিছু বলার দরকার নেই, যদি কিছু থাকে ত তারও সদ্ব্যবহার করা যাবে। গুলি ছুঁড়বে!—তা ছুঁড়ুক। লাগে ত একজনের গায়েই লাগবে আর একটা গুলিতে কিছু আর মারা পড়বনা।

লাফিয়ে উঠে সৈনিকটা আমার কথায় উৎসাহ প্রকাশ করে: বেশ ত চলো!

খুব আস্তে আস্তে ছাত্রটা চলতে থাকে আমাদের পেছন পেছন।

তিরস্কারের সুরে সৈনিক বলে: কমরেড্!

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আমরা হকচকিয়ে যাই, অমনি গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ কানের পরদায় ঘা দেয়।

ফসকে গেছে, বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠে সৈনিকটা চেঁচায়; পরক্ষণেই একলাফে গিয়ে লোকটাকে ঝাঁকুনী দেয়: এইবার, এইবার শালা তোকেই এই গুলিতে সাবাড় ......।

ছাত্রটা দৌড়ে গিয়ে তার বোঁচকায় থাবা মারে, সেটাকে দুইহাতে আঁকড়ে ধ'রে সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়।

—শয়তান ত কম নয়, সবিস্ময়ে সৈনিকটি বলে লোকটাকে লাথি মারবার ভঙ্গিতে: নিজেকে গুলি করতে গেছিল নাকি? এই, এই শালা নিজেকেই গুলি করলি নাকি?

ছাত্রটা আনন্দের মাথায় চেঁচিয়ে ওঠে: এই যে মাংস, হরেক রকমের কেক্, রুটী, আরো কি কি যেন রয়েছে!

—চুলোয় যাও তবে। চলো চলো, ওগুলোর ব্যবস্থা করা যাক্। সৈনিক উৎসাহে ফেটে পড়ে।

লোকটার হাত থেকে আমি রিভলভারটা কেড়ে নি, তখন সে নির্জীব হ'য়ে পড়ে রয়েছে। রিভলভারে আর একটি মাত্র গুলি বাকি।

আমরা নির্বিবাদে চুপচাপ খেতে থাকি। লোকটাও চুপচাপ প'ড়ে, ওর দিকে নজর দেবারও আমাদের তখন অবসর নেই!

অকস্মাৎ একটা কর্কশ কম্পিত স্বর কানে আসে: কমরেড্‌স্, শুধু রুটীর জন্যই এই সব করা!

আমরা সচকিত হ'য়ে উঠি, ছাত্রটী গলা খ্যাঁকারি দিয়ে মাথা নিচু ক'রে কাশতে সুরু করে।

—তোমায় মারতে চেয়েছিলাম ব'লে মনে হয়, না? কিন্তু তোমায় শুধু শুধু মেরে কি হবে বলো? সৈনিকের গলার স্বর শান্ত, ধীর, সংযত।

ছাত্রটী ফস্ ক'রে ব'লে ওঠেঃ সবুর করো, আগে খাবার কয়টা শেষ ক'রে নি, তারপর যা' হয় করা যাবে।

রাতের সুগভীর নিস্তব্ধতার মাঝে লোকটীর প্রবল জোর জোর নিশ্বাস প্রাণে আশংকা জাগিয়ে তোলেঃ কমরেডস্, আমি গুলি ছুঁড়েছিলাম ভয় পেয়ে।···সূর্য ডুববার পরই জ্বরে আমি বেহুঁস হ'য়ে পড়ি।······যাচ্ছিলাম স্মোলেনস্ক্-এ, সেখানে ছুতোর মিস্ত্রীর কায করি।···বাড়ীতে বৌটা আছে আর আছে দুটো মেয়ে, একটা তিন বছরের, আরেকটার বয়স চার।···বহুদিন তাদের দেখিনি!······

পরে আবার নিশ্বাস নিয়ে বলেঃ তোমরা ভালো মানুষ জানলে কি আর গুলি ছুঁড়ি! একে এই পোড়ো খাঁ খাঁ করছে মাঠ তার ওপর অন্ধকার রাত, আমায় মাপ কোরো কমরেড্স্।

—কেঁদে মরছো কেন? ঘৃণাভরে সৈনিকটী তিরস্কার করে।

—ওর কাছে টাকাকড়ি ও কিছু আছে। ছাত্রটী ইঙ্গিতে জানায়। চোখদুটো ছোট ক'রে সৈনিকটী লোকটার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসেঃ চলো আগুন তৈরী ক'রে একটু ঘুম দেওয়া যাক্।

—আর ওর কি হবে? ছাত্রটি প্রশ্ন করে।

—ও চুলোয় যাক্। আমরা কি করব তার?

—কিন্তু আমাদের ত কিছু একটা করা উচিত।

আমাদের ঘুম পাচ্ছিল, লোকটা তখন আমাদের কাছ থেকে গজ তিনেক দূরে শুয়ে নিজের মনে মনেই অস্পষ্ট গলায় কি ব'লে চলেছিলো। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলঃ কমরেডস্!

—কী, বলো?

—তোমাদের কাছে আগুনের ধারে গিয়ে একটুখানি বসবো?···সারা দেহ আমার শীতে কনকন করছে······আর মেয়েদুটোর মুখ দেখতে হবেনা···! এই ব'লে সে দীর্ঘনিশ্বাস চাপে।

—আচ্ছা স'রে এসো। ছাত্রটি অনুমতি দেয়।

আস্তে আস্তে মাটি ঘঁষে ঘষে সে সরে আসে। আলোয় দেখলাম লোকটা যেমন লম্বা তেমনি লিকলিকে রোগা, সারা দেহ তার ঠকঠক ক'রে কাঁপছে, মুখখানা মৃতদেহের মত ফ্যাকাশে, পাণ্ডুর ম্লান। অনুজ্জ্বল চোখদুটিতে বিষাদের ছায়া।

আগুনের দিকে সরু সরু হাত বাড়িয়ে সে তার হাড়সার আঙুলগুলো ঘষতে থাকে। শেষকালে এমন অবস্থা হোল যে তার দিকে আর চাওয়া যায় না।

—অ্যাকে এই অবস্থা, তার ওপর পা হেঁটেই বা যাচ্ছিলে কেন? পয়সা বাঁচাবার মতলবে বুঝি? সৈনিকটি বিরক্তি দমন করতে পারেনা।

—ওরা আমায় ক্রিমিয়ার পথে যেতে ব'লে জলপথে যেতে বারণ করলে। আর আমার হাঁটবার ক্ষমতা নেই।...এই খানেই ম'রে প'ড়ে থাকতে হবে আমাকে, কেউ জানবে না, কেউ খোঁজ নেবেনা।...বৌটা আর মেয়েদুটো আমার মুখ চেয়ে ব'সে থাকবে, যাবার খবর দিয়ে তাদের জরুরী একখানা চিঠি লিখে দিয়েছি কিনা।

সৈনিক বন্ধুটি চ'টে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: কি জ্বালা! মরবে ত শান্তিতে মরোনা, লোককে জ্বালাও কেন বকবক্ ক'রে?

—মাথায় একটা ঠোক্কর দাওনা তা' হ'লে চুপ করবে। ছাত্রটা উপদেশ দেয়। আমি তাকে উদ্দেশ ক'রে বললাম: ছাখো, তোমার যদি আগুন পোয়াতে হয় ত চুপচাপ থাকো, আমরা ততক্ষণ একটু ঘুমুই।

সৈনিকটি রুক্ষভাবে আমার কথার জের টেনে চলে, বুঝেচো ত? রুটি দিয়েচো ব'লে গুলি ভোলবার লোক আমরা নই। ছ্যাঃ!

আর কোনও কথা না বোলে সে হাত পা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ছাত্রটি আগেই শুয়ে পড়েছে লোকটার বাঁদিকে কুঁকড়ি-মুকড়ি মেরে, দেখে মনে হচ্ছিল ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও দেখাদেখি লোকটার ডানদিক ঘেসে এগিয়ে পড়লাম। মাথার নীচে হাতদুটো রেখে সৈনিক আকাশের দিকে চেয়ে রইলো।

মিনিট কয়েক পরে সে আমার দিকে ফিরে বলল: কি সুন্দর রাত আর কত তারা! এইরকম ভবঘুরের জীবনই আমার ভালো লাগে বন্ধু। 'কি অবাধ স্বাধীনতা!—হুমকি মেরে একটা কথা বলবার কেউ নেই, কি অনাবিল সুখ! এক'দিন না খেয়ে, মরমর হয়েছি তবু আমার কি মনে হচ্ছে জানো? ঐ তারাগুলো আমার দিকে তাকিয়ে যেন বলছে, 'লাকুতিন্, ভয় পেওনা এইভাবে জগতের বুকে ঘুরে বেড়াও, ঠিক, এমনি স্বচ্ছন্দভাবে কারো কাছে মাথা না নুইয়ে জীবনটাকে হেসে খেলে কাটিয়ে দাও'!

ওর কথা শুনতে শুনতে তন্দ্রায় আমার চোখ জুড়ে আসে।

—ওঠো, ওঠো চট ক'রে।

চমকে জেগে উঠি, তারপর তাড়াতাড়ি চোখ খুলে লাফিয়ে পড়ি লাকুতিনের কাঁধে ভর দিয়ে।

—চলো বেরিয়ে পড়া যাক্।

তার মুখ গম্ভীর, বিচলিত। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম! প্রভাত সূর্যের ব্যাপ্ত সমারোহে ইতিমধ্যেই ছুতোরমিস্ত্রীর স্থির পাংশু মুখ খানি রাঙা হ'য়ে উঠেছে। তার মুখ হাঁ করা, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসে অদ্ভুত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে; দেখলে ভয়ে গায় কাঁটা দেয়। পরণের যা' কিছু সব ছেঁড়া আর সে প'ড়ে রয়েছে মুখড়ে। ছাত্রটিরও কোনো হদিশ নেই।

হাতদুটো ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে লাকুতিন জেদাজেদি করে: হয়েচে তো, আর কেন? এবার চলো।

সকাল বেলাকার ঠাণ্ডা হাওয়ার আমেজে কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করি: লোকটা কি মারা গেছে?

—তা' আবার জিগ্যেস্ করতে হয়? কশে গলা টিপে ধরলে কেউ কি বেঁচে থাকে নাকি!

—কিন্তু ধরলে কে, ঐ ছোকরা বোধ হয়?

—তাছাড়া আর কে? দেখচো ত শিক্ষার কি গুণ! বেশ চালাকি ক'রে লোকটাকে সাবড়ে রেখে এখন আমাদের ফলভোগ করতে ফেলে গেছে। আগে জানতে পারলে একটি ঘুষিতে ওর জান নিয়ে নিতাম। এখন চলো মানে মানে পালাই যাতে কেউ এই প্রান্তরে আমাদের দেখতে না পায়। আজকেই ওকে এ অবস্থায় সকলে দেখতে পাবে আর খুনীকে খুঁজতেও বাকী রাখবেনা। তার ওপর ওই সব প্রশ্ন,—'কোত্থেকে আসছো', 'কোথায় রাত কাটিয়েছো' আর আমাদের ধরলে ত কথাই নেই।

—তার ওপর তোমার কাছে ওর রিভলভারটা রয়েছে। ওটা ফেলে দাওনা কেন।

ভাবতে ভাবতে সে বলে: ফেলে দোব? তুমি জানোনা এর দাম কত! তিন তিনটে রুবল এর দাম, তার ওপর এর ভেতর একটা গুলি পোরা আছে। আর ও শালা কত কি নিয়ে ভেগেছে তা'ই বা কে জানে?

—ওর মেয়ে দুটোর বরাতে ঐ পর্যন্ত!

—মেয়ে? হ্যাঁ, তারা বড় হবে, যৌবনের কোঠায় পা দেবে কিন্তু আমাদের তারা বিয়ে করবেনা কক্ষনো এটা নিশ্চয় জেনো। যাক্গে। চলো তাড়াতাড়ি আর দেরী নয়। কোন্ দিকে যাবে বলোতো?

—যেদিকে ইচ্ছে চলো। ও একই কথা।

—তা ঠিক, তবু চলো ডান দিক দিয়ে যাওয়া যাক্, ওইদিকে বোধহয় সমুদ্র পড়বে।

খানিকদূর গিয়ে আমি পেছন ফিরে তাকালাম। বহুদূরে প্রান্তরের ওপর কালো একটা ঢিবি, তার ওপরে সূর্যের আলো এসে জড়ো হয়েছে।

—কি দেখছো ও উঠল কিনা! ভয় নেই ও আর উঠে তোমায় তাড়া করতে আসবেনা। তোমার ও পণ্ডিতটী সেদিকে ভালো, ওকে একেবারে পুঁতে রেখে গেছে। আশ্চর্য!

নিশ্চল বিজন আলোঝলমল প্রান্তর প'ড়ে রয়েছে চারিদিকে হাত পা মেলে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় এই আলোর রাজ্যে হীন কায সংঘটিত হওয়া যেন অসম্ভব।

আধখানা সিগারেট মুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সঙ্গী বলে আজ আর খাওয়ার বাদবিচার নেই, কিছু পেলেই হল।

—কিন্তু আজ কি খাব, পাবই বা কোত্থেকে কেমন ক'রে?.........

প্রান্তর তোলপাড় হ'য়ে ওঠে এ প্রশ্নের প্রতিধ্বনিতে।*

ম্যাস কনট্র্যাক্ট

"কাফের"

এলাহাবাদ—মতিলালের এলাহাবাদ, জওহরলালের এলাহাবাদ। এলাহাবাদে 'আনন্দ-ভবন', এলাহাবাদে এ. আই. সি. সির দপ্তর! শৈশব হইতেই এলাহাবাদ আমার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। এলাহাবাদের কথা মনে পড়িলেই কল্পনায় ভাসিয়া ওঠে স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্রগামীদলের সৈনিকের দৃঢ় মুখচ্ছবি।

কয়েক বৎসর পূর্বে কি একটা মেলা উপলক্ষ্যে মনে নাই এলাহাবাদ দর্শনের সুযোগ মিলিয়াছিল। সহর পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলাম প্রত্যুষে, স্বরাজ ভবনের দ্বারে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা দ্বিপ্রহর। দ্বারে দ্বারবান নাই। মেলা প্রত্যাগত একদল গ্রাম্য নর-নারী গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে, দেখিলে মনে হয় ইহারা মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটিয়া দূর দূরান্ত হইতে সহরে আসিয়াছে। মাথা মুড়াইয়া, সঙ্গমে স্নান করিয়া পুণ্যার্জন করিয়াছে, গ্রামে ফিরিবার পূর্বে দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সবকয়টাই দেখিবে। 'স্বরাজ-ভবন', কংগ্রেসের 'বড়াদপ্তর'ও দেখিবে। নহিলে কোন মুখ লইয়া গ্রামে ফিরিবে? দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ইহাদের আলোচনার কথার টুকরাগুলি কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

[* Goky র 'In the steppes' গল্পের অনুবাদ]

ইতিমধ্যে একজন সাহসে ভর করিয়া উকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিয়া লইল। বারণ করিবার কিছুই নাই। সুতরাং একে একে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। আমিও ইহাদের সহিত কিছুটা ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর আসিয়া দেখি উহারা দল বাঁধিয়া একটা লনের বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। কি যেন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিতেছে মুখের ভাব এইরূপ। আগাইয়া আসিয়া দেখিলাম একটি বিলাতী আয়া গুটি কয়েক দেশী শিশুকে লইয়া খেলা করিতেছে। দৃশ্যটি আমিও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম।

সরু কাঁকরের পথ। আঁকিয়া বাঁকিয়া অগ্রসর হইয়াছে। চলিতে চলিতে আমরা এ. আই. সি. সির 'দপ্তরে'র সমুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সমুখে কয়েক ধাপ সিড়ি। তাহার পর বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়াইয়া কয়েকজন ভদ্রলোক ডেস্কের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সংবাদ পত্র পড়িতেছেন। ইহার পর হল ঘর। ঘরের মধ্যেকার টাইপ রাইটারের খটাখট শব্দ বাহিরে ভাসিয়া আসিতেছে। উপরে জাতীয় পতাকা, হাওয়ায় পৎ পৎ করিয়া উড়িতেছে।

বারান্দায় ওঠা সমীচীন হইবে কিনা উহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর সাহস করিয়া একে একে সকলেই বারান্দায় উঠিল। পাঠরত ভদ্রলোকেরা বাধ্য হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন একমুখ বিরক্তি লইয়া। বারান্দা হইতে হল ঘরের মধ্যে টাঙ্গানো কয়েকজন দেশনেতার ছবি চোখে পড়ে। কয়েকটা আলমারী আর কয়েকজন কর্মরত কেরাণী। হলের মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব। আঙ্গুলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, উকি দিয়া যতটা পারে দেখিয়া লইবার চেষ্টা সকলের মধ্যেই প্রবল।

গ্রামে থাকিতে ইহাদের ধারণা জন্মিয়াছে কংগ্রেস অফিস তীর্থস্থান। নেতাদের বহু বক্তৃতা ইহারা শুনিয়াছে। কংগ্রেস কিষাণ মজুরের 'হামী'। কংগ্রেসরাজ কায়েম হইলে কিষাণ মজুরের দুঃখ কষ্ট দূর হইবে। জওরলাল, আনন্দ-ভবন, আরোও কত কি ইহারা শুনিয়াছে। মনে জাগিয়াছে কংগ্রেসের প্রতি দরদ। সেই কংগ্রেস অফিসের এত সন্নিকটে আসিয়া দ্বার হইতেই ফিরিয়া যাইতে মন সরিতেছে না।

"এই চলো, ভীড় মৎ করো, যাও ইধারসে"। হল ঘরের মধ্য হইতে কোন এক দেশ সেবকের তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলির আশাদীপ্ত মুখগুলির উপর নামিয়া আসিল হতাশার ছায়া। একে একে সকলেই নীচে নামিল। আমিও।

এ. আই. সি. সির দপ্তর দেখা আর হইয়া উঠিল না।

ফিরিবার পথে কল্পনায় এলাহাবাদের পূর্ব ছবিটিকে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিলাম। এলাহাবাদ আসিল না, শুনিতে পাইলাম "এই চলো, ভীড় মৎ করো, যাও ইধারসে।"

———০———

মৃত্যুহীন

আর্যকুমার সেন

তিন মাস আগের কথা।

পাশের বাড়ির হরিশবাবু আসিয়া বলিলেন, "পরশু আমার বাড়িতে আপনাদের সকলের নেমন্তন্ন।"

অবাক হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি দক্ষিন হস্তের অনামিকা বাহির করিয়া দেখাইলেন। একটি কুশের আঙঠি।

বলিলাম, "বিয়ে করেছেন? কবে?"

"পরশু।"

"তা এমন নিঃশব্দে সারলেন কেন?"

নিঃশব্দে সারার কারণ সোরগোল করিবার কিছু ছিল না বলিয়া। হরিশবাবুর পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স, বিপত্নীক। দ্বিতীয়বার বিবাহ করার বাসনা তাঁহার কোনোদিন ছিল না। শুধু এক অনাথা বিধবার দায় উদ্ধার করিয়াছেন। খুব যে অনিচ্ছার সঙ্গে, তাহা নহে। বধূ সুন্দরী।

একটি ছোটখাট রাস্তার উপরে একখানি পুরানো বাড়ি ভাড়া লইয়া আমরা কয়েকজন মিলিয়া মেসবাসী হইয়াছি। হরিশবাবুই প্রথম যাচিয়া আলাপ করেন। বলিয়াছিলেন, "একা মানুষ পড়ে থাকি, তিনকুলে ত কেউ নেই! অন্ততঃ গোটাকয়েক কাঁধ দেওয়ার লোক ত দরকার!"

তিনি নাকি অশুভ আশঙ্কাতেই আমাদের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আজ দেখিয়া খুশি হইলাম সে পরিচয়ের প্রথম অঙ্ক শুভ কর্ম্মে ভূরিভোজনে। সানন্দে আমন্ত্রন গ্রহণ করিলাম।

বধূর বয়স ষোলসতেরোর বেশী নহে। সেদিক দিয়া হরিশবাবুর সঙ্গে একটু বেমানান। তা হোক, অনাথা বিধবার মেয়ে স্বচ্ছল ঘরে আশ্রয় পাইয়াছে, সেটাই বড় কথা।

তিন মাস পরের কথা।

শনিবার বিকালের দিকে একটু সিনেমায় যাইব ভাবিতেছি, দ্বারদেশে হরিশবাবু দেখা দিলেন। চুল উস্কোখুস্কো, কোটরগত চক্ষু।

শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে হরিশবাবু? অসুখবিসুখ করেনি ত?

হরিশবাবু সে কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, "শ্মশানে যেতে পারবেন?"

চমকিয়া কহিলাম, "সে কি?"

হরিশবাবু বলিলেন, "সুকুমারী মারা গেছে খানিক আগে।"

স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

কয়েকদিন আগে সামান্য জ্বর হইয়াছিল। সুকুমারী চাপিয়া যায়। ফলে জ্বরের, অবশ্যম্ভাবী বৃদ্ধি, এবং তাহার পরে আজকের ঘটনা।

সুকুমারী পালঙ্কে শুইয়া আছে। সহসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, যে এ সুকুমারী সে নহে, যাহার শুভ আগমন উপলক্ষ্যে আমরা তিন মাস আগে এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলাম। অথচ সে সুকুমারী ছিল রক্তমাংস দিয়া গঠিত মানুষ, আজকের সুকুমারী মৃতদেহ মাত্র। যে মুখে চকিত হাসি অশ্রু ফুটিয়াছে শরৎকালের মেঘ ও রৌদ্রের মত, সে মুখে হাসি এখনও লাগিয়া আছে, শুধু তাহাতে প্রাণ নাই। সুকুমারী পৃথিবীর তুচ্ছ হাসি কান্না মান অভিমানের অনেক ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে।

স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, হরিশবাবু কহিলেন, "একবার বাজারের দিকে যান, একখানা খাটিয়া নিয়ে আসুন।"

একজন খাটিয়া আনিতে চলিয়া গেল।

এই ঘরেই সুকুমারীকে নববধূরূপে দেখিয়াছিলাম। পরণে লাল বেনারসী শাড়ী, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার। রূপ যেন দেহে ধরিতেছিল না। সে রূপের অনেকখানি অংশ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু আর বেশীক্ষণ থাকিবে না।

যে সিঁড়ি দিয়া নববধূ সুকুমারী লাল চেলি পরিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, সেই সিঁড়ি দিয়াই তিন চার জনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে নামাইয়া আনিলাম।

শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে একজন বলিল, "বল হরি—।" বাকী কথাগুলি আর কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল না। নিঃশব্দে শব বহিয়া চলিলাম। হরিশবাবু সঙ্গে চলিলেন। ক্রন্দনরত কেহ পিছনে পড়িয়া রহিল না, কারণ আর কেহ কাঁদিবার লোক নাই।

আশ্চর্য! যাহাকে কোনদিন চিনিলাম না, শুধু একদিন মাত্র যাহাকে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলাম, তাহারই শব দেহ বহন করিবার ভার পড়িল আমাদের উপর! জীবনে আমাদের উপরে যাহার কোনো অধিকার ছিল না, মৃত্যুর পরে এ অধিকার তাহার কোথা হইতে আসিল!

যাহাকে লইয়া প্রশ্ন তাহার নিকট হইতে আর এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীর অনেক সমস্যার মত এ সমস্যাও অপূর্ণ রহিয়া গেল।

শ্মশানে একসঙ্গে পাঁচটি চিতা জ্বলিতেছে। প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া মানুষ, যে সারাজীবনের দেনাপাওনার খেলা শেষ করিয়া চিতাগ্নির নীচে শেষ আশ্রয় পাইয়াছে। প্রাচীর বেষ্টিত সমস্ত শ্মশান আগুণের রঙে লাল।

মন্ত্র পড়িয়া সুকুমারীর মুখাগ্নি হইয়া গেল।

বাহিরে আদি গঙ্গার ধারে আসিয়া বসিলাম।

ঘাটের উপরে শানবাঁধান খানিকটা স্থান, উপরে ছাদ। মেঝের উপরে কয়েকটা লোক নিঃশব্দে ঘুমাইতেছে।

একটা স্ত্রীলোক, সন্ন্যাসিনীও হইতে পারে, পাগলী হওয়াও আশ্চর্য নয়, আপন মনে বিড়বিড় করিতে করিতে এক কোণায় আশ্রয় লইল। পরিধানে ময়লা একটা গেরুয়ারঙের আবরণ মাথায় জটা। একটা ছিন্ন অতি মলিন কাঁথা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া সে ঘুমের আয়োজন করিতেছে। এক পাশে দুটি লোক গায়ের চাদর মাটিতে বিছাইয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, দেখিলে মনে হয় শ্মশানঘাটে রাত কাটানোতে তাহারা অনভ্যস্ত নহে।

একজন সন্ন্যাসী আসিয়া একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি মাথার নীচে দিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল। লোক দুটি ভ্রুক্ষেপও করিল না।

সহসা সন্ন্যাসীর বিকট চীৎকারে চমকিয়া উঠিলাম। "ব্যোম, ব্যোম, হর হর শঙ্কর!" মনে পড়িল রাত্রি যত গভীরই হোক, শ্মশানে যাহারা ঘুমাইতে আসে, এটুকু গোলমালে তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, ইহার চেয়ে অনেক বেশী গোলমালেও না।

দেওয়ালের রঙ এককালে সাদাই ছিল। এখন তাহার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কাঠকয়লার কলঙ্কের ছাপ। ছাদ পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

অজস্র নাম। গত দুই তিন বৎসর ধরিয়া এ শ্মশানে যত লোকের শেষকৃত্য হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই নাম বোধহয় কাঠকয়লার সাহায্যে দেওয়ালের গায়ে আশ্রয় লইয়াছে। কাঠকয়লা কোথা হইতে আসিয়াছে সম্ভবতঃ না বলিলেও চলে।

জীবিত ব্যক্তির নাম যে নাই, তাহা নহে। এদিক ওদিক খুঁজিলে দুই একটা নাম চোখে পড়ে যাহাদের আগে শ্রী শব্দটি রহিয়াছে। বাকী সবগুলির আগে একটি করিয়া চন্দ্রবিন্দু। ৺ভূমোহন রায়, ৺হরেন্দ্রনাথ বসু, ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এমনি অনেক নাম, সংখ্যাহীন।

মনে মনে হাসিলাম। মানুষের অমরত্বের কি দুর্নিবার স্পৃহা! যেখানে লোকের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত চিতার আগুনে মুছিয়া দিতে আসিয়াছে, যেখানে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে মৃত্যুই একমাত্র সত্য, জীবন চরম মিথ্যা, সেইখানেই মানুষ অমরত্বের আশা করিয়াছে। নাম লিখিয়াছে কাহার? যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের? না। যাহারা এ জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ চিরকালের জন্য চুকাইয়াছে, সারাজীবন মৃত্যুর সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া পরাজিত হইয়াছে, তাহাদের নাম।

অন্যমনস্কভাবে শুনিলাম সন্ন্যাসীও সেই কথাবলিতেছে। নিদ্রালু লোক দুটি সহসা তাহাকে পরম দার্শনিক সাধু ঠাওরাইয়া শ্রদ্ধাভরে তাহাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে, এবং মন দিয়া তাহার উত্তর শুনিতেছে।

সন্ন্যাসীর ভাষা হিন্দী ও বাংলা মিশ্রিত। পৃথিবীটা যে কিছুই নহে, মায়া প্রপঞ্চ, এই তাহার উপদেশের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু সে কথা জানিবার জন্য গঞ্জিকাসেবী মলিন গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর সাহায্যের কি প্রয়োজন বুঝিলাম না। শ্মশানের সম্মুখে বসিয়া যাহারা তিলে তিলে প্রিয়জনের দেহ ভস্মীভূত হইতে দেখিতেছে, তাহারা কি এ সত্য এত সহজে ভুলিয়া যাইবে? শ্মশান হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে?

সহসা কোণে শায়িত সন্ন্যাসিনী গোঙাইয়া উঠিল। লোক দুটির একজন বলিল, "কিরে পাগ্‌লী, মশায় কামড়াচ্ছে?"

পাগ্‌লী তেমনি ক্রন্দনজড়িত স্বরে উত্তর দিল, "আমি পাগল না।"

সন্ন্যাসী সহসা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, "সে আমি জানি।"

তাহার নবলব্ধ শিষ্যদ্বয় কি যেন বলিতে যাইতেছিল, সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া মুখব্যাদান করিয়াই রহিল।

পাগলী আপন মনেই বারকতক বলিল, "আমাকে খালি খালি পাগল পাগল করিস্‌নে, আমি পাগল না।"

কথাটা পাগল মাত্রেই সম্ভবতঃ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকে; কাজেই কিছুমাত্র অবাক হইলাম না। কিন্তু সন্ন্যাসী শুইয়া শুইয়াই বলিল, "মা একটু চরণ সেবা ক'রে দেব?"

বুঝিলাম ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে। পাগলী অনুনাসিক কণ্ঠে বলিল, "খবরদার, আমায় ছুঁস্‌নে!"

সন্ন্যাসী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হুকুম না পেলে ছোঁব কেন মা?"

লোক দুইটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রশান্ত নিদ্রা। সশব্দে তাহাদের নাক ডাকিতেছে।

সন্ন্যাসী আপন মনেই খানিকটা উপদেশ দিল। কহিল, "অমর হতে চাও ত পৃথিবীর মোহ ত্যাগ কর—ইত্যাদি" অর্থহীন অনেকখানি প্রলাপ। নিদ্রিত লোকদুটির নাক ডাকা থামিল না।

আপন মনে বলিলাম, "অমর হতে চাও ত এই জায়গাটার দেওয়ালে বড় বড় করে নাম লেখো, ৺অমুক চন্দ্র তমুক।"

সন্ন্যাসী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সন্ন্যাসিনী ঘুমের মধ্যেই গোঙাইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে সশব্দে চড় মারিয়া মশা মারিতেছে।

রাত অনেক হইয়াছে। গঙ্গার ওপারে চেৎলার একটি বাড়িতেও আলো জ্বলিতেছে না। সম্ভবতঃ দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে।

ঘাট ছাড়িয়া উঠিলাম। এতক্ষণে সুকুমারীর দেহের আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে?

চিতা এখনও ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। ঘাট হইতেই খানিকক্ষণ পরপর তিনবার হরিধ্বনি শুনিয়াছি। তিনটি নূতন শবদেহ আসিয়াছে। পুরাণের চিতার দুইটার কাজ শেষ হইয়াছে, সেখানে নূতন দেহের উপর নূতন করিয়া চিতা জ্বলিয়াছে। একটা দেহ তখনও পড়িয়া আছে, কাঠ আসিয়া পৌঁছায় নাই।

এক অতিবৃদ্ধার মৃতদেহ। অস্থির উপর চর্ম ভিন্ন আর কিছু নাই বলিলেও চলে, কিন্তু সধবা। সমস্ত কপালটা সিঁদুর দিয়া লেপা, দুই পায়ে আলতা।

যাহারা আনিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহাদেরই একজন, কালো রঙ, খালিগায়ের উপর গামছা জড়ানো, তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "দু ঘন্টাও লাগবে না, ওতে আছে কি ?"

যেন বাকি শবদেহগুলির মধ্যে কিছু আছে! যেন চিতা জ্বলিয়া শেষ হওয়ার পরে কোনোটিরই মধ্যে আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে!

যাত্রীশালার বারান্দায় সঙ্গীরা আর একটি পাগলী জোগাড় করিয়া আলাপ জুড়িয়াছে। সময় কাটানো দরকার। সুকুমারীর দেহ নিশ্চিহ্ন হইতে এখনও বেশ খানিকটা বাকী আছে।

পাগলী তাহার জীবনের ইতিহাস বলিতেছে। যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিচিত্র। যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলেও বিচিত্র, কারণ গল্পের মধ্যে উদ্ভাবনাশক্তির প্রচুর পরিচয় আছে। সঙ্গীরা হাঁ করিয়া গল্প গিলিতেছেন।

পাগলীর বাপের বাড়ি এঁড়েদহ, শ্বশুরবাড়ি বরিশাল। সে সুন্দরী না হওয়ায় স্বামী তাহাকে ত্যাগ করেন, তখন সে নিজে উদ্যোগী হইয়া নিজের মামাতো বোনের সহিত স্বামীর বিবাহ দেয়।

একজন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার স্বামী কি করেন ?" পাগলী উত্তর দিল, "সিভিল সার্জন। খুব ভালো ফোঁড়া কাটতে পারে।"

সিভিল সার্জন অর্থে যে ফোঁড়া কাটার ডাক্তার, তাহা জানা ছিল না। একজন বলিলেন, "কোথায় থাকেন তিনি ?"

পাগলী এতক্ষণ আপন মনে হাসিতেছিল। বলিল, "কে আবার কোথায় থাকেন ?"

"আপনার স্বামী, সেই সিভিল সার্জন ?"

পাগলী বিরক্ত হইয়া বলিল, "স্বামী আবার কোথায় দেখলে তোমরা ? একশবার বলছি মামাতো ভগ্নীপতি—"

"আচ্ছা তাই না হয় হল।"

"সে এলাহাবাদ থাকে।"

সহসা বলিলাম, "আপনার বাপের বাড়ি কোথায় ?"

"কাটোয়া।"

"আর শ্বশুর বাড়ি ?"

"বিক্রমপুর।"

এইবার সকলে মিলিয়া একসঙ্গে চাপিয়া ধরিলাম। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে এঁড়েদহ ও বরিশাল যথাক্রমে কাটোয়া ও বিক্রমপুরে পরিণত হইলে আপত্তির যথেষ্ট কারণ আছে।

পাগলী একেবারেই দমিল না। বলিল, "বিক্রমপুর হচ্ছে আমার আসল শ্বশুরবাড়ি—আর—"

একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন, "আর বরিশাল হল নকল শ্বশুরবাড়ি—কেমন ?"

পাগলী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা পাগলদের পাল্লায় পড়া গেছে, একটা সোজা কথা বোঝে না।"

অগত্যা আলাপের ধারা পরিবর্তিত করিতে হইল। স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন, "আচ্ছা, আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন ত ?"

পাগলী বলিল, "কেন ? এইখানেই ! তাছাড়া কাশীমিত্তিরের ঘাট আছে, নিমতলা আছে—"

"রক্ষে করুন, শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ানো আমার ব্যবসা নয়। আমার মনে হচ্ছে আপনাকে রাঁচিতে দেখেছি—"

সকলে হাসিলাম। পাগলী বলিল, "খুবই সম্ভব। রাঁচির শ্মশানঘাটে আমি এক নাগাড়ে বারোবছর তপিস্যে করিছি।"

এমনি অসম্বদ্ধ খানিকটা প্রলাপ। আমরা যে শ্মশানঘাটে বসিয়া আছি, সামনে একসঙ্গে ছ'টা চিতায় ছয়টি নর-নারীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইতেছে, তাহা যেন কাহারও মনে নাই। হরিশবাবুরও না।

বাঁ দিকে পাঁচিলের পাশ ঘেঁসিয়া সুকুমারী। প্রজ্বলিত কাষ্ঠের ভিতর দিয়া পা দুইখানি দেখা যাইতেছে, খানিক আগে যে পা আল্‌তা দিয়া রঞ্জিত করিয়া আনিয়াছিলাম। অবশিষ্ট আছে দুইখণ্ড অঙ্গার। খানিক পরে তাহাও থাকিবে না।

বাহিরে ঘাটের ধারে লোকগুলি বোধ হয় এতক্ষণে মশার কামড় উপেক্ষা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সামনে আরও কয়েকজন ঘুমাইতেছে, জাগরণহীন নিদ্রা। শুধু আমরা জনকয়েক শববাহক বসিয়া শ্মশান ঘাটের শান্তি ভঙ্গ করিতেছি।

আরও অনেকক্ষণ পরে। কতক্ষণ পরে মনে নাই, কারণ এখানে সময়ের কোনো দাম নাই, অস্তিত্বও নাই। অনন্তকালের সহিত পাল্লা দিয়া মানুষের হাতে গড়া ঘড়ির সময় কতটুকু চলিবে।

চিতা নিভিয়া গিয়াছে।

তবু যেটুকু বাকী আছে, কলসে কলসে আদি গঙ্গা হইতে কর্দমাক্ত জল আনিয়া তাহাও নিভাইয়া দেওয়া হইল। হরিশবাবু বলিলেন, "এইবার এক কলসী জল এনে চিতার উপর ভেঙ্গে দিয়ে চলে যান; দেখবেন, কেউ যেন পিছন ফিরে দেখবেন না!"

কে পিছন ফিরিয়া দেখিবে? যাহার সহিত পরিচয় ছিল না কোনদিন, মৃত্যুর আবির্ভাবে শুধু একরাত্রির জন্য পৃথিবীশুদ্ধ সবাই তাহার পরমাত্মীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, চিতা নির্বাপিত। নবলব্ধ পরিচিতার আর কোন চিহ্ন পৃথিবীর উপরে অবশিষ্ট নাই—দেহের প্রত্যেকটি অণুপরমাণু আকাশে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে।

কে পিছন ফিরিয়া চাহিবে? কাহার জন্য পিছন ফিরিয়া চাহিবে? সুকুমারীর জন্য? সুকুমারী ত একরাত্রি আগে মৃত্যুময় জীবনের ক্ষণিক পান্থশালায় বিশ্রামের পর অসীম পথে, মৃত্যুহীন অমরত্বের পথে যাত্রা করিয়াছে!

শ্মশানঘাটের প্রাচীরে যাহাদের নাম লেখা আছে, তাহারাও ঐ একই পথের যাত্রী। শুধু কোন্ অতিপ্রিয় আত্মীয়, অথবা একান্ত অনাত্মীয় শ্মশানবন্ধু ক্ষণিকের দুর্বলতায় তাহাদের নাম অমর করিয়া রাখার প্রয়াস পাইয়াছে, মৃতচিতার অঙ্গার খণ্ডের সাহায্যে।

বাহিরে আসিয়াছি। সহসা কি মনে করিয়া সকলের বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া আবার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সঙ্গীরা অবাক হইয়া রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চিতার উপরে কাঠকয়লার রাশি ও ছাইয়ের স্তূপ। তাহারই মধ্য হইতে একটুকরা কাঠকয়লা উঠাইয়া লইয়া বাহিরে গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গেলাম। অনেক কষ্টে একটুখানি সাদা জায়গা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লিখিলাম,

শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।

একটু ভাবিয়া "শ্রীমতী" কাটিয়া একটা চন্দ্রবিন্দু বসাইয়া দিলাম।

আর্থিক জগত

জিতেন্দ্র গোস্বামী

দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ কনফারেন্স

কিছুকাল পূর্বে ভারত সরকারের প্রেস নোট প্রকাশিত হয়েছে তাহার তাৎপর্য এই "স্পেকুলেসন ও নানা কারণে বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ভারত সরকার এ বিষয়ে অবহিত আছেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব আর একটি মূল্য নিয়ন্ত্রণ কনফারেন্স আহ্বান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইতিমধ্যে জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাহারা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য ক্রয় না করেন কারণ অতিরিক্ত ক্রয়ে স্পেকুলেটারদের প্রভাবে মূল্য বৃদ্ধি পায়।" *

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরবর্গের সম্মুখে প্রদত্ত বক্তৃতায় গবর্ণর স্যার জেমস্ টেইলর সেদিন বলেছিলেন যে বিগত দ্বাদশমাসের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ১৯৩৯ সালের শরৎকালে যুদ্ধারম্ভের ত্রাস ও ডানকার্কের দুর্গতির অব্যবহিত পরবর্তী কালের স্বল্পকালস্থায়ী দ্রব্যমূল্যের উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যতীত ব্যাপক ও শঙ্কাজনক বিপর্যয়, কখনও ঘটেনি। যেটুকু উর্দ্ধগামিতা দেখা দিয়েছে তা সাধারণ এবং স্বাভাবিক বলে নিঃশঙ্কচিত্তে মেনে নেওয়া যেতে পারে। স্যার জেমসের বক্তৃতার মাসখানেকের মধ্যেই দ্রব্য মূল্যের এমন আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছে যে জনসাধারণ তথা কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বিষয়টির গুরুত্ব স্থানীয় ও সর্বভারতীয় দ্রব্য মূল্যের আপেক্ষিক মান-নির্দেশক সংখ্যা বা "Price or Index number" এর সাহায্যে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যাবে। কলিকাতার সাধারণ দ্রব্য মূল্যের মান ১৯৪০ সালের মে মাসে ছিল ১১৭, ১৯৪১ সালের মে মাসে তাহা বেড়ে ১৩০ হয়েছিল; জুন মাসে তা ছিল ১৩৮ এবং জুলাই মাসে বেড়ে হয়েছে ১৪৯। বোম্বাইয়ের অঙ্ক এখনও নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়নি তবে বিশেষজ্ঞদের মতে জুন মাসের ১২৭ থেকে জুলাই মাসে তা ১৪০এ উঠেছে। এই বৎসরের জানুয়ারীর তুলনায় কলিকাতার দ্রব্য মূল্যের সাধারণ মান ২৮ পয়েণ্ট এবং বোম্বাইয়ের ২৩ পয়েণ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সঙ্গে এও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কলিকাতায় দ্রব্য মূল্যের বর্তমান মান যুদ্ধারম্ভের (অর্থাৎ ১৯৩৯ নবেম্বর ডিসেম্বর) কাল থেকেও

---

* "There has recently been a visible tendency for the prices of various commodities including textiles, to rise sharply, partly due to speculative influences and partly to more substantial reasons. The Government of India are giving the closest attention to this object and propose to convene another Price Control Conference as early as possible. Meantime, the best service the public can render to themselves is to refrain from making purchases in excess of their normal requirements, as such purchases only serve to encourage those speculative influences which contribute to a rise in prices"—

১২ পয়েণ্ট এবং প্রাক্‌যুদ্ধ কাল থেকে ৪৯ পয়েণ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রব্য হিসাবে ভাগ কর্লে দেখা যায় চাউল গম, ভুট্টা ইত্যাদির মূল্য বেড়েছে ৬ পয়েণ্ট, ডাল ইত্যাদির ৯ পয়েণ্ট, চিনির ৮ পয়েণ্ট চায়ের ২২ পয়েণ্ট। একথা বিশেষ লক্ষ করার ব্যাপার যে গত তিন মাসে চায়ের দামের বৃদ্ধি ঘটেছে ৬৫ পয়েণ্ট এবং বস্ত্র ও বস্ত্রজাতের ৫৬ পয়েণ্ট।

১৯৪১ সালের প্রথম ভাগে সাধারণভাবে ক্রমবর্ধিত দ্রব্য মূল্যের কারণ নিরুদ্বিগ্নচিত্তে যুদ্ধের স্বাভাবিক ফল বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিগত দু'তিন মাসের আকস্মিক ও অভাবনীয় বৃদ্ধির পেছনে বিশ্বব্যাপী মহাসমর সংক্রান্ত বিপর্যয় ছাড়াও অধিকতর শক্তিশালী স্থানীয় ও সাময়িক কারণ বর্তমান এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। স্পেকুলেটর বা ফাট্‌কাওয়ালা কারসাজি চাহিদা ও যোগানের এই অসাম্যের সুযোগকে যথাসম্ভব ব্যবহার করে দ্রব্য মূল্যের এই আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক গগনে কৃষ্ণমেঘের ঘনায়মান ছায়ার সুযোগ নিয়ে একদিনেই চিনির বাজার এতোখানি বেড়ে উঠেছিলো যে সিণ্ডিকেটের কর্তারা Quota র পরিমাণ বৃদ্ধি করে মূল্য বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রেহাই পেলেন। মালবাহী জাহাজের অভাবে বর্মাথেকে প্রয়োজন মত আমদানি হতে পায়নি বলে চাউলের মূল্য আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে, এই জাহাজী অব্যবস্থার অন্তরালে বর্মায় ফাটকাওয়ালার সুনিপুণ হস্ত কতখানি কাজ করেছে সে বিষয় তদন্ত সাপেক্ষ। স্বাভাবিক কারণের সুযোগ নিয়ে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সুকৌশলী প্রয়োগ বর্তমানে অর্থনীতিক্ষেত্রে অরাজকতার সৃষ্টি করেছে ও করে চলেছে। ইহা স্বীকার কর্তেই হ'বে যে বাড়্‌তির বাজারে যোগান যখন চাহিদার সঙ্গে সমপদক্ষেপে চল্‌তে সক্ষম নয়, তখনই ফাটকাওয়ালার দ্রব্য মূল্যের যদৃচ্ছা ব্যবহার করবার সুযোগ ঘটে। এতকাল প্রাদেশিক সরকারের উপর মূল্য নিয়ন্ত্রণের সকল দায়িত্ব চাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন কিন্তু কার্যতঃ প্রাদেশিক সরকার যে এ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কর্তে পারেননি ক্রমবর্ধিত দ্রব্য মূল্য তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের সর্বত্র যে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি হ'য়েছে তার পরিণাম দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলার পরিপন্থী হ'য়ে উঠেছে; "Bread riot" গোছের সম্মিলিত অভিযান ও বলপ্রয়োগ পূর্বক লুটতরাজ ইতিমধ্যেই সংঘটিত হ'তে সুরু করেছে। ব্যাপক ও মারাত্মকভাবে কর্তৃপক্ষের শাসন শৃঙ্খলাকে অমান্য করার রূপ পরিগ্রহ করা শুধু সময়সাপেক্ষ। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবিলম্বে অবহিত না হোলে, এই ব্যাপারে দীর্ঘকাল হরণ করার মধ্যে শুধু যে দুর্গতিকে অনাবশ্যক বাড়িয়ে দেওয়া এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের অর্থ শোষণ করবার নিরঙ্কুশ অধিকার মেনে নেওয়া হচ্ছে তাই নয়, ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতে বাজারের অবস্থা কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের গণ্ডীর বাইরে চলে যাচ্ছে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।
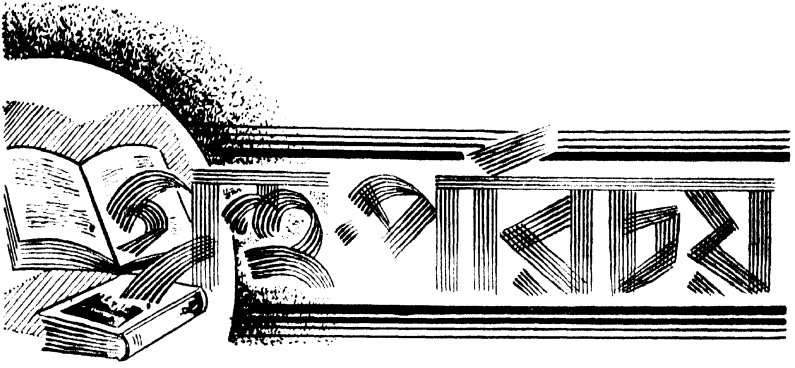
দৃষ্টিকোণ—শ্রীজ্যোতির্ময় রায়। "কবিতা ভবন" ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, প্রাপ্তিস্থান—ডি-এম-লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম ১৷০ পৃঃ ১৬০।

বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার বাহুল্য আছে, কিন্তু সাহিত্যলক্ষণাক্রান্ত গদ্যের পরিমাণ এখনো যথেষ্ট কম। আদি থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত যা আমাদের গদ্য রচনা, তা হচ্ছে প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ প্রসঙ্গাত্মক—তার লক্ষ্য হ'ল সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, আচার, অনুষ্ঠান আরো অনেক কিছু নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা। কাজেই সাম্প্রতিক সমাদরের মাশুল আদায় করেই তা প্রবহমান সাহিত্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার, দেবেন্দ্র নাথ, টেকচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল, সকলেরই মূল্য আজ যতটা ঐতিহাসিক, ততটা সাহিত্যিক নয়। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয় চন্দ্র সরকার এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যকে সাহিত্যিক কৌলীন্যে অভিষিক্ত করলেন—কিন্তু তখনো পর্যন্ত তার শিক্ষক রূপটাই রইলো বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে।

বলা অনাবশ্যক যে এর প্রয়োজন ছিল। বাংলা গদ্যই মোটের ওপর একালের সৃষ্টি—তার কোন কৌলিক গরিমা নেই। শ্রীরামপুরের পাদ্রী পণ্ডিতদের হাতে ধর্মপ্রচারের বাহনরূপে যার জন্ম, এঁরা তাকে দেশ-বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিচার-বৈদগ্ধ্যে সমৃদ্ধিশালী করে না তুললে, তার শব্দভাণ্ডার ও প্রকাশভঙ্গী নানা বিচিত্র পথে প্রবাহিত করার উপযোগী করে না তুললে, রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বিশেষ বেগ পেতে হত। রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন প্রায় তৈরি একটা ভাষা—যাতে একই সঙ্গে ছিল বস্তুর সঞ্চয় ও ভঙ্গীর সাবলীলতা। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর সৃজনী প্রতিভা প্রয়োগ করে অতি অনায়াসেই তাকে ঐশ্বর্য মণ্ডিত করে ফেললেন। এখন থেকে যা আমাদের গদ্য, তার একটা মাপকাঠি নির্ণয় সম্ভব—কারণ অতি সাধারণ লেখকের রচনাও এর পর একটা বিশেষ স্তরের নীচে নামে না।

এর কারণটা সহজ। রবীন্দ্রনাথ এমন একটা ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এলেন, সেই সঙ্গে নিয়ে এলেন এমন একটা সহজ নমনীয় বিন্যাসপদ্ধতি, যাতে গদ্যরচনা অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলো। জাতি গঠন, সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার যে কোন দিকেই তাকে নিয়োজিত করা হক, তা প্রথমতঃ হতে লাগলো

সাহিত্য, তারপর আর কিছু। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যই তার প্রধান দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রানুগামী যুগের প্রমথ চৌধুরী এরপর আনলেন আর একটা জিনিষ—রবীন্দ্রনাথের অব্যক্তিক ভাবমুখিতা এবং অতি-অলঙ্করণকে তিনি আর একটু সহজ করে, তাতে সঞ্চারিত করলেন একটি ঋজুতা। বাংলা কথ্য ভাষা নিয়ে পরীক্ষা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই, রবীন্দ্রনাথ ও হাত দিয়েছিলেন এই পরীক্ষায়, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীই তাকে সর্ববিধ আলোচনার অনন্য বাহন করে তুললেন। এইখান থেকেই আধুনিক গদ্যের সূচনা—এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। নানা বিচিত্র পথে, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে আজ তা হু-হু করে এগিয়ে চলেছে—বিচারে বিতর্কে, আলাপে আলোচনায়, রসে রসিকতায় তার সমৃদ্ধি আজ প্রচুরায়ত হতে চলেছে। আরো সৌভাগ্য যে প্রসঙ্গাত্মক গদ্য ও রসাত্মক গদ্যের ভেতর আজ সুস্পষ্ট একটা সীমারেখা গড়ে উঠেছে, যার ফলে বিষয়ভারাক্রান্ত সাম্প্রতিক রচনাকে আজ আর কেউ সাহিত্য বলে ভুল করেন না।

এই ক্রমোন্নতির পথেই বাংলা গদ্যে এসেছে নূতন একটা জিনিষ—ইংরেজীতে একে বলা হয় personal essay, বাংলায় বলা যাক ব্যক্তিক নিবন্ধ। রবীন্দ্রনাথেই আছে এর রূপ, প্রমথ চৌধুরীতে ও আছে—কিন্তু এর সত্যিকার উৎকর্ষ হয়েছে অতি আধুনিক কালে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, সঞ্জীব চন্দ্র, নবীন সেন, চন্দ্রনাথ বসু এবং আরো কোন কোন লেখকের রচনায় এক ধরণের আত্মবীক্ষাসূচক নিবন্ধ দেখা যায়—যার উদ্দেশ্য সমসাময়িক জীবন ও তার পারিপার্শ্বিককে হাল্কা হাতে এঁকে যাওয়া এবং সেই অঙ্কনের মুখে তার ওপর নিজের মনের রং ফেলে চলা। বলা বাহুল্য ব্যক্তিক নিবন্ধের প্রাথমিক কাঠামো এই—কিন্তু এরি সঙ্গে চাই একটা সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গী, যা না থাকলে শিল্প হিসাবে রচনা কোন রকমেই দানা বাঁধতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের আগে ঠিক সেই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী খুব সুলভ ছিল না, তাই এদিক থেকে কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর সাহিত্য ও হতে পারেনি তাঁর আগে।

আধুনিক কালে যাঁরা এই দিকে লেখনী চালনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল ও বুদ্ধদেব বসুর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এঁরা তিন জনেই জোর দিয়েছেন বিশেষ করে ভ্রমণের কথা লেখার ওপর—পথে বিপথে চলতে ফিরতে যে সমস্ত ছবি চোখে পড়ে, যে সমস্ত লোক এসে পড়ে হাতের সামনে, যে সমস্ত ছোটখাটো ঘটনা ঘটে তার ভেতর দিয়ে নিজের মনের অনুভূতিগুলোকে আলতো আলোয় ফুটিয়ে যাওয়াতেই তাঁদের হাত খেলেছে খুব ভালো। বুদ্ধদেব এ ছাড়াও লিখেছেন ব্যক্তিক নিবন্ধ—যাতে আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ এবং প্রাত্যহিক সংসারে অনেক সময় উপেক্ষণীয় জিনিষ তাঁর মনের আলোতে রঙীন হয়ে ফুটে উঠেছে। এই হল খাঁটি জাতের personal essay র দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এখানেও আছে একটা ছোট আপত্তি। এতটা রং কেন? প্রত্যেক অভিজ্ঞতাকে রঙের জৌলুসে আবিল করে তুললে স্বভাবতঃ লেখক পাঠকের অনুরাগের ওপর দাবীদার হয়ে ওঠেন, কিন্তু এই রংকে সংহত করে তুলতে পারলেই তাঁর দ্বারা সম্ভব সত্যিকার বিচারের সম্মুখীন হওয়া। এই দিক দিয়ে সম্প্রতি একজন লেখক খুব বড় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—তিনি হলেন জ্যোতির্ময় রায়।

এর আগে গল্প লেখায় নিজস্ব বৈশিষ্টের পরিচয় দিয়ে তিনি ভালো করেই প্রমাণ করেছেন যে তাঁর চোখে দৃষ্টির অভিনবতা এবং হাতে প্রকাশের সাবলীলতা আছে। তারি রকম ফের দেখলাম তাঁর নূতন প্রবন্ধের বই 'দৃষ্টিকোণে'। এই বইটি শুধু বাজারেরই নূতন বই নয়, সাহিত্যক্ষেত্রে ও নূতন। যে সমস্ত

বিষয় ও বস্তুকে, যে ধরণের দৃষ্টি দিয়ে আমরা নিত্য নিয়ত দেখেছি বা দেখি—তাদের তিনি এমন একটা বিশেষ দিক থেকে দেখেছেন এবং এঁকেছেন যে প্রথমেই তাঁর দৃষ্টির অভিনবতায় তাক লেগে যায়। কিন্তু তার পরও আছে। শব্দপ্রয়োগ এবং পরিবেশ অঙ্কনে তাঁর এই দর্শন ও মননের সঞ্চয় এমনি জমাট বেঁধে উঠেছে যে অকপটে বলতে হয় চমৎকার। এই চমৎকার কথাটা ইদানীং আমাদের সাহিত্যে রেখে ঢেকে বলা চলছে, তার কারণ সত্যিকার নূতন লেখকের আবির্ভাবকে আজ আমরা ভয় করতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু আমার কোন ভয় নেই—সহজ ভাবেই বলছি চমৎকার, ঠিক এই শ্রেণীর প্রবন্ধ আমি একটাও বাংলায় পড়িনি—এমন ধার, এমন জৌলুস, সবদিক থেকে এমন নূতনত্ব সচরাচর সুলভ নয় বলেই বলবো, লেখক সার্থক শিল্পী।

বলা বাহুল্য বইটির আমি বিশদ সমালোচনা করছি না। তাই এর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বা কোন দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা আমার প্রয়োজন হয় নি। এমন কি দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি যে সমস্ত প্রসঙ্গাত্মক রচনা সন্নিবিষ্ট করেছেন, তার কোন কোনটার সঙ্গে রীতিমত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, আমি সেগুলোর কথাও তুলি নি। যে সমস্ত অজ্ঞাত অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে তিনি সাহিত্যের উঁচু তলায় উন্নীত করেছেন—যেমন 'ইনসমনিয়া', 'কড়া', 'বেকার বনাম ইন্সুরেন্স এজেন্ট'—শুধু সেইগুলোকেই আমি আমার আলোচনার লক্ষ্য স্বরূপ নিয়েছি। ইংরেজীতে পড়েছি এই জাতের লেখা অনেক—বাংলায় এর অভাব চিরদিন ছিল, আশা হচ্ছে এবার দূর হবে। সেই ভাবী সম্ভাবনার অগ্রদূত রূপেই আমি স্বাগত করছি শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায়কে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

"নিজেরে হারায়ে খুঁজি"—শ্রীগীতা ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরেন্দ্র কৃষ্ণ সরকার, মাধব চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা, দাম ১॥৵০। ১৫০ পৃষ্ঠা

বাংলা সাহিত্যের আসরে আমরা লেখিকাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। লেখিকা নূতন এবং উপন্যাসটী তাঁর প্রথম লেখা। কিন্তু তাই বলে তার লেখনী মোটেই অপটু নয়। লেখিকার রচনা শক্তি আছে, কল্পনা শক্তি আছে আর আছে সুক্ষ্ম বিশ্লেষণী প্রতিভা। ভাষা ঝরঝরে ও জোরদার এবং আতিশয্য নেই কোথাও। আলোচ্য উপন্যাসখানিতে গল্পাংশ অতি সামান্য। মাতৃপিতৃহীনা মেয়ে, বিলিতী ভাবাপন্ন বড়লোক পিসিমার দ্বারা প্রতিপালিতা ও উচ্চশিক্ষিতা। ড্রইং রুমের কৃত্রিম জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পালিয়ে সে ভবঘুরে বেদের দলে যোগ দিলো এবং দু'মাসের অজ্ঞাতবাসের পরে কলকাতায় এসে বিয়ে থা করে সংসারী হল। প্রসঙ্গক্রমে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কৃত্রিম জীবনের এবং বেদে বেদেনীদের যাযাবর জীবনের চিত্র খুটীনাটী সহ বিবৃত হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আছে মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ এবং রোমান্টিক একটী সুগভীর চিত্তের দুর্দম্য অতৃপ্তি এবং অফুরন্ত উদাস। শিক্ষিতা আধুনিকার ঘাঘরা পরে দুমাস বেদেনী জীবন যাপন অবাস্তব মনে হবে। তবু বইখানা আমাদের ভাল লেগেছে।

'দীপঙ্কর'

নীতি এবং কৌশল, মানুষ ও মানচিত্র ভীড় কোরেছে এর মস্তিষ্কে——।

"ওয়ার্লড রিভিউ হইতে"

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধ "বিশ্ববস্তু"

১৭ই অক্টোবরের খবরে জানা যায় মস্কোর পতন আসন্ন; রাজধানী কাজানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মস্কো পতনের জন্য শুধু রাশিয়ানরা কেন বাইরের জগৎও প্রস্তুত ছিল। এই সেদিন লর্ড বিভারব্রুকের মুখে শোনা গেছে—'মস্কোর পতনে রাশিয়ার পরাজয় ঘটিবে না'। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দূত হ্যারি হপকিন্স রাশিয়া পরিদর্শন ক'রে ওয়াশিংটনে ফিরে বলেছেন রাজধানী সরিয়ে নেবার প্রয়োজন হলেও রাশিয়ার প্রতিরোধশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। সেপ্টেম্বরের শেষভাগে আমেরিকান সাংবাদিক র‍্যালফ্ ইন্‌গারসল্ আঙ্কারা থেকে খবর পাঠিয়েছিলেন 'রাশিয়া অপরাজেয়'।

জার্মাণীও জানে মস্কো পতনেই রাশিয়ার পতন নয়। রাইখের প্রেসবিভাগের বড়কর্তা ডিট্রিস্ ৯ই অক্টোবর পূর্ব সীমান্ত থেকে বার্লিনে ফিরে এসে বলেন 'রণকৌশলের দিক দিয়ে বলা যায় সোভিয়েট রাশিয়া নিঃশেষ হয়ে গেছে।' ২রা অক্টোবর হিটলার অপ্রত্যাশিত ভাবে পূর্ব-রণাঙ্গন থেকে নাৎসীপার্টির বাৎসরিক সভায় যোগ দিয়ে পূর্ব-রণাঙ্গনে আর একবার তুমুল জার্মাণ আক্রমণের খবর পৃথিবীকে জানিয়ে দেন। এটা হোল জার্মাণীর চতুর্থ অভিযান। এই অভিযানের চতুর্থ কি পঞ্চম দিনেই ডিট্রিস্ ঘোষণা করেছেন' 'Soviet Russia is finished from the military point of view'. রাজধানী হিসাবে মস্কোর মর্যাদা কিম্বা শীতের পূর্বে মস্কো পৌছানর সার্থকতা জার্মাণীর জানা আছে। কিন্তু জার্মাণীর সমরবিভাগের লক্ষ্য হচ্ছে ভোরোশিলফ্, টিমোশেঙ্কো ও বুদেনীর সেনানী। এবার সেইজন্যই জার্মাণী প্রথমটা তিনদিন প্রকাণ্ড চক্রাকারে মস্কোর চারিদিকে সৈন্যচালনা করে হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে বর্শাফলকের মত মস্কোর দিকে ছুটে চলেছে। গত সেপ্টেম্বরে ব্রিয়ান্স্ক পর্যন্ত জার্মাণরা পৌচেছিল। এবারকার আক্রমণে ভালদাই পাহাড় থেকে ব্রিয়ানস্ক পর্যন্ত বৃত্তাকারে পরিবেষ্টন করলেও ভিয়াজমা রণক্ষেত্রেই জার্মাণরা প্রবল হয়ে টিমোশেঙ্কোর বাহিনী খণ্ডিত করবার দাবী করে। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত যোজনব্যাপী ফ্রন্টের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলা কিম্বা পেছু হঠা যেমন রুশদের সব চাইতে লক্ষ্যের বিষয়, জার্মাণরাও তেমনি অখণ্ড সীমানায় ফাটল ধরিয়ে বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একে একে ঘেরাও করে পিষে মারবার জন্য বদ্ধপরিকর। আক্রমণের সপ্তদশ সপ্তাহে বুঝিবা তাদের বাসনা পূর্ণ হোয়েছে। রাইখের প্রেস বিভাগের কর্তা ডিট্রিসের হিসাব অনুযায়ী টিমোশেঙ্কোর ৫০ থেকে ৭০ ডিভিসন বাহিনী দুইটি ব্যূহে আটকা পড়ে গেছে। ডিট্রিসের ঘোষণায় বলা হয়েছে বুদেনীর বাহিনী দক্ষিণে নিকাশ হয়েছে, ভরোশিলফেরটা লেলিনগ্রাদে বেষ্টিত হয়ে আছে—অর্থাৎ গোটা সোভিয়েট ফ্রন্টই চুরমার হয়ে গেছে।

৯ই অক্টোবর তারিখে হিটলারের দৈনিক নির্দেশপত্রে (order of the day) যে উক্তি ছিল তার সবটাই যে ফাঁকা আওয়াজ অবস্থা দেখে তা মনে হয় না। হিটলার তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'গত তিনমাসের মধ্যে তোমরা অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত শত্রুর সমরশিল্পের কেন্দ্রগুলি দখলে এনেছ, আরও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়ার তিনটি সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্র তোমাদের হস্তগত হবে। এই যুদ্ধে রুশ হতাহত ও বন্দী ২৪ লক্ষ, ১৭,০০০ ট্যাঙ্ক, ২১,০০০ বন্দুক ও ১৪,০০০ বিমান ধ্বংশ অথবা দখল করেছ। তোমাদের সঙ্গে আজ উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ফিন, স্লোভাক, হাঙ্গেরীয়ান, ইতালীয়ান, রুমানিয়ান সৈন্যদল শত্রুর জমিতে লড়াই করছে, স্প্যানিশ ক্রোট এবং বেলজিয়ান বাহিনী শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হবে।" মস্কোর পথে মোজালিস্ক, রাসলভ, ওরেল, টুলা, কালিনিন এবং কালগা এই স্থানগুলি অনায়াসে না হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই যে ভাবে জার্মাণ কবলে এসেছে তাতে হিটলারেরই সমর্থন পাওয়া যায়। কমুনিষ্ট পার্টির পত্রিকা 'প্রাভদা' ও সেই কথাই বলেছে। 'প্রাভদা' শঙ্কিতচিত্তে জার্মাণীর সংখ্যাধিক্য স্বীকার করে বলেছে—শত্রুসৈন্যের ক্ষতি প্রচুর হলেও অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি না করা অমার্জনীয় লঘুচিত্ততার পরিচায়ক হবে।

অন্য দুই সমর ক্ষেত্রের মধ্যে লেলিনগ্রাদে লড়াইয়ের হারজিৎ অমীমাংসিত রয়ে গেছে। বল্টিকে রেড নেভি যে কৌশলের পরিচয় দিয়েছে তাতে মনে হয় লেলিনগ্রাদ সমুদ্রপথে সুরক্ষিত আছে। সোভিয়েট নৌবহর এখনও ওয়েসেল, ভারো এবং হাঙ্গোতে ঘাঁটি আগলে আছে।

রুমানিয়ান সৈন্য ওডেসা দখল করেছে। দক্ষিণে খারকভের পথে পোল্টাভা দখলের সংবাদ পাওয়া গেছে। খারকভ ইউক্রেনের শিল্পকেন্দ্রের অন্যতম। খারকভের পথ খোলা পেলে ইউক্রেনের সমৃদ্ধতর প্রদেশে প্রবেশ পাওয়া সহজ হয়ে যাবে। ইউক্রেনের অন্য কয়েকটি শিল্পকেন্দ্র যেমন কিয়েফ, নিপ্রোপেট্রো-ভস্ক, খারসান ও ক্রিভয়রগ জার্মাণদের হস্তগত। জার্মাণীর দক্ষিণ অভিযানে ডনটেজ শিল্পাঞ্চলের জন্য প্রবল চেষ্টা চলেছে।

জার্মাণরা আজব সাগরের তীরে মোলটোপাল, বার্ডনিয়াস্ক মারিয়াপোল, টাগানরগ দখল করেছে। টাগানরাগের ৪০ মাইল দূরে রোষ্টভ বন্দর বিপন্ন।

ক্রিমিয়ায় জার্মাণরা পেরেকোপ অঞ্চলে সংগ্রাম করছে। ক্রিমিয়ায় সেবেস্তাপুল রাশিয়ান অধিকারে থাকা পর্যন্ত কৃষ্ণসাগরে রুশ-শক্তি প্রবল থাকবে। কিছুদিন পূর্বে বুলগেরিয়ায় সৈন্য সমাবেশের খবর পাওয়া গেছে। কৃষ্ণসাগরে রুশ আধিপত্য খর্ব করার জন্যই এই আয়োজন মনে হয়। বুলগেরিয়ার বন্দরে যে সামান্য নৌবল আছে তা রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরের নৌবলের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ। সুতরাং ইতালীয় নৌবলের সহায়তায় রুশীয় নৌবলের শক্তি ক্ষুণ্ণ করা ছাড়া জার্মাণীর অন্য উপায় নাই। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে দার্দনেলিসের মধ্য দিয়ে ইতালীয় নৌশক্তিকে পথ ছেড়ে দিতে তুর্কিকে রাজী করাতে হবে। বুলগেরিয় সমাবেশের অন্তরালে তুর্কিকে সম্মত করবার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় যে নাই সেকথা জোর করে বলা চলে না। বুলগেরিয় সমাবেশের আতঙ্ক তুর্কি-সম্মতি আদায় করতে না পারলে তুর্কি অভিযানের সম্ভাবনাও আছে।

মধ্য প্রাচ্য

খাইবার আর তেহেরান যেন এক দৌড়ের পথ। ভারতের জঙ্গীলাট ওয়াভেল সাহেব লণ্ডন থেকে ফিরবার পথে তেহেরাণ ঘুরে এসেছেন। সুইডেনের কাগজ 'সোসিয়াল ডেমক্রেটেন' এর খবর,

ককেসাসে সৈন্য পরিচালনার উদ্যোগ চলেছে—ভার পরেছে ওয়াভেল সাহেবের ওপর। পার্সীয়ান উপসাগরের বন্দর বন্দরসাপুরে সৈন্য নেমে রেলপথে ইরাণ যাচ্ছে; খাইবার পাশ থেকে যাচ্ছে সাঁজোয়া গাড়ী ও বিমান। ইরাণের শাহের রেলপথটা খুব কাজে লেগে গেল। এই সুবিধা থাকায় তাব্রিজের উত্তরে একটা ব্রিটিশ ঘাঁটি রাখা চলবে। দক্ষিণ-রুশের তেলের খনি নিয়ে জেনারেল ওয়াভেল ও মার্শাল ফন রুন্‌সতেদর মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হতে পারে—কে কার আগে দখল করবে। সেইজন্যই এই তোড়জোড়। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বিমান মহড়া চলেছে—লড়াই যদি ককেসাসে আসে?

বিশ্ব শান্তি

লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে শান্তির কথা শুনতে পাওয়া যায়। আবার তার পরই জোড় লড়াই সুরু হয়। "Cannibal Hitler" শান্তির চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়েছেন কারণ "War-monger" চার্চিল তার শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। হিটলারের লড়াইয়ের সমস্ত আয়োজন 'are the most important preparations for peace' শান্তির নৈবেদ্য রচনা, আর চার্চিলের 'আটলান্টিক চার্টারের' প্রতি ছত্রে ছত্রে বিশ্বশান্তির জন্য উন্মুখতা। আমরা অহরহ একথাই শুনছি, লড়াইয়ের পূর্বে দুনিয়া যা ছিল আর লড়াইয়ের পর দুনিয়া যা হ'বে তার মধ্যে থাকবে আসমান-জমিন তফাৎ। পৃথিবীর এই অবস্থায় একটা দুরন্ত বিরোধের অবসান ঘটে নূতন কোন্ ব্যবস্থার মাঙ্গলিক ধ্বনিত হবে তা বলা কঠিন কিন্তু একটা প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে। "The price of victory is a European revolution for we can not unleash the forces that victory requires if we stand by the ancient ways." (Laski, Where do we go from here, p126). 'ancient ways' অথবা 'প্রাচীন পন্থা'র অপমৃত্যু লাস্কি সাহেবের স্বগোত্রীয়েরা কামনা ও ভাবনা কোনটাই করেন না, তা আর নজীর দিয়ে দেখাতে হবে না। যুদ্ধ জয়ের জন্য ল্যাস্কি সাহেব যে চড়া দাম হেঁকেছেন তার চাইতেও কম দরে জয়ের পথ খোলা ছিল। সে পথ ক্রমেই দুর্গম হয়ে উঠেছে, সুতরাং যারা সাদা চোখে দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখেন, ল্যাস্কি সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন "without that revolution both the war and the peace will be no more tnan a dispute about the character of a social order which has twice brought us to world conflict and will bring us to it again if we seek no more than its preservation." সাম্রাজ্য আঁকড়ে থাকা যাদের স্বভাব তাদের কাছে লাস্কি সাহেব কি আশা করেন?

এই সেদিন ইডেন সাহেব লণ্ডনে এক মৈত্রী সম্মেলনে—'Inter Allied Conferrence'—এক 'স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা' ইউরোপ রচনা করলেন। যুদ্ধের পর নাৎসী নির্যাতন থেকে যে সব দেশ উদ্ধার পাবে মৈত্রী সম্মেলন তাদের খাবার ও জীবন যাত্রার অন্যান্য অপরিহার্য দ্রব্যের সংস্থান দেবে। খাবার যোগাবে আমেরিকা। আমেরিকার যোগানে আর ইংরেজের মোড়লীতে খাবার বিলি করেই ইডেন সাহেব ভাঙ্গা ইউরোপ জোড়া লাগাবেন, এটা ল্যাস্কি সাহেবের 'revolution' এর কোন সংস্করণ?

শ্রেণী সংগ্রাম বনাম জাতীয় সংগ্রাম—

শ্রেণী সংগ্রাম না জাতীয় সংগ্রাম? প্রশ্নটা স্বভাবতই আসে। সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ কৌতূহলের সামগ্রী। আমেরিকার সাহায্য পেয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে আর সেই সাহায্যের দাবীতেই সোভিয়েটের সামনে নানা রকম প্রশ্ন তোলা হচ্ছে—'ধর্মের

স্বাধীনতা রাশিয়ার আছে কি'? উপায় নাই—সোভিয়েটের প্রচার কর্তা মঃ লজভস্কি ও লণ্ডনস্থ দূত মঃ মেইস্কি আমেরিকার প্রশ্নকর্তাদের আশ্বস্ত করেছেন—সোভিয়েট ইউনিয়নে বিভিন্ন চার্চ, আছে ধর্মের স্বাধীনতা আছে এবং ধর্মটা হ'ল ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই, অবশ্যি ধর্মবিরোধী প্রচারেরও স্বাধীনতা আছে। কথায় বলে 'He who pays the piper 'all for the tune.' সোভিয়েট নিরুপায়—শ্রেণী মহৎ কিন্তু জাতি মহত্তর। বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই ধরণের একটা অবস্থার কথা চিন্তা করেই লিখেছিলেন সোভিয়েটের শ্রেণী সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হয়। (The allies of the Soviet government must not be troubled by revolutionary or anti-militarist propaganda, but must be supported in all the turns and twists of their international politics. The war by which the objects of Communism are to be achieved thus ceases to be a class war as formerly conceived and becomes an ordinary war between national states—Which way to peace, p 195)

নিরপেক্ষতা আইনের সংশোধন—

আতলান্তিকের ক্রমবর্ধমান জাহাজ ডুবিতে আমেরিকার ধৈর্যের বাঁধ বুঝিবা ভাঙে। পর পর আটটা জাহাজ সাবমেরিনের আক্রমণে জলমগ্ন হয়েছে। অষ্টম জাহাজ আই, সি, হোয়াইট ডোবার পর তুমুল কলরব উঠেছে নিরপেক্ষতা আইন সংশোধন করে সওদাগরীগুলি জাহাজগুলি সশস্ত্র করবার জন্য। স্বরাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল মনে করেন সাবমেরিন অভিযানের মূলে আছে আতলান্তিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পৃথিবী জয়ের পরিকল্পনা। নিরপেক্ষতা আইনের বিধানে কোন কোন স্থানে আমেরিকার জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু সাবমেরিন আক্রমণের ফলে সমগ্র আতলান্তিকই নিষিদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। সে অবস্থায় 'Lease and Land' এর সাহায্য বৃটেনে পৌঁছাবে না। এই অবস্থা দূর করবার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আইন সংশোধনের সুপারিশ করে কংগ্রেসে পাঠিয়েছেন। আই, সি, হোয়াইট ডুবি বোধ হয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পথ সুগম কোরে দেবে। Isolationist অর্থাৎ যারা আমেরিকাকে ইউরোপের ঝঞ্চাটের বাইরে রাখতে চায় তাদের দলে আনা এরপর সহজ হয়ে যাবে। সেই দলেরই একজন রেমণ্ড ক্ল্যাপ্পার এই আইনের আগাগোড়া সংশোধন দাবী করে বলেছেন 'আইনে মানা আছে আমেরিকার জাহাজ কোন যুদ্ধমান বন্দরে প্রবেশ করতে পারবে না—বৃটেনের যে কোন বন্দরে আমেরিকার জাহাজ পাঠাবার স্বাধীনতা 'শাসন বিভাগ দাবী করে'। এই থেকেই মনে হয় সওদাগরী জাহাজের সশস্ত্রীকরণের পরই এই ধারার সংশোধন করা হবে।

পানামায় রাষ্ট্রবিপর্যয়—

এই ধারণটা যে অমূলক নয় পানামায় রাষ্ট্রবিপর্যয়ে সেটা বোঝা যায়। যে সব জাহাজ পানামার নিশান উড়িয়ে চলে পানামার ক্যাবিনেট তাদের সশস্ত্রীকরণ নিষেধ করে। এই খবর আলোচনা কালে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র কমিটির সভাপতি সেনেটর কোনোলি মন্তব্য করেন "নিরপেক্ষতা আইন সংশোধন করে আমরা বাণিজ্য জাহাজ সশস্ত্র করতে পারি এবং তারপর তাদের যে কোন অঞ্চলে পাঠাতে পারি"। অর্থাৎ পানামা ক্যাবিনেটের মর্জির ওপর নির্ভর না করে এবং পানামার নিশানের ভরসায় না থেকেও আমেরিকা আইন বদলেই নিজের নিশানের আড়ালে জাহাজ চালাতে পারবে।

এরপরই গত ৯ই অক্টোবর জানা যায় পানামার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে পানামার বিচার সচিব রিকার্ডো গার্ডিয়া শাসন ক্ষমতা হাতে নেন। প্রেসিডেন্ট আরিয়াল জানিয়েছেন তিনি পলায়ন করেন নাই, চক্ষু চিকিৎসার জন্য হাভানায় গিয়েছিলেন সেই অবসরে এই ব্যাপার। পানামার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব থেকে রাষ্ট্রবিপর্যয়ের কার্য কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সংসারে শুধু নাৎসী প্ররোচনাতেই কু'দেতা হয় না।

সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের আভাস

সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা আবার জটিল হয়ে উঠেছে। 'চীনের ঘটনা' গতমাসে সাড়া দিয়ে উঠেছে। জাপানীদের দক্ষিণ অভিযান প্রতিরোধ করে তাদের পার্শ্ব ও পশ্চাৎভাগে আক্রমণ করে বিপদগ্রস্ত করার লোভ চীনারা সামলাতে পারে নি,—ফলে হুনান, হোনান, কোয়াংটাং, চেংচাও প্রভৃতি মধ্য চীনের প্রদেশগুলিতে চীন-জাপান সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গেছে। এবারকার হানাহানিতে চীনদেরই জিৎ হয়েছে। চাংসা ও ইচাংএ নাকি জাপানীদের ৪০,০০০ সৈন্য নিকাশ হয়ে গেছে, মধ্য চীনে চীনা সৈন্যের বিজয় অভিযানে চীননেতারা চীনের অনুকূলে এই যুদ্ধের নিষ্পত্তির সম্ভাবনা দেখছেন।

আমেরিকার 'লিজ এণ্ড লেণ্ড' আইনে চীনাকে সাহায্য করার জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারল জন ম্যাগ্রুডর এক মিলিটারী মিশন নিয়ে চুংকিং উপস্থিত হয়েছেন। পরস্বাপহারী দেশের বিরুদ্ধে সবরকম সাহায্য করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চীন-জাপান যুদ্ধের পঞ্চম বৎসরে আমেরিকাবাসীদের হুকুমনামা চীনদেশে হাজির হয়েছে।

পরোপকারের বিলম্বিত অভিপ্রায়ের কারণ খুঁজতে বেশীদূর যেতে হবে না। জাপানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কটা ক্রমেই জটিল হয়ে এসেছে। প্রিন্স কোনয়ের মন্ত্রীসভা প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টায় অগ্রণী হয়েছিল। সেই অবসরেই কর্ণেল নক্সের মন্তব্য আমেরিকা জাপান, জার্মাণী ও ইতালীকে পরাস্ত করবার সঙ্কল্প করেছে—শান্তি আলোচনা কতটা অর্থহীন তাই প্রমাণ করেছে। ফলে হয়েছেও তাই। কর্ণেল নক্সের মন্তব্যের পরই জাপানে মন্ত্রীসভার পরিবর্তন আসন্ন হয়ে ওঠে। জাপানী সাংবাদিকরা সেই সময়ই বলেন, যদি কর্ণেল নক্সের বক্তৃতার পর জাপানে কোন চরমপন্থী, জাপানের প্রধানমন্ত্রী হন তজ্জন্য এই বক্তৃতাই দায়ী। তারপর ক্রমাগত পটপরিবর্তন হয়ে চলেছে। 'জাপান টাইমস এণ্ড এডভাইসার' সোভিয়েট যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যদান করার জন্য ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজকে সতর্ক করে দিয়েছে। গত তিন মাসে বহুসংখ্যক জাপানী সৈন্য চীন থেকে মাঞ্চুরিয়ায় জমা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ সমবেতভাবে জাপানে তেল রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছে এবং এই প্রতিবন্ধক নাকি প্রাচ্যে সমৃদ্ধির সীমানা বিস্তারে জাপানীদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে।

গত ১৬ই অক্টোবর কোনয়ে মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে। কোনয়ে মন্ত্রীসভার অনুসৃত 'জাতীয় নীতি' নিয়ে মতদ্বৈধ হওয়াই নাকি তাদের কার্যভার ত্যাগের কারণ। কোনয়ে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ বহুপূর্বেই আশাকরা গেছে, মধ্য চীনে জাপানের লাঞ্ছনা, ইউরোপে সোভিয়েটের দুর্বল অবস্থান, মিত্রশক্তিকে সাহায্যদানে আমেরিকার তোড়জোড়, সুদূর প্রাচ্যে ইংরেজের বিমান বিভাগের কর্তা স্যার ব্রুক পপ্‌হামের

সফর, সবগুলি মিলে জাপানী নীতির পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। জাপানী রাষ্ট্রনীতিতে চক্রবৎ সামরিক ও বৈষয়িক প্রভাব দেখা যায়। কোনয়ে পরিষদ শান্তিজল ছড়িয়ে বৈষয়িক প্রভাবের মর্যাদা বৃদ্ধি করছিল। কিন্তু পর পর এতগুলি ঘটনার সংঘাতে আবার সামরিক প্রভাব জাপানী রাষ্ট্রনীতির আসন দখল করেছে। তাই কোনয়ে সভার সমর সচিব, নূতন দপ্তরের প্রধান মন্ত্রী।

নূতন মন্ত্রীসভার গঠন সুদূর প্রাচ্যে লড়াইয়ের আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। জল্পনা চলেছে আক্রমণটা কোথায় হবে। চাংসায় লাঞ্ছনা ভুলতে কি জাপান দক্ষিণায়নে যাবে? ব্লাডিভাষ্টকের পথে আমেরিকা সোভিয়েট-সাহায্য পাঠাচ্ছে—জাপানী নৌবহরের নজর সে দিকেও আছে। মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য সমাবেশ-সেটা ভুললেও চলবে না। তিনমাস পূর্বে কোনয়ে সভা পদত্যাগ করলে সাতদিনের মধ্যে জাপানী সৈন্য ইন্দো-চীনে প্রবেশ করে—এটাও মনে রাখবার বিষয়। মোটকথা, ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে তাকিয়ে জাপান তৈরী—টোজো সভা তারই ইঙ্গিত। অভিযান কোথায় এবং কখন হবে রাষ্ট্রনীতির দূরবীণ দিয়ে তারই নিরিখ চলবে এখন।

১৮-১০-৪১

ভারত ও ব্রহ্মদেশে নির্বাচন বন্ধ

গত ১১ই সেপ্টেম্বর কমন্স সভায় নির্বাচন স্থগিত বিল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হোয়েছে—এ সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্যেরা যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা খুবই উপাদেয়। আমেরী সাহেব বিল উত্থাপন কোরে বলেন যে বিলটাতে যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরও এক বৎসর ভারত ও ব্রহ্মদেশে নির্বাচন বন্ধ রাখবার প্রস্তাব করা হোয়েছে। এর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন যে এখন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে গেলে—যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভাঁটা পড়বে—২য়তঃ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলেছে, নির্বাচনে তা আরো বাড়বে; ৩য়তঃ, কতকগুলো প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ছাড়ার ফলে শাসনতন্ত্র স্থগিত রয়েছে এখন নির্বাচন হোলে—গান্ধিজীকে যুদ্ধের প্রতি নেতিবাচক মনোবৃত্তি প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হবে।

শ্রমিক সদস্য—সিলভারম্যান, কোভ, সোরেনসেন বিলের বিরুদ্ধে বলেন যে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে একইরূপ ব্যবস্থা করবার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি নাই—ইংলণ্ডের কমন্স সভা নির্বাচন স্থগিত রেখেছে, কিন্তু ভারতীয় আইন পরিষদগুলি এর স্বপক্ষে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই—কমন্স সভা জোর কোরে নির্বাচন স্থগিত রাখছে—বিলে যুদ্ধকালে ও যুদ্ধের পরও ১২ মাস নির্বাচন বন্ধ রাখা হোচ্ছে—কিন্তু এর আগে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হবে না বা যুদ্ধের ১২ মাসের পরও যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটবে না, নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারে না। মিঃ সোরেন সেন বলেন, যে গবর্ণমেণ্ট যেহেতু জানেন যে ভারতবাসীরা তাঁদের নীতি সমর্থন করছে না, সেজন্য নির্বাচন স্থগিত রাখা হোচ্ছে—যদি এর উল্টো হোতো তবে নির্বাচন বন্ধ রাখা হোতো না।

লর্ড উইণ্টারটন ও ষ্টনলী বিলটাকে সমর্থন কোরে যা বলেন তার মর্ম—ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক প্রীতিকর নয় সত্য, কিন্তু তার জন্য ভারতবর্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কিছু বাধা পড়ছে না এবং বিলটা আনাতে স্বেচ্ছাচারিতা, প্রকাশ পায়নি, কারণ কমন্সের সঙ্গে ভারতবর্ষের যা শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক তাতে এ ধরণের বিল আনবার অধিকার কমন্সের রয়েছে। ব্যাস্; চুকে গেল অধিকার যখন রয়েছে—তখন কোন ওজর আপত্তি খাটে না। সে অধিকার গায়ের জোরের অধিকার না—তার পেছনে কোনো জনমত রয়েছে তা বিচার কোরে দেখবার প্রয়োজন নেই। ফ্যাসিস্তবাদের নিন্দা ও ডিমোক্রেসী এবং স্বাধীনতার ডঙ্কানিনাদ করতে করতে অধিকারের জগন্নাথ রথ ভারতবর্ষের

উপর দিয়ে চালিয়ে নেবার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। কিন্তু এই ১৯৪১ সনে ইংলণ্ডের কাছ থেকে কোনো অধিকার আশা করেন এমন রাজনৈতিক—বীর সভরকার ও মিঃ জিন্না—বাদে কেউ আছেন কি? কাজেই আমাদের অন্যপথে মুক্তি খুঁজতে হবে—সে পথ কোন দিক দিয়ে কি ভাবে আসবে তা সুস্পষ্ট হয়তো নয়—কিন্তু তার ইঙ্গিত আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই আসছে—সে ইঙ্গিতকে ভারতের জনগণের নিকট সুস্পষ্ট কোরে তোলা এখন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের একমাত্র কাজ।

আমেরিকার পাঁচটী প্রশ্ন

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনৈতিকেরা ভারতের স্বপক্ষে আমেরিকার ওকালতিতে অত্যন্ত আস্থাবান। তাঁরা মনে করেন যে বৃটেনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু আমেরিকা যখন ভারতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন তখন—আমেরিকার সুপারিশ বৃটেন ফেলতে পারবে না। সম্প্রতি আমেরিকার কয়েকজন ভদ্রলোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাঁচটী প্রশ্ন কোরেছেন সে প্রশ্ন কয়েকটী আলোচনা করে একদিকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমেরিকার পর্বত প্রমাণ অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে আমেরী সাহেবের উত্তরে চমৎকৃত হোতে হয়।

প্রশ্ন পাঁচটী এরূপ :—

(১) ভারতবর্ষ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কি কি ট্যাক্স দিয়ে থাকে?

(২) ভারতের বড়লাট ভারতের জনসাধারণের সম্মতি গ্রহণ না কোরেই সত্যই কি জার্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন?

(৩) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিচ্ছেন না কেন? তাঁদের কি দেবার ইচ্ছা আছে? কখন?

(৪) ভারতকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়াই যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি হয় তবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কারাদণ্ডের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কোথায়?

(৫) বর্ত্তমান যুদ্ধ—ভারতে বৃটিশ রক্ষা ব্যবস্থার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কি পরিবর্ত্তন এনেছে? এর উত্তরে আমেরী সাহেব বলছেন ভারতবর্ষ তো কোনো টেক্স দেয়ই না বরং বৃটিশ সরকারকে ভারত রক্ষার জন্য বৎসরে কয়েক কোটি ডলার দিতে হয়।

বড়লাট যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি কারণ তাঁর সে অধিকার নেই, বৃটেন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধভাবেই ভারত যুদ্ধে অংশীদার হোয়েছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হবে। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের মধ্যে একতা স্থাপিত হোলেই তা দেওয়া হবে। পণ্ডিত জওহরলাল বিশিষ্ট ব্যক্তি হোলেও আইনের উপরে নন। আর যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতবর্ষের মতামত কি তা প্রমাণ হবে ভারতবর্ষ থেকে স্বেচ্ছায় সাড়ে সাত লক্ষ লোক সৈন্য বিভাগে যোগ দিয়েছে এই তথ্য থেকে।

যেমন প্রশ্ন তার উত্তরও তেমনি।

হোমচার্জ নামে প্রতি বৎসর ভারত থেকে ৫০ কোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে—সেটা মার্কিনী বন্ধুরা অবশ্যি একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন, তবে সে কষ্টস্বীকার তাঁদের কাছ থেকে আশা করা যায় না—আর এই যুদ্ধে সাহায্য করবার ব্যাপারে ভারতের স্বাধীন মতামত কি তা জানাও সহজ। কিন্তু এই প্রশ্ন-উত্তরে ভারতের পক্ষে লাভ লোকসান কিছু নেই। নিছক পরোপকারের খাতিরে আদর্শ রক্ষার জন্য, কোনো দেশ স্বাধীনতার ফলটী ইংরেজের কাছ থেকে আহরণ কোরে এনে ভারতবাসীর হাতে দেবে সে স্বপ্ন কেউ দেখে না।

ভারতের রেল

ভারতে রেল লাইন প্রবর্তিত হয় প্রধানতঃ ইংরেজের সৈন্য চলাচলের সুবিধার জন্য—যাতে শান্তি (?) রক্ষার ব্যাঘাত ঘটলে সহজে সায়েস্তা করা যায় শান্তিভঙ্গকারীদের। কাজেই ভারতবাসীর দৈনন্দিন যাতায়াত বা সুবিধা অসুবিধার কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়—ইংরেজের প্রয়োজনে ভারতের রেল অন্যত্র চালান যাবে তার আর আশ্চর্য কি? কাজেই সম্প্রতি ই, আই, আর এ, উইক-এণ্ড টিকিট বন্ধ করে দেওয়া হোয়েছে, পূজার সময় যাত্রী সংখ্যা বাড়াবার জন্য রেল কর্তৃপক্ষের চেষ্টায়ও মন্দা লেগেছে—এমন কি পূর্বাহ্নেই জানানো হোয়েছে এবার কুম্ভমেলায় অতিরিক্ত ট্রেন দেওয়া সম্ভব হবে না। ক্রমশঃ যে ট্রেনের সংখ্যা আরো কমানো হবে তার ইঙ্গিত সর্বত্র। এর কারণ ভারতকে যুদ্ধমান মধ্য-প্রাচ্যে রেললাইন গাড়ী ইত্যাদি চালান দিতে হোয়েছে সেখানকার প্রয়োজন মেটাতে—হয়তো এর পর ইরাণের রেল লাইনের স্বল্পতা দূর কোরতে ভারতকেই ডেমক্রেসী রক্ষার্থে স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া যেসব মেরামতি কারখানা ছিল তাতে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরী হোচ্ছে—ভারতে ইঞ্জিন তৈরীর যে পরিকল্পনা হোয়েছিল যুদ্ধের জন্য তা পরিত্যাগ করা হোয়েছে—যুদ্ধের কাজ কোরেই কারখানাগুলো কুল পাচ্ছে না—ভারতবাসী ২।৪ বছর না হয় যাতায়াত নাই করলো—তাতে স্বাধীনতা ও ডেমক্রেসীর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কাজেই এদেশে রেললাইন, গাড়ী, ইঞ্জিন সব কিছুর অভাব হোয়েছে, আরো হবে। স্বাভাবিক যাতায়াত বন্ধ হবে, বাণিজ্য বন্ধ হবে ফলে জিনিষের দাম আরো বাড়বে—তা ছাড়া মেরামতের অভাবে রেল লাইন, ইঞ্জিন ইত্যাদির অবস্থা বিপজ্জনকও হবে—কিন্তু তাতে আশঙ্কান্বিত হবার কি আছে—না হয় ডিমোক্রেসী রক্ষার্থে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে—কয়েক শত "কালা আদমী" রেল এক্সিডেণ্টে মারা যাবে। উদ্দেশ্য তো সাধু!

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ অমরনাথ ঝাঁর সভাপতিত্বে নিখিলভারত শিক্ষা সম্মেলনের ১৭শ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে

ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা সম্মিলিত হন এবং অনেকগুলি মূল্যবান বক্তৃতা হয়, তার দু একটী উল্লেখ করবো—

আন্তঃসাম্প্রদায়িক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক ঐক্য বৈঠকে সিন্ধুর শিক্ষা সচিব পীর ইলাহী বক্স বলেন, "আমরা মুসলমানগণ ভারতবাসী, আমরা ভারতবাসী হিসাবেই বাঁচিয়া থাকিব এবং ভারতবাসী হিসাবেই মরিব।" তিনি বলেন ভারতকে তার নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি রচনা করতে হবে এবং শিক্ষকদের তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচার করতে অনুরোধ করেন। বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডলী কি বলেন এ বিষয়ে? ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি তাঁরা চান না, তাঁরা চান হিন্দু অথবা মুসলমানী শিক্ষা-পদ্ধতি। শিক্ষার গায়েও তাঁরা 'হিন্দু' 'মুসলমান' ইত্যাদি তক্‌মা এটে দেবার পক্ষপাতী—আর তা না করলেই ছেলেমেয়েরা যথার্থ হিন্দু ও যথার্থ মুসলমান হোতে পারবে না।

প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা দান সম্পর্কে অধ্যাপক অনাথনাথ বসু বলেন "প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার প্রধান কাজ সভ্যতাকে যুদ্ধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার কবল হোতে উদ্ধার করা"। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সব দেশে শিক্ষিতের হার অনেক উচ্চে তাদের মধ্যেই যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা যাচ্ছে বেশী। তিনি ঠিকই বলেছেন "প্রাপ্ত বয়স্কদের কোনো সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিক্ষা না দিলে তাদের মন থেকে পুরাতন বৈরীভাব দূর হবে না।"

"প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা রাষ্ট্রের শিক্ষা বিষয়ক দৈনন্দিন কার্যতালিকার অংশ হওয়া উচিত"......"এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার চূড়ান্ত কার্যতালিকা রাষ্ট্র ও জনসাধারণের এক সম্মেলনে রচিত হওয়া আবশ্যক। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্র ও যুবকদিগকে নির্দিষ্ট সময় কাজ কোরতে বাধ্য করা উচিত।"

ভারতবর্ষের মত নিরক্ষর দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের যে একটা প্রধান দায়িত্ব সে কথা সর্বস্বীকৃত কিন্তু বিদেশী রাষ্ট্রের সে দায়িত্ব বোধ নেই এবং তাকে বাধ্য করাবারও কোনো উপায় নেই। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা—বিষয়টীর গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি পড়ে মাত্র কিন্তু সমস্যার মীমাংসা হয় না। তবু এ সম্মেলনগুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে দেশের সামনে আমাদের লক্ষ্যকে জাগিয়ে রাখবার জন্যে।

জওহরলালকে কুইসলিং আখ্যা

কুরুচি ও স্পর্ধা কতদূর যেতে পারে—তার একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে নাগপুরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ এ জি এফ ফারকুহারের ব্যবহারে। ব্যাপারটী এই।

যুদ্ধের প্রচারকার্য চালাবার সময় একদল লোক গান্ধীজীর জয়ধ্বনি ও মিঃ ফারকুহারকে নানারূপ প্রশ্ন করে—তাতে উত্তেজিত হয়ে তিনি জওহরলাল নেহেরুকে "কুইসলিং" অভিহিত করেন। পরে অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে সংবাদ পত্রে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি ক্ষমা

প্রার্থনা করেছেন দেখে আমরা খুসী হোয়েছি। তবে এ ব্যাপার নূতন নয়—বিদেশী শাসকদের অযাচিত উপদেশ ও ভর্ৎসনা দুইই শুনতে আমরা অভ্যস্ত।

হরদয়াল নাগ জয়ন্তী

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলার প্রবীনতম দেশসেবক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয়ের ৮৮তম জয়ন্তী উৎসব চাঁদপুরে সুসম্পন্ন হয়। তিনি কংগ্রেসের জন্ম থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে কয়েকটি রাজনৈতিক আন্দোলন হোয়েছে সব কয়টিতেই সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ কোরেছেন—প্রতি যুগের রাজনৈতিক মত ও পথের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছেন এ কম বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। তাঁর মধ্যে যে জীবন্ত মন ও সজীব প্রাণ রয়েছে জরাগ্রস্ত দেহদ্বারা অভিভূত হোয়ে পড়েনি—তাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর এই নিষ্ঠা ও মানসিক শক্তিকে আমরা দেশের সামনে আদর্শ হিসাবে ধরছি। আদর্শ লাভের জন্য এই যে গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা—এ আমাদের দেশে দুর্লভ।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সম্বন্ধে এসেম্বলীর বিরোধীদলের সঙ্গে আপোষ মিমাংসা ব্যর্থ হোয়েছে। আমরা অন্যরূপ আশা করিনি। সাম্প্রদায়িকতার ঠুলি পরে যাঁরা সব কিছু দেখেন তাঁদের কাছে কোনো বৃহত্তর আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গীর আশা করা মূর্খামি—তবে বেশী দিন এভাবে চলবে না এই যা আশা—কারণ সমস্ত দেশকে বড় কোরতে না পারলে দেশের কোন একটী অংশ যে বড় হোতে পারে না এ অভিজ্ঞতা তাঁদের হবেই। আন্তর্জাতিক এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও এঁরা তাঁদের নীতি বদলাচ্ছেন না, এর পরিণাম যে কি অনুমান করা কঠিন নয়।

এই বিল সম্পর্কে মন্ত্রীমণ্ডলীর মনোভাবের প্রতিবাদ করবার জন্য হাজরা পার্কে বিরাট প্রতিবাদ-সভা হয়। শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল জাতীয় দৃষ্টি ও ভাবধারার পরিপন্থী বলে মত প্রকাশ করা হয়। আর একটী প্রস্তাবে এই বিল যেন আর অগ্রসর করা না হয় তার দাবী গভর্ণমেণ্টের নিকট করা হয় এবং সদস্যদের এই বিলের বিরোধিতা করার জন্য আহ্বান করা হয়, তৃতীয় প্রস্তাবে জনমতের বিরুদ্ধে যদি এই বিল পাস করা হয় তবে হিন্দু জনসাধারণ ও বিশেষভাবে হিন্দু মন্ত্রীদের মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে অসহযোগ করতে বলা হয়। জনমত যারা গ্রাহ্য করেনা এসব প্রস্তাবে তারা বিচলিত হবে না।

কামাথের বিবৃতি

চার্চিলের আটলান্টিক ঘোষণা সম্পর্কে নিখিলভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সংগঠনকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিবিষ্ণু কামাথ—এক বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে কয়েকটী সত্য কথা রয়েছে। তিনি যথার্থই

বলেছেন' চার্চিলের ঘোষণাতে যদি ভারতের জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হয় এবং যদি ভারত ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে তবে এই ঘোষণাতে শুভফল হোয়েছে বলা যেতে পারে। আর বৃটিশ শ্রমিকদলের সম্পর্কেও যদি ভারতীয়দের দৃষ্টি খোলে তবে আশার কথা।...চার্চিলের বক্তৃতা থেকে এও বোঝা যায় যে বৃটেন একটা স্বাধীন জাতীর সহযোগিতা অপেক্ষা একটা পরাধীন জাতির আত্মসমর্পণে বেশী বিশ্বাসী।......যে সব ভারতবাসী বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ফলে আমেরিকাবাসী বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে এবং এর ফলে আমেরিকার আধ্যাত্মিক সমর্থন ভারত লাভ করবে—আর আমেরিকার সাহায্যের উপর যখন বৃটেনের ১৬ আনা নির্ভর না করে উপায় নেই তখন আমেরিকার মতামত বৃটেনকে প্রভাবান্বিত করবেই। তাঁদের সাধের তাসের ঘর এখন খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেছে—কারণ চার্চিলের বক্তৃতার পর আমেরিকা একটী কথাও বলেনি, বলবে তার আশাও নেই।

সৈন্যদের জন্য কম্বল

সম্প্রতি নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের সিন্ধু শাখা সৈন্যদের জন্য গভর্ণমেণ্টকে কম্বল সরবরাহ করে। এ নিয়ে দেশে কিছু আলোচনার সৃষ্টি হয়। গান্ধিজীর পক্ষথেকে মসরুওয়ালা এবং 'খাদি জগতে' গান্ধীজী নিজে এর যা উত্তর দিয়েছেন তার সার মর্ম—

(১) আমরা স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত পরোক্ষে যুদ্ধে সাহায্য না কোরে পারিনা—যখন আমরা ডাক টিকিট কিনি, রেলে চড়ি বা পেট্রোল কিনি তখন যুদ্ধে সাহায্য করি। যুদ্ধে সহযোগিতা না করতে হোলে বিদ্রোহ করতে হয়—কিন্তু বর্তমান আন্দোলনের রূপ সেরকম নয়।

(২) বর্তমান আন্দোলনে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত করবার জন্য কোনো পিকেটিং করা হয় নাই কাজেই এ আন্দোলনে কেবলমাত্র উপদেশ দেওয়া পর্যন্তই চলবে।

(৩) ক্রয়-বিক্রয় একটী আদান প্রদান, এটা চাঁদা দেওয়ার মত নয়। জিনিষ কিজন্য ব্যবহার হবে সেটা দেখা বিক্রেতার কাজ নয়। ক্রেতাদের বৃত্তিদেখে জিনিষ বিক্রী করা চলে না এবং তা সম্ভবও নয়।

(৪) 'গভর্ণমেণ্টকে' বিব্রত না করার নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে এবার। কিন্তু যদি কোন ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার মতভেদ জেনে কোনো কোনো জিনিষের খুব দরকার থাকা সত্বেও তা বিক্রি না করা হয় তবে বিব্রত করার নীতিই গ্রহণ করা হয়।

মহাত্মা গান্ধির নিজের ও তাঁর তরফ থেকে মসরুওয়ালার যুক্তি দেখে মনে হয় যে, সূক্ষ্ম বুদ্ধির মারপ্যাঁচ দ্বারা স্বাভাবিক সাধারণ জ্ঞানকে কি ভাবে আচ্ছন্ন করা যায় এ তার একটি চমৎকার উদাহরণ। ভারতবর্ষে বাস কোরে ও জীবনধারণ কোরেই আমরা পরোক্ষভাবে শুধু যুদ্ধে নয়—সাম্রাজ্য পরিচালনায় সহায়তা করছি কিন্তু তার জন্য যেমন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার

আন্দোলন অর্থহীন বা অযৌক্তিক নয়--তেমনি কোন অধীন দেশের অধিবাসীদের পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধে সাহায্য করিয়ে নেওয়া হোচ্ছে এই অজুহাতে সাক্ষাৎ ভাবে সাহায্য করার যুক্তি সমর্থন করা যায় না। প্রথমোক্ত স্থলে choice এর কোনো সুযোগ নেই শেষোক্ত স্থলে ইচ্ছা না কোরলে সাহায্য না কোরেও পারা যায়।

তারপর—বিক্রেতা ক্রেতার বৃত্তি কি দেখতে পারে না যখন ক্রেতা বিক্রেতা ব্যক্তি বিশেষ individuals হয়, কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতা যেখানে দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেখানে সম্পর্ক শুধু বাণিজ্যিক আদান প্রদানের নয়, সেখানে নীতির প্রশ্ন আসে। আর সে নীতি শুধু সাক্ষাৎ ভাবে অস্ত্র শস্ত্র বা যুদ্ধোপকরণের বেলাতেই প্রযোজ্য নয়। আজ মহাত্মা গান্ধি, জাপানের নিকট কম্বল বিক্রী করিবেন কিনা বা তাঁকে করতে দেওয়া হবে কিনা সন্দেহ। যে ক্ষেত্রে বিক্রেতা সকলের নিকট নির্দোষ মাল বিক্রী করতে পারবেন না, সেখানে নীতির দিক দিয়ে কোনো একটি বিশেষ বিক্রেতার নিকট মাল বিক্রী করা অর্থপূর্ণ হয়।

তারপর বিব্রত না করার নীতি—এ নীতিকে আমরা কখনো সমর্থন করি নাই তবু মহাত্মা গান্ধিরই বিব্রত না করবার নীতি অর্থে আমরা বুঝেছি এতদিন যে এমন কোনো আন্দোলন তিনি করতে চান না, যাতে দেশে অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে যুদ্ধমান বৃটেন বিপদাপন্ন হয়, তার সঙ্গে কম্বল বিক্রী না করার দ্বারা বিব্রত করবার ব্যাপার সমপর্যায় ভুক্ত নয়। কম্বল বিক্রী না করলে বৃটেন কিছুমাত্র অসুবিধাগ্রস্ত হোতো বলে আমাদের বিশ্বাস নয়—এ যেন সহযোগিতা করবার জন্যই সুযোগ গ্রহণ, অন্ততঃ সাধারণের সে ধারণা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মহাত্মা গান্ধির এসব সূক্ষ্ম ethical যুক্তি আমরা রাজনীতিরক্ষেত্রে কোনোদিনই প্রযোজ্য বলে মনে করিনি—কিন্তু তাঁর যুক্তিগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে অনেক সময় ভ্রান্তির সৃষ্টি করে—তার জন্য আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতের রাজবন্দী

পরাধীন দেশের রাজনৈতিক বন্দীসমস্যা চির পুরাতন। যাঁরা দেশের ক্লেশ মোচনের জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহশীল তাঁদের জন্য বন্দীশালার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। বন্দীশালাতেই জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁদের কাটাতে হবে এ নিশ্চয় কিন্তু তবু দেশবাসী তাঁদের ভুলতে পারে না—তাঁদের অভাব অভিযোগকে সাধারণে প্রকাশ করতেই হয়।

সম্প্রতি মিঃ এম এন যোশী দেউলী বন্দী নিবাস পরিদর্শন কোরে রাজনৈতিক বন্দীদের কতকগুলো অভাব অভিযোগের বিবরণ দিয়েছেন—সেগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। শ্রেণী বিভাগ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাতা সম্পর্কে অভিযোগ।

শ্রেণী বিভাগ নিয়ে রাজবন্দীরা চিরদিন আন্দোলন করেছে—তবু গভর্ণমেণ্টের নীতির

পরিবর্ত্তন হয় নি—এই শ্রেণীবিভাগের কি যে প্রয়োজন বোঝা মুস্কিল। যখন এদের রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে স্বীকার করা হোচ্ছে, তখন তাদের একই শ্রেণীভুক্ত যে কেন করা হবে না তার স্বপক্ষে খেয়াল ছাড়া কোনো যুক্তি নেই। এদিকে জিনিষের মূল্য যত বাড়ছে রাজনৈতিক বন্দীদের ভাতার পরিমাণ তত কমছে।

এ ব্যাপার মন্দ নয়—প্রথম এক টাকা ছিল তারপর পনোর আনা ও এখন বার আনা করা হোয়েছে আর পারিবারিক ভাতাও কোনো ক্ষেত্রে দেওয়া হোচ্ছে না। যার যার প্রদেশ থেকে এত দূরে যাতায়াতের পক্ষে কঠিন এরূপ স্থানে বন্দীদের রাখবার বিরুদ্ধে জনসাধারণ ও বন্দীরা বহু অভিযোগ কোরেছে। এদের যদি বন্দী কোরে রাখাই গভর্ণমেণ্টের মর্জি হয় তবে অন্তঃত এদের প্রতি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা কোনো সভ্য গভর্ণমেণ্টের নীতি হোতে পারে দেখে আমরা বিস্মিত হোয়েছি। যা হোক্ রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের নীতির কোনো পরিবর্তন আমরা আশা করিনা যদিও বড়লাটের কাউন্সিলের নবনিযুক্ত মহারথীরা অনেক আশা দিচ্ছেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল সমিতির ১৯৪০—৪১ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হোয়েছে। রিপোর্টে বলা হোয়েছে যে ১৯২০ সনে ছাত্রদের স্বাস্থ্য যা ছিল ১৯৪০ এ তার অপেক্ষা উন্নতি হোয়েছে। ছাত্ররা অধিকতর দীর্ঘ সুগঠিত দেহ ও সুস্থ হোয়েছে। ১৯২০ সালে প্রথম ছাত্র মঙ্গল সমিতি গঠিত হয়—এবং তখন পরীক্ষা কোরে দেখা যায় শতকরা ৬৬ জন ছাত্রছাত্রীই কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত। ১৯৩৫-৩৭ এই তিন বৎসরে এই সংখ্যা শতকরা ৪০ জনে নামে কিন্তু ১৯৩৮—৪০এ এ আবার বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭ জনে উঠে। এবার ১৯৪০—৪১ এ যে অনুকূল রিপোর্ট প্রকাশিত হোয়েছে তার স্বপক্ষে ছাত্রমঙ্গল সমিতি বলেছেন যে—সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সময় বিশেষ বিশেষ রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয় না কাজেই দৃষ্টি শক্তির অভাব ও অন্যান্য স্বাস্থ্যহীনতার বিষয়ও ধরা হয় নাই। এগুলি বিচার করলে ছাত্রমঙ্গল সমিতির রিপোর্ট অন্যরূপ হোতো ১৯৩৮—৪০ সালে দৃষ্টিশক্তির অভাব জনিত রোগ ৩৩ থেকে ৩৭ এ উঠেছে—এবং ছাত্রীদের মধ্যেই এই রোগের প্রসারতা বেশী বলে জানা গেছে—ছাত্রদের সংখ্যা যেখানে ৩৫˙ ৫. ছাত্রীদের সংখ্যা ৪১˙ ৩. টনসিলের রোগে ছাত্র ভুগ্ছে কলেজে ৬˙৪ স্কুলে ১৭˙৯. আর ছাত্রীদের সংখ্যা ২৮। দাঁতের রোগে আক্রান্ত ছাত্রদের সংখ্যা ১˙৪ আর ছাত্রীর সংখ্যা ২˙৩। কিন্তু যদিও এ সকল তথ্যথেকে ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীদের স্বাস্থ্য খারাপ প্রমাণ হয় কিন্তু—অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে—ছাত্রমঙ্গল সমিতির অভিমত যে ছাত্র ও ছাত্রীর স্বাস্থ্যের বিশেষ তারতম্য নেই। তাছাড়া এই রিপোর্ট কলকাতার কয়েকটী মাত্র স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর তৈরী—যথার্থ তথ্য পেতে হোলে সমস্ত বাংলাদেশের স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয় এবং সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করতে হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি এদিক দিয়ে সুচিন্তিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে জাতির ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কার্যকরী ভাবে সাহায্য করবেন। আমরা আশা করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এদিক দিয়ে পথ প্রদর্শন করবেন।

সাম্রাজ্যের প্রগতি

"আমেরিকায় আমরা যা করেছিলাম—আয়র্লেণ্ডে তাই করছি—আয়র্লেণ্ডে যা করে-ছিলাম—মিশরে তাই করছি—এবং প্রতিবারই সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী অশ্রু বিসর্জ্জন করেন" * নিউ ষ্টেটস্‌মেন ও নেশান নামক বিলাতী সাপ্তাহিকের ৯ই আগষ্টের সংখ্যায় এক প্রবন্ধে সাম্রাজ্যের প্রগতির উপরোক্ত ধরণের একটা ফিরিস্তি—প্রবন্ধ লেখক দিয়েছেন। প্রবন্ধ লেখকের আফ্‌শোষ গত ১৭০ বৎসর যাবৎ ইংরেজ সাম্রাজ্য খোয়াচ্ছেন যেমন আজ ভারতবর্ষকে খোয়াতে বসেছেন লর্ড লিন্‌লিথগো ও আমেরী সাহেব। দীর্ঘসূত্রী ইংরেজের বিলম্বিত ব্যবস্থায় অবস্থা নাকি এমন এসে দাঁড়ায় যখন আর 'সবজেক্ট'দের মন ভোলাবার সময় থাকে না—স্বয়ং-শাসনের বায়না ধরে হাতে হাতিয়ার নিয়ে তারা রুখে দাঁড়ায়। লড়াইয়ে পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে তবুও ইংরেজের নাকি এই খামখেয়াল দূর হয় নাই; জাঁক করে সাম্রাজ্যের পসরা সাজিয়ে বসতে তাদের প্রচুর প্রয়াস।

সাম্রাজ্যবাদীর খেয়াল সবাই সমান বুঝতে পারেন না, ইতিহাসও সবার কাছে একইভাবে ধরা পড়ে না—তাই আটলান্টিকের চুক্তিপত্র নিয়ে এত উত্তাপ ও মনস্তাপ। ভারতবাসীর হ'য়ে দুচার জন ইংরেজ ভদ্রলোক ওকালতি করেছেন দেখে একই কারণে আমরা কেউ কেউ পুলকিত হোয়েছি।

এ প্রসঙ্গে সার সেকেন্দারের দৃষ্টান্ত বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—আটলান্টিক চুক্তি সম্পর্কে চার্চিলের ঘোষণায় তিনি বিশেষ মর্মাহত হোয়ে তিনসপ্তাহের মধ্যে বৃটিশ সরকারের নিকট একটা সুস্পষ্ট ঘোষণা দাবী করেন বৃটিশ সরকারের উপর তাঁর এই পূর্ণ বিশ্বাসে অবশ্য আমাদের কোনো আপত্তি নেই—তবে যদি উত্তর মনের মত না হয় তবে তিনি কি করবেন সে সম্পর্কে তিনি নীরব কেন?

সার সেকেন্দারের ঘোষণার দাবী সম্পর্কে সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স এক বিবৃতিতে বলেন যে সার সেকেন্দার যে ঘোষণার দাবী করেছেন তার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, যে সব জাতি গভর্ণমেণ্টকে এই যুদ্ধে সহায়তা করছে তাদের জন্য অনুকূল বিশেষ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা প্রতিশ্রুতি পাওয়া। এতে অবশ্যি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কোনো আপত্তির কারণ নেই এবং সানন্দে তারা এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হবে কারণ ভেদনীতির উপরই তাঁদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত এবং এ ব্যবস্থাতে সেই ভেদনীতিরই জয় হবে। খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্সের বিবৃতির উত্তরে সার সেকেন্দার এ কথা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি বলেছেন যে দেশের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণমেণ্টের দ্বারা মনোনীত ব্যক্তিরা একটা সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র তৈরী করবেন, যদি এই প্রতিনিধিরা তা না করতে পারেন তবে ভারত রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘের যে সকল শ্রেণীগুলি যুদ্ধে সাহায্য করছে তাদের সহযোগিতায় একটা শাসনতন্ত্র রচনা করা হবে। মোট কথা তিনি যে ঘোষণা দাবী করেছেন সাম্রাজ্যের শক্তি তাতে বৃদ্ধিই পাবে, কম্‌বে না—এখন দেখা যাক তাঁর এই দাবীর উত্তরে চার্চিল কি বলেন?

* 'We do in Ireland what we did in America, in Egypt what we did in Ireland and now in India what we did in Egypt. And every time the Imperial angels weep'.

ভারতীয় রাজনীতির ঘানী

সম্প্রতি কংগ্রেসের জনকয়েক মহারথী মুক্তি পেয়েছেন—তাঁদের মধ্যে দেশবন্ধু গুপ্ত, আস্‌ফালী এবং গোবিন্দ বল্লভ ও আছেন। এঁদের মুক্তিতে আবার ভারতের রাজনৈতিক public opinion মুখরিত হোয়ে উঠেছে নানা জল্পনা-কল্পনায়। তাছাড়া মাদ্রাজী নেতা সত্যমূর্ত্তির ওয়ার্দ্ধা-নাসিক-মাদ্রাজ দৌড়াদৌড়ি রাজনৈতিকদের চমৎকৃত কোরেছে। নাসিকে ও বোম্বেতে তিনি দেশাই ও সর্দারজীর সহিত দেখা করেছেন ও বহু গোপন বৈঠকের খবরও পাওয়া গেছে। এইসব বিচিত্র ঘটনা পরম্পরার মধ্যথেকে কয়েকটী প্রশ্ন সুস্পষ্ট হোয়ে উঠেছে।

প্রথমতঃ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে যাঁরা মুক্ত হোয়েছেন, মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল প্রমুখ যাঁরা জেলে আছেন এবং স্বয়ং গান্ধিজীর মতকি ?

২য়তঃ যদি সত্যাগ্রহ সম্পর্কে অনুকূল মত না হয়, তবে নীতির পরিবর্ত্তন কি ভাবে হবে ?

যাঁরা মুক্ত হোয়েছেন সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তাঁরা পরিষ্কার কোন মতামত প্রকাশ করেননি যা করেছেন তা সরকারী ভাবে সত্যাগ্রহকে সমর্থন করে। মৌলানা আজাদ সম্পর্কে যদিও শোনা যাচ্ছে তিনি এই সত্যাগ্রহে সন্তুষ্ট নন এর সম্প্রসারণ চান, তবু প্রকাশ্যে তিনি এ অস্বীকার করেছেন এবং সত্যাগ্রহের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন।

গান্ধীজীর মতামত সরকারীভাবে জানবার এখনো আমাদের সুযোগ হয়নি—কিন্তু তিনি সত্যাগ্রহ সম্প্রসারণ করতে বা এ বন্ধ করতে রাজী নন বলেই মনে হয়—তিনি বলেছেন সত্যাগ্রহীদের অসুস্থতা না ঘটলে বার বার কারাবরণ করতে হবে। কাজেই তাঁর মতামত অনুমান করা কঠিন নয়।

ওদিকে সত্যমূর্ত্তির মত যে যুদ্ধ ও জাতীয় অচল অবস্থা সম্পর্কে ভারতবাসীর মতামত কি তা আইন পরিষদের বাহির ও ভিতর উভয় স্থান থেকে প্রচার করা উচিত। আইন পরিষদে যোগ দিলে সে সুযোগ পাওয়া যাবে। এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয় কাজেই আইন পরিষদে যোগদান এবং মন্ত্রীত্ব গ্রহণ এ দুইই তিনি সমর্থন করেন। কিন্তু যতদূর জানা গেছে গান্ধিজী এ যুক্তি স্বীকার করেননি—তবে সত্যমূর্ত্তিকে নাকি তাঁর মতামত প্রচার করবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমরা ভাবছি এই মতামতের স্বাধীনতা দাবী করেই সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আস্‌তে হোয়েছিল—শুধু তাই নয় তাঁকে সমর্থন করার ফলে গোটা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকেই বাতিল করা হোয়েছিল ন্যায় ও সত্যের খাতিরে। আজ গান্ধীজী তার কি কৈফিয়ৎ দেবেন। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের অপেক্ষা সত্যমূর্তিকে কি বেশী প্রয়োজন ?

এদিকে শোনা যাচ্ছে পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মিঞা ইফতিকার উদ্দিন মিঃ জিন্নার সঙ্গে দেখা করবেন, উদ্দেশ্য কংগ্রেস-লীগ মিলন সংঘটিত করা—এ খবর কতদূর সত্য জানা যায়নি—তবে অসম্ভব নাও হোতে পারে। কাজেই সেই "থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়'। ঘুরছে ভারতের রাজনৈতিক ঘানি—স্তিমিত তার গতি, বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধ-বর্জিত তার নীতি, ভাগ্য চক্র এগিয়ে আসছে তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই তার চোখে ঠুলিদিয়ে ঘানি ঠিকমত চালালেই হোলো।

লোক গণনা

অবশেষে বাংলাদেশের লোকগণনার ফলাফল জানতে পারা গেছে। এই গণনা নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হোয়েছে—প্রত্যেক দলই নিজেদের সংখ্যা যাতে উর্ধদিকে থাকে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কোরেছেন—কিন্তু এত করবার পরও ফল যা দাঁড়িয়েছে তাকে ১৯৩১ এর পুনরাবৃত্তি বল্লেই হয়। ১৯৩১ এ কংগ্রেস থেকে সেন্সাস বয়কট করা হয়—তখনও যা ফল এখন ১৯৪১এ যখন গণনা যাতে নির্ভুল হয় তারজন্য গলদঘর্ম হোয়ে উঠলো সব দল তখনও সেই একই অবস্থা। ১৯৩১এ ছিল অনুপাত হিন্দু—৪৩.০৪, ১৯৪১এ ৪৩.৮, মুসলমান ছিল ৫৪.৮৭ এবার হয়েছে ৫৪.৭৩। হিন্দু-মুসলমান কোনো পক্ষই এই অঙ্কের সংখ্যাকে স্বীকার কোরতে রাজী নন—এ বিষয়ে তাদের ঐক্য আদর্শ স্থানীয়, এর ফল কি হয় দেখা যাক।

বর্তমান যুগে রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি সংখ্যা কিন্তু ভারতবর্ষে এ সংখ্যা-নির্ণয় সম্পর্কে যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে সেন্সাসের কাজ নির্ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, বিশেষজ্ঞরা বহুদিন ধরে একটী স্থায়ী সেন্সাস বিভাগ করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন যাতে কতক-লোকের এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা জন্মাবার সুযোগ হয়। এখন যে ব্যবস্থা আছে তাতে প্রতি বছর নূতন কোরে লোক নেওয়া হয়—এবং যারা পূর্বে সেন্সাস কার্যে অংশ গ্রহণ করবার দরুণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগে না। এ সম্পর্কে কোনো প্রকার পরিবর্তিত পন্থা আমরা আশা করি না—কিন্তু জনসাধারণকে সেন্সাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বাঙ্গলায় মন্ত্রীমণ্ডলী

হক-জিন্না মতান্তরের ফলে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তাকে storm in a tea-pot আখ্যা দিলে যথার্থ হয়। কারণ হক সাহেব মিঃ জিন্নাকে আক্রমণ করার জন্য প্রাদেশিক মুশ্লীম লীগ হক সাহেবের কার্যের নিন্দা করে এবং মিঃ জিন্নার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন কোরে প্রস্তাব পাশ করে। ফলে হক সাহেবের সঙ্গে লীগপন্থীদের লেগে যায় ভাল ভাবেই—হক সমর্থকরা মিঃ সুরাবর্দীর উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চায় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অসময়ে এসেম্ব্লী স্থগিত রাখবার জন্য তা সম্ভব হয়নি। তারপর যবনিকার অন্তরালে নানা পটপরিবর্তন চলতে লাগলো—রাতারাতি 'প্রোগ্রেসিভ এসেম্ব্লী পার্টি' এবং 'নবযুগের' আবির্ভাব হোলো হক সাহেবকে সমর্থন দেবার জন্য। ওদিকে লীগেরও তোড়জোড় চল্ল। যখন 'নবযুগের' নূতন বার্তা শোনবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হোয়ে অপেক্ষা করছি এমন সময় দেখা গেল হক সাহেব 'তোবা' 'তোবা' করতে সুরু কোরেছেন—তাঁর নেতৃত্বে মুশ্লীম লীগের প্রাদেশিক বৈঠকে জিন্নার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন কোরে প্রস্তাব গৃহীত হোলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জল্পনা কল্পনারও অবসান হোলো—রাজনৈতিক আবহাওয়ার ব্যারোমিটার একেবারে শূন্যে এসে নামলো। তবে এখনো অনেকে আশা ছাড়েন নি—

তাঁরা বলছেন হক সাহেবের এ একটা চাল, এর পর আরো কিছু ঘটবে। অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডলী পরিবর্তন হবেই। যাদের পেছনে কোনো আদর্শের বালাই নেই—কোনো প্রকারে ক্ষমতাকে করতলগত কোরে রাখাই যাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাদের কাছ থেকে কোনো সাহসিকতা অথবা দূরদৃষ্টি আশা করা বাতুলতা।

ঢাকার দাঙ্গা

গত ৫ই অক্টোবর ঢাকায় আবার দাঙ্গা সুরু হোয়েছে এবং নানা স্থান থেকে হতাহতের সংবাদ আসছে। দাঙ্গার কারণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু আমরা ভাবছি এ ভাবে চলবে কতদিন, গভর্ণমেণ্ট কি নিরপেক্ষ হোয়ে কেবল তাকিয়ে থাক্‌বেন, না—হিন্দু-মুসলমান কলহের এই নজির দেখাবার সুযোগ গ্রহণ করবেন ?

বহির্ভারতে যুদ্ধ ক্রমেই এগিয়ে আসছে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও ক্রমে সঙীন হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে এই আত্মঘাতী কলহের যে কী ফল তা' সাধারণ বুদ্ধিতে শিশুও বুঝতে পারছে। তবু বারম্বার এই লজ্জাকর পুনরাবৃত্তি ঘটছে। গত বুধবার ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ঈদের মিছিল উপলক্ষে আবার দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। বারবার একই মন্তব্য করে কোন ফল হবে না ; তবু আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে মন্ত্রীমণ্ডলী এবং ইংরেজ সরকারের কি বিন্দুমাত্র চক্ষু লজ্জাও নেই, দায়িত্বজ্ঞানের আশা না হয় নাই করলাম !

জয়প্রকাশনারায়ণের পত্র

দেউলী জেল থেকে জয়প্রকাশনারায়ণের লিখিত একখানা বে-আইনী পত্র ধরা পড়েছে বলে ভারত সরকার ইস্তাহার জারি করেছেন। পত্রখানা নাকি পত্নীর নিকটে লেখা এবং গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রখানা শোনা যাচ্ছে ভারত সরকার ভারতের বাইরেও পাঠিয়েছেন। পত্রখানা নিয়ে এদেশে দস্তুর মত হট্টগোল হয়ে গেছে। গান্ধীজিকে পর্যন্ত বিবৃতি দিতে হয়েছে, কারণ জয়প্রকাশ তথাকথিত পত্রে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করতে বলেছেন এবং গান্ধীসত্যাগ্রহকে ছেলেখেলা বলেছেন। এদিকে জয়প্রকাশ আবার গান্ধীজীর প্রিয় সমর্থকও। গান্ধীজী স্বভাবতই বিব্রত বোধ করেছেন। পত্রখানার সত্যমিথ্যাত্ব সম্বন্ধে কিছু বলবো না। কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে হচ্চে। পত্রখানার অন্তর্গত বক্তব্য অতি মামুলী, তবু সরকার একে এতখানি গুরুত্ব আরোপ করে এতটা হৈ চৈ সৃষ্টি কেন করলেন, তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্চে। এ কি আসন্ন দমন নীতির ইঙ্গিত, না, ডেটেনুদের দাবি-গুলোকে অগ্রাহ্য করবার ভূমিকা ?

২২।১০।৪১

এচিং　　　　শিল্পী— রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দশম বর্ষ { অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ

অনিলচন্দ্র রায়

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে গরীবের প্রাণ যায়, একথা সবাই জানে। য়ুরোপে আজ লড়াই বেধেছে, কিন্তু ধনে প্রাণে মারা পড়তে বসেছি আমরা। গত যুদ্ধেও আমরা ১৫ লক্ষ লোক আর প্রায় ৬০ কোটী টাকা দিয়েছিলাম, কিন্তু কী হোলো? আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। প্রায় দু'শ বছর ধরে একটানা ব্ল্যাক্-আউট্ চলেছে; একটা জোনাকীর আলোও চমকায়নি। অথচ মরবার যখন ডাক্ আসে তখন বড় বড় মনভোলান কথার নামেই আসে। গতবার যারা পৃথিবীকে মরবার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন তারা ডিমোক্রেসীর বাঁশী বাজিয়েই আবেদন জানিয়েছিলেন। জর্জরিত ধরিত্রীকে ডিমোক্রেসীর জন্য নিরাপদ করতে হবে। পৃথিবী হবে গণসমাজের স্বর্গ, দিকে দিকে নাম্‌বে ফুলফসলের সোনালী সৌন্দর্য। কিন্তু তার আগে কঠিন মাটীকে মানুষের রক্তে সিক্ত করতে হবে। তাই ৮০ লক্ষ তরুণ তাদের কচি প্রাণ ও টাট্‌কা রক্ত ঢেলে দিল য়ুরোপের মাঠে ঘাটে।

তারাও উইল্‌সনী বাণী শুনেছিল। ১৪ দফা নববিধান আর ৪ দফা নব্যনীতির উল্লাসে পৃথিবীর সবাই তখন মেতেছিল। কিন্তু সেই রক্ত সমুদ্র থেকে কোন নতুন সৃষ্টি জন্ম নিল? ১৯১৪ সনের প্রলয়কে সেদিন আশাবাদীরা মনে করেছিল কালের কল্যান্তিক প্রসব বেদনা। কিন্তু

হায়! সেই কর্দমাক্ত মাটীর পৃথিবী, আর পুরোনো ক্লেদাক্ত জীবন বেরিয়ে এল সেই বেদনার্ত কলরোল আর হাহাকারের মধ্য থেকে। লয়েড জর্জ আর ক্লিমেঁসোর হল জয়জয়কার। জয় হলো সেই রাজনৈতিক সাপুড়েদের মিষ্টি বাঁশীর আর বিষাক্ত চাতুরীর। সুললিত কথার মালা গাঁথা হয়েছিল লাঞ্ছিতদের বরণ করবার জন্য, সেই সব কথা ভেঙ্গে গড়া হলো দুর্বলের গলার ফাঁসী। জেনারেল স্মাট্‌স্‌'এর মাথা থেকে বেরুল, ম্যাণ্ডেট্ (mandate) এর ফাঁকি। সেই ফাঁকিতে পৃথিবীশুদ্ধ নির্বোধেরা মুগ্ধ হয়ে বগল বাজাল।

এদিকে ম্যাণ্ডেটের ফাঁকির ওপরে গড়ে উঠ্‌ল নতুন সাম্রাজ্যবাদ। যবনিকার আড়ালে গোপন চুক্তি আর নিঃশব্দ লঙ্কাভাগ সমাধা হয়ে গিয়েছিল। মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকাকে বাটোয়ারা করে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ গ্রাস কর্‌ল। তুর্কী সাম্রাজ্যকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করা হল। আরবীদের আশা দেয়া হয়েছিল তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। মিশরকে লোভ দেখানো হয়েছিল, লড়াইর পরে রক্ষকনবিশীর (protectorate) খতম হবে। ভারতবর্ষকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল, অচিরে স্বরাজের ফল ফল্‌বে। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দিন গুণছিল। কারণ উইল্‌সনী বিধানের ৩ নম্বর দফায়ই তো আছে, যা কিছু ব্যবস্থা হবে সবই হবে স্থানীয় লোকদের স্বার্থের কল্যাণে। ১২ নম্বরেও ঘোষণা করা হয়েছে, তুর্কীর অধীন জাতগুলোর অবাধ স্বাতন্ত্র্য, 'autonomous development'. লীগ অব নেশন্‌স্‌'এর (League of Nations) ২২ নং দফায়ও আছে, "Well being and development of such peoples form a sacred trust of civilization". হায় সভ্যতা! হায় sacred trust!

এই সভ্যতার ফাঁকি দিয়ে চললো অ-সভ্য শোষণ। প্যালেষ্টাইন, আরব, মিশর আটকা পড়লো ইংরেজের লোহার ফাঁদে; সিরিয়া পড়লো ফরাসীর জালে। ইরাকী বিদ্রোহে আবার রক্তস্রোত বইলো, ১৯২১ সনের কাইরো শান্তি বৈঠকে নাম মাত্র ক্ষমতা ইরাক পেল। চার্চিল ব্রিটিশ সৈন্যকে সরিয়ে এনে Royal Air force এর বজ্রমুষ্টিতে ইরাককে আট্‌কে রাখলেন। বাগদাদ, বসোরা হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিমান পথের নাড়ীকেন্দ্র, আর সুয়েজ খাল হবে সমুদ্র পথের মূল কেন্দ্র। তাই আরব চাই, আর চাই মিশর। আর সঙ্গে সঙ্গে চাই মসুলের তেল, "ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর" কোটী কোটী টাকার লাভের জন্য। একই কারণে চাই ইরাণে কর্তৃত্ব; কারণ বছর বছর ২০ লক্ষ পাউণ্ড মুনাফা শুষে আনা চাই, "অ্যাংলো-পারসীয়ান অয়েল কোম্পানীর"। ১৯২২ সনে মিশরকে স্বাধীন ঘোষণা করা হ'ল। কিন্তু যাতায়াতের পথ, বিদেশী স্বার্থ, সুডান ও দেশরক্ষার দায়িত্ব রইল ইংরেজের। যাতায়াত মানে ভারতবর্ষ, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, ইরাণ, মেসোপটেমিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি দশদিকের সঙ্গে সাম্রাজ্যের নাড়ীসংযোগ রক্ষা। এরই নাম সভ্যতার দায়িত্ব! মানবতার পবিত্র দায়।

গত বিশ বছর ধরে এই 'সভ্যতা'কে এরা লালন করছেন। এই কঠিন দায়িত্বকে এরা বহন করছেন। কিন্তু এই সুপবিত্র দায়িত্বটী আর কিছুই নয়, রক্ষক হয়ে ভক্ষণের সুমহৎ দায়িত্ব মাত্র। বড়ো আদর্শের ছোঁয়াচ লাগিয়ে নিলে সব কিছুরই শুদ্ধি হয়ে যায়। তাই ভক্ষণ করতে হলে রক্ষণের নামে করলেই ভালো। তাতে জাতও বাঁচে কূলও বাঁচে। আজকালকার সভ্যতার এইটুকুই হলো মহৎ বৈশিষ্ট্য। তাই আজকাল যা কিছু খুনোখুনী, রক্তপাত হচ্চে, সবই হচ্চে বড়ো কথার ছলে; কথা আছে, কাকের মাংস কাকে খায় না। কিন্তু মানুষের নাকি এত সংকীর্ণতা নেই। বিখ্যাত টমাস জেফারসন বলেছিলেন যে মানুষ এ বিষয়ে আশ্চর্য উদার। কেবল মানুষই স্বজাতিকে ভক্ষণ করে থাকে, "experience declares that man is the only animal which devours his own kind".

এরা যে সভ্যতার কথা বলে থাকেন সে হলো মানুষের এই ব্যাঘ্রবৃত্তি, মানবতার নামে মানুষকে উৎসন্ন করবার এই অমানুষিক, উন্মত্ত লোভ। তীক্ষ্ণ নখরের আঘাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এশিয়ার ও আফ্রিকার মাটীতে সঞ্চিত মধুকে এরা লুণ্ঠন করে নিয়েছেন; এই আধুনিক দস্যুবৃত্তি হলো 'সাম্রাজ্যবাদ', 'সভ্যতার' মুখোস পরে দেশবিদেশের কামধেনুকে দোহন করে নিচ্ছে। ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ তিন তিনটে সাম্রাজ্যের অন্তঃসারকে হজম করেছে এই বিশ বছর ধরে। ফলে শক্তিদম্ভ ফেঁপে উঠেছে। কিন্তু জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদও কম যায় না। গত চল্লিশ বছর ধরে এই লুণ্ঠনোৎসব থেকে জার্মাণী বাদ পড়েছে। তাই পড়েছে তার সাজ-সাজ রব, বসুন্ধরায় এই দস্যুতার ভোজে তাকেও শরীক হতে হবে। ভার্সাইতে তার পাখা কাটা গেছে, তার উড়বার ক্ষমতা গেছে। কিন্তু বিশ বছরে তারও নতুন পাখা গজিয়েছে! আজ আবার সে যুযুৎসু হয়ে আসরে এসেছে, দুই সাম্রাজ্যবাদের ঠোকাঠুকিতে আবার আগুন জ্বলে উঠেছে। জলেস্থলে, আকাশে উঠেছে সেই আগুনের শিখা। যতো কিতাবী নীতি আর মৌলিক আদর্শ পুড়ে ছাই, ছাই হয়ে গেলো, কোথায় রইলো গণতন্ত্র, আর কোথায় আজ মানবতা।

আবার সাম্রাজ্যবাদী সাইরেন বেজে উঠেছে, কুটনৈতিক সাপুড়েদের মধুর সাইরেন। ডাক্ এসেছে মানবতার নামে, গণতন্ত্রের নামে, মানুষকে বাঁচাতে হবে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে বাঁচাতে হবে! অতয়েব আবার লক্ষ লক্ষ গর্দান চাই। কিন্তু গর্দান যারা দেবে, তারা হলো নির্বোধ গণসমাজ। আবার তারা প্রাণ দেবে, বুকের রক্ত দেবে। কচি ঘাসের মত তাদের তাজা দেহ সীসা আর ষ্টীলের মুখে কুচি কুচি হয়ে কাটা যাবে। লোভে লোভে সংঘাত বেঁধেছে, কিন্তু যারা এই যজ্ঞের হোতা, উদ্গাতা তারা কোথায়? নিরাপদে মঞ্চে বসে তারা অগ্নিছন্দে বিউগিল বাজাচ্ছেন। আর মন্ত্রমুগ্ধ হতভাগারা আজ ঝাঁকে ঝাঁকে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে। বড় বড় কথায় মোহ আবার মানুষকে পেয়ে বসেছে।

কিন্তু কিসের আশায় ?

এইবার কি পৃথিবীর নতুন জন্ম হবে ? এই কুৎসিৎ রক্তলীলা থেকেই কি বেরিয়ে আস্‌বে নতুন মানুষ ! নতুন সমাজ ?

ইংরেজ বল্‌ছেন, এই হবে। কিন্তু তাহলে ইংরেজকে জয়ী হতে হবে। কারণ ইংরেজ হলো এই নতুন সমাজের ভগীরথ। যে বিশ্বশান্তি পৃথিবীতে আগামী কাল মুঞ্জরিত হবে, তার নাম হলো Pax Britanica, জার্মাণ বলছেন, নতুন পৃথিবীর জন্ম হবে জার্মাণীর বিজয়োৎসবে। তার ভিত্তি হবে Pax Germanica, ইটালীও দাবি করছেন, ভবিষ্যতের একমাত্র গতি হলো রোমান ব্যবস্থা, তাই নতুন ব্যবস্থার মূলে থাকা চাই Pax Romanica. এদিকে আমেরিকা বলছেন, ইঙ্গ-ফরাসী বা জার্মাণ কারুরই নেই ভবিষ্যৎ, এরা নিঃশেষ হয়ে এসেছে। পৃথিবীর একমাত্র ভরসা হলো আমেরিকার তরুণ নেতৃত্ব, অতয়েব পৃথিবী জুড়ে জয়গান করো Pax Americana'র। আবার রাশ্যা বলছেন, মার্ক্সীয় বিশ্বশান্তিই হবে চূড়ান্ত মোক্ষ, তাই চাই Pax Sovietica. এই কোলাহলে স্বভাবতঃ সন্দেহ আসে, কঃ পন্থা ?

সম্প্রতি ইঙ্গ-আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েট হাত মিলিয়েছেন, এই ত্রয়ীর একতারাতে একটী মাত্র গান বাজছে, সে হলো ডিমোক্রেসীর পুরোনো সুর। এ আমাদের চেনা, কারণ এর ঠাট-পর্দা আমরা জানি। ১৯১৪ সনে এই রাগিনীই বেজেছিল। এবারও ইঙ্গ-আমেরিকার সঙ্গে রুষ সেনা মিলিয়েছে, এ লড়াইতেও ডিমোক্রেসী নিরাপদ হবে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ইতিহাসের পুনরাবর্তন হচ্চে। কিন্তু কেউ কেউ বলছেন, বাদী সুরে তফাৎ আছে, রাগিনী এক নয়। কারণ তখন গেয়েছেন নিকোলাস-কেরেন্‌স্‌কী, আর এবার গাইছেন ষ্টালিন-লিট্‌ভিনফ্‌। কাজেই এদের মতে এবারকার লড়াই লোভের সংঘাত নয়, এ হলো নীতির সংঘর্ষ। অতয়েব, হে অমৃতস্য পুত্রা, বিনা বিচারে মরো, ডিমোক্রেসীর নামে মরলে মৃত্যু থেকেই অমৃতে যেতে পারবে।

আমাদের দেশেও মরবার ডাক্ এসেছে। এ হলো য়ুরোপের ডাক্, য়ুরোপে যে সাম্রাজ্যবাদী অজগর-ব্যাঘ্রের লড়াই চলেছে তার ডাক্। এ ডাকে সাড়া দিতে বলছেন ইংরেজ ; আর বলছেন ভারতীয় ডিমোক্রেটীক দলের মানবেন্দ্র রায় ও অন্যান্য মার্ক্সীস্টরা। ডিমোক্রেসীর যুদ্ধ হলে তো মার্ক্সবাদীর সমর্থন থাকবেই, কারণ তারা হলেন সোস্যাল ডিমোক্রেসীর নতুন রূপকার। তবে অন্যান্য মার্ক্সবাদীদের ইংরেজের পক্ষে বল্‌তে সরম লাগে, সাহসও হয় না। তাই তারা সোভিয়েটের দোহাই দিয়ে ডাক্ দিয়েছেন। মানবেন্দ্রের সে সঙ্কোচ নাই, তিনি পরিষ্কার ইঙ্গ-সোভিয়েটের নামে শিঙা ফুঁকেছেন। অপর মার্ক্সবাদীরা ইংরেজ বিরোধী, কিন্তু সোভিয়েট ভক্ত। তাদের হলো দুমুখো লড়াই, double front ইংরেজকে খতম করবো, কিন্তু রুশকে জয়ী করবো ; এই মনোভাব এদের। কিন্তু মানবেন্দ্র শাক দিয়ে মাছ না ঢেকে সোজা পথে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর মতে এ

যুদ্ধ হলো অবিভাজ্য ; রুশদের বড়ো মহারথীরাও বলেছেন, এ যুদ্ধকে ভাগ করে দেখা চলবে না ; আমেরিকা থেকে ইংলণ্ড, ইংলণ্ড থেকে রুশ, পৃথিবীজোড়া একই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ, indivisible এবং অবিচ্ছেদ্য। এই অবিচ্ছেদ্য যোগেই রুশ ও ইঙ্গ-আমেরিকা আজ যুক্ত হয়েছে। তাই এই আহ্বান, ইংরেজের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ; এ যুদ্ধ ফ্যাসিবিরোধী, ব্যস্, আর কিছু চাইনে। ফ্যাসিস্তবাদকে ধ্বংস করাই একমাত্র প্রোগ্রাম ও আদর্শ।

কিন্তু ভারতের জাতীয়তা আজ এ ডাকে সাড়া দেয়নি। কংগ্রেস এ যুদ্ধের বিরোধী, ফরোয়ার্ড ব্লকও এ যুদ্ধে সায় দেয় নাই। জাতীয়তাবাদ আজ ঘোষণা করেছে, স্বাধীনতাই ভারতের ধ্যানের লক্ষ্য। য়ুরোপীয় যুদ্ধ হলো সাম্রাজ্যবাদের রেষারেষি, দুটো শোষণ-যন্ত্রের আপোষহীন সংগ্রাম। ভারতের স্বার্থ অন্যত্র। জাতীয় আন্দোলন এখানে ভারতীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। এতে মানবেন্দ্র সায় দিতে পারেন নি ; (১) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতাবাদ তাঁর কাছে সংকীর্ণ স্বার্থপরতা। 'বিশ্ব যবে চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,' ভারতবর্ষ বসে থাকবে 'মুক্তি সমাধিতে,' এ চলতেই পারে না। সোভিয়েট যদি যায়, ইংরেজ যদি যায়, তবে কে থাক্‌বে ? আর এরা থাকলে সবাই থাক্‌বে ; সাম্য, স্বাধীনতা ও মুক্তি। (২) জাতীয়তাবাদ হলো নেতিমূলক কারণ স্বয়ং স্বাধীন হতে চেয়ে অপরের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করে থাকে : যথা, চীনের কুয়োমিনটাং জাতীয়তা মঙ্গোল ইত্যাদি অ-চীনা জাতিদের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। যথা, ভারতে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য (self determination) স্বীকৃত হয় না, এবং ভারতে জাতীয়তাবাদীরা ব্রহ্মদেশের বিচ্ছেদকে সমর্থন করেনি। এ ছাড়া যা'কিছু বিদেশী তারই ওপরে জাতীয়তাবাদীর আক্রোশ, এতে জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হয়। (৩) তৃতীয়তঃ ভারতবিভাগ বা পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেনা, এতে ভৌগোলিক ঐক্যকে বড়ো করে দেখা হয় এবং এ ঐক্য হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পোষক। কাজেই জাতীয়তা হলো সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক। (৪) এই প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র রায় রেজা শাহকে আক্রমণ করে রুশীয়ার ইরাণ অধিকারকে সমর্থন করেছেন। (৫) স্বাধীনতা ইংরেজ দিলেও আজ গৃহযুদ্ধ হবে, তাই স্বাধীনতা দেওয়ারও কোন স্বার্থকতা নেই। মানবেন্দ্রের উক্তিগুলি ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিপন্থী এবং যুক্তিগুলি শিশুসুলভ।

প্রথমতঃ, য়ুরোপীয় যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ফল। ১৯১৪ থেকে ১৯৩৯ কোনো দিকেই তফাৎ নয়। যুদ্ধের শিকড় রয়েছে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে। যে অবস্থার সমবায়ে লড়াই আস্‌তে বাধ্য, সেই সমবায় ১৯১৪ সনে যেমন ছিলো এখনো তেমনি আছে। এবারকার যুদ্ধও গভীর সামাজিক কারণ থেকে জন্ম নিয়েছে।—রুশের সংশ্লিষ্ট হওয়াতেই যুদ্ধের রূপ বদলে যায়নি। কারণ ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরার প্রকৃতিও বদ্‌লায়নি। নীতির সংঘর্ষ বলে যুদ্ধকে কৌলিন্য দান করবার চেষ্টা চলেছে ; কিন্তু রকম বেরকমের মিতালী ও সমবায়ের নমুনাতেই ধরা পড়ে যুদ্ধের

স্বরূপ। ফরাসী প্রথমে হলেন ইংরেজের মিতা। তারপরে হলেন জার্মানীর দোস্ত। রুশীয়া একবার হলেন জার্মানীর দোস্ত, পরে গেলেন ইংরেজের দলে। তাছাড়া যুদ্ধের প্রকৃতি বোঝা গেছে আটলান্টিক চার্টার থেকে। রুশীয়া ঐ চার্টারের উৎসাহী সমর্থক, এতে রুশীয়া সমাজতন্ত্রী ডিমোক্রেসীর ইজ্জৎ রক্ষা করেন নি, সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হয়েছেন। ইঙ্গ-মার্কিন-রুশীয় সমবায়ে ইঙ্গ-মার্কিনই প্রবলতর শরীক, ফলে রুশকে এদের মুখাপেক্ষী হতেই হবে। রুশীয় দাবি-দাওয়া চাতুরীতে বিফল হবে, যেমন হয়েছিল লয়েড জর্জ-ক্লিমেঁসোর চালে উইলসনের আদর্শবাদ। জাতিসঙ্ঘের সভ্য হয়ে যেমন রুশীয়াকে মেনে নিতে হয়েছিল উপনিবেশিক শোষণ নীতিকে, ম্যাণ্ডেট্ নামক সাম্রাজ্যবাদী আত্মসাৎ-এর নীতিকে, ইংলণ্ডের আবীসিনীয় ও স্পেনীয় পলিসীকে। এই কারণে রুশের যোগদানে ইতরবিশেষ কিছু হয়নি। যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপেরও হানি হয়নি। তাই ভারতবর্ষের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন উৎসাহ নেই, কারণ সাম্রাজ্যবাদ হলো জাতীয় প্রগতির পরিপন্থী। এ যুদ্ধে যে শরীকি করতে হচ্চে ভারতের, তাতে তার আত্মার যোগ নাই। মানবেন্দ্র রায় কিন্তু এতে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। তাতে নাকি ইতিহাসের জয় সূচিত হয়েছে ; কিন্তু এতে ইতিহাসের নয়, সাম্রাজ্যবাদের জয় সূচিত হয়েছে। মানবেন্দ্রের এ উল্লাস সাম্রাজ্যবাদের সমধর্মী।

দ্বিতীয়তঃ এ যুগের জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী শক্তি হিসাবে। ইজিপ্ট, আরব, ইরাণ, ভারত, চীন, তুর্কী ইত্যাদি সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতিবাদে জন্ম হয়েছে জাতীয় আন্দোলনের। একে সংকীর্ণ মতবাদ ও স্বার্থপরতা বলে তাচ্ছিল্য করে সাম্রাজ্যবাদ ; Sir. A. T. Wilson ১৯১৮ সনের পরে আরব জাগরণকে বলেছিলেন, "Arab provincialism." কম্যুনিষ্ট মানবেন্দ্রও আজ ভারতীয় জাতীয়তার বিরুদ্ধতা করে সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ সহায়ক হয়েছেন। সিভিল সার্ভেন্টরাও ভারতীয় আন্দোলনকে 'disgruntled' কতিপয়ের আস্ফালন বলে গালাগালি দিয়ে থাকেন। জাতীয়তাবাদ সামাজিক বিকাশের একটা ঐতিহাসিক পর্যায়। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এর সার্থকতা আছে। জাতীয়তার সঙ্গে মানবতার ও আন্তর্জাতিকতার বিরোধ নাই, বরং একে অন্যের পরিপূরক। ব্যষ্টির সঙ্গে যেমন সমষ্টির বিরোধ নাই, অংশের সঙ্গে পূর্ণের যেমন সংঘর্ষ নাই। উভয়ের এই যোগাযোগকে যারা ব্যবচ্ছেদ করে দেখেন তারা বাস্তবকে খণ্ডিত করেন, কৃত্রিম, কাল্পনিক দ্বৈত সৃষ্টি করে তারা জীবনের বিকাশকে ব্যাহত করেন। তবে জাতীয়তা বলতে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তা বোঝায় না। সর্বগ্রাসী, বুভুক্ষু (annexetionist) জাতীয়তা হলো সাম্রাজ্যবাদের জনক। পরাধীন জাতিগুলির জাতীয়তা সেই লোভাতুর বুভুক্ষুতা নয়। এ হলো শুধুমাত্র বাঁচবার অধিকারকে এবং সামাজিক জীবনের প্রগতিকে অক্ষুণ্ন রাখবার দাবি মাত্র। জাতীয়তা নিছক ভৌগলিক ঐক্য

নয়, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনীতিক ঐক্যও বটে। ঐক্য হলো প্রগতির পরিচায়ক, ভেদ হলো সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের একমাত্র কৌশল। স্বায়ত্তশাসনের (self determination) নাম দিয়ে ব্রহ্মবিচ্ছেদ ও পাকিস্থান সমর্থন করা হলো প্রতিক্রিয়াপন্থীর মনোবৃত্তি। এই সাধু নীতির দোহাই দিয়ে ইংরেজও ভারতে ভেদনীতিকে বজায় রেখেছে। মানুষ ভৌগলিক পরিস্থিতিকে বাদ দিয়ে চলতে পারেনা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সুদূর সংযোগ রেখে মানুষকে নিকটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রাখতে হয়। এটি হলো বাস্তব নীতি, ভৌগলিক ঐক্যের ওপরে অযথা গুরুত্ব আরোপ নয়।

কাজেই স্বভাবতই জাতীয়তাবাদ অপরের স্বাধীনতাকেও সম্মান করে থাকে। চীনের জাতীয়তাবাদী দল কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর বিরুদ্ধে কতকগুলি কল্পিত অভিযোগ মানবেন্দ্র রায় করেছেন। মাঞ্চু সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারকে বাঁচিয়ে রেখে সানইয়াৎসানও নাকি চীনের অন্য জাতগুলোকে গ্রাস করে রাখতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস যারা জানেন তারাই বুঝবেন এ অভিযোগ কত ভিত্তিহীন। ডাঃ সানের 'Union of the five races' কে জুলুম বলে অভিহিত করার মানে হলো ইতিহাসকে স্বেচ্ছায় বিকৃত করা। সমস্ত চীনদেশের গণশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার মূলে রয়েছে ডাঃ সানের আজীবন সাধনা। ১৯২৪ সনে ডাঃ সানের নেতৃত্বে কুয়োমিন্‌টাঙের প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। সেই কংগ্রেসেই জাতীয় দলের বিখ্যাত ঘোষণাপত্র (Manifesto) প্রচারিত হয়েছিল। সেই প্রচার পত্রে চীনা জাতীয়তাবাদকে স্পষ্টভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদের হলো দুটো উদ্দেশ্য (১) চীনা গণশ্রেণীর স্বাধীনতা (২) চীনা রিপাব্লিকের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি বা অংশগুলোর (Complete equality of the nationalities) পুরোপুরি সাম্য। গণশ্রেণীর দাবী নিয়েই কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্ট গঠন করবার পোগ্রাম দিয়েছিল, "It unites the peasants and workers to join the party in order to enable it to present a united front against the militarists and imperialists." (Manifesto), আর জাতিগত সাম্য (racial equality) সম্বন্ধে স্পষ্টভাষায় পিকিং মান্দারিনদের নীতিকে আক্রমণ করে আত্মনিয়ন্ত্রণের (racial self determination) নীতিকে দলীয় নীতি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মানবেন্দ্র দিনকে রাত করে জাতীয়তাবাদের ওপরে ঝাল মিটিয়েছেন। মঙ্গোলীয় রিপাব্লিকের স্বাতন্ত্র কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ আজো স্বীকার করেনি, তুর্কীস্তানের পৃথক হবার (secede) অধিকারকে স্বীকার করেনি বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। উপরোক্ত ম্যানিফেষ্টোতে, স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায় (free alliance) চীনা রিপাব্লিক গঠিত হবে, একথা স্পষ্টভাবে রয়েছে। যেমন আজ U. S. S. R. হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতায়। সোভিয়েট গণতন্ত্রেও পৃথক হবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু কাগজে কলমে থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সত্যি

সত্যি পৃথক হতে দেওয়া হয় কি? সমাজতন্ত্র শেখবার অজুহাতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীনস্থ ছোট ছোট জাতিগুলোকে কি বাধ্য করানো হয়নি সোভিয়েটের সঙ্গে থাকতে?

রুশ চেহারার আড়ালে দুর্ধর্ষ তাতারই কি লুকিয়ে নেই? রোমানফ্ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়েই কি সোভিয়েট রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করা হয় নি? পোলাণ্ড, ফিন্ল্যাণ্ড, ইউক্রেন, ককেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, ক্রিমিয়া, বেসারাবিয়া, বুকোভিনা এসব নিয়ে এত মারামারি সোভিয়েট কেন করেছে? শস্যশালিনী উক্রেন্‌কে ও জর্জিয়া, আজারবেজানকে সোভিয়েট সৈন্য কেন দখল করে নিয়েছিল? এদের ভাষা, জাতি, সবই আলাদা। একথা বললে চলবে না যে এরা সোভিয়েট সংঘের সভ্য হয়ে সুখে আছে। এদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখতে হবে, এরা চেয়েছিল কিনা। সাম্রাজ্যবাদীরাই বলে থাকে অধীনস্থ তাবেদারেরা সুখে আছে। ইংরেজও বলছে, ভারতের গণসমাজ ইংরেজকেই চায়। তেমনি League of Nations এর ম্যাণ্ডেট পদ্ধতিও অনুগত জাতিদের 'tutelage' নীতির ওপরেই দাঁড়িয়েই আছে। তারাও 'sacred trust' এর দোহাই দিয়ে থাকেন। কাজেই সোভিয়েট ইউনিয়ান বললেই সাতখুন মাপ! আর 'union of five races' এর সানইয়াৎসান সাম্রাজ্যবাদী! এ যুক্তি চমৎকার।

আত্মনিয়ন্ত্রণ বা "self determination" এর যে মানে করেছেন মানবেন্দ্র রায় তা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিপন্থী এবং অসম্ভব প্রতিক্রিয়াশীল। তার স্বাধীনতার মানে হলো স্বেচ্ছাচার ও এনার্কিজ্‌ম। স্বাতন্ত্র্যের একটা সীমা থাকা চাই; নির্বিশেষ স্বাতন্ত্র প্রগতির শত্রু। বিজ্ঞানের যুগে শক্তির কেন্দ্রীকরণই চাই, বিচ্ছিন্নতা নয়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বড়ো unit গঠন করবার প্রয়োজন আজ বেশী। তাতে বৃহৎ আকারে উৎপাদন ও সংগঠনের ব্যবস্থা সম্ভব হয়। জগতে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সমবায় হতে হতে বিশ্ব-সংহতি একদা সম্ভব হতেও পারে। তাই বৃহৎ ভৌগলিক ভিত্তিতে সংস্থা বা institution গড়াটা আন্তর্জাতিকতার অনুকূল। সেই অর্থে জাতীয়তার স্থান আন্তর্জাতিকতার মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু যারা আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে যদৃচ্ছাচার সমর্থন করেন তারা প্রগতির মূলে কুঠারাঘাত করেন। আজ মানবেন্দ্র পাকিস্থান সমর্থন করেন, কাল শিখিস্থান, পরশু মারাঠীস্থান, তরশু ইহুদীস্থান ও ক্রিশ্চানিস্থানকেও সমর্থন করবেন। তাহলেই ভারতবর্ষকে একটী রাষ্ট্রীয় unit না রেখে বহু খণ্ডে ভেঙ্গে ফেল্‌তে চান তিনি। অন্থকার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বল্‌বে এই পরিকল্পনা মারাত্মক, কেবল রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ইত্যাদি সকল দিকেই। আজিকার জগতে কোন সুস্থবুদ্ধি লোক এই প্রস্তাব করতে পারেন তা কল্পনাতীত।

মানবেন্দ্রের ধারণায়, জাতীয়তা মানে হলো বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরোধ। কাজেই জাতীয়তা প্রতিক্রিয়াপন্থী। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণা এসেছিল য়ুরোপ থেকে, একথা তিনি জানেন না সেদিন ও জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী যন্ত্রশিল্প ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতেই

ভবিষ্যৎ ভারতের পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। এ সম্বন্ধে এতখানি অজ্ঞতা করুণার উদ্রেক করে। এই অজ্ঞতাকে সম্বল করেই মানবেন্দ্র রায় সমস্ত জাতীয়তাবাদকে আক্রমণ করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত জাতীয়তাবাদীই আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত ঐশ্বর্যকে গ্রহণ করে জাতিগঠনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ইজিপ্ট, ইরাক, চীন সর্বত্রই নব্যবিজ্ঞানের আয়োজন হয়েছে। রিজা সাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, রিজা শাহ ইরাণকে ইচ্ছা করে উন্নত করেন নি, ইরাণের মধ্যদিয়ে ভারতে রেললাইন আনতে দেননি ইংরেজ এবং সোভিয়েটের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। এসব তাঁর বিদেশী বিদ্বেষ মাত্র। কিন্তু মানবেন্দ্র রায় কি খবর রাখেন, পারস্যের সমস্ত শাসন ব্যবস্থায় বিদেশীদের প্রভুত্বই বহাল রেখেছিলেন রিজা শাহ? কাষ্টমস্ বিভাগ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বেলজিয়ানদের হাতে, অর্থবিভাগ Dr. Millspangh প্রমুখ আমেরিকানদের হাতে, এবং শিক্ষা-বিভাগ ফরাসীদের হাতে। তবে হ্যাঁ, সোভিয়েট ও ব্রিটিশকে রিজা শাহ বিশ্বাস করেন নি; কিন্তু তাতে মানবেন্দ্র চট্‌লে চলবে কেন? এই দুই শক্তির প্রবল স্বার্থের চাপ যে ইরাণের ওপর অহরহই রয়েছে। ইংরেজ চেয়েছিল বাগদাদ থেকে তিহারাণ পর্যন্ত রেললাইন ও ইরাণ থেকে ভারত পর্যন্ত বিমান পথ নির্মাণ করতে। রিজা শাহ তা দেননি। কারণ তার অর্থ তিনি ভালই জানেন। তিনি বাগদাদ তিহারান সড়ক বাঁধিয়ে দিয়ে কাইরো করাচী বিমান পথের ষ্টেশন করতে দিয়েছেন; সর্ত হল এই যে ষ্টেশনগুলো হবে ইরাণের সম্পত্তি। ককেসাস থেকে পারস্য সাগর পর্যন্ত রেললাইনের জন্য সোভিয়েট বহুদিন পীড়াপীড়ি করছে। কারণ তাদের স্বার্থসিদ্ধি এবং উত্তরে রুশীয়ার ককেশিয়া ও কাস্পিয়ান রাজ্য। রিজা শাহ মস্কো তিহারাণ বিমান যাতায়াত করতে দিয়েছেন এবং একটী ছোট রেললাইনও বানিয়ে দিয়েছেন। রিজা শাহ ইংরেজ ও সোভিয়েটের কথায় কান দেন নাই তাই মানবেন্দ্র রায় ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন, রুশ-ব্রিটিশ অধিকারে গিয়ে ইরাণের ভালই হয়েছে। ইরাণীরা নাকি খুশীই হয়েছে। ইরাণীরা খুশী হয়েছে কিনা জানিনে, তবে মানবেন্দ্র যে খুশী হয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের বক্তব্য, কোন জাতিকে গায়ের জোরে দখল করবার অধিকার কারুর নাই, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সোভিয়েটেরও নাই। ইরাণ আজ স্বাধীন নয়, এই মর্মান্তিক সত্যকে কোনো প্রচার, কোন কোলাহলই ঢেকে রাখতে পারবে না।

তাই আমরা বলছিলাম, আমাদের দেশে আজ মরবার ডাক এসেছে। ডাক দিয়েছে ইংরেজ, আর ডাক দিয়েছে মানবেন্দ্র রায়ের ডিমোক্রাটিক দল এবং অন্যান্য মার্ক্সবাদীরা। সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধ রাতারাতি সমাজবাদী যুদ্ধে পরিণত হয়েছে রুশের শরীকী দ্বারা, এই মারাত্মক, মিথ্যা কথা এরা প্রচার করেছেন। যুদ্ধ এদের কাছে আজ ক্রুসেড্। কিন্তু ভারতের জাতীয়তাবাদীরা এই ইতিহাস বিরুদ্ধ, অবৈজ্ঞানিক মিথ্যাকে স্বীকার না করে ভারতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্যকেই সমুখে রেখেছেন। তাই ভারতবর্ষ এই মরণের ডাকে সাড়া দেয়নি। ১৯১৪ সনের পুনরাবৃত্তি করে কাল্পনিক ইউটোপিয়ার নামে মরবার সখ তার নেই। কিন্তু তবু হয়তো মরতে হবে, দুঃখে, দুর্ভিক্ষে, অপমানে জর্জরিত হয়ে মরতে হবে; কিন্তু তবু, সাম্রাজ্যবাদীদের এই জোড়াতুর কাড়াকাড়িতে পরাধীন ভারতবর্ষের কোনো স্বার্থ নেই, ইতিহাসের পাতায় এই সাদা সত্য লিখা থাকুক।

দু'য়ে দু'য়ে

বিট্রেন ও ভারতবর্ষ, হিন্দু ও মুসলমান, আমেরী ও লিনলিথ্গো, রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও দেশরক্ষা পরিষদ। শেষ জোড়ার মাহাত্মের কাঁচে অন্যগুলি দেখা যাক্। শেষ জোড়াটার কিছু মানে আছে—হয়তো বা অতিকায় জানোয়ারের ঈষৎ অঙ্গচালনা বই এটা আর কিছুই নয়। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর কল্যাণের দায়িত্ব যাদের, তাদের অতিকায়ের এই পদক্ষেপন তলিয়ে দেখা উচিত। এটারও প্রয়োজন আছে, যেমন প্রয়োজন আছে দেশরক্ষী বোমারু বিমানের সমারোহের।

স্থিরচিত্তে ভারতের কথা ভাবা মুস্কিল। সাদা কথায় ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা আরও মুস্কিল। এক কথায় ভারত ও বৃটেনের মধ্যে বিবাদের সূত্রটা কি? সেটা এই—আমরা যেমন স্বাধীনতা চাই ভারতবর্ষও ঠিক সেই রকম স্বাধীনতা চায়; চার্চিল যে স্বাধীনতা চায়—আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা আপন রুচি অনুযায়ী জীবনযাত্রার স্বাধীনতা যার রীতিনীতি বৃটিশ পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী—সুহৃদ, মিত্র ও শত্রু বেছে নেবার স্বাধীনতা। এজন্য আমরা নেহেরু এবং আরও পাঁচহাজার লোককে কয়েদ করেছি। তারা পঞ্চমবাহিনী বা আমাদের শত্রু নন—তাদের দাবী হোল, আমাদের বর্ণিত যুদ্ধের উদ্দেশ্যের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতাও স্থানলাভ করুক। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়ার্কিং কমিটির কৈফিয়ৎ—যা ব্রিটিশ জনসাধারণের কাছে গোপন রাখা হয়েছে—ইংরেজী ভাষার মর্মস্পর্শী উজ্জ্বল সম্পদ হয়ে থাকবে। যে স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ আমাদের মুখের বুলি সেই মন নিয়ে কংগ্রেসের জবাব দিলে নেহেরু আজ কারান্তরালে না থেকে তার দুর্বার প্রেরণা দিয়ে আমাদের স্বপক্ষে ভারতকে অনুপ্রাণিত করতেন। আর আজ আমরা ভারতীয় জনগণের অতি সামান্য অংশকে বৃত্তিভোগী সৈন্য হিসাবে ব্যবহার করছি—যারা পয়সার জন্য নির্বিচারে যে কোনও দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত।

এই বৃত্তিভোগীরা অধিকাংশই দুর্ধর্ষ পাঞ্জাবী ও প্রান্তীয় মুসলীম,—লড়াই তাদের পেশা, বহুদিনের বৃত্তিভোগী এরা, ইংরেজের স্তম্ভ এরাই। সেইজন্যই লড়াইয়ের বিপদ যতই ঘনিয়ে এলো, ইংরেজের চোখে সেকেন্দার, জিন্নার কদর বাড়লো। এরা যে পরিমাণে কামান গোলার খোরাক জুটিয়েছে কদরও বেড়েছে সেই অনুপাতে। স্বভাবতই, এই ভদ্রলোকেরা সুযোগ বুঝে হিন্দু-প্রধান কংগ্রেসের—দুর্ভাগ্যের বিষয় কংগ্রেসে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী—গণতন্ত্রী প্রাধান্যের বিরোধিতা করে। ইংরেজের সময় খারাপ। স্বাধীনতার কথা যারা বলবেনা কিম্বা সেনাপতির আদেশ যারা অমান্য করবেনা এরকম সৈন্য তাদের চাই। ভারতের ভবিষ্যৎ কিম্বা নেহেরুর সঙ্গে আলোচনা তাদের কি কাজে আসবে? সুতরাং, নেহেরু জেলে গেল সঙ্গে গেল ভারতের শ্রেষ্ঠ নর-নারী।

অবস্থাটা সুখের নয়। শুধু সৈন্যই চাই না। আরও কিছু চাই—অর্থ চাই, শস্ত্র চাই আর সেই হেতু চাই দেশের শুভেচ্ছা। আমেরী সাহেবের চাওয়ার ও পাওয়ার সুযোগ ছিল। ভারতের জাতীয় দাবী পূরণ করলেই সমস্যা মিটে যেত। অবশ্য এ নিয়ে অনন্তকাল তর্ক করা চলে যেমন চলে চেক ও পোলদের অবস্থা নিয়ে। অসংখ্য বিঘ্নের কথাও তোলা যায়। এখানে এইটুকু বলে রাখি যে আমেরী সাহেবের ভারতে যাবার প্রস্তাবটা ছিল সঙ্গত। অবশ্যি আমেরী সাহেবকে চার্চিল-সাইমন লয়েডের ভারত সম্পর্কে মনোভাবের বিরুদ্ধে পদত্যাগ না করার জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণে দোষ দেওয়া ভুল হবে। কোনটাই হোল না, ফলে, অতিকায় জানোয়ার একটা হাই তুল্‌লো মাত্র। অবস্থা রয়ে গেল অপরিবর্তিত।

কিছুতেই কিছু হ'ল না। আরও কিছু করা দরকার। সুতরাং ১৯৪১ সালের ২২শে জুলাই আমেরি-লিন্‌লিথগো কয়েকটি ছানার জনক হলেন। আমেরিকা বা বৃটেনের প্রতি হাজারের নয়শত নিরানব্বই জনের কাছে হোয়াইট পেপারে—দেশরক্ষা ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ—মুদ্রিত নামের কোন অর্থ নাই। তাদের কাছে প্রশ্ন হ'ল ছানাগুলি সাচ্চা না ঝুটা? বৃটেনের সুহৃদ, নব্য ভারতের নায়ক নেহেরু স্যাঁতসেঁতে গারদে কাল কাটাচ্ছেন—চৌদ্দ দিনে মাত্র একখানা চিঠি তিনি পান। এই অবস্থায় বৃটিশ রাজের আশ্রয়ে রাজকার্য গ্রহণ করা ভারতীয়দের পক্ষে কিছুতেই সঙ্গত না। আমার ভুল হোতে পারে; ছানাগুলি হয়ত বা সাচ্চা। হয়ত বা স্বাধীনতার পথে এক পা ভারত বাড়িয়েছে। একটা ইংরেজী কাগজ তো 'ভারত ভারতীয়দের জন্য' এই শিরোনামা দিয়ে এদের আগমনবার্তা ঘোষণা করেছে। আচ্ছা, আরও একটু ভাল করে দেখা যাক।

স্যার হোমী মোদী হয়েছেন সরবরাহ সচিব। স্যার হোমী অমায়িক প্রকৃতির, সুরসিক, বুদ্ধিমান সুচতুর ব্যবসায়ী। জাতে পার্শী। টাকার কথা বাদ দিলে তিনি ভারতের প্রতিনিধি নন। তাঁকে আমার লাগে ভাল। কিন্তু আমি ভেবে পাই না বোম্বের প্রাসাদে বসে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে তার যোগাযোগটা কোথায়?

স্যার আকবর হায়দারী একা আমাকে হায়দারাবাদের চমৎকার বাগানে খানা খাইয়েছেন। তার সে কি কাণ্ড!—চৌত্রিশটা ফোয়ারা, আলোয় আলো, মধুর আলাপ, সবশেষে তাঁর সংগৃহীত ছবি। তিনি নিজের প্লেনে ওড়েন, ভোর বেলা মুষ্টিযুদ্ধ লড়েন—তাঁর মত বয়সে দুটোই তাজ্জব ব্যাপার। তিনি একজন মনের মত লোক। তাঁকে মোগল বাদসার উত্তরাধিকারী বলা যেতে পারে—কিন্তু তিনি ভারতের প্রতিনিধি?—ছ্যা! একথা উচ্চারণ না করাই ভাল।

রাঘবেন্দ্র রাও আর ফিরোজ খাঁ নুন—তাঁরা হলেন যথাক্রমে অসামরিক দেশরক্ষা ও শ্রমবিভাগের মন্ত্রী। উভয়েই কিছুকাল ইংলণ্ডে ছিলেন—সেটা একটা সুবিধাও বটে, অসুবিধাও বটে। রাঘবেন্দ্র রাওকে জানি—বিবেকনিষ্ঠ লোক কিন্তু কল্পনায় বালাই নাই। দিল্লীতে যখন

লাহোরে হুনদের আগমন শুনলে আমি চাইবো আরও উৎসাহী কেউ দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করুক। স্যার ফিরোজ খাঁ! 'হ্যাঁ, তার সম্বন্ধে কয়েকটা কড়া কথা বলতে পারি—শত্রু হলেও আঘাত দেব না। লোকটি ভাল— শ্রমমন্ত্রীর কাজও বিস্তর। তাঁর এই পদ গ্রহণ করা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়। তার শুভ কামনা করি। তিনি যদি একবার দেরাদুন জেলে নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন!

আনের পরিচয় সামান্যই জানা আছে। ভারতীয় প্রবাসীদের পরিচর্যার সুযোগটা কম কথা নয়। তাঁর সংস্কারবর্জিত সবল মানসিকতা থাকা চাই। নূতন আইন সচিব—স্যার সুলতান আমেদ। তাঁকে বৃটিশ রাজের তাগিদে আড়াল থেকে টেনে বার করা হয়েছে কারণ উচ্চপদে মুসলমানের সংখ্যা কম আর বাইরে তিনি বুরোক্র্যাসীর ওপর চোখ রাঙ্গালেও আসলে খুব অনুগত।

নলিনী সরকারকে কে জানে? তাকে অর্থবিভাগ থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমিব্যবস্থা বিভাগে (মন্ত্রীদের কত বিষয়ই না জানতে হয়!) গোত্রান্তর করার পেছনে বাংলাদেশ থেকে যাহোক একজনকে নেবার তাড়না ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।

দেশরক্ষা পরিষদ নিয়েও খানিকটা গল্পগুজব করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তার তালিকাটা বড় লম্বা। আম্বেদকারের পরিচয় হল—তিনি হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যদের বিদ্রোহের প্রতীক। সুতরাং, হিন্দুদের জব্দ করার কিছু একটা পেলেই হ'ল, যে লড়াইয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই সেটাই বা বাদ যায় কেন? বাংলা, আসাম ও পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীরা আমেরী সাহেবের বড় নজীর। কিন্তু ইংরেজরা কি জানে না যে প্রধান মন্ত্রী আরও ছিল, তারা সবাই পদত্যাগ করেছে এবং যে কারণে নেহেরু জেলে গেছে সেই কারণে তারাও কারারুদ্ধ। এরপরও কি দেশরক্ষা পরিষদকে প্রতিনিধিমূলক বলা যায়? অবশ্যি দারভাঙার মহারাজার মত—যার আয় ছয়লক্ষ পাউণ্ড, খুঁটি হাতে রাখা দরকার। স্যার কয়াজী জাহাঙ্গীর বড়লোক; পার্শীদের দোহন করতে হোমি মোদীর সহায়তা করতে পারবেন। স্যার জাওলা শ্রীবাস্তবের মত খবরের কাগজের মালিক কাজে আসবে। আর ইউরেশীয় নেতা স্যার হেনরী গিডনীর তো এই সুবিধা। তার স্বজাতীয়দের, ভারতীয়দের ঘৃণা করবার অহমিকা আছে, রোজগারের সংস্থান করার মুরাদ নাই। এবার তারা চাকরী লুটে নিতে পারবে। এই তো রকম! চমৎকার লোক সব—এরাই ভারতের প্রতিনিধি?

আচ্ছা, বর্ধিত রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও দেশরক্ষা পরিষদের কাজটা কি? হোয়াইট পেপার ও আমেরী সাহেব সরমে এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই! তাদের কোন সভাপতি থাকবে বলে মনে হয় না—সভাপতির প্রশ্নটাই গোলমেলে। আমেরী সাহেবের জবাবে বোঝা গেছে (১) বড়লাটের নাকচ করবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে, (২) দেশরক্ষা পরিষদ মন্ত্রণা পরিষদ বই আর কিছুই

নয়। কি মজার কথা! আমি যখন ভারতে ব্রডকাষ্টিংএর বড়কর্তা ছিলাম আমারও এ ধরণের অনেক মন্ত্রণা পরিষদ ছিল। আমাকে রোখবার তাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। বলতে কি তাদের পরামর্শ অগ্রাহ্যই করতাম বেশী। তা' হোলে দাঁড়াচ্ছে এই—বড়লাটের নাকচের ক্ষমতা থাকলে রাষ্ট্রীয় পরিষদ হবে স্বেচ্ছাচারীর গোবেচারী মন্ত্রণা সভা।

আমি সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে কথাগুলি বলেছি, না বলে উপায় কি! আমি ভাবতেই পারি না গান্ধী যেখানে নেই নেহেরু যেখানে জেলে কি করে সেখানে গুটি কয়েক মন্ত্রণাদাতা ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় হতে পারে? তবে আর একটা দিকও দেখবার আছে। লিন্‌লিথগো আর আমেরী মিলে যাহোক একটা কিছু করেছেন। তাদের এই অঙ্কুর মুঞ্জরিত হবে কি? আমার সন্দেহ আছে প্রকৃত ভারত এদের গ্রহণ করবে কিনা। যদি ভারতের পরীক্ষার সময় আসে, আমার ভুল যেন ভাঙে। একটা কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। জয়াকরের মত লোক, যিনি এই সবেমাত্র প্রিভিকাউন্সিল্ সভ্য পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, তিনিও বোম্বাইতে লিবারেল কনফারেন্সে ২৭শে জুলাই তারিখে এক প্রস্তাব করেন যে যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা উপনিবেশগুলির মত হবে এই মর্মে পরিষ্কার ঘোষণা করা হউক।

সর্বশেষ হলেও সব চাইতে বড় কথা হোল গান্ধীজী। তাঁর সম্পর্কে লিখতে আমার সঙ্কোচ হয়—এই সব বিক্ষোভের কত ঊর্ধে তিনি! ক্ষীণচিত্ত ব্যক্তিদের মত তার সঙ্গে আলোচনা করেছি 'সত্যিই কি হিটলার আমাদের জয় করবে?' তাঁর কাছে এই প্রশ্নের একটিমাত্র জবাব পেয়েছি—অহিংসা, সে যত বছরেই হউক।

যুদ্ধ তাঁর কাছে হেয়—দাসত্ব মোচনে হিংসার পথ তাঁর পথ নয়। তবুও, নেহেরুর ন্যায় তিনিও ইংরেজের বন্ধু এবং জার্মাণ লোলুপতার পরম শত্রু। যদিও এই যুদ্ধে নীতির তাগিদে তিনি দূরে সরে আছেন, আজ যদি ভারতের জীবন-মরণ সমস্যা হ'ত, আমার মনে হয় তিনি নির্লিপ্ত থাকতে পারতেন না। ওয়ার্ধায় তাঁর সঙ্গে মিলনের কথা যখন মনে পড়ে যখন বোম্বাই ও দিল্লীতে নেহেরুর সঙ্গে আলাপের কথা ভাবি তখন সুপারিষদ লিন্‌লিথগোর বিরাটত্ব আবছা হয়ে আসে। এই দুটি মহান পুরুষ ভারতের কেন ইংলণ্ডের জন্য কত কি করতে পারতেন।*

---

*New Statesman and Nations, পত্রিকার Lionel Fieldenএর লেখা প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।

Lionel Fielden কিছুকাল পূর্বে ভারতের ব্রডকাষ্টিংএর বড়কর্তা ছিলেন। শোনা যায় কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন।

Fielden সাহেবের প্রবন্ধে নতুন কিছু না থাকলেও এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে বর্তমানে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সুরটি একজন ভূতপূর্ব ইংরেজ রাজকর্মচারীর চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়লেও আমাদের দেশে কোথাও কোথাও আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী আন্তর্জাতিক সমস্যার সম্মুখে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এটাই লজ্জার বিষয়।

শক্তি

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বৃদ্ধের ও বৃদ্ধতর থাকে। আমার এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুর কথা বলি। তিনি আজ ইহলোকে নাই। তিনি জাতিতে ছিলেন নমঃশূদ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পরে হলেন উকীল। আইনের দ্বিজত্বে নবপক্ষোদ্গমের পর উড়ে গিয়ে বস্‌লেন খুল্‌নার বার্-লাইব্রেরির ডালে। সেখানে পদার্পণ করামাত্র যে সাদর সম্ভাষণ পেলেন সেটা লিপিবদ্ধ করি। যেই সেই ঘরে ঢোকা, অমনি সেখানকার একজন মুরুব্বী উকীলবাবু হাঁকলেন—'ওরে কে আছিস্, হুঁকোর জলগুলো ফেলে দে!' বলা বাহুল্য, এই অনভিজাত আইনী-ভ্রাতার গৃহ-প্রবেশে হুঁকোর জল অশুদ্ধ হয়ে গেল। সুতরাং রঙ্গালয়ে ধূমপান হল অচল। আমার বন্ধু অল্প দিন পরেই মুন্সেফীতে বাহাল হয়ে এঁদের ধূম্রচর্চার পথ মুক্ত করে দিলেন।

আমরা স্বাধীনতা চাই, স্বরাজ চাই। কে না চায়? যে মুখে বলে না ভয়ে, সে মনে মনে বলে। কিন্তু কোনো জিনিষই ত শুধু চাইলেই পাওয়া যায় না—এক মুষ্টিভিক্ষা ছাড়া। অর্জন করতে হলে চেষ্টার প্রয়োজন, চেষ্টার মূলে আছে শক্তি, বাহুবলই হোক আর আত্মিক প্রভাবই হোক।

এ শক্তি আসবে কোত্থেকে? যে কামানের গোলায় পাহাড় উড়ে যায় তার কলকব্জা তৈরী হয়েছে অনেক টুকরো জুড়ে। জাতীয় শক্তির মূলে তার সমষ্টিগত একতায়, ছোট বড়কে পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। জীবিত দেহে পঞ্জরকে সংঘবদ্ধ করে পেশী। আমাদের সমাজদেহ বহু শতাব্দী ধ'রে প'চে গ'লে পরিণত হয়েছে শতবিচ্ছিন্ন কঙ্কাল স্তূপে। মানুষ স্বয়ং স্রষ্টা, সে আত্মায় অমর। আমাদের জীয়ন-মারণ কাঠি আমাদেরই হাতে। যদি প্রাণের সাড়া আজ জেগে থাকে আমাদের নাড়ীতে, তবে সেটাকে রক্ষা করতে হোলে আমাদের বহির্মুখী দৃষ্টিটাকে ফিরোতে হবে অন্তরের দিকে।

শক্তি সংগ্রহ করতে হলে আমাদের দৌর্বল্য কোথায় সেটা আগে দেখা দরকার। যারা নিজের হাতে খাল কেটে কুমীর এনেছে গাঁয়ে, তারা যদি কেবল খালের দু'পারে দাঁড়িয়ে কুমীরকে গাল পাড়ে, তবে কুমীর শুধু এক একবার তার মাথাটা তোলে আর ল্যাজের বাড়িতে দু'একটা খোরাক সংগ্রহ করে। উদর পূর্ত্তির পর দেখা দেয় পুনশ্চ। যাকে একটা শিকার ধরতে হ'লে তিন ক্রোশ সাঁত্‌রাতে হত, সে ঘাটে ভেসে উঠেই মুখের গ্রাস পায়। এর একমাত্র প্রতিকার

খালের তট ত্যাগ করে দল বেঁধে মাটি কেটে খালে ফেলা। কুমীরের পো পিছু সাঁতার কেটে ধীরে ধীরে গাঙে ফিরবে।

আজ নয়, প্রায় দেড়শ বছর আগে এই বাংলার এক যুবক আমাদের জাতীয় দৌর্বল্যের মূল কোথায়, এই তথ্যটি তাঁর সহজ দৃষ্টিতেই আবিষ্কার করেছিলেন এবং বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন শক্তির কেন্দ্রটিকে বাধামুক্ত করতে। এক টুক্‌রো বরফ রক্ষা করতে হলে ভুঁষি চাই বই কি। কিন্তু বরফ কবে হয়েছে অন্তর্ধান, ভুঁষির বাক্সটা আঁক্‌ড়ে ব'সে থাকলে লাভ কি? পিপাসার সময় জলে একমুঠো ভুঁষি দিলে ত তৃষ্ণার জল শীতল হয় না, হয় অপেয়। একটা এঞ্জিন চালাতে হ'লে চাই আগুন। সে আগুনে নিথর জল হয় বাষ্পীভূত, কলগুলিকে করে সচল। মানুষের জীবনে তার শক্তির মূল অধ্যাত্মকেন্দ্রে। সেখানে যখন প্রবর্তক বাষ্প পুঞ্জীভূত হয়, তখন জীবনের কলকব্জায় জাগে প্রেরণা। রামমোহন তাই হিন্দুকে দেখিয়েছিলেন কোথায় তার অন্তর্গূঢ় শক্তির উৎস। জগৎকে দেখিয়েছিলেন কোথায় সার্বভৌম মিলনের ক্ষেত্র। যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াতে হবে সেই সর্ষেতে যখন ভূত চাপে, তখন কোনো ওঝার সাধ্যি নেই ভূত ছাড়ানো। ভূতগ্রস্ত বাঙালী দেড়শ বছর ধ'রে সর্ষেটাকেই ভূতুড়ে ক'রে তুলেছে।

রামমোহন যে একটা নিতান্ত মেকি ধাপ্পাবাজ অসচ্চরিত্র লোক ছিলেন এটা প্রমাণ করবার জন্যে সত্যনিষ্ঠ গবেষকের অভাব হয়নি আমাদের এই দেশে। এর জন্যে দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই। আমাদের জাতীয় দুর্গতি কোন্ চরম দশায় পৌঁছেচে তার একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া চিকিৎসার পক্ষে অনুকূল।

হিন্দু মুসলমানের অহিনাকুল্যের যে সমস্যা আজ দেশকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে, তার মূলে অনুসন্ধান করতে গেলে কি দেখি? পরের খুঁৎ ধরতে গেলে নিজের দোষ শোধ্‌রায় না। অত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সেটা তাঁরা নিজেরাই করুন। বাংলার মুসলমানেরা সকলেই ইরাণ তুরাণের বংশধর নয়। তাঁরা এলেন—তাঁদের জাতিবর্ণহীন, আচারবাহুল্য বর্জ্জিত, একতায় বলিষ্ঠ উদার ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষা দিল কে? হিন্দু পৌরহিত্যের সঙ্কীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধির খণ্ডতা নির্যাতিতকে মুক্তি দিয়েছে গণ-নারায়নী ধর্ম্মমণ্ডলীর আশ্রয়ে। প্রশ্নটি জটিল, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা কারণকূট নিহিত রয়েছে এই বিষয় সমস্যার ভিতর। তবু একথা সত্য, মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা স্বাভাবিক মৈত্রীবন্ধনের সম্ভাব্যতা সর্বদেশে সর্বকালে উন্মুখ। হিংসা, বিদ্বেষ যেমন সত্য, তার চেয়েও আমাদের সত্য প্রেম।

জড় পরমাণুদের মধ্যেও এই আকর্ষণ বিকর্ষণের নিত্যলীলা। তবু আকর্ষণটা প্রবলতর হয়েছে ব'লেই পৃথিবী আজ বাষ্পপিণ্ড নয়। আমরা হিন্দু মুসলমানরা এই মাটির সন্তান। আমাদের মধ্যে এই সার্বজনীন সহজপ্রীতি উদ্বুদ্ধ হোক, সকল দ্বন্দ্ব সমস্যার সমাধান কর্মকর্তৃবাচ্যেই উপলব্ধ হবে স্বয়ংসিদ্ধ প্রেমসমন্বয়ের গুণে।

আর একটি কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করি। আমাদের দেশে পৌরাণিক কল্পনায় হরগৌরী ও শ্যামরাধার যুগলমূর্তি দেখতে পাই। দর্শনের প্রকৃতিপুরুষ যুগ্মাত্মিক। আজ বিজ্ঞানীর মুখে শুনি, বিশ্বসৃষ্টি বৈদ্যুতিক মিথুন সম্ভূত। জীবজগতে স্ত্রীজাতি সন্তানের জন্মভূমি। একটি প্রাচীন বচন মনে পড়ে—

"পতির্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়া স্তদ্ধিজায়াত্বং পৌরাণাঃ কবয়োবিদুঃ॥"

অর্থাৎ, পতি পত্নীর দেহে অপত্যরূপে জন্মলাভ করেন, তাই প্রাচীন কবিরা নারীকে 'জায়া, বা স্বামীর আত্মার পুনর্জন্মভূমি নামে অভিহিত করেছেন। নারী কেবল সন্তানের জননী নন, স্নেহসেবায় আত্মিক প্রেরণায় তিনি বিশ্বমানবেরই মাতৃসমা। নারীর এই মাতৃশক্তি যে বিশ্ববিজয়িনী, নেপোলিয়ানের এই বিখ্যাত উক্তিতে সে কথা অভিব্যক্ত হয়েছে—"The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world."

শিশুর দোলাটি দোলায় যে পাণি
বিশ্বশাসন সেই হাতে জানি।

বৈদিক গৃহ্যসূত্রে দেখতে পাই, বধূকে প্রত্যক্ষ গৃহদেবতা রূপে বরণ করা হয়েছে। আজ আমাদের গৃহে সমাজে নবযুগের ভাঙনের মড়্‌মড়ানি জেগেছে। ভেঙে গড়বার ভার প্রধানতঃ মেয়েদের রক্ষণশীল মাতৃহস্তে সে কথা আমরা স্ত্রীপুরুষে যেন না ভুলি। তাঁদের দায়িত্ব পালনে আনুকূল্যের ভার পুরুষের হাতে, কত শতাব্দী ধ'রে এ সহজ কথাটি আমরা ভুলেছি। তার প্রতিফল যা, ঘরে বাইরে তা হাড়ে হাড়ে ভোগ করছি। এ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। বাংলার আগামী যুগের নবদম্পতী পরস্পরের হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারেন অকুতোভয়ে—

"উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইত পাবো।
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাবো
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি।"

কংগ্রেসের সত্যমূর্তি

পুলকেশ দে সরকার

আবার সত্যমূর্তি দেখা দিয়েছেন—সার্থকনামা সত্যমূর্তি! কংগ্রেসের প্রকৃত রূপ যখনই কোন কারণে কিছু ঘোলাটে হ'য়েছে বা প্রকৃত আন্দোলনকে বিকৃত পথে চালিয়ে কংগ্রেসের কর্ণধারেরা আবার দিবালোকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চেয়েছেন, তখনই এই মূর্তি দেখা দিয়েছে। সত্যমূর্তি গান্ধী কংগ্রেসের প্রকৃত মূর্তি।

সত্যমূর্তি গান্ধী আন্দোলনের অসামঞ্জস্যও নয়, "বিদ্রোহ"ও নয়। সত্যমূর্তি গান্ধী আন্দোলনের ফরমূলা।

সত্যমূর্তি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন; আবার সত্যাগ্রহ করার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন (কারণ—অসুস্থতা); কিন্তু "সমগ্র রণাঙ্গনে" যুদ্ধ করার প্রস্তাব নিয়ে আন্দোলন করার অনুমতি পেয়েছেন। একাধারে অব্যাহতি ও অনুমতি স্বয়ং গান্ধীজী দিয়েছেন।

বদ্‌লে গেল মতটার একটা কারণ সাধারণ লোককে জানাতেই হয়। সে কারণটা হ'চ্ছে, "বর্তমান পরিস্থিতিতে—"

In view of the present international situation........

যথেষ্ট কারণ। অর্থাৎ অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এর একটা বিহিত করতে গেলে আমাদের চলার রীতিটাকে একটু এদিক ওদিক না করলেই নয়। সে সংশোধিত রীতিটা কি? —না, 'সমগ্র রণাঙ্গনে' সংগ্রাম। অর্থাৎ বিনোবা ভাবে যদি তক্‌লি আর সত্যাগ্রহ নিয়ে (বৃটিশ রাজত্বকে বিব্রত না ক'রে) সংগ্রাম চালায়, তবে সত্যমূর্তির দল পার্লিয়ামেণ্টারী বক্তৃতার ঝড়ে বৃটিশ শক্তিকে অবিব্রত রাখ্‌তে পারবেন। এই হ'ল সমগ্র রণাঙ্গনের দু'টো ফ্রণ্ট।

এটাকে আমরা 'য়্যালায়েন্স' বল্‌তে পারি। আজকাল যুদ্ধে য়্যালাই না হ'লে যুদ্ধ চলে না। এতে গান্ধীজীর অহিংস তক্‌লির সত্যাগ্রহও থাক্‌ল, সত্যমূর্তি দলের গরম বুকনিও থাক্‌ল। অতএব সংগ্রাম হচ্ছে না বলে যাঁরা হৈ-চৈ করেন তাঁদের মাথায়ও চাটি পড়ল, বৃটীশ গভর্ণমেণ্টও অবিব্রত থাক্‌লেন।

তাহলে এবার গান্ধী ফরমূলাটা কষা যাক্। আমরা উদ্ কায়দায় পেছোব।

বর্তমানের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি হচ্ছে: রুশ-জার্মাণ যুদ্ধ। পূর্ব রণাঙ্গনে সংগ্রাম এবং অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট। হ্যালিফ্যাক্স জার্মাণী ও বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন বৃটেনের এমন জাহাজ বা অস্ত্রশস্ত্র নেই যাতে ক'রে পশ্চিম রণাঙ্গন সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। আরও অনেক বিশেষজ্ঞেরা বিজ্ঞের মত হিট্‌লারকে আড়াল না দিয়েই বলেছেন, আমরা কি বাপু আবার একটা ডানকার্ক করব? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য জাহাজ সশস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা করছেন। জাপান সকল

দিক সামলাতে না পেরে কেবলই মন্ত্রিসভা ভাঙছে। অষ্ট্রেলিয়ায় শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট হয়েছে। বৃটীশ ও মার্কিন গভর্ণমেণ্ট রুশিয়াকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি জানিয়েছেন আজ প্রায় চারমাস; মস্কো থেকে রুশ-গভর্ণমেণ্ট স্থানান্তরিত হ'য়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

বর্তমানে ভারতের পরিস্থিতি হচ্ছে: আগে-নলিনী সরকার প্রমুখ একদল বড়লাটের ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন; মুস্‌লিম লীগের গণ্ডীর মধ্যে হক-জিন্নার মনকষাকষি চলেছে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনেকেই অসুস্থতার কারণ ও মেয়াদের সমাপ্তিতে মুক্তি পেয়েছেন। গান্ধীজী নিয়মিত চরকা কাট্‌ছেন। ভারতের সম্পর্কে মিঃ আমেরি ইংরেজ শাসনের একটানা রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছেন। দিন্‌কে দিন জিন্নাজী জিন্দাবাদ হচ্ছেন।

এর মধ্যে আরও একটা কাণ্ড হয়েছে রুজভেল্ট ও চার্চিল আট্‌লান্টিকে একটা ফতোয়া দিয়েছেন; তার ব্যাখ্যায় ভারতবর্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বিশ্বসংগ্রামটা হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতা ও গণতন্ত্রের জন্য—কালা আদ্‌মি ফারাক যাও।

সেই সভ্যতা ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে নাৎসী-জার্মাণী পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স পদানত করেছে, বৃটেনে বিস্তর বোমা ফেলেছে, বল্কানকে ঠাণ্ডা করেছে, তারপর—ইতালী, রুমানিয়া, হাঙ্গারী, ফিন্‌ল্যাণ্ড এবং স্পেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স সহযোগে ও অন্যান্য জাতির নিষ্ক্রিয় সহযোগিতায় এবং কারও কারও নিষ্ক্রিয় অসহযোগিতার ভরসায় জার্মাণী একক রুশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারতে যুদ্ধ বিরোধীর ক্ষীণ ধ্বনি তুলে দুই একজন নির্বাচিত সত্যাগ্রহী জেলে যাচ্ছে; কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মন্ত্রীমণ্ডলী ছেড়ে জেলে গেছেন। কিন্তু যেখানে কংগ্রেসের অপ্রাধান্য সেখানে কিছুদিন ব্যতিক্রম করা হ'ল, অবশ্য নিরুপায় হ'য়ে যখন কোয়ালিশন টিক্‌ল না, তখন সত্যাগ্রহের অনুমতি এসেছে।

তখনও মিঃ আমেরি প্রাচীন রেকর্ডখানা বাজিয়েছেন।

যুদ্ধের সুরুতে অথবা যুদ্ধ ঘোষণার পর কংগ্রেসকে কেন জিগ্‌গেস ক'রে যুদ্ধ ঘোষণা হয়নি এবং পরামর্শের জন্য তাদের কেন ডাকা হয় না এই অজুহাতে 'ভারতরক্ষা আইনের' ব্যূহ ভেদ ক'রে কংগ্রেস নেতারা মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলেন ও জেলে গেলেন। কিন্তু কৃপালনী ও রাজেন্দ্র প্রসাদ কংগ্রেসের দপ্তর আগ্‌লে বাইরে থাক্‌লেন ও যথাযথ বিবৃতি দিতে লাগ্‌লেন।

যুদ্ধের সুরুতে আর আজকের পরিস্থিতিতে এইমাত্র তফাৎ যে, আজকে ডিফেন্স কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। মুসলিম লীগ সদস্যরা কেউ কেউ কাউন্সিলে যোগ না দিয়ে জিন্নাজী ও মুস্‌লিম লীগের মর্যাদা বাড়িয়েছেন।

মাঝে আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল। স্যার তেজ-বাহাদুরের নেতৃত্বে একটা সর্বদল সম্মেলন বসেছিল। জিন্নাজী অভিযোগ করেন, ওটা কংগ্রেসের প্রেরণায় ও ইচ্ছানুসারে হয়েছে; উদারনীতিকদের বক্তব্য আসলে কংগ্রেসেরই বক্তব্য।

এ দুর্ণামের যৌক্তিকতা—শূন্য অকার!

তাহ'লেই এখন ভাব্‌বার বিষয় হচ্ছে, মন্ত্রিত্ব ত্যাগ কর্‌বার পরবর্তীকালে বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন কি হয়েছে যাতে আবার সেই পুরোনো রণাঙ্গনে ফিরে যেতে হবে?

মিঃ আমেরি 'ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট' চাইছেন; স্যার সাপ্রু সর্বদল সম্মেলন করেছেন; স্যার সেকেন্দারও প্রতিধ্বনি কর্‌ছেন। মিঃ জিন্নাই শুধু এই সম্মেলন চান না, তাই লীগও চায় না। কংগ্রেসের খুব যে আপত্তি আছে তা নয়। কিন্তু কংগ্রেসের তরফ থেকে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যদি এই প্রচেষ্টাই বর্তমান পরিস্থিতির দাবী হয়ে থাকে এবং সত্যমূর্তি তারই পথাবিষ্কারে বেরিয়ে থাকেন, তবে মিঃ আমেরি জিন্দাবাদ এবং তারও মূলে মিঃ জিন্না জিন্দাবাদ!

কিন্তু এখনও একথা জান্‌বার উপায় নেই; সত্যমূর্তি সেকথা খুলে বলেন নি; সমগ্র রণাঙ্গনে যুদ্ধ কর্‌তে চাইছেন মাত্র। অতএব এদিক দিয়ে সত্যমূর্তির ওপর আলোকপাত করা যাবে না।

এবার ফরমূলার থার্ড ব্র্যাকেটটা তুল্‌তে হবে।

সত্যমূর্তি বরাবর আইনানুগ রণাঙ্গন সৃষ্টির কথা তুলেছেন এবং বরাবরই সে ফ্রন্টটা আইন সভা। কেননা আইনই গান্ধী আন্দোলনের মূল কথা। আইনকে মেনেই আইন অমান্য, তারই আন্দোলন। গান্ধীজীর সমগ্র আন্দোলনটাই আইনানুগ। অহিংস থেকে অসহযোগ, তকলি থেকে যুদ্ধ বিরোধী সবই ঐ এক পর্যায়ের।

১৯২১ এর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অনেকের মনে ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছিল। কারণও ছিল। প্রথমতঃ যদি শতকরা একশ জন অসহযোগী হয় তবে ছয় মাসে স্বরাজ। দ্বিতীয়তঃ নিরস্ত্র ভারত অহিংস অস্ত্রের কথা শুনে অবাক্ হ'য়ে গেল; সহিংসবাদীরা পর্যন্ত ভাঙা পিস্তল ফেলে দিল। তৃতীয়তঃ, বিলাতী বস্ত্র বর্জনের পাশাপাশি স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রী বাড়্‌ল, তাতে স্বদেশী ব্যবসায়ীদের সায় ও সহানুভূতি পাওয়া গেল।

কিন্তু বন্যার মত ছড়িয়ে পড়ার বিপদ ক্রমশঃ পিনাল কোডকে ডিঙিয়ে যেতে চাইল। অর্থাৎ, যারা আইন অমান্যের আইনানুগ প্যাঁচটা বোঝেনি, সেই চা-বাগানের কুলি, জমিচষা চাষী, কারখানার মজুর—তাদের মধ্যে যখন এই প্রবৃত্তিটা অনাড়ম্বর ও আদিম আকারে দেখা দিল, তখনই গান্ধীজী রাশ টান্‌লেন।

অসহযোগ আন্দোলনের মর্মকথাটা এই: যার সঙ্গে অসহযোগ তার আইন মেনে ধরা দিতে হবে; তার কারা-আইন মেনে চল্‌তে হবে। অর্থাৎ শাসন কর্তৃপক্ষের আইন বজায় রাখতে প্রতিপদে সাহায্য কর্‌তে হবে।

তর্ক উঠ্‌তে পারে আইন সভার 'অসহযোগিতার' কৌশলটা গান্ধীজী তো প্রথমে বরদাস্ত করেন নি, দাশ সাহেবের সঙ্গে সেজন্য তার বেশ সংঘর্ষই হ'য়ে গেছে; রাজাজী প্রমুখ আজকের Pro-changer রা তখন ছিলেন No-changer.

তার জবাব এই হবে যে গান্ধীবাদেরও একটি পুষ্টির ইতিহাস আছে এবং গান্ধীবাদ আইনানুগ ব'লেই তার মধ্যে দাশ সাহেবের আইন সভা অধিকারের কথা উঠেছে এবং যে আইন গান্ধীবাদের ভিত্তি সেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইন সভার। আইন সভার, আইন প্রণয়নের প্রকৃত ক্ষমতা থাক্‌লে সে আইন প্রণয়নে হাত বাড়ানো যাবে; যদি না থাকে, তবে তাও দেশবাসীর সম্মুখে নগ্ন করে দেখানো যাবে। সাধারণের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে মোহ কাটিয়ে দেয়া যাবে। তারপর?—তারপর, দাশ সাহেব জবাব দেন নি।

দাশ সাহেব আইনানুগ গান্ধী আন্দোলনের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। গণ-আন্দোলন যেখানে অহিংস হতে চায় এবং গভর্ণমেণ্টের বদলে আন্দোলনের নেতারাই যেখানে তার কণ্ঠ টিপে ধরেন, সেখানকার গণ্ডী ঠিক রাখ্‌তে হ'লে অর্থাৎ, আইনের কাঠামোটা বজায় রেখে দেশবাসীর মনে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ চাগিয়ে তুল্‌তে আইনের লড়াইই একমাত্র পথ। গান্ধীজী নিজে তাঁর আন্দোলনের এদিকটা সম্বন্ধে অচেতন ছিলেন; দাশ সাহেব চক্ষুদান কর্‌লেন।

কিন্তু গান্ধীজী জানেন, আইন প্রণয়নক্ষেত্রে পরাধীন ভারতবাসীর মোহ কাট্‌তে বেশী দেরী হবে না। আইন সভার গঠনতন্ত্র জানা আছে, বড়লাটের সার্টিফিকেট আছে।

আর একটা কথা ব্র্যাকেটে বল্‌তে চাই। দাশ সাহেবের সময় মিঃ আমেরির কীলকটা বার্কেনহেড অত সহজে ভারতের রাজনীতিতে তখনও প্রবেশ করাতে পারেনি; মিঃ জিন্না বা আম্বেদকর তখন ভাল করে কথা বল্‌তে শেখেন নি। তাই আইন সভার নগ্নরূপটা বেশ প্রকট হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তারপর?

স্পর্দ্ধিত জনগণ কল কোলাহলে এ প্রশ্ন কর্‌ল।

গান্ধীজী আবার আইন অমান্যের হুম্‌কি ছাড়্‌লেন। সেই আইনানুগ আইন অমান্য। জানিয়ে শুনিয়ে প্রকাশ্যে গান্ধী নির্দিষ্ট আইন অমান্য কর্‌তে হবে, পুলিশ ধরলে ধরা দিতে হবে, বিচারক দণ্ড দিলে মেনে নিতে হবে, দণ্ড হ'লে জেলে যেতে হবে; জেলের আইন কানুন মেনে চল্‌তে হবে। গান্ধীজী যে আইনটি অমান্য কর্‌তে নিষেধ করবেন সেটি মেনে চলতে হবে, যেমন, চৌকিদারী ট্যাক্স ও অস্ত্র আইন। অপরদিকে জমিদারী স্বত্ব আর কারখানা মালিকের মালিকানায় স্পর্দ্ধিত প্রশ্ন তোলা চল্‌বে না।

কিন্তু গান্ধীজী এবার নিজেই সহযোগিতার হাত বাড়ালেন, সপ্রু-জয়াকর প্রসাদাৎ নূতন শাসনতন্ত্র (মানে, আইন) রচনার জন্য বিলেত যাওয়া স্থির হয়ে গেল। বিলাতী কূটনীতিকেরা

মাইনরিটির অ্যাপ্ল্ অব্ ডিসকর্ডটা ভীড়ে ফেলে দিলেন ; গান্ধীজী ব্যর্থতার অভিমানে যখন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এদেশে কৃষক আন্দোলনকে ফোর্‌ষ্টল করতে "পুনঃ" আইন অমান্য সুরু করলেন, তখন ম্যাকডোনাল্ড বানালেন এক উপাদেয় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা।

গান্ধীজী হরিজনের জন্য জীবন দেবেন বলে জেল থেকে মুক্তি আদায় করলেন। নির্বাচন কালে সত্যমূর্তির দল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে মেনেই এবং গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিয়েই নির্বাচনে নাম্‌লেন। সাইমন কমিশন বয়কট হয়েছিল ; ১ম রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বয়কট হয়েছিল ; তৃতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বয়কট হয়েছিল। কিন্তু যে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করব না বলে নেতারা অভিমানে ফোঁপাচ্ছিলেন সেই শাসনতন্ত্রের শাসন মেনেই ভোট যুদ্ধ খেল্‌লেন। অনেকগুলো প্রদেশেই ভোট যুদ্ধে জয় হ'ল এবং সংখ্যাধিক্যের নেশা তাঁদের এমনই পেয়ে বস্‌ল যে অফিস গ্রহণ করা হবে কি না সে প্রশ্নও মাথা চাড়া দিল। গান্ধীজী বল্‌লেন, বেশ, বড়লাট বলুন, তিনি বে-আইনী রকম যথাতথা তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। বড়লাট বল্‌লেন, সে এমন বেশী কি কথা, বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ ক্ষেত্রেই তো ব্যবহার হয় ও তাই-ই হবে।

ব্যস নেতারা জয়োল্লাসে খুসী। দেশে কংগ্রেসী রাজত্ব চল্‌ল, গুলিগোলা আগেও যেমন চল্‌ত, অহিংস কংগ্রেসীরাজত্বেও তা' চল্‌ল, গান্ধীজী তা' সমর্থন করলেন। সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসুরা হরিজনের ফাইল দেখ্‌তে পারেন। কংগ্রেসীরা বেশ চুটিয়ে রাজত্ব চালালেন। শাসনদণ্ড হাতে পেয়ে কংগ্রেসের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আর দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বামপন্থীদের ছিন্নভিন্ন করলেন।

এল যুদ্ধ। এল ভারতরক্ষা আইন। বামপন্থীদের কংগ্রেসীরাই নিকেশ ক'রে এনেছিলেন, সরকার আরও এককাঠি ওপরে গেলেন।

কংগ্রেস পুনা-দিল্লী, দিল্লী-পুনা ক'রে জানিয়ে দিল, সহিংস-অহিংস কথাটা বাজে ; কথাটা হ'চ্ছে, যুদ্ধে আমরা আপত্তি করতাম না, সাহায্যই করতাম ; তোমরা কেন, একবার আমাদের ব্যাপারটা জানালে না ; কেন, আপন করে ডেকে নিলে না ? নিলে না যখন তখন দিলাম মন্ত্রিত্ব ছেড়ে। আমরা এমন যুদ্ধের বিরোধী।

গান্ধীজী বল্‌লেন, বিরোধী, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য মিত্ররাজকে বিব্রত না করা। আহা, তারা মরণপন যুদ্ধে লিপ্ত, ছি, এই কি বোঝা পড়ার সময় ? ওরা আবার মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়াক তখন আবার আমাদের মেরুদণ্ডের পরখ হবে।

চল্‌ল, গান্ধীজী নির্দিষ্ট 'ব্যক্তিগত' (কথাটা ব্যষ্টিক হওয়া উচিত) সত্যাগ্রহ। প্রধান মন্ত্রীরা লম্বা লম্বা বক্তৃতাসহ প্রস্তাব পাশ ক'রে জেলে গেলেন।

তাঁরা অনেকেই আজ জেলের বাইরে।

ফরমুলাটার সমাধান হ'চ্ছে এই :

(১) অসহযোগ—জেল—আইন সভা—
(১৯২১) (১৯২৩)
(দাশ সাহেবের সৌজন্যে)

(২) আইন অমান্য—(অসহযোগ)—জেল—রাউণ্ড টেবিল
(১৯৩০) (১৯৩১)
(গান্ধীজীর সৌজন্যে)

(৩) আইন অমান্য (২)—জেল—হরিজন (১৯৩৩)
(১৯৩২) (গান্ধীজীর সৌজন্যে)
নির্বাচন, মন্ত্রিত্ব (১৯৩৭)

(৪) মন্ত্রিত্বত্যাগ
ব্যষ্টিক সত্যাগ্রহ } —জেল—সত্যমূর্তি
(১৯৩৯)

=ভিসাস সার্কেল—অসহযোগ—জেল—আইন সভা
=অসহযোগ—সহযোগ—অসহযোগ—সহযোগ……

শোনা যাচ্ছে, সত্যমূর্তি ব্যর্থ হবেন। আসফ আলির দৌড়ো-দৌড়ি, রাজাজীর ওয়ার্দ্ধা গমন, জয়াকরের বিবৃতি, সেকেন্দারের ইউনাইটেড ফ্রন্ট, আল্লা বক্সের মহান্ চেষ্টা ব্যর্থ হবে; কেননা সত্যমূর্তি রিক্রুট পাচ্ছেন না। কিন্তু সত্যমূর্তি যদি ব্যর্থ হন, গান্ধী আন্দোলন গান্ধীবাদই ব্যর্থ হবে। সত্যমূর্তি গান্ধী কংগ্রেসের অমর প্রতিমূর্তি।

—"এক কথায় ভারত ও বৃটেনের মধ্যে বিবাদের সূত্রটা কি ? সেটা হোল—আমরা যেমন স্বাধীনতা চাই, ভারতবর্ষও ঠিক সেই রকম স্বাধীনতা চায়; চার্চিল যে স্বাধীনতা চায়—আত্মনিয়ন্ত্রনের স্বাধীনতা, আপন রুচি অনুযায়ী জীবনযাত্রার স্বাধীনতা—যে জীবনযাত্রার রীতিনীতি ব্রিটিশ পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী—সুহৃদ, মিত্র ও শত্রু বেছে নেবার স্বাধীনতা। আমরা যাদের জেলে পুরছি তারা পঞ্চম বাহিনীও নয় কিম্বা আমাদের শত্রুও নয়—তাদের দাবী হোল আমাদের বর্ণিত যুদ্ধের উদ্দেশ্যের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতাও স্থানলাভ করুক।"

—লাওনেল ফিল্ডেন
'নিউষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন'

বাংলা প্রথম পাঠের ভূমিকা

জীবনময় রায়

ইউরোপ ও আমেরিকায় শিশুর অক্ষর পরিচয় ও অনুলিখন পদ্ধতিকে শিশুর পক্ষে সহজ ও মনোজ্ঞ ক'রে তোলবার জন্যে যে পরিমাণ চেষ্টা, অনুসন্ধান ও অনুশীলন হয়েছে তা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিপরায়ণ জাতির পক্ষেই সম্ভব। বাংলা ভাষার অক্ষর পরিচয় ও অনুলিখনকে আনন্দদায়ক ও বাঙালী শিশুর মনকে জ্ঞানের পথে আগ্রহান্বিত ক'রে তোলবার জন্যে সে রকম বৈজ্ঞানিক চেষ্টার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

শিশুপাঠ্য প্রণয়নের অধিকাংশ চেষ্টাই শিশুদের স্বাস্থ্য, জ্ঞান, আনন্দ বা এক কথায় শিশুদের তথা দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের মূল্যে কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন বই আর কিছুই নয়। আসল কথা বাঙালীর মজ্জাগত ধর্ম হচ্ছে "আপাত মধুর পাপ" সাধন করা — অর্থাৎ আমার স্বার্থটুকু আপাতত সিদ্ধ হলেই হল। "পরিণামে পরিতাপটা" প্রত্যক্ষভাবে আমার ভাগে না পড়্‌লেই চুকে যায়। সেই পরিণামটাকে হিসেবের মধ্যে আন্‌তে হ'লে আপাতত যে স্বার্থত্যাগটুকুর প্রয়োজন তা' করতে বা 'দূর ভবিষ্যতে কার লাভ হবে' এই আশায় বর্তমানের আরামের বা সুবিধারূপ মূলধনটুকু খোয়াতে আমরা প্রস্তুত নই। আর যে-ব্যক্তি নিজের ঘরের জন্যে কিছুই ছাড়তে বা কষ্ট করতে প্রস্তুত নয় সে যে গোষ্ঠীর বা দেশের বা মানবজাতির মুখ চেয়ে "আপাত মধুর" এর কণামাত্র ও ছাড়তে চাইবে না এত জানা কথা। অলমতি বিস্তারেণ। এখন কাযের কথায় ফেরা যাক।

কিছুদিন থেকে ইণ্ডিয়ান সট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউট বাংলা ভাষা শিক্ষা পদ্ধতির অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ ক'রেছেন। আর আমার মনে হয় যে "আবোল তাবোল" বা ব্যক্তিগত খাম-খেয়ালী চেষ্টা না করে সুনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানাশ্রিত পন্থায় অনুসন্ধান ও পথনির্দেশের চেষ্টা করলে ফলও অনেক বেশী সুনিশ্চিত, নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হবে।

এই অনুসন্ধানের ফলে একটা কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে যে বহুপ্রচারিত প্রথম পাঠগুলির মধ্যে দু'একখানি ছাড়া আর কোনোটিতেই সামান্য মাত্রও চিন্তা বা শিশুমনস্তত্ত্বের পরিচয় নেই। তা ছাড়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে পাঠ্যমান বা স্ট্যানডার্ডাইজেশনের একান্ত অভাব। আমাদের দেশে এই স্ট্যানডার্ডাইজেশনের অভাবে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে আমাদের সুনিশ্চিত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি পদে পদে দ্বিধাগ্রস্ত হয় এও জানা কথা। শিশুকে এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে নিয়ে ভর্তি করলে যে একই স্ট্যান্ডার্ডের বা ওজনের পাঠ্য সে পড়তে পাবে তার নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং, বাংলা ভাষার পাঠ্যগুলি যাতে শ্রেণী অনুপাতে একই ওজনের হয়

তার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তা ছাড়া বাংলা ভাষার প্রথম পাঠগুলি যাতে সহজ, মনোজ্ঞ ও বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত হয় তার দিকে দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য। শিশুমনের পরিচয় যাঁদের কাছে অজ্ঞাত নয়, প্রথম পাঠ সংক্ষিপ্ত করার কারণ তাদের ব'লে দিতে হবে না। আর আমাদের মতে প্রত্যেক প্রথম পাঠ প্রণেতারই শিশুমন-অনুশীলন-অভিজ্ঞ না হওয়াটা অমার্জনীয় অপরাধ।

প্রচলিত প্রথম পাঠগুলি বিশ্লেষণ ক'রে যে বিপুল এবং দুরূহ শব্দসম্ভার এই অচিরোদ্গতদন্ত নিরপরাধ শিশুকুলের জন্যে নির্বাচিত পাঠ্যরূপে পাওয়া গেছে—তা একত্র দেখ্‌লে চম্‌কে উঠ্‌তে হয়। অপগত, লালসা, অনৈতিহাসিক, বিশূচিকা প্রভৃতি শব্দ কেবলমাত্র যুক্তাক্ষর বর্জিত বলেই নির্বিচারে নির্বাচিত হ'য়েছে। এই সব কঠিন শব্দের পৌনঃপৌনিক ব্যবহার থেকে এইটুকু বেশ বোঝা যায় যে বাংলা প্রথম পাঠ প্রণয়ণের সময় শিশুদের পরিপাক শক্তি সম্বন্ধে আমরা শুধু উদাসীন নই—নির্মম। এমনতর অভ্যার্থনা দেউড়ীর দরজাতেই পেলে যে, শিশুদের বিদ্যালাভের আগ্রহের "পিলে-চম্‌কে" যাবে তার আর বিচিত্র কি!

অধিকাংশ প্রথমপাঠ প্রণেতার উক্তরূপ অপচেষ্টা সত্ত্বেও যে বাঙালী শিশুর জ্ঞানার্জন স্পৃহাকে একেবারে গলা টিপে মারতে পারেনি তার কারণ শিশুদের টিকে থাকবার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। জানার গৌরবও তার অপরিমেয় আনন্দ, মানবশিশুর জীবনী শক্তিরই সমপর্যায়ের। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফল যে শোচনীয় হ'য়েছে তাও নিঃসন্দেহ।

বাংলার শিশুসম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন এই দুই বিভিন্ন যুগে যেমন প্রহার ও প্রশ্রয়ের ব্যবস্থা নির্বিচারে করা হ'য়েছে প্রথমপাঠ প্রণেতারাও ঐ দুই বিভিন্ন যুগে সে ব্যবস্থা যে অক্ষুন্ন রেখেছেন তার প্রমাণ হাতেই রয়েছে। আর এই দুই ব্যবস্থাই একই মনোভাব প্রসূত; অর্থাৎ শিশুচর্যায় আমাদের মনোযোগ ও চিন্তার ক্লেশস্বীকার করবার আলস্য। এইজন্যে প্রথমপাঠ প্রণয়ণে আমরা নির্বিচারে হয় একদিকে দুর্লঙ্ঘ্য শব্দপুঞ্জে কণ্টকিত ক'রে শিশুদের চলার পথ দুরূহ ক'রে তুলি; আর না-হয়ত বিদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের আনুকূল্যে যে পাঠ্যপ্রণয়ন-পদ্ধতি গ'ড়ে উঠেছে তার স্বরূপ পরিপাক করতে না পেরে তারই অন্ধ অনুকরণে লেগে যাই। আর মাত্রাজ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছবি আর ছড়ার জগাখিচুড়ীর অতি-পরিবেষণে শিশুকুলকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিয়ে নিজেদের এই শিশুসার-রচনায় নিজেরা এত মুগ্ধ হ'য়ে থাকি যে এর হাস্যকর রূপটা আমাদের চোখে পড়ে না—যেমন পড়ে না, পাশ্চাত্য-সুরাফেন-বিলাসী সিনেমা-শিক্ষিত অতিআধুনিকতাগ্রস্ত যুবকদের, নিজেদের অভিনয়ের হাস্যকর রূপটা তাদের নিজেদের চোখে।

ঐ রকম ছবি ও ছড়ায় প্লাবিত প্রথমপাঠ আগাগোড়া কণ্ঠস্থ ক'রে একটা অক্ষরও চিনতে পারে না এমন শিশু আমরা অনেক পেয়েছি। একটা কথা মনে রাখলে সব গোল মিটে যেতো; সেটা এই যে, শিশুরাও মানুষ, আর আমাদের চেয়েও অনেক তাজা মানুষ। তাদের

জ্ঞানার্জনের স্পৃহা স্বাভাবিক। কোনো মতে ফাঁকি দিয়ে তাকে লেখাপড়া গিলিয়ে দেব, সে জানতে পারবে না এই রকম একটা মনোভাবের আড়ালে থাকে একটা পূর্বজাত ধারণা যে, লেখাপড়া জোর-শিশুর পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার—প্রায় ওষুধ গেলার মত। এর মত ভুল ধারণা খুব কমই আছে। 'জ্ঞানলাভ' বা 'শেখা'র আগ্রহ মানুষের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি সুতরাং শিখতে পারাটা আনন্দজনক। অতএব কিছু শেখাতে গেলে শিশুকে 'ভুলিয়ে-ভালিয়ে' গিলিয়ে দেবার চেষ্টা; এক নম্বর—অজ্ঞতা প্রসূত; দুই নম্বর—আলস্য অর্থাৎ "পশ্চিমের নকলনবিশী করলেই যদি একটা অভিভাবক-ভোলানো জিনিস খাড়া করা যায় তবে আর দরকার কি"—এই মনোভাবের ফল।

শিশু নিজে শিখছে, জানছে, বড় হচ্ছে, বাঁচছে এই পরমবিস্ময় ও আনন্দেই সে শিখতে চায়। সুতরাং অতিরিক্ত ছড়া ও ছবির বিপর্যয়ে তাকে বিভ্রান্ত করে তুললে সুফল লাভের সম্ভাবনা নেই। তাই বলে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে ছন্দ ও ছবির বিরুদ্ধে আমরা মত প্রচার করতে বসেছি। ছবি ও ছন্দ শিশুর মনে জ্ঞানার্জনের রসায়নস্বরূপ—অর্থাৎ তার স্নায়ুর অবসাদ দূর করে এবং তার শিক্ষাব্যাপারকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, যা অবসাদ দূর করে তারই মাত্রাধিক্যে বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়।

আর একটি কথা মনে রেখে শিশুর শিক্ষার পথে অগ্রসর হ'তে হবে। শিশুচিত্ত প্রস্ফুরণোন্মুখ সুতরাং গতিশীল। একই বস্তুতে তাকে অধিকক্ষণ বা অধিক দিন নিবদ্ধ রাখলে ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা। নূতন নূতন বিষয়ে তার চিত্ত নব নব রসের ও বিস্ময়ের টানে ছুটে চলে। পরিণত হিসাবী মন একই বিষয়ের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট রেখে তার ফলপ্রাপ্তির অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করতে অভ্যাস করে। কিন্তু শিশু প্রকৃতির এই বিশেষ গুণের জন্যে সে কোনো একটা বিষয়কে সম্পূর্ণ আয়ত্ত না-ক'রেও বিষয়ান্তরে উপনীত হয় আর ক্রমে ক্রমে তার পথ চলার অভিজ্ঞতার বাঁকে বাঁকে তার মনের আবছায়াগুলি ক্রমে বাস্তব জ্ঞানে পরিণত হয়।

ভাষা শেখবার সময়েও দেখতে পাওয়া যায় যে শিশু একটি কথাকে নিতান্ত অসম্পূর্ণভাবে শেখে ও ব্যবহার করে; কিন্তু বার বার শুনতে শুনতে এক একটি কথার পূর্ণ অবয়বটিকে সে কখন এক সময় যে আয়ত্ত করে ফেলে! কিন্তু বারবার ভুল করে ব'লে তার ভাষা শেখার কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় না। কিন্তু তাকে বই পড়ানো আরম্ভ করার সময় এ কথাটি আমরা মনে রাখি না। আর তাকে এক একটি অক্ষর বা কথা বা পাঠের গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে—শিখিয়ে মুখস্থ করিয়ে, সড়গড় ক'রে দিয়ে তবে রেহাই দি। আর ফলে তার বিদ্যালাভের স্পৃহার ক্ষতি সাধিত হয়। শিশুর প্রত্যেকটি পরিচয়ের সাধনকাল যতটা সংক্ষেপ করা যায় ততই মঙ্গল। যেমন ধরা যাক যে "প" অক্ষরটির সঙ্গে তাকে পরিচিত করতে হবে। অন্য একটি পদই তার পক্ষে যথেষ্ট, যথা—পবন পান পায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে যেমন একটি নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয় হলেই তখনই তার সঙ্গে

শিশুর পরিচয় পাকা হ'য়ে যায় না—পরন্তু নানাস্থানে নানাভাবে পরে পরে তার পরিচয় পেতে পেতে তার সঙ্গে পরিচয় ক্রমে পাকা হয়। তেমনি ঐ "গ" অক্ষরটি পরপর আরো নানা পাঠের মধ্যে পেতে পেতে "গ"-এর পরিচয় পাকা হ'য়ে উঠবে। তা'রই "গ" অক্ষরটি শেখাবার মুহূর্ত থেকে তার গলা টিপে গিলিয়ে দেবার চেষ্টা গণ্ডমূর্খতা না হ'লেও অপোগণ্ড-মূর্খতা তাতে আর সন্দেহ নেই। অতএব একদিকে যেমন খুব অল্প পরিসরের মধ্যে প্রথমপাঠকে সংহত করা দরকার তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্রমপাঠ্য পদগুলির মধ্যে স্বল্প-পরিচিত অক্ষরগুলি যাতে বারবার যথেষ্ট পরিমাণে আপন আপন পরিচয় দান করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পরম্পরায় পাঠ্যপদগুলি রচনা করতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রথমপাঠকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করার আর একটি উপায় আছে। জটিল (যথা ক্ষ, ঋ) অনাবশ্যক (যথা ঌ, ঞ, ঢ়) এবং সম-উচ্চারণের (যথা ই, ঈ ; উ, ঊ ; শ, ষ, স ; ণ, ন) এক একটি অক্ষর ছাড়া অন্য অক্ষরগুলিকে প্রথমপাঠে আনার দরকার নেই। তা'ছাড়া এমন অনেক অক্ষর আছে যে গুলোর ব্যবহার শিশুদের জানা শব্দের মধ্যে নেই (যথা—ঔ, ঋ, ঞ, ঌ, ৎ ইত্যাদি) আর অপরিচিত শব্দের অক্ষর তাদের মনযোগ ও কৌতুহল আকর্ষণ করে না। এই সময়টা মস্তিষ্ক, চোখ, কান, হাতের সঙ্গে বই ও অক্ষরের সহযোগবিধানের (Co-ordination) কাল। এই অভ্যাসটুকু হ'য়ে গেলেই নূতন নূতন অক্ষর ক্রমে আয়ত্ব করা শিশুর পক্ষে আর কঠিন হয় না। আর কো-অর্ডিনেশনের এই কালটুকুতে শিশুর পাঠচর্চা যত সহজ ক'রে দেওয়া যায় ততই "পারার" বা সফলতার আনন্দে সে যে সগৌরবে এগিয়ে চলতে চাইবে এ ত' জানা কথা।

এই গেল পড়ার কথা। কিন্তু পড়া আর লেখা এক সঙ্গে সুরু করলেই ফল শেষ পর্যন্ত সব চেয়ে বেশী পাওয়া যায়। কারণ অক্ষরের প্রতিরূপ লেখার চেষ্টাতেই স্মৃতিশক্তিকে সাহায্য করে বেশী ; তা' ছাড়া ওটা শিশুর সৃজন করবার বৃত্তিকে চরিতার্থ করবার আদি পর্যায়। আর সেই জন্যে শিশুদের পক্ষে স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে যে যে অক্ষর পর পর শেখা সহজ সেইগুলি পর পর প্রথম পাঠে আসা উচিত। অল্প একটু আলোচনা করলেই এ কথা সহজে বোঝা যাবে।

মানুষের স্নায়ু ও পেশীর বিশেষ অবস্থানের জন্যে মানুষের হাতের রেখাঙ্কন প্রবণতা তথা সহজগতি-প্রবণতা হ'চ্ছে বাইরে থেকে কোলের দিকে, ডাইনে থেকে বাঁয়ে, সরলরেখার চেয়ে বৃত্তাংশ অঙ্কনে। এই জন্যে উর্দু বা ইংরাজি হরফ মানুষের পক্ষে আয়ত্ব করা সহজ। ইংরাজি হাতের লেখার অক্ষর বৃত্তপরায়ণ ও দ্রুতগামী ; কিন্তু আমাদের বাংলা অক্ষরগুলি লেখার সময় দিকবিদিকে থমকে থমকে কসরৎ করে করে চলতে হয়। সুতরাং তারা গতির চেয়ে স্থিতিশীল বেশী এবং অক্ষরের টানগুলি বহুকোণসম্পন্ন সুতরাং সহজে গড়িয়ে চলে না। এ ছাড়াও বাংলার আবার কতকগুলি অক্ষর ও বহুভুজ ও ভুজঙ্গের জটাজটিল নৃত্যবিশেষ—যুক্তাক্ষরের ত তুলনাই নেই—এক বোধ হয় তিনে অক্ষর ছাড়া। এমন অবস্থায় আমাদের শিশুকালে লেখার প্রথম দিনেই যখন

(ঈ) লিখতে দেওয়া হ'ত তখনকার কথা স্মরণে আনতে চেষ্টা করলে বয়স্কদের আর আমার কথা বুঝতে একটুও কষ্ট পেতে হবে না। এই জন্যেই সহজ বৃত্তাংশের রেখাযুক্ত অক্ষরকেই প্রথম অক্ষর হিসাবে নির্বাচন করা দরকার; আর সে হরফটি আর কিছুই না—সেটি হ'ল (ত)। সুতরাং বাংলা প্রথম ভাগের প্রথম অক্ষর হওয়া উচিৎ (ত)। কিন্তু শিশুর আঙ্গুলের স্বাভাবিক রেখাঙ্কন প্রবণতা যেদিকেই হোক বাংলা হরফ তার সব নিয়মগুলিকে ভেংচি কেটে নিজ মূর্তি ধারণ ক'রে আছে। অর্থাৎ বাংলা কোনো অক্ষরই, এক (ও) ছাড়া, প্রায় কেবল বৃত্তাংশ দিয়ে লেখা যায় না আর অনেক অক্ষরই পরস্পর বিপরীতগামী রেখার প্রলাপ।

এইখানে একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ইংরাজি অক্ষরের টান হচ্ছে (এ্যান্টি-ক্লকওয়াইস্) বামাবর্ত এবং লেখার স্রোত খাতার বাঁ থেকে ডাইনে; আর সেইজন্যে সহজেই মানুষের স্বাভাবিক রেখাঙ্কনের উলটো চালের বাধা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে—লেখার গতি দ্রুত হয় আর মোলায়েম ভাবে গড়িয়ে চলে, কোথাও হোঁচট খায় না। এ বিষয়ে উর্দু হরফের ছন্দ ও গতি একেবারে আদর্শ। অর্থাৎ তার হরফের চালও আমাদের পেশীর প্রবণতা অনুসারে (ক্লক-ওয়াইস্) দক্ষিণাবর্ত আর তার লেখার স্রোত ও তারই অনুকূল, মানে, খাতার ডানদিক থেকে বায়ে। কিন্তু বাংলা হরফের বেলায় এ পক্ষপাতিত্বের অপবাদ দেবার যো নেই। তার একটা হরফের মধ্যেই, কোনো রেখার ডাইনে চাল, কোনোটার বা বাঁয়ে; কোনো সরল রেখা ডাইনে থেকে বাঁয়ে বাঁ থেকে ডাইনে ভেঙেচুরে ঘোরা ফেরা করছে, আবার কোনো হরফ বা বামাবর্তের সঙ্গে দক্ষিণাবর্তের কুস্তির প্যাঁচ। এমন অবস্থায় বাঙালী শিশুর সংকট যে সঙ্গিন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? বাংলা হরফ যতই সহজ হোক দু'টি বিপরীতমুখী টান থেকে বাঙালী শিশুর নিস্তার নেই। সুতরাং সেই স্বাভাবিক আর বিপরীত টান দুটো যত নির্বিঘ্নে আর সহজে শেখানো যায় ততই মঙ্গল। সুতরাং বাংলা হরফের মধ্যে প্রথমে সানুকূল রেখার (ত) এবং পরে প্রতিকূল রেখা (৲) যুক্ত হ তারপর তৃতীয় রেখা (।) আকার শেখানো উচিৎ। পরপর লিখন পদ্ধতির বিশদ আলোচনা পরে আর একদিন করা যাবে। আজ এইখানেই বাংলা প্রাথমিক লিখন পঠনের মূল কথাগুলি ব'লে আজকের মত শেষ করি।

আশা

সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র

কার অপরাধে কারে তুমি দাও সাজা
এ রহস্য যে বুঝিতে পারিনা ওগো নিখিলের রাজা।
একের পাপের তরে
কেন দল বেঁধে নিরপরাধীরা মরে,
প্রবলের লোভ দম্ভ অত্যাচারে
নিরীহ কোমল সহৃদয় যারা আত্মরক্ষিবারে
পারেনা যে তারা নিরুপায় ধূলিলীন,
ওগো প্রেমময়, নয় কি তাহারা তব আশ্রয়াধীন ?

তাহাদেরে দাও বলি,
গর্ব্বদৃপ্ত দুর্বৃত্তেরা পদতলে যায় দলি'
ধূলিলুণ্ঠিত জনে,
সম্বলহারা কী করিবে তারা দানবশক্তি সনে ?
শুনিয়াছি বটে তুমি অগতির গতি,
তাই যদি হবে কেন নিরবধি হীনমতি
তোমার জগতে অবাধ নিরঙ্কুশ,
যুগে যুগে যিশু যূপকাষ্ঠ ও ক্রুশ
লভেন তাঁহার অগণন মূরতিতে,
নরপিশাচের বজ্র-মুষল শুধু বুক পেতে নিতে ?
অত্যাচারীরা নিখিল ভুবনে জয়ী
বিজয়লক্ষ্মী তাহাদেরি শুধু চির কল্যাণময়ী ?

করুণার অবতার
বুদ্ধ খৃষ্ট প্রবলের দুরাচার
নিবারিতে [illegible],
[illegible] মম অভিজ্ঞতাক্রম
শুধু নৃশংসতা,

শক্তিবিহীন সত্য ও ন্যায় প্রেমের অকৃপণতা।
তথাপি আস্থা এখনো রয়েছে ভবে
ধর্ম্মের জয় হবে।

বাস্তব চেয়ে স্বপ্ন কি বলশালী?
নিভে যতবার কেন ততবার আশার প্রদীপ জ্বালি
প্রাণের নিভৃত কোনে?
মানবাত্মা কি শোনে
তোমার অভয়বাণী?
সে মাভৈ রবে শোকতাপ ভুলে যায়
ভবিষ্যপানে চায়।

অনপনেয় সে আশারমন্ত্র হৃৎকম্পনে বাজে,
যতদিন ভবে জীবাত্মা রবে সে সুর থামিবে না যে!
হৃদয়ে হৃদয়ে যে আগুন জ্বলে
একদিন তার সমবেত ফলে
উঠিবে জ্বলিয়া কল্লান্তের চিতা
পুড়ে ছারখার হবে দুরাচার, নব-জীবনের গীতা
হবে বিরচিত প্রাচীপ্রতীচির মিত্রাক্ষর শ্লোকে
নবীন সবিতা দিবে দেখা এই রক্তধৌত লোকে।

নার্স

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

ভালোবাসার আমাদেরো ছিল অধিকার
ছিল মনে মনে ছোট একখানা নীড়
সময় যেখানে মেলেনা ঘুমের আঁখি আর
এখন এখানে জাগর মুখর ভীড় !

কবে থেকে কতো রাজপুত্রের অভিযান
সুরু হয়ে গেছে তেপান্তরের পর—
আমরাও সেই কাহিনী শুনেছি পেতে কান,
আজ দেখি ধূ ধূ করে শুধু বালুচর।

ফুলের মতন ঝরে কতো মৃদু অনুভব
রোমাঞ্চময় মুহূর্ত মরে যায়,
পাখীর কতো না কাকলীর মতো কলরব
স্বপ্নের দূর ধ্বনি হয়ে সরে যায়।

সাদা বলাকার সাদায় ঊষর নীলাকাশ
নেই তার পথে এক ফোঁটা নীল জল,
বলাকার দেহে এখনো জলের প্রতিভাস,
মন ছুঁয়ে আছে জলহীন মরু-তল !

কতো জীবনের ব্যথার রাত্রি কতো দান
নিয়ে আসে আর ভরে ওঠে কতো বুক,
আমাদের ক্ষুধা সে-ব্যথারে করে অপমান,
আমাদের বুক অটল নিরুৎসুক।

যারা ভালোবাসে, যাদের আকাশে ওঠে চাঁদ,
আমাদের পরাজয়ে নিল যারা জয়—
আমাদের এই মৃত্যুর হীন অপরাধ
তাদেরো করুক এমনি মৃত্যু-ময় ॥

ঝড়ের যাত্রী

মহেন্দ্র নাথ

আমাদের রাজনীতি তরংগিত চায়ের ধূয়ায়,
জটিল আবর্ত রচে হয়তো বা পত্রিকা অফিসে ;
বাজারে পণ্যের মতো বেচাকিনি এ হাটে ও হাটে
থিওরী পায়না রূপ—রাজনীতি জর্জরিত বিষে।

রাজপথে জনস্রোত, কলরবে মুখর নগরী।
নাগপাশে এ' শতাব্দী সভ্যতার অন্তিম বিলাস;
আলোকস্তিমিত রাত্রি—আশে পাশে ধোঁয়াটে আঁধার
শ্রমিকের অভিযান—ধনিকের ঘন নাভিশ্বাস।

ওধারে বিমান হানা ; জার্মাণীর রুশ অভিযান
'রয়টার' অগ্নিবর্ষী—বৃটেনের জয়জয়কার ;
তবুও সংশয় জাগে ঘূর্ণাবর্তে কি জানি কি হবে !
এ' ধারেতো সত্যাগ্রহ—দীপ্ত অভিযান অহিংসার॥

সত্যাগ্রহী সেনাদল ; অনাবিল প্রেমের ঝরণা
পাষাণ গলাবে জানি ; কবে ? সেতো বুঝিতে না পারি ;
চমৎকার রাজনীতি ! শূন্য মার্গে অব্যর্থ সন্ধান,
শংকায় যাপিছে কাল অগণিত ক্ষুব্ধ নর-নারী।

কতোদূরে সেই লক্ষ্য ? এখনও সেই প্রশ্ন জাগে,
কোথায় নায়ক সেই ? কে করিবে সৈন্য সমাবেশ ?
শুনি না তো তূর্যধ্বনি ; মোদের কি বধির শ্রবণ !
চারিদিকে প্রশ্ন ওঠে, এ' যাত্রার নেই কি গো শেষ !

পথ ও নীতির মাঝে কেন আর মিথ্যা কোলাহল !
লক্ষ্যতো মোদের এক ; কেন তবে হানাহানি আর।
অগ্রগামী দল কোথা ? কি তাদের যুগ পরিক্রমা
শংকিত এ' সন্ধিক্ষণে আশা আছে দেখিবো এবার।

আমরা ঝড়ের যাত্রীঃ ঈশানের পুঞ্জীভূত ঝড়
আবর্তিত মেঘবর্ণে লালনীল পিংগল আকাশ;
আমরা তো লক্ষ্যভ্রষ্ট, নেই কোন পথের ঠিকানা,
এমেচারী পলিটিক্স—ক্ষণিকের উন্মাদ বিলাস।

পাতাবাহার

হরপ্রসাদ মিত্র

এইটুকু বাঁধা পদ্ধতি,
এর বাইরে যে বাড়াবো পা—
মনে সাধ হয় যদ্যপি
মাথা বলে সে তো কাম্য না।

আমি চাই শুধু একটি ঘর
নীচু তার ছাদ, চার দেয়াল।
মোলায়েম হাতে, মিষ্টি স্বর,—
আমাকে ঘিরেই তার খেয়াল।

অতি-খরচের চোরাবালি,
অপ-খরচে ঠুঁটো পাহাড়,
আছে প্রান্তর ফালি-ফালি।
আমি সেই দেশে পাতাবাহার।

ফুল তো নেই,
ফল তো নেই,
অভিধানে নেই সীমান্ত।
অনেক প্রবীণ
চক্ষু দেখেছে
আয়ু কোনোমতে দিনান্ত।

সংস্কার

আশাপূর্ণা দেবী

দীর্ঘকাল পরে সত্যসুন্দর দেশে ফিরিলেন—পুত্রের বিবাহসংবাদে নয়—মৃত্যু সংবাদে। জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্বে মানুষ আজও বিধাতার কাছে মাথা হেঁট করিয়া আছে সত্য, তবু সেই পরম পরাজয়ের গ্লানি ঢাকিতে অভিযানের আর অন্ত নাই তাহার। দুরন্ত আবেগের সময়—"পাখী হইয়া উড়িয়া যাইবার" তীব্র ইচ্ছাকে আর নিরুপায় ক্ষোভে নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে হয় না। ওড়াও সম্ভব হইয়াছে।

অতর্কিত দুঃসংবাদে দিশাহারা সত্যসুন্দর উড়িয়া আসিলেন।

স্বামীর আগমনসংবাদ ইন্দুমতীকে জানানো হয় নাই, অপ্রয়োজন বোধে নয়, সাহসের অভাবে। সরকার মহাশয় নিজস্ব বিবেচনায়, কর্তাকে আনিতে দমদমায় গাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, সাহসে বুক বাঁধিয়া ইন্দুমতীর ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ইন্দুমতী কিন্তু সকলের আশঙ্কামত এই নূতন আলোড়নে ধৈর্য হারাইলেন না। অনবরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমশঃ যেন নিথর হইয়া যাইতেছেন তিনি। মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—গাড়ী রাখবেন সময়ে, দেখবেন যেন কিছু অসুবিধে না হয়।

কৃতার্থম্মন্য শ্রীকান্ত সরকার দুইহাত জোড় করিয়া সবিনয়ে জানাইলেন—আজ্ঞে গাড়ী রওনা হয়ে গেছে দমদমায়। উড়োজাহাজে আসছেন কি না।

-- উড়োজাহাজে? তাই বটে, চারদিনের পথ একদিনে পাড়ি দিবার প্রয়োজন থাকিলে উড়িয়া আসা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু প্রয়োজন কি সত্যই আছে? পরাজিতা ইন্দুমতীর হৃত-গৌরব মূর্তিখানা দুইদিন পরে দেখিলেই বা ক্ষতি ছিল কি? লাঞ্ছনা? তিরস্কার? তাহার জন্য তো সারাজীবনই পড়িয়া থাকিল।

সহসা ইন্দুমতীর মনে হয় এত তাড়াতাড়ি চিন্ময়ের মৃত্যু ঘটিবার কথা কি ছিল? সত্যসুন্দরের প্রচ্ছন্ন কামনাই ইহার জন্য দায়ী নয় তো? অবাধ্য পত্নীর দর্পচূর্ণ করিবার গোপন কামনা? মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসে।

সরকার যাইতে উদ্যত হইতেই পিছন হইতে ডাকিয়া বলেন—শুনুন ছোট গাড়ীখানাও বার করতে বলুন, হালদার পাড়ায় যাবো আমি।

হালদার পাড়া ইন্দুমতীর বহুদিনবিস্মৃত পিত্রালয়।

শ্রীকান্ত সরকার দুইচোখ প্রায় গোল করিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন—আপনি? আপনি যাবেন? আজ?

—আজ নয়—এখনই!

—তাইতো—মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কথার শেষ করেন সরকার,—যা আজ্ঞে করেন, তবে আজকের দিনটে বাদ দিলে হ'ত না? কর্তা মশাই আসছেন।

—আসছেন—ভালো কথা। আপনারা তো কোথাও যাচ্ছেন না। আমাকে আজই যেতে হ'বে।

ইহার উপর আর যাহারই হোক শ্রীকান্ত সরকারের কথা চলেনা। অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া, আচ্ছা, বলিয়া প্রস্থান করেন।

ভালো বিপদ হইয়াছে সরকারের! বড় লোকের বাড়ী কাজ করা নয় বাবা! এই তো কয়দিনেরই বা কথা মাস তিনেক বুঝি, রুগ্নছেলেটার রোগ লুকাইয়া কর্তার অমতে বিবাহ দিলেন গিন্নি, কী সমারোহ, কী কাণ্ড কারখানা! 'হেঁপা' সামলাইতে সেই বেচারা শ্রীকান্ত সরকার। কর্তা তো আসা চুলোয় যাক একখানা চিঠি ও দিলেন না, গিন্নি নানারকম হুকুম করিয়া খালাস, মরিবার জন্য গরীব আছে।

ব্যস্ উৎসবের জের মিটিতে না মিটিতে হতভাগা ছেলেটা কিনা মারা পড়িল! শিবের অসাধ্য রোগ, বাঁচিবার কথা নয়, তবু ছিল তো টিঁকিয়া। 'তাওতের' জোরে চেহারা দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না ভিতরে এই রাজরোগ লুকানো আছে। মরিবার জন্য এত কি ব্যস্ততা পড়িয়াছিল?

শ্রীকান্তরই কি কম লাগিয়াছে? এতটুকু ছেলে, ট্রাইসিক্‌ল চড়িয়া ছুটাছুটি করিত তখনকার আমলের লোক সে। দূর হোক ছাই চাকর বাকরের আবার মন। কিন্তু ধন্য বলিতে হয় বড় মানুষদের—এক সন্তান হারাইয়াও তেজটী বজায় আছে, এখনো মানঅভিমানের পালা চোকে নাই! শোকাতাপা মানুষটা 'হন্ত দন্ত' হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে—কোথায় তাহার দেখাশোনা কর—তা' নয় মান করিয়া চলিলেন বাপের বাড়ী। ভগবান তুমিই দেখ।

ভগবানের অবশ্য শ্রীকান্তর মত বাজে লোকের আবেদনে কর্ণপাত করিবার ফুরসৎ থাকেনা, তিনি দেখিলেন না—কাজেই কর্তা বাড়ী ঢুকিবার ঘণ্টাখানেক আগে গিন্নি বাড়ী ছাড়িলেন।

সত্যসুন্দরের যে তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইল তাহা নয়। চরম ক্ষতিই তো ঘটিয়া গিয়াছে বরং যে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড়াইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া আনিতেছিলেন তাহার ব্যতিক্রমে একটু সুস্থই বোধ করিলেন।

বাড়ীখানা একটু বেশী গম্ভীর, একটু বেশী নিথর, কেমন যেন অস্বাভাবিক থমথমে—এই মাত্র। চাকর বাকর, আত্মীয় অনাত্মীয় আশ্রিত অনুগতের অভাব নাই, সহাস্য না হোক অভ্যর্থনা ও জুটিল। ত্রুটি কিছুরই নাই। বরাবরের মতই চাহিবার পূর্বেই আবশ্যকীয় বস্তু হাতের কাছে আসিয়া হাজির হইল! স্নানের পর যে সত্যসুন্দরের এক গ্লাস মিশ্রীর সরবতের অভ্যাস আছে, সেই তুচ্ছ কথাটীও কেহ বিস্মৃত হয় নাই। অথচ কী না কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে।

আশ্চর্য, নিজেও তো তিনি ঠিকই রহিয়াছেন! সরবতের গ্লাস নামাইয়া লবঙ্গ দুইটা মুখে ফেলিবার অভ্যাস ও তো ভুলিয়া যান নাই কই?

অভ্যাস! সকলের বড় শাসন কর্তা। পৃথিবীর চেহারার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, সূর্যের রং বদলাইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়, অভ্যাস আপনার খাজনা আদায় করিয়া লইবেই।

তাই চির অভ্যাস মত জলযোগান্তে আপনার নির্দিষ্ট আসন খানি টানিয়া সকালের খবরের কাগজ খানা খুলিয়া বসেন। পড়িয়া অর্থবোধ হয় না—তবু কাগজ খানার প্রয়োজন আজ বড় বেশী, আপনাকে আড়াল করিতে। আসিয়া পর্যন্ত ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা হয় নাই। অনুপস্থিতির কথাটা বলিবার সাহস কাহারো হয় নাই…তাই প্রতি মুহূর্তে ইন্দুমতীর পদশব্দের আশঙ্কা করিতে থাকেন সত্যসুন্দর।

গতবার আসিয়া ছুটির কয়দিন শুধু বচসা করিয়াই কাটিয়াছে। রোগগ্রস্ত সন্তানের 'জীবনের সাধ' পূর্ণ করিতে, স্নেহান্ধ মাতার বিচারবিবেকহীন ইচ্ছার সহিত বিবেকসম্পন্ন বিচক্ষণ পিতার মতবিরোধ।

ছুটি ফুরাইল—যুক্তি তর্কে ইন্দুমতীর দৃঢ় সঙ্কল্প টলাইতে না পারিয়া সত্যসুন্দর সহসা একটা কটু শপথ করিয়া গিয়াছিলেন, বিবাহ দিলে মাতাপুত্র উভয়ের মুখ দেখিবেন না তিনি।

একজন তো পিতৃসত্য পালন করিতে আপনার মুখ লইয়া চিরতরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া বেড়াইলেও সে মুখ চোখে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। মুহূর্তের জন্য ও না।

—বাকী আছেন ইন্দুমতী।

পিছনে পায়ের শব্দ পাইতেই সত্যসুন্দর তাড়াতাড়ি কাগজখানা আড়াল করিয়া ধরেন। কিন্তু আশঙ্কার কারণ বেশী ছিল না, ইন্দুমতী নয়, সত্যসুন্দরের বুড়ি পিসি। কিন্তু তাঁহার পিছন পিছন ছায়ার মত আসিয়া দাঁড়াইল কে? খোকার বৌ? চিন্ময়ের? থান পরিয়াছে?

বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকেন সত্যসুন্দর।

পিসিমা ক্রন্দনবিজড়িত কণ্ঠে কহেন—নে হতভাগী প্রণাম কর।

পায়ের উপর আলগোছ একটু ভীত কোমল স্পর্শে সত্যসুন্দর সহসা যেন চেতনা ফিরিয়া পান, দুর্বলতা ঝাড়িয়া সোজা হইয়া বসেন, মাথায় হাত দিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া কি যে আশীর্বাদ করেন তিনিই জানেন। শুধু প্রণতা কিশোরীরই মনের কথা টানিয়া লইয়া পিসীমা কপালে করাঘাত করিয়া কহেন—আর আশীর্বাদ, সে বরাত কি রেখেছে অবাগী, এখন শীগগীর যাতে মরণ হয় সেই আশীর্বাদ কর ওকে।

বিরক্ত সত্যসুন্দর হাত নাড়িয়া বলেন—আঃ পিসীমা, চুপ করো তুমি। বসো তো মা তুমি, এসো এইখানে আমার কাছে, নাম কি তোমার।

—পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা? হ্যাঁ ঠিক্ ঠিক্। মেয়ের উপযুক্ত নাম রেখেছেন তোমার বাপ মা, না কি বল পিসীমা।

পিসীমা মলিন মুখে বলেন—হ'লে কি হ'বে, ওই রূপই কাল, মেয়ে মানষের অত রূপ আবার ভালো নয়। চাঁদের মতন কপাল টুকুন, তার ভেতরে ছাই পোরা।

ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে সত্যসুন্দর কহেন—মানুষ যদি জোর করে কপালে ছাই ঢেলে দেয়, তার জন্য কপাল দায়ী নয় পিসীমা, মা আমার পূর্ণিমাই কিন্তু বড় মলিন হয়ে গেছে। মেঘে ঢাকা পড়ে আছে কিনা। পিসীমা যাও এই হতচ্ছাড়া সাজটা খুলে মানুষের মেয়ের উপযুক্ত—আমার মেয়ের উপযুক্ত বেশ করিয়ে নিয়ে এসো দিকিন, এ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

পিসীমা নাতবৌ উভয়েই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন, কথার উত্তর দিবার সাহস হয় না।

এইবার সত্যসুন্দরের ব্যবহারে অস্থিরতা প্রকাশ পায়, অসহিষ্ণু স্বরে বলিয়া উঠেন—কই বসে রইলে যে! যাও নিয়ে এস কাপড় গয়না, ওঠ। এ আমি সহ্য করব না। কিছুতেই না।

পিসীমা ভীত মৃদু কণ্ঠে কহেন—একবার ত্যাগ করে—

—ত্যাগ? কেড়ে নেওয়াকে ত্যাগ বলেনা পিসীমা। ধন্য তোমরা, সার্থক দুধ খেয়েছিল মায়ের, এই কচী বাচ্ছাকে এমনি করে রাখতে পেরেছো তো? ধর্মে বাধল না?

পিসীমা এবার নিজস্ব কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া ওঠেন—আমরা তো সে কথা বলেছিলাম বাছা। এই দুধের বাছাকে এক্ষুণি আমাদের মতন হাল করে রাখলে পাঁচজনে ছি ছি করবে। পেড়ে কাপড়খানা চুড়ি ক'গাছা থাক। আর ভগবান তো সবই কাড়লেন, জড়ান বুদ্ধি হলে আপনিই ফেলে দেবে—বৌমার যে কি 'খোট্', বলেন—'যেমন কপালে করে এসেছে তেমনি থাকুক'।

সত্যসুন্দর চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া যান ইন্দুমতীর এই নূতন নিষ্ঠুরতার বার্তায়······কী এ? প্রতিহিংসা? কাহার উপর? ফুলের মত মেয়েটাকে টানিয়া আনিয়া আগুণে ফেলিয়া দিয়া, তাহার ভাগ্যের নিন্দায় শতমুখ। কেন এমন হয়?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সত্যসুন্দর কহেন—আচ্ছা আমার মেয়ের ভাগ্যের ভার আমি নিলাম, দেখি কে জেতে কে হারে। পূর্ণিমা, যাও বিয়ের আগে যেমন সাজে থাকতে তুমি সেই ভাবে থাকো গে। জেনে রেখো, তুমি আমার আইবুড়ো মেয়ে, বিয়ে হয়নি তোমার। কারুর কথায় কান দেবে না, চক্ষুলজ্জা করবে না। আর শোনো পশু দিন ফিরবো আমি, তুমি যাবে আমার সঙ্গে করাচীতে, এদের কথা, এই কদিনের ঘটনা ভুলে যাবে, বাপ আর মেয়ে বেড়াতে এসেছিলাম আমরা এখানে আবার ফিরে যাচ্ছি নিজের যায়গায় বুঝেছ তো? হ্যাঁ যাও, লক্ষ্মী মেয়ে, শাড়ী পরে এসো একটা, লালশাড়ী।

পূর্ণিমা ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়।

পিসীমা ভীতকণ্ঠে কহেন—বৌমা এসে রাগ করবেন বৌটার আর 'খোয়ারের' শেষ

থাকবে মা—আর আদর করবার তো নেইও কিছু, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে অতবড় সর্বনাশটা হয়ে গেল।

—সর্বনাশ তো দরজায় দাঁড়িয়েছিল পিসীমা, তোমরা তাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছ মাত্র, কিন্তু যাক সে কথা; আমার যেটুকু কর্তব্যের ত্রুটী হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবো আমি, পূর্ণিমার আবার বিয়ে দেব।

—দুর্গা দুর্গা। পিসীমা শিহরিয়া ওঠেন।

কিন্তু সত্যসুন্দর এবার হাল ধরিবেন, যে অনিচ্ছাকৃত অসাবধানে এত বড় পাপ ঘটিয়া গিয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে বৈ কি। বিধবা পুত্রবধূর পুনর্বিবাহ দিবার সঙ্কল্প অটুট থাকে তাঁহার, বরং প্রতিকূল বাতাসে উত্তরোত্তর দৃঢ় হইতে থাকে।

বিপদ দেখিয়া সরকার মহাশয় হালদার পাড়ায় ছুটিয়া ইন্দুমতীর হাতে পায়ে ধরিয়া লইয়া আসেন, পুরোহিতকে ডাকিয়া আনেন, গুরুবংশের একটা অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলে দেশে পড়িয়া গাঁজা টানে আর মাঝে মাঝে বার্ষিকি আদায় করিতে আসে, তাহাকে খবর দেন, মোটকথা সত্যসুন্দরের সুমতি ফিরাইতে চেষ্টার ত্রুটী হয়না।

পূর্ণিমার মা বাপ নাই জ্ঞাতি সম্পর্কে এক খুড়ার বাড়ী মানুষ হইয়াছে, বিধবা মেয়েকে বুকে করিয়া লইবার মত প্রবল স্নেহ তাঁহাদের ভিতর না পাওয়া গেলে বেশী দোষ দেওয়া চলে না, ভাগ্যক্রমে ভাল ঘরে পড়িয়াছে এই ঢের, এখন তাহারা আজীবন ভাত দিবে কি 'নিকা সাঙা' দিয়া দূর করিয়া দিবে সে চিন্তা তাঁহার নয়।

যাইবার ব্যবস্থা করিতে আরো কয়েক দিন কাটে, সত্যসুন্দরের যেন নেশা ধরিয়াছে পূর্ণিমাকে লইয়া অনবরত দোকান বাজারে ঘুরিয়া বেড়ান, অপর্যাপ্ত দিয়াও যেন তৃপ্তি হয় না, যা তাহার প্রয়োজন নাই জীবনে হইবে কিনা সন্দেহ, দুই হাত ভরিয়া তাহাও কিনিয়া আনিয়া জড় করেন। শাড়ীর ওপর শাড়ী, জুতার উপর জুতা, জরি ফিতা লেস চিকন টুকিটাকির আর অন্ত নাই।

পূর্ণিমা বিব্রত মুখে খালি বলে—এত কি হবে, বাবা, এ যে পাঁচ জনে মিলে সারাজীবন পরেও ফুরাবে না।

সত্যসুন্দর বলেন, তা হোক—সেখানে সব জিনিষ পাওয়া যায় না।

মনে মনে একটী ছেলেকে আঁচ করেন তিনি, যাহার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া অসম্ভব নয়, ওয়ারলেস অফিসে কাজ করে ছেলেটী, তাঁহারাই কোয়ার্টারের কাছে থাকে, ভারী ভালো ছেলে।

ইন্দুমতী দেখিয়া শুনিয়া আরো কঠিন হইয়া বসিয়া থাকেন, পূর্ণিমার সঙ্গে বাক্যালাপ তো বন্ধ করিয়াছেনই, স্বামীর কাছেও দেখা দেন না।

যাইবার দিন খবর পাইয়া পূর্ণিমার সেই জ্ঞাতি কাকা দেখা করিতে আসেন, তখন বোঝেন মেয়ে আসিয়া ঘাড়ে পড়িবার সম্ভাবনাটা নির্মূল হইয়াছে। সঙ্গে আর একটি ছেলে আসিয়াছে বোধ করি কাকার ভাইপো। ভাগিনেয় কেউ হইবে। ভিতরে দেখা করিতে পাঠাইয়া দিয়া, সত্যসুন্দর শ্রীকান্তের সঙ্গে প্রয়োজনীয় দুই চারিটি কথা কহিতে থাকেন……কিন্তু ক্রমশঃ ট্রেনের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসে, উহারা আসেনা কেন?

সত্যসুন্দর ভিতরে আসেন তাড়া দিতে, কাকাটী বোধ করি ইন্দুমতীর দরবারে হাজিরা দিতে গিয়াছেন, বেহাইয়ের চাইতে 'বেহান'কেই তিনি চেনেন বেশী, "বড় গাছে নৌকা" বাঁধিয়া বড় সুখ পাইয়াছিলেন, বিধাতা পুরুষের সহিলনা এই যা খেদ। কিন্তু পূর্ণিমা? কোথায় সে? ঘরে নাই দালানে নাই……কোথায় গেল? পিছনের বারান্দায় কে যেন দাঁড়াইয়া না? পূর্ণিমাই। আর সেই ছেলেটি। খুড়তুতো ভাই না কি? সত্যসুন্দরের চোখের উপর কি এখনি বার্দ্ধক্যের পর্দা পড়িয়াছে? চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দুইজনে, কথা নাই মুখে। কাছাকাছি বলিলে অন্যায় বলা হয়, বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবধান দুইজনের মধ্যে, তবু— এই অশ্রুসজল বদ্ধগভীর দৃষ্টি, চিনিবার মত বয়স সত্যসুন্দরের এখনও আছে। সহসা একটা তপ্ত রক্তস্রোত পা হইতে মাথা পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতে থাকে, যে রক্ত সত্যসুন্দরের পিতৃপিতামহের ধমনীতে বহিত, কুলবধূর অনাচার দেখিলে।

অভ্যাস? সংস্কার?

নিজেকে সংযত করিয়া ফিরিয়া আসেন সত্যসুন্দর। গাড়ীতে স্টার্ট দিতে হুকুম দেন। জ্ঞাতি কাকাও ততক্ষণে বাহিরে আসেন, পিছনে ছেলেটী।

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করেন—ছেলেটী কে বেহাই?

এই প্রথম বেহাই সম্বোধন করেন সত্যসুন্দর।

জ্ঞাতিকাকা ঈষৎবিপন্ন ভাবে উত্তর দেন—পাশের বাড়ীর ছেলে, ছেলেবেলা থেকে ভাই বোনের মতন খেলাধূলো—আসতে চাইলে—

—বেশ তো বেশ তো—তার আর কি, হ্যাঁ ভালো কথা, বৌমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবার একটা কথা ছিল, কিন্তু ভেবে দেখলাম—সেটা ঠিক হবে না। আমি সারা দিনই কাজে থাকি কার কাছে থাকে না থাকে, আপনিই নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে। তবে হ্যাঁ আমার দিক থেকে কর্তব্যের ত্রুটি হবে না, খরচ পত্র যা লাগে—আচ্ছা নমস্কার। গাড়ীতে উঠিয়া সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দেন সত্যসুন্দর।

ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নূতন পরিচয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে অনভ্যস্ত বলে যে অখিল মৈত্রীকে দেখে কোন কথাই বল্‌তে পার্লে না তা নয়; মৈত্রীর সঙ্গে পূর্বে কখন সাক্ষাৎ না হলেও, অখিল মৃত্যুঞ্জয়ের কন্যারূপে রত্না রেবার কাছে তার নাম শুনেছিল খুবই ; তা ছাড়া Miss Bose বলে একটী বাঙালী মেয়ে রেলওয়ের টিকেট অফিসে কাজ করে, সে কথাও কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে অনেকেরই জানা ছিল। অখিল থেকেই মৈত্রীর নাম শুনে চাকুরীতে যোগ দেবার দ্বিতীয় দিনে দুর্গা তার সহকর্মিনীর নাম বলে দিতে পেরেছিল। সে যাই হোক অখিল যখন দেখ্‌ল যে মৃত্যুঞ্জয় বোসের কন্যা একদিন অপরাহ্ণে বিডন স্কোয়ারের বাড়ীতে এসে হাজির, তখন তার বিস্ময়ের সীমা ত রইলই না, মনে মনে দারুণ পীড়া বোধ কর্ল। অখিল দু একটী বন্ধুর সংসর্গে পতিতা-সংস্কারে ব্যাপৃত হয়ে দুর্গাদের বাড়ীতে যত ঘনিষ্টতাই করুক্ তার কাছে এটা প্রমাদ-বৎ মনে হ'ল যে ভদ্র পরিবারের, বিশেষত জানাশোনা কোন ভদ্র পরিবারের মেয়ে দুর্গাদের বাড়ীতে যে কোন কারণেই আগন্তুক হ'তে পারে। মুহূর্তের জন্য অখিল তার নিজের উপরই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল কিন্তু পর মুহূর্তেই তার সমস্ত প্রাণটা ভরে উঠ্‌ল একটী ভদ্র পরিবারের, কলঙ্ক রটবার আশঙ্কা-জনিত দুশ্চিন্তায় ও সমবেদনায়। সে রাত্রেই অখিল শ্রীমন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যাপারটা মৃত্যুঞ্জয়ের কাণে তোলবার জন্য তাকে সবিশেষ অনুরোধ করে গেল। অখিলের পক্ষে ব্যাপারটা যথার্থ ভাবে বর্ণনা করা সম্ভবপর হ'ল না। কাজেই যতটুকু স্পষ্ট করে এবং যতটুকু আভাষে বর্ণনা হ'ল তাতে যে সেটা অনেকখানি সত্য ব্যাপারকে ছাড়িয়ে গেল, তা' বলাই বাহুল্য। মৈত্রীর বিডন স্কোয়ারে যাওয়াটা অখিলকে পীড়া দিয়েছিল বৈষয়িকভাবে, কিন্তু তার বিকৃত বিবরণটা একেবারে দলে দিয়ে গেল শ্রীমন্তের নৈতিক বুদ্ধিকে, সে মানসিক বেদনায় কিছুক্ষণের জন্য যেন বিমূঢ় হয়ে রইল।

অনেক বিতর্কের পরও শ্রীমন্ত মৈত্রীর সম্বন্ধে তার কর্ত্তব্য স্থির করতে পার্ল না। একবার ইচ্ছা হ'ল রত্নার সঙ্গে পরামর্শ করে, পরমুহূর্তেই যে সঙ্কল্প ত্যাগ কর্ল। কিরীটের সঙ্গে পরামর্শ করার কথাও মনে মনে ভাব্‌ল কিন্তু শ্রীমন্তের কেমনতর মনে হল যে কিরীট এ ব্যাপারের গুরুত্বটা হয়ত বুঝ্‌বে না, হয়ত সে তার স্বাভাবিক ব্যঙ্গোক্তি দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে লঘু করে মৈত্রীকেই কোন এক হালকা মনের অবস্থায় এ সব ব্যাপার নিয়ে উপহাস করবে। কাজেই শ্রীমন্ত পরদিন অনিশ্চিত মন নিয়েই কলেজে গেল কিন্তু বিকালের দিকে কলেজের কাজ বন্ধ করে একেবারে এসে হাজির হল ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে—উদ্দেশ্য যে মৈত্রী অফিস থেকে বাড়ী

ফেরবার আগেই যেন ব্যাপারটা মৃত্যুঞ্জয়কে বলতে পারে। বলা বাহুল্য যে বলার সুবিধা হল খুবই – শ্রীমন্ত ব্যথিতভাবে অখিল থেকে যেমন যেমন শুনেছিল, সবই মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট খুলে বল্ল। শুনে বৃদ্ধ পিতার চোখ দুটী দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল, একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন এবং এ প্রসঙ্গে শ্রীমন্তের সহিত দ্বিতীয় কথা না বলে, অন্যান্য কথার মধ্যে শ্রীমন্তকে বৈকালিক জলযোগ করিয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

সে রাত্রে মৃত্যুঞ্জয় যখন বাড়ী ফিরলেন তখন রাত দশটা। মৈত্রী অফিস প্রত্যাগতা হয়ে পিতাকে বাড়ীতে পায়নি, তার উপর ফিরতে ফিরতে যখন মৃত্যুঞ্জয় রাত কর্‌লেন দশটা, তখন সে পিতার উপর ক্ষুব্ধ হ'ল। মৃত্যুঞ্জয় বসবার ঘরে পা দিতেই সে বল্ল "এ কি রকম বাবা, সেই কখন তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছ, আর এই রাত দশটায় ফিরছ—এদিকে আমার ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ কর্‌ছে।" মৃত্যুঞ্জয় কোন উত্তর না দিয়েই চাকরকে ডেকে ছাড়া জামা-চাদর যথাস্থানে রাখতে বল্লেন ও পরে হাত-পা ধোয়া হলে পর কন্যার আহ্বানে খাবার টেবিলে গিয়ে বস্‌লেন। পিতাকে নীরবে ভোজন-রত দেখে মৈত্রী আশ্চর্য হ'ল কিন্তু তার চাইতে বেশী হল পিতার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ। সে বলে যেতে লাগল "আজ কাল তুমি মাঝে মাঝে কেমনতর যেন হয়ে যাও। তোমার যা অসুবিধা, সেটা যদি তুমি আমায় খুলে না বল, তবেত আমার বোঝার সাধ্যি নেই! আমার ত অফিসেরও খাটুনি আছে, তার উপর সর্বক্ষণ কি আমার পক্ষে সম্ভব তোমার ছোটখাট অসুবিধগুলোর খবর নিয়ে বেড়ান। এটা তুমিই কতবার আমায় বুঝিয়েছ যে মেয়েরা ষোল আনা ঘর-সর্বস্বা বলে না হয় ওরা ঘরের আলো, না হয় ওর বাইরের ছায়া। আর এই বা কি রকম যে তুমি বাইরে কাটাবে একটানা পাঁচ ঘণ্টা এবং বাড়ীতে এসে মুখ ভার করে থাক্‌বে—বলবে না কোথায় গেছ্‌লে তুমি। বিশ্রি সব আমার মতে।"

মৃত্যুঞ্জয় বাক্য ব্যয় না করে আহার শেষ কর্লেন এবং কন্যাকে "আমি শুতে যাই" বলে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় গা ঢাল্‌লেন। শ্রীমন্তের সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধে কথা হবার পর থেকে ঘণ্টা পাঁচেক সময় যে মৃত্যুঞ্জয় কি ভাবে কাটিয়েছেন তা বলা শক্ত। মগজের প্রতিটী রক্ত দিয়ে যে কন্যার ধী-কে পুষ্ট করেছেন, যে কন্যার চরিত্র-গঠনে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর বহু বৎসরের আহৃত আদর্শ অভিজ্ঞতাকে উজাড় করে নিঃশেষ করেছেন, সেই কন্যার এই রুচি-বিকৃতির কথা শুনে মৃত্যুঞ্জয়ের পিতৃ-হৃদয় যেন চৌচির হয়ে গিয়েছিল। অসহ্য বেদনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর একটা প্রচণ্ড ধিক্কার এল এবং ক্রমে সেটা গিয়ে পরিণত হল এক কঠোর নির্মমতায়। মৃত্যুঞ্জয় যখন ৯।৹ টার সময় ঢাকুরিয়া লেকের এক জনহীন কোণ থেকে উঠে এলেন তখন তাঁর মনে কন্যার প্রতি নির্মম ব্যবহার করবার একটা বজ্র-প্রতিজ্ঞা নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু মৈত্রী যতক্ষণ আহারে বসে কথা বলে চলেছিল ততক্ষণ মৃত্যুঞ্জয়ের মনের মধ্যে চলছিল একটা দ্রুত প্রতিক্রিয়া, তিনি কিছুতেই যেন

আর কন্যার প্রতি অকরুণ হবার মত শক্ত থাকৃতে পারছিলেন না। তা হলেও মৃত্যুঞ্জয় তার নির্ধারিত মনের সংকল্পকে আঁকড়ে রইলেন ও বাক্যব্যয় না করে শয্যার আশ্রয় নেওয়া সমীচীন মনে করলেন।

মৃত্যুঞ্জয় কখনও কন্যার সঙ্গে স্বর্গগতা পত্নীর কথা আলাপ করতেন না। মৈত্রীর ছেলে বেলায় সেটা না করার যথেষ্ট কারণ ছিল, পরে এটা না করাটাই হয়ে গিয়েছিল একটা অভ্যাস। তা ছাড়া এটাও ঠিক যে মৃত্যুঞ্জয় যতটা কন্যাবৎসল ছিলেন, সেই অনুপাতে মোটেই পত্নীবৎসল ছিলেন না। কিন্তু সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মনে পড়ল পত্নীর শুভ্র ললাটে সেই দীপ্ত সিঁদুরের টিপ্, যা দেখে প্রথম দিন তিনি শিউরে উঠেছিলেন। তিনি কি জানতেন যে তাঁর সেই আশঙ্কার পেছনে কতখানি অদৃষ্টের পরিহাস লুকান ছিল। সে রাত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের মনে হল যে তিনি আর যাই করুণ, মৈত্রীকে মায়ের হ'য়ে মানুষ করেননি, যদি করতেন তবে অতখানি রুচি-বিকৃতি মৈত্রীর হোত না। মৈত্রী ধী পেয়েছে কিন্তু ধৈর্য পায়নি, শক্তি পেয়েছে ক্ষমা পায়নি, রূপ পেয়েছে শ্রী পায়নি, সার পেয়েছে কিন্তু পায়নি রস। মৃত্যুঞ্জয় বুঝতে পারলেন যে কন্যার চরিত্রকে শোধরাতে হবে এবং সে শোধরানোর জন্য দরকার হ'লে তাকে কঠিন হতে হবে। মাতৃ হীনাকে মাতৃ-কঠিন আচরণে দরকার হয় ভেঙ্গে গড়তে হবে।

পরদিন ভোর বেলা চায়ের টেবিলে পিতাপুত্রী তুমুল সংঘর্ষ হয়ে গেল। অনভ্যস্ত গলায় মৃত্যুঞ্জয় কন্যাকে বল্লেন "মিতি তুমি আজ চাকুরী ইস্তফা দিয়ে এসো। আস্চে হপ্তায় আমার সঙ্গে তোমার শিলং যেতে হবে। আমার শরীরটা এখন এখানে ভাল থাকৃচে না।"

শুনে মৈত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে গেল, ভ্রূ কুচ্‌কে বল্ল "সে কিছুতেই হবে না। আমার চাকুরীর পেছনে তুমি অমন করে লাগছ কেন? তোমার শরীরের ত কিছু হয়নি। একটা মিথ্যা অজুহাত দিয়ে আমাকে চাকুরী ছাড়াতে চাচ্ছ কেন? কি আশ্চর্য, আমায় একটা মিথ্যা কথা বলতে তোমার বাঁধল না। আমি কিছুতেই চাকুরী ছাড়ব না, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার।"

মৈত্রী টেবিল ছেড়ে উঠল। তার চোখ দুটো দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌ল। মৃত্যুঞ্জয় পেছন পেছন উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকলেন "মিতি"। মুহূর্তের জন্য পেছন ফিরে উত্তর হল "আমি কিছুতেই ছাড়ব না।"

মৈত্রীর চাকুরী নেবার মাস খানিক পর থেকে কিরীট ল্যান্সডাউনের বাড়ীতে বড় একটা আস্তে পারেনি। তার প্রথম কারণ ছিল দিদির দৌরাত্ম্য যার ফলে তাকে অন্ততঃ দিন সাতেক মৃত্যুঞ্জয়ের অন্যতম পেনশনার বন্ধু রসময় রায়ের বাড়ী হাঁটাহাটি করবার পর তবে পেরেছিল তার তরুণ [illegible]র জামাতা অনুপের নামে একখানা চিঠি বার করতে। সে চিঠির যথার্থ উদ্দেশ্য যাই [illegible] লিখিত মর্ম ছিল এই যে অনুপের যদি বাড়ী কেনার আবশ্যক থাকে, তবে পত্রবাহক [illegible]টের নিকট অনেক বিক্রেয় বাড়ীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এ চিঠি নেওয়া হলেই দিদির

দৌরাত্ম্যের অবসান হয়নি ; অবসান হল সেদিন যেদিন অনুপ গাড়ী নিয়ে কিরীটকে তার বাড়ীতে খুঁজতে আসাতে হেমমালার সহিত হল দৈবক্রমে অনুপের সাক্ষাৎ।

এই দিদির দৌরাত্ম্য ছাড়াও কিরীটের মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে উপস্থিতি-বিরলতার অন্য একটা কারণ ছিল। কিছুদিন পূর্বে যে কিরীটের দিদি বাড়ীতে একটা নূতন উড়ে ঠাকুর রেখেছিল একদিন জানা গেল যে সে কার্যাক্ষম, কেননা একটা ফোঁড়া হওয়াতে সে চলৎ-শক্তিহীন। হেমবালা ষষ্ঠীকে জবাব দিল, কিন্তু কিরীট তাকে গাড়ী করে পৌছিয়ে দিল তার খোলার ঘরের বাড়ীতে এবং শুধু তাই নয়, সেখানে নিয়ে গেল নিজের পরিচিত দুটাকা ফিসের একজন ডাক্তারকে। পরে ডাক্তারের পরামর্শে কিরীট ষষ্ঠীকে হাঁসপাতালে ঢুকাল এবং সেখানে তার ফোঁড়া অস্ত্র করাবার ব্যবস্থাও কর্ল। এই চিকিৎসাব্যাপারে কাটল প্রায় কিরীটের দু সপ্তাহ।

যেদিন সকালে চায়ের টেবিলে পিতাপুত্রীর ঝগড়া হ'ল, সেদিন দুপুরে বেলা প্রায় একটার সময় যখন হেমবালা ভাইকে তার বহু অব্যবসায়িক ব্যবহারের জন্য তিরস্কার কচ্ছিল, এমনি সময় সেখানে হাজির হলেন মৃত্যুঞ্জয়। ভ্রাতা-ভগ্নী এ সময়ে ওদের বাড়ীতে মৃত্যুঞ্জয়ের উপস্থিতিতে বিস্মিত হ'ল। হেমবালা বহু আপ্যায়ন করে আগন্তুককে বসাল কিন্তু কিরীট ব্যস্ত ভাবে ব্যাপার জানবার-জন্য অনুসন্ধিৎসু হল। মৃত্যুঞ্জয় বল্লেন ব্যাপার এই যে তিনি কালই শিলং যেতে চান, কেননা কিছুদিন যাবত তিনি একটা শারীরিক দৌর্বল্য অনুভব করে আসচেন। কিন্তু সে যাওয়া সম্ভব হতে পারে তা হলেই যদি হেমবালা গিয়ে কিছুদিন তাঁর ল্যান্সডাউনের বাড়ীতে থাক্‌তে রাজি হন। তিলমাত্র বিলম্ব না করে হেমবালা ব'ল্ল যে যদিও তার ওখানে থাকার গুরুতর অসুবিধা আছে, তা হলেও মৈত্রীর সুবিধার জন্য সে তা গ্রাহ্য করবে না মোটেই। সঙ্গে সঙ্গে হেমবালা এও বল্ল যে কিরীটের খাবার দাবারও কোন বিশেষ অসুবিধা হবে না, যেহেতু দিনের বেলার খাওয়াটা না হলেও রাত্রির আহারটা সে মৈত্রীর ওখানে সেরেনিতে পারবে। মৃত্যুঞ্জয় শালীনতাপূর্ণ গলায় সজোরে এই প্রস্তাবে অঙ্গীকৃতি জানালেন। মৃত্যুঞ্জয় বেরিয়ে আস্‌তে আস্‌তে কিরীট তাঁর এই আকস্মিক শিলং যাত্রা সম্বন্ধে সন্দিহান ভাবে দুচারটা প্রশ্ন কর্ল কিন্তু নিজের শারীরিক দৌর্বল্য ছাড়া মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট হতে অন্য কোন উত্তরই সে বার করতে পার্ল না।

কন্যার সঙ্গে বাক্য-সংঘর্ষ হবার পর মৃত্যুঞ্জয় ভেবে ঠিক করেছিলেন যে তাঁকে শিলং যেতেই হবে এবং যেহেতু মৈত্রীকে তার সঙ্গে শিলংএ যেতে কিংবা কলকাতায় অন্য কোথাও থাক্‌তে বাধ্য করা যাবে না, কাজেই তাঁকে হেমবালার শরণাপন্ন হতে হবে। মৃত্যুঞ্জয় সব চাইতে খুসী হতেন যদি শ্রীমন্ত রত্না তাঁর বাড়ীতে থাক্‌তো কিন্তু ভেবে দেখ্‌লেন এ প্রকার প্রস্তাব কর্‌া শোভন হবে না।
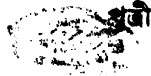
যেদিন দুপুর বেলা হেমবালা প্রতিশ্রুতি দিল সেদিন সন্ধ্যায়ই সে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে থাকতে এল এবং পরদিন দুপুর বেলাই মৃত্যুঞ্জয় শিলং রওয়ানা হলেন। কিরীট কিংবা তার দিদি কারোরই সন্দেহ রইল না যে পিতাপুত্রীর মনান্তরই শিলং যাত্রার যথার্থ কারণ। গৃহত্যাগের শেষ মুহূর্তে মৃত্যুঞ্জয়ের যাত্রার উদ্যোগ শিথিল হয়ে এল কিন্তু এই শিথিলতায় তাঁর নিজের সঙ্কল্প ধিকৃত হবার আশঙ্কা আছে এই ভেবে তাড়াতাড়ি তিনি ট্যাক্সিতে গিয়ে বস্‌লেন। মৈত্রী তখন টিকেট বেচ্‌ছিল চৌরঙ্গীর অফিসের কাউণ্টারে বসে।

শিলং-যাত্রার সব ব্যাপারটাই শ্রীমন্তের অজ্ঞাত ছিল। কারণ মৈত্রীর বিষয় বলবার পরদিন সে মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট আসেনি এবং এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি যে বৃদ্ধ অত শীঘ্র একটা এত বড় রকমের ব্যাপার করে ফেল্‌বেন। মৃত্যুঞ্জয় যাবার দিন গোটা দশেকের সময় শ্রীমন্তের বাড়ীতে গেলেন। কিন্তু তাকে না পেয়ে তার নামে একখানা ছোট চিঠি রেখে এলেন। তার মর্ম ছিল এই যে, ভুল জীবনে সব সময়েই শোধরাণ যায়, তাই মনে করে মৃত্যুঞ্জয় একলাই শিলং যাচ্ছেন। কিরীটের দিদি হেমবালাকে বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, তবুও শ্রীমন্ত খবরাখবর নিলে ভাল হয়।

বিকালে শ্রীমন্ত ও কিরীট দুজনই ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে হাজির হল। প্রথমটা মৈত্রী বসবার ঘরে ছিল না, হেমবালার মারফত খবর নিয়ে জানা গেল যে মৈত্রী ওর শোবার ঘরে বসে কি পড়াশুনো করচে। কিরীট শ্রীমন্তের সঙ্গে কথা চালাতে লাগল এমনি ভাবে যেন বোসেদের বাড়ীর প্রাত্যহিক আবহাওয়ার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। শ্রীমন্ত যদিও একবার জিজ্ঞাসা করেছিল যে মৃত্যুঞ্জয়ের শিলংএ থাকবার কি ব্যবস্থা হয়েছে, তথাপি তাকে আলাপ কর্‌তে হ'ল বেশীর ভাগ এই নিয়েই যে খেলাধুলা ভাল হলেও ক্রীড়াদেবীর যে পূজা আজকাল হয় সেটা অত্যন্ত হানিকর। বেশীক্ষণ বিতর্ক চালাবার দরকার হল না, কারণ হেমবালা এসে অনুপ জমিদারের প্রপোসল ফর্মের ভিতর যে বয়সের কোঠায় মারাত্মক ভুল হয়েছিল, সেটা আশু শোধরাবার জন্য ভাইকে কড়া উপদেশ দিতে লাগ্‌ল এবং অনুপের দেওয়া চিঠি নিয়ে কেন যে কিরীট এতদিনেও ক্ষিদিরপুরে অনুপের বিবাহিত বোনের সঙ্গে হেমবালার সাক্ষাতের জন্য একটা দিন স্থির করে আসে নাই সে জন্যও ভৎর্সনা কর্‌তে লাগল।

প্রায় ঘণ্টা খানিক পরে বসবার ঘরে বিষণ্ণমুখে এসে হাজির হল মৈত্রী। তাকে দেখেই হেমবালা বল্ল "বোন আমার আজ বেজায় খেটেছে অফিসে। দেখ্‌চি মুখখানা ক্লান্তিতে একেবারে কালী হয়ে গেচে।"

কি—ক্লান্তিতে না কেঁদে ও রকম হল ?

হে—কাঁদবে কেন ছাই ? বাবা গেছে স্বাস্থ্যের জন্য শিলংএ, আর মেয়ে তাঁর জন্য কাঁদবে ! (বলে উচ্চহাস্য)

শ্রী—উনি কোথায় থাকবেন শিলংএ কিছু বোধ হয় ঠিক করেননি মৈত্রী।

মৈ—আমি যতদূর জানি কিছুই করেন নি। জানিনা হেম-দির কিছু জানা আছে কি না।

কি—আরে ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? পাহাড়ে জায়গায় হাজার-গণ্ডা দিশি-বিলিতি হোটেল আছে নিশ্চয়। সে কথা রাখ। মৈত্রীর আজ মন খারাপ, চল আজ সবাই মিলে একটা চার্লির ছবি দেখে আসা যাক্, আজই হোচ্ছে একটা চৌরঙ্গী সিনেমায়।

শ্রী—আমার স্ত্রীর আজ যাওয়া হবে না, কাজেই আমাকেও বাদ দিতে হবে।

মৈ—আমার চার্লির ছবি একেবারেই ভাল লাগে না।

কি—ঝক্‌মারি, নিছক ঝক্‌মারি—ছবি দেখ্‌বার কথা বলতে যাওয়া। এ-দেশের কিছু হতে পারে না—যেখানে অত স্ত্রীর ভয়, আরো আরো কত কিছুর ভয়।

বলে কিরীট চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—মনে হল যেন সে তখনি ঘর ছেড়ে চল্ল। হেমবালা জিজ্ঞাস কর্ল "তুমি উঠ্‌চ কেন কিরীট?" আবার চৌকিতে বসে ভাল করে জুতাটা পরতে পরতে কিরীট বল্ল "আমায় আজ ছবি দেখ্‌তেই হবে, যাচ্ছি তাই।"

হে—ছবি দেখ্‌বেত ন'টায়। এখন কি? তা ছাড়া খেয়ে যাবেত? বসো ততক্ষণ।

কিরীট গম্ভীর ভাবে দিদিকে জানাল সে এখন একটু অন্যত্র যাচ্ছে। ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই ফিরে আস্‌বে খেতে এবং তারপরই যাবে ছবি দেখ্‌তে। বলেই কিরীট বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে মৈত্রী কিরীটের এই ঘরত্যাগ ব্যাপারে কোন কথাই সে রাত্রে বল্ল না। শ্রীমন্তের মনের মধ্যে খেল্‌ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের শিলং যাত্রা ব্যাপারটা। বস্তুতঃ তার ছবি দেখ্‌তে যাবার ইচ্ছা নাই বলেই স্ত্রীর নামে একটা তাড়াতাড়ি মিথ্যা কথা চালিয়ে দিয়েছিল। কাজেই সেও কিরীটের সহসা ঘরত্যাগ ব্যাপারটা নীরবে হজম করে গেল। কিন্তু হেমবালা দেখ্‌লে সমস্ত ব্যাপারটাতে একটা অশোভনতা। তাই কিরীট ঘর ছাড়ার আধ মিনিটটাক পরেই হেসে হেসে সে বল্লে "তোমরা আমার ভাইটাকে চেন না, ওর যখনই কোন উত্তেজনা হয়, তখনই আমি বুঝি যে ও চটেছে ওর নিজের উপর"। মৈত্রী জিজ্ঞাসুভাবে হেমবালার দিকে তাকাতেই সে আবার বল্লে "বুঝলে না, ছবি দেখ্‌তে যাওয়ার কথা বলে ও নিজে হয়ে গেল বেকুব, তাইতে ওর নিজের উপর হলো রাগ। ওর সবই বোন্, উল্টো, কিন্তু ওর মত একটা অতো নির্মল চরিত্রের ছেলে ও দেখ্‌লাম না—দু'একটা শ্রীমন্তের মত ছেলে বাদ দিলে"।

শ্রী—তা যেন হ'ল (স্মিত হাস্য) কিন্তু এই নির্মম চরিত্রের ভাইটাকে যে পাঠিয়ে দিলে পারতেন শিলংএ মৈত্রীর বাবার সঙ্গে। উনি একেবারে একাটী গেলেন। আমার কি রকম ঠেক্‌চে।

হেমবালার কাছে যেন হঠাৎ একটা অজ্ঞাত তত্ত্বের আবিষ্কার হল, এ রকম একটা বিস্ময়ের ভাব করে ব'ল্ল "ঠিক বলেচ ভাই ঠিকই বলেচ, আমার ছাই সব সময় বুদ্ধিগুলো মাথায় আসে না। তা ছাড়া শোনইনা কেমন করে আমার কাছে মৃত্যুঞ্জয় বাবুর বল্‌তে যাওয়া"। এই পর্যন্ত বলা হতেই মৈত্রী ঘর থেকে উঠে গেল এবং তখন হেমবালা সবিস্তারে শিলং যাওয়ার ইতিহাসটা শ্রীমন্তকে বল্ল। অধ্যাপক যুবক চুপ করে শুনেই গেল, হেমবালা তার আশ্চর্য মনযোগ লক্ষ্য করে শ্রীমন্তের সন্নিহিতা হয়ে অনুচ্চ গলায় ব'ল্ল "বুঝলে না শ্রীমন্ত তুমি ব্যাপারটা—মেয়ে-বাপে ঝগড়া! কে জানে কিসের জন্য! তা আমি একটা আঁচ করেচি। তা দেখ্‌ব আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব, কিছুই বাকী রাখ্‌ব না"।

শ্রীমন্ত সেখান থেকে উঠ্‌ল। প্রায় ঘণ্টা খানিক পরে যখন কিরীট বসবার ঘরে ফিরে এল, তখন দেখ্‌ল সেখানে একা বসে মৈত্রী, একটা খবরের কাগজ সামনে রেখে বোধ হয় পড়বার চেষ্টাই কচ্ছিল। ঘরে ঢুকে অতিশয় সহজভাবে কিরীট ব'ল্ল "দিদি কোথায়? রান্না হয়েছে কি জান তুমি?"

মৈ—রান্না হয়ত হয়েচে, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু ছবি দেখ্‌তেই যদি যাবেন, তবে রান্না হোক না হোক তাতে কি যায় আসে। ভয় বলছিলেন আমার, কিরীট বাবু। কিন্তু ভয়ত দেখ্‌চি আপনার সব চাইতে বে । ছবিও দেখবার ইচ্ছা আছে বলচেন, অথচ অভুক্ত থাকবার আশঙ্কাটা কাটাতে পারছেন না।

কিরীট হেসে উঠ্‌ল এবং ব'ল্ল "না খেয়ে ছবি দেখতে কোন শঙ্কা হতে পারে না, মৈত্রী। তবে মিথ্যা মিথ্যি দিদির কথা ফেল্‌তে যাই কেন। খুব বেশী যদি হয় ছবি আরম্ভ হবার দশ মিনিট পরে হলে ঢুকব, এইত!"

মৈ—যদি ছবি দেখবই, তবে ছবি দেখাটাকে ওভাবে নষ্ট করার চাইতে দিদির কথা না শোনাই ভাল।

কি—তোমার অনেক মতকে আমি শ্রদ্ধা করি মৈত্রী কিন্তু যা, তুমি এখন বলচ, এ তোমার মত হতে পারে না। কি করে বোঝাই তোমায় ব্যাপারটা।

মৈ—বোঝাবার কিছু নাই ওতে।

কি—জীবনে কাজের পর্যায় ভেদ আছে। সব কাজেই স্বতন্ত্র হবার কোন আবশ্যক নাই। তুমি তোমার বাবার অমত জেনেও চাকুরীতে ঢুকেছ, তার একটা মানে আছে। কিন্তু ধর ধর আজ যদি তোমার ইচ্ছাও হয় আমার সঙ্গে চৌরঙ্গী সিনেমায় ছবি দেখবার তা হলেও তুমি নিশ্চয়ই যাবে না। কারণ এ ক্ষুদ্র ব্যাপারে নিজের স্বাতন্ত্র্য ফলাবার কোন আবশ্যকতা নাই।

কিরীটের কথা শেষ হতে না হতেই ঘরে ঢুকল হেমবালা ও ভাইকে দেখেই ব'ল্ল "তুই এসেছিস্ কিরীট, একটুখানি বসতে হবে। ঠাকুর বলচে মাংসটা সিদ্ধ হতে একটু সময় নেবে। তা কি আর হবে একটু দেরী হলে। দিদির ঘরকন্নার ত কত অসুবিধা! বৌ ঘরে এলে ত এসব কিছুই সইতে হত না (হাস্য) তা সে সৌভাগ্য আমাদের কখন হবে জানিনাত"।

এর পর হেমবালা মৈত্রীর কাছে ভায়ের বহু বিবাহ সম্ভাবনার গল্প করল, রত্না সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করতে ছাড়লে না। কিরীট দু-তিনবার ভুরু কুঁচ্‌কাইবার পর নীচে রাস্তায় সিগারেট কিন্‌তে গেল। অতিষ্ট হয়ে বেচারী মৈত্রী হেমবালাকে নিজের ক্ষিধের কথা জানাল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সবাই খেতে বসল।

মৈত্রী টক্ দই না খেয়ে আগেই অনুমতি নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠ্‌ল এবং কিরীট যখন দাঁড়িয়ে দিদির কাছে খাবার জন্য সিগারেট ধরাচ্চে তখন মৈত্রী এসে বল্ল "চলুন আমিও দেখে আসি চার্লির ছবি। হেমদি আপনার জেগে থাকবার কাজ নেই কিন্তু।"

রাত ন'টায় কিরীট ও মৈত্রী রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। (ক্রমশঃ)

পলাতক

"যাযাবর"

সীমাহীন, ঘন নীল পাহাড়ের কোলে সূর্য সবে ঢলে পড়েছে। গোধূলির লাল আলো এখনও নিঃশেষে মুছে যায়নি আকাশের বুক থেকে। পাহাড়ের নীচে, চা ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যার অন্ধকার এখনও ঘনিয়ে আসেনি। শরতের নীল, শুভ্র আকাশ—পূব আকাশে শুধু কয়েক টুকরো শাদা মেঘ। দূরে চা ঘরের চিমনি থেকে একটু একটু করে কালো ধূয়া বাতাসের সাথে কুণ্ডলী পাকিয়ে বা'পাশের নীল পাহাড়ের কোল বেয়ে ভেসে চলেছে মৃদু, মন্থর গতিতে। আধো আলো, আধো অন্ধকারে থরে, থরে সাজানো চা ঝোপগুলির সবুজ, সতেজ সৌন্দর্য প্রাণে দোলা দেয়। রক্ত রাঙা পাহাড়ীয়া পথটী চা ঝোপের আড়ালে কোথায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এই পথ বেয়ে ক্ষীণপ্রাণ, ধূসর মলিন মজুরের দল বস্তিতে ফিরে গেছে মৃদু, মন্থর গতিতে। এদের ক্ষীণ কোলাহল মুহূর্তের জন্য মুখরিত করে তুলেছিলো আশপাশের বনভূমি; এখন আর কাউকে চোখে পড়ছে না—

ধীরে, ধীরে রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে—গাঢ়, কালো অন্ধকার। চা ঘরের চিমনি আর চোখে পড়ছে না—রক্ত রাঙা পথটীও। সামনে, পেছনে চারিদিকে শুধু কালো, আর কালো। স্তব্ধ, মৌন প্রকৃতি নিদ্রার কোলে এলিয়ে দিয়েছে অলস, শিথীল দেহখানি। সরল গাছের ফাঁকে, ফাঁকে কুলি বস্তির স্তিমিত আলোক রশ্মিও আর চোখে পড়ছে না—এদের ক্ষীণ কোলাহল আর মাদলের আওয়াজ অনেকক্ষণ থেমে গেছে। তারস্বরে চীৎকার করে কে যেন গান গাইছে; তা'রই রেশটুকু মৃদু বাতাসে ভেসে আসছে।

চা ঝোপের আড়ালে সযত্নে আত্মগোপন করে এগিয়ে চলেছে অলক—স্বচ্ছন্দ, চঞ্চল গতি—এমনি কত রাত্রি যেন তার কেটে গেছে এই পথে। ত্রস্ত, কালো চোখ দুটী অন্ধকারে যেন আর ও বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পায়ে যেন কি ঠেকলো।······কিছু না,···গাছের শিকড় কেটে কে পথে ফেলে রেখেছে। পাহাড়ীয়া নালার কোল বেয়ে এগিয়ে চলেছে অলক···পাশের চা ঝোপটী সজোরে নাড়িয়ে দিয়ে কি যেন পালিয়ে গেল···শেয়াল···বন্য শূকর হয়ত বা, চকিতে থমকে দাঁড়ায়, কালো চোখের চঞ্চল দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় আশ পাশে। হিম, শীতল বাতাস গায়ে এসে লাগছে, আধ ময়লা ছিটের জামাটী যেন একে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না—এবার একটু দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ট্রলি লাইনের পাশ দিয়ে তীব্র আলো ফেলে একখানি মোটর ছুটে চলে গেল—বাগানের ম্যানেজার শিকার করে ফিরছে।

কুলি বস্তির সরু গলি বেয়ে এগিয়ে চলেছে অলক। গোবর আর পচা খড় জঞ্জাল জমে জমে সরু পথটী প্রায় অগম্য হয়ে উঠেছে। দু'পাশের নালা বুজে গিয়ে নালার জল পথে এসে দাঁড়িয়েছে—তা'রই পচা গন্ধ আবহাওয়াকে বিষাক্ত, ভারী করে তুলেছে। মানুষের সাড়া পেয়ে বস্তির

ক্ষুধিত, ক্ষীণপ্রাণ কুকুরগুলি ঘেউ-ঘেউ করে থেমে যায়—তেড়ে আসার সামর্থ নেই। দু'পাশের ঘন সন্নিবেশিত জীর্ণ খড়ের ঘরগুলির নীচু চাল এসে মাথায় ঠেকছে—অলক এগিয়ে চলেছে। ও দিককার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে, মেয়েলী স্বরে কে যেন কথাও বলছে। —এদিকের ঘরে কে যেন গুণ, গুণ করে গান গাইছে। পাশের বাড়ী থেকে টর্চ হাতে করে একটী লোক গলি পথে বস্তির বাইরে চলে গেল—হয়ত বা ষ্টাফের কোন বাবু।

মাথা নুইয়ে, পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে অলক সাবধানে, মন্থর গতিতে। বস্তির শেষ সীমায় চট ঝোলানো জীর্ণ খড়ের ঘরখানির সামনে অলক থমকে দাঁড়ায়—অন্ধকারে গা ঢেকে কে যেন দাঁড়িয়ে। চকিতে লোকটী কাছে এসে কি যেন বলে—দু'জনে চুপি, চুপি ঝোলানো চটখানি সরিয়ে ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। সামনের গলি বেয়ে আলো নিয়ে বুট পায়ে কা'রা চলে গেল।

ঘরের ভেতর মিট মিট করে কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে—কালো ধুঁয়া ঘরের বাতাস ভারী করে তুলেছে। কঙ্কালসার রোগ জীর্ণ চারটী লোক বসে আছে—স্তিমিত আলো এদের শীর্ণ মুখে এসে পড়েছে! স্তিমিত আলোতে অলকের পাণ্ডুর মুখখানি আরও পাণ্ডুর দেখাচ্ছে—লম্বা, রোগা চেহারা পরণে ময়লা খদ্দরের শাদা পায়জামা, হাটুর কাছে এক জায়গায় ছেঁড়া, গায়ে সেই আধময়লা ছিটের জামা, মাঁথায় অযত্ন বর্ধিত ঝাকড়া চুল। কারো মুখে কথা নেই নির্বাক বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে আছে অলকের পাণ্ডুর মুখের পানে। অলকের চোখের ইসারায় একটী লোক উঠে বাইরে চলে গেল—বোধ হয় পাহারা দিতে।

রোগা, পাণ্ডুর মুখখানি তুলে মৃদুকণ্ঠে অলক বলে—"রামদীন! এখানকার খবর সব ভাল?"

ঐ পাশের কালো, রোগা লোকটী মাথা তুলে আমতা, আমতা করে উত্তর দেয়—এখানকার সব খবরই ভাল। পর্বতপুরের সর্দারকে নিয়ে আজ কামারহাটীতে এক মিটিং হয়েছে, অনেক লোক এসেছিলো দু'চার দিনের ভেতরই ইউনিয়ন করা চলবে। কিন্তু······

জিজ্ঞাসু নেত্রে অলক তাকিয়ে থাকে।

নিঃশ্বাস নিয়ে মৃদুকণ্ঠে রামদীন বলে—"কিন্তু; পুলিশ আপনার খবর পেয়েছে। আজ তিন, চার দিন থেকে এদিকেই শুধু ঘুরছে—আজ দু'বার এসে এখানেও হানা দিয়ে গেছে—একটু আগে এই পথেই তা'রা গেল।"

অলকের রোগা, পাণ্ডুর মুখে বিষাদের ছায়া নেমে আসে না—মৃদু হেসে বলে—"সবই জানি রামদীন—আর জেনে শুনেই আজ এসেছি কাল এলেও হয়ত চলতো; কিন্তু এ অবস্থায় ত আর দেরী করা চলে না। কালই হয়ত আমি এখান থেকে চলে যাব তাই আজই আমাদের এখানকার

কার সমস্ত কাজ তোমাদের বুঝিয়ে দিতে চাই। বিলাসীকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু কমরেড্ দাসের সাথে তা'র দেখা হলো না। নইলে আজই তিনি আসতেন—যাক্ কালই তাকে পাঠিয়ে দেব—তোমাদের বোধহয় বিলাসীই খবর দিয়েছে ?"

"হ্যাঁ! কিন্তু সে বলছিলো আজ ক'দিন থেকেই আপনার জ্বর—তা জ্বর নিয়ে এই শীতের রাত্রিতে এখানে না এলেই কি চলতো না?" কথা ক'টী বলে অভিমান ক্ষুণ্ণ রামদীন মুখ ফিরিয়ে নিলে।

এ অভিযোগের কোন প্রতিবাদই অলকের দিক থেকে পাওয়া গেল না। হাতকাটা, বেটে, মোটা লোকটী অলকের সামনে এগিয়ে এসেছে। —"কমরেড্! একটী কথার উত্তর দেবেন কি? সেদিন বলছিলেন মৃত্যুর ভয়ে যারা পালিয়ে বেড়ায় তা'রা ভীরু—কাপুরুষ তা'রা যারা জেল, পুলিশ ভয় করে; কিন্তু আজ সবার আগে আপনিই ত ছুটে পালাচ্ছেন। সে'টী হবে না—আমাদের মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিয়ে আপনি পালাবেন—মরি যদি এক সাথেই সবাই মরবো।" সাঁওতাল রামজীবনের রুক্ষ কথাগুলির উত্তরে অলক হেসে বলে—"পালিয়ে আমি বেড়াই সত্যি; কিন্তু কেন জান? ···তোমরা মরতে দেও না বলে। নিজেদের জীবনের মূল্য তোমরা যেদিন বুঝবে—আমার কাজও ফুরাবে—হাসি মুখে সেদিন মৃত্যু বরণ করে নেব। সেদিন কিন্তু তোমাদের কাউকে দলে টানবো না।"

অলকের প্রদীপ্ত মুখের পানে চেয়ে অভিভূত লোক ক'টী মৌন আনুগত্য জানায়। কেরোসিনের ডিবেটী এখনও মিট্ মিট করে জ্বলছে।

মনে পড়ে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ষণ ঘন শ্রাবণ সন্ধ্যা—টিপ, টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে—বর্ষণের যেন আর বিরাম নেই। সামনের সরু লাল পথটী জলে, কাদায় নিবিড় হয়ে উঠেছে—। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে চা-ঝোপের আড়ালে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে অলক—ভেজা কাপড় জামা, টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। জল কাদা ঠেলে পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে ক্ষীণ-প্রাণ মজুরের দল নিঃশব্দ, মন্থর গতিতে। বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রাম ধারায়—এবার যেন বেগ একটু বেড়েছে। সরল গাছটীর নীচে দাঁড়িয়ে অলক—নিস্পন্দ, পলকহীন তার দৃষ্টি।

—"তারপর—আজকের ঘটনা ত নিজেই দেখলাম।"

"আজ আবার কি হলো।"

"শুননি, আশ্চর্য! নিধু মিস্ত্রী ত সেদিন কলে কাটা পড়লো; আজ তার বউ তিন, চারটে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে এসেছিলো সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাইতে—"

"তারপর?"

"তারপর আবার কি! দিলে না। বলে দিলে আবার এসে বিরক্ত করলে লাথি মেরে, মেরে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেবে—মেয়েটীর সে কি কান্না।"

"সাহেব সত্যি এ রকম বললে ?"

"সতি না ত মিথ্যে বললে নাকি। তাই বলছিলাম নিজেও কলে কাজ করি—কাচ্চা, বাচ্চা আমারও আছে—"

জল, কাদা পায়ে ঠেলে রোগজীর্ণ লোক দুটী এগিয়ে চলেছে। চকিত বিস্ময়াবিষ্ট অলক এদের পিছু নিলে। এমনি করেই হলো প্রথম পরিচয়। প্রথম পরিচয়ের জড়তা আজ আর নেই। অলক আজ এদেরই একজন—এরা ভাবতে পারে না অলক অন্য কেউ, তার ও থাকতে পারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বতন্ত্র সত্বা। এরা ভাবতে পারে না অলক কোন দিন তা'দের ছেড়ে যাবে—অলক না থাক্‌লে জীবন যে তা'দের শূন্য, অন্ধকার; তাই রামজীবন আজ এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। অলক নিজেই অবাক হয়ে যায় আজ এদের নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণ আর দৃঢ় বিশ্বাস দেখে। একদিন এই রামজীবনই বলেছিলো—"চালাকি পেয়েছ চাঁদ—এখানে দালালি করতে এসেছ না ? সেটী হবে না। জোয়ান ছেলেদের ভুলিয়ে নিয়ে যুদ্ধে পাঠাবে—জোচ্চোর কাহাকার—বেরিয়ে যাও—"। সেদিন এমনি অনেক কথাই শুনতে হয়েছে—আর আজ ?

কেরোসিনের ডিবেটী কয়েকবার দপ্‌ দপ্‌ করে নিভে গেছে। দাওয়ার লোকটী চটখানি একটু টেনে দিয়ে ঘরের ভেতরে এসে বসেছে।

* * * * *

স্তব্ধ মৌন রাত্রি, চারদিকে ঘন কালো অন্ধকার—নীল আকাশের পটভূমিকায় জ্বল জ্বল করছে অসংখ্য তারা—তারই ছায়া পড়েছে পাশের নালার জলে।

"আর এসে কি হবে ? এবার তুমি না হয় যাও।"

"আর কতটুকুই বা পথ—আপনাকে গেট্‌ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েই ফিরবো।"

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চা-ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে এগিয়ে চলেছে অলক, পেছনে রামদীন। পাহাড়ীয়া দেশ—শরৎ শেষ না হতেই এদিকে বেশ শীত পড়ে গেছে। শিশির সিক্ত চা-ঝোপগুলি যেন নিস্পন্দ, অসাড়,—উপরের সরল গাছগুলির সরু, চিকন পাতা বেয়ে শিশির ঝরে পড়ছে টপ্‌ টপ্‌ করে নীচের চা-ঝোপগুলির মাথায় আর তারই মৃদু শব্দ এসে কানে বাজছে। শিশির সিক্ত পথে এগিয়ে যেতে পরণের কাপড়, জামা ভিজে উঠেছে। ভোর হওয়ার বোধহয় আর বেশী দেরী নেই, ভোরের হিম, শীতল বাতাস এসে গায়ে লাগছে—পূব আকাশ এরি মধ্যে বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

পাহাড়ীয়া নদী বয়ে চলেছে ক্ষীণ, স্বচ্ছ ধারায়। বর্ষার সেই ফেনিল কলোচ্ছাস আজ আর নেই যেন কোন্ মায়ার পরশে জরা এসে নিঃশেষে মুছিয়ে নিয়ে গেছে যৌবনের আনন্দোচ্ছাস।

এখান থেকেই পরস্পরের নিকট বিদায় নিতে হবে। ভাব শিথিল, অবশ হাতখানি রামদীনের কাঁধের উপর রেখে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে অলক। বিদায়ের মুহূর্তে আজ যেন এদের ভাষা ফুরিয়ে গেছে—কে জানে, হয়ত এরপর দেখা এজীবনে আর নাও হতে পারে।

রামদীন, অশিক্ষিত রোগ জীর্ণ মানুষটী—কে জানে, কিসের প্রভাব আজ তাকে এমনি মাতাল করে তুলেছে? কিসের প্রভাব এই ফর্সা, রোগা মানুষটীর পেছনে তাকে টেনে এনেছে নিশ্চিত বিপদের মাঝে—রাত্রির গভীর অন্ধকারে। এর পরিণাম, ভাবলে গা শিউরে উঠে।

দূরে আবছা অন্ধকারে চা ঘরের চিমনি প্রেতের মতন দাঁড়িয়ে আছে; হয়ত এখনি বিভৎস চীৎকারে সুপ্তির কোল থেকে কর্ম-ক্লান্ত মানুষগুলিকে সচকিত করে তুলবে। অলক চোখ ফিরিয়ে নিলে। এদিকে তাকালেই এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় প্রাণ কেঁদে উঠে।

"রামদীন, ভোর হয়ে গেছে এবার তুমি ফেরো।"

নির্বাক রামদীন কোন সাড়াই দেয় না—ফ্যাল, ফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে থাকে।

"তোমাকে তো আবার বাড়ী ফিরে কাজে বেরুতে হবে আর দেরী করোনা। তোমাকে ও নতুন করে বলবার কিছুই নেই। আমাদের আদর্শ—আমাদের মূলমন্ত্র সামনে রেখে এগিয়ে যাও সাফল্য আসবেই। কমরেড্ দাসকে বলে যাব, তিনিই এখন থেকে তোমাদের সমস্ত কাজ করে দেবেন তাকে যেন সবাই মেনে চলে।"

ঘাড় নেড়ে রামদীন মৌন সম্মতি জানায়।

"আমার আজকের এই নৈশ অভিযান পুলিশের হয়ত অজানা থাকবে না—যা' বলে গেলাম মনে রেখো।"

শেষ বারের মত পায়ের ধূলো নিয়ে রামদীন ব্যথিত অন্তরকে সান্ত্বনা জানায়। হাত তুলে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে পাহাড়ীয়া নদীর কোল বেয়ে এগিয়ে চলেছ অলক স্বচ্ছন্দ, চঞ্চল গতিতে। এখনও ভাল করে ফরসা হয়নি—রোগা, ফর্সা মানুষটী একাই এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের পথে—কেউ জানেনা···কি তার উদ্দেশ্য···কি তার লক্ষ্য···। পায় জুতো নেই···পরণে কাপড় নেই···এই শীতে গায়ে একখানা গরম কাপড় পর্যন্ত নেই···দু'দিন হয়তো চারটে ভাতও জুটবে না। পাহাড়ের পথে একা চলেছে···কোন ভাবনা নেই—আত্মরক্ষার জন্য একগাছি লাঠিও হাতে নেই···সামনের বাঁক ঘুরলেই দিগন্তব্যাপী, সীমাহীন নীল পাহাড়ের কোলে তার শীর্ণ দেহখানির অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপর······

রামদীন আর ভাবতে পারে না—শীর্ণ হাতখানি তুলে চোখের জল মুছে নেবার বৃথা চেষ্টা করে। অলকের রোগা শীর্ণ দেহখানি এখনও বাঁকের আড়াল হয়ে যায় নি—মুগ্ধ রামদীন উৎসুক দৃষ্টি মেলে এখনও সে'দিকেই তাকিয়ে আছে।

কে জানে, এই মানুষটী অশিক্ষিত রামদীনের কতটুকু নিয়ে গেল?

নষ্টনীড়

মালবিকা রায়

সেদিন ছিল মাঘী পূর্ণিমা। কুহেলীর ওড়নায় তনুদেহটী ঢেকে অভিসারিকা পূর্ণিমা চলেছে তার পরমপ্রিয়র কাছে সর্বাঙ্গে ফুলের গন্ধ মেখে। এই কথাগুলি এতক্ষণ অনুভা বলছিলো উচ্ছ্বসিত স্বরে। শুভেন্দু এতক্ষণ গালের উপর হাত রেখে আধশোয়া হয়ে বসেছিল, এবার উঠে হো হো করে হাসতে লাগলো।

"হাসলে যে!" অনুভা বললো ক্ষুব্ধ স্বরে।

"হাসবার কথা শুনেও হাসতে পার্বো না;"

"এর মধ্যে হাসবার তুমি কি পেলে?" অনুভা সাভিমানে উত্তর করলো, "সে কথা পরে বলা যাবে, আপাতত ঘরে চল। বাবা, জ্যোৎস্নায় বসে কবিত্ব করা কি সোজা কথা? জ্যোৎস্না দেখলে সত্যি বলছি, অনু, ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে যায়। কেবলি মনে হয়, কাল সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে যাবে আর ২।৫ দিন ল্যাবরেটরিতে যাওয়া বন্ধ থাকবে।"

খানিকক্ষণ স্তব্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে অনু হঠাৎ বলে ফেল্‌লো "তুমি জ্যোৎস্নাও ভালবাস না? ফুলও ভালবাস না?

হো, হো করে হেসে শুভেন্দু বল্‌লে, "ফুল আর জ্যাৎস্না নিয়ে তোমাদের জগৎ চলে, অনু! ও সব তোমাদেরি পোষায়।"

অনু ওর মুখের দিকে চেয়ে কি জানি কেন হঠাৎ দ্রুতপদে লন অতিক্রম করে ড্রয়িংরুমে ঢুকে গেলো। প্রকাণ্ড লনটা ততক্ষণে প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে, কেবল এক কোনে প্রভাস আর মীরা বসে গল্প করছিলো। এখন প্রভাস উঠে যেতে মীরা এসে অনুর স্থান অধিকার করে বসে বললে, "অনু হঠাৎ অমন করে উঠে চলে গেলো কেন?" সে অনুর দ্রুতপদে চলে যাওয়া লক্ষ্য করেছিলো। শুভেন্দু কৃত্রিম উদাসীনতা দেখিয়ে হাত উলটে বললো, "কি করে বলবো বলুন? আপনাদের মেয়েদের কথা আপনারা মেয়েরাই বোঝেন। তবে আমারো একটু দোষ হয়েছে তা স্বীকার করছি। অনু এতক্ষণ ধরে আমাকে সন্ধ্যার আঁচল, জ্যোৎস্নার চাদর, আর চাঁদের চশমা দেখাবার চেষ্টা করছিলো। আমি কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না, তাই বোধ হয় রাগ করেছে।"

মীরা বিস্মিত হয়ে বললো "চাঁদের চশমাটা কি জিনিষ শুভেন্দু বাবু?" শুভেন্দু বললো, "আমি-ও কি ছাই বুঝেছি। ওটা অনুকেই জিজ্ঞেস করবেন। চলুন ঘরে চলুন। আপনাদের কি শীতও লাগে না?

"কোথায় শীত, কি যে বলেন আপনি," মীরা হেসে জবাব দিল, শুভেন্দু উঠতে পারি দাঁড়ালো। দাঁড়াবার সময় ওর কোল থেকে এক আধফোটা রক্ত গোলাপ গড়িয়ে পড়ে মীরা সেটা কুড়িয়ে দিয়ে বললো, "এই নিন আপনার গোলাপ।" শুভেন্দু বললো, "আপনিই ও নিন, মিস ঘোষ। অনু ওটা দিয়েছিলো সন্ধ্যা বেলা। এই দেখুন না এই গোলাপটা তুলবার সময় অনু বললে কি 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ।' এতগুলো লোক ছিলাম কারো কানে গেলো না কুঁড়ির কান্না, যত কানে গেলো অনুর। নাঃ মেয়েদের নিয়ে কারবার করা ভারি মুস্কিল।"

মীরা চলতে চলতে বললো, "কুঁড়ির কান্না কি সব লোক শুনতে পায়, শুভেন্দু বাবু। কুঁড়ির কান্না শোনবার মত কান যেদিন পাবেন—" বাধা দিয়ে শুভেন্দু বললো, "দোহাই আপনার, অত সৌভাগ্যে আমার কাজ নেই। দুটো কান রয়েছে তাতেই সময় সময় মনে হয় একটা কান থাকলে ভালো হোত, গালমন্দগুলো একটু কম শুনতে পেতাম। তার উপর আপনাদের অভিশাপে তিনটী কান হোলেই হয়েছে, মনে মনে যে সব গাল মন্দ দিবেন তাও শুনতে পাবো।"

মীরা হেসে ফেললো। বললো, "সব ত বুঝলাম কিন্তু অনুকে তার জন্মদিনে এমন করে রাগিয়ে দিলেন কেন বলুন ত?" শুভেন্দু বললো "দেখুন, আমি ওকে মোটেই রাগাতে চাইনি। কেবল জন্মদিন বলেই আজ এক ঘণ্টা ধরে পাগলের প্রলাপ শুনেছি।"

দুজনে ড্রইংরুমে যখন ঢুকলো, অনুভা তখন পিয়ানো বাজিয়ে গান ধরেছে।

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা।" অনুভা সুগায়িকা। সে আজ সমস্ত মনপ্রাণ নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে গান করছে। সকল শ্রোতাই মুগ্ধ। নূতন সিভিলিয়ান নিশীথ বাবু ত এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন তিনি বহু কষ্টে আবেগ চাপছেন। শুভেন্দু ড্রইংরুমে ঢুকে অত্যন্ত অস্বোয়াস্তি অনুভব করতে লাগলো। সত্যই তার আর বেশীক্ষণ বসবার সময় ছিল না। সে বেলা ৫ টার সময় এসেছিল এখন ৭৷৷০ টা বাজতে চললো। শুভেন্দু গান শেষ হবার অপেক্ষায় একটুখানি বসে রইলো। কিন্তু অনুভা তখন সুদীর্ঘ গানটী চরণের পর চরণ গভীর আবেগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে চলেছে। গান শেষ হতে দেরি আছে দেখে শুভেন্দু অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অনুর দিকে চেয়ে বললো, "অনু, আর আমার বসবার সময় নেই, আমি চললাম।" কোনদিকে আর না চেয়েই শুভেন্দু বেরিয়ে পড়লো।

অনু চমকে উঠলো। স্বর্গ রাজ্য থেকে কে যেন তাকে ঠেলে ফেলে দিলো। তার গলা কেঁপে উঠলো, এবং হঠাৎ গানের স্কেল চেঞ্জ হয়ে গেলো।

মিসেস গাঙ্গুলী চশমার ভিতর দিয়ে অনুর দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেটীকে ত চিনলাম না।"

অনু জবাব দেবার আগেই মীরা বলে উঠলো ; উনি শুভেন্দু বিশ্বাস ; এম এস্‌সিতে ফাষ্ট ..., তি এন্‌সির জন্য রিসার্চ করছেন। মিসেস গাঙ্গুলী তেমনি ভাবেই ভুরু কুঁচকে বললেন, ..., কিন্তু কি manners !"

নিশীথ উৎসাহিত হয়ে বললো, "দেখুন লেখাপড়াটা আসল জিনিষ নয়। আসল জিনিষ হচ্ছে কাল্‌চার। Tagore বলেন—"

বাধা দিয়ে মীরা বললো, "শেষের কবিতা থেকে কোট করতে চান ত ? 'শেষের কবিতা' সকলেরি পড়া।"

নিশীথ কিছু বলবার আগেই অনু মিউজিক টুল থেকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সকলের দিকে চেয়ে বললো, "আমি আজ অত্যন্ত ক্লান্ত। আশা করি সেজন্য আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করবেন। মীরা, তুমি এঁদের একটু দেখাশোনা করো। আমি আজ আর পারছিনা। নমস্কার।" কারো অনুমতির অপেক্ষা না করেই অনু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

নিশীথ অত্যন্ত ম্লান হয়ে উঠলো। সকলেই যেন কেমন হয়ে গেলো। মিসেস গাঙ্গুলী পুনরায় কিছু মন্তব্য প্রকাশ করবার আগেই মীরা নিশীথের পাশের চেয়ারটীতে বসে বললো, "নিশীথবাবু, হঠাৎ এত ম্লান হয়ে গেলেন যে ?" অনুভার প্রতি আকর্ষণের কথা নিশীথ কোনদিনই গোপন করতে চায় নি, আজও করলো না। একটু ক্ষীণ হাসি হেসে বললো, "চন্দ্র না থাকলে নিশীথ ত ম্লানই হয়, মিস ঘোষ।"

মীরা হাসলো। বললো, "খুব powerful electric light-এও কি কিছু হয় না ? দেখা যাক চেষ্টা করে, কি বলেন ? একটা গান গাই কেমন ?" নিশীথ ও লোকেশ দুজনেই বলে উঠলো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ গানই করুন, ভালো লাগছে না কিছু।"

সঙ্গীতে মীরার যথেষ্ট দখল ছিল। তার গান সকলকেই আনন্দ দিল। মীরা বললো, আপনি আমাকে গানের একটা সার্টিফিকেট লিখে দেবেন, নিশীথবাবু ? সিভিলিয়ানের সার্টিফিকেট বিয়ের সময় কাজে লাগবে।"

লোকেশ হেসে বললো, "সিভিলিয়ানের সার্টিফিকেটও বুঝি আজকাল বিয়ের সময় দরকার হচ্ছে ?" মীরা বললো, "ব্যাপার প্রায় তাই দাঁড়িয়েছে। আজ দরকার হচ্ছে না, কিন্তু কাল হবে। আজকাল কনে দেখতে এসে লোকে বলে ক'টা পাশ ? এরপর জিজ্ঞাসা করবে, তুমি সব শুদ্ধ ক'টা ছেলেকে মুগ্ধ করেছ ? ক্রমশঃ ক্রমশঃ নিয়ম বদলাবে, বুঝছেন না ?" সকলে হেসে উঠলো। এমনি করে হাসি গল্পের পর সভা ভাঙ্গলে মীরা প্রভাসকে বললো, "আচ্ছা, আমি যে এত দুষ্টুমি করি, তুমি রাগ কর না ত ?". প্রভাস হেসে বললো, "নিশ্চয় করি, কিন্তু শেষ অর্থে।" মীরা বললো, "অন্য কেউ হলে কিন্তু সত্যিই রাগ করতো।" স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে

মীরার দিকে চেয়ে প্রভাস বললো, "তোমাকে এ রকম দুষ্টুমি ছাড়া আমি কল্পনাই করতে পারি না, মীরা।"

সোনার কাঠির পরশ পেয়ে প্রথম যখন ঘুম ভাঙলো, প্রথম যৌবনের সেই সোনার মুহূর্তটিতে জীবনের সকল আশা সকল আনন্দ সকল ভালবাসা অনুভা যাকে দান করেছিলো সে শুভেন্দু! নিজেকে সে যে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিয়েছে শুভেন্দুর কাছে এ কথা প্রথম সে টের পেলো সেদিন, যেদিন শুভেন্দুর উপেক্ষায় ওর বুকের ভেতরটা অসহ্য বেদনায় কেঁদে উঠলো।

শুভেন্দু ছিল একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। মেয়েদের ও কোনদিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারত না। ও বলত পুরুষের জীবন সংগ্রামের, আর মেয়েদের জীবন বিলাসের।

অনুভা শুনে রাগ করতো, বলতো, "তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে কি জান বলত? ক'টা মেয়ে দেখেছো?" শুভেন্দু হেসে বলত, "কেন তোমার বান্ধবীদের! সব মেয়েই সমান বুঝেছ, অনু।" অনুর মন অভিমানে পূর্ণ হয়ে যেতো কিন্তু ও কোন কথাই বলতো না।

কিন্তু মানুষের সহ্যেরও সীমা থাকে, অনুরও সহ্যের সীমা ছিল। তাই নিশীথ যেদিন তাকে প্রথম প্রণয় জ্ঞাপন করলে ও চুপ করে শুনলো, কিছু বাধা দিলো না। নিশীথ বললো, "তোমাকে আমার চাই, অনু, তুমি না হলে আমি বাঁচতেই পারবো না।" অনুর শিরায় উপশিরায় কি যেন এক তাণ্ডবলীলা সুরু হোলো। যাকে সে ভালবাসে সে তাকে চায়না। কিন্তু তা বলে আর এক পুরুষের প্রেমকেও সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

অল্প দিনের মধ্যেই রাষ্ট্র হয়ে গেলো সিভিলিয়ান নিশীথ সেনের সঙ্গে বিখ্যাত ডাক্তার অতুল রায়ের একমাত্র কন্যা অনুভার বিয়ে। মীরাও কথাটি শুনলো, কিন্তু বিশ্বাস করলো না। সেদিন দুজনের মধ্যে এই নিয়ে কথাবার্তা হোলো। মীরা বললো, "আমার বিশ্বাস হয় না যে এ বিয়ে তোর মতে হচ্ছে।"

শান্ত সুরে অনুভা বললো, "কেন হয় না? অনিশ্চিতের পেছনে ছুটে ছুটে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" ব্যথিত দৃষ্টিতে মীরা ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তার ভাব দেখে অনুভা বললো, "চুপ করে রইলে যে? কিছু উপদেশ দিতে চাও? বেশ..." বাধা দিয়ে মীরা বললে, "না, না, কি যে বলো। উপদেশ তোমায় দেব কেন? এ ব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি না করলেও পারতে। বিশেষতঃ যা অনিশ্চিত ভাবছ তাকে নিশ্চিত করে কোন কাজ করলেই ভালো হোতো।"

অনু উঠে দাঁড়ালো। উত্তেজিত স্বরে বললো, "কি বলছো তুমি?" মীরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, "আমি কিছুই বলছি না। তুমি বুঝে কাজ করতে পারো এমন বয়স তোমার হোয়েছে।"

মীরা চলে যাওয়ার পর সমস্ত দিনটা কি-এক অদ্ভুত অসহিষ্ণুতার সঙ্গে কেটে গেলো। সে অনেক ভাবলো। কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারলো না। শুভেন্দু আজ ক'দিন আসে নি। সে কথাটা অনুর সব সময়ই মনে হতো। জলে ডুববার সময় লোক যেমন সামান্য কুটোটিকেও আঁকড়ে ধরতে চায়, অনুও আজ তাই করলো। শুভেন্দুর এই কদিনের অনুপস্থিতিকে ও আজ অন্য অর্থে গ্রহন করলো। শুভেন্দুর বাড়ী ও অনেকবার গেছে। শুভেন্দুর বৌদির সঙ্গে ওর খুব আলাপ আছে। অনু ঠিক করলো আজ শুভেন্দুর বাড়ী সে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা সে যখন মোটরে করে বার হোলো তখন আশা নিরাশার প্রচণ্ড দোলায় ওর বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। শুভেন্দুর দরজায় নেমে ওর মনে হোলো ও বোধ হয় আর চলতে পারবে না, ওর পা এতো কাঁপছে। মুহ্যমান দেহমন নিয়ে যখন সে শুভেন্দুর পড়বার ঘরে এসে দাঁড়ালো, তখন শুভেন্দু একমনে কি সব লিখছে। ও প্রথমে অনুকে দেখতে পায়নি। তারপর যখন দেখতে পেলো তখন বলে উঠলো, "আরে অনু যে এসো, এসো। তার আনন্দিত স্বরে অনুর বুকের ভিতর কেমন যেন করে উঠলো। এতখানি আনন্দ ও আশা করে নি। তবে কি ও যা ভেবেছে তা নয়! অনু শুভেন্দুর সামনে একটা চেয়ার টেনে বসলো। শুভেন্দু ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললো' "নেমন্তন্ন চিঠি নিয়ে এসেছ ত? বাঃ বাঃ, অমনি খাবারের মেনুটাও শুনিয়ে যাও। নিশ্চয় জানো তুমি কি কি খাবার হবে।"

ওর কথা শুনে অনু স্তব্ধ হয়ে গেলো। শুভেন্দুর ত কোথাও কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে কি—না না অনু আর ভাবতে পারে না। অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে অনু বললো, "এ কদিন আমাদের ওখানে যাও নি কেন?" শুভেন্দু হেসে বললো, "গিয়ে কি নিশীথবাবুর অভিশাপ কুড়োবো; কিন্তু তা নয় অনু। ক'দিন ল্যাবরেটারিতে এত কাজ পড়েছিলো যে কোথাও যাবার সময় পাইনি একবারও। তুমি বুঝি রাগ করেছ?" বলে অনুর মুখের দিকে চেয়ে ও অবাক হয়ে গেলো। বললো, "অত গম্ভীর কেন অনু, কি হয়েছে?".

এবার আর অনু পারলে না দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললো, "চিরদিনই কি তোমাকে বলে দিতে হবে কি হয়েছে? তুমি কি কিছুই বোঝ না।"

অশ্রুজলের বন্যায় ও একেবারে ভেঙ্গে পড়লো টেবিলের ওপর। শুভেন্দু হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। তার বিস্মিতকণ্ঠ থেকে শুধু বেরোলো, "সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না, যার জন্য—"

অশ্রুসিক্ত মুখ টেবিল থেকে তুলে রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করে অনু বললো, "যার জন্য, যার জন্য আমার জীবন বিষিয়ে গেলো-সে তুমি।" আবার অশ্রুর ভারে ভেঙ্গে পড়ে অনু বললো, "ওগো একটু বোঝ তুমি, একটু বোঝ। আমি যে আর পারি না।"

স্তব্ধ বিস্ময়ে শুভেন্দু কিছুক্ষণ বসে রইলো। তার পর ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, "আমি বুঝেছি, অনু। তুমি ত জানো আমার জীবনের সাধনা হচ্ছে আমার রিসার্চ, এ ছাড়া যে আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। আমাদের জীবন সংগ্রামের ভাবের স্রোতে ভেসে গেলে ত আমাদের চলবে না, অনু। সে যাক্, তুমি সুখী হবে, এ আমি বলছি। এটা কিছু নয়। তুমিও পরে বুঝবে।"

শুভেন্দুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনু উঠে দাঁড়ালো। দুই চোখ থেকে অশ্রুর সমস্ত চিহ্ন সে মুছে ফেলেছে। শুষ্ক চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে। সামনের বিপর্যস্ত চুলগুলিকে সরিয়ে সে শুভেন্দুর পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে বললো "মেয়েদের তুমি ভালবাসতে পার না, তার কারণ কি জানো? তুমিই মেয়েদের ভালবাসার যোগ্য নও। আজ যাদের ঘৃণা করছ এমন দিন আসবে যেদিন এদের ভালবাসার অভাবই তোমার জীবনের একমাত্র অভাব হবে, সেদিন আমাকে মনে কোরো।" শুভেন্দুকে বিস্ময় বিমূঢ় করে ঝড়ের মত অনু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

অনুভার বিয়ের পর দেড়বছর কেটে গেছে। বিয়ের পরই নিশীথ নব-পরিণীতা বধূকে নিয়ে সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিল। দেড় বছর পরে আজ কলকাতায় ফিরে এসেছে। সেই উপলক্ষে অনুভার পিতা মাতা নিজেদের বাড়ীতে একটা প্রীতিভোজ দিচ্ছেন। শুভেন্দুরও নিমন্ত্রণ ছিল। শুভেন্দু যখন সেখানে পৌছলো তখন ৭টা বেজে গেছে। হলঘর পরিচিত এবং অপরিচিত মুখে ভর্তি। কে একটী মেয়ে পিয়ানো বাজিয়ে গান করছে। শুভেন্দু প্রথমে মেয়েটীকে চিনতে পারলো না। কিন্তু গান শেষ করে মেয়েটী উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দু তাকে দেখে চমকে গেলো। অনুর সঙ্গে তার দেড় বছর পরে দেখা। আজ প্রথম দিনেই সে বুঝে নিল অনুর পরিবর্তন হয়েছে। অনু সুন্দর, কিন্তু আজ এই সুন্দর মুখের উপর যখন সে রুজ পাউডারের প্রলেপ দিয়ে, ঠোঁটে লিপষ্টিক লাগিয়ে চোখে সুরমা দিয়ে কৃত্রিম হাব ভাব প্রকাশ করতে লাগলো, শুভেন্দু সমস্ত মনটা যেন এক নিমিষে একবারে বিষিয়ে উঠলো। অনুভা যখন অনাবৃত বাহু দুলিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন ওর মনটা এত ঘৃণাপূর্ণ হয়ে গেছে যে ওর মুখ থেকে একটা শব্দ পর্যন্ত বেরুল না। অনু কিন্তু অপ্রস্তুত হোল না। ও কৃত্রিম হাসি হেসে "হা ড্যু, ড্যু শুভেন্দুবাবু" বলে হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলো। শুভেন্দু নিশ্চল হয়ে বসে রইলো। ওপাশ থেকে লোকেশ ডাকলো "Mrs. Sen," "Oh yes," বলে কায়দা করে উঠে দাঁড়ালো অনু। লোকেশ বললো, "বাঃ গান হয়ে গেলো বুঝি? আর গাইবেন না?" মিহির বোস বললো, "আপনার গান শুনে আশ মেটে না, মিসেস্ সেন।" মিহিরের সামনে ঝুঁকে তাঁর দিকে একটা কটাক্ষ করে অনু বললো, "আমাকে দেখেই কি আশ মেটে?" শুভেন্দুর সত্যিই বসে থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ও নিঃশব্দে

বারান্দায় বেরিয়ে এলো। বাগানের দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবলো, "ওঃ বেঁচে গেছি খুব বেঁচে গেছি আমি। এই ছলনাময়ীর ছলনায় ভুলে নিজের সাধনাকে বিসর্জন দিই নি, নিজেে নষ্ট করিনি। উঃ খুব বেঁচে গেছি। আমি মেয়েদের চিনেছিলাম, তাই তাদের অশ্রুজলে ভুলিনি ওঃ বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি আমি।" কিন্তু আশ্চর্য এই যে আজ নিজেকে বাঁচাবার এত বড় শক্তি উপলব্ধি করেও শুভেন্দু যেন সম্পূর্ণ আনন্দ পেল না। কি একটা বেদনা যেন বুকের মধ্যে ছোট কাঁটার মত কেবলি খচ্ খচ্ করতে লাগলো।

অনুভার বাড়ী থেকে ফিরে আসার পরেই শুভেন্দু প্রতিজ্ঞা করলো এই ছলনাময়ীর সঙ্গে সে আর কোন সম্পর্কই রাখবেনা। সে নিজের পড়ার মধ্যে ডুবে গেলো। কিন্তু কি যেন একট হয়ে গেছে। কোথায় কি যেন হারিয়ে গেছে। শুভেন্দু আজ প্রথম উপলব্ধি করলো, যে পড়ার ভিতর সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সে পড়ার ভিতরও সে যেন আর তেমন তৃপ্তি পাচ্ছে না। ও কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেও শুভেন্দু কিছুই করতে পারলো না।

কয়েক মাস কেটে গেছে! শুভেন্দু এখন লক্ষ্ণৌএর প্রফেসার। ডি এস সি রিসার্চ শেষ না হতেই ওর প্রফেসারি নেওয়ায় সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলো। শুভেন্দু বুঝিয়ে বললো, দাদার ত বয়স বাড়ছে। এখন ওঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। আমি যদি সংসারের ভার না নিই তাহলে ওঁর বিশ্রাম করা অসম্ভব। দাদা, বৌদি শুনে ক্ষুণ্ণ হলেন। বাধা দিলেন, কিন্তু ফল হোলো না। আসল কথা শুভেন্দু নিজের ভিতর একটা পরিবর্তন অনুভব করছিলো। কলকাতা ওর পক্ষে কি জানি কেন অসহ্য হয়ে উঠেছিলো। সে নিজেকে বোঝাচ্ছিল ও সব কিছু নয়। সে চাকরী করতে বিদেশে যাচ্ছে। সে কোনদিনই দুর্বল নয়। সুন্দরী নারীর হাসি, চোখের জল, প্রণয় নিবেদন কিছুই ওকে টলাতে পারে নি কোন দিন। ও সেই শুভেন্দু।

ছয় মাস হোলো শুভেন্দু লক্ষ্ণৌতে এসেছে। এর মধ্যে যা দেখার ছিলো সব দেখা শেষ হয়ে গেছে। কাজেই বেশীর ভাগ সময় বাড়ীতেই কাটায়। আজ সকালে কলকাতার ডাক এসেছে। প্রথম চিঠিটা ও খুলে দেখলো মীরা লিখেছে—'শুভেন্দু বাবু, একবার কলকাতায় আসতে পারেন না কয়েক দিনের জন্য? আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। অনু ক্রমশঃ অধঃপাতে যাচ্ছে। তাকে রক্ষা করতে আপনিই পারবেন। একবার আসুন, লক্ষ্মীটি।"

চিঠি পড়ে শুভেন্দু জ্বলে উঠলো। অনু অধঃপাতে যাচ্ছে তাতে তার কি। মীরা কি তাকে আজও চিনতে পারে নি। সে চিঠি রেখে ওর দাদার চিঠি পড়লো। দাদা লিখেছেন, "আমার শরীরটা বড় খারাপ যাচ্ছে, শুভু, তুই যদি পারিস, তবে দিনকয়েকের জন্যও আয়। তোকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।"

কলকাতা যাবার ট্রেনে উঠে শুভেন্দু কেবলি নিজের মনকে এই বলে বোঝাবার চেষ্টা করছিলো। সে যাচ্ছে দাদার আহ্বানে। এর মধ্যে অন্য কোন কারণ নেই। অন্যবারের মত মন কিন্তু এবার এ কথায় ভুলছিল না। শুভেন্দু আজ নিজে ভেবে অবাক হোলো এ কি করে সম্ভব হোলো। একটী নারীর আহ্বান আজ তাকে এই সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে অপর একটী নারীর প্রয়োজনে। শুভেন্দু কি করে এত দুর্বল হোলো। যে শুভেন্দু একদিন নারীর চোখের জল উপেক্ষা করেছিলো হাসি মুখে এ কি সেই শুভেন্দু ? কি জানি !

কলকাতায় পৌঁছে সন্ধ্যাবেলা শুভেন্দু গেলো মীরার কাছে। মীরা তখন প্রভাসের সঙ্গে বসে গল্প করছিলো। শুভেন্দুকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বল্লো, "মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করুন, শুভেন্দু বাবু, আমি প্রভাস বাবুকে গাড়ীতে তুলে দিয়েই আসছি।"

শুভেন্দুকে নমস্কার করে প্রভাস মীরার সঙ্গে বেরিয়ে গেলো। শুভেন্দু দুই একবার পায়চারী করে, ঘরের জিনিষ পত্রগুলো নেড়ে চেড়ে আবার অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ারে এসে বসলো। এ-পাশ ও-পাশ চাইতে চাইতে হঠাৎ ওর চোখে পড়লো বারান্দায় দুটী ছায়ামূর্তির দিকে। ও বিস্মিতভাবে চেয়ে দেখলো ছায়ামূর্তি দুটী একটী পুরুষের অপরটী নারীর। ও তাদের চিনলো— প্রভাস ও মীরা, পরস্পর হাতে হাত রেখে রেলিং এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কি হোল ; শুভেন্দু এই ছায়ামূর্তির উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারলো না। তার কেবলি মনে হতে লাগলো এই ছায়ামূর্তি দুটীই যেন বিধাতার নশ্বর সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কেবলি মনে হতে লাগলো জগৎ কি আশ্চর্য, কি অসীম এর রহস্য, কি অপার এর মহিমা। বারে বারে বুকের ভিতর দুলে উঠতে লাগলো পুলকে, বেদনায়।

হঠাৎ সে মীরার স্বরে চমকে উঠলো। "আমার বড্ড দেরি হয়ে গেলো কিছু মনে করবেন না।" শুভেন্দু মীরার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। আজ প্রথম তার মনে হোলো মীরার চোখে এমন একটা জিনিষ আছে যা সে পূর্বে কখনো লক্ষ্য করেনি।

মীরা ওর পাশের চেয়ারে এসে বসে বললো, "দেখুন, ভূমিকা করে কথা বলা আমার স্বভাব নয়। তাই ভূমিকা না করেই জিজ্ঞাসা করছি, আপনি সত্যিই নিজের মধ্যে কোন পরিবর্তনই অনুভব করেন না ? আপনি এই লক্ষ্ণৌ থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে আপনার পক্ষে, উত্তর দিচ্ছেন না যে ?" মীরা উৎসুক দৃষ্টিতে শুভেন্দুর মুখের দিকে চাইলো। শুভেন্দু মুখ নীচু করে রইলো। পরিবর্তন সে ত অনুভব করছে, কিন্তু কাকে সে কথা বলবে। এ কথা সে যে নিজের মধ্যেই কত গোপন রাখছে। এ কথা কি মীরাকে বলা যায় ?

তার মুখের দিকে একটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে মীরা বললো, "তবু স্বীকার করবেন না। বেশ না করুন। আমার যা বলবার আমি বলছি। আপনি ত জানেন আমি অনুকে কত

ভালবাসি। ওঃ আপনি আবার মেয়েদের ভালবাসার কথা বিশ্বাস করেন না। যাক্ গে। সে আমার বন্ধু। সে ক্রমশঃ অধঃপাতে যাচ্ছে। তাকে আপনার রক্ষা করতে হবে; তাই আপনাকে ডেকেছি।

বিস্মিতকণ্ঠে শুভেন্দু বললো, "আমি কি করে রক্ষা করবো? আমি কি করতে পারি?"

তীব্র কণ্ঠে মীরা উত্তর করলো, "আপনি কি করতে পারেন? আপনি কি জানেন না আজ আপনার জন্যই তার এই পরিণাম? আপনি মেয়েদের খেয়ালী বলেন। আপনার মত খেয়ালী আমি ত কাউকে দেখি না। আপনার একটা খেয়াল, শুধুমাত্র খেয়ালের জন্য আর এক জনের জীবন নষ্ট হয়ে গেলো। তবুও বলেন কি করবো আমি? আপনি শুধু খেয়ালী নন, আপনি অন্ধ।"

শুভেন্দু স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলো। মীরা যা বলছে সে ত তা আজ অস্বীকার করতে পারে না। সত্যি সবই সত্যি। কিন্তু তাহারি জন্য, কেবল মাত্র তাহারি জন্য অনুর আজ এই পরিণাম? শিশু যেমন নূতন শেখা শব্দটাকে বার বার উচ্চারণ করে সেও তেমনি বার বার বলতে লাগলো, শুধু আমারি জন্য শুধু আমারি জন্য। সমস্ত আকাশ ওর মুখের কাছে নত হয়ে বলছে 'শুধু তোমারি জন্য,' 'শুধু আমারি জন্য'! এত বড় গৌরব ওর কোথায় লুকানো ছিলো এতদিন? জগতে ওর জন্য এত বড় আসন পাতা ছিলো, একথা এতদিন গোপন রইলো কেমন করে!

বেলা তখন ১০টা। শুভেন্দু ধীরে ধীরে অনুভার বাড়ীতে প্রবেশ করলো। অনু বারান্দায় একটা আরাম চেয়ারে বসেছিলো। সামনে আর একটী লোক। শুভেন্দুকে দেখবামাত্র লোকটী উঠে দাঁড়ালো। অনু বললো, "যাচ্ছ কেন অসীম! ওঁকে দেখে? উনি ত তোমার কলিগ।" অনু হেসে উঠলো। অসীম ব্যস্ত হয়ে বললো, "আমি এখন যাই। ও বেলা আসবো, মিঃ সেনকে বলবেন—"

"এর মধ্যে আবার মিঃ সেনকে কেন অসীম। তিনি ত দিব্যি আরামে পেগ টেনে ঘুমুচ্ছেন। তারপর ওবেলা কি তাঁকে পাবে। তিনি যে মিসেস্ চৌধুরীর খবরদারী করতে যাবেন। মিঃ চৌধুরী ত এখানে নেই। তিনি না হলে তাঁকে আগলাবে কে?" অনু হি হি করে হাসতে লাগলো। অসীম তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করে বেরিয়ে গেলো।

শুভেন্দু অনুর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, "লোকটী কে?"

"বল্লাম ত আপনার কলিগ।" শুভেন্দু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। অনু সামনের টেবিল থেকে রূপোর সিগারেট কেস খুলে একটী সিগারেট নিজের মুখে দিয়ে শুভেন্দুর সামনে খোলা কেসটা ধরলো। শুভেন্দু ব্যথিত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো।

"ভালছেলে" বলে অনু দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট টানতে লাগলো। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে শুভেন্দু ডাকলো, "অনু—" অনু চমকে উঠলো। অনেকদিন শুভেন্দু তাকে অনু বলে

ডাকেনি। অনু কিন্তু এক মুহূর্তে'ই নিজেকে সামলে নিলো। ধীরে ধীরে ধোঁয়া [illegible] বললো, "অনু নয়, মিসেস্ সেন।"

ওর কথার উত্তর না দিয়ে শুভেন্দু আপনার মনেই বলতে লাগলো, "আমার সামনে তোমার সিগারেট খেতে লজ্জা হয় না, অনু? "লজ্জা, কিসের লজ্জা?"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শুভেন্দু বললো, দেখো অনু, যে কথা আমি আজ তোমাকে বলতে এসেছি, সে কথা বলবার যে কোনদিন প্রয়োজন হবে, আমি তা ভাবিনি, সত্যিই দেখতে পাচ্ছি তুমি দিন দিন কি অধঃপাতে যাচ্ছ, আমি তোমাকে রক্ষা করবো অনু, তোমাকে রক্ষা করতে চাই।"

অনু বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চাইলো। পরিহাসের সুরে কি বলতে গেলো, কিন্তু পারলো না। জ্বলন্ত সিগারেটটা ওর মুখ থেকে পড়ে গেলো। ও নির্বাক দৃষ্টিতে শুভেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। শুভেন্দু সে ভাব লক্ষ্য করে বললো, "তুমি বিশ্বাস করছ না। কিন্তু সত্যিই আমি এসেছি তোমার কাছে, তোমাকে রক্ষা করতে। আজ এতদিনে আমি বুঝতে পারছি তোমাকে আমি কতখানি ভালবাসি।

সোজা হয়ে বসে অনু বিদ্রূপের সুরে বললো, "মেয়েদের কবে থেকে ভালবাসতে সুরু করলে, এত ভালো লক্ষণ নয়।"

শুভেন্দু চেয়ার থেকে উঠে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ওর সেই গভীর দৃষ্টির সামনে অনু চোখ তুলতে পারলো না। একটু থেকে শুভেন্দু বললো, "আমাদের দুজনের ভিতরে আজ অনেক ব্যবধান। আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিশীথ। কিন্তু তবুও আমাদের কল্যাণের সম্বন্ধটীকে নিশীথ আড়াল করে দাঁড়াতে পারে না। আমি তোমায় ভালবাসি। আমার পরিপূর্ণ প্রেম দিয়েই আমি তোমায় রক্ষা করবো। যেখানে যখন থাকি আমার প্রেমই তোমায় রক্ষা করবে সমস্ত বিপদ থেকে, নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় এই ভীষণ অভিশাপ থেকে।

একটা মর্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অনুভা বললো বহু দেরী হোয়ে গেছে বহু দেরী।

দৃঢ়স্বরে শুভেন্দু বললো, "যতই দেরি হোক, আমি তোমায় এখনো রক্ষা করতে পারি। অনেক সময় আমি বৃথা নষ্ট করেছি। আর আমাকে নষ্ট করতে দিও না।"

"একমুহূর্তে দুর্নিবার উচ্ছ্বাস অনুভার বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠ্‌লো। অন্ধকার বিস্মৃতির মধ্য থেকে উঠে এলো দুর্দম্য ঝড়। দুই হাত বাড়িয়ে ব্যাকুল আবেগে সে বললো, "পারবে, পারবে শুভেন্দু, আমাকে বাঁচাতে। এই অসহ্য শুষ্কতা থেকে, এই নিষ্করুণ রুক্ষতা থেকে? এই নাও আমার হাত, পারো তো আমাকে তুলে ধরো।"

আর্থিক জগৎ

জিতেন্দ্র গোস্বামী

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমস্যা সম্পর্কে নিয়োজিত আলোচনা-পরিষদের প্রথম অধিবেশন গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লীতে সংঘটিত হয়েছে। অধিবেশনের কার্যকলাপ সাধারণের অবগতির জন্যে প্রচারিত হয়নি সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা করা চল্বে না। পরিষদের আহ্বায়ক ও সভাপতি কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের বক্তৃতা থেকে এ সম্বন্ধে যা বুঝা গেলো প্রবন্ধ সেইটুকুর মধ্যেই নিবদ্ধ রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারের যথেষ্ট মূল্য যে আছে তা অস্বীকার না করেও বাণিজ্য সচিবের বক্তৃতা থেকে আসল ব্যাপারের যে কাঠামোটি আমাদের চোখে ভেসে উঠেছে তাতেই শঙ্কিত হ'বার প্রচুর কারণ রয়েছে। আমলাতন্ত্রী গভর্ণমেন্টের চিরাচরিত প্রথা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনৌদার্য যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থাকে প্রভাবিত কর্বে না এমন কোন আশা আমরা কর্তে পারি কিনা বক্তৃতায় তার আভাষটুকুও পেলাম না। এই পরিষদের গঠন সম্পর্কে স্যার রামস্বামী ইতিপূর্বে বলেছিলেন যে যুদ্ধের পর দেশের শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতিসাধন কি উপায়ে করা যায় সে বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য এই কমিটি গঠন করা হবে। এবারকার উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি শুধু 'after the war' বা যুদ্ধাবসানে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন বিষয়ে পরিষদের কার্য নিবদ্ধ রাখেন নাই। যুদ্ধোত্তর সমস্যা যে যুদ্ধকালীন সমস্যা থেকে পৃথক নয় এবং বিগত-যুদ্ধ পৃথিবীর সমস্যা সমূহের সমাধান কর্তে হ'লে যে বর্তমান অবস্থা থেকেই যথেষ্ট সাবধানতা ও দূরদৃষ্টি সহকারে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য তা তিনি বলেছেন। † আজকের সমস্যা সমূহ থেকেই ভবিষ্যতের সমস্যা সমূহ উদ্ভূত হ'বে এবং যেভাবে বর্তমানের প্রশ্নসমূহের সমাধান আমরা করি, তারই উপর নির্ভর কর্বে ভবিষ্যতে আমাদের কার্যক্রমের সাফল্য। অতি সত্য কথা এবং তারই জন্যে ভয় হয়। সরকারী কার্যপ্রণালী ব্যবসা, বাণিজ্য, শ্রমশিল্প ও জীবনযাত্রার মানকে বর্তমান ব্যবস্থায় যেভাবে পরিচালিত করেছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বিশ্বব্যাপী মহাসমরের সুযোগ নিয়ে সুপরিকল্পিত বিধি ব্যবস্থায় এতদিনে ভারতবর্ষ অন্য-নিরপেক্ষ শিল্প-প্রধান মহাদেশে পরিণত হ'তে পারতো। অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড এমন কি চীনদেশ এই অত্যল্পকাল মধ্যে কাঁচামাল, সস্তা শ্রমিক ও উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের অভাব সত্ত্বেও শ্রমশিল্পের বিভিন্ন বিভাগে পরনির্ভরতার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কমিয়ে এনেছে। ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে ভারতবর্ষ বর্তমান সঙ্কটে আদর্শ; কাঁচামাল, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রমিক সম্পর্কেও এখানে কোন প্রতিবন্ধক নেই; বেসরকারী অর্থ, জাতীয় শ্রমশিল্পের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত হ'বার জন্যে উন্মুখ—এমন অবস্থায়ও মোটর-নির্মাণ, জাহাজ-নির্মাণ, এয়ারোপ্লেন-নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়-স্বভাব গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বিলাতী কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক হিসেবে যে লজ্জাস্কর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিরোধিতা করেছে তাতে করে গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্যের আসল রূপটি সম্বন্ধে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই নূতন সরকারী প্রচেষ্টার সত্যিকারের রূপ সম্বন্ধেও উৎসাহিত হ'বার কোন কারণ দেখি না।

---

† "It was present-day problems which created post-war problems and the manner in which we tackled present-day problems impinged largely on a solution of post-war problems.'

ভারতবর্ষের প্রয়োজনে পুনর্গঠনের যে প্রয়োজন হয়েছে, আলোচনা-পরিষদের জন্য নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তার কোন স্থান নেই। সন্দেহ হয়, যুদ্ধের জন্য সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত ও সরবরাহ করার ব্যাপারে সরকারকে যে সকল বিধিব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয়েছে বা যে সকল অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ কর্তে হয়েছে তার জের মেটানোর জন্যই লোক-দেখানো এই পুনর্গঠন কমিটি ও আলোচনা-পরিষদের সৃষ্টি হ'য়েছে।

এতো গেলো নিছক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিক, যেদিকে সরকারী কৃপারশ্মি আলোকপাত কর্তে চিরদিন কার্পণ্য করে এসেছে। পুনর্গঠন সমস্যার বিচারে শুধু ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে এই সমস্যার আসল রূপটির সাথে পরিচয় হবে না, শুধু আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানোই সার হ'বে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে দাঁড়িয়ে অর্থনীতিকে শুধু অর্থনীতির চৌহদ্দির মধ্যে রেখে বিচার করার প্রয়াস শুধু মূর্খতা নয়, এর ভেতর জেনেশুনে সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার দুষ্ট-অভিসন্ধি আরোপ করা চলে। একথা অপ্রতিবাদে স্বীকৃত হ'য়েছে যে ভারতীয় সমস্যা, ভারতীয় পুনর্গঠন, পৃথিবীর সমস্যা ও পৃথিবীর পুনর্গঠনের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে দেখ্‌বার মতন তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী ভারত সরকার ব্যতীত আর কারও নেই। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক অসাম্যের পরোক্ষ ফল স্বরূপ যে অবাঞ্ছিত অর্থনৈতিক কাঠামো কায়েমী স্বার্থের পরোক্ষ প্ররোচনায় দেশবিদেশে গড়ে উঠেছে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় সেই স্বার্থকে স্বীকার করে নেবার মতন গতানুগতিক মনোবৃত্তিকে বাহাদুরি দিতে হয়। রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফাটল ধরেছে যে কাঠামোর, অবিশ্রান্ত ধ্বসে যাচ্ছে যে ভিত্তি, সেই কাঠামো ও সেই ভিত্তিকে নতুন দিনের পুনর্গঠন পরিকল্পনা থেকে বাদ দিতে হ'বে। পূর্বেই বলা হয়েছে জোড়া তালি দিয়ে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন হ'বেনা। ভারতবর্ষের ভবিষ্যত আর্থিক ও সামাজিক জীবনের একটি সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা স্থির কর্তে হ'বে—সে পরিকল্পনায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে তুল্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্বীকারের বিনিময়ে বিশ্ব-নাগরিকত্বের ভাগীদার হবে ভারতবর্ষ।

আটলাণ্টিক চার্টারের আমেরী-চার্চিল ভাষ্য যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পুনর্গঠিত চিত্রের যে পরিকল্পনার আভাষ দিয়েছে, তাতে ভারতবর্ষের উল্লেখ নেই। সেদিনকার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের (I. L. O.) যে অধিবেশন আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হ'লো তাতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কথাই বিশেষ করে আলোচনা হ'য়েছে। বাঁধাবুলির আওতার বাইরে মৌলিক রাষ্ট্রক্ষমতার ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাপেক্ষে পুনর্গঠিত অর্থনৈতিক কাঠামো ছাড়া ভবিষ্যত পৃথিবীর চাহিদা যে মিটবেনা, এ সঙ্কটকালেও-তা খোলাখুলি তারা স্বীকার করে উঠ্‌তে পার্লোনা। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে আমেরিকাজাত সমরসম্ভার নিয়োজিত হ'বে একথা জোর গলায় প্রচার করা সত্বেও ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও ধর্মঘট আজ যে আমেরিকার উৎপাদন শক্তিকে ব্যাহত করে চলেছে মারাত্মক ভাবে, এর মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, বর্তমান কাঠামোকে মেনে না নেওয়ার ইঙ্গিত—দেশের স্বার্থ, বিশ্ব-শ্রমিকের তীর্থক্ষেত্র সোভিয়েট ভূমির স্বার্থের দোহাইও আজ নতুন চেতনার কাছে মূল্যহীন হ'য়ে পড়েছে। সাগরপারের এই ইঙ্গিত কি মোহগ্রস্ত ভারতভাগ্য বিধাতাদের চেতনা সঞ্চারে সহায়তা কর্বেনা?
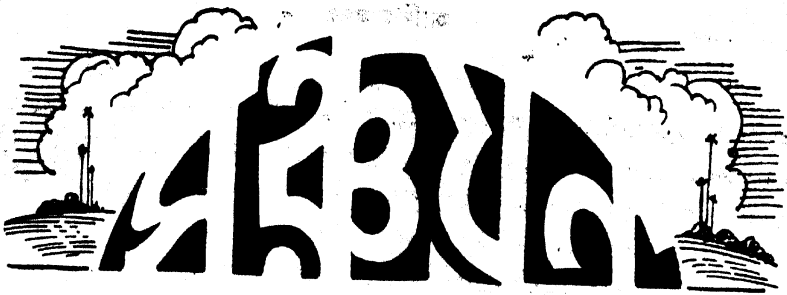
ভারত ও আমেরিকায় সাংবাদিকের ব্যবসা

লক্ষ্ণৌর বেন মিশ্র একজন নামকরা সাংবাদিক। তিনি হাতে কলমে আমেরিকায় ১২ বছর জার্নেলিসম্ শিক্ষা করেছেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি আমেরিকান পদ্ধতিতে চলুক তিনি তার বিশেষ পক্ষপাতী। এ সম্পর্কে "What India Thinks" নামক বইতে তিনি একটী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন। তার কোনো কোনো অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হোলো।

"আমেরিকা ও কিছু পরিমাণে ইংলণ্ডে সাংবাদিকের ব্যবসা কি আর্ট হিসাবে, কি বিজ্ঞান ও ব্যবসা হিসাবে এতটা উৎকর্ষ লাভ কোরেছে যে ভারতবর্ষে তার কিছুই হয় নি। আমাদের খবরের কাগজগুলো হয় বিলিতি কাগজের কার্বণ কপি না হয় নিকৃষ্ট ব্যঙ্গচিত্র অথবা তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের নকল।

* * * *

আমাদের খবরের কাগজগুলো প্রপাগ্যাণ্ডার অথবা বিভিন্ন মতের বাহক, খবরের নয়; আত্মকেন্দ্রিক, নিজেদের কৃতিত্বে ও গৌরবে নিজেরাই মুগ্ধ ও স্ফীত। এদের কাছে খবরের কোনো দাম নেই—কেবলমাত্র সম্পাদকীয় মতামত মূল্যবান—ফলে ভারতীয় কাগজগুলোর একঘেয়েমি নীরসতাও দূর হয় না।

* * * *

ভারতীয় সংবাদপত্রের মহারথীরা মনে করেন—সাংবাদিকের কাজ শেখ্‌বার কিছু নেই—কারণ এটা শেখা যায় না—ভারতীয় সংবাদপত্র যেভাবে চলে তাতে বাস্তবিকই কিছু শেখ্‌বার নেই। ......কিন্তু আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মত সংবাদ পত্র যদি প্রকাশ ও পরিচালনা কর্‌তে হয় তবে......খুব একাগ্র ভাবে এ কাজ গ্রহণ করা দরকার এবং এর জন্য বিজ্ঞানসম্মত নির্দিষ্ট শিক্ষা ও গ্রহণ কর্‌তে হবে।

ভারতীয় সাংবাদিকেরা কোনোদিন টেক্‌নিক্ নিয়ে আলোচনা করেন না, তার ফলে ৫০ বছর আগে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো যে অবস্থায় ছিল এখনো সে অবস্থায় আছে। একেবারে নিরস পাথরের মত নিরেট ও নিদারুণ ক্লান্তিকর—এতে প্রগতির চিহ্ন মাত্র নেই। বরং প্রাচীনত্বের লক্ষণ-এর সর্বাঙ্গ জুড়ে।

একটা উদাহরণ দিই—

পাঞ্জাব মেল
হত্যার প্রতিধ্বনি
ভোপাল আদালতে
ফরিয়াদীর বিবরণ

এখন এর অর্থ বের করতে চেষ্টা করা যাক্। প্রথম লাইনে কিছুই বোঝা গেলনা, দ্বিতীয় লাইন তথৈবচ, তৃতীয় লাইন প্রথম দু'লাইনের অর্থহীনতা ঢাক্‌বার জন্যই যেন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক—অর্থাৎ এর অর্থ দু'রকমই হোতে পারে—ফরিয়াদী নিজের সম্পর্কে কিছু বলেছে বা ফরিয়াদী সম্পর্কে অপরে কিছু বলেছে। এই তিন লাইনে এমন কিছু নেই যাতে আমাদের পড়বার আগ্রহ হোতে পারে।

আর একটী উদাহরণ—

"ভুল পদ্ধতি
নরিম্যান প্রতিনিধিদের নায়কত্ব করছেন।"

নরিম্যান প্রতিনিধিদের নায়কত্ব করবেন সেটা ভুল পদ্ধতি কেন? সম্প্রতি তিনি যে অপ্রীতিকর ব্যাপারে জড়িত হোয়েছিলেন সেজন্য? দেখাই যাক্ ব্যাপার কি?

"সভাপতির কাজের পদ্ধতির প্রতিবাদ জানিয়ে অনুমতি নিয়ে মিঃ নরিম্যান এ, আই, সি সির সভ্যদের স্বাক্ষর যুক্ত এক মেমোরেণ্ডাম পাঠ করেছেন। শিরোনামা দেখে এ বোঝবার উপায় নেই।" কিন্তু ভারতীয় খবরের কাগজের এটাই রীতি। এর পাশাপাশি আমেরিকান কাগজগুলির সরল ও চতুর বর্ণনার দু' একটী উদাহরণ দেখুন—

"পশুশক্তিই সব" এই বিশ্বনীতি রুজভেল্ট কর্তৃক নিন্দিত"—সংক্ষেপ ও স্ফটিকস্বচ্ছ।

আর একটা—**"জাপানীগণ কর্তৃক মিত্রশক্তিদের অস্বীকার এবং আরো সৈন্য সমাবেশ"**

কয়েকটী মাত্র কথায় সমস্ত সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার কোনো অবকাশ নেই। এভাবেই সংবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত ও হোচ্ছে আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলিতে।

* * * *

ভারতীয় সংবাদিকেরা কোনো সংবাদের সন্ধানই পান না, যখন চারিদিক থেকে সংবাদগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হবার জন্য কোলাহল কোরে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। শিরোনামাগুলি কদাচিৎ 'ধর্ক' হয়

আসল কথা হোচ্ছে—শিক্ষিত অভিজ্ঞ লেখক ও সাংবাদিক প্রয়োজন এবং তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়াও প্রয়োজন তাতে কাগজেরই লাভ।

* * *

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি বিশেষত্ব বর্জিত—ভারতীয় সম্পাদক ও প্রকাশকরা একেবারেই কল্পনা-শক্তি রহিত এবং আত্মকেন্দ্রিক, কাজেই কোনো প্রকার বিশেষ প্রকৃতির দিকে তাদের একেবারেই নজর নাই।

এধরণের চিন্তাতে প্রগতিশীল সংবাদপত্র চলেনা। সব কাগজেরই সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে হবে—কিন্তু কাগজের বিশেষত্বই কাগজকে জনপ্রিয় করে এবং ক্রমবর্দ্ধমান পাঠক শ্রেণীর মনোরঞ্জন করে। কাগজের বিশেষ প্রকৃতিগুলি থাকলে কাগজের কোনো চিন্তা থাকেনা—এবং যে কোনো রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক মতই কাগজের থাকুক না কেন—কাগজের উত্তরোত্তর উন্নতি অনিবার্য।

—What India Thinks
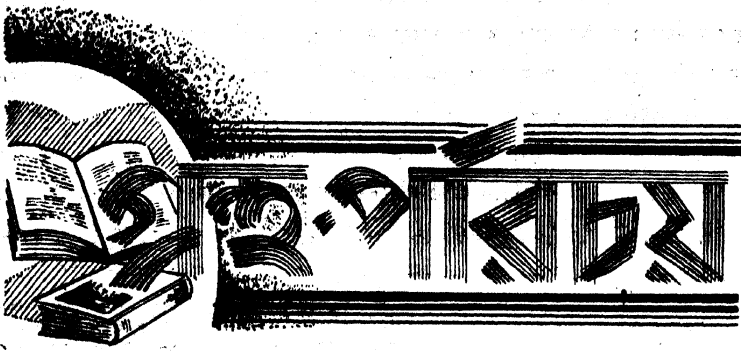
রুদ্র-বসন্ত
তিহাং নদীর বাঁকে } অশোকবিজয় রাহা, বিষ্ণুপুর ভবন, শ্রীহট্ট। ৬৪ পৃঃ। দাম ১৲

আকাশ—মৃণালকান্তি দাশ, বাণী চক্রভবন, শ্রীহট্ট। দাম ১৲। ৪৯ পৃঃ।

তিনখানাই কবিতার বই। ছাপা পরিষ্কার বাঁধানো সুন্দর। বিষয় নির্বাচনেও বৈচিত্র্য আছে। কাব্যামোদী যারা তারা পড়ে আনন্দ পাবেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগ নামে নাকি একটা নতুন যুগ সুরু হয়েছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস সব কিছুতেই নতুন বসন্তের হাওয়া দিয়েছে, এই রকম একটা কথা শোনা যাচ্ছে। যারা একথা বলেন তাদের মানে খুব স্পষ্ট নয়। নতুনত্বটা কী অর্থে তা'র বিশদ আলোচনা কোথাও দেখিনি। সাহিত্যের বহিরঙ্গ হলো ভাষা, অন্তরঙ্গ হলো ভাব। উভয়েরই আছে নানা ঢঙ, নানা রঙ ও আলোছায়ার নানা বাঁকা চোরা পার্থক্য। একই যুগেও নানা কবির নানা নূতনত্ব ফুটে ওঠে রকম বেরকম বিন্যাসের কায়দায়, ভাব ও ভাষার নানা technique এ। কিন্তু এক যুগ থেকে অন্য যুগকে পৃথক করে যে সীমারেখা সে হলো সাদা-নীলের গভীর পার্থক্য, গঙ্গা যমুনার মধ্যরেখা। সেই গভীর qualitative পার্থক্য দেখা না দিলে যুগান্তরের আবির্ভাব হতে পারে না। "রবীন্দ্রোত্তর" বলে কোলাহল আরম্ভ হলেও, আসলে বাংলা কাব্য রাবীন্দ্রিক কাব্যলোকেই পাখা মেলে উড়ছে। কোলাহলটা কামনা-অনুপ্রাণিত ভাবনার বা 'wishful thinking'এরই প্রকাশ মাত্র। রোমান্স-বাদ (Romanticism), মরমীয়া-বাদ (Mysticism), পলায়ন-বাদ (Escapism) ইত্যাদিকে ছাড়িয়ে যে বাস্তববাদ তার কথা পথে ঘাটে আজকাল শোনা যায়। নিছক বস্তুতন্ত্রই নাকি এই তথাকথিত নবযুগের কাব্য লক্ষণ। কিন্তু কাব্যজগতে বস্তুতন্ত্রের অযথা বাড়াবাড়ি হলে তা আর কাব্য থাকে না, গদ্যে পরিণত হয়, একথা নবীন কাব্য প্রয়াসীরা স্মরণে রাখেন না। তাই বস্তুতন্ত্র আজ প্রায়শই কিম্ভূতে ভাষা ও ভাবের বিকারে পর্যবসিত হয়।

কিন্তু আনন্দের কথা শ্রীযুক্ত অশোক বিজয়ের কবিতায় এই বিকৃত বাস্তবতার অহমিকা নাই। প্রচুর কাব্যরস ছন্দে ছন্দে বয়ে চলেছে; কাব্যের প্রাণ যে সৌকুমার্য ও সূক্ষ্ম কল্পনা তার প্রকাশ পাতায়

ভাষায়। আতিশয্য নাই ; পরিমিত ব্যঞ্জনা ও সংযত ভাবাবেগে অধিকাংশ কবিতাই রসধর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। আজকাল কাব্যসমালোচনার ফ্যাশানই হলো, পারিপার্শ্বিকের গুণগান। প্রাকৃতিক সীমাকে কল্পনায় উল্লঙ্ঘন করলেই হয় স্বপ্নবিলাশ, কিংবা পলায়নপর অবাস্তবতা। কিন্তু আমাদের মতে বাস্তবকে অবলম্বন করে বাস্তবাতীতের ইঙ্গিতই হলো রোমান্স ; এবং এই রোমান্টিক সুদূরাভিসারই হলো কাব্যের প্রাণ। সেই প্রাণশক্তিতে অশোকবিজয়ের কবিতা, মাধুর্যে সজীব। তাই তার কলমের মুখে রাজপুত্রের স্বপ্নপুরীর ছবি ফুটে ওঠে, "অনেক সোণার মেঘ, স্বপ্নের পাহাড়,—পার হয়ে এসেছি এখানে," এই বলে জ্যোৎস্না রাতে তার মন খুসী হয়ে ওঠে। সমুদ্রের ওপারে চাঁদের পাহাড়ের জন্য মন ব্যাকুল হয়। এই রোমান্টিক ব্যাকুলতা থেকে রাশি রাশি ছবি ফুটে ওঠে, কবিতা পড়তে পড়তে চোখের সমুখে রঙ-বেরঙের চিত্রশালা খুলে যায়।" কত ক্রুদ্ধ ঝড়ের ঈগল, ছিঁড়েছে রাতের ডানা অন্ধকার কৃষ্ণ-মহাদেশে"—একটী লাইনে সম্পূর্ণ চিত্র আঁকা হয়ে গেছে! কিন্তু জোরালো, দৃঢ় শক্তিমত্তারও অভাব নাই। 'সমুদ্র-শঙ্খ', 'রাতের গাড়ি' ইত্যাদিতে সেই বলিষ্ঠতা মনকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে যায়। "বিশাল সমুদ্র-শঙ্খ তবু ডাকে, তবু আজো ডাকে ; হঠাৎ বন্যার মতো রক্তে জাগে সমুদ্র-কল্লোল", "জীবনে মৃত্যুর স্বাদ একবারো পায় নাই যারা, তারা আজো জন্মে নাই"···ইত্যাদি ছত্র অনবদ্য। 'মহাকাল', 'জীবন-দেব', ইত্যাদিতেও আছে জীবন-ধর্মের স্তব, সঙ্গে সঙ্গে আছে "কঙ্কাল কাঁদে" কবিতার অসহায় ক্রন্দন ; "বিংশ শতক" কবিতাও আছে যন্ত্র-সভ্যতার রুক্ষ নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, ভীত কাতরোক্তি। নানা বিরুদ্ধভাবের ঐক্যতান। কিন্তু যে সব কবিতায় তথাকথিত আধুনিকতা প্রবল সেই কবিতাগুলিতে কাব্যসৌন্দর্যের হানি হয়েছে, একথা আমাদের বলতেই হবে। কারণ তাতে রয়েছে খাপছাড়া, অসংলগ্নতা এবং অকারণ ও কষ্টচেষ্টিত তীব্রতার ঝাঁঝ। চিত্রসৃষ্টিতে এই লেখকের নৈপুণ্য আছে কিন্তু মাঝে মাঝে ইমেজ বা উপমাগুলো পুনরুক্তিতে ও আতিশায্যে রসহীন হয়েছে। "লেহিয়া লেহিয়া মুছিল রক্তরেখা", "জিহ্বা মেলে হাজার বছর ধরে তৃষার মরীচিকা", "হাজার জিহ্বা মেলেছে তৃষার মরীচিকা", "সম্মুখে লেহিছে চক্ষু জিহ্বা মেলি···"—এই সব স্থানে একই "ইমেজের" বারম্বার আবির্ভাব ঘটেছে। তবে এসব সত্বেও লেখকের কাব্যে সত্যিকার কবিতারস রয়েছে এবং আনন্দের প্রচুর খোরাক তাতে পাওয়া যাবে।

মৃনালকান্তির 'আকাশ' পড়ে আমরা খুসী হয়েছি। কারণ এরও মধ্যে আছে রোমান্টিক জিজ্ঞাসা এবং কল্পলোকের স্পর্শ। চাঁদ এখনো বিস্ময় ছড়াতে পারে ; কলের ধোঁয়া এবং ইট কাঠের অট্টহাসি এখনো ফুলের পিপাসাকে মেরে ফেল্‌তে পারে নাই। কবি এখনও চাঁদের দিকে চেয়ে কামনা করেন, "ঝরে যাক্ কবিতার মতো কিছু জল"। মাটীর আসক্তি এ যুগের মডার্ণ কাব্যের বাঁধাধরা মানদণ্ড ; এই অত্যাধুনিকতার যুগে "কোথা সবে চলে যাব দূরে রেখে এ মাটীর সীমা" বলে আকাশের স্বপ্ন দেখছেন যে কবি, তার কাব্যে কল্পনারও বলিষ্ঠতা আছে। এই কবির কাব্যভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। মেকি চমক নেই, পালিশ করা চোস্ত বুলি নাই। সংহত ভাষায় তাজা, প্রাণবন্ত কবিতাগুলি সরসতায় ও মাধুর্যে মনোরম। তবে স্থানে স্থানে মিলের গোলমাল এবং ছন্দের পতনে কিঞ্চিৎ তালভঙ্গ ঘট্‌লেও সত্যিকার কাব্যসম্পদে কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। "শ্যামল শস্যের শীর্ষে ফুরায়েছে ফসলের গান", "অন্ধকারে ভবিষ্যৎ ভ্রূণ হয়ে কাঁদে"—ইত্যাদি ছত্রের অনবদ্য ইঙ্গিত ছবি আঁকবার ক্ষমতাকে সূচিত করেছে।　　　　—দীপঙ্কর

"বিশ্ববন্ধু"

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধ

ইতিহাসের রূপান্তর ঘটেছে। বেশীদিনের কথা নয়। মাত্র চব্বিশ বছরের ব্যবধানে ইতিহাসের মোড় ফিরেছে। ১৯১৭ সাল আর ১৯৪১ সাল। ১৯১৭ সালের ষ্ট্যালিন আজ মহামানব—'Stalin is a a great man' (লর্ড বিভারব্রুক) ১৯১৭ সালের লাঞ্ছিত রাশিয়া আজ অজেয় 'হবার আশীর্বাণী লাভ করেছে—'There will always be a Russia—জনসাধারণের ত্যাগে, নিষ্ঠায় বর্ধিত ও রক্ষিত রাশিয়া'। (লর্ড হ্যালিফ্যাক্স)।

ষ্ট্যালিন ভাগ্যবান পুরুষ, রাশিয়ারও জোর বরাত।

এই এক মাসে লড়াইয়ের ভাগ্য কিন্তু পরিবর্তিত হয় নাই। রাজধানী কুবিশেভে স্থানান্তরিত হয়েছে। মস্কোর প্রত্যেক অধিবাসীকে সহর রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছে। মস্কো এখনও জার্ম্মাণীর অনায়ত্ত। ডাইনে, বাঁয়ে ও বরাবর—কোনদিকেই আক্রমণ করে জার্মাণী আজ পর্যন্ত মস্কো পৌছাতে পারে নাই। এদিকে মস্কো অভিমুখে পঞ্চম অভিযান পরিচালিত হয়েছে। জার্মাণীর চেষ্টার বিরাম নাই। রাশিয়াও প্রাণপণ প্রতিরোধ করছে। কালিনিন, মোজাইস্ক, ম্যালো-ইয়ারোস্লাভেৎস, কালুগা, ওরেল, টুলা এ কয়টা নামের পরিধিতে লড়াই সীমাবদ্ধ। কখনও বা কালিনিনে আক্রমণের সংবাদ আসছে কখনও বা তুলায়। মস্কোর লড়াই থেকে একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে। মোজাইস্কের পথে বরাবর মস্কোর পাল্লা দেবার দুরন্ত চেষ্টা করে এবার জার্মাণ আক্রমণ মস্কো বৃত্তের প্রান্তে কালিনিন ও তুলার উপর নজর দেবে বেশী। কালিনিনের অর্ধেক জার্মাণ দখলে বাকী অর্ধেক রাশিয়ার আয়ত্তে। সেখানে লড়াই চলছে রাস্তায়, রাস্তায়। কালিনিন ও তুলার প্রতিরোধ উত্তীর্ণ হয়ে মস্কোর পূবে মিশে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই এই বৃত্ত রচিত হয়েছে। বৃত্ত সম্পূর্ণ হলে মস্কোর পতন অবশ্যম্ভাবী। কালিনিন দখলে এলে উত্তর রণক্ষেত্রের সঙ্গে মধ্য রণক্ষেত্রের রেলপথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে—কালিনিন, কালুগা, তুলা আর তার ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা নূতন নাম শোনা যাবে।

শীত আসছে। রাশিয়ার প্রান্তরে দুরন্ত শীত। তাই রণকুশলীদের কেবলই মনে পড়ছে নেপোলিয়নের কথা। রাশিয়ার শীতে নেপোলিয়নের 'Grand Army' মস্কোর সীমানায় এসেই থমকে গিয়েছিল এবং

এরপর থেকেই নেপোলিয়নের পতন আরম্ভ হয়। ষ্ট্যালিনের হিসাবে নেপোলিয়ন সিংহ হয়ে থাকলে হিট্লার মার্জার-সামিল। তাই বলে নেপোলিয়নের কাল আর হিটলারের কালে তফাৎটা ভুলে গেলে চলবে না। এটা হ'ল যন্ত্রযুগ আর লড়াইয়ের রকমটা হ'ল সর্বগ্রাসী; আর তা ছাড়া চলাচলের ও সরবরাহের ক্ষিপ্রতার জন্য নেপোলিয়নের বাহিনীতে ডাঃ টদ্তের খবরদারী ছিল না। জার্মানবাহিনী জার্মানীতে ফিরবে না এই তাদের পণ। এক নাৎসী জেনারেলের উক্তিতে পাই "আমরা গ্রীসে গিয়াছিলাম, গ্রীস জয় করে এসেছি। ক্রীটে গিয়ে জয় করে এসেছি। নরকে গেলেও সে স্থান দখল করবো—"We shall never return to Germany."

লড়াইটা ক্রমেই দক্ষিণে গড়িয়ে আসছে। ইতিমধ্যে রুশবাহিনীর নেতৃবদল হয়েছে। টিমোশেঙ্কো দক্ষিণ বাহিনীর ভার নিয়েছেন—মস্কোর ভার ছেড়ে দিয়েছেন জেনারেল যুখভের উপর। বুদেনী আর ভরোসিলভ পশ্চাদভাগে নূতন বাহিনী গঠন করছেন—শীতের পর বসন্তে ককেসাস, উরালে লড়তে হবে। এতদিন রুশ প্রতিরোধ-রেখা লেলিনগ্রাদ-মস্কো-খারকভ-রোস্তভ লাইন ধরে চলেছিল। তারমধ্যে লেলিনগ্রাদে রুশ প্রতিআক্রমণ আরম্ভ হলেও লেলিনগ্রাদের নাকি অব্যাহতি নাই। এদিকে ফিনল্যাণ্ডকে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে আমেরিকা ক্রমাগত চেষ্টা করছে। হুমকি, অনুনয় কোনটাই এখন পর্যন্ত ফল ধরে নাই। রুশো- ফিন লড়াইতে রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের ঘাটি হ্যাঙ্গো রুশসৈন্য দিয়ে আগ্‌লবার অধিকার অর্জন করে। ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে এক মাথায় লেলিনগ্রাদ, প্রবেশপথে হ্যাঙ্গো। হ্যাঙ্গো থেকে রুশ সৈন্য অপসারিত হয়েছে। হিটলারের মিউনিখ বার্ষিকীর বক্তৃতায় লেলিনগ্রাদ সম্পর্কে পাই "আমরা এখন আক্রমণ প্রতিরোধ করছি, অপর পক্ষ ব্যূহ ভেদ করবার চেষ্টা করবে। ......লেলিনগ্রাদের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত একজন লোকও খোয়াবোনা। লেলিনগ্রাদের অব্যাহতি নাই।" মস্কো অঞ্চলেরই অবস্থা জানা গেছে, শীতের প্রকোপ দক্ষিণে অনেক কম। কাজেই, দক্ষিণের চাপটা ক্রমেই বেশী। জার্মাণবাহিনী সমস্ত ইউক্রাইন দখলে এনেছে। ডনেতেস বেসিনে ক্রমেই তারা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। খারকভ তাদের দখলে। টাগানরগ থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে বিখ্যাত অস্ত্র নির্মাণ কেন্দ্র ষ্টালিনো রুশবাহিনী ত্যাগ করে গেছে। ডনেতেস বেসিনে জার্মাণ বাহিনী ক্র্যামাটোসকায়া পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।

ডনেতেসের পর ডন্, ভল্গা—পথে পড়েছে রোস্তভ। রোস্তভ নিয়ে হুড়োহুড়ি চলেছে। জার্মাণরা রোস্তভে প্রবেশ করবার দাবী করেছে, অপরপক্ষের সমর্থন এখনও পাওয়া যায় নাই। রোস্তভ ককেসাসের চাবিকাঠি, ককেসাসের সিংহদ্বার এই রোস্তভ। রোস্তভ রাশিয়ার হাতছাড়া হলে ককেসাসের তেল বেহাত

হয়ে যাবে এটা সুনিশ্চিত। তা ছাড়া ইরাণের মধ্য দিয়ে ইঙ্গ-আমেরিকান সাহায্য রাশিয়াতে পৌছাবার পথও ঐ রোস্তভ। রোস্তভ থেকে কাস্পিয়ানের উপকূলে অস্ত্রাখাঁ, তারপর দক্ষিণে বাকুর দিকে মোড় নিলে ককেশাসের পর্বতমালা এড়িয়ে যাওয়া যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া থেকে ককেসাস বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। জার্মাণীর দক্ষিণ অভিযানের নাকি অন্ত নাই, শেষ সোভেয়েট বাহিনী নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযান চলবে—"The advance will continue unlimited by time or space until the last soviet division is wiped out." দক্ষিণ প্রাঙ্গনে এখন রীতিমত প্রতিযোগিতা চলেছে। হিটলারের রোখ চেপেছে ষ্টালিন যাতে উরলের শিল্প ও শস্ত্রসম্ভারের জোরে উত্তরে ও দক্ষিণে প্রতিআক্রমণ না করতে পারে। ষ্টালিনেরও বিশ্রাম নাই। উরলকে ভিত্তি করে নূতন প্রতিরোধ-রেখা রচনার চেষ্টায় সোভিয়েট শক্তি নিয়োজিত। ষ্টালিনগ্রাড-সারাটভ-সামারা হবে তার সীমানা। রণকুশলী Annalist বলছে 'It is evident that Stalin is not going to allow the Germans to stabilise their northern front during the winter while carrying on a delcicive campaign in the south.'

ককেসাস অভিযানে ক্রিমিয়ার গুরুত্ব নাৎসীরা অবহিত আছে। অক্টোবরের শেষভাগ থেকে দক্ষিণ অভিযানে ক্রিমিয়ার লড়াই তাই প্রবল আকার ধারণ করে। ক্রিমিয়ার প্রবেশ পথে সঙ্কীর্ণ পেরিকোপ যোজক বৃত্তাকার পরিবেষ্টনের সুযোগ না দেওয়ায় ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীর সমবেত আক্রমণে পেরিকোপ ভেদ করে জার্মাণ সৈন্য ক্রিমিয়ায় প্রবেশ করে সিম্পারোপোল হয়ে সেবেস্তাপুলের বিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেছে। অন্য এক বাহিনী সোভিয়েট বাহিনী দ্বিখণ্ডিত করে জায়লা পর্বতের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণসাগরের কূলে উপস্থিত হয়েছে। কৃষ্ণসাগরের বন্দর থিওডোসিয়া ও কার্চ জার্মাণদের দখলে এসেছে বলে প্রকাশ। ক্রিমিয়া সম্পূর্ণ করায়ত্ত না হলে ককেসাসের দিকে অগ্রসর হওয়া মুস্কিল। পার্শ্বভাগে ক্রিমিয়ার প্রবল শত্রুসৈন্য ও সেবেস্তাপুলে শত্রুর নৌবহর রেখে জার্মাণ বাহিনী স্বচ্ছন্দ অভিযান চালাতে পারবে না। তা ছাড়া ক্রিমিয়া অভিযানের পূর্বপ্রান্তে পৌছালেই ককেসাসের পশ্চিম প্রান্তে চাপ পড়বে। সুতরাং, জার্মাণী ক্রিমিয়া অভিযান
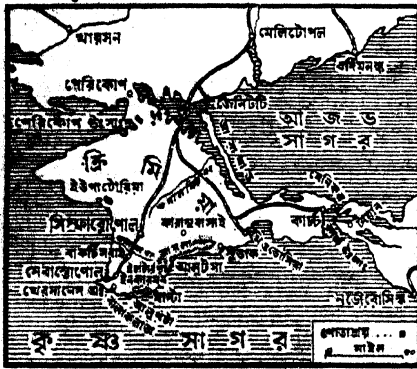
সফল হলেই ককেসাসের দরজায় নিরুপদ্রবে হানা দিতে পারবে। ক্রিমিয়ার অবস্থা দেখে এই আশঙ্কাই হয়। কার্চের পতন হয়েছে। সেবেস্তাপুলের অবস্থাও কিছু উন্নত নয়। একমাত্র অবশিষ্ট বন্দর নভোরোসিস্কের ভবিষ্যৎ ও উজ্জ্বল নয়। যদি অবস্থা এই দাঁড়ায় কৃষ্ণসাগরে রুশ-নৌশক্তি লুপ্ত হবে এবং রুশ সৈন্যের অপসরণের পথও থাকবে না।

এই প্রসঙ্গে তুর্কির অবস্থাটা বলে রাখা ভাল। প্রেসিডেন্ট ইনেনু ৩০ শে অক্টোবর 'রিপাব্লিক দিবসে' সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত থাকবার জন্য আহ্বান করে উৎপাদন বাড়াতে বলেছেন। তুর্কীর একদিকে মিত্রশক্তি

অধিকৃত সিরিয়া, ইরাণ, ইরাক ও অন্যদিকে নাৎসী সাঁড়াশীর দক্ষিণবাহু ক্রিমিয়ার প্রান্তভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। তুর্কী অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে—ইতিহাসের হুকুমনামা কি সমন নিয়ে আসে।

ষ্ট্যালিন, হিটলার, চার্চিল ও রুজভেল্ট

পর পর কয়েকদিন নভেম্বরের প্রথম দিকটায় ঈথরের ঝড় বয়ে গেল। রেড স্কোয়ারে ষ্ট্যালিন, মিউনিখে হিটলার, ম্যানসন হলে চার্চিল আর ওয়াসিংটনে রুজভেল্ট অভিধানের বাছাই করা বুলিগুলি নিঃশেষে নিক্ষেপ করেছেন। পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত বক্তৃতার ঝাঁঝ ও ভাপের ফাঁকে সত্য নির্বাসিত হয়েছে। আর হবেই বা না কেন—'in war truth is the first casualty.' তা সত্ত্বেও রূঢ় বাস্তব নির্মম ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। রেড আর্মির পরাজয়ের কারণ হিসাবে ষ্ট্যালিন বলেন (১) ইউরোপে পূর্বরণাঙ্গন ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় রণক্ষেত্র নাই। বিলাতে পার্লামেন্টে কেউ কেউ পশ্চিম রণক্ষেত্রে বৃটিশবাহিনী পরিচালনা করে রাশিয়াকে সাহায্য করার জন্য ওকালতী করেছিলেন—তাদের ডানকার্কের দুর্যোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে,—ভলগা ও ডনই এখন বৃটেনের সীমান্তরেখা। ষ্ট্যালিন আশায় বুক বেঁধে আছেন আর একটা রণক্ষেত্র অবিলম্বেই রচিত হবে। ইতিমধ্যে একক রাশিয়া মুক্তিসংগ্রামে প্রাণপাত করবে। (২) ইস্পাতের ওজনে রুশিয়া জার্মাণীর চাইতে দুর্বল—ট্যাঙ্কের সংখ্যা কম, ট্যাঙ্ক উৎপাদনের হার আরও কম, এয়ারোপ্লেনের সংখ্যাও কম। কাজেই জার্মাণীর সঙ্গে রাশিয়া এঁটে উঠতে পারে নাই, গোড়ায় রেড আর্মির ট্যাঙ্ক ছিল ১৫,০০০; নাৎসীদের ২৫,০০০। জনবলের দিক থেকেও রাশিয়া একক আর তার বিরুদ্ধে ইউরোপের সম্মিলিত লোকবল। চারমাসে জার্মাণী খুইয়েছে ৪৫ লাখ আর রাশিয়া ১৩ লক্ষ। ষ্ট্যালিন হিটলারী চালের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন হিটলারের হিসাব কতবার ভুল হয়েছে (১) হেসকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে শ্রেণীবিরোধের খোঁচা দিয়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মন ভাঙানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। (২) রেড আর্মি প্রবলভাবে আক্রান্ত হলে কিষাণ ও মজুরের সংঘর্ষ বাধবে, সোভিয়েট রুশিয়ায় জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে, সোভিয়েট ষ্টেট খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে; এখানও হিটলার আবার ভুল করেছেন। ষ্ট্যালিন বলেছেন সোভিয়েট লোহার ফ্রেমে গড়া। (৩) হিটলার ভেবেছিলেন সোভিয়েট বাহিনীর পশ্চাদভাগ হবে সব চাইতে দুর্বল এবং সেটাই হবে সোভিয়েটের মৃত্যুর কারণ। কাজের বেলায় নাকি উল্টোটা হয়েছে, গরিলা যুদ্ধে জার্মাণ বাহিনীর সরবরাহের ব্যবস্থায় রুশ সৈন্য ঘুণ ধরাচ্ছে। হিটলারের পতন ছয় মাস কি এক বছরে অবশ্যম্ভাবী। এই গেল ষ্ট্যালিনের ভাষণ।

ইঙ্গ-আমেরিকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করে ষ্ট্যালিন বলেছেন—'A modern war is a war of machines.' রাশিয়া, ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্ত উৎপাদন জার্মাণীর তিন গুণ হবে। সুতরাং নাৎসী পরাজয় অনিবার্য। রুশ, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কোয়ালিসনটা নাকি খাঁটি এবং এই বন্ধন ক্রমশই সুদৃঢ় হবে আশার কথা সন্দেহ নাই, ষ্ট্যালিনের বক্তৃতায় আমেরিকা ও ইংলণ্ডের রাষ্ট্র ব্যবস্থার তারিখ আছে—সেটা আরও আশার কথা। সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন আছে, শ্রমিকদের দল আছে আর একটা কথা ষ্ট্যালিনের বক্তৃতায় স্থান পায় নাই। সেটা হচ্ছে যে আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নগুলি ক্রমেই যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিছুদিন যাবৎ কেবলই ষ্ট্রাইকের খবর পাওয়া যাচ্ছে। 'কয়লা'র ষ্ট্রাইক এই সবে মাত্র নিষ্পত্তি হল। আবার ক্যালিফোর্ণিয়াতে রাজমজুররা ষ্ট্রাইক করবার বায়না ধরেছে। এবার তাদের কাজটা বোধ হয় বিবেচনার বেড়া ডিঙিয়ে গেছে—কারণ এবারকার ষ্ট্রাইকটা হবে দেশরক্ষার কোন এক কাজ উপলক্ষে। শোনা যাচ্ছে সেনেটে

বিল আসবে দৈর-সামরিক সম্পর্কিত কাজে ষ্ট্রাইক চলবে না। কতকাল আর 'elementary democratic liberties' দেওয়া যায়! মজুরদের লাই দিলেই মাথায় চাপে।

এবার হিটলারের হিসাব শোনা যাক্। সোভিয়েটের ১৫,০০০ প্লেন, ২০,০০০ ট্যাঙ্ক, ২৭,০০০ বন্দুক ক্ষতি হয়েছে, সোভিয়েট লোক খুইয়েছে ৮০ লক্ষ থেকে এক কোটি। জার্মাণীর অধিকারে এসেছে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড যার উপর শতকরা ৬০ থেকে ৭৫ ভাগ সোভিয়েট শিল্পসম্ভার স্থাপিত।

হিটলারের লড়াই বাঁচা-মরার লড়াই,—সভ্যতার শত্রু বলশেভিজমের বিরুদ্ধে লড়াই। হিটলার ও দুচে মিলে সম্মিলিত ইউরোপীয় সংহতি গড়ে হাজার বছরের জন্য ইউরোপের ভাগ্য নির্ণয়ে সহায়তা করছেন। হিটলার আশ্বাস দিয়েছেন বার্লিন ইউরোপের রাজধানী হবার আকাঙ্খা রাখে না। ফ্রান্সের পতনের পর হিটলার ইংলণ্ডকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ইংলণ্ড তখন ভেবেছিল হিটলার দুর্বল, তাই আপোষ করতে চায়। ইংলণ্ডের ভুল ভেঙেছে। তারা যদি পরখ করতে চায় ইউরোপের যে কোন যায়গায় অবতরণ করুক। হিটলার শপথ করে বলতে পারেন তাদের বিদায় নিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হবে না। আজ হিটলারের একটিমাত্র লক্ষ্য ইউরোপকে বাঁচান। জার্মাণীতে বিদ্রোহ হবে? আর যাই ঘটুক একটি ঘটনা ঘটা একেবারেই অসম্ভব—জার্মাণী কোনদিনই আত্মসমর্পণ করবে না। লড়াই বহুদিনব্যাপী চলতে পারে কিন্তু লড়াইয়ের প্রান্তরে জার্মাণবাহিনী অবশিষ্ট থাকবেই।

হিটলারের বক্তৃতায় 'International Jeweryর' মার্জনা নাই—ষ্ট্যালিনের মার্জনা নাই। ষ্ট্যালিন কিন্তু হিটলারকে কিছুকাল পর্যন্ত ক্ষমা করতে পেরেছেন। ষ্ট্যালিন যেন একটু জাতীয়তা ঘেঁষা। বক্তৃতার মাঝে মাঝে 'this national war' কথাটা স্থান পেতে দেখা গিয়েছে। তাই বোধহয় যতদিন পর্যন্ত হিটলার রাইনল্যাণ্ড,, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি অঞ্চল গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, হিটলারের ততটা বেয়াদবী হয় নাই। কারণ nationalist হিসাবে অতটুকু অনাচার করাটা দোষের কিছু নয়। অপরের দেশে হাত দিলে সেটাকে Imperialism না বলে পারা যায় না।

বৎসরান্তে Confessionএর ধুম পড়ে গেছে। গত বছর তো কোন ক্ষীণকণ্ঠ শুনি নাই? সেবারও রুদ্ররোষে শত্রু শত্রুকে চোখ রাঙিয়েছে। এবারও আবার সেই চোখরাঙানো। গতবার নাকি উড়োজাহাজ সংখ্যায় খুব কম ছিল। এবার রুদ্রকণ্ঠে চার্চিল সাহেব বক্তৃতায় বলেছেন—আমরা জার্মাণীর সমান।

চার্চিল সাহেব হিটলারকে শাসিয়েছেন—নাৎসী পার্টির সঙ্গে কস্মিনকালেও শান্তির কথা চলবে না। হিটলারের চরেরা স্থানে-স্থানে শান্তির টোপ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। চার্চিল সাহেব তাতে ভুলবেন না—হিটলার দানব।

আমেরিকা কতদূর

দশ দশটা জাহাজ ডুবে গেল—আমেরিকার রাগ সামলান দায়। আইরল্যাণ্ডের সন্নিকটে 'Bold Venture' জাহাজ ডুবি হবার পর রুজভেল্ট সাহেব সরাসরি সশস্ত্র করবার জন্য বলেছেন। Neutrality আইন রদ করবার জন্য চারদিকে থেকে জোর তুল উঠেছে—শুধু সশস্ত্র করতে অনুমতি দিলেই চলবে না আমেরিকার জাহাজ যথাতথা যাবার আইনও করা চাই। নিরপেক্ষতা আইন আর নিরপেক্ষ নয়। এই

আইন হিটলারের সহায়ক। It is an aid to Hitler—জার্মাণী আর আমেরিকার লড়াই ঘোষিত না হলেও পরস্পর হানাহানি চলছে। আইন সংশোধিত হলে লড়াইটা আর একটু মুখর হয়ে উঠবে। আমেরিকার পয়সা কেবলই আতলান্তিকের দরিয়ায় তলিয়ে যাচ্ছিল—এবার যদি মিত্রশক্তির দরজায় গিয়ে পৌঁছায়।

জাপান

আতলান্তিকের ভাবনা শেষ না হতেই প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি। জাপ-আমেরিকান শান্তি প্রস্তাব ভেস্তে গেছে। ব্লাডিভষ্টক নিয়েই যত গোলযোগ হয়েছে। ঐ বন্দরটা আক্রমণ করবে এমনিতর প্রতিশ্রুতি জাপান দিতে অক্ষম। ইতিমধ্যে তোজো মন্ত্রিসভা কুরুসু নামে এক ভদ্রলোককে বিশেষ দৌত্যে ওয়াসিংটনে পাঠিয়েছে—তাতে আশার খুব কিছু নাই। তোজো সভা আমেরিকাকে ঘাঁটাতে চায় না। শোনা যাচ্ছে জাপান মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে ৩৩ ডিভিশন, ইন্দোচীনে ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য জমা করেছে, থাই সীমান্তে সৈন্য চলাচল হচ্ছে—ব্যাঙ্কক সন্ত্রস্ত। কোয়াংসি সীমান্তেও সৈন্য সমাবেশের কথা শোনা যায়। বর্মা রোড, থাইল্যাণ্ড অথবা কুনাম্মিঙ-এ জাপানী মুষ্ট্যাঘাত করবে। বর্মা রোডে মালের ভীড়। ঐ একটি মাত্র পথে চীনে সাহায্য প্রেরিত হচ্ছে। উনানের মধ্য দিয়ে বর্মা রোড আটক করলে চীনের সাহায্য বন্ধ হবে। জাপান কি এই পথই বাছবে? A. B. C. D. ব্যূহ জাপানের অসহ্য। কিছুদিন আগে আমেরিকানরা চীন ত্যাগ করেছে এবার চীনা দরিয়ায় আমেরিকান জাহাজ স্থানান্তরে যেতে সুরু করেছে। এটা কিসের ইঙ্গিত? তোজো সভার দপ্তরের দিকে সুদূর প্রাচ্য তাকিয়ে আছে। ১২-১১-৪১

যুদ্ধের বাজার—
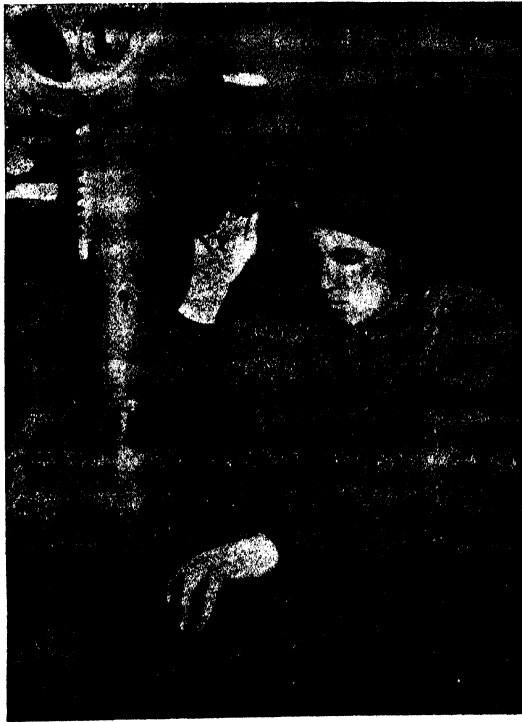
ছাপরা

বেহার বলতে বাইরের লোকের ধারণা ওটা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের রাজনীতির খাসমহল আর অধুনা গান্ধীবাদের স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা স্নেহের দাবীতে সেখানে কিছুটা আসন পেয়েছেন। রামগড়ে আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে যারা গেছেন তাদের কাছে রাজেন্দ্রপ্রসাদী প্রভাবের উপকথা ধরা পড়েছে। এবার বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের খাস জেলা ছাপরায় বেহার প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে সেটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। কংগ্রেস সমাজবাদীদের কথা না তুললেও চলে। তাদেরও একটা সম্মেলন হ'ল একই সময়ে। প্রথমটায় নাকি তাঁরাও ছাপরাতেই সম্মেলনের স্থান স্থির করেছিলেন। রামগড়ের অভিজ্ঞতাটা তাদের এবার কাজে লেগে গেছে। তাঁরা বুদ্ধিমানের মত ফরোয়ার্ড ব্লকের আঁচ থেকে সতর্কভাবে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে পাটনা সহর থেকে কিছু দূরে গর্জন করেছেন; তাও আবার শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে।

কংগ্রেস শাসনের পর এটা প্রমাণ হোয়ে গেছে বেহারের সংহত শক্তির নেতা কে? স্বামী সহজানন্দের নামে সেখানে মরা হাড়ে ভেল্কী খেলে। আজ সেখানে ফরোয়ার্ড ব্লকের স্তম্ভ হলেন স্বামীজী। রামগড়ের পর দু'বছরে বহুকর্মী জেলে গেছেন—ছোট বড় নানারকম সংগ্রাম করে। স্বামীজী স্বয়ং দু'বছর যাবৎ জেলে—কৈ ছাপরায় তো তার কিছুই বোঝা গেল না? দু'একজন প্রতিবাদীর ক্ষীণকণ্ঠ ছাড়া হাজারো কিষাণ কণ্ঠে শোনা গেছে 'ফরোয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ' 'সুভাষবাবু কি জয়', 'স্বামীজী জিন্দাবাদ'। প্রতিপক্ষ বহু শ্রম স্বীকার করে দেশময় ছড়িয়েছেন যে ফরোয়ার্ড ব্লকের গণ-সমর্থন নাই, ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্ব পেটি বুর্জোয়াজীর নেতৃত্ব। রামগড়, ছাপরার মত সম্মেলন দেখে তাদের মন ভেঙে যায়। তারা তখন নতুন পথ খোঁজেন—তাদের পরিভাষায় যাকে বলে—tactics. সেটা আরও মজার। এই tactics গুলি অবশ্যি খুব পুরাণো, মরচে ধরা; ইতিহাসে ভেদনীতির অস্ত্রশালা থেকে ধার করা। বাংলার কর্মী বেহারে গেলে এঁদের কাছে শুনবেন যে বাংলা দেশে ফরোয়ার্ড ব্লক বর্ধিষ্ণু ও সজাগ—বেহারে কিছু নয়। বেহারের কর্মী বাংলায় এলে এই বন্ধুরাই তাদের তারিফ করে বলবেন বেহারের কথা আলাদা, সেখানেই একমাত্র ফরোয়ার্ড ব্লকের গণসংযোগ আছে, বাংলায় ফরোয়ার্ড ব্লক গণভিত্তিক নয়। ইত্যাদি। এই উক্তির মাঝেও তাঁরা অজ্ঞাতে ফরোয়ার্ড ব্লকের সামগ্রিক রূপটাকে স্বীকার করে নেন। তাঁদের স্বীকৃতিটাকে একটু স্পষ্ট করে তুললে যা দাঁড়ায় তা এই—ফরোয়ার্ড ব্লকের উন্মেষ বিভিন্ন যায়গায় বিভিন্ন রকম হলেও তারও একটা ধারা আছে। সেই ধারাই হবে সমাজের গণজনের জীবনধারা। ব্লকপন্থীরাও তাই বলেন— Forward Bloc is a way of life....এটাই ছাপরার সুর।

সম্পাদকীয়

সত্যাগ্রহ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি

গত ৩০শে অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা ক'রে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে এক বিস্তৃত বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর কাছে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে যে অভিযোগ এসেছে তার উল্লেখ কোরে সে সকল অভিযোগের অসারত্ব তিনি প্রমাণ করেছেন। অভিযোগ-গুলিকে প্রধানতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) সত্যাগ্রহ সম্পর্কে জনসাধারণ ও কংগ্রেসকর্মী উভয়েরই উৎসাহ হ্রাস পেয়েছে। (২) সত্যাগ্রহী বন্দীদের মধ্যে অনেকস্থলে নিয়মানুবর্তিতা নাই এবং অনেকে অহিংসায় বিশ্বাসী নয় (৩) বিব্রত না করার নীতি দুর্বোধ্য কাজেই সংগ্রামকে তীব্রতর করা উচিত (৪) কংগ্রেসের মধ্যে কোনো প্রাণের স্পন্দন নাই।

প্রথম অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেছেন যে বাইরের চমকপ্রদ আড়ম্বরপূর্ণ উৎসাহের কোনো মূল্য নেই বরং ক্রমাগত অস্থিরভাবে কার্যধারা হিংসার উদ্রেক হয়। কাজেই সত্যাগ্রহীর তালিকা যদি নিঃশেষ হয় তাতে এসে যায় না কারণ প্রতিনিধি যদি একজনও হন তাতেই কার্য সিদ্ধি হবে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গণসংগ্রাম তিনি করবেন না কারণ সাম্প্রদায়িক ঐক্য ব্যতীত গণসংগ্রাম গৃহযুদ্ধে পরিণত হবে।—কংগ্রেসের কোনো কাজ দ্বারা এই গৃহযুদ্ধকে তিনি এগিয়ে আনতে সম্মত নন।

২য় অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন যে যারা শৃঙ্খলা মানে না বা যাঁরা প্রকৃত মনোভাব গোপন কোরে সত্যাগ্রহী হোয়েছেন তাঁরা কখনো প্রকৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতে পারবেন না। এবং আপনা থেকে বাদ পড়ে যাবেন। আন্দোলন চলছে তাঁদেরই নামে ও জন্য যাঁরা যথার্থ অহিংসাপন্থী নিয়মানুবর্তী কংগ্রেসসেবী।

৩য় বিব্রত করা সম্পর্কে। তিনি বলেন বর্তমান অবস্থায় কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করতে গেলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়ে নানারূপ দমননীতির প্রয়োগ করতেন। হিংসার পথ গ্রহণ করলে তাঁদের বিপদ আমাদের সুযোগ একথা খাটতো। কিন্তু অহিংসার নীতি যেখানে গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে বিব্রত করার পথ আত্মহত্যার সমান হোত। সত্যাগ্রহ কার্যকারী হোচ্ছে না এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরা এ পথকে পরিবর্তিত করতে অথবা সত্যাগ্রহ একেবারে পরিত্যাগ

করতে বলেন। গান্ধীজীর মতে এ দুটোই নীতি বিরুদ্ধ। তার মতে এ পথ পরিবর্তন করার অর্থ হিংসার পথ গ্রহণ করা। সত্যাগ্রহের প্রকৃত উদ্দেশ্য—বর্তমান যুদ্ধ এবং সকল যুদ্ধের বিরুদ্ধেই প্রচারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই সত্যাগ্রহ পরিত্যাগ করাও বোকামি।

৪র্থ অভিযোগ কংগ্রেসের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায় না—গান্ধিজীর মতে বাইরে প্রাণের স্পন্দনের অভাব গভীরতার পরিচায়ক। তার কোনো প্রয়োজন নাই। পার্লামেণ্টারী কার্যকলাপ বন্ধ রাখারই তিনি স্বপক্ষে। যাঁরা সত্যাগ্রহ করবেন না তাঁরা গঠনমূলক কাজ না করলে সত্যাগ্রহ সফল হোতে পারে না, যেমন যুদ্ধরত সৈন্যদলের পেছনে সমস্ত দেশের জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ না হোলে কোনো যুদ্ধ সফল হোতে পারে না।

গান্ধিজীর এসব যুক্তি আমাদের নিকট অনেকাংশে দুর্বোধ্য মনে হয় কারণ সবগুলি যুক্তির পেছনে রয়েছে তার অদ্ভুত নৈতিক মতবাদ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যা সমগ্রজাতি হিসাবে প্রযোজ্য নয় বলে আমরা বহুবার মত প্রকাশ করেছি। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ব্যবহারের মানদণ্ড এক নয় ও এক হোতে পারে না। তিনি বল্‌ছেন সত্যাগ্রহ সম্পর্কে উৎসাহের হ্রাস হয়নি—কিন্তু আমরা দেখছি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে—একজন সত্যাগ্রহীর বার বার কারাবরণ দ্বারা নৈতিক আদর্শ রক্ষা হোতে পারে কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়লাভের আশা বাতুলতা। গণআন্দোলন যদি নাই করেন অন্যের কিছু করার নেই কিন্তু গণ-আন্দোলন আরম্ভ করলে আত্মকলহ বাড়বে এ যুক্তি আমরা মানতে পারি না—বরং সাম্রাজ্যবাদী তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবারই সম্ভাবনা। আর যদি গণ-আন্দোলন আরম্ভ করলেই আত্মকলহে পরিণত হয় তবে যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা কেন? যুদ্ধের পরেও এই আত্মকলহের সম্ভাবনা থাকবে। কাজেই আত্মকলহকে এড়াতে গেলে আমাদের অধীনতাকেই চিরস্থায়ী করতে হয়। গান্ধী অবশ্যি বল্‌বেন বরং অধীনতাও ভাল কিন্তু হিংসা ভাল নয়। গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা সকল রাজনৈতিক কর্মীই স্বীকার করবেন কিন্তু তিনি যে ১৩ দফা গঠনমূলক কাজের ফর্দ দিয়েছেন দেশের রাজনৈতিক কর্মীরা তার অনেকগুলিকেই অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেননি কারণ সেগুলির সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের যোগাযোগ খুঁজে তারা পায়নি। অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও প্রচেষ্টা যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—তার বর্তমান অবস্থা প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষেই দুঃখজনক—উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান এই সঙ্কট সময়ে জাতিকে সমস্ত অবস্থার জন্য প্রস্তুত কোরতে পারতো তাকে আজ অচল কোরে রাখা হোয়েছে। নৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য গান্ধিজী নিজে যতদিন না মত পরিবর্তন করছেন ততদিন যুক্তিতর্ক দ্বারা কিছু হবে না। তবে সম্প্রতি তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীকে স্বাধীন মতামত প্রচার করবার অধিকার দিয়েছেন দেখে আমরা আশ্বস্ত

হোয়েছি যে তাঁর নিজের মতামত পরিবর্তিত হবার এটা একটা ইঙ্গিত হয়তো। দেখা যাক্ কি হয়। এদিকে জোর গুজব উঠেছে সত্যাগ্রহীবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে। জওহরলাল, মৌলানাআজাদ প্রভৃতি যদি মুক্তি পান তবে কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি কিছু পরিবর্তন হয় কিনা দেখবার জন্য আম্‌রা উৎসুক হয়ে আছি।

রাজবন্দীদের অনশন

গত ২৫শে অক্টোবর তারিখে দেউলী জেলের ২৩০ জন রাজনৈতিক বন্দী তাঁদের অভাব অভিযোগের কোনো প্রকার প্রতীকার না হওয়াতে অনশন অবলম্বন করেন। গত এপ্রিল মাসে রাজবন্দীরা তাঁদের অভাব অভিযোগের বিষয় গভর্ণমেণ্টকে জানান—কিন্তু যেমন হোয়ে থাকে এই দীর্ঘকাল ধরে গভর্ণমেণ্ট কোনো ব্যবস্থাই করেন নাই। মিঃ যোশী বন্দীদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে নিজে পরিদর্শন কোরে যে সুপারিশ করেন গভর্ণমেণ্ট সে সুপারিশ অনুসারেও কাজ কর্‌তে রাজী হন নাই ; ফলে এই অনশনধর্মঘট। গত ২৯শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে মিঃ যোশী এজন্য একটী মুলতবী প্রস্তাব আনেন। রাজবন্দীদের অভিযোগগুলি প্রধানতঃ ৩টী শ্রেণীতে ফেলা যায়।

(১) প্রথমতঃ তাঁদের মধ্যে ১ম ও ২য় শ্রেণীর হিসাবে যে শ্রেণীবিভাগ করা হোয়েছে তা উঠিয়ে দেওয়া।

(২) দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি করা ও পারিবারিক ভাতার ব্যবস্থা করা।

(৩) তাঁদের স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়ে আনা।

মুলতুবী প্রস্তাব আলোচনা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল যে মনোবৃত্তির পরিচয় দেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বন্দীদের অবস্থা বর্ণনা করে মন্তব্য করেন যে তাদের যথেষ্ট বিলাসিতার মধ্যেই রাখা হোয়েছে। তার নিদর্শনস্বরূপ বলেন যে একমাত্র সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ৩৬ টিন Reserved আনারস ১৯ বোতল অষ্ট্রেলিয়ান মধু, ৪০৩টী আপেল ৮২৭টী কলা ও ১৪ সের বাদাম তাঁরা পেয়েছেন।

কিন্তু কতজন বন্দীর মধ্যে এই বিলাসিতার উপকরণগুলি ভাগ কোরে দেওয়া হোয়েছে সে সম্পর্কে তিনি নীরব। মিঃ যমুনাদাস মেটা মন্তব্য করেন যে মাসে ১৫০০ কলা যদি ২০০ রাজবন্দীকে দেওয়া হয় তা হোলে প্রতিদিন ৫০টী কলা ২০০ রাজবন্দী ভোগ করেন অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ কলার অধিকারী। যদি এরূপ বিলাসিতাতে তাঁরা সন্তুষ্ট না হন তবে স্বরাষ্ট্রসচিব বন্দীদের অনশনের নিকট "হার মানুবেন না"। স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়ে আনুবার দাবীকে তিনি রাজনৈতিক দাবী বলে বর্ণনা করেন, তার অর্থ কি? নিজেদের প্রদেশের জেলে আটক থাকলে কখনো

কখনো বন্দীদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য হবে মাত্র, এতে কোন্ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে ?

রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন সম্পর্কে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী সভাসমিতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বাংলা দেশেও বহু বড় বড় সভা এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। মিঃ যোশী দেউলীতে রাজবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেশবাসী তাঁদের দাবী সম্পর্কে যে সজাগ হোয়েছে এ কথা বলেন এবং আরও যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে ১৮৪ জন রাজনৈতিক বন্দী গত ৮ই নভেম্বর অনশন ত্যাগ করেছেন। কিন্তু ৪৬ রাজবন্দী অনশন ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। ১৩ই নভেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয়পরিষদে রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য মিঃ যোশী এক নোটিশ দিয়েছেন। তবে সরকার পক্ষ থেকে সেই দিন কোনো প্রকার বিবৃতি প্রকাশ হবার আশা কম। আগামী ১৫ই নভেম্বর সত্যাগ্রহী ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করতে আরম্ভ করবেন এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশিত হবে শোনা যাচ্ছে। মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহেরু এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যরা প্রথম মুক্তি পাবেন শোনা যাচ্ছে। জেলের মধ্যে কারারুদ্ধ হওয়া ছাড়াও বহু সংখ্যক লোকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হোয়েছে নানা বিধিনিষেধ দ্বারা। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র সচিব জানান যে ভারতরক্ষা আইনে মোট ১৭২৪ জন আটক বন্দী আছেন এবং ২০০৬ জনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হোয়েছে। শেষোক্তদের মধ্যে একমাত্র বাঙলা দেশেই ১৬১০ জন। এদের সম্পর্কেই বা কি করা হবে জানা যায় নি। তবে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বিশেষ কিছু আশা করবার নেই। যাহোক ১৫ নভেম্বরের জন্য আমরা কৌতুহলী হয়ে রইলাম।

নিখিল ভারত কিষাণ কমিটি

গত ১৮ ও ১৯শে অক্টোবর অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত পাকালাতে—নিখিল ভারত কিষাণ কমিটির সভা হয়। পলাশার ১৮ মাস পার এই প্রথম কিষাণ সভার অধিবেশন হোলো। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। তারমধ্যে, জাতীয় দাবী, রুশ-জার্মাণ যুদ্ধ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রস্তাবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় দাবী সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয় যে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস কমিটিগুলিকে বাতিল কোরে দিয়ে এবং ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ কোরে জাতীয় কংগ্রেসের ডেমোক্রেটিক কার্যকলাপে শুধু বাধা সৃষ্টি করেছেন তা নয় এই আন্দোলন সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির পরিপন্থী কোরেছেন।

বর্তমান অচল অবস্থার জন্যই এত সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি হোয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব কিষাণ মজুরদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করে ও কংগ্রেসের স্বাভাবিক কার্য-কলাপ ফিরিয়ে এনে। এই উদ্দেশ্যে কিষাণ মজুরদের প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি পলাশা প্রস্তাবের প্রতি আকৃষ্ট করা হোচ্ছে।

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধ সম্পর্কে সভা জার্মাণীর সোভিয়েট আক্রমণ নিন্দা করেন এবং সোভিয়েটের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন,—কিষাণ মজুর ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে সোভিয়েটকে যথাসম্ভব সাহায্য দানের জন্য আহ্বান করেন। সকল দিক থেকে চাপ দেবার জন্য নাজি জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে আরো শক্তিশালী করতেও বলেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পলাশাতে গৃহীত প্রস্তাবকেই পুনরায় সমর্থন করা হয়। এবং কৃষিজাত জিনিষের মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে, এবং কৃষিজাত জিনিষের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করবার সম্বন্ধে আলোচনা চালাতে কিষাণদের আহ্বান করা হয়। শিল্পজাত দ্রব্যের উচ্চতম মূল্য নির্ধারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি এবং মিল শ্রমিকদের মাগ্‌গি ভাতার দাবী উত্থাপন করবার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কারণ কিষাণসভা ভারতের অন্যতম প্রগতিশীল শক্তিদের প্রতিষ্ঠান বলে দাবী করে। কাজেই কংগ্রেসের অপেক্ষা কিষাণ সভার প্রস্তাব অধিক পরিমাণে বামপন্থী হবে এটা আশা করা অন্যায় নয়। জাতীয় দাবীর প্রস্তাব সম্পর্কে কিষাণ সভার সহিত আমরা একমত। কিষাণ সভা যথার্থই বলেছেন যে সংগ্রাম সুরু করলে আত্মকলহ কম্‌তো, বাড়্‌তো না যার বিভীষিকা মহাত্মা গান্ধী সর্বত্র দেখ্‌ছেন। যুদ্ধ সম্পর্কে প্রস্তাব আমাদের বোধগম্য হয়নি, কোনো দেশের শাসনপদ্ধতিকে সমর্থন করা আর সে দেশের গভর্ণমেণ্টের কার্যকলাপ সমর্থন করা এক ব্যাপার নয়। আমাদের মত, স্বাধীন ভারতবর্ষের কর্তব্য আছে কিন্তু অধীন ভারতবর্ষ, যার পক্ষে কোন কিন্তু বাছাই করবার উপায় নেই তার একমাত্র কর্তব্য বাছাই করবার স্বাধীন অধিকার অর্জন করা।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমরা পাকালা প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এ সব বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট এতটা উদাসীনতা ও কল্পনাশক্তির অভাব দেখাচ্ছেন যে এদেশের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে তাঁদের যে কতটা চিন্তা তার ভাল উদাহরণ পাওয়া যায়। এদেশের লোক না খেয়ে মরুক্ তাতে এসে যায় কি? যুদ্ধোদ্যম পুরো মাত্রায় চল্লেই হো্লো। হতভাগাদের দিয়ে যুদ্ধের রসদ যোগাবার কাজ করানো গেলেই হোলো।

হক্-জিন্না সংবাদ

গত ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর নয়াদিল্লীতে লীগ কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

জন্য। তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সম্পর্কে ব্যবস্থা আলোচনা।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর মিঃ ফজ্‌লুল হক লীগ সম্পাদকের নিকট এক পত্র লিখে ওয়ার্কিং কমিটি ও লীগ কাউন্সিলের পদত্যাগ করেন। ২৬শে অক্টোবর ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এ উপস্থিত থাক্‌তে অনিচ্ছা প্রকাশ করে আর একটী চিঠি লেখেন। এই দুই চিঠি নাকি, লীগের সভাপতি, কাউন্সিল, ওয়ার্কিং কমিটি এবং মুসলমান সংখ্যা লঘিষ্ঠ প্রদেশগুলির প্রতি অপমানসূচক এবং ভিত্তিহীন। কাজেই যদি মিঃ হক্‌ এই সিদ্ধান্ত জান্‌বার ১০দিনের মধ্যে অভিযোগ প্রত্যাহার করে ক্ষমা না চান তবে ওয়ার্কিং কমিটি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌বেন। গত ৮ই নভেম্বর সেই ১০দিনের মেয়াদ শেষ হয়েছে। হক্‌ সাহেব লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লী গেছেন কায়েদে আজামএর সঙ্গে দেখা কর্‌তে। এখনও ফলাফল জানা যায় নি। ১৬ই নভেম্বর লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক হবে এবং সেখানে হক্‌ সাহেবের ভাগ্যনির্ণয় হবে। এদিকে তো ভারতের, বিশেষ বাঙলার, রাজনৈতিক আবহাওয়ার তাপ বেড়ে গেছে—কৌতূহল ও উৎকণ্ঠায়—হক্‌ সাহেব এবারে কি করেন; আত্মমর্যাদা সাতহাত দরিয়ার নীচেই ডুবিয়ে দেন মুস্লীম স্বার্থরক্ষার ভুয়া বুলিতে, না নিজের অতীত মর্যাদাজ্ঞান ও শুভবুদ্ধিরই জয় হবে। জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই, হক্‌ সাহেবের অনুচরবৃন্দ বল্‌ছেন যে এবার হক্‌ সাহেবের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই টল্‌বেনা। তিনি জিন্নার হুম্‌কীর নিকট মাথা নীচু কর্‌বেন না। তাঁর উন্নত শির দেখ্‌বার আশা কোরেই আমাদের আপাতত চারদিন আরো অপেক্ষা কর্‌তে হবে।

মালয়ে ভারতীয় শ্রমিক

সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট মালয় সরকার ৫০০ ভারতীয় শ্রমিক চেয়ে পাঠান কিন্তু ভারত সরকার শ্রমিক পাঠাতে স্বীকৃত হন নাই। গত এপ্রিল—যে মাসে মালয়ের রবার বাগানের ভারতীয় শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে—সেই ধর্মঘট ভাঙ্‌বার জন্য মালয় সরকার অমানুষিক অত্যাচার করেন—ধর্মঘটীদের শুধু মারধর করেই ক্ষান্ত হন নাই—চারদিক থেকে তাঁদের বেষ্টন করে গুলি করা হোয়েছিল—এবং তারপর ব্যাপারটীকে ধামাচাপা দেবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা হোয়েছিল। বহু শ্রমিককে আটক ও নির্বাসন দেওয়া হোলো—এমন কি অতিশয় নরমপন্থী সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া এসোসিয়াশনের বিরুদ্ধেও শ্রমিকদের উত্তেজিত কর্‌বার অভিযোগ করা হয়। মালয়ের এ ব্যাপার নিয়ে ভারতে খুব আন্দোলন হয় এবং মালয় গভর্ণমেণ্টের নিকট একটী নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করা হয়। শোনা গিয়েছিল প্রথম মালয় সরকার তাঁতে সম্মত হোয়েছিলেন কিন্তু পরে তাদের মত পরিবর্তিত হয়।

আরো শোনা যাচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে শ্রমিক না পাওয়াতে যাভা থেকে শ্রমিক আনবার ব্যবস্থা হোয়েছে এবং "ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রেশন কোম্পানীর" হাতে যে টাকা ভারতীয় শ্রমিকদের সুবিধার জন্য জমা আছে সে ফাণ্ডের সুযোগ যাভার শ্রমিকরাও ভোগ করতে পারবে এরূপ ব্যবস্থা হোয়েছে। ভারত গভর্ণমেন্টের এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা উচিত কারণ—যে টাকা ভারতীয় শ্রমিকদের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে সে টাকাতে অন্য শ্রমিক এসে যদি ভাগ বসায় তাতে যে সামান্য সুবিধা ভারতীয় শ্রমিকদের ভোগ করবার সম্ভাবনা ছিল তাতেও বাধার সৃষ্টি হবে। ভারতের শ্রমিকেরা পৃথিবীর সর্বত্র কি ব্যবহার পায় এ তার একটা ভাল উদাহরণ। পরাধীন ভারতবাসী আত্মস্বার্থ রক্ষায় অক্ষম—পরের ধনদৌলত সঞ্চয় ও রাজ্যলিপ্সা তার যোগান দিতেই তার জীবন যাচ্ছে। নিজের স্বার্থরক্ষা করবার যাদের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই তারা যে কেন পরের স্বার্থরক্ষা করবে তা বোঝা মুস্কিল। যাক্ মালয় সম্পর্কে নূতন সচিব মিঃ আনে কি করেন দেখবার জন্য উৎসুক হোয়ে থাক্‌বো।

লীগের পরিষদ ত্যাগ

গত ২৮শে অক্টোবর মিঃ জিন্না একটা বিবৃতি দেবার পর লীগসদস্যগণ সব কেন্দ্রীয় পরিষদ ত্যাগ করেন। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করবার জন্য লীগ দল যে সর্ত দিয়েছিল গভর্ণমেণ্ট সে সর্তগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে—বড়লাটের শাসন পরিষদ সমপ্রসারিত করার প্রতিবাদ করাই নাকি পরিষদত্যাগের উদ্দেশ্য। তাঁদের সর্ত ছিল যে অন্যান্য বিষয় এখন স্থগিত থাক্‌বে প্রদেশ ও কেন্দ্রে লীগকে যথার্থ ক্ষমতা দিতে হবে সে ক্ষমতার অর্থ কেন্দ্রে সরকার লীগের জন্য যে শতকরা ৩৩ ভাগ রেখেছেন তাতে চলবে না—সেখানে শতকরা ৫০ ভাগ এবং সম্প্রসারিত কাউন্সিলে কংগ্রেস যোগ দিলে ৫০ ভাগ না দিলে ৭৫ ভাগ তাঁদের জন্য রাখতে হবে, না হোলে তাঁরা যুদ্ধে সাহায্য করবেন না এবং এ হেন কক্ষ পরিত্যাগ দ্বারা অন্ধকে চক্ষুষ্মান ও বধিরকে শ্রুতিদান করবেন। তাদের এই কক্ষ পরিত্যাগের পশ্চাতে স্বাধীনতা লাভের প্রশ্ন নেই প্রশ্ন হোচ্ছে কি ভাবে ভারতের সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতির স্বাভাবিক অধিকারকে খর্ব করা যায় তার চেষ্টা। ইংরেজ সরকার তাঁদের এই নাটকীয় ভঙ্গীতে কতটা অভিভূত হবেন বলা যায় না—তবে মিঃ জিন্না ও তাঁর লীগ যদি মনে কোরে থাকেন যে এ ভাবে তাদের কার্যসিদ্ধি হবে তবে তাঁদের জানা উচিত যে যতদিন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি থাকবে ততদিন এসব আব্দার চলতে পারে তারপর জাতি যখন আত্মকতৃত্ব লাভ করেবে তখন একদলের আব্দারে কোনো ফল হবে না। দেশের লোক এঁদের যথার্থ রূপ জানবে কবে? . . .

ঢাকার দাঙ্গা

গত ৫ই অক্টোবর থেকে ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাভিনয়

হয়। এ সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টের বিবরণ এরূপ : ৫ই অক্টোবর হিন্দুসভার নির্দেশানুসারে হিন্দু দোকানদাররা হরতাল করে, রাত্র ৮টার পর সেদিন একজন মুসলমান অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা আহত হয়। প্রথম পর্যায়ের দাঙ্গার সূত্রপাত এতে এবং ১৩ই পর্যন্ত মারপিট চলে। এই ৯ দিনে ৭ জন হিন্দু ও ৪ জন মুসলমান নিহত হয় এবং ৮ জন হিন্দু ও ১৮ জন মুসলমান আহত হয়। এর পরে দ্বিতীয় দফা আরম্ভ হয় ঈদের মিছিলকে উপলক্ষ করে। ঈদের জন্য ২০শে সান্ধ্য আইন উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং ঈদের মিছিল বের করবার অনুমতিও দেওয়া হয়। ২৩শে সন্ধ্যায় মিছিল নবাবপুরে পৌঁছালে হিন্দু মুসলমানে গুরুতর দাঙ্গা হয়ে যায়, চারদিক থেকে ইট্ পড়তে থাকে। ফলে ৭০ জনের বেশী মুসলমান হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং তার মধ্যে দু'জন মারা যায়। এর পরে ৪ দিনে নানাস্থানে আক্রমণ ও অগ্নিকাণ্ড চলে। পুলিশের গুলিতে দুজন হিন্দু মারা যায়। ২২শে থেকে ২৭শে ৬দিনে ৫জন হিন্দু ও ৪জন মুসলমান নিহত হয় এবং ২১জন হিন্দু ও ১৬৬ জন মুসলমান আহত হয়। গ্রেপ্তার হয়েছে মোট ২৫৪ জন হিন্দু এবং ১৪৪ জন মুসলমান।

ঢাকা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান জরুরী হয়ে পড়েছে। সাম্প্রদায়িক বিষের একটা গোপন উৎস ঢাকায় আছে তা' ঢাকার গত নয় মাসের ইতিহাসই প্রমাণ করছে। বিষসংক্রমণের এই মূলকে বের করে উৎপাটিত না করলে সমস্ত ভারতবর্ষের নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে বারম্বার বিষাক্ত করে তুলবে। সমস্ত ভারতের চিন্তাশীল লোকদের এ বিষয়ে সমুচিতভাবে চেষ্টা করবার দিন এসেছে। ঢাকায় নতুবা আরো অশান্তি হবে কারণ এই মনোভাব ক্রমশঃই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সরকারের মতিগতি বোঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তারা এক অভূতপূর্ব অর্ডিনান্স গত ৪ঠা নভেম্বর থেকে ঢাকায় জারি করেছেন। তার নাম "উপদ্রুত অঞ্চল অর্ডিনান্স"। কোথাও কোনো ঘটনা ঘটলে এই আইনে সার্বজনীন জরিমানা আদায় করা হবে স্থানীয় লোকের কাছ থেকে। আর অপরাধের বিচার হবে স্পেশাল মেজিষ্ট্রেট কর্তৃক ও সরাসরিভাবে। এই ধরণের আইনে উপকারে চাইতে জুলুম হবার আশঙ্কা থাকে বেশী; বিশেষতঃ যখন কর্তৃপক্ষের ওপরে জনসাধারণের আস্থা নাই তখন এই কঠোর আইনে লোকের ভীতিরই কারণ হবে, কিন্তু অপরাধের নিবারণ হবার সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া ঈদ্ উপলক্ষ্যে ওরকম মিছিলের অনুমতি দিয়েও সরকার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ও সতর্কতার ব্যবস্থা করেন নাই। এটাও কর্তৃপক্ষের অপদার্থতার পরিচয় দান করে।* কর্তৃপক্ষ কি এখনো গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করবেন?

সুভাষবাবু কোথায়?

গত ১০ই নভেম্বর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের এক আশ্চর্য দায়িত্ব

জ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া গেছে। রাজা যুবরাজ দত্তসিংহের প্রশ্নের জবাবে হোম সেক্রেটারী মিঃ ই' কনরাথ স্মিথ বলেছেন, সুভাষ বাবু যে শত্রু পক্ষে যোগ দিয়েছেন তার প্রমাণ হলো চারদিকের গুজব এবং কিছু বেনামী ইস্তাহারের ঘোষণা। গুজবে ও ইস্তাহারে জানা গেছে, সুভাষ রোম বা বার্লিনে আছেন।

হোম সেক্রেটারীর এই দায়িত্ব জ্ঞানহীনতায় আমরা স্তম্ভিত হয়েছি। আজ ন' মাস ধরে চেষ্টা করে ভারত সরকার সুভাষ বাবুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে অবশেষে গুজবের ও বেনামা হ্যাণ্ডবিলের উপরেই নির্ভর করে বসলেন! সুভাষের অন্তর্ধানে সমস্ত দেশবাসী আশঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করে আছে প্রকৃত তথ্যের জন্য। এমন সময়ে সুভাষের অনুপস্থিতিতে এতবড় অভিযোগ তার বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হলো; এর কারণ কি? পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা কে জানে! হোম সেক্রেটারীর মনে নাকি কোন সন্দেহই নাই এসম্বন্ধে। কিন্তু আমরা মনে করি সরকারের এই অভিযোগের সাক্ষ্য প্রমান উপস্থিত করা উচিত। যদি তা' না পারেন তবে অবিলম্বে প্রত্যাহার করে এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

কানপুরে ছাত্রদলন

গত ৯ই নভেম্বর কানপুরের ছাত্রেরা দেউলী-রাজবন্দী-অনশন-দিবস পালন করবার জন্য সভা ও শোভাযাত্রা করেছিল। পুলিশের তা সহ্য হয়নি। ফলে লাঠি আক্রমণ এবং বহু ছাত্র আহত একটী ছাত্র মোটরের নীচে পড়ে মারা গেছে। ফলে সহরে হরতাল হয়। ছাত্ররা দলে দলে শহরে বেরিয়ে মৃত ছাত্রের স্মৃতিতে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘর্ষ বাধে স্থানে স্থানে। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে অবস্থা আয়ত্তে আনে। ২০০ ছাত্র জখম হয়েছে। লক্ষ্ণৌতেও শোভাযাত্রা পুলিশের লাঠিতে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখছি আইনের অপপ্রয়োগ বা অতিপ্রয়োগ দিনে দিনে মারাত্মক হয়ে উঠছে। ছুতায়নাতায় ১৪৪ ধারা, কথায় কথায় সান্ধ্য আইন, এই হয়েছে এদেশের রীতি। কর্তৃপক্ষ কি মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখবেন? আর একটু কম মেজাজী হলে মহাভারতও অশুদ্ধ হবে না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও রসাতলে যাবে না।

ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা

যাত্রার অভিনয়ে যুদ্ধ হয়, মানুষ মরে, রাজ্য ভাঙ্গে রাজ্য গড়ে; অর্থাৎ সবই হয় কিন্তু কিছুই আসল নয়, বাস্তব নয়। সবই মিথ্যা ও নকল। আমাদের এই দেশেও তাই হয়েছে অভিনয় এখানেও সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে অনেক কিছু হয়; অনেক ব্যাপার, অনেক সমারোহ, কিন্তু কিছুই সত্যিকার নয়। কোন বাস্তব ফল এ থেকে হয় না, হবে না। যুদ্ধ লাগবার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপে আমেরিকার সমাজ পরিকল্পনার হিড়িক পড়েছে। যুদ্ধ থামলে কি হবে, তারই খসড়া করা চলছে সর্বত্র। হিট্‌লার, ষ্ট্যালিন, চার্চিল, রুজভেল্ট, মায় ডাঃ বেনেস্ পর্য্য

নয়া দুনিয়ার পরিকল্পনা হাজির করেছেন। এখন ভারত গভর্ণমেণ্টকেও কিছু করতে হয়। তাই সেদিন 'পুনর্গঠন কমিটী' (Reconstruction committee) হয়ে গেলো স্যার রামস্বামী মুদালিয়রকে চেয়ারমেন করে। সঙ্গে সঙ্গে বহুতর সাবকমিটীও হয়েছে, তাদের চেয়ারমেন সবাই সাহেব লোক। স্যার রামস্বামী অর্থনীতিজ্ঞদের পরামর্শ কমিটী গঠন করে দিল্লীতে তার বৈঠক করলেন। বিশেষজ্ঞরা একমত হয়ে স্কীম দেবে, তারপরে কাজ হবে। অর্থাৎ যুদ্ধান্তে ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠন হবে।

কিন্তু এই ধরণের সমারোহ যে প্রহসন মাত্র তা' বর্তমান দুনিয়ার সম্বন্ধে যাদের অল্প জ্ঞানও আছে তারা জানে। বিষয়টা অতো সোজা নয়। অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি ও সমাজ-নীতির অচ্ছেদ্য যোগ। সর্বাঙ্গীন জাতীয়জীবন ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিকল্পনা না থাকলে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমস্যার সমাধান অসম্ভব। অথচ মহারথীদের সে সম্বন্ধে কোনই বালাই নাই। কেবল ঢাক ঢোল বাজিয়ে নাম প্রচার এবং প্রভূত অর্থ খরচই সার। কাজেই আসলে মহারম্ভ ও বাক্‌বিস্তারের অন্তে যা হবে সেটী হলো যুদ্ধে সরবরাহের ব্যবস্থার দরুণ যে'জট পাকাবে তার গ্রন্থিমোচন। সবটুকুই সরকারী স্বার্থ, জনগণের কল্যাণ ত্রিসীমানায়ও নেই। সরকার তো এদেশে কানে তুলো দিয়েছেন। কাজেই মন্তব্য করে লাভ নেই।

সত্যমূর্তির ডিগ্‌বাজী

গত ১০ই নভেম্বর বোম্বের কাছে এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সত্যমূর্তি দুঃখের সহিত স্বীকার করে ফেলেছেন অহিংসায় তার আর বিশ্বাস নাই। এতদিনে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্তির খেয়াল হয়েছে যে অহিংসা বর্তমান জগতের সাম্প্রতিক সমস্যায় কোন কাজেই আস্‌বেনা। সত্যমূর্তি একবার অন্ততঃ সত্যকথা বলেছেন, এজন্য তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে আস্‌বার পরে শার্দুল সিংজী তাঁকে বলেছিলেন এই সত্যকথাটাই স্বীকার করতে। কিন্তু সিংহ বিক্রমে তিনি গর্জন করে তখন প্রতিবাদ করেছিলেন যে গান্ধীবাদী নীতি ও কার্যক্রমে তাঁর আস্থা অটুট। কংগ্রেসে এই মিথ্যাকে লালন করে চলেছেন বহু কংগ্রেসী, কেবল সত্যমূর্তি একা নয়। সত্যমূর্তির এই স্বীকৃতিতে তাঁদের চক্ষুরুন্মীলন হবে কি? আমাদের বাংলা দেশের কংগ্রেসী কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এদিকে। সকল মিথ্যাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই অসত্যের ফাঁস থেকে আমাদের জাতীর জীবনকে তারা মুক্তি দিন।

১৩-১১-৪১